আহমদ শরীফ
শ্রদ্ধাঞ্জলি

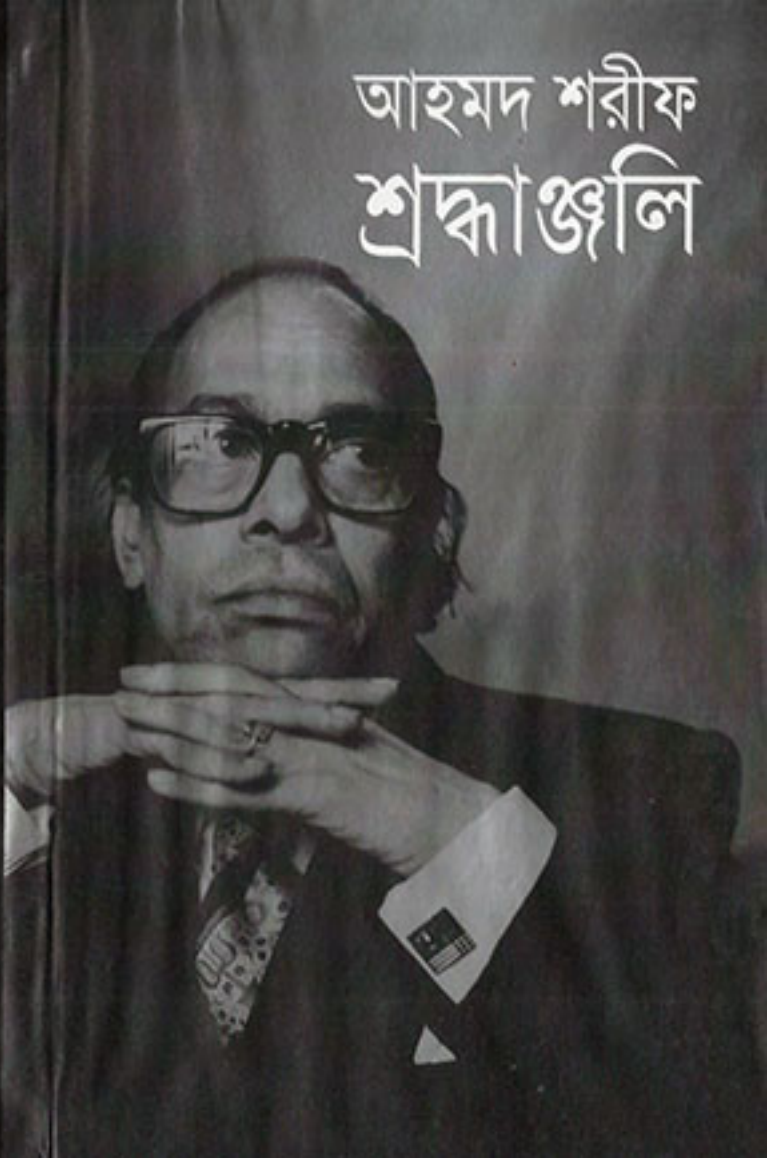

আহমদ শরীফ শ্রদ্ধাঞ্জলি

আহমদ শরীফ শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘ সঙ্কলিত

সম্পাদক

আফজালুল বাসার

অনন্যা

৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা

প্রকাশক ❐ মনিরুল হক
অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা

প্রথম প্রকাশ ❐ ফেব্রুয়ারি ২০০১

প্রচ্ছদ ❐ ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স ❐ গ্রাফিক্স স্ক্যান
৫৫/১ পুরানা পল্টন ঢাকা

কম্পোজ ❐ সৃষ্টি কম্পিউটার্স
৩০/এ/২ গোলাপবাগ, ঢাকা
মুদ্রণ ❐ হেরা প্রিন্টার্স
২৭ শ্রীশ দাস লেন ঢাকা

দাম ❐ তিনশত পঞ্চাশ টাকা

AHAMED SHARIF SRODDHANJOLI Edited by Afzajul Bashar ❐ Published by Moniroul Hoque ❐ First Published : February 2001 ❐ Ananya 38/2, Bangla Bazar, Dhaka-1100 ❐ Cover Design : Druba Eas ❐ Graphics : Graphics Scan ❐ Printing : Hera Printers ❐ Price : Three hundred fifty Only. US $ 15.

ISBN-984-412-172-8

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি
অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক

সম্পাদক
জনাব আফজালুল বাসার

সদস্য
ব্যারিস্টার আবদুল হক
জনাব আব্দুল মান্নান
জনাব হাসান ফকরী
জনাব ইসমত আরা চৌধুরী কাজল
জনাব মোহাম্মদ আজম
জনাব মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম
জনাব নাঈমা সিদ্দিকা

সম্পাদকীয়

বিশ শতকের শেষার্ধে এই ভূখণ্ডের সাধারণ রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ধারার দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পাই।

চল্লিশের দশকে দাঙ্গাবিক্ষুব্ধ হিন্দু-মুসলিম বিরোধবুদ্ধিনির্ভর কংগ্রেস-মুসলিম লিগ বিভক্ত আবহাওয়ায় এবং পাকিস্তান প্রস্তাব পাস হওয়ার পরে পূর্ব বাঙলার অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষ মুসলিম লিগ সমর্থন করতেন।

দুর্মর ভাষা জাতীয়তার জাগরণ, গোপন কমিউনিস্ট রাজনীতি, ইসলামকেন্দ্রিক রাজনীতি-সংস্কৃতি, তাহজিব-তমদ্দুনসহ কমবেশি অক্রিয়-সক্রিয় পাকিস্তান পন্থা ছিল পঞ্চাশের দশকের ধারা। এই ধারায় রূপান্তর সূচিত হয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে।

ষাটের দশকে ছিল ৬ দফা, ১৪ দফা, ১১ দফাকে কেন্দ্র করে গণআন্দোলন, বাঙালি জাতীয়তাবোধ, স্বাধিকার-চেতনা আর বাংলাদেশের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা।

স্বাধীনতা অর্জন, শেখ মুজিবের পতন ও সামরিক শাসন হল সত্তরের দশকের ধারা ও প্রবণতা।

সত্তরের দশক থেকে শুরু করে আশির-নব্বইয়ের দশকে সমাজতন্ত্রের পতনে প্রভাবিত হয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের ও বুদ্ধিজীবীদের প্রধান গোষ্ঠীসমূহ রাতারাতি গণতন্ত্রের সেবকে পরিণত হয়; অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা, অবসরপ্রাপ্ত আমলা, ব্যবসায়ী, রাজনীতিক সমন্বয়ে শক্তিকেন্দ্র গঠিত হয়; বাইরের উস্কানিমূলক ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে ধর্মকেন্দ্রিক ব্যবসাভিত্তিক রাজনীতি তুঙ্গে ওঠে আর বাঙালি জাতির দুইশত বৎসরের অর্জিত স্বাধীনতা-স্বাজাত্যবোধ-মনুষ্যত্ব বিকাশের চেতনায় মড়ক ধরে।

এই সাধারণ রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক চৈতন্যধারায় কমবেশি রঞ্জিত অথচ পৃথক ধারার স্রষ্টা এক বিশাল পুরুষ অধ্যাপক আহমদ শরীফ।

চার শত বৎসর যাবৎ ইউরোপে রেনেসাঁসের কর্ষণে যে শুভবুদ্ধি ও সমৃদ্ধিবোধের বিকাশ সাধিত হয়েছিল, কলকাতায় উনিশ শতকে যার তাপিত উদ্ভাস ঘটেছিল, বিশ শতকের গোড়ার দিকে ঢাকায় যে বোধিবৃক্ষ কিছু সৌরভ ছড়িয়ে দিয়েছিল—সেই রেনেসাঁসের মূল্যবাহী একজন মহাকায় ছিলেন অধ্যাপক আহমদ শরীফ। সম্ভবত ১৯৯৯ সনে অধ্যাপক আহমদ শরীফের মৃত্যুর সঙ্গে ঢাকায় বাঙালি সমাজে রেনেসাঁস দীপায়িত মহাকায়দের যুগ শেষ হল।

বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস পুনর্গঠন, শিক্ষকতার ও ব্যক্তিত্বের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন, মার্কসীয় ধারার রাজনীতির সক্রিয় ও প্রবল সমর্থন, যুক্তি-প্রগতি-কল্যাণের পক্ষে শুভবাদী ও মুক্তিকারী জীবনালোকের মশাল ধারণ, জড়তা-জরা-অন্ধতা-অতীতচারিতার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ, হিন্দু-মুসলিম বিরোধ বা জাতিসত্তার সমস্যা নিরসনে কার্যকর পন্থা প্রদর্শন, কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পাওয়া সত্ত্বেও সে আমন্ত্রণ রক্ষা করা থেকে বিরত থাকা, ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে অধ্যাপক আহমদ শরীফ এতদঞ্চলের প্রতিষ্ঠান-বহির্ভূত এবং প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গনে অঘোষিত আচার্য হিসেবে আবির্ভূত হন।—এসবের কিছু পরিচয় এই গ্রন্থে বিধৃত আছে। তা ছাড়াও এই গ্রন্থের বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা, প্রাতিস্বিক সম্পর্কের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিবৃত ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত পরিচয় এবং বিস্মৃত ও বিস্তৃত জীবনকথা। আর গোটা গ্রন্থটির মধ্য দিয়েই ফুটে উঠেছে বিংশ শতাব্দির বাংলাভাষী জনগণের বিশেষ করে বাংলাদেশের জনগণের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অন্তরঙ্গ চিত্র।

অধ্যাপক আহমদ শরীফের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘ তাঁর স্মরণে গ্রন্থ প্রকাশের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর দেখতে পায় যে, তাঁকে নিয়ে প্রণীত স্মরণ, স্মৃতিচারণ, মূল্যবিচার ইত্যাদি রচনা, প্রবন্ধ, কবিতা অনেক হাতে জমেছে। সেগুলো প্রকাশের জন্য প্রয়োজন একাধিক বৃহৎ আকৃতির গ্রন্থের পরিসর। বস্তুত তাঁর কৃতি ও কীর্তির মূল্যবিচার বা সে বিষয়ে অধিকতর পরিণত কাজ করার পরিস্থিতি এখনো তৈরি হয়নি। কারণ তাঁর রচিত প্রবন্ধ, গবেষণা, সম্পাদনা, সাক্ষাৎকার, ডায়েরি ইত্যাদির এক বৃহৎ অংশ এখনও অপ্রকাশিত-অগ্রন্থিত রয়ে গেছে। তা ছাড়া রয়েছে তাঁর বিভিন্ন মানুষকে লেখা চিঠিপত্র এবং বিভিন্ন সভা, সমিতি, অনুষ্ঠানে, উদ্বোধনে, আড্ডায় প্রদত্ত ভাষণ, সংলাপ ও কথকতা; ৪০টি সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থেকে সাংগঠনিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও কর্মকাণ্ড ইত্যাদি। এসব সঙ্কলিত হতে সময়েরও প্রয়োজন, জাতীয় পর্যায়ের প্রয়াসও আবশ্যক। আবেগসর্বস্বতা, মোহমুগ্ধতা, নানাবিধ মানসিক আচ্ছন্নতা এবং বিরূপ পরিবেশের প্রভাব কাটিয়ে ওঠাও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

এই প্রয়াসের অংশ হিসেবে আমরা যখন অর্থ সংস্থানের কথা চিন্তা না করে, প্রকাশক পাবার আগেই স্মারক গ্রন্থের জন্য প্রাপ্ত রচনার কিছু অংশ নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশ হবে এই আশায় শ'পাঁচেক পৃষ্ঠা কম্পোজ করে কাজ এগিয়ে নিয়েছি—এ রকম সময়ে প্রকাশনা সংস্থা অনন্যার মালিক জনাব মনিরুল হক সাগ্রহে গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অধ্যাপক আহমদ শরীফের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধাই হয়ত এই আগ্রহের কারণ।

স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘের সভাপতি এবং এই গ্রন্থের সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক গ্রন্থ প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে বাধা অপসারণে এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেছেন।

এই গ্রন্থের সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ নানাভাবে গ্রন্থ প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন।

সম্পাদকীয়

রচনা সংগ্রহ থেকে শুরু করে অন্যান্য সকল কাজে অধ্যাপক আহমদ শরীফের পরিবারের সদস্যবৃন্দ, স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘের সদস্যবৃন্দ, শুভানুধ্যায়ী এবং অন্যান্য অনেকের সমর্থন ও সহযোগিতায় গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভব হল।

এই মুহূর্তে গ্রন্থের লেখক, শিল্পী, প্রকাশক, বর্ণবিন্যাসকারী, গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসহ সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘ থেকে অধ্যাপক আহমদ শরীফ স্মরণে গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা অধ্যাপক আহমদ শরীফের মৃত্যুর (২৪.২.১৯৯৯) পরেই গৃহীত হলেও কিছু জটিলতার জন্য বর্তমান গ্রন্থটি অতি অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে দ্রুত প্রকাশ করা হয়েছে। ফলে আমাদের প্রয়াসে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অস্বাভাবিক নয়। আশা করি অধ্যাপক আহমদ শরীফ স্মরণে আরো গ্রন্থ প্রকাশিত হবে। যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি এ ব্যাপারে আমাদের ত্রুটি নির্দেশ করেন কিংবা পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করেন তা হলে স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘ সানন্দে তা গ্রহণ করবে এবং ঋণ শোধ করতে না পারলেও কৃতজ্ঞ চিত্তে ঋণ স্বীকার করবে।

মহাকায় যে-কোনো ব্যক্তিকে সচেতনভাবে ক্ষুদ্র বানিয়ে, অবহেলা করে, তাঁর সম্পর্কে নীরব থেকে, এমনকি তাঁকে শারীরিকভাবে খতম করে দিয়ে মেধাশূন্য জাতিতে পরিণত করার আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ষড়যন্ত্র এই দেশে এখন যথেষ্ট সক্রিয় রয়েছে। এইসব বাধা অতিক্রম করেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘ প্রত্যাশা করে, বাঙালি জাতির গৌরবদীপ্ত বিকাশ ঘটবে। এই কাজে অধ্যাপক আহমদ শরীফের কীর্তি এবং আমাদের এই গ্রন্থটি সহায়ক হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

১ ফেব্রুয়ারি ২০০১ আফজালুল বাসার

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়	vii	
	স্মরণ	
ডক্টর আহমদ শরীফ	৩	বদরুদ্দীন উমর চিন্তক, রাজনীতিক
কথায় ও কাজে অভিন্ন এক আদর্শ পুরুষ	৫	শামসুর রাহমান কবি, সাংবাদিক
আমার শিক্ষক জাতির শিক্ষক	৮	সুলতানা আজীম লেখক
কীর্তিমান মনীষী আহমদ শরীফ	১২	বেলাল মোহাম্মদ স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের সংগঠক, কবি
শরীফ স্যার যা বলে গেলেন	১৫	বীণা শিকদার প্রাক্তন ছাত্রনেতা
সাহস ও স্পষ্টতার প্রয়াণ	১৯	রাজু আলাউদ্দীন সাংবাদিক
ড. আহমদ শরীফ সম্পর্কে	২১	সৈয়দ আনোয়ার হোসেন অধ্যাপক, মহাপরিচালক বাংলা একাডেমী, ঢাকা
আহমদ শরীফ : কালাপাহাড় ও নীলকণ্ঠ	২৩	আবুল মোমেন সাংবাদিক, চট্টগ্রাম
ড. শরীফের মশাল জ্বালিয়ে রাখার অঙ্গীকার	২৫	বিনোদ দাশগুপ্ত সাংবাদিক
ড. আহমদ শরীফ : আমাদের সক্রেটিস	২৭	রুবাইয়াৎ ফেরদৌস সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাবি
স্রোতের বিরুদ্ধে একা	৩০	হাসান হাফিজ কবি, সাংবাদিক

মানুষ পরাজিত হয় না	৩৩	মাহবুব সাদিক পিএইচ. ডি. অধ্যাপক, সরকারি কলেজ, ফরিদপুর
চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ সেথা শির	৩৬	এ. কে. মনোয়ার উদ্দীন আহমেদ পিএইচ. ডি. অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাবি
অনন্য মনীষী আহমদ শরীফ	৩৮	মোনায়েম সরকার রাজনীতিক

পারিবারিক

অধ্যাপক আহমদ শরীফ : তাঁর ব্যক্তিজীবন	৪৩	রহিমা নেহাল অধ্যাপক আহমদ শরীফের পুত্রবধূ
স্মৃতির মণিমুক্তা	৪৮	সেলিনা চৌধুরী অধ্যাপক আহমদ শরীফের শ্যালিকা
আহমদ শরীফ স্মরণে	৪৯	আবু রশীদ মাহমুদ অধ্যাপক আহমদ শরীফের সম্বন্ধী
আমার স্মৃতিতে বাবার জন্মদিন	৫১	ইসমত আরা চৌধুরী কাজল অধ্যাপক আহমদ শরীফের পুত্রবধূ শিক্ষক, অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ধানমণ্ডি, ঢাকা

কবিতা

অন্য একজন	৫৫	সাযযাদ কাদির কবি, সাংবাদিক, অনুবাদক
এক কণা আলো দাও তোমার হৃদয়ের	৫৭	নূরজাহান সহকারী অধ্যাপক, সরকারি কলেজ
শরীফনামা	৫৮	শামসুল ইসলাম কবি, সাংবাদিক
বাংলার সীমানা	৫৯	শামছুজ্জামান মিলন ছড়াকার, রাজনীতিক
আহমদ শরীফ শ্রদ্ধাস্পদেষু	৬০	কামাল বারি সাংবাদিক
দ্রোহের জীবনপাখি	৬২	সুনীল শীল কবি
শরীফ বা লা-শরীফ	৬৪	মুহম্মদ নূরুল হুদা কবি, নির্বাহী পরিচালক নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

জীবনস্মৃতি

একটি পত্র	৬৭	অন্নদাশঙ্কর রায় সাহিত্যিক ও চিন্তক, কলকাতা
বিরল পণ্ডিত অধ্যাপক আহমদ শরীফ	৬৮	চৌধুরী আবদুর রহমান প্রাক্তন ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা
প্রিয় অধ্যাপক ডক্টর আহমদ শরীফ	৭৬	সালেহা চৌধুরী অধ্যাপক আহমদ শরীফের ছাত্রী, লন্ডন
এমন এক চরিত্র যাঁকে ভোলা যায় না	৮০	কাজী আবুল কাসেম শিল্পী
আহমদ শরীফ : আমার স্মৃতিতে	৮৩	আহমদ নুরুল ইসলাম সহযোগী অধ্যাপক, বাঙলা বিভাগ, চবি
ড. আহমদ শরীফের সর্বশেষ জন্মদিন	৮৯	আহমদ ছফা চিন্তক, লেখক, কবি
সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অধ্যাপক আহমদ শরীফ : স্মৃতিতে ভাস্বর	৯৩	খায়রুল বাসার নাট্যকার, পরিচালক
রাজনৈতিক আন্দোলনে অধ্যাপক আহমদ শরীফ : এক স্মরণীয় বিকেল	৯৬	হাসান ফকরী রাজনীতিক
স্বাধীনতা সংগ্রামের পথিকৃৎ অধ্যাপক আহমদ শরীফ	৯৯	আবদুল আজিজ বাগমার প্রাক্তন ছাত্রনেতা, ব্যবসায়ী
পটিয়াবাসীর পাশে অধ্যাপক আহমদ শরীফ	১০৪	হরিসাধন দেব ব্রহ্মণ অ্যাডভোকেট, সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা
সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের আড্ডাটা আজ আর নেই	১০৭	সুভাষকান্তি বড়ুয়া নেপাল সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে অধ্যাপক আহমদ শরীফের আড্ডার সদস্য
অধ্যাপক আহমদ শরীফ : স্মৃতি তর্পণ	১১০	কল্পনা ভৌমিক সহকারী গ্রন্থাগারিক, ঢাবি
শেষ আড্ডা	১১৩	আবু তাহের কাজল প্রকৌশলী
একটি মৃত্যু, একটি যন্ত্রণাহত বিবেক ও কিছু স্মৃতি	১১৭	প্রথমা রায় মণ্ডল পিএইচ.ডি., ডি. লিট. গবেষক, অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর মহিলা কলেজ, কলকাতা

নৈর্ব্যক্তিক

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের উত্তরাধিকারী অধ্যাপক আহমদ শরীফ	১৫৯	মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ক্যাডেট কলেজ, চট্টগ্রাম

আহমদ শরীফ : আমাদের সক্রেটিস	১৬২	হারুন-উর-রশিদ আসকারী সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ইবি
উৎস কোথায়	১৬৭	সমুদ্র গুপ্ত কবি
আমার ভাবনায় আহমদ শরীফ	১৬৯	আব্দুল মান্নান রাজনীতিক
যিনি কখনো কলম ও কণ্ঠ ভাড়া দেননি	১৭১	গাজী আজিজুর রহমান সহকারী অধ্যাপক, সরকারি কালিগঞ্জ কলেজ, সাতক্ষীরা
যুগপ্রবর্তক আহমদ শরীফ	১৭৫	রতনতনু ঘোষ সাংবাদিক, প্রভাষক, মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ, ঢাকা
অধ্যাপক আহমদ শরীফ : আমাদের ভলতেয়ার	১৭৯	তরুণ চক্রবর্তী শিক্ষক, অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ধানমণ্ডি, ঢাকা
সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সাহস ও দ্রোহের প্রতীক	১৮৪	মহসিন শস্ত্রপাণি রাজনীতিক
অধ্যাপক আহমদ শরীফের সামাজিক দায়িত্ববোধ	১৮৬	নেহাল করিম পিএইচ. ডি. অধ্যাপক আহমদ শরীফের পুত্র, অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাবি
অধ্যাপক আহমদ শরীফ : সুদীর্ঘ মনোলগ	১৮৮	মামুনুর রশীদ নাট্যকার, পরিচালক
আহমদ শরীফ	১৯২	রফিকুল ইসলাম পিএইচ. ডি. অধ্যাপক, বাঙলা বিভাগ, ঢাবি
অপূর্ব সংসদ-এর কথা	১৯৪	মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান প্রাক্তন প্রধান উপদেষ্টা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পর্যালোচনা

আহমদ শরীফ : একলা চলার অভীক	২০৩	আহমদ কবির অধ্যাপক, বাঙলা বিভাগ, ঢাবি
আহমদ শরীফের নজরুল-বিবেচনা প্রসঙ্গে	২০৭	সৌমিত্র শেখর পিএইচ. ডি. সহকারী অধ্যাপক, বাঙলা বিভাগ, ঢাবি
অধ্যাপক আহমদ শরীফের সাহিত্য-গবেষণার এক দিক	২১৪	বিশ্বজিৎ ঘোষ পিএইচ. ডি. অধ্যাপক, বাঙলা বিভাগ, ঢাবি

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতা আহমদ শরীফ	২২০	নুরুর রহমান খান পিএইচ. ডি., ডি. লিট. অধ্যাপক, বাঙলা বিভাগ, ঢাবি
বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য : বাঙলা সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস	২৩৮	সাইদ-উর-রহমান পিএইচ. ডি. অধ্যাপক, বাঙলা বিভাগ, ঢাবি
অধ্যাপক আহমদ শরীফের মধ্যযুগের সাহিত্য সম্পাদনা	২৪৪	আবদুল গফুর প্রাক্তন উপপরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
অধ্যাপক আহমদ শরীফ : তাঁর মানবতা ও গণমুক্তির দর্শন	২৫৫	বশীর আল্‌হেলাল লেখক
আশির দশকে ভাষার রাজনীতি ও অধ্যাপক আহমদ শরীফের চিন্তা	২৬৮	ইসরাইল খান পিএইচ. ডি. প্রাবন্ধিক
অগ্রসর চেতনার আলোকে অধ্যাপক আহমদ শরীফ	২৭৩	আইয়ুব চৌধুরী রাজনীতিক
উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক বিরোধ এবং অধ্যাপক আহমদ শরীফের প্রাসঙ্গিকতা	২৭৯	শৈলেশকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদক, গান্ধী স্মারক নিধি, দিল্লি
পার্থক্যের স্রষ্টা অধ্যাপক আহমদ শরীফ	২৮৬	আফজালুল বাসার লেখক
অধ্যাপক আহমদ শরীফ : তাঁর শিক্ষকতা এবং স্বাজাত্যবোধ ও স্বাদেশিকতা	২৯৫	আবুল কাসেম ফজলুল হক চিন্তক, অধ্যাপক, বাঙলা বিভাগ, ঢাবি

সাক্ষাৎকার ও সংলাপ

আলাপচারী ডক্টর আহমদ শরীফ : একটি অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার	৩১৫	সাক্ষাৎকার গ্রহণ : আবুল আহসান চৌধুরী পিএইচ. ডি. গবেষক, ডিন, কলা অনুষদ, ইবি
বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্র-কাঠামোয় পশ্চিমবাংলার উন্নতি নেই, অবনতি আছে	৩৪১	সাক্ষাৎকার গ্রহণ কেশব মুখোপাধ্যায় সম্পাদক, কলকাতা
অধ্যাপক আহমদ শরীফের সংলাপ	৩৬৩	ইসা মোহাম্মদ সহকারী অধ্যাপক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

স্বরচিত

আমার কথা	৩৭৫	আহমদ শরীফ
জনসমাজে নীতি-নিয়মরিক্ততার কারণ	৩৭৮	আহমদ শরীফ
আমাদের সংস্কৃতির উপর সাম্প্রতিক হামলা	৩৮০	আহমদ শরীফ

সম্পাদকীয়

৩৯৫

THE ATHEIST, আন্দোলন, ভ্যানগার্ড, মে দিবসের কাগজ, চলতি পত্র, লেখক সমাবেশ, পাক্ষিক চিন্তা, দৈনিক পূর্বকোণ, দৈনিক আজাদী, নতুন কথা, Independent, দৈনিক প্রাইম, আজকের কাগজ, মানবজমিন, মুক্তকণ্ঠ, ভোরের কাগজ, খবরের কাগজ, ধ্রুবতারা, গণস্বাস্থ্য, আজকের সূর্যোদয়, Bangladesh Observer, সংবাদ, জনকণ্ঠ

শোকবার্তা শোকবাণী

৪১৯

প্রধানমন্ত্রীর শোকবাণী
বিরোধীদলীয় নেতার শোকবাণী
কয়েকটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে
ড. আহমদ শরীফের আড্ডায় অংশগ্রহণকারী অনুসারীবৃন্দ,
বাঙলা বিভাগ, ঢাবি, পূর্ববাঙলার সর্বহারা পার্টি,
স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘ, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ,
সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতি, অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী,
বিপ্লবী জাতীয় শ্রমিক আন্দোলন (দ্বিতীয় জাতীয় কমিটি), বাংলাদেশ
জাতীয় হিন্দু পরিষদ, বস্তি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি,
বিপ্লবী জাতীয় শ্রমিক আন্দোলন (জাতীয় কমিটি),
বিপ্লবী নারী মুক্তি, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক আহমদ শরীফের জীবনপঞ্জি

৪৩৫

পরিশিষ্ট

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি ৫১৯
চক্ষু ও মরদেহ প্রদানের অসিয়তনামা ৫২৩
চক্ষু ও মরদেহ প্রদানের হলফনামা এবং মরদেহ হস্তান্তরের দলিল ৫২৪
আলোকচিত্র ৫২৫

স্মরণ

ডক্টর আহমদ শরীফ

বদরুদ্দীন উমর

বিগত ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ভোররাত্রি ১-৪০ মিনিটে ডক্টর আহমদ শরীফের জীবনাবসান হয়।

তাঁর জন্ম হয়েছিলো ১৯২১ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি, চট্টগ্রাম জেলায় সুচক্রদণ্ডী গ্রামে। তাঁর পিতা আবদুল আজিজ সাহেব ছিলেন চট্টগ্রাম সরকারী কলেজিয়েট স্কুলের কর্মচারী। তাঁর মাতার নাম সিরাজ খাতুন। ঊনিশ শতকেই ডক্টর আহমদ শরীফের পরিবারে শিক্ষাদীক্ষা শুরু হয়। তাঁর চাচা ছিলেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, যিনি শুধু এদেশের পুথি সাহিত্য গবেষকদের মধ্যে একজন বিখ্যাত অগ্রগণ্য পণ্ডিতই ছিলেন না, চিন্তা-চেতনার দিক থেকে তিনি ছিলেন সকল প্রকার কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ডক্টর আহমদ শরীফের ওপর সাহিত্যবিশারদের প্রভাব সুবিদিত।

কর্মজীবনের প্রথমে তিনি ১৯৪৪ সালে কাজ করেন সরকারের দুর্নীতি দমন বিভাগে, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সে চাকরীতে ইস্তফা দেন। আগস্ট ১৯৪৫ থেকে ৪৮-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ডক্টর শরীফ লাকসামে পশ্চিমগাঁও নবাব ফৈজুন্নেসা কলেজে শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৮-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৯-এর জুন পর্যন্ত তিনি শিক্ষকতা করেন ফেনী ডিগ্রী কলেজে। ১৯৫০ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে রিসার্চ এ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৫২-৫৩ সাল থেকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন অস্থায়ী লেকচারার হিসেবে। তাঁর লেকচারার পদ স্থায়ী হয় ১৯৫৭ সালে। ১৯৬৯ সালে তিনি রীডার এবং ১৯৭২ সালে প্রফেসর পদে নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ সালে তিনি বিভাগীয় প্রধান এবং ১৯৮০ সালে কলা বিভাগের ডীন নিযুক্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরী থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করে ১৯৮৩ সনের ৩১শে অক্টোবর।

ডক্টর আহমদ শরীফের রচনাবলী অনেক পথগামী হলেও তাঁর মূল কাজের ক্ষেত্র মধ্যযুগের মুসলমান সাহিত্য। এ ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর সব থেকে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর দুটি বই—*চট্টগ্রামের ইতিকথা* ও *বিচিত চিন্তা*। ১৯৬৭ সালে তিনি পিএইচ. ডি. লাভ করেন সৈয়দ সুলতানের সাহিত্যের ওপর কাজ

করে। *সৈয়দ সুলতান : তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ* নামে তাঁর এই থিসিসটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে। তাঁর *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ* প্রকাশিত হয় এপ্রিল ১৯৭৭, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* প্রথম খণ্ড ১৯৭৮, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৮৩; *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য* বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে; *বাংলা ভাষা সংস্কার আন্দোলন* ১৯৮৬; *বাঙালীর চিন্তা চেতনার বিবর্তন ধারা* ১৯৮৭। এছাড়া তিনি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের একটি জীবনীও রচনা করেন (১৯৮৭)।

তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে ১৯৬১ সালে অধ্যাপক আবদুল হাই-এর সহযোগে তিনি সম্পাদনা করেন *মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতা*। এছাড়া *মুসলিম কবির পদসাহিত্য* (১৯৬১), *মধ্যযুগের রাগতালনামা* (১৯৬৭), *বাঙলার সূফী সাহিত্য* (১৯৬৯), *বাউল তত্ত্ব* (১৯৭৩), আলাওল বিরচিত *সিকান্দারনামা* (১৯৭৭) ইত্যাদি।

ডক্টর আহমদ শরীফ শেষ দিকে বিভিন্ন সাময়িকী ও পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ লেখেন। তিনি এ দেশে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, সাংস্কৃতিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং শাসক শ্রেণীর নানা গণবিরোধী নীতি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের লোক ছিলেন না, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ও বামপন্থী রাজনীতির তিনি ছিলেন দৃঢ় সমর্থক।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী নামে পরিচিত লোকজনের শতকরা নব্বই ভাগ কি তারও বেশী হলো নানা পর্যায়ের সুযোগ সন্ধানী এবং ক্ষুদ্র স্বার্থ উদ্ধারকারী। শিক্ষিত অংশের মধ্যে এদের বিপুল প্রাধান্যের কারণে বাংলাদেশে বিদ্বৎসমাজ বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই। বাংলাদেশের উপরোক্ত বুদ্ধিজীবীরা যে সব গুণের অধিকারী সেটার দ্বারা যে বিদ্বৎসমাজ গঠিত হয় না এটা বলাই বাহুল্য।

এ দিক দিয়ে ডক্টর আহমদ শরীফ ছিলেন এক মস্ত ব্যতিক্রম। তাঁর মতো ব্যক্তিদের দ্বারাই গঠিত হয় যে কোনো দেশের বিদ্বৎসমাজ। কিন্তু এ ধরনের ব্যক্তির সংখ্যা এতই নগণ্য যে তাঁরা বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করলেও তাঁরা একত্রে এদেশে কোনো বিদ্বৎসমাজ গঠন করেন, এমন বলার উপায় নেই।

এ কারণে বাংলাদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ডক্টর আহমদ শরীফের অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে এক বড়ো রকম ক্ষতির ব্যাপার।

কথায় ও কাজে অভিন্ন এক আদর্শ পুরুষ

শামসুর রাহমান

পঞ্চাশের দশকের প্রত্যুষকালীন সময়ের কথা। আমি, বিশ বছরের সদ্য যুবক, সবেমাত্র নাজিমুদ্দীন রোডের প্রায় দায়সারা গোছের রেডিও পাকিস্তান অফিসে প্রবেশাধিকার পেয়েছি। না, কোনও কর্মচারী হিসেবে নয়, একজন তরুণ কবি হওয়ার সুবাদে। সেই অফিসেই আমি প্রথম ডক্টর আহমদ শরীফকে দেখি। তখন তিনি রেডিও পাকিস্তানে একজন প্রোগ্রাম প্রডিউসার হিসেবে কর্মরত। তাঁকে সেই অফিসে ডাঙায়-তোলা মাছের মতো মনে হচ্ছিল। ধবধবে সাদা ফুলহাতা শার্ট আর ট্রাউজার পরা, ঝকঝকে গায়ের রঙ। কিন্তু সেই অফিসের কামরায় তিনি যেন নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না। তাঁর ছটফটে, অস্বস্তিকর ভাব আমার দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি বেশিদিন সেখানে কর্ম করেন নি। এতে আমি অন্তত অবাক হই নি। এরপর তিনি তাঁর যোগ্য জায়গায় গিয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে একজন অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন ড. আহমদ শরীফ। জ্ঞানচর্চা ছিল যাঁর সার্বক্ষণিক ধ্যান, তিনি কি পারেন রেডিও অফিসের ছোট্ট কুঠুরিতে আটকে থাকতে? অধ্যাপনায় তিনি যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তা আজ সবারই জানা কথা।

তবে আমরা সবাই এ কথাও জানি, তিনি শুধু একজন গ্রন্থবিহারী অধ্যাপকই ছিলেন না, তিনি একজন অসাধারণ লেখকও ছিলেন। বলব না, তিনি কোনও সৃজনশীল কবি অথবা ঔপন্যাসিক ছিলেন। তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন মননশীল প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে। অবশ্য এর আগে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিষয়ক তাঁর বিশিষ্ট গবেষণাধর্মী রচনাসম্ভারের কথা উল্লেখ করতেই হবে এবং এই গবেষণাকর্মের কথা স্মরণে রাখলে আমাদের স্বীকার করতে হবে ড. আহমদ শরীফ শুধু আবুদল করিম সাহিত্যবিশারদের নিকট আত্মীয়ই ছিলেন না, ছিলেন তাঁর যোগ্য উত্তরসাধকও।

অনেক আগে ড. আহমদ শরীফ আরমানীটোলার একটি একতলা বাসায় থাকতেন। আমি থাকতাম সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেনে। আমাদের দু'জনের বাসস্থানের মধ্যে দূরত্ব কমই ছিল। মাঝে মাঝে তাঁর বাসায় যেতাম একজন জ্ঞানীর সাহচর্য লাভের আশায়। তিনি, আমার ধারণা, আমাকে অপছন্দ করতেন না। তিনি নানা কথা বলতেন। তাঁর কথা মন দিয়ে শোনার মতো ছিল। তিনি যেসব কথা বলতেন সেগুলোয় কোন

রকম ধোঁয়াশা ছিল না। যা বলতেন তাতে স্পষ্টতা আর দৃঢ়তা থাকত। আর থাকত অবিচল বিশ্বাসের আলো। এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত ছিল প্রগতিশীল চিন্তা, ইহজাগতিকতার ভিত্তিতে। তিনি সাম্প্রদায়িকতা, কূপমণ্ডূকতা, কুসংস্কার এবং ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে শুধু লেখেনই নি, অবিরল বলে গেছেন আজীবন। তাঁর কোনও বক্তব্যে কখনও কোনোরকম উপরচালাকি অথবা সুবিধাবাদ প্রশ্রয় পায়নি। যুক্তি ও ন্যায়ের পথে তিনি নিজে চলতেন এবং তাঁর ছাত্রদেরও পরিচালিত করতে চেষ্টাশীল ছিলেন সব সময়। প্রতিভাবান সাহিত্যিক এবং অধ্যাপক ডক্টর হুমায়ুন আজাদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ড. আহমদ শরীফ বলেছেন, "মানুষের সর্বশেষ আবিষ্ক্রিয়া হচ্ছে সমাজতন্ত্র, সর্বশেষ বলেই বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর গরিব দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রই সর্বোৎকৃষ্ট। সেজন্যই আমি সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী। কিন্তু সমাজতন্ত্র বললেই মানুষ ক্ষেপে যায়, তার কারণ হলো শাস্ত্র। মানুষ বিশ্বাস-সংস্কার অনুসারে চলে। তাদের ভূতে ও ভগবানে বিশ্বাসের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ওই বিশ্বাসই তাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে, তারা নিয়তিবাদী হয়, অদৃষ্টবাদী হয়। নতুন ব্যবস্থার জন্যে তাই আঘাত করা দরকার বিশ্বাসের দুর্গে। প্রথম লেখা থেকে আজ পর্যন্ত আমি মানুষের পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার-নিয়ম-শাস্ত্র-প্রচলিত আইন-কানুন-সবকিছুকেই আঘাত করেছি। বিশ্বাসের দুর্গে আঘাত করেছি, কেননা বিশ্বাস হচ্ছে যুক্তির অভাব। যেসব বিশ্বাস উন্নতির, আধুনিকতার, প্রগতির সুষ্ঠু সমাজ গড়ে তোলার পক্ষে বাধা, সেগুলোকে আঘাত করেছি। শাস্ত্রীয় আচার-আচরণ সবটাই কুসংস্কার, তার বিরুদ্ধে চিরকাল লিখেছি।"

হুমায়ুন আজাদ ড. আহমদ শরীফকে প্রশ্ন করেন, "আপনি যেসব ব্যাপারে প্রতিবাদ করেন সেগুলোই কি এখন আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে না?" ড. আহমদ শরীফ জবাব দেন এভাবে, "ঠিক প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না, তবে প্রবলভাবে আসছে। যেমন ধর্ম। ধর্ম এখন আড়ম্বরের সাথে আসছে, আনছে সরকার। কম্যুনিজমকে বাঁধা দেয়ার জন্যে, অশিক্ষাকে জিইয়ে রাখার জন্যে। পুঁজিবাদী শক্তিগুলো অনুন্নত দেশের সরকারগুলোকে এজেন্ট হিসাবে ব্যবহার করে, ধর্মের প্রচারণা চালায়। সাধারণ মানুষ ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাকে অন্যায় মনে করে বলে পছন্দ না হলেও মেনে চলে।" ড. আহমদ শরীফের কথায় কোনোরকম রাখ-ঢাক নেই, একেবারেই সোজা-সাপ্টা কথা।

আগেই বলেছি, তিনি স্পষ্ট কথা বলতে পছন্দ করতেন। যা বিশ্বাস করতেন তা-ই উচ্চারিত হতো তাঁর কণ্ঠে, লেখনীতে। পরকালে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু এই জীবনকে তিনি সত্য বলে মানতেন এবং জীবনের প্রতি অশেষ ভালোবাসাও ছিল তাঁর। যেহেতু তিনি বিশ্বাস করতেন ঐহিকতায়, তাঁর আগেপরে বলে কিছু নেই, বর্তমান জীবনই সব, তাই জীবন তাঁর কাছে অতুলনীয়; অতুলনীয় এর রূপরস। জীবনকেই পরম ঐশ্বর্য জ্ঞান করেছেন তিনি এবং এজন্যেই এই ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত হতে আগ্রহী ছিলেন না কখনও।

বিভিন্ন সময়ে তিনি অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু কখনও তাঁর মধ্যে কোন স্ববিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়নি। তাঁর সব কথার সঙ্গে সবাই একমত হবেন, এটা আশা করা যায় না। আসলে পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তিই নেই যাঁর সকল উক্তি সবার কাছেই

গ্রাহ্য। আমি নিজে ড. আহমদ শরীফের অনেক কথাই মান্য করি। তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করার ক্ষেত্র অত্যন্ত অপরিসর। শ্রদ্ধেয় আহমদ শরীফ শুধু একজন পুস্তকপ্রিয় পণ্ডিত, গবেষক, দীপ্তিমান প্রাবন্ধিক, প্রগতিশীল, দর্শনের নাস্তিক্যধারায় সমর্পিত পুরুষই ছিলেন না, তাঁর মধ্যে একজন কর্মীর উদ্যমও ছিল পুরোদস্তুর। এজন্যেই তিনি নির্দ্বিধায় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের আগে ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে শহীদ মিনারে একটি উদ্দীপক ঘোষণা পাঠ করেছিলেন বিক্ষুব্ধ লেখক শিল্পীদের সমাবেশে। তাঁর কণ্ঠের সঙ্গে আমরা সবাই কণ্ঠ মিলিয়েছিলাম সেদিন। পরবর্তীকালে তিনি বামপন্থী লেখকদের শিবিরে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা তো গ্রহণ করেইছিলেন, শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। গণআদালতের একজন বিচারক হিসাবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। শেষের দিকে তিনি শারীরিক কারণে প্রতিবাদী মিছিলের যোগ দিতে অপারগ ছিলেন এবং সাহিত্য-সংস্কৃতিবিষয়ক সভাতেও খুব কম যেতেন।

উগ্র মৌলবাদীরা তাঁকে 'মুরতাদ' আখ্যা দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলার অপচেষ্টায় মেতেছিল, তাঁর বাসায় হাতবোমাও ছোঁড়া হয়েছিল। কিন্তু সত্য, প্রগতি ও মানবকল্যাণের একনিষ্ঠ সাধক ড. আহমদ শরীফ ক্ষণিকের জন্যে ঈষৎ বিচলিত হলেও আদর্শচ্যুত হননি, অবিচল ছিলেন ঐহিকতায়, অন্ধকারের দাপট তাঁকে একচুলও সরাতে পারে নি আলোর ঝর্ণাধারা থেকে।

যখন আমরা বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের অনেক অধ্যাপক ও ছাত্রের মধ্যে কুসংস্কার, কূপমণ্ডূকতা এবং ধর্মান্ধতা দেখে হতবাক হয়ে যাই, তখন ড. আহমদ শরীফের বিজ্ঞানমনস্কতা ও অসামান্য অগ্রসর চেতনার পরিচয় পেয়ে এই প্রগতিশীল ব্যক্তির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। তিনি শুধু কথায় তাঁর অগ্রসর মানসের পরিচয় দেননি কাজেও তা প্রমাণ করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে যাতে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান না হয় এবং তাঁর মরণোত্তর চোখ দু'টি 'সন্ধানী' এবং মৃতদেহ বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজের অ্যানটমি বিভাগকে দান করার জন্যে একটি উইল করে যান। সংবাদপত্রে পড়েছি মহৎপ্রাণ ড. আহমদ শরীফের দুই চোখের দুটি কর্ণিয়া দু'জন অন্ধ ব্যক্তির চোখে বসানো হয়েছে। এই দু'জনের মধ্যে একজনের নামের আগে 'হাফেজ' শব্দটি রয়েছে। আখেরে একজন মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মহান 'মুরতাদ'-এর দান করা চোখ একজন হাফেজের কাজে লাগল। ড. আহমদ শরীফ যা যা দেখতেন অবিকল সেসবই কি দেখছেন এখন সেই হাফেজ সাহেব? হ্যাঁ, দেখছেন ঠিকই। কিন্তু ড. আহমদ শরীফ যেভাবে দেখতেন, সেভাবে তিনি দেখতে পাবেন না। অনেক কিছুই তিনি দেখেও বুঝতে পারবেন না আমাদের শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক-লেখকের মতো। কারণ, যে চেতনার অধিকারী ছিলেন তিনি সেই চেতনা এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের নেই। জানি না কোন আগামী দশকে, কোন শতাব্দীতে হবে!

আমার শিক্ষক জাতির শিক্ষক

সুলতানা আজীম

তাঁকে নিয়ে আলোচনা, লেখালেখি অনেক হয়েছে, হচ্ছে। তার উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতিতেও। এটা চলবেই। তাঁর কৃতী নিয়ে লিখবার মতো সময় হলো না বলে আজ তাঁর স্মৃতি নিয়েই লিখব। স্মৃতি? সে তো অনেক। সব তো একবারে লেখা যাবে না। দুএকটা দিনকেই বেছে নেব আজ, অনেক দিনের ভেতর থেকে।

আমার গর্ব, আমি তাঁর ছাত্রী ছিলাম। আমার অহঙ্কার, তিনি আমার শিক্ষক ছিলেন। আমার সুখ, আমাদের ওপর অর্পিত তাঁর দায়িত্বের উত্তরাধিকার বয়ে যাওয়ার। একজন মানুষকে হলেও, আলোর পথে এগিয়ে দেবার।

পেরিয়ে গেছে বহুদিন, তবু মনে হয় এই তো সেদিন। মনে হয়, কারণ অমন প্রিয় সময় আর কি এসেছে জীবনে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে টিকে গেছি সবগুলোতেই। ভর্তি হতে হবে একটি বিভাগে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। কোথায় ভর্তি হব, সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। একটি নাম, আর সে নামের আকর্ষণ পৌঁছে দিল সিদ্ধান্তে। আমাদের একজন প্রধান পণ্ডিত তিনি। তাঁর সম্পর্কে শুনে আসছি ছোটবেলা থেকে। যেন তাঁকে, তাঁর ছাত্রী না হয়েও, জেনে গেছি অনেক। সে জানার ভেতর শ্রদ্ধা যত, ভয় তার চেয়ে কম নয়। ভয়, তাঁর পাণ্ডিত্যের সামনে নিজের অজ্ঞানতার।

অধ্যাপক মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, আবদুল হাই বেঁচে নেই তখন। মুনির চৌধুরী হয়েছেন স্বাধীনতার বলি। ভয়ানক বিষণ্ণতায় ম্লান হয়ে আছে বাংলা বিভাগের চত্বর। কিন্তু আহমদ শরীফ আছেন শ্রদ্ধা আর ভয়ের সমন্বয়ে ভীষণ আকর্ষণীয়, অনন্য শিক্ষক। কী ভীষণ সৌভাগ্য আমাদের।

ভর্তিপর্ব শেষ, অদম্য অস্থিরতার শুরু। অস্থিরতা, বিভিন্ন শিক্ষকের সঙ্গে প্রথম ক্লাসের অভিজ্ঞতার। সবচেয়ে অস্থিরতা, অধ্যাপক আহমদ শরীফের ক্লাসের জন্য। শ্রেণীকক্ষের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বড়, সেখানেই হতো তাঁর ক্লাস। একটি সিটও বোধহয় খালি থাকত না। অন্যান্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকরাও যে তাঁর বক্তৃতা শুনতে আসতেন, তা আগেই শুনেছিলাম। পৌষের সূর্যালোকে স্নিগ্ধ এক সকালে প্রথম ক্লাসটি ছিল আমাদের সঙ্গে। সমাধির নিস্তব্ধতা শ্রেণীকক্ষ পেরিয়ে করিডোরে

পৌঁছালো। সন্ত্রস্ত আমরা অভ্যাসমতোই উঠে দাঁড়ালাম তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে। দাঁড়াতে হবে না– প্রথম কথা বললেন তিনি। 'আমি আহমদ শরীফ, কী পড়াব তা নিশ্চয়ই জানো তোমরা' বলতে বলতেই প্রথম সারির প্রথম ছাত্রের হাতে নাম ডাকার খাতাটি দিলেন। বললেন, ধারাবাহিকভাবে সই করে টেবিলে রেখে দিও। শুরু হলো তাঁর বক্তৃতা। অন্য কোনো অধ্যাপকের সঙ্গে মিলল না তাঁর আচরণ।

সেদিন কী বিষয় দিয়ে শুরু করেছিলেন মনে করতে পারছি না আজ তবু মনে পড়ে সেদিন এবং তারপর প্রতিটি ক্লাসেই বক্তৃতা করতে করতে চলে যেতেন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। কোথা থেকে কোথায় যে যেতেন–পৃথিবীর যেকোনো বিষয়ে তাঁর অবাধ বিচরণ। ক্লাস শেষ হওয়ার একটু আগে আবার ফিরে আসতেন সেখানে, যেখান থেকে শুরু করেছিলেন। মনে হতো, সুগ্রথিত একটি ক্যাসেট বাজছে তাঁর ভেতরের অদৃশ্য রেকর্ডারে। একটি শব্দের কাছেও বাধাপ্রাপ্ত হতেন না তিনি। ছাত্রদের নাম ডেকে অথবা অপ্রয়োজনীয় কথা বলে একটি মুহূর্তও নষ্ট করেননি শরীফ স্যার। এক মিনিট দেরি করেও আসতেন না ক্লাসে, বেরিয়েও যেতেন না এক মিনিট আগে। 'কথাটা বুঝবার চেষ্টা করো'–বক্তৃতার ভেতরে অনেকবার বলতেন এই বাক্যটি। কেন বলতেন তিনি একথা? তিনি কি বুঝতেন, আমরা ওই বয়সের প্রজাপতিমন নবীন শিক্ষার্থীরা এমন জ্ঞানসমৃদ্ধ বক্তৃতায় সম্পূর্ণ মনোযোগী হতে পারছি না? আমরা কেন, তাঁর বক্তব্য বুঝবার মানসিকতা আপামর বাঙালি কি আয়ত্ত করেছে এখনো পর্যন্ত।

যতখানি শ্রদ্ধা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলাম শরীফ স্যারের প্রতি, তাঁর সঙ্গে বেশ ক'বছরের সান্নিধ্যে, তা বেড়েছে অনেক। সঙ্গে যোগ হয়েছিল ভালোবাসা। ভয় তো ছিলই। সে ভয় খুব জরুরি ছিল, আমাদের কল্যাণের জন্য। শ্রদ্ধেয় মানুষের ভীষণ অভাবের বাংলাদেশে, অনিবার্য ছিল তাঁর জন্য আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি। কয়েক বছর আগে দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে, ঢাকায়, এক সমাবেশে। স্যারকে কেন্দ্র করে আড্ডা শুরু হলো, অনুষ্ঠানের শেষে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ভাগ হচ্ছে তখন। পতন ঘটেছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার। ওরকম সময়ে এটাই হলো আলোচনার প্রধান বিষয়। রাষ্ট্রিক জীবনের সমস্যা এবং সঙ্কট কমানোর জন্য, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রদ্ধাবান শরীফ স্যার যে-কয়েকটি উপায়ের কথা বলতেন তার ভেতর একটি হলো, কমিউনিস্ট হওয়া। সে কথাটি মনে পড়ায় জানতে চাইলাম, বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি কী বলবেন। বললেন, এর বিকল্প কিছু নেই। তাঁর এক অর্বাচীন ছাত্রী আমি, সেদিন কিছু বলার সুযোগ হারাতে চাইলাম না। বললাম, 'স্যার কমিউনিজমের ওপর পড়াশোনা করে অথবা কমিউনিস্ট পার্টি করেই কি কোনো মানুষ কমিউনিস্ট হতে পারে? না পেরেছে? কমিউনিস্ট নামধারী সামন্ত বুর্জোয়ারা যে-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে, তা তো যথার্থ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল না। যা ছিলই না, তার আবার পতন কী। আমার ধারণা, পৃথিবীর নিরান্নব্বই ভাগ মানুষ এখনো সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা ও আচরণে অভ্যস্ত। নিজের বৃত্তে নিজেকে প্রভু হিসেবেই দেখতে চায় তারা। প্রতিটি সরকার, পরিবার, সংস্থা, সংগঠনের প্রধান ব্যক্তিরা এক একজন রাজা অথবা জমিদারের পরিবর্তিত ভূমিকায়। পূজা যে নেয়, সে যেমন মানসিকভাবে ভয়াবহ দরিদ্র, পূজা যে দেয়, সেও তেমনি। মানুষ পূজা নিয়ে আর পূজা দিয়েই তো অভ্যস্ত এখনো।

ভীষণ লোভী এক প্রজাতি, এই মানুষ। তাদের লোভও অসীম। সব ধরনের ক্ষোভ বর্জন করতে পারে, এমন মানুষ কজন আছেন এই বাংলাদেশে, আপনাকে বাদ দিলে? সমাজতন্ত্রকে যদি আমরা সঠিক ব্যবস্থা মনে করি, তবে তা প্রতিষ্ঠার জন্য সঠিক মানুষ দরকার। মানুষের সঙ্গে মানুষের সব ধরনের সৃষ্ট বিভেদকে যারা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারবে না, যারা মানুষকে দেখবে মানুষ হিসেবে, যা সবার জন্য ভালো, তা নিজের জন্যও ভালো মনে করবে, সেরকম মানুষ গড়তে হবে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সঠিক নেতৃত্ব যতটা জরুরি, সঠিক জনগণও ততটা জরুরি।' সেরকম মানুষ তৈরি করো—বললেন শরীফ স্যার। তিনি জানতেন, দেশে তাঁর ছাত্রছাত্রী, পাঠক, অনুসারীর সংখ্যা অগণ্য। তাদের তিনি আলোকিত করেছেন মুক্তবুদ্ধির সত্যালোকে। এতখানি মহৎ প্রত্যাশা কি থাকবে না তার নেপথ্যে? চূড়ান্ত হতাশার মধ্যে, প্রত্যাশা টিকে থাকতে সাহায্য করে মানুষকে। তাঁর প্রত্যাশার গাছে জল দিতে চাইলাম। বললাম, 'যদি আমরা হয়ে উঠতে পারি আপনার মতো, আর যদি গড়ে তুলতে পারি আমাদের শিশুদের আপনার মতো মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে, তাহলে সবই সম্ভব হবে।'

'খুব চাটুকারিতা করছ' একটু হেসে বললেন কথাটা, প্রিয় অধ্যাপক আহমদ শরীফ। বললাম, 'সে সুযোগও তো দেননি কাউকে, কখনই।'

শরীফ স্যার গলা অথবা গায়ের জোরে কথা বলেননি। বলেছেন সত্যানুসন্ধানী জ্ঞান, যুক্তি, বুদ্ধি, মেধা ও মননশীলতার জোরে। লিখেছেনও সেভাবেই। কথার সঙ্গে কাজের সমন্বয় করেছেন আজীবন। বিদ্রোহী ছিলেন—শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অমানবিকতা, অন্যায় প্রথা, বিশ্বাস, যুক্তি ও বুদ্ধিহীনতা, কুসংস্কার, মৌলবাদ, স্বৈরাচার, সাম্প্রদায়িকতা, অনাধুনিকতার বিরুদ্ধে। চিন্তাচেতনায় পরিপূর্ণ মুক্তবুদ্ধি তাঁর পাণ্ডিত্যকে উজ্জ্বল করেছে অনেক। যথার্থ করেছে তাঁকে। যুক্তিবুদ্ধির মুক্তি ছাড়া, যে ব্যক্তি জ্ঞানী অথবা পণ্ডিত বলে পরিচিত হতে চায়, তার পাণ্ডিত্য অন্ধের হাতি দেখার মতোই।

ধর্মের তথাকথিত সত্যকে অস্বীকার অবিশ্বাস করে, কর্মের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন আহমদ শরীফ। যে চরিত্র ও সঠিক কর্মের সাধনা তিনি করেছেন সবসময়, তা কি কথিত কোনো স্বর্গ লাভের জন্য? স্বর্গ-নরকে তো কখনই বিশ্বাস করেননি মর্তজীবনবাদী শরীফ স্যার। যিনি ধর্ম, প্রথা, মানুষে-মানুষে বৈষম্য, অন্যায়, অসুন্দরকে মানতে পারেন না, নিজেকে মেনে চলবার দায় থাকে তার সম্পূর্ণ। যিনি পারিবারিক, সামাজিক, ঐতিহ্যিক অনুশাসন মানতে পারেন না, নিজের ওপর নিজের অনুশাসন হয় তার প্রবল। স্বায়ত্তশাসিত সে মানুষ নিজেই হয়ে ওঠেন নিজের পরিচালক। জীবনযাপনে, মরণ-বরণে নিজের সিদ্ধান্ত, ইচ্ছা এবং নীতিকে সেভাবেই কার্যকরী করেছেন আহমদ শরীফ। অবিচল ব্যক্তিত্ব এবং প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধের কারণে প্রচলিত অনেক কিছুর সঙ্গেই খাপ খাওয়াতে পারেননি নিজেকে। সে চেষ্টাও করেননি। নিঃসঙ্গ হয়েছেন। সবচেয়ে বড় পুরস্কার পেয়েছেন এই নিঃসঙ্গতার জন্যই। একক এবং অনন্য হবার মতো পুরস্কার। কোথাও যে মাথানত করেননি কখনো, তাই তো এনেছে তাঁর জন্য অপরাজিতের গৌরব। অধিকাংশ ভণ্ড, প্রতারক, আত্মপ্রতারকের বাংলাদেশে, নিজেকে নিজে সম্মান করার মতোই চরিত্র ছিল তাঁর। তা অর্জন করতে পেরেছিলেন,

নিজেকে নিজে ফাঁকি দেননি বলে। ভণ্ডামি এবং ভণ্ডদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ দুরে ছিলেন বলে।

এখানে আমার সংগ্রহে তার যেসব বই আছে প্রায়ই পড়ি, পড়া হয়ে যাবার পরও। স্পর্শ করতে পারছি না তাঁর পাণ্ডিত্যের একটি বিন্দুকেও। দেশের বেশির ভাগ মানুষের যদি থাকত এতখানি মেধা ও যোগ্যতা, দেশটা এগিয়ে যেত অনেক অনেক দূর। সবদিক থেকে।

জনপ্রিয়তা, খ্যাতি, অমরতা, উচ্চপদ, পুরস্কার, শাসকের অত্যাচার, ভয়–কিছুরই তোয়াক্কা করেননি অধ্যাপক আহমদ শরীফ। সব সময়ই দাঁড়িয়ে ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অনড় অবিচল। এক মুহূর্তের জন্যও ছাড়েননি নিজের কথা নির্ভয়ে বলবার অধিকার। জীবন হারানোর আশঙ্কা ছিল, তবুও। কোন বৃত্তের সীমায় আবদ্ধ থাকেননি, তাই হতে পেরেছেন এত অসীম। মনে-প্রাণে, জ্ঞানে, কর্মে, আচরণে, চেতনায় এতটা সৎ ও যুক্তিবাদী মানুষ খুব কমই জন্মেছে আমাদের দেশে। আজকের বাংলাদেশের অনেক অনেক অন্ধকারের ভেতর যে বাতিটি তীর্যক হয়ে জ্বলছে, তার নাম আহমদ শরীফ। যে আহমদ শরীফ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আবদ্ধ থাকেননি। হয়েছেন জাতির শিক্ষক।

সবই তো রেখে গেছেন এই জাতির জন্য, যা কিছু তাঁর সম্পদ ছিল। এতটা ভোগ করতে পারি, সে সাধ্য-সামর্থ্য আমাদের কোথায়?

তাঁর কোনো সমাধি নেই, স্মৃতিসৌধ নেই। এসব তাঁর জন্য জরুরিও নয়। তিনি আমাদের সঠিক পথে চলতে শিখিয়েছেন। শেখাচ্ছেন এখনো। শেখাবেন, যতদিন না আমরা তাঁর নীতি ও চরিত্রকে প্রজন্মক্রমে আমাদের মধ্যে ধারণ করি। তিনি আছেন আমাদের সঙ্গে, ছিলেন, থাকবেন। জরুরি প্রয়োজন তাঁকে আমাদের, অত্যন্ত জরুরি! আজ, আগামীকাল এবং অনাগতকালে।

কীর্তিমান মনীষী আহমদ শরীফ

বেলাল মোহাম্মদ

কী সুন্দর হেঁটে চলে গেলেন আমাদের সবচেয়ে সাহসী মানুষটি। হ্যাঁ, রাত দুপুরে কয়েকবার লুজমোশন–এরপর স্ট্রোক–তারপরও দোতলা থেকে সিঁড়ি ভেঙে গিয়েই ক্লিনিকমুখে গাড়িতে উঠে বসেছিলেন ৭৮ বছরের বিশালদেহী আহমদ শরীফ। সেই ছিলো তাঁর অসুস্থ যাত্রা। তখন রাত ১টা ৪০ মিনিট।

স্বভাবতই ২৪ ফেব্রুয়ারির দৈনিক পত্রিকায় ড. আহমদ শরীফের মৃত্যু খবর প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। তবে বিবিসি এবং বাংলাদেশ বেতার খবরটি প্রচার করেছে প্রভাতী অধিবেশন সংবাদ বুলেটিনে। এছাড়া ঢাকা শহরে অনুরাগিদের মধ্যে টেলিফোনে জানাজানি হয়েছে এই দুঃসংবাদ। শেষ রাতে 'সন্ধানীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হয় কর্নিয়া। তারপর প্রয়াতের অন্তিম ইচ্ছার 'অসিয়ত-নামা'র আলোকে, অবধারিত কীটের আহার না হয়ে শল্য চিকিৎসা শিক্ষার্থিদের ব্যবহারের জন্যে শবদেহ হস্তান্তরের উদ্যোগ। এই অপেক্ষমাণ কালের মধ্যে লাশকে উত্তর শিথানে শয়ানের সংস্কার গৌণ। কেনো না ড. আহমদ শরীফ মানুষের সমাজে শোষক ও শোষিতের ভেদাভেদের একজন ভালো যোদ্ধা হলেও উত্তর-পশ্চিম-পূর্ব-দক্ষিণের দিক দর্শন আদৌ বুঝতেন না।

আহমদ শরীফ ছিলেন আধুনিক পোশাক পরিহিত মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য-বিশেষজ্ঞ। তাঁর এই বৈশিষ্ট্যটি সমপেশাদার ইর্ষাতুরদের দৃষ্টিতে দারুণ আকর্ষণ করতো।

১৯৮৩ সালের বিজয় দিবসে বাংলা একাডেমীর বটতলা-মঞ্চে একজন স্মৃতিচারণকারী অংশগ্রহণকারী হিসেবে আমার বসবার সুযোগ হয়েছিলো অনুষ্ঠানের সভাপতি কিংবা প্রধান অতিথি ড. আহমদ শরীফের পাশে। আমি তখন বাংলাদেশ বেতারের বহির্বিশ্ব কার্যক্রমের উপ-পরিচালক। বক্তব্য প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক সত্যতার তাগিদে আমি ওই সময়ে সরকারি পর্যায়ে 'ভাসুরের নাম' জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও 'জয় বাংলা' শব্দ বার বার উচ্চারণ করেছিলাম। অনুষ্ঠান শেষে

একাডেমীর মহাপরিচালক মনজুর-এ-মওলা তাঁর কক্ষে বসে চা খাওয়া ও নগদ দু'শ টাকা সম্মানীর খাম ধরিয়ে দেবার অবকাশে বলেছিলেন, বেলালের বক্তব্য আমার ভালো লেগেছে, কিন্তু তাকে এই মঞ্চে আর না ডাকার জন্যে নিষেধাজ্ঞা জারি না করে আমার উপায় নেই।

ড. আহমদ শরীফ বলে উঠেছিলেন, ওর জন্যে সেটাই লাভজনক হবে। চিরদিন তো সমান যায় না। ইত্যাদি।

সেই ১৯৮৩ সালের পর, বাংলা একাডেমীর কোনো অনুষ্ঠানে না যাওয়া হলেও ১৯৯৪ সালে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর কোলকাতায় ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বসে কিছু পড়াশোনা করার লক্ষ্যে সমকালীন মহাপরিচালক মনসুর মুসার কাছ থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে একটি প্রত্যয়নপত্র নিয়েছিলাম। সেটি দেখিয়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরির পা-গ্যালারির জন্যে নিয়মানুগ পরিচয়পত্র (কার্ড) অবাধে পেয়ে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, অধ্যাপক মনসুর মুসার কাছ থেকেই ফোনে শেষ রাতে আমরা জেনেছিলাম ড. আহমদ শরীফের মৃত্যুখবর। সকালে রূপা, চক্রেশ ও আমি গিয়েছিলাম ধানমণ্ডি ১ নম্বর রোডের বাড়িতে চিরনিদ্রিত পিতৃমুখ দেখতে। গত পঁচিশে বৈশ খ (১৪০৫) কোলকাতা থেকে প্রকাশিত আমার কাব্যগ্রন্থ 'এখন বৃষ্টিতে এসিড' মান্যবর আহমদ শরীফের নামে উৎসর্গীকৃত। উৎসর্গ পাতায় সমীপেষু শুভেচ্ছা—শব্দটি মুদ্রিত, আমি তাঁর বাড়িতে প্রথমবারের মতো বইটি নিয়ে গিয়ে তাঁকে সারপ্রাইজ দিয়েছিলাম। তিনি বিনয় প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর মতো 'অ-কবির' নামে কেনো কবিতার বই উৎসর্গ করা হলো! উত্তরে কিছু বলিনি। শুধু বইটিতে সংকলিত 'স্বগত পংক্তিমালা' শীর্ষক কবিতা গুচ্ছ তাঁর সামনে পাঠ করে মনে পড়ে কি-না, জানতে চেয়েছিলাম। একটু ভেবে বলেছিলেন, হ্যাঁ, কবিতাগুলো যেনো আগে কখনো পড়েছি বা শুনেছি। সত্যি তাই। ১৯৬৯-৭০ সালে 'স্বগত কবিতা গুচ্ছ' শিরোনামে চট্টগ্রামের অধুনালুপ্ত মাসিক *মেঘনা* পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর তিনি পড়ে সম্পাদকের (রফিক ভুইয়া) কাছে ইতিবাচক মন্তব্য করেছিলেন। সম্পাদক আমাকে জানিয়েছিলেন।

আমাদের একজন বন্ধু কথায় কথায় বলেছিলেন, ড. আহমদ শরীফ নাকি কবিতার ব্যাপারে কোথাও বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জীবনানন্দের পর এখন শুরু হয়েছে সুকান্তের যুগ। অথচ বন্ধুটির বিবেচনায় সুকান্ত আদৌ কোনো যুগ স্রষ্টা কবি নন। কবিতা গ্রন্থ উপহার দেবার কয়েকদিন পরই ড. আহমদ শরীফের জীবদ্দশায় দ্বিতীয় ও শেষবার তাঁর বাসায় গিয়ে তাঁকে সুকান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। বলেছিলেন, সুকান্ত যুগ জিজ্ঞাসার সঠিক জবাব দিয়েছেন, মেহনতি মানুষের কথাকে কবিতার আঙ্গিকে প্রকাশ করেছেন। দেশকাল ও যুগ সচেতনতাই বড়ো মাপের প্রতিভার লক্ষণ। 'আর্ট' তো জীবনের জন্যেই। কিন্তু সুকান্ত খুবই স্বল্পজীবী। ইত্যাদি।

ড. আহমদ শরীফ একবার বিজ্ঞান চেতনা পরিষদের সাপ্তাহিক আলোচনা সভায় এসেছিলেন। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সেদিন তাঁর উক্তিটি ছিলো

অপূর্ব। বলেছিলেন, আমি মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব বলি না। কারণ অন্য প্রাণীরা যতো বেশি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে—যেমন সার্কাসের পশুরা, মানুষকে উঠতে-বসতে ঘরে-মক্তবে যতোই উপদেশ-নির্দেশ দেয়া হোক, তারা তা গ্রহণ করে না। শিক্ষিত মানুষরাই হয় প্রতারক। হ্যাঁ, মানুষের একটাই প্রাধান্য—তার বুড়ো আঙুলটা। এই আঙুলের শক্তিতে সে দড়িতে গিট দিতে পারে, বড়ো বড়ো পশুকে বেঁধে ফেলতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রশিক্ষণে বা আদর্শের অনুশীলনে নয়, বিবেক বিবেচনায়ও নয়, শুধু বুড়ো আঙুলের প্রধান্যটি মানুষের প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব। আমি শতায়ু কামনা করেছিলাম। তা পূর্ণ হলো না। তবু দেখলাম, একজন সাহসী ও শ্রেষ্ঠ মানুষ, একজন বিশাল বাঙালি প্রচলিত নিয়মনীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে কী সুন্দর হেঁটে চলে গেলেন।

২৪.০২.৯৯

শরীফ স্যার যা বলে গেলেন

বীণা শিকদার

এদেশে মুক্তচিন্তার বর্তমান প্রজন্মের পথিকৃৎ ড. আহমদ শরীফ আজ আর আমাদের মাঝে নেই। সমাজের কূপমণ্ডূকতা, অন্ধতা, গোঁড়ামি, শোষণ-বঞ্চনা-দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করছেন তারা একজন অভিভাবককে হারিয়েছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে কোনো বিদ্রোহকে তিনি সমর্থন দিতে দ্বিধাহীন ছিলেন। সমাজ প্রগতি তথা সমাজতন্ত্রের লড়াইয়ে শরীফ স্যারের ভূমিকার যে শূন্যতা তৈরি হল, তা পূরণ হতে কতদিন লাগবে তা ভবিষ্যতই বলতে পারে। অর্থবিত্ত আর ক্ষমতার দাপটের কাছে সততা-নিষ্ঠা আর বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা যখন পদানত, ক্ষয়িষ্ণু সমাজে নৈতিকতার সকল বন্ধন যখন খসে পড়ছে। লক্ষ্যহীন প্রজন্মের ভার বহনে যখন প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে এমনি অবস্থায় ড. আহমদ শরীফ ছিলেন অন্ধকারে আলোর দিশারী, আত্মশক্তিতে বলীয়ান এক প্রগতির পাঞ্জেরী। বর্তমান সময়ের বুদ্ধি বিবেক বেচা কেনার হাটে ড. আহমদ শরীফ ছিলেন এক প্রতিবাদী মানুষ। তিনি যা বিশ্বাস করতেন মুখে তাই বলতেন আর তার কাজও ছিল কথার সাথে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ। এসব বিষয়ে তিনি আপোষ করেননি। তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন। সমাজতন্ত্রের পক্ষে তার অবস্থান ছিল দৃঢ় এবং স্পষ্ট। ধর্মকে তিনি যুক্তিবিরুদ্ধ, প্রকৃত জ্ঞান ও প্রগতির অন্তরায় এবং শোষক শ্রেণীর হাতিয়ার বলে বিবেচনা করতেন এবং স্পষ্টতই তা বলতেন। সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি ও মার্কসীয় সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে আজ যে দৈন্য, সুবিধাবাদিতা, আপোসকামিতা বাসা বেঁধেছে সেখানে শরীফ স্যারের দ্ব্যর্থহীন উচ্চারণ ছিল 'সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ বা কম্যুনিজমের কথা বললেই চারদিকের মানুষ চটে ওঠে, অথচ এ যুগে বন্টনে বাঁচা ছাড়া কোন উপায় নেই। বন্টনে বাঁচতে হলে রীতিনীতি আইন কানুন শাস্ত্র সম্পর্কে নতুন ধারণা করতে হবে, পুরনো দিয়ে হবে না। সেজন্য দরকার সমাজতন্ত্র। মানুষের সর্বশেষ আবিষ্ক্রিয়া হচ্ছে সমাজতন্ত্র, সর্বশেষ বলেই বোধহয় সর্বশ্রেষ্ঠ, পৃথিবীর গরীব দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রই সর্বোৎকৃষ্ট। সেজন্যই আমি সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতি।' [তথ্যসূত্র ডক্টর আহমদ শরীফের একটি সাক্ষাতকার—ভোরের কাগজ ২৫/০২/৯৯।

আজ যারা সমাজতন্ত্র কিংবা মার্কসবাদকে অস্বীকার করেন, যারা একে অচল বলে বাতিল করেন তারা কিন্তু সমাজতন্ত্রের বিকল্প কোন ব্যবস্থার কথা বলতে পারেন না।

পঁচা গলা বুর্জোয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের চেয়ে উন্নততর ব্যবস্থা হিসেবে সমাজতন্ত্র তার যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকাসহ দেশে দেশে নাগরিকদের 'সামাজিক নিরাপত্তার' নামে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যে সুবিধা দেয়া হচ্ছে সে তো সমাজতন্ত্রের ভয়েই। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের আপাতবিপর্যয় সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে পৃথিবীর দেশে দেশে অগণন গরীব মেহনতি মানুষের মুক্তির মতবাদ হিসেবে অন্য কোন মতবাদ আমাদের সামনে নেই যা সমাজতন্ত্রের চেয়ে উন্নততর। সমাজতন্ত্রের পক্ষে শরীফ স্যারের মত জ্ঞান তাপস যুক্তিবাদী মানুষের দৃঢ় অবস্থান আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের সংগ্রামকে এগিয়ে দেবে। দৈহিকভাবে তিনি আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তার কর্ম তার গবেষণালব্ধ জ্ঞান আমাদের জন্য রেখে গেছেন। রেখে গেছেন তার কালোত্তীর্ণ সাহিত্য। তার প্রতিটি বাক্য হতে পারে এক একটি অভিসন্দর্ভের বিষয়।

ভোটের রাজনীতিতে পর্যুদস্ত একদল সমাজতন্ত্রী এবং ভোট ও ভাতের অধিকার ও ধর্ম নিরপেক্ষতার দাবীদার (একদার) আর গণতন্ত্রের ধ্বজ্জাধারীরা যখন রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার করছে, রাষ্ট্র ধর্ম ঘোষণা করে খোদ রাষ্ট্রকেই যেখানে সাম্প্রদায়িক রূপ দেয়া হচ্ছে সেখানে শরীফ স্যারের মত বিবেকবান মানুষ নিশ্চুপ থাকতে পারেনি। তাইতো প্রতিবাদ ওঠে ড. আহমদ শরীফের প্রতিবাদী কণ্ঠের তখনি অন্ধকারের জীবেরা হিংস্র থাবা মেলে আক্রমণ করতে ছুটে আসে। তাকে মুরতাদ ঘোষণা করে তার ফাঁসী দাবী করে। কিন্তু তার কলম থেমে থাকেনি। তার মতে "বাধাই বাধা ছিন্ন করার প্রেরণা যোগায়।"

তিনি আগা গোড়াই ছিলেন সেক্যুলার চিন্তায় বিশ্বাসী। তিনি সর্বদাই বলতেন কি সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি, কি মার্কসবাদী সাহিত্য চর্চা, কি মুক্তবুদ্ধির বিকাশ এসবের পথে রয়েছে অন্ধ বিশ্বাস ও সংস্কারের বিরাট বাধা। তার ভাষায়, "সমাজতন্ত্র বললেই মানুষ ক্ষেপে যায়, তার কারণ হলো শাস্ত্র। মানুষ বিশ্বাস সংস্কার অনুসারে চলে। তাদের ভূতে ও ভগবানে বিশ্বাসের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ওই বিশ্বাসই তাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে, তারা নিয়তিবাদী হয় অদৃষ্টবাদী হয়। নতুন ব্যবস্থার জন্যে তাই আঘাত করা দরকার বিশ্বাসের দূর্গে।" [তথ্যসূত্র : ঐ]

একজন সমাজ সচেতন লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষাগুরু হিসেবে তিনি এই কাজটিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রচলিত শাস্ত্র সমাজকে ভাঙ্গার লক্ষ্যে তার প্রতিটি শব্দ অন্ধ বিশ্বাসের দুর্গে এক একটি শাবলের আঘাত। তার নিজের কথায় "বিশ্বাসের অঙ্গীকারে ধর্মবোধের উদ্ভব ও স্থিতি। তাই ধর্মভাব অশিক্ষিত মানুষের ভূষণ এবং ধর্মাদর্শ তাদের জীবনের দিশারী। ধর্মীয় নীতি ও রীতি তাদের জীবন যাত্রার পথ ও পাথেয়। লেখাপড়া জানা ধর্মভীরু মানুষেরও মনোভূমি অনাবাদে অপচিত। আর এক শ্রেণীর শিক্ষিত অথচ চরিত্রহীন বুদ্ধিমান দুরাত্মা সব জেনে-বুঝেও স্বস্বার্থে এই বিশ্বাস-সংস্কারকে ও স্মৃতিকে প্রশ্রয় দিয়ে, পুঁজি করে মানুষকে শাসন শোষণের আনন্দ, আরাম, গৌরব ও সম্মান লাভ করে।" [তথ্য সূত্র ঃ বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী ও প্রগতি প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব। ড. প্রথমা রায় মণ্ডল]

একথা অনেকাংশেই সত্য যে এদেশে পদকে পদকে গলা ভরেছে মুর্খ আর দালালদের, রাষ্ট্রীয় খেতাব পেয়েছে চাটুকার শ্রেষ্ঠরাই। কিন্তু আহমদ শরীফ ওসবের

তোয়াক্কা করেননি কোন দিন, আর করেননি বলেই সত্যকে মিথ্যা বানিয়ে মিথ্যাকে সত্য সাজিয়ে, ঘটনার আড়াল করে, তথ্য গোপন করে ক্ষমতাসীনদের পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্য পাবার চেষ্টা করেননি। এই জ্ঞান তাপস প্রমাণ করে গেছেন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, খেতাব, সোনার পদক এসব একজন সত্যিকারের লেখক বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষকের কাছে কত তুচ্ছ।

আজকের এই যুগসন্ধিক্ষণে সবচেয়ে এবং সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে নতুন মানুষ তৈরি করা। আজকে যে জেনারেশন তৈরি হচ্ছে তাদের সামনে কোন আদর্শ নেই, জীবনের কোন লক্ষ্য নেই। সমাজ প্রগতির জন্য এ আমাদের কাম্য নয়। কিন্তু মানুষ তৈরি করার সে কারিগর কোথায়? কোথায় সেই শিক্ষাগুরু, যে আলো দিয়ে আলো জ্বেলে যাবে। মস্তিষ্ক বিক্রি করার জন্য যারা মাথা হেট করেই রাখে তারা তো মানুষ তৈরির কারিগর হতে পারে না। এই মিথ্যার বেসাতি শরীফ স্যারকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করেছিলো তিনি স্পষ্ট করেই বলতেন, "দেশের বুদ্ধিজীবী বলে খ্যাত যারা তারা দুটি বৃহৎ দলে বিভক্ত এবং বিক্রি হয়ে গেছে।" এ অবস্থায় তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের একটি প্লাটফর্ম গড়ে তোলার কাজে নেমেছিলেন। সংগঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগে তিনি এদেশের বামপন্থী রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আলোচনায় বসলেন। নেতৃবৃন্দের মধ্য উপস্থিত ছিলেন কমরেড রাশেদ খান মেনন, নির্মল সেন, হায়দার আকবর খান রনো, বদরুদ্দীন উমর, আ ফ ম মাহবুবুল হক, দিলীপ বড়ুয়া, খালেকুজ্জামান, আবু সাইদ খান প্রমুখ। দীর্ঘক্ষণ নেতৃবৃন্দের সাথে স্যার মতবিনিময় করলেন, আমাদের মত গরীব দেশে সমাজতন্ত্রের কোন বিকল্প নেই। একথাই দৃঢ়তার সাথে বললেন আর নেতৃবৃন্দের প্রতি তিনি তার শেষ আহ্বান জানালেন, "আপনারা রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ দেশের মানুষের ভরসার স্থান। বিশেষ করে ভাসানীর মৃত্যুর পর গণমানুষের পক্ষে কথা বলার কোন নেতা নেই। দেশের বুদ্ধিজীবী বলে খ্যাত যারা তারা দুটি বৃহৎ দলের বিভক্ত ও বিক্রি হয়ে গেছে। একটা স্থবিরতা বিরাজ করছে। এর শেষ কোথায় জানি না। দুই বড় দল শুধু ক্ষমতা রক্ষা এবং ক্ষমতায় যাওয়া নিয়ে ব্যস্ত, তারা গণমানুষের কথা ভাবে না।

আপনারা বামপন্থীরা বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন বলে দুর্বল। এবং এর কারণে মানুষের কাছে আপনারা আবেদন সৃষ্টি করতে পারছেন না। আপনারা যাদের পক্ষ হয়ে লড়ছেন তারা দুর্বল এবং নির্বোধ। আপনাদের সমর্থক আমরা কিন্তু আমাদের কোন সাধ্য নেই। আমরা আমাদের লেখা এবং চিন্তা দিয়ে আপনাদের সাহায্য করতে চাই। আপনারা যদি একমত হন তাহলে আমরা একটা সংঘ করতে চাই এবং আমাদের চিন্তাকে প্রকাশ এবং জনমত গঠনের জন্য একটি পত্রিকা বের করতে চাই। দেশের সর্বত্র এর শাখা-প্রশাখা করা হবে। যা ভবিষ্যতে প্রগতিশীল চিন্তার বিকাশ সাধন করবে।"

প্রসঙ্গক্রমে, মৌলবাদ সম্পর্কে তিনি বললেন, "মৌলবাদকে এত ভয় পাবার কিছু নেই। এরা কখনই আমাদের দেশের জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারেনি। আমাদের দেশের সামাজিক রাজনৈতিক বাস্তবতায় এরা কখনই গুরুত্ব পাবে না।

আজকে যারা মৌলবাদের ধ্বজাধারী তাদের সন্তানরা পাশ্চত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। এমনকি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে এরা ডিসকো সংস্কৃতি দ্বারা আক্রান্ত।

তবে বুর্জোয়াজি যাচ্ছে না। কারণ এর মধ্যে একটা লিপ্সার বিষয় আছে। প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী 'শিক্ষা ব্যবস্থা' নিয়ে কথা তুললে তিনি বললেন, লেখা পড়া হচ্ছে কিন্তু আমাদের দেশের লোক বিদ্যান হচ্ছে না। মানুষ হচ্ছে না। তিনি শিশুদের উপর একই সঙ্গে তিনটি ভাষা চাপিয়ে দেয়ার কঠোর নিন্দা করেন এবং নতুন করে প্রাথমিক পর্যায়ে আরবি ভাষা চালু করারও কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁর দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন ছিল সমাজতন্ত্র এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে তিনি তার সতীর্থদের নিয়ে আর একবার দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন "আমি সংঘে বিশ্বাস করি। সংঘই হচ্ছে শক্তি এবং সংঘবদ্ধ হয়ে আজকের এই অচলায়তন ভাঙ্গতে হবে।"

সাহস ও স্পষ্টতার প্রয়াণ

রাজু আলাউদ্দিন

বাঙালিদের গড় আয়ুর কথা মনে থাকলে ৭৮ বছর নিশ্চয়ই কম কিছু নয়। কিন্তু যে মানুষ কর্মচঞ্চল, চিন্তা চেতনায় সর্বদাই সজীব, মতপ্রকাশে নির্ভীক তাঁর জন্যে তো এটা সামান্য বয়স। চারদিকে প্রশ্নহীন মানুষের সংখ্যাধিক্যের মাঝে ড. আহমদ শরীফের মতো সাহসী ও চিন্তাশীল মানুষদের বেঁচে থাকা উচিত শতাধিক বর্ষ।

সাহস আর পাণ্ডিত্য ছিলো তাঁর আলোকিত রচনার উৎস। তাঁর রচনার বেশির ভাগই মধ্যযুগের সাহিত্যকে কেন্দ্র করে রচিত। কিন্তু মধ্যযুগের সাহিত্য সম্পাদনা বা এর ভাষ্য রচনার সময় তিনি সচেতন আধুনিক মনকে ব্যবহার করেছেন সর্বদাই। মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রতি তাঁর মনোভাবের কথা হুমায়ুন আজাদের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন : 'মধ্যযুগের কবিরা উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি করেননি, তবে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।' তাঁর মন্তব্য থেকেই তাঁর মনের চেহারাটা আমরা বুঝে উঠতে পারি। মধ্যযুগ দিয়ে তাঁর সীমাহীন লিপ্ততা সত্ত্বেও আশ্চর্য রকমের পক্ষপাতহীনতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। যদিও আমি তাঁর মূল্যায়নের পদ্ধতির সাথে পুরোপুরি একমত হতে পারবো না। একমত হওয়া সম্ভব নয় তাঁর আরও অনেক মন্তব্য বা মতামতের সাথে। যেমন বঙ্গভঙ্গ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস। তিনি কালের দর্পণে স্বদেশ গ্রন্থে বলেছেন, ২৫ মার্চ বা ১৬ ডিসেম্বর নাজাত দিবস হতে পারে, কোনো সংজ্ঞাতেই আজাদী হিসেবে স্মরণ্য নয়।' এই বক্তব্য কিছুটা বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে। আমি ভেবেছিলাম এই বিষয়ে তাঁর মতামত এবং বিশ্লেষণ জানতে চাইবো সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে। কিন্তু আহমদ শরীফ আমাকে সেই সুযোগ না দিয়েই চলে গেলেন। এটা সত্য যে, প্রথানুগ চিন্তায় তিনি বিশ্বাস করতেন না। যে কোনো বিষয়কে তিনি ক্রিটিক্যালি দেখতেন বলে অনেকের সঙ্গেই তার মতের মিল হতো না। কিন্তু নিছক বিতর্ক কুড়াবার জন্য যে তিনি প্রথাবিরোধী চিন্তা করতেন তা আমার কখনো মনে হয়নি। রাষ্ট্র কাঠামো, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা ধর্ম প্রসঙ্গেও তিনি যখন কথা বলেছেন, তখন তা প্রথাবাদী মানুষকে রীতিমতো উত্তেজিত করে তুলেছে, বিপুল বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। তবে বিতর্ক সৃষ্টিকারী বেশির ভাগ মন্তব্যই ছিলো ধর্মসংক্রান্ত।

এদেশের কায়েমী স্বার্থবাদী গোঁড়া ধর্মান্ধরা তাঁর মন্তব্যকে সহজে মেনে নিতে পারেনি। তাঁরা আহমদ শরীফকে 'মুরতাদ' ঘোষণা করেছে। আহমদ শরীফ নিজের বিশ্বাস ও ভাবনা প্রকাশে ছিলেন বরাবরই নির্ভীক। তোয়াক্কা করেননি কখনো এর ফলাফল নিয়ে। তাঁকে 'মুরতাদ' ঘোষণার পরও আমি তাকে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। আমি নিজেই শংকিত বোধ করেছিলাম তাঁর নির্ভীক চলাচলে। দুষ্কৃতকারীরা যেখানে শামসুর রাহমানের বাড়িতে গিয়ে হামলা করতে পারে সেখানে আহমদ শরীফকে প্রকাশ্য রাস্তায় পেয়ে যাওয়াতো বিরাট সুযোগ। তবে সৌভাগ্য এই যে, জীবদ্দশায় তাঁকে সে রকম কোনো আক্রমণের শিক্ষার হতে হয়নি। সবাই জানেন আহমদ শরীফ ছিলেন পুথি সাহিত্যের বিখ্যাত বিশারদ ও সংগ্রাহক আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের ভাতিজা। উত্তরাধিকার সূত্রে পুথির বিপুল ভাণ্ডার তাঁর হাতে এসে পৌঁছলেও আহমদ শরীফ বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আবদুল করিম সাহেবের মানসিক গড়নটিকে অগ্রসর করে নিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আধুনিক মনের মানুষ। রাজনৈতিক বিশ্বাসে তিনি ছিলেন বাম-ঘেঁষা।

দার্শনিক বিশ্বাসের জগতটি ছিলো নাস্তিক্য ধারার। কিন্তু তাঁর এই বিশ্বাসকে তিনি বক্তব্যে বা রচনায় কখনো গোঁয়ারের মতো চাপিয়ে দিতে চাননি শ্রোতা বা পাঠকদের উপর।

ভাবতে ভালো লাগে যে, আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের সততা ও আদর্শ নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে যে সংশয় ও সন্দেহ রয়েছে আহমদ শরীফ সম্পর্কে কখনো তা দেখা দেয়নি। তাঁর বক্তব্য বা বিবৃতি নিয়ে বিতর্ক হলেও তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সততা নিয়ে কোনো সন্দেহ দেখা দেয়নি।

সরকারের নানা প্রলোভন থেকে নিজেকে তিনি সতর্কতার সাথে রক্ষা করেছেন। কখনোই কোনো রহস্যঘেরা বক্তব্য দিয়ে সুবিধার পথে পা বাড়াননি। কোনো দলীয় রাজনীতির পক্ষাবলম্বন করতে গিয়ে নিজের চারিত্রিক দৃঢ়তাকেও বিসর্জন দেননি।

আহমদ শরীফ চলে গেলেন- এই সত্য মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু আমাদের জন্য তিনি রেখে গেলেন অসীম সাহস। যে সাহস তাঁকে পথ দেখিয়েছে সারাজীবন। এই সাহস ও চারিত্রিক স্পষ্টতা তাঁকে অমর করে রাখবে আমাদের মাঝে। আমরা যারা বিবেকবান তাদের জন্য এই সাহস উত্তরাধিকার হয়ে উঠুক।

ডক্টর আহমদ শরীফ সম্পর্কে

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

জাতি গঠনের ইতিহাস পরিলক্ষ্য করলে দেখা যায় একটি জাতির বিশেষ কিছু বাঁক পরিবর্তনের কালে সেই জাতির অভ্যন্তরে জন্ম লাভ করে কিছু অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্ব তখন কথা বলেন সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে। তিনি জাতীয় জীবনকে পরিপুষ্ট করেন, সংহত করেন, নির্মাণ করেন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। ডক্টর আহমদ শরীফ ছিলেন এমনি একজন ব্যক্তি যিনি আমাদের জাতি গঠনের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অনন্যসাধারণ।

ডক্টর শরীফের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, তিনি আর দশ জন মানুষের মতো প্রথাগত ছিলেন না। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী একজন মানুষ। নিজের মতামতের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল অগাধ। তিনি যা ভাল বলে মনে করতেন নিঃসঙ্কোচে তা প্রচার করতেন। এক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব খুব কমই ছিল বলে মনে হয়। প্রচলিত ও সনাতন বিশ্বাসসমূহকে তিনি বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ করেননি। বিশ্বাসকে নিরন্তর প্রশ্ন করেছেন, তাঁর মতের সঙ্গে না মিললে অস্বীকার করেছেন, কখনও কখনও তা প্রতিরোধ করেছেন। এই প্রতিরোধ করতে গিয়েই প্রচলিত বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর হয়েছে সংঘাত। তাঁকে প্রচলিত বিশ্বাসে বিশ্বাসী মানুষেরা শত্রু বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু প্রবল প্রতিকূল অবস্থা ডক্টর আহমদ শরীফকে থামিয়ে দিতে পারেনি। তিনি নিষ্ঠ থেকেছেন তাঁর বিশ্বাসের প্রতি।

অতএব এককথায় বলতে গেলে ডক্টর আহমদ শরীফের ব্যক্তিত্ব ছিল প্রশ্নপ্রবণ। জিজ্ঞাসা, সংশয় ও সংকল্প এই প্রত্যয়গুলো ছিল ডক্টর শরীফের ব্যক্তিত্বের প্রণোদনা। একজন গবেষক হিসেবেও একজন দার্শনিক হিসেবেও ডক্টর শরীফের চিন্তাধারা ছিল। তিনি নিজের অভিমতের অনুকূলে প্রণয়ন করেছেন অভিসন্দর্ভ। নিজের বিশ্বাসের আলোকে নির্ধারণ করেছেন গবেষণার ক্ষেত্র। আপনারা জানেন, আহমদ শরীফ মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালির কর্মধারা সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। আমার মনে হয় বাঙালির উৎস সন্ধান করতে গিয়েই তিনি মধ্যযুগকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন। বাঙালির শিকড় সন্ধানের অনিবার্য প্রয়োজনে ডক্টর শরীফ মধ্যযুগের সৃষ্টিশীল মানুষের চিন্তাধারাকে তাঁদের রচনার মধ্যে খুঁজে পেতে চেয়েছেন। বলা বাহুল্য, ডক্টর আহমদ

শরীফ বাঙালির স্বরূপ আবিষ্কারের প্রশ্নে যথেষ্ট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। হয়তো তাঁর গবেষণা পদ্ধতির সঙ্গে সমকালীন গবেষণা পদ্ধতির অনেক জায়গায় অমিল লক্ষ্য করা যাবে, তথাপি আমরা ডক্টর আহমদ শরীফের মেধা ও পরিশ্রমের মূল্য দিতে কার্পণ্য করবো না, কারণ ডক্টর আহমদ শরীফ ছিলেন গবেষণা ও চিন্তাভাবনায় বাঙালির পথিকৃৎ।

ডক্টর আহমদ শরীফের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

২১.৪.৯৯ তারিখ বাংলা একাডেমী আয়োজিত স্মরণ সভায় প্রদত্ত ভাষণ।

আহমদ শরীফ : কালাপাহাড় ও নীলকণ্ঠ

আবুল মোমেন

ড. আহমদ শরীফ ছিলেন এ সমাজে একেবারে ব্যতিক্রমী অনন্য একজন মানুষ। মানুষ সমাজবদ্ধ প্রাণী; তার মধ্যে বাঙালি এমনিতে ঘরকুনো; তার ওপর দল বেঁধেই চলতে অভ্যস্ত। সেখানে আহমদ শরীফ রীতিমতো কালাপাহাড়, নিজের অবস্থানে অটল। তিনি যে-সমাজে জন্মেছিলেন সেটি ছিল অনালোকিত, অচল, বরং নানা কুসংস্কারের বিকারে বদ্ধ। শরীফ সাহেবের সাধনা আলোর; আলোকিত পথে চলার; সমস্ত কুসংস্কার ও বিকারকে যুক্তিতে পদদলিত করে এগুনোর। প্রয়োজনে একাই চলবেন তিনি। কারো জন্যে মায়া, অপেক্ষা বা ছাড় নেওয়ার গরজ তিনি করেননি। এই দ্বিধাবিহ্বল সমাজে তাই তাঁর কণ্ঠ শোনাত রাগী, উদ্ধত, বলিষ্ঠ এবং সব মিলে বিশিষ্ট।

তিনি সামাজিক জাগরণ, মানবিক মুক্তি নিয়ে ভেবেছেন। অনেক সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে কাজেও নেমেছেন কিন্তু তাঁর মূল ঝোঁক ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের প্রতি হওয়ায় শেষ পর্যন্ত একলা চলো রে নীতিতেই চলেছেন। ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলেই পরিবৃত ছিলেন। তিনি যা বিশ্বাস করতেন তা বলেছেন, যা বলেছেন তা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় জোরের সাথে বলেছেন, কখনো কখনো অতিশয়োক্তিও করেছেন। কিন্তু তাঁর ভাবনা ও অবস্থান ছিল সবসময়ে স্পষ্ট। সবসময়ে চেয়েছেন ভাবনাকে যুক্তিযুক্ত রাখতে, যুক্তির আলোয় পথ চলতে। যুক্তি মানুষকে সবসময়ে খাটায়, নানারকম চিন্তাগত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে, অনর্গল পথ চলতে বাধ্য করে। অক্লান্ত ভাবুক হলেন যুক্তিবাদী মানুষ। তাঁর তূণীরে অনবরত তৈরি হতে থাকে যুক্তিশেল্ এবং তা ভাণ্ডারে অকেজো জমিয়ে রাখার জন্যে নয়। প্রয়োগের জন্যে; আঘাত করার জন্যে। ব্যক্তি ও সমাজ তো প্রায়ই বধির, স্থবির এবং নিজেদের সীমাবদ্ধতায় অসহায়ও বটে। সজাগ ও বদমাশকে আঘাতে জর্জরিত করা সহজ, এমনকি আনন্দময়; কিন্তু অপারগ ও অসহায়কে আঘাত করা কঠিন, অথচ সমাজপ্রগতি ও মানবমুক্তির জন্যে সে-কাজও জরুরি। সে-কাজ যিনি করেন তিনিই হলাহল গ্রহণকারী নীলকণ্ঠ। এ সমাজে আহমদ শরীফ একই সাথে এক কালাপাহাড় ও নীলকণ্ঠ।

ড. শরীফের মশাল জ্বালিয়ে রাখার অঙ্গীকার

বিনোদ দাশগুপ্ত

আজ ড.আহমদ শরীফের মৃত্যু দিবস।একটি বজ্র-নিনাদি কণ্ঠ আজ এক বছর ধরে স্তব্ধ। ঘুমিয়ে পড়েছে যেনো বাংলার বিবেক। কিন্তু একটি দেশের বিবেক হিসেবে দুর্লভ স্থানটি পাওয়ার জন্য কোনো প্রয়াস বা সচেতন প্রচেষ্টাও তার ছিলো না। নিজের সহজাত মানবিক গুণাবলীই তাকে ওই আসনে উন্নীত করেছে অত্যন্ত সহজ-স্বচ্ছন্দ গতিতে। দেশের সচেতন সুশিক্ষিত এবং জনদরদী সমাজই তাকে ওই মর্যাদার আসনটিতে বরণ করে নিয়েছিলো। বৈষয়িক, প্রাতিষ্ঠানিক বা পদ-পদবীগত কোনরূপ সুবিধার লোভ-লালসা বর্জিত এই মানুষটিকে কারো কোনো হুমকি, ভয়ভীতি বা রক্তচক্ষু তার আদর্শনিষ্ঠ চলার পথ থেকে পেছাতে পারেনি। চরম স্বৈরাচারের বুকের ওপর দাঁড়িয়েও দেশ ও জনগণের কল্যাণের কথা উচ্চকণ্ঠে তুলে ধরতে তাঁর মতো সাহসী পুরুষ বিরল দেখা যায়। বিশেষ করে কোনো রাজনৈতিক দল বহির্ভূত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা কোনো দেশেই বেশি নয়।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে—একমাত্র সামাজিক দায়িত্বের অন্তর্গত ব্যাপার ছাড়া একদিকে কারো কোনো প্রভাব-প্রতিপত্তি বা বিভবের প্রদর্শনীমূলক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তিনি মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু অন্যদিকে বাম বা প্রগতিশীল ক্ষুদ্র যে কোনো গ্রুপের আয়োজিত মঞ্চেও যোগ দিতে কোনো দিন তিনি দ্বিধা করেননি। বরং অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে যোগ দিয়ে বলিষ্ঠ বক্তব্য হাজির করেছেন।

কেউ কেউ তাকে একান্ত একপেশে দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে বলতে চেয়েছেন যে, তিনি সব সময় সব সরকারের কেবল বিরোধিতাই করেছেন। দৃশ্যত কথাটা সত্য বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে বলতে চাই যারা এই অভিযোগ করেন তাদের সকলে না হলেও বেশিরভাগই শুধু বিশেষ কোনো সরকারের নয়, প্রায় প্রতিটি সরকারের অনুগ্রহ প্রার্থী (এবং সে অনুগ্রহ তারা পেয়েও থাকেন)। কিন্তু এই অভিযোগকারীরা একটি বারের জন্যেও ভেবে দেখেন নি (বা ভেবে দেখার প্রয়োজনও মনে করেন নি) যে, আমাদের দেশে এ যাবত (পাকিস্তানি আমল থেকেও যদি কেউ হিসাব করতে চায় আপত্তি নেই—কারণ এদেশে পাকিস্তানপন্থী ও পাকিস্তানি অনুচরের সংখ্যা অগণন) যতো

সরকার ক্ষমতার গদিতে বসেছে তাদের মধ্যে কোনো সরকারই কি নিজেদেরকে দেশ ও জনদরদী বলে সামান্যতম পরিচয়ও দিতে পেরেছে? সকলেই করেছেন উল্টো কাজটা। অর্থাৎ সোজা কথায় সকলেই কাজ করেছে দেশ, জাতি বা জনগণের বিরুদ্ধে-দেশি-বিদেশি প্রতিক্রিয়ায় নিজেদের ও গোষ্ঠী স্বার্থের পক্ষে। জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া কোনো সৎ, দেশপ্রেমিক ও বিবেকবান লোকই এসব সরকারকে অন্ধভাবে সমর্থন করতে পারে না। এমন কি এসব সরকারের গলায় যদি সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্র নামক মাদুলি ঝুলানো থাকে তাতেও ওদেরকে সমর্থন করা যায় না। সমাজতন্ত্রের আলোয়ান গায়ে জড়িয়েও দেশকে তথা জনগণকে কিভাবে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়া যায় এবং দেয়া হয়েছে তার বহু উদাহরণ আজ আমাদের দেশসহ পৃথিবীর অনেক জায়গায় ছড়িয়ে আছে। আমাদের বৃহৎ প্রতিবেশী দেশ ভারতেও (বর্তমানে নয়) দারিদ্র্য হটানো এবং সমাজতন্ত্রমুখী অর্থনীতি-রাজনীতি প্রতিষ্ঠার জন্যে মহাযজ্ঞ শুরু হওয়ার হই-হুল্লড় চলেছে বহুদিন। এখন সে হুল্লোড় এবং হুল্লোড় সৃষ্টিকারীরা উভয়ই প্রায় কোণঠাসা। আর এ প্রসঙ্গে আমাদের স্বদেশের কথা বলার প্রয়োজনই নেই। এমন এক অবস্থার মধ্যেও সক্রিয় রাজনীতি থেকে বহু দূরে অবস্থিত একজন স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবী কি করে সব মহলের কাছে এমন জনপ্রিয় এবং অঘোষিত নেতা হয়ে উঠতে পারেন তা না দেখলে বোঝা যায় না। সকাল থেকে অনেক রাত পর্যন্ত দেখেছি অসংখ্য খ্যাত-অখ্যাত লোক আসছেন-যাচ্ছেন শুধু তাকে শুভেচ্ছা জানাতে। তাঁর বাড়ির লোকেরাও (কাজের ছেলে-মেয়েরা পর্যন্ত) সবাই অভ্যস্ত, কাউকেই একটু অন্তত মিষ্টিমুখ না করিয়ে বিদায় নিতে দেয়া হচ্ছে না। আরও লক্ষ্য করেছি রাজনৈতিক নেতা ও অন্যান্য খ্যাতনামা ব্যক্তিসহ এতো অসংখ্য লোকের আনাগোনার মধ্যে একটা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের লক্ষণের বদলে আন্তরিকার ছাপটাই প্রধানভাবে পরিলক্ষিত। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে তার জন্মদিনটা দেশের বিরাট জনগোষ্ঠীরই জানা হয়ে গেছে যেনো। সরাসরি সরকারি নীতি-নির্ধারকের গদিতে বসা ব্যক্তিরা ছাড়া তার বিরোধী ব্যক্তি বা রাজনীতিকদের কেউ কেউও তার জন্মদিনে শরিক হতেন।

ব্যক্তিগতভাবে আমার অন্যতম এক প্রধান বেদনা এই যে, আমি '৯৯ সালে অনুষ্ঠিত তার জীবদ্দশার শেষ জন্মদিনে এবং তার মাত্র কয়েকদিন পর সংঘটিত তার মৃত্যুউত্তর সমাবেশেও যোগদান করতে পারিনি--এই বেদনা যে কতোখানি তীব্র তা কাউকে বুঝানো সম্ভব নয়। জীবনে যাকে সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধা করেছি, গ্রহণ করেছি যাকে নিকটতম আত্মীয়, পরম বন্ধু এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অভিভাবক হিসেবে তার জন্ম বা মৃত্যুদিনে উপস্থিত না থাকতে পারার দুঃখ যে কতো করুণ তা অনেকেই নিশ্চয় জানেন। বিশেষত একেবারে নিকটতম স্থানে থেকেও আমার এই অক্ষমতার কথা মনে হলে আমি এখনো খুব কাতর হয়ে পড়ি। অনেকদিন পর্যন্ত আমি ছিলাম এদেশের সেরা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এবং তৎসলগ্ন হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। শ্রদ্ধেয় আহমদ শরীফ সাহেব নিজেও কয়েকবার সেখানে আমাকে দেখতে গেছেন অনেক কষ্ট স্বীকার করে।

বহু বছর থেকেই প্রতি সপ্তায় তার বাড়িতে একটা বিশেষ ধরনের আড্ডা বসে। এটা খুব সংগঠিত বা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার নয়। আবার একেবারে অসংগঠিতও নয়। এই আড্ডা থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার, সভা, সংবর্ধনা ও প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ শুধু

নয় সেগুলো বাস্তবায়নও করা হয়েছে। অন্যদিকে নিছক গল্প করেই কাটানো হয়েছে অনেক সময়। এই আড্ডার একটি মূল বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে অংশ নিতে যেমন কাউকেও সেখানে সদস্যপদ নিতে হয় না, আড্ডা ত্যাগ করতেও কোনো আনুষ্ঠানিকতা নেই। একান্ত তরুণ-তরুণী থেকে ৭০ ঊর্ধ্ব বয়বৃদ্ধদের জন্যেও এই আড্ডার দ্বার খোলা। মূলত শরীফ সাহেবের ব্যক্তিগত আকর্ষণেই যে এই আড্ডার জন্ম তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু আনন্দের কথা এই যে, তার মৃত্যুর এক বছর পরও এখনো নাকি ওই রাজনৈতিক-সামাজিক আড্ডাটি জীবিত আছে। আমি যদিও ওই আড্ডায় যোগ দেয়ার মতো শারীরিক শক্তি আজো (অর্থাৎ অসুখের পর) অর্জন করতে পারিনি তবুও আশা করি এ আড্ডা যদি যথাযথভাবে জিইয়ে রাখা যায় তবে ড. শরীফের জীবন দর্শন অনুসরণে এখান থেকেই একটি বলিষ্ঠ সৃজনশীল ও প্রভাবশালী জাতীয় সংগঠন একদিন হয়তো গড়ে তোলা যাবে।

নিজের সাধনালব্ধ জ্ঞান, বিশ্বাস ও আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার এমন বলিষ্ঠ ও সক্রিয় সাহস সচরাচর দেখা যায় না। এদেশের শতকরা প্রায় ৯৯ জন মানুষই একান্ত ধর্মপ্রাণ, কিন্তু তারা ধর্মান্ধ নয়। এই নিরীহ সরলপ্রাণ মানুষগুলোকে ধর্মান্ধতার সংকীর্ণ কূপে নিক্ষেপ করার জন্যে যেখানে ধর্ম ব্যবসায়ী রাজনীতিকরা চারদিক থেকে আদাজল খেয়ে নেমেছে এবং কেবল মাত্র নাস্তিকদের নয়, সকল মুক্তবুদ্ধির লোকদের জীবননাশের জন্যেও প্রায় সর্বত্র হামলা চালাচ্ছে সেরূপ এক ভীতিকর পরিস্থিতিতেও তিনি তার নাস্তিকতার কথা তখনো সদম্ভে ঘোষণা করতে কুণ্ঠিত হননি। আবার শুধু ঘোষণা দিয়েই তিনি শান্ত থাকেননি। মৃত্যুর পর তার মৃত দেহ নিয়ে যেনো কোনো ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান না হয় সে জন্যে তিনি একটি আইনানুগ উইলও করে গেছেন। তার চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং সমর্থক গোষ্ঠীর শক্তির কথা অনুমান করেই ধর্ম ব্যবসায়ীরা সম্ভবত তার ইচ্ছানুযায়ী মৃত্যু পরবর্তী কাজগুলোতে আর কোনো বাধা দেয়নি। কেবল ব্যবসায়ীরা নয়, যাবতীয় নামী-বেনামী বা বর্ণচোরা সব প্রতিক্রিয়াশীলরাই ছিলো ড. শরীফের বিরোধী। এদের সকলেই তাঁকে ভয় ও ঘৃণা করতো। কিন্তু সামনাসামনি গিয়ে তাঁকে আক্রমণ করার সাহস তাঁদের অনেকের ছিলো না বলেই তারা ড. শরীফের ফাঁসি দাবি করার বা তাকে হত্যা করার হুমকি দানের মতো ঘৃণ্য কাজের দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলো খুনী ধর্ম ব্যবসায়ীদের হাতে। কিন্তু মানুষের নৈতিক মনোবলের কাছে ওই খুনী চক্রও যে কতো দুর্বল সে কথা ড. শরীফ প্রমাণ করে গেছেন। মানুষ মরণশীল বলে তিনিও শারীরিকভাবে এখন আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু মানুষকে আলোকিত করার যে অনির্বাণ মশাল তিনি জ্বালিয়ে রেখে গেছেন তা সহজে নিভে যাওয়ার নয়। সেদিক থেকে তিনি অমর। সে মশালের আলো ছড়ানোই হোক এখন থেকে আমাদের একটি প্রধান কাজ।

ড. আহমদ শরীফ : আমাদের সক্রেটিস

রুবাইয়াৎ ফেরদৌস

এক.

সকালে উঠে সামনের রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করার অভ্যেস আমার। সেদিনও হাঁটছিলাম। হঠাৎ পাশের দোকানের মকবুল মিয়া বললো, স্যার আপনাদের ইউনিভার্সিটির একজন শিক্ষক মারা গেছেন। রেডিওর ৭টার খবরে বলেছে। নাম মনে নেই তবে বললো বাংলা বিভাগের প্রধান। আঁতকে উঠলাম। বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান তো সাঈদ-উর-রহমান। এতো অল্প বয়সে তিনি মারা গেলেন। এই সেদিনও আমি, স্যার আর মেহের নিগার একুশে ফেব্রুয়ারির মাইক নিয়ন্ত্রণের কাজ করলাম এক সঙ্গে রাত জেগে। বিশ্বাসই হচ্ছে না। ভাবলাম সব লাশ শুধু বাংলা বিভাগ থেকেই বেরুচ্ছে। কয়েক মাস আগে আমার প্রিয় একজন মানুষ নরেন স্যার চলে গেলেন। এরপরই গেলেন আমার বন্ধু জামরুল বেগ। দুজনেই বাংলা বিভাগের শিক্ষক। এবারও বাংলা বিভাগের। মনটা হোঁচট খেলো। সামনের পত্রিকা স্ট্যান্ড থেকে এক এক করে প্রত্যেকটা কাগজ দেখলাম। কোথাও কোনো খবর নেই। এক রাজনৈতিক দাঙ্গার সময় ছাড়া রেডিও আমি কখনই শুনিনা। তাও শুনি বিবিসি। মকবুল মিয়ার কাছ থেকে জেনে নিলাম পরের সংবাদ ৮টায়, ইংরেজিতে। খবরের জন্য অপেক্ষা করছি আর সাঈদ-উর-রহমান স্যারের কথা মনে পড়ছে। কিন্তু কে জানতো আমার জন্য কতো বড়ো দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছে। খবরে শুনলাম ড. আহমদ শরীফ মারা গেছেন। শরীফ স্যার একসময় বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন। মকবুল মিয়া আসলে ভুল শুনেছে।

দুই.

নতুন মাত্রায় আমার মধ্যে কষ্ট সংক্রমিত হতে শুরু করলো। ক্রমশ আমি আবেগ আক্রান্ত হতে শুরু করল। ক্রমশ আমি আবেগ আক্রান্ত হয়ে পড়লাম। হায়! ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে শরীফ স্যার মারা গেছেন। দিন কয়েক আগেও পার্কে তার সঙ্গে আড্ডা দিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর থেকে প্রায় প্রতিটি বিকেল আমার কাটতো স্যারের আড্ডায়। স্যারের মৃত্যু আমার মনে হলো যেন একটি প্রাচীন জ্ঞানবৃক্ষের মৃত্যু। যার শেকড়-বাকড়, পাতা-কাণ্ড থেকে আমরা ক্রমশ রস নিয়ে নিজেদেরকে তৈরি

করছিলাম। যেমন পৃথক করা যায় না ধনুক থেকে ছুটে যাওয়া ধাবমান তীরকে কিংবা ছুটন্ত তীর থেকে তার গতিকে, তেমনি যায় না জ্ঞান থেকে জ্ঞানের যন্ত্রণাকে। শরীফ স্যার আমাদের ভিতর সেই জ্ঞান যন্ত্রণা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। তৃষ্ণার্ত আমি কারবালার পিপাসা নিয়ে হাজির হতাম তার জ্ঞানসাগর থেকে অঞ্জলি ভরে পান করতে। আর কি উদার তিনি ছিলেন এ বিষয়ে যারা তার আড্ডায় আসেননি তাদেরকে বলে বোঝানো যাবে না। কি সেই উদারতা! আর ভাণ্ডারের সেকি অভাবশূন্যতা! কি চাই, শুধু মুখ ফুটে বললেই উত্তর হাজির। তা সে দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস বা রাজনীতি হোক না কেন কিংবা হোক না কেন অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব বা সাহিত্য। একটুও কৃপণতা দেখাতেন না তিনি। যেন তিনি এক ফলসমৃদ্ধ বৃক্ষ কাছে গিয়ে আমরা শুধু ডালে মৃদু ঝাঁকি দিতাম আর অমনি জ্ঞান-রসে পুষ্ট ফলগুলো টুপটুপ করে গাছ থেকে নীচে পড়তো। ক্ষুধার্ত আমরা আমাদের ক্ষুদ্র ও ছিন্ন আঁচলে যতোটা পারতাম কুড়িয়ে নিতাম।

তিন.

নিজেকে এতিম মনে হলো। কোনো বিষয়ে খটকা লাগলে চটজলদি জবাব আমি এখন কোথা পাই। জটিল কোনো শব্দের অর্থ আমাকে অমন ভেঙেচুরে কে বুঝিয়ে দেবে। সন, তারিখসহ ইতিহাস আর রাজনীতির নতুন ব্যাখ্যার কথা আমাদেরকে অমন বিনে পয়সায় কে শেখাবে, শিক্ষা বাণিজ্যিকীকরণের এই যুগে। সত্যিই নিজেকে ভীষণ কাঙাল মনে হচ্ছে। ধর্মের নামে ভণ্ডামির অমন তীক্ষ্ণ আর সাহসী সমীকরণের কথা আমাদের কে বোঝাবে। আমি জানি না। সত্যিই আমি জানি না।

চার.

বলতে দ্বিধা নেই। এই আমি যে এই আমি তার সিংহভাগ কৃতিত্ব স্যারের। এই আমি যে নিজেকে অসাম্প্রদায়িক ভাবি, ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যে আমি উঠতে পেরেছি বলে দাবি করি তার মূলে শরীফ স্যার। অস্বীকার করছি না এ আমার ভিতরেও কতো গোঁড়ামি ছিল, ছিল ধর্মান্ধতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা। কিন্তু তাঁর দীর্ঘ সংস্পর্শে আজ আমি মুক্ত, বুক উঁচু করে বলতে পারি সেসব থেকে একেবারেই মুক্ত। নিজেকে নিয়ে এই যে আমি অহঙ্কার করি তা শরীফ স্যারের জন্যই সম্ভব হয়েছে। এতোটুকু বাড়িয়ে আমি বলছি না। এবং আমি নিশ্চিত আমার মতো হাজার হাজার তরুণ স্যারের সংস্পর্শে এসে সংস্কারহীন আধুনিক মানুষে পরিণত হয়েছে। প্রথা আর সনাতনী চিন্তার কূপমণ্ডুকতা থেকে তিনি আমাদের হাত ধরে উঠিয়ে এনেছেন, দেখিয়েছেন আলো। তিনি এক সত্যিকারের শিক্ষক। এক মহান শিক্ষক। আবার প্রাজ্ঞ অধ্যাপকও তিনি। তাই সাবধান করতেও ভুলেননি যে, ঐ আলোয় পথ চলা কঠিন, তাই বলতেন, তোমাদেরকে আরো সাহসী হতে হবে, আরো সতর্ক হতে হবে। তিনি কেবল বই-পুথির কথা বলতেন না। তার কাছে থেকে আমরা পেতাম এরচেয়েও বড়ো পাঠ, জীবনের পাঠ।

পাঁচ.

যুবকদের তিনি ভীষণ পছন্দ করতেন। ঠিক গ্রিসের সেই সক্রেটিসের মতোই। সক্রেটিসের মতো তিনিও যুবকদের সঙ্গে হাঁটতেন, আড্ডা দিতেন আর গল্পচ্ছলে

যুবকদেরকে চেষ্টা করতেন অন্ধকার থেকে, সনাতনী বৃত্তের পঙ্কিলতা থেকে তুলে আনতে। চেষ্টা করতেন তাদের জ্ঞান-স্পৃহা বাড়াতে, তাদেরকে জ্ঞানপিপাসু করে তুলতে।

গোঁড়া সমাজ সক্রেটিসকে দোষী বানিয়ে হেমলক খাইয়েছিল। শরীফ স্যারের বিরুদ্ধেও অন্ধসমাজ অবস্থান নিয়েছিল, তার নামে মামলা হয়েছিল, তার ফাঁসির দাবি উঠেছিল, তার কুশপুত্তলিকার বহ্ন্যুৎসব হয়েছিল। এসব কি? আমার তো মনে হয় এসব এক ধরনের হেমলকই। দিনের পর দিন এ হেমলকের যন্ত্রণা তাকে সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু চরিত্রের কি তেজ যে নিঃসঙ্গ শেরপার মতো কিংবা মহাকাব্যের নায়কদের মতো সব বাধা পেরিয়ে তিনি তার কথা বলে গেছেন, কোনো ফাঁক ছিল না, ছিল না কোনো দ্বিধা কিংবা কোনো ইতস্তত মনোভঙ্গি।

ছয়.

আজকের বিরূপ সময়ে যখন সাম্প্রদায়িকতা আর ধর্মান্ধ শক্তি চারদিকে দাঁত খিঁচিয়ে চলছে ঠিক তখন শরীফ স্যারের মতো একজন সক্রেটিসের বড়ো দরকার ছিল আমাদের। বড়ো দরকার ছিল তার মতো একজন হারকিউলিসের। জানি না কতো প্রহর অপেক্ষার পর একজন শরীফ স্যারের জন্ম হয়। এইটুকু শুধু জানি আমাদের এই পঙ্কিল সমাজে সে রকম আলোকিত মানুষের প্রয়োজন বড়ো বেশি।

স্রোতের বিরুদ্ধে একা

হাসান হাফিজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে আমরা ভর্তি হই ১৯৭৪ সালে। অনার্স, এম.এ. পাস করে বেরোতে বেরোতে '৮০ সালের আগস্ট। আমাদের '৭৭ ব্যাচের সৌভাগ্য যে, আমরা অধ্যাপক আহমদ শরীফকে বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসেবে পেয়েছিলাম। রাশভারী গম্ভীর মানুষ, তাঁকে কমবেশি ভয় পায় সকলেই। অসাধারণ স্পষ্ট বক্তা, ভণ্ডামি তাঁর ধাতে নেই। অন্য অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর মতো সুবিধাবাদের খুদ কুড়াতে আগ্রহ তাঁর ছিল না কস্মিনকালেও। দুঃসাহসী এক বেপরোয়া ব্যক্তিত্ব। তাঁর খ্যাতি 'পণ্ডিত ও বয়স্ক বিদ্রোহী' বলে। যথার্থ শিরোপা নিঃসন্দেহে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সময়কালে নববর্ষে, বিশেষত ইংরেজি নববর্ষে খেতাব দেওয়ার চল ছিল। এখন সে সব আছে কিনা জানি না। চটকদার, রঙ্গরসে ভরপুর কৌতুকপ্রদ মজার মজার সব নাম দেওয়া হতো একেক বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ এমনিতেই বড়োসড়ো বিভাগ, প্রত্যেক বর্ষেই ছাত্রছাত্রী অনেক। নাম দেওয়া হতো হাতে লিখে-ছাত্র বা ছাত্রীর নামের পাশে নববর্ষের সম্ভাষণসূচক খেতাব। অশ্লীল খেতাবও নেহাত কম থাকতো না। তো, এক বছর দেখলাম দেয়ালে দেয়ালে সাঁটা মুদ্রিত খেতাব। ছাত্রছাত্রীদের নয়, শিক্ষকদের খেতাব দেওয়া হয়েছে সে বছর। কে বা কারা করেছিল এটি, জানি না। হতে পারে আমাদের সিনিয়র ব্যাচের পক্ষ থেকে এ কাজটি করা হয়েছিল। ড. আহমদ শরীফের নাম দেওয়া হয়েছিল 'চলমান মধ্যযুগ।' ড. শরীফ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য নিয়ে অসাধারণ সব গবেষণা করেছিলেন। বিশেষত মুসলিম সাহিত্যিকদের রচনা ছিল তাঁর গবেষণার প্রধান বিষয়। তাঁর এ সম্পর্কিত গবেষণার পরিধির পরিমাণও ছিল বৃহৎ বিস্তর। গোটা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসই একক প্রচেষ্টায় অনেকখানি পাল্টে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর যে নামকরণ 'চলমান মধ্যযুগ'- সেটা ছিল তাঁর প্রতি অবিচার। আসলে তিনি ছিলেন বর্তমান সময়ের চেয়েও অগ্রসর একজন মানুষ। ধর্মীয় গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িকতা, কুসংস্কার, কূপমণ্ডূকতা ছিল তাঁর চিরশত্রু। জীবনের দীর্ঘ ৭৯টি বছর আপসহীন লড়াই তিনি করে গেছেন। কেউ পাশে না দাঁড়ালেও হতোদ্যম হননি।

'একলা চলো' নীতিতে অটল, অবিচল থেকেছেন। নিজস্ব উপলব্ধি, বিশ্বাস থেকে একচুলও সরে দাঁড়াননি। হয়তো সে কারণেই ছিলেন নিঃসঙ্গ, ক্লান্তি নৈরাশ্য তাঁকে নিশ্চয়ই আচ্ছন্ন করেছে সময় সময়, কিন্তু ভেঙে পড়েননি কখনো। আহমদ শরীফ এক কঠিন পাত্র–এ কথা ভালো জানেন যারা তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন।

পরিণত বয়সেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলতে গেলে। কিন্তু তাও বুঝি মেনে নেওয়া কঠিন অনেকের পক্ষে। বাগ্মী, তার্কিক, মুক্তচিন্তার প্রবক্তা জলজ্যান্ত মানুষটি আর নেই, এ সংবাদ তাঁর ছাত্র, ভক্ত, অনুরাগীদের মর্মাহত করেছে। জীবদ্দশায় কাউকে ছেড়ে কথা কইতেন না। চিনির প্রলেপমাখা ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলা ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। সেজন্য অপ্রিয়ও ছিলেন অনেকের। মৃত্যুর দিন সন্ধ্যায় তাঁর ধানমন্ডি এক নম্বর রোডের বাড়িতে গিয়ে দেখি বাড়ি প্রায় ফাঁকা। সেদিন ছিল হরতাল। শোক জানাবার জন্য খুব কমসংখ্যক মানুষই তাঁর বাড়িতে গিয়েছেন সেদিন। লাশ রাখা হয়েছিল বারডেমের মরচুয়ারিতে। বাড়িতে অনুরাগীরা গিয়েছেন ফুলের তোড়া, স্তবক নিয়ে। দেশ, সমাজের যাঁরা মাথা–তাঁদের কাউকে দেখা যায়নি।

ক্লাসে চমৎকার পড়াতেন। অমনোযোগী উদাসীন ছাত্রছাত্রীরাও খুব উপভোগ করতো তাঁর পড়ানো। স্বভাবসুলভ ব্যঙ্গবিদ্রূপ, রসিকতা, কৌতুক, শ্লেষ মিলিয়ে মিশিয়ে নিজস্ব এক ধরনের আকর্ষণীয় বাগভঙ্গি ছিল তাঁর। সভা-সমিতিতেও তাঁর ভাষণ আগ্রহের সঙ্গে মন দিয়ে শুনতেন শ্রোতারা। গুরুগম্ভীর জটিল বিষয়কে সহজ সরলভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের চমৎকার ক্ষমতা-দক্ষতার অধিকারী ছিলেন অধ্যাপক আহমদ শরীফ। ক্লাস নেওয়া সম্পর্কে তাঁর নিজের বক্তব্য : ..... সারা জীবনে পারতপক্ষে আমি কোনো ক্লাস কামাই করিনি। যতোক্ষণ ক্লাসে থেকেছি, আনন্দে থেকেছি। সেই জন্য ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমি চিরকাল ক্লাসে গেছি। যতোক্ষণ ক্লাসে থেকেছি ততোক্ষণই আনন্দিত জীবনের স্বাদ পেয়েছি। ক্লাসের সময়টুকুকেই আমি শ্রেষ্ঠ সময় মনে করেছি।'

ছোট্ট দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে শেষ করবো সামান্য এ শ্রদ্ধাঞ্জলি। ১৯৯১ সালে অধ্যাপক আহমদ শরীফকে একুশে পদক দেওয়া হয়। তাঁর সঙ্গে যুগ্মভাবে সাহিত্যে একুশে পদক পেয়েছিলেন অধ্যাপক কবীর চৌধুরী। দৈনিক বাংলায় সেবারের একুশের পদকপ্রাপ্তদের অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে একটি প্রতিবেদন লেখার জন্য ফোনে যোগাযোগ করেছিলাম তাঁর সঙ্গে। বললেন, পুরস্কার দিয়েছে ভালো। কিন্তু ব্রাকেট করে দিলো কেন? আমি এই পুরস্কার আনতে যাবো না। তবে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলে নেবো।

এর পরের ঘটনাটি নিছক ব্যক্তিগত বলে পাঠকের কাছে মার্জনা চেয়ে নেই। আমি যখন অনার্স পরীক্ষার্থী, তখন তিনি বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান। কোনো কারণবশত নির্ধারিত সময়ে আমার ফরম ফিলআপ করা হয়নি। পরীক্ষার ফি ৬৬ টাকা, ফাইন হয়ে গেছে ৭০ টাকা। বিশেষ বাকিও নেই পরীক্ষার। একটাই উপায় আছে– তা হলো বিভাগীয় চেয়ারম্যানের মাধ্যমে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে আবেদন করা। মঞ্জুর হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিভাগ ফাইনসহ ফি জমা নেবে।

দরখাস্ত নিয়ে এক বিকালে গেলাম শরীফ স্যারের ফুলার রোডের বাসায়। বিস্তারিত বললাম সব। জবাবে যা বললেন, শুনে আমার চক্ষু চড়কগাছ। সোজা সাপটা বলে দিলেন, আমি এতে সই করবো না। আমি বললাম, আপনাকে সই করতে হবে। উনি

পাল্টা বললেন, কেন সই করতে হবে? এবার আমার ক্রুদ্ধ জবাব—করতে হবে কারণ আমি আপনার ছাত্র। আমার দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে। আপনি এ দরখাস্তে সই না করলে আমার পরীক্ষাটা দেওয়া হবে না। আমার ক্যারিয়ারটা নষ্ট হয়ে যাবে। আমার কণ্ঠে কিছুটা ঝাঁঝ ও ক্ষোভের অভিব্যক্তি ছিল। মনে হলো এই ঔদ্ধত্যকে বোধ হয় তিনি পছন্দ করলেন। কোনো দ্বিরুক্তি না করে সঙ্গে সঙ্গে সই করে দিলেন। নিজে যেমন স্পষ্ট কথা বলতেন, অন্য স্পষ্টবাদীদের পছন্দও করতেন। এক সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'প্রতিভার বিনয় আর প্রতিভার ঔদ্ধত্যের মধ্যে কোনটা আপনার পছন্দ? আহমদ শরীফের জবাব ছিল, 'প্রতিভার ঔদ্ধত্যই আমার কাছে বেশি গ্রহণীয় মনে হয়। কারণ উদ্ধত মানুষ সহজে চরিত্রহীন হতে পারে না। আত্মপ্রত্যয়ী আত্মমর্যাদাসম্পন্ন না হলে কেউ উদ্ধত হতে পারে না। কৃত্রিম বিনয়ে অনেক বিনীত মানুষেরা সুবিধাবাদী হয়।'

মানুষ পরাজিত হয় না

মাহবুব সাদিক

শিক্ষকতা করি। সে কারণেই ছাত্রদের নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হই। কখনো সমাজের অন্য মানুষজনও নানা প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হন। কেননা, তারা প্রায় ধরেই নেন লোকটি যেহেতু শিক্ষক, সুতরাং কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর তারা অবশ্যই জানবেন। এইসব মানুষের কৌতূহল মেটানোর খুব সহজ হয় না। তাদের সব জিজ্ঞাসার জবাব জানাও থাকে না। ছাত্রদের প্রশ্নের প্রত্যাশিত উত্তর কখনো দিতে পারি, কখনো পারি না। তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সহজ–কখনো প্রায় মধুর, কাজেই যেসব জিজ্ঞাসার উত্তর জানি না, সেগুলো জেনে নেওয়ার পর তাদের কৌতূহল মেটাই। তারপরও থাকে এমন বিষয় যার সম্পর্কে আমার নিজেরই মধ্যে নানারকম কৌতূহল জাগতে থাকে, নানা কূট প্রশ্ন মাথার মধ্যে কুটকুট করে কামড়াতে থাকে। সেইসব প্রশ্ন নিয়ে নানাজনের কাছে ছুটি-লাইব্রেরির নানা বই ঘাঁটাঘাঁটি করি। চেষ্টা করি প্রশ্নের বেড়াজাল থেকে বেরুতে। তারপর যাই শরীফ স্যারের কাছে। আমাদের নানা প্রশ্নের চটজলদি উত্তর তাঁর কাছে পেয়ে যাই। আমাদের মনের মধ্যে নানা অন্ধকার গলিঘুঁজিতে শরীফ স্যার আলো ফেলেন। আমরা ক্রমশ আলোর দিকে উঠতে থাকি। সেই শরীফ স্যার, আমাদের সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষকদের একজন–বড় আকস্মিকভাবে অকালে চলে গেলেন। আমাদের নানা প্রশ্নের জবাব দেওয়ার মতো শিক্ষক তেমন কেউ আর রইলেন না। আকস্মিক এবং অকালে শব্দ দুটোও সচেতনভাবেই ব্যবহার করেছি। আমাদের কাছে আকস্মিক এ জন্য যে, তাঁকে দেখে আমাদের কখনো বয়োবৃদ্ধ মনে হয়নি–আমরা তাঁকে, তরুণ বলেই জানতাম। যদিও যথেষ্ট বয়স হয়েছিল তাঁর কিন্তু হঠাৎ করে যাওয়ার মতো অবস্থায় তাঁকে কখনো দেখিনি। আর মনের দিক দিয়ে তো ছিলেন ত্রিশের তরুণ যুবাপুরুষ। এজন্যও অকালে শব্দ ব্যবহার করেছি। তাছাড়াও অকালে গেছেন শরীফ স্যার। সত্যিই অ-কাল চলছে আমাদের। এই অকালে আহমদ শরীফের মতো ঋজু মানুষের দরকার ছিল। আর আমরাই বা আমাদের নানা প্রশ্নের জবাব কার কাছে খুঁজি? তাঁর সব মতামত হয়তো আমরা মানতে পারিনি–তবু তাঁর সুস্পষ্ট মতামতের দার্ঢ্য আমাদের মুগ্ধ করতো। তাঁর মৃত্যু তাই আমাদের কাছে আকস্মিক।

শিক্ষকতার প্রসঙ্গেই মনে পড়ে দুএকটি ব্যক্তিগত স্মৃতি। আমরা তাঁর ছাত্র ছিলাম বাংলাদেশের ইতিহাসের উত্তাল দিনগুলোতে। আটষট্টি-উনসত্তর-সত্তরের ঝড়ো

উন্মাতাল দিনে শরীফ স্যারের অন্তরের উত্তাপ অনুভব করেছি। তৎকালীন ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে আমার কিছুটা যোগ ছিল—শরীফ স্যার স্পষ্টভাবে শিখিয়েছিলেন যে, দেশের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষকে ভালোবাসতে হয়। তাকেই বলে দেশপ্রেম। আমরা তাঁর কথা বুঝেছিলাম। স্নেহ করতেন তিনি আমাদের কয়েকজনকে। সেই স্নেহের দাবিতে স্যারের অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করেছি। আমাদের সেই কালটিই ছিল স্যারের জীবনের সবচেয়ে ফলবান সময়। তখন দুই হাতে লিখছেন তিনি, গবেষণা করছেন মধ্যযুগের সাহিত্য দিয়ে। একটি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ না বললেই নয়। এম. এ. ফাইনালে মৌখিক পরীক্ষা নিতে এসেছেন ড. মুহম্মদ এনামুল হক। প্রত্যেককে ব্যাকরণের নানা বিষয় জিজ্ঞেস করছেন। আমি ব্যাকরণ জানি না তেমন। শরীফ স্যারকে বললাম আমার ভয়ের কথা। পরীক্ষার সময় এনামুল হক স্যার নানা বিষয়ে প্রশ্ন করার পর যে-ই ব্যাকরণ জিজ্ঞেস করার আয়োজন করেছেন-শরীফ স্যার আমাকে বললেন, 'যাও ওদিকে, পাণ্ডুলিপি লেখো।' আমি দ্রুত পাণ্ডুলিপি লিখে দৌড় দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

শরীফ স্যার এম.এ. ফাইনালে আমাদের পাণ্ডুলিপি পড়াতেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পুরোনো হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি নিয়ে তিনিই ঘাঁটাঘাঁটি করতেন। এ বিষয়ে তখন তিনিই ছিলেন একমাত্র বিশেষজ্ঞ। তখন পর্যন্ত পাণ্ডুলিপি পাঠ বিষয়ে বাংলায় কোনো বই বেরোয়নি। আমরা যা কিছু শিখেছিলাম সবই শরীফ স্যারের গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে। পরে এ বিষয়ে তাঁর বই বেরোয়। একালে নানাজন পাণ্ডুলিপি ও পুরোনো পুথি ঘাঁটাঘাঁটি করেন। এদের প্রত্যেকের গুরু শরীফ স্যার। আমাদের যেমন হাতে ধরে পাণ্ডুলিপির অক্ষর চিনিয়েছিলেন তেমনি তৈরি করেছেন বেশ কিছু ছাত্র—যারা পাণ্ডুলিপি নিয়ে আজো ঘাঁটাঘাঁটি অব্যাহত রেখেছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিষয়ে ড. আহমদ শরীফের অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আহমদ শরীফের প্রবল ব্যক্তিত্ব আমাদের মুগ্ধ করতো। তাঁর ক্লাসে থাকত পিন পতন নিস্তব্ধতা। তাই বলে তিনি মোটেই গোমড়া মুখের শিক্ষক ছিলেন না, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ছিল সহজ সম্পর্ক। আমাদের নানা অসঙ্গতি ও ব্যবহার নিয়ে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করতেন। তাঁর ব্যঙ্গের মধ্যেও যুক্তির স্পর্শ থাকতো—ফলে আমরা কেউ কখনো মন খারাপ করেছি বলে মনে পড়ে না।

শরীফ স্যার, মুনীর চৌধুরী স্যার যখন বাংলা বিভাগের লম্বা করিডোর ধরে হাঁটতেন ছাত্রছাত্রীরা দ্রুত সরে যেত এদিক-ওদিক। ও রকম মাথা উঁচু করে হাঁটা প্রবল ব্যক্তিত্ব আজকের দিনে কোথায় আর? আজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই মাথা উঁচু করে হাঁটে সন্ত্রাস। সন্ত্রাসই একালের প্রবল ব্যক্তিত্বের উদাহরণ। সন্ত্রাসের কাছেই জিম্মি সাধারণ ছাত্রছাত্রী, সাধারণ শিক্ষক সবাই।

সাম্প্রদায়িকতা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করে এসেছেন শরীফ স্যার। তিনি ছিলেন প্রবলভাবে যুক্তিবাদী। ছিল তাঁর তাৎক্ষণিকভাবে যুক্তি শানানোর মেধা—যা দিয়ে তিনি তাঁর প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতেন। তাঁকে কখনো যুক্তিহীন কথা বলতে শুনেছি বলে মনে পড়ে না। আর যখন তিনি লেখক তখনতো পরিপূর্ণভাবে যুক্তিবাদী। এ রকম অসাম্প্রদায়িক মানুষও একালে কম দেখেছি। যেসব বিষয় এবং অসঙ্গতি চোখে দেখে বা অনুভব করে আমরা চুপ করে থেকেছি বা থাকি সেই সব বিষয়ে

শরীফ স্যার প্রবল প্রতিবাদ তুলতেন। তাঁর কাছে সব ধর্মের, বর্ণের মানুষ সমান মর্যাদা পেত। কিন্তু মানুষের বা লেখকের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ তিনি করতেন। একটি মাত্র বিষয় উল্লেখ করি, আমরা যখন ছাত্র সেই শেষ ষাটের দশকে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি বিষয় নিয়ে পর পর দুদিন আমাদের সামনে বক্তৃতা করেছিলেন। বিষয়টি 'অন্ধকার যুগ'। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১২০০ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে কোনো সাহিত্য নিদর্শন পাওয়া যায়নি বলে বাংলার বিখ্যাত সব পণ্ডিত এর জন্য বাংলাদেশে তুর্কি আক্রমণকে দায়ী করেছেন। তাঁরা মনে করেন, তুর্কিদের অত্যাচার-অনাচারের ফলেই একালের লেখকরা সাহিত্য রচনা করতে পারেননি। দেশব্যাপী হত্যা-রক্তপাত-সন্ত্রাস চললে লেখকরা কেমন করে লিখবেন? আমার মনে পড়ে শরীফ স্যার এ বিষয় নিয়ে এতো চমৎকার আলোচনা করেছিলেন যে, বিখ্যাত সব পণ্ডিতের মতামতকে মনে হয়েছিল, একপেশে, অযৌক্তিক এবং কখনো কখনো সাম্প্রদায়িক।

শরীফ স্যারের এসব মতামত লিপিবদ্ধ রয়েছে তাঁর একটি বিখ্যাত গবেষণা প্রবন্ধ *বাংলা সাহিত্যের খসড়া চিত্র* গ্রন্থে। তাই একটি প্রবন্ধ থেকেই যেকোনো সচেতন পাঠক পুরো বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পেয়ে যাবেন। হুমায়ুন কবিরের বাংলার কাব্য নামক ছোট্ট বইটির মতই আহমদ শরীফের ঐ প্রবন্ধটি বিখ্যাত।

সব রকম সাম্প্রদায়িক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ঝরেছে শরীফ স্যারের কথায়, লেখায়। এতো জোর দিয়ে কাউকে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে শুনিনি। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তাঁর অনড় অবস্থান তাঁর জীবনকে হুমকির মুখোমুখি করেছে বহুবার। শরীফ স্যার ভ্রূক্ষেপ করেননি। ফ্যাসিস্ট শাসকের রক্তচক্ষুকে তিনি থোড়াই পরোয়া করতেন। যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী এই ঋজু মানুষটি তাঁর দীর্ঘ জীবনব্যাপী ফ্যাসিস্ট শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, স্বৈরাচারী মানুষ ও স্বৈরাচারী শাসকরাও তাঁর ওপর খড়্গ তুলেছে বারবার—আহমদ শরীফ ভয় পাননি কখনো। দ্বিধান্বিত হননি কখনো। সমস্ত প্রতিকূলতার মুখে তাঁকে কখনো মাথা নত করতে দেখিনি আমরা। তিনিই হয়তো একমাত্র উদাহরণ, যাঁকে দেখে আমাদের মনে হত হেমিংওয়ের 'ওল্ড ম্যান এন্ড দি সি'র সেই অবিস্মরণীয় উক্তি, 'ম্যান মে বি ডেস্ট্রয়েড, বাট নট ডিফিটেড'- মানুষ ধ্বংস হতে পারে, কিন্তু পরাজিত হয় না। শরীফ স্যার কোনো প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেই পরাজিত হননি।

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ সেথা শির

এ. কে. মনোওয়ার উদ্দীন আহমেদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য শিক্ষক ড. আহমদ শরীফ এখন পরলোকে। মানবদেহ নশ্বর কিন্তু তার চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা অবিনশ্বর। বহু বছর আগে জন্ম নেয়া সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক সক্রেটিসের চিন্তাকে কেউ ধ্বংস করতে পারেনি। সেই গতিধারার প্লেটো এবং প্লেটো থেকে এরিস্টটলের সিলসিলা আজও মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক অগ্নিপ্রবাহ যা সময়ের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বইতে থাকবে। ১৯৬৬ সালে প্রথম যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসি তখন বিশ্ববিদ্যায়ের একজন শিক্ষক সম্বন্ধে আমার একটি নিজস্ব ধারণা ছিল। ১৯৬৬ থেকে ১৯৯৯ এই সুদীর্ঘ সময়ে নানা ঘটনায় নানা ধরনের মানুষ দেখেছি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। অধ্যাপক আহমদ শরীফ ছিলেন একজন অসাধারণ মানুষ। এটা বলারই অপেক্ষা রাখে না যে, এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে যাদের জন্য চিনে অর্থাৎ যাদের পরিচয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের একজন হচ্ছেন আহমদ শরীফ।

আমি এই কথা বলব না যে, আহমদ শরীফ একজন ছিলেন এখন আর নেই। এর কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এখনও আছেন। কলা ভবনের প্রধান গেইটে তার একটি প্রতিকৃতি দেখছি। সেই তেজোদীপ্ত মানুষটি এখনও আমাদের মাঝে আছেন। ষাটের দশকে যখন প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসি তখনই তার নাম শুনি। লেখা ও বক্তৃতা উভয় ক্ষেত্রেই তার দক্ষতা ছিল তুলনাহীন। তার বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা অবশ্যই অহঙ্কার করে বলবে যে, আমরা শরীফ স্যারের ছাত্রছাত্রী ছিলাম। আহমদ শরীফ শিক্ষক হিসেবে কেমন ছিলেন? নিবেদিতপ্রাণ, স্নেহপরায়ণ এবং মহৎ আদর্শে বলীয়ান এক শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন তিনি। বর্তমান বাংলা বিভাগের প্রবীণ শিক্ষকদের সকলেই আহমদ শরীফের ছাত্র। ঐ বিভাগে অনেক দেশ বরেণ্য পণ্ডিত শিক্ষক রয়েছেন। এটি বলা নিষ্প্রয়োজন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ একটি অত্যন্ত শক্তিশালী বিভাগ। আমরা গর্ব করতে পারি, অহঙ্কার করি এমন অনেকেই আছেন। এরা সকলেই আহমদ শরীফের ছাত্র। আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, এরা সবাই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, আহমদ শরীফ ছিলেন একজন মেরুদণ্ডওয়ালা শিক্ষক। আমি অধ্যাপক আহমদ শরীফের সাহিত্যকর্ম ও গবেষণা সম্পর্কে কিছু বলব না– কারণ এটি তার পণ্ডিত ছাত্ররাই করবেন। পাণ্ডিত্যে তিনি যে কোনো মানদণ্ডের বিচারেই একজন শীর্ষস্থানীয় অধ্যাপক ছিলেন তা সকলেই জানেন।

কিন্তু আহমদ শরীফের আরও অনেক গুণ ছিল। যে কথা বলতে চাই তা হল এই যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তথা এই সমাজে আমি প্রথমবারের মত একজন দণ্ডায়মান মেরুদণ্ডওয়ালা শিক্ষক দেখেছি। সত্যিকার অর্থেই তিনি ছিলেন এক স্বাধীন ব্যক্তি। মানুষ তখনই স্বাধীনতা লাভ করে যখন তিনি শুধুমাত্র তার বিবেকের নির্দেশে চলেন। অধ্যাপক আহমদ শরীফ ছিলেন সেই রকম একজন বিবেকচালিত স্বাধীন মানুষ। তিনি তাঁর মত প্রকাশে কোনো রকম ভয় বা তোয়াক্কা করতেন না। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ছিল তার পদচারণা। সাহিত্য, দর্শন, সমাজনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, অর্থনীতি সকল বিষয়ে তাঁর মন ছিল যুক্তিবাদী। সমকালীন জটিল বিষয়ে তিনি তাঁর যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ দিয়ে যে নজির স্থাপন করে আমাদের জন্য রেখে গেছেন, সেই প্রবাহ এই সমাজে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবাহিত হতেই থাকবে।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ তার সাহিত্য ও দর্শন চর্চায় সমাজ ও ইতিহাসের চেতনা মিলিয়ে এ দেশে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন মহান মানবতাবাদী ছিলেন। এই কারণেই সকল গোড়ামী ও কুসংস্কারের উর্ধ্বে উঠে তিনি মানব কল্যাণ, যুক্তি ও বিজ্ঞানের পথে তাঁর চিন্তা নিবদ্ধ করেছিলেন। তাই তিনি ছিলেন সত্যের পক্ষে। যা সত্য তা যত কঠিন আর অগ্রহণযোগ্য হোক না কেন আহমদ শরীফ তার পক্ষে কথা বলেছেন অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে। সত্য আর ন্যায়ের পক্ষে এত বড় কণ্ঠ আর এত সাহস আমি আর কখনো এ দেশে পণ্ডিতদের মধ্যে দেখিনি– অন্তত আমার যাদের কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে তাদের মধ্যে দেখিনি। তিনি ছিলেন মানবের কল্যাণকামী এক দার্শনিক আর তাই স্বপ্ন দেখতেন শোষণহীন সমাজের। সত্য বলে যা বুঝেছেন তা মুক্ত কণ্ঠে বলে গিয়েছেন। তার ব্যক্তি চরিত্রের এই যে দৃঢ়তা, তার এই যে অসাধারণ নৈতিক চারিত্রিক শক্তি এটাই তো তাকে করেছে একজন অতুলনীয় মহান শিক্ষক। আমার শিক্ষক সম্বন্ধে কৈশোরে যে ধারণা জন্মেছিল অধ্যাপক আহমদ শরীফই তা পুরণ করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যারা তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র নই অথচ কম বেশি তাঁর সংস্পর্শে এসেছি তারা সকলেই এই সত্যবাদী দার্শনিকের দ্বারা ক্ষণিকের জন্য হলেও প্রভাবিত হয়েছি। তাঁর বাচনভঙ্গি বা প্রকাশ ভঙ্গিটাই ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। কিন্তু সবার উপরে তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত স্নেহময় মানুষ–যিনি যথার্থ অর্থেই একজন বাবা ছিলেন। আমরা যারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালের ছাত্র ছিলাম আমাদের গর্ব এটাই যে শরীফ স্যার নামে আমাদের একজন শিক্ষক ছিলেন যিনি ছিলেন চরিত্রবান, স্নেহপরায়ণ, কর্তব্যপরায়ণ এবং সবার উপরে ভয়হীন একজন শক্তিশালী মানুষ। ভবিষ্যৎ প্রজন্মে যারা মানুষ হবে তারা তাঁকে অবশ্যই তার লেখার মাধ্যমে জানতে পারবে। আমরা যারা তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছি, তাঁর কথা শুনেছি এবং আলোকিত হয়েছি তারা বিশ্বাস করি যে, আহমদ শরীফ নামে যে মানুষটি মাথা উঁচু করে সত্য কথা বলে গেছেন তিনি আমাদের মাঝে এখনও আছেন। এই দেশের সেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি যেভাবে সত্যের পক্ষে বলেছেন ও লড়েছেন আমরাও তা অনুসরণ করব। ব্যক্তি জীবনে অত্যন্ত সুন্দর চরিত্রের অধিকারী এই মানুষটির জীবন নানা দিক থেকে ছিল পরিপূর্ণ। তিনি সত্যের যে আলোকবর্তিকা জ্বেলে দিয়ে গেছেন তা চিরকাল আমাদের মাঝে জ্বলতে থাকবে। অধ্যাপক আহমদ শরীফ যে সত্যের সন্ধানে ছিলেন আমাদের শিশুদের সেই পক্ষে নিয়ে যেতে হবে। তা হলেই এই মহান ব্যক্তির আদর্শ চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে।

অনন্য মনীষী আহমদ শরীফ

মোনায়েম সরকার

ড. আহমদ শরীফ আমাদের বাঙালি সমাজ ও সাহিত্যে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেলেন আধুনিক বিশ্বে সর্বত্রই তা অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয়। তিনি তাঁর নিজস্ব চিন্তায়, মননে, জিজ্ঞাসায় অন্বেষায় এক অনন্যসাধারণ মানুষ হিসেবে আমাদের মাঝে ছিলেন। তাঁর ক্রমাগত সাধনা ছিল মানুষ হয়ে ওঠার সাধনা সুরুচি ও সুকৃতিতে। তিনি যাপন করেছেন সংস্কৃতিমান মানুষের জীবন। তাঁর পিতৃব্য আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের সুযোগ্য ঐতিহ্যগত উত্তরাধিকারিত্বের প্রমাণ রেখে আমাদের মধ্যযুগীয় সমাজ ও সাহিত্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর তিনি যেসব আধুনিক চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন তার প্রভাব ড. শরীফের জীবদ্দশাতেই এই সমাজকে আন্দোলিত করতে শুরু করেছিল।

উপমহাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ ড. শরীফ মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন নির্ভীক ও যুক্তিবাদী ছিলেন। কথায় কথায় আজকাল অনেকেই মুক্তমনের বলে দাবি করেন, কিন্তু ফলত দেখা যায় অন্যরূপ। তিনি ছিলেন কথায় এবং কর্মে সৎ একনিষ্ঠ। প্রচণ্ড দ্রোহী জীবন যাপন করেছেন তিনি, কিন্তু সে দ্রোহে কোনো ব্যক্তিস্বার্থ জড়িত ছিল না। মানবতাবাদী ড. শরীফ মৃত্যুর পরও তার প্রমাণ রেখেছেন। বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণার জন্য তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তিনি তাঁর মরদেহ দান করে গেছেন। তিনি জানতেন শরীর নশ্বর, এর ক্ষয় আছে। মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে তাঁর কর্ম। সাহিত্যে, ইতিহাস অন্বেষণে তাঁকে যেমন আমরা মনে রাখব তেমনি মেডিক্যাল কলেজকে তাঁর এ দান তাঁর কর্মকে অমর করে রাখবে।

তাঁর লেখনী নিজস্ব ঢং-এ স্বতন্ত্র। বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে তার লেখায়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর চিন্তাশীল প্রবন্ধ এবং সমালোচনা-সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে দিয়েছে ঐশ্বর্য। অধ্যাপক আহমদ শরীফ অসংখ্য গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : *বিচিত চিন্তা, চট্টগ্রামের ইতিহাস, সাহিত্য-সংস্কৃতি চিন্তা, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, কালের দর্পণে স্বদেশ, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য, বাংলা ভাষা সংস্কার আন্দোলন, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, বাঙালির চিন্তা-চেতনার বিবর্তন*

ধারা, বাংলার বিপ্লবী পটভূমি, সাম্প্রদায়িকতা ও সময়ের নানা কথা, বাঙলা, বাঙালি ও বাঙালিত্ব, শাস্ত্র সমাজ ও নারী মুক্তি, প্রগতির বাধা ও পন্থা, সময় সমাজ ও মানুষ, স্বদেশ চিন্তা, উজান স্রোতে কিছু আষাঢ়ে চিন্তা ইত্যাদি। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : *লাইলি মজনু, পুঁথি পরিচিতি, মুসলিম কবির পদসাহিত্য* ইত্যাদি।

তাঁর প্রগতিশীল চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য যাকে এক কথায় বলা যায় মানবতাবাদ, এ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকেই তা দৃশ্যমান হয়ে উঠছিল। পরিণতিতে আমাদের সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র, স্বৈরাচারী এরশাদ এবং সাম্প্রদায়িক বিএনপি সরকারের আমলে তাঁর সম্মানিত জীবন হিংসাত্মক প্রতিক্রিয়া দ্বারা হুমকির সম্মুখীন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেসব ঘটনার ইতিহাস সকলের জানা।

একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমি লক্ষ্য করেছি ১৯৯৮ সনের শেষের দিকে তাঁকে মোল্লাদের অভিযোগে মৌলবাদীদের মামলার পরিপ্রেক্ষিতে গোপালগঞ্জের আদালতে স্বশরীরে হাজিরা দিতে। আবার ১৯৯৯-এর প্রথমাংশে দেখেছি মৃত্যুর পর মানব কল্যাণে স্বেচ্ছায় তাঁর দেহদান, চক্ষুদান পর্ব ঢাকায় পালন করা হয়, তখন আওয়ামী লীগ প্রশাসন তাঁকে সম্মানের সঙ্গে সহায়তা করেছে। আমিও ব্যক্তিগতভাবে বাংলার এই কৃতি সন্তানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সান্ত্বনা লাভ করেছি। তিনি ছিলেন উন্নত জীবন যাপনের পথিকৃৎ। তাঁর স্বদেশ ও বহির্বিশ্বের সামগ্রিক কল্যাণকামিতা তাকে পরিণত করেছে উঁচু স্তরের মানুষে। পূর্বতন ঐতিহ্য সংস্কৃতি মূল্যবোধকে সমুজ্জ্বল রাখার পাশাপাশি এর বিনির্মাণেও তিনি রাখেন বলিষ্ঠ ভূমিকা। তাঁর চিন্তাবৃত্তি, বোধিবিশ্ব, কর্মশক্তি, তাঁর আচরণবিধি, জীবনবোধ সকল কিছুই মাঙ্গলিক ব্যঞ্জনার দিশা।

পারিবারিক

অধ্যাপক আহমদ শরীফ : তাঁর ব্যক্তিজীবন

রহিমা নেহাল

১৯৯৯ সনের ১৩ ফেব্রুয়ারি আমার শ্বশুর ড. আহমদ শরীফ তাঁর ৭৮তম জন্মবছর পেরিয়ে ১১ দিনের শুরুতে অর্থাৎ ২৪ ফেব্রুয়ারি ভোর ১.৪০ মিনিটে আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন। যখন তিনি আমাদের সবার মাঝে ছিলেন তখন তাঁর উপস্থিতি আমাদের সবাইকে প্রতিনিয়ত নাড়া দিত। বর্তমানে তিনি নেই, ভবিষ্যৎ-এ ফিরবেন না। কিন্তু তারপরেও তাঁর অনুপস্থিতি প্রায়ই আমাদের সবার অনুভূতিতে প্রকট হয়ে ওঠে। তাঁর সম্বন্ধে লিখতে বসে অজস্র ঘটনা, আনন্দ ও সুখের স্মৃতি মনে পড়ছে। প্রায় সাড়ে ১৯ বছর আগে তাঁর দ্বিতীয় পুত্রবধু হিসেবে তাঁর পরিবারে আমার আগমন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর অবর্তমানেও একই ছাদের নীচে পূর্বের মতন বাস করছি।

১৯৭৯ সনের ৫ অক্টোবরে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকার ৩৭/সি বিল্ডিং-এ নববধু হিসেবে আসি, তখন থেকেই শ্বশুর-শ্বাশুড়ী ও ভাশুর-দেবর সবাই মিলে ছিল এই সংসার। পরবর্তীতে তাঁর অপর দু'সন্তানের স্ত্রীরাসহ পর্যায়ক্রমে চার নাতি নিয়ে অদ্যাবধি একসাথে চলছে এই সংসারটি। এ লেখা লিখতে বসে, আব্বার সাথে প্রায় দীর্ঘ দু'যুগ বসবাসের সময়কে মূল্যায়ন করলে বলতে হয় যে, তিনি ছিলেন একজন স্বার্থক স্বামী, পিতা, শ্বশুর, দাদা এবং সর্বোপরি পরিবার ও স্বজনদের জন্য এক বিরাট বটবৃক্ষ। একই ছাদের নীচে তিন সন্তানের স্ত্রীদের ও নাতিদের নিয়ে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বাস করা—এ যুগে চিন্তা করা যায় না। শুধুমাত্র প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবার কারণে এই চারটি পরিবার সহাবস্থান করতে পেরেছে।

আব্বার প্রতিদিন অতিবাহিত হত অত্যন্ত নিয়মমাফিক। প্রতিদিন ভোর ৫টায় ১/২ গ্লাস পানি খেয়ে তিনি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে হাঁটতে যেতেন এবং ৬.১৫ মিনিট পর্যন্ত হাঁটতেন। ১৯৬৭ থেকেই তিনি বহুমূত্র রোগে ভুগছিলেন। প্রাতঃভ্রমণ থেকে ফিরে এসে তিনি চা-বিস্কুট খেতে খেতে বিবিসি শুনতেন। এর পরপরই বাংলাদেশ বেতার ও আকাশবাণী কোলকাতার বাঙলা সংবাদ শুনে স্নান করতে যেতেন। স্নান সেরে পড়ার টেবিলে বসতেন, হয় লিখতেন বা পড়তেন। সকাল ৮টার সময় দিল্লীর বাংলা সংবাদ শুনে ৮.১৫ মিনিট থেকে ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত কোলকাতা কেন্দ্রে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনতেন এবং এ সময়ের মধ্যে খবরের কাগজ ও নাস্তা তাঁর পড়ার টেবিলে আসত। সকাল

১০টার সময়ে তিনি পড়ার টেবিল থেকে উঠে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পৌনে ২টার মধ্যে ফিরে আসতেন, আকাশবাণীর ২টার বাঙলা সংবাদ শুনতে শুনতে দুপুরের খাওয়া সেরে নিতেন। আব্বা সারাদিনে শুধু একবারই খাওয়ার টেবিলে আসতেন সেটা হচ্ছে দুপুর বেলায় ঠিক ২টার সময়। অন্যসময় তাঁর খাওয়া তাঁর ঘরে পড়ার টেবিলে পাঠানো হত। যেহেতু তিনি একবার আসতেন, সেহেতু দুপুর বেলায় খাওয়ার টেবিলে একসাথে বসার জন্য সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। টেবিলে আব্বা, তাঁর সন্তানেরা ও আমরা তিন জা বসতাম, একসাথে সবাই খাওয়া ছাড়া ঐ সময়টাতে সমাজ, দেশ, রাজনীতি ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা হত। সকলের অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে তা প্রায় ৫০ মিনিট স্থায়ী হত। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হত। এই সময়টি আমরা সবাই উপভোগ করতাম এবং বর্তমানে সবাই ভীষণভাবে তাঁর অনুপস্থিতি অনুভব করি। খাওয়ার পর দুপুরে ঘুমাতেন যা নিয়মিত ছিল। অবশ্য সাধারণ কোনো সভা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কোনো সভা থাকলে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিয়ে গন্তব্যস্থলে যেতেন। ফিরে এসে বেলা থাকলে প্রশাসনিক ভবন ও কলা ভবনের মাঝখানে খোলা জায়গায় হাঁটতেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলে তিনি বৃটিশ কাউন্সিলের উত্তরপাশ সংলগ্ন ফুলার রোডের বিখ্যাত গুঁড়িতে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকদের সাথে দেশ-কাল সমাজ নিয়ে গল্প-গুজব করতেন। যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাইরে গুঁড়ি আড্ডা নামে বিখ্যাত ছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৭২ থেকে ১৯৮৪ সন পর্যন্ত গুঁড়ি আড্ডা চালু ছিল এবং তিনি যেহেতু আড্ডার মধ্যমনি ছিলেন সেহেতু ১৯৮৪ সনে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগ করার পর তাঁর অবর্তমানে ঐ গুঁড়িতে আর কখনও শিক্ষকদের আড্ডা জমেনি, সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে।

আবার তাঁর নিত্যদিনের নিয়মমাফিক জীবন-যাপনের কথায় ফিরে আসি। গুঁড়ি আড্ডা থেকে ফিরে এসে তিনি টিভিতে বাঙলা সংবাদ শুনতে শুনতে রাতের আহার করতেন। এর পরে রাত ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত বই পড়তেন বা লিখতেন বা পরীক্ষার খাতা দেখতেন, এ সময়ের মধ্যে প্রায় সময়ই বিভিন্নজন তাঁর সাথে দেখা করতে আসতেন। যাঁরা আসতেন তারা জানতেন এ সময়ই তাঁকে নিরিবিলি পাওয়া যাবে এবং নিজেদের উদ্দেশ্য সময় নিয়ে বলা যাবে। উল্লেখিত ১২ বছর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যেমন : বিভাগীয় সভাপতি, কলা অনুষদের ডীন, সিন্ডিকেট ও সিনেট সদস্যসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদের নির্বাচনী পর্ষদের সদস্য ছিলেন। অনেকেই আসতেন, সবাইকে চিনতাম না, তবে এঁদের মধ্যে ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ড. ওয়াকিল আহমেদ ও ড. এস. এম. লুৎফর রহমান অন্যতম। মনে পড়ে, ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান প্রফেসর হওয়ার আগে পর্যন্ত মাঝে মাঝে স্ত্রীসহ আসতেন, তারা উভয়ই আব্বার ছাত্র ছিলেন। বিশেষ করে ঈদের দিন রাতে এসে উভয়ই আব্বাকে পায়ে ধরে সালাম করতেন। কিন্তু আশ্চর্য ড. মনিরুজ্জামান প্রফেসর হওয়ার পর তাঁরা আর কোনোদিন আব্বার কাছে আসেননি। অতিথিদের সঙ্গে কথা বলে বা নিজে কাজ শেষ করার পর রাত ১১টার সময় তিনি ঘুমাতে যেতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকায় থাকাকালীন এই ছিল তাঁর নিত্যদিনের জীবন যাপন। পরবর্তীতে যখন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছেড়ে ১৯৮৪ সনের জুলাই মাসে নিউ ইস্কাটন পাসপোর্ট অফিসের পেছনে ১২৫ নম্বরের বাসায় আসি তখন তাঁর নিত্যদিনের জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে। পূর্বের মতো ভোরে হাঁটতে যেতেন না, তবে সকাল সাড়ে ৬টায় বিবিসি এরপরে ঢাকার বাঙলা সংবাদ ও আকাশবাণীর সংবাদ শুনতেন। পরে স্নান সেরে নাস্তা করে তিনি পড়তেন বা লিখতেন কিংবা কেউ দেখা করতে আসলে, বসার ঘরে যেতেন। তবে কেউ না আসলে, তিনি সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ঘুমাতেন-এ ধারা তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বজায় ছিল। ১টার সময় ঘুম থেকে উঠে তিনি ক্যাসেট প্লেয়ারে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনতেন এবং সেই সাথে পৌত্র নাফিস করিম কান্তকে সঙ্গ দিতেন। দুপুর ২টার সময় তিনি খেয়ে পুনরায় ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে চা-বিস্কুট খেয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে হাঁটতে যেতেন, দু'তিনবার ঘুরে ঘণ্টা খানেক উদ্যানের গোল চত্বরে হাঁটার সাথীদের নিয়ে বসতেন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদিসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হত। শুনেছি সে আড্ডাতে সরকারী অফিসের কর্মকর্তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যাপক, ছাত্র প্রমুখ প্রায় ৩০/৪০ জন উপস্থিত থাকত। রাত ৮টার মধ্যে ফিরে এসে কাপড় বদলিয়ে এককাপ চা ও বিস্কুট বা পেঁয়াজু খেয়ে টেলিভিশন দেখতেন। বয়স একটি বড় বাঁধা, করতে চাইলেই সব করা যায় না, আব্বার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। রাত্রিতে তিনি আর পড়াশুনা করতেন না। টেলিভিশন দেখতেন এবং রাত সাড়ে ১০টায় বিবিসি শুনে ঘুমিয়ে পড়তেন।

১৯৮৮ সনে মাঝামাঝিতে আমরা নিউ ইস্কাটন বাসা ছেড়ে ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার সড়ক নম্বর ১, বাড়ি নম্বর ২৫/বি-তে যখন আসলাম, তখন আব্বার মাঝে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম, নিউ ইস্কাটন-এর বাসার তুলনায় তিনি যেন একটু বেশি সপ্রতিভ ছিলেন। কারণ হয়ত এই যে বাসাটি বিশ্ববিদ্যালয় ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের কাছে এবং সর্বোপরি শহরের কেন্দ্রস্থলে, ফলে তাঁর অনুরাগীদের তাঁর কাছে যাতায়াতের ক্ষেত্রে তেমন কোনো পরিবর্তন নিউ ইস্কাটনের তুলনায় ঘটেনি; তবে ধানমন্ডির বাসায় প্রতি শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১.৩০ মিনিট পর্যন্ত সাপ্তাহিক আড্ডা হত। এই সাপ্তাহিক আড্ডাতে সাধারণত যারা সংস্কারমুক্ত তাঁরা সমবেত হতেন, সংখ্যায় ১৮ থেকে ২৪ জন পর্যন্ত উপস্থিত থাকতেন। আজ তিনি নেই, তবুও তাঁর অনুরাগীগণ অদ্যাবধি প্রতি শুক্রবার তাঁর বাড়িতে এসে মিলিত হচ্ছেন, তবে পূর্বের ন্যায় উপস্থিতি তেমন না হলেও ১৫ থেকে ২০ জন হয়ে থাকে। তিনি যে চেয়ারে বসতেন, সে চেয়ারটিতে এখনো কেউ বসেন না, উপরন্তু কেউ না কেউ প্রতি শুক্রবারে তাঁর চেয়ারে ফুল রেখে থাকে।

আব্বার মনোবল অত্যন্ত দৃঢ় ছিল, কোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতি বা ভয়-ভীতি তাঁকে দমাতে পারেনি। মনে পড়ে ১৯৯২ সনের ২১ অক্টোবরে জাতীয় যাদুঘরে 'স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘ' কর্তৃক আয়োজিত 'আমাদের সংস্কৃতির উপর সাম্প্রতিক হামলা' বিষয়ের উপর সেমিনারে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি নাস্তিক্যবাদের পক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন বলে পরবর্তীতে তিনি মৌলবাদীদের দ্বারা মুরতাদ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন এবং দেশের প্রায় বড় শহরগুলোতে মৌলবাদীরা বিক্ষোভ মিছিল করে আব্বার ফাঁসি দাবি

করেছিল। এ কাজ করেই মৌলবাদী গোষ্ঠী থেমে থাকেনি, তারা সরকারের কাছে ব্লাসফেমি আইন বলবৎ করার দাবি জানিয়েছিল। এর পরেও ধর্মান্ধ মৌলবাদী গোষ্ঠী তাঁর বাসায় বোমা নিক্ষেপ করেছিল, যদিও কেউ হতাহত হয়নি। তবে আশ্চর্যজনক হলেও সামান্য ব্যতিক্রম ব্যতীত সত্যি—বোমা নিক্ষেপের পর তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহকর্মী, বামধারার রাজনৈতিক দলগুলো ও পরিচিত-জনদের কাছ থেকে তেমন কোনো সহানুভূতি পাওয়া যায়নি বা বোমা হামলার নিন্দাজ্ঞাপন করে তেমন কোনো সভা অনুষ্ঠিত হয়নি বা পত্রিকায় বিবৃতি আসেনি।

আব্বার মন ছিল বিরাট। আর্থিকভাবে অসচ্ছল, পরিচিত, অপরিচিত বা আত্মীয়-স্বজনদের তিনি সাধ্য মতন সাহায্য করতেন। বিশেষ করে মানুষের বিপদে তিনি খুব বিচলিত হয়ে উঠতেন। কিভাবে তারা সে সব থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে তা নিয়ে অধীর হতেন। তাই তাঁর সমগ্র জীবনের সব লেখনীর মধ্যে গণ-মানুষের আর্থ-সামাজিক মুক্তির কথাই বারংবার উদ্ধৃত হয়েছে। এক কথায় তিনি ছিলেন একজন অসামান্য মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব।

তিনি চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণে মন মানসিকতায় ছিলেন একজন আধুনিক ও সৌখিন ব্যক্তি। বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় থাকার সময় তিনি বাসায় হুকো টানতেন এবং বাসার বাইরে সিগারেট খেতেন; অবশ্য মৃত্যুর ১০ বছর আগে সিগারেট বা তামাক খাওয়া বর্জন করেছিলেন। ঘরে সব সময় পায়জামা-পাঞ্জাবি পরতেন কিন্তু ঘরের বাইরে স্যুট বা প্যান্ট-সার্ট পরতেন এবং সন্তানদেরও তিনি ঘরে পায়জামা পরানোর অভ্যাস করিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, তিনি বা তাঁর সন্তানেরা কেউ ধর্ম-কর্ম না করলেও বাসায় আমার শ্বাশুড়ী, আমরা তিন জা এবং বাড়ীর কাজের সহযোগীরা রোজা, নামাজ প্রতি বছরই করে আসছিলাম। কিন্তু তিনি বা তার সন্তানেরা কেউ কোনোদিন আমাদের এ ব্যাপারে বাঁধা দেননি বা কোনোরূপ বিরূপ মন্তব্য করেননি। আব্বার দর্শন ছিল, কারো ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করা এবং যার যার বিশ্বাস মতন চলা। তবে তিনি বলতেন সব কিছুতেই যৌক্তিকতা থাকা আবশ্যক।

আমার বিবাহিত জীবনের সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে এই যে, গত সাড়ে ১৯ বছরে তাঁকে কোনোদিন সংসারের জন্য, নিজের জন্য বা অন্যকারোর জন্য কোনোকিছু কেনাকাটা বা বাজারে যেতে দেখিনি এমনকি ঈদের কেনাকাটাও নয়। তাঁর কাপড়-চোপড় বা গেঞ্জি ইত্যাদি শ্বাশুড়ী করতেন এবং সংসারের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমরা পালাক্রমে সংগ্রহ করতাম। এছাড়া তিনি শোক বা উৎসব ছাড়া সাধারণত আত্মীয়-স্বজন বা অনাত্মীয়ের বাসায় যেতেন না। এমনকি আমার জ্ঞাতসারে যতদূর মনে পড়ে তিনি কখনো সরকারী বা কোনো দূতাবাসের অনুষ্ঠানে যান নি বা যেতেন না। তেমনি বর্তমান পৃথিবীর ভূ-স্বর্গ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেও কয়েকবার আমন্ত্রণ পেয়েও তিনি না যাওয়ার পক্ষে অবিচল ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর যুক্তি ছিল যাদের সমালোচনা করি, অপছন্দ করি, তাদের কোনো অনুষ্ঠানে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে নিজের বিবেকের সাথে, আদর্শের সাথে এবং দেশের গণমানুষের সাথে প্রতারণা করার শামিল।

তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলা যায়, তার জন্যে বড় পরিসর প্রয়োজন। একটি কথা বলে শেষ করব। লেখার শুরুতেই বলেছিলাম আমরা একান্নবর্তী পরিবার অর্থাৎ তিনি

ও শ্বাশুড়ী ও তাঁদের তিন সন্তান, তিন পুত্রবধু ও চার নাতিসহ সবাই তাঁর সংসারে ছিলাম। সংসারের সমস্ত ব্যয়ভার তিনিই বহন করতেন অর্থাৎ খোরাকীসহ টেলিফোন, বিদ্যুৎ, পানি ইত্যাদি সবকিছুর জন্য তিনি ব্যয় করতেন। একই পাকে আমরা সবাই খেতাম, এ ক্ষেত্রে তিনি কখনো কোনো সন্তান থেকে একটি পয়সাও গ্রহণ করেননি। অনেক আত্মীয়-স্বজন আমার শ্বাশুড়ীর মাধ্যমে পরামর্শ দিয়েছিলেন, সন্তানদের কাছ থেকে বেশি না হলেও নাম মাত্র খোরাকীর জন্য টাকা নেয়া, কিন্তু তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কখনো এ বিষয়ে সন্তানদের কাছ থেকে একটি পয়সাও নেননি। উপরন্তু তাঁর যুক্তি ছিল যে, সন্তানদের কাছ থেকে খোরাকী বাবদ কোনো আর্থিক সাহায্য নিলে তখন সন্তানদের এবং তাদের স্ত্রীদের সংসারের সবকিছু এবং বিশেষ করে প্রতিদিনের খাওয়ার ব্যাপারে দাবি থেকে যাবে; যার ফলস্বরূপ একত্রে থাকা-খাওয়া কোনো অবস্থাতেই সম্ভব হবেনা। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলতেন, খাওয়ার সময়ে কোনো সন্তানের স্ত্রী যদি মাছের বা মুরগীর ভালো অংশটি না পায় তখন স্বভাবতই বলবে যে, আমার স্বামী সংসারে এত টাকা দেয়, আমরা কেন মাছ বা মুরগীর ঐ অংশ পাব না। এই জাতীয় মনোবৃত্তি থেকে পারিবারিক ভাঙ্গন দেখা দিতে পারে। তাই কোনো ভাঙ্গন পরিহার করার জন্য আর্থিক সহায়তা নেননি। তিনি মনে করতেন যে, কোনো রকমের আর্থিক সহায়তা না নিলে কোনো দাবি উত্থাপিত হবে না এবং দাবি করার যৌক্তিকতাও থাকবে না। তার সেই যুক্তি ও দর্শনের কারণে অদ্যাবধি তাঁর সব সন্তানেরা তাঁদের পরিবারসহ পূর্বের ন্যায় আছে। অতিরঞ্জিত না করেই বলছি যারা আমাদের এই যৌথ পরিবারের কথা শোনেন সবাই বিস্ময় প্রকাশ করেন কিভাবে প্রায় ২০ বছর ধরে এখনো একত্রে আছি। বলতে দ্বিধা নেই যে, তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব, আত্মসম্মানবোধ, মহান উদারতা, দূরদর্শিতা, সহনশীলতা ও যৌক্তিকতার দ্বারা আমাদের সকলকে একই ছাদের নীচে এবং একই পাকে খাওয়াতে এবং রাখতে পেরেছিলেন; নয়তো সহাবস্থান অসম্ভব ছিল।

স্মৃতির মণিমুক্তা

সেলিনা চৌধুরী

হাতে কলম নিয়েছি সত্যি। যার কথা লিখতে যাব তার সম্পর্কে বলা কঠিন। তবু কিছু লিখতে মন চাইছে।

এমন মানুষ আছেন, হঠাৎ চলে গেলে এক আঁধার ছড়িয়ে যায় চারদিকে। অথচ যতদিন বেঁচে থাকেন, হাটেন, চলেন, গল্প গুজব, হাসি ঠাট্টা করেন চারদিক আলোয় ভরে রাখেন। এমন মানুষ চলে গেলে সবকিছু বিষণ্ন হয়ে আসে। শরীফ দুলাভাই তেমনই একজন ছিলেন আমার কাছে।

পরিপূর্ণ বয়সেই শরীফ দুলাভাই সবাইকে ছেড়ে চলে গেছেন। আমরা হারিয়েছি স্বজন-ব্যকুল আপনজনকে। আর দেশ হারিয়েছে একজন জ্ঞানী, আদর্শ শিক্ষক ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বকে।

আমি তাঁর কাছে কিছুদিন পড়েছিলাম বাঙলা ব্যাকরণ। আমাকে যেভাবে পড়িয়েছেন আজও সব আমার মনে হয়। অদ্ভুতভাবে বুঝাতে পারতেন। সব পরিষ্কার হয়ে উঠত। টুকরো টুকরো অনেক স্মৃতিইত মনে হচ্ছে। কোনটা ছেড়ে কোনটা লিখি!

আমার বিয়ের পর তিনি চৌধুরী সাহেবের হাতে সপে দিয়ে যেসব উপদেশ আমাদের দুজনকে দিয়েছিলেন আমি তা পালন করতে পেরেছি বলে আমার বিশ্বাস। চৌধুরী সাহেবকে (আমার স্বামী) তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ঢাকায় এলে তাঁর ভাইয়ের বাসায় উঠলে তিনি সেখান থেকে নিয়ে আসতেন। শরীফ দুলাভাই আমাদের এত স্নেহ করতেন, আমি ঢাকায় এলে মেজ আপার বাসায় না উঠে অন্য কোথায়ও উঠি তা ভাবতেই পারতেন না।

নতুন কোনো বই তার কাছে থাকলে দিয়ে বলতেন এটা পড়। ঘরে অজস্র বই। আমি আলমারির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি তাঁর বইগুলো। এইসব এখন কে পড়বে? দুলাভাই যে আমাদের মাঝে নেই; তা এখনও ভাবতে পারি না। মনে হয় দোতলা গেলে দেখব তিনি তার লেখার টেবিলে বসে লিখছেন। দেখার সঙ্গে সঙ্গে একটা স্মিত হাসি দিয়ে বলবেন : কি কোনো কথা আছে?

ভাবতে কষ্ট হয় আর কোনো দিন কোথাও দুলাভাইকে দেখতে পাব না। তার কাছে কোনোদিন পরামর্শের জন্য আর যাব না। এমন মুরব্বি হারানোর ব্যথা তো বোঝানো যায় না।

আহমদ শরীফ স্মরণে

আবু রশীদ মাহমুদ

৭ নভেম্বর, ১৯৪৭ সনে আমার মেজ বোন সালেহা মাহমুদের সঙ্গে অধ্যাপক আহমদ শরীফের বিয়ে হয়। আমাদের মা তখন বেঁচে ছিলেন। আমরা যখন কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে এলাম, তার কয়েক মাস পর রেডিও অফিসে চাকরি নিয়ে শরীফ ঢাকায় এল। মা সালেহাকে খুব স্নেহ করতেন। তাই ওদের আলাদা বাসা নিতে দেননি। সেই থেকে শরীফের সঙ্গে আমি আছি।

শরীফ মার খুব প্রিয় জামাই ছিল। মা তাকে খুব স্নেহ করতেন। শরীফও আমার মায়ের খুব সেবা করেছে। বাইরে থেকে দেখলে শরীফকে খুব দৃঢ় মনে হত। তাঁর বলার ভঙ্গিটাই ছিল সে রকম। কিন্তু ও ছিল খুব স্নেহময় একটি মানুষ। অসহায় মানুষের জন্য ছিল তার ভাবনা। তাদের কষ্ট তাকে উতলা করে তুলত। কোনো বৃদ্ধ লোককে ইঁট ভাঙতে দেখলে শরীফ বিচলিত হয়ে পড়ত। মানুষের কল্যাণ ছিল তাঁর চিন্তা, আর শোষণহীন সমাজের কথাই সে ভাবত।

শরীফ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লিখেছে। তার লেখার অনুপ্রেরণা দিয়েছে ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সব কিছু করেছে সালেহা। সালেহা সংসারের সব ভার নিয়েছিল বলে শরীফ নিশ্চিন্ত ছিল এবং শুধু মাত্র লেখা পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পেরেছিল। পারিবারিক জীবনে শরীফ কোনো কিছুর মধ্যেই থাকত না। সব কিছুর ভার নিয়েছিল সালেহা।

শরীফ তার মত প্রকাশ করতে কখনও ভয় বা তোয়াক্কা করেনি। সত্যি কথা বলতে দ্বিধা করেনি। তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তাই তাকে একজন অতুলনীয় মহান মানুষে পরিণত করেছে। সত্য আর ন্যায়ের পক্ষে বলার লোক আজকাল তেমন দেখা যায় না।

শরীফ নেই। তার লেখার টেবিল আর বসার চেয়ারটা খালি দেখলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। তীব্রভাবে তার অভাব অনুভব করি। মাঝে মাঝে মনে হয় কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গেছে। আবার একটু পরেই ফিরে এসে বসবে তার চেয়ারে। আর কলম হাতে নিয়ে শুরু করবে লিখতে। মন মানতে চায় না যে তার লেখনি থেমে গেছে চিরতরে।

সালেহার উৎসাহ যত্নে তার সাহিত্য কর্ম ফুলে ফলে পূর্ণতা লাভ করে। শরীফের সাফল্যে সমসাময়িক সাহিত্যিকগণ ঈর্ষান্বিত হয়। কিন্তু সে তার কাজ চালিয়ে যায়। এখানে তার কর্মফলের জন্য সকলের প্রশংসা ও সম্মান অর্জন করে। ঘরের পরিবেশও

এসব ব্যাপারে তার অনুকূলে ছিল। সে অনেক রকমের অনেক পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা করেছে। মৃত্যুর দু'দিন পূর্বেও সে অধ্যয়ন ও লেখার কাজে ব্যস্ত ছিল। তার তিনপুত্র প্রত্যেকেই উচ্চশিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত। ঢাকা ও তার বাইরে সে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনন্য ছিল। দুই বাঙলাতেই সে অনন্য পণ্ডিত রূপে স্বীকৃত ছিল। মৃত্যুর দু'দিন আগেও সে তার সব কর্মে স্বাভাবিক ছিল। তবু মানুষ মরণশীল। শরীফ বিশেষ কোনো রোগে শয্যাশায়ী ছিল না। সে চলে গেল সব কিছু রেখে, সকলের সামনে। তার অসংখ্য লিখিত পুস্তক ও গুণগ্রাহীদের মধ্যে সে অমর হয়ে থাকবে। আমরা দেশবাসীরা সকলে তাঁর অমরত্ব কামনা করি।

আমার স্মৃতিতে বাবার জন্মদিন

ইসমত আরা চৌধুরী কাজল

বাবার জন্মদিন পালন প্রথম প্রচলন করেন কলিকাতার নাট্যকার কবি মনোরঞ্জন বিশ্বাস। ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮ সালে। বাবার আপত্তি সত্ত্বেও তিনি ঘরোয়াভাবে জন্মদিনের উৎসব করেন। তাঁর উদ্যোগেই ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, বাবাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে। এর পর বেশ কয়েক বৎসর মনোরঞ্জন বিশ্বাস জন্মদিনের কার্ড তৈরি করে পাঠাতেন। বাবাকে ভাই বলে সম্বোধন করতেন তিনি। তারপর থেকে প্রতি বছর ঘরোয়াভাবে বাবার জন্মদিন পালন করতাম আমরা। বাসায় সামান্য কিছু নাস্তার ব্যবস্থা করে রাখতাম। যারা বাবাকে ভালবাসেন, তাদের মধ্যে যাদের মনে থাকতো বাবার জন্মদিনের কথা, তারা কেউ ফুল নিয়ে, কেউ নিজের লেখা বই নিয়ে, কেউ নিজেদের পছন্দমতো উপহার নিয়ে বাবাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে যেতেন। সারাদিন বাসায় একটা উৎসব ভাব থাকতো। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাবার সঙ্গে যারা হাঁটতেন, তাঁরা সবাই দল বেঁধে আসতেন, সন্ধ্যায়। বাবার শুক্রবারের আড্ডার সুধীজনেরা আসতেন, আসতেন আরও অনেকে। যাদের কাছে বাবা ছিলেন তাঁদের প্রিয়জন তাঁরা নিজেদের উদ্যোগে নিজেদের মতো করে বাবার জন্মদিন পালন করতেন। বাবা তাঁর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে কোনো প্রকার প্রচারের বিরোধিতা করতেন। বাবাকে কেন্দ্র করে কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন হলে বাবা খুই অস্বস্তি বোধ করতেন। যেমন বাবা-মার ৫০তম বিবাহ বার্ষিকী তাঁর নাতিরা আয়োজন করতে চাইলে বাবা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপত্তি জানান এই অনুষ্ঠান না করার জন্য।

১৯৯৬ সালে ৭৬তম জন্মদিনে দৈনিক জনকণ্ঠ এটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। লিখেছিলেন অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, বশীর আলহেলাল, ড. প্রথমা রায় মন্ডল এবং আরও কয়েকজন। ১৯৯৬ সালের জন্মদিনে বাবা ছিলেন ডায়াবেটিস হাসপাতালে ভর্তি, চোখের ক্যাটারেক অপারেশনের জন্য। সারাদিন সবাই এসেছেন হাসপাতালে। সেই বছর বাবার জন্মদিনের আমেজটা ছিল অন্য রকম।

১৯৯৭ সালে ৭৭তম জন্মদিন বাবার শুক্রবারের আড্ডার সুধীজনেরা খুব ঘটা করে পালন করেন।। পরিবারের পক্ষ থেকে আমরাও সহযোগিতা করি। পত্র-পত্রিকায় তাঁর জন্মদিন পালনের সংবাদও প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ জন্মদিন উৎসবে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ বক্তৃতা দেন। অনেক সুধীজন উপস্থিত ছিলেন সেদিন। আবু ইউসুফ ও মুস্তাফা মজিদ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন *আহমদ শরীফ : আমাদের অহঙ্কার* শীর্ষক স্মরণিকা।

জন্মদিন সম্পর্কে বাবা মজা করে বলতেন, জন্মদিন কখনো-আনন্দ উৎসব হতে পারে না। বিশেষ করে বয়স্ক মানুষের জন্য। কেননা, মানুষের একটা করে জন্মদিন পার করার অর্থ হচ্ছে মৃত্যুর কাছাকাছি এক বৎসর এগিয়ে যাওয়া।

বাবার ১৯৯৯ সালের ৭৯তম জন্মদিনে কি কারণে জানি না, বাবা সকালের দিকে বিমর্ষ ছিলেন। জন্মদিনের আগের রাতে অর্থাৎ ১২ই ফেব্রুয়ারি রাতে আমি মিষ্টি কিনে নিয়ে আসি। বাবা আমাকে খুব বকা দিলেন। কেন এত মিষ্ঠি কিনেছো? কে আসবে? কার মনে আছে আমার কথা? যত মানুষ জন্মায় সবারই একটা জন্মদিন থাকে। জন্মদিন নিয়ে উৎসব করার কি আছে?—অবশ্য শেষ পর্যন্ত অনেক লোক এসেছিলেন সেদিন।

বাবার ৭৯তম জন্মদিনে হাসান ফকরী একটি সুন্দর গান রচনা করেন। হাসান ফকরী সেই গানটি দুইবার গাইলেন সেদিন। আহমদ ছফা, হাসান ফকরী আরো আরো অনেকে বললেন, "স্যার আমরা আগামী বছর অর্থাৎ ২০০০ সালে আপনার ৮০তম জন্ম উৎসব অনেক বড় করে উদযাপন করবো।" বাবা মজা করে বললেন, "আমি থাকবো না, তোমরা আমার ৮০তম জন্ম উৎসব ধুমধামের সঙ্গেই পালন করত পারবে। আজকাল তো মৃত ব্যক্তির জন্ম উৎসব পালন করা ফ্যাশন।"

বাবা রসিকতা করে আমাকে বলতেন, "হযরত মোহাম্মদ, হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী এবং আরও অনেকের মত আমারও জন্ম মৃত্যু একই দিনে হতে পারে।" বাবার রসিকতা সত্যি হয় নাই বটে তবে জন্মদিনের মাত্র এগার দিন পরে বাবা চলে গেলেন।

১৯৯৯ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি দুপুর বেলার কথা খুব বেশি মনে পড়ছে। আমরা পরিবারের সবাই একসঙ্গে বসে বাবার প্রিয় গলদা চিংড়ি আর কই মাছ দিয়ে ভাত খাই। বাবা তৃপ্তি করে খেলেন বটে কিন্তু বার বার বললেন, "কেন এত পয়সা নষ্ট করলে এই দুর্দিনে।"

প্রথমা দিদি প্রতি বছর বাবার জন্মদিনে নতুন পাঞ্জাবি পাঠাতেন। রঞ্জনা আপা সবার আগে সকাল বেলা একগাদা ফুল নিয়ে আসতেন।

২০০০ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি আর সে সব কিছুই হবে না। বাবা আর সাদা ইস্ত্রি করা পাঞ্জাবি পায়জামা পরে ড্রয়িং রুমে বসবেন না। অনর্গল কথা বলবেন না। হাসি তামাসা করবেন না। অতিথিকে চা দিতে বলবেন না।

কবিতা

অন্য একজন

সাযযাদ কাদির

[শরীফ স্যারকে নিবেদিত]

আমার নামে একটা লোক আছে শহরে ।
আমার বয়সী ওই লোকটা দেখতেও আমার মতো।
যে সব জামাকাপড় সে পরে
সেগুলো আমার এই প্যান্ট-শার্টগুলোরই মতো।
তার হাতেও ঘড়ি নেই, তবে চশমা আছে
দূরকে দেখার জন্য –
ঠিক আমারটার মতোই।

মাঝে-মধ্যে নানা খবর আসে লোকটা সম্পর্কে।
বেশির ভাগই উড়ো খবর।
তবে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে দেখলে
এটুকু বোঝা যায় :
লোকটার মধ্যে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি আছে।
সোজা পথে সে চলেই না,
ক্ষতি স্বীকারে প্রস্তুত থাকে সবসময়
অন্যরকম হতে চায় সে।
তাই তো সকল রকম সুযোগের সামনে দাঁড়িয়ে
সে থাকে অবিচল –
না হয় নতজানু, না করে মাথা নিচু।
কখনও-কখনও মনে হয়
লোকটাকে আমি চিনি,
কোথাও দেখেছি তাকে কোনও একদিন।
শহরের শেষ প্রান্তের শেষ গলিটির শেষে
অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল কে একজন

– ওই অপেক্ষমাণ মানুষটিই
হয়তো ছিল সে।
মনে হয়েছিল সে।
মনে হয়েছিল, শেষ সীমা
ছাড়িয়ে লোকটা কোথাও যেতে চায়।

এক কণা আলো দাও তোমার হৃদয়ের

নূরজাহান

আজ এসেছি তোমার কাছে—একটাই চাওয়া আমাদের।
চিরতরুণ, ওগো অরুণ, এককণা আলো দাও তোমার হৃদয়ের ॥

সৃষ্টিশীল ফাগুনের আগুনে রাঙিয়েছিলে মন,
সেই কবে কখন
আজ দেখি তার আঁচে স্বৈরাচারী-ধর্মবাজ-অজ্ঞানের
ত্রাসে কাঁপে মন
কাঁপনে সেই থরথর কাঁপুক বাংলাদেশ, ওদের মূলোচ্ছেদের ॥

এসময় জয়মালা দেয়নি তো মন ও মননের
তোমার অবদানের
যুগ থেকে যুগে যুগে বয়ে যাবে জানি জানি স্রোতস্বিনী
কীর্তি মহতের
এ সময়কে কেউ কখনো করবে না ক্ষমা আগামী প্রজন্মের ॥

শরীফনামা

শামসুল ইসলাম

জীবন প্রচণ্ড বস্তু অগ্নির সঙ্কাশ
মেকি দ্রব্য জ্বলে পুড়ে হয় ছত্রাখান
কেবল মনে ও প্রাণে থাকে অধিবাস
পরম মন্ত্রগুরুর কীর্তি অফুরান।

কিছু-বা হৃদয় থাকে পরশ পাথর
যার সংস্পর্শে লোহা সোনা হয়ে যায়
মাঝে মধ্যে। সে প্রকার গুণের আকর
দেখেছি একদা কিন্তু পাইনি ছোঁয়ায়।

বাংলার সীমানা

সামছুজ্জামান মিলন

(অধ্যাপক আহমদ শরীফকে উৎসর্গকৃত এবং ১৯৬১ সালের ১৯ মে আসামের বরাক উপত্যকায় ১২ জন ভাষা শহীদ স্মরণে)

বাংলার অঙ্গ
পশ্চিম বঙ্গ,
আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়
পদতলে তার
বঙ্গোপসাগর
শিয়রে বিশাল হিমালয়।

রেডক্লিফ রোয়েদাদ-ম্যাকমোহন লাইন
ব্রিটিশ বেনিয়ার ষড়যন্ত্র
বঙ্গভঙ্গের আইন!

হিন্দু'গ হিন্দুস্তান
মুসলমানের পাকিস্তান
কইয়া দিল খ্রিস্টান।
মাউন্টব্যাটনের চালাকি
হিন্দি-উর্দুর মোনাফেকি
সাম্প্রদায়িক সাপের ছোবল
বাংলা হলো ভাগের কবল!

স্বাধীন স্বপ্ন মুক্ত চিন্তা
লাখো শহীদের জীবন দান
গড়েছে সৌধ প্রগতির সিঁড়ি
দেবে বাংলার সমাজের মুক্তি
আর সীমানার সমাধান।

আহমদ শরীফ শ্রদ্ধাস্পদেষু

কামাল বারি

পাঁজরের ভেতর নিঃশব্দে জখম
জখম জখম রক্ত হোলি খেলা চলে
অথচ যৌবনে সংক্রান্তি জাঁকিয়ে বসে
গনগনে আগুন লেলিহান করে নীরবে।
চুল্লির তীব্র তামাটে দাগ পুষে রাখি।

দ্রোহে ফুঁসে ওঠার এ বেলায়
বেলেল্লা নারীর মতো, পণ্যেরা আহ্বান করে
তবু সেই বর্ণমালার বাঁকেই আমি কাম চুর চুর
টান টান তুলে রাখি দেহ।

যাঁর উত্তরাধিকার প্রকাশ করি সগৌরবে;
শব্দ সমাহারের মসীবীর গড়ে
আপন নির্যাসে পূর্বপুরুষ :
এ দেহ কান্তির মালিকানা যাঁর।

মৃত্যুময় পৃথিবীকে ফুলে-ফলে ভরপুর করে দেয় :
অনিবার্য যন্ত্রণার-এ ভূমিতেও স্বর্গ গড়ে–
মৃত্যুর কফিন যেন সুন্দরতম শকট :
জ্যোতির্ময় অভিযাত্রা!

সতীর্থ ছুটে এসেছে মুষ্টিমেয় ক'জনা
বাকিরা বিবশ রক্তের ওমে এখনও বেহুঁশ!

যারা শুভাগত তাদের মধ্যেও যাদুর দণ্ড কেউ কেউ
বিভ্রান্তির সন্তানে সন্তপ্ত শম্বুক সময়ে
আদিম উদ্যমে বার বার ফিরে চায় পিছু
জটিল পাঠের সভ্যগণ শিক্ষা না কি শিখে শিখে
জটায়ুর নীচে তপে মশগুল-
পাকা রং হৃদয়ে আঁকে
অথচ, জীবনের বহতায় সারল্যটুকু খুঁজে পায় না;
বিহঙ্গীর ডানার পতপত আওয়াজ শুনে রোমাঞ্চিত
ছুঁতে পারে না শব্দ মোহিনী।

রঙচটা প্রচ্ছদের যেখানে যেখানে তীব্রতা :
হরেক রঙ গ'লে নির্ভয়ে সজীব হতে চায় যেখানে
মেখে নেই তুলিদণ্ডে
অবিরাম তুলি বুলোতে থাকি ক্যানভাসে, পোস্টারে
প্লাকার্ড, ফেস্টুন, ব্যানারের তরতাজা জমিনে।

মেদুল মিনমিনে চোখ যুধিষ্ঠির সময়ে
হাড়ের ঝনৎকার শুনি চারদিকে
সর্বত্র অগণন জোড়া জোড়া সচকিত চোখ
নির্যাতিত কান, দুর্বিনীত বাণী মুখে
নিশ্চিত জেগে ওঠে ঐ সময় সারস!

পাঁজরের ভেতর বিকশিত অনন্য সৌরভ
দুঃসাহসী বায়ু পৌঁছে যাও সুবাস বিভাজনে ॥

দ্রোহের জীবনপাখি

[আহমদ শরীফের স্মৃতির উদ্দেশে]

সুনীল শীল

আকাশজুড়ে নীলের কাছে
ঝোড়ো হওয়া মেঘের কাছে
প্রবল ডানায় উড়ে যাওয়া
ওই মুক্তপালক পাখি।

জীবনজুড়ে দুঃখের কাছে
শস্যক্ষেত আর নদীর কাছে
অন্ধকারে আলোকিত
অগ্নিময় এক আঁখি।

ডাইনে বাঁয়ে লোভি অনেক
ফ্যাসিবাদের বুলেট অনেক
চাবুক মারা শাসক অনেক
তবু দ্রোহের জীবনপাখি

প্রবল ডানায় আপন মনে
মধ্যযুগের রৌদ্রকিরণ
আহরণে সূর্যরেখা রঙ
মানবতার জয়পতাকা আঁখি।

অনেক দিনের ব্যর্থ মানুষ
ধর্মভয় ও লোভের কাছে
অলৌকিক সে প্রভুর কাছে
আজও বন্দি আছে দেখি।

নিরীশ্বরের অমর বীজে
ব্যর্থ করে মৃত্যুবান
প্রবল প্রতাপ মানুষ তুমি
ওড়ো দ্রোহের জীবনপাখি।

শরীফ বা লা-শরীফ

মুহম্মদ নূরুল হুদা

সমস্ত শরীফকে তুমি করতে চেয়েছিলে লা-শরীফ;
রোসাঙ্গ রাজের পৃষ্ঠপোষকতায় যা কিছু সঞ্চিত ছিল,
তুমি তার সবটাতো পাওনি সাহিত্যবিশারদের কাছে,
পেয়েছিলে কিছু কীটদংশিত পদ্যজ্ঞান,
তুমি লোকজ্ঞানের ভিত্তিতে তার নাম রেখেছিলে পুথি।

তোমার সেই মধ্যযুগ নির্ভর বিশ্লেষণের পথ ধরেই বলি,
তুমি এক মানব পুথি এই বিংশ শতাব্দীর
এপার ওপার জুড়ে।
শ্রাবণের ভরা নদীর মত শঙ্খের খরস্রোতে লাকড়ির বহর,
আর হে মানব নদী তোমার স্নায়ুস্রোতে কেবল জ্ঞানের লাকড়ি,
সেই লাকড়ি পুড়িয়ে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সর্ব ঋতুতে তুমি জ্বালিয়ে রেখেছো চুল্লি,
যে চুল্লিতে রান্না হয় ঢেঁকিছাঁটা চালের লাল ভাত,
তাই মুখে দিয়ে তোমার দাদা-বড়দাদা পরহেজগার
বান্দার মতো চলে গেছেন কবরে।

কিন্তু তুমি গেলে আরেক পথে। মানুষকে শ্রেণিচ্যুত করে,
নিজের দেহটাকে বানালে জ্ঞানের অগ্নিতে প্রজ্বলিত লাকড়ি।
সেই লাকড়ির জ্ঞানাগ্নিতে মানুষগুলো এসে দাঁড়ায় এক সারিতে–
আজ তারা সবাই শরীফ–অথবা লা-শরীফ।

হে তার্কিকশ্রেষ্ঠ, জন্ম-জন্মান্তর ধরে আমরা কেবল
করে যাবো তোমারই তারিফ।

জীবনস্মৃতি

একটি পত্র

অন্নদাশঙ্কর রায়

[নোট : প্রখ্যাত বর্ষীয়ান চিন্তক অন্নদাশঙ্কর রায় বরাবরে আহমদ শরীফ স্মারক গ্রন্থের জন্যে একটি লেখা চেয়ে অনুরোধ জানালে তিনি এই পত্রটি প্রেরণ করেন। -সম্পাদক]

জনাব আবুল কাসেম ফজলুল হক
স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘ
৬, নীলক্ষেত রোড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাস
ঢাকা ১০০০
বাংলাদেশ।

১৭ ডি আশুতোষ চৌধুরী অ্যাভেনিউ
কলকাতা ৭০০০১৯
ভারত
১৩.০৭.৯৯

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ সাহেব বিগত হয়েছেন শুনে আমি খুবই দুঃখিত হয়েছি। তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল তিন বছর আগে বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে। সে সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার আগে যার যে-জাত ছিল ধর্মান্তরের পরেও সেই জাত থেকে যায়। চাষী চাষী, তাঁতী তাঁতী, ধোপা ধোপা, নাপিত নাপিত, কষাই কষাই ইত্যাদি।

তাঁর সঙ্গে আরও কথাবার্তা হয়েছিল। সেসব আমার মনে নেই। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন শেরাটন হোটেলে। তাঁকে তো তখন ভালোই দেখেছিলুম। এত শীগগির তাঁর চলে যাওয়ার কথা নয়।

আগে একবার কলকাতা এসেছিলেন। তখন আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে দেখা করতে এসেছিলেন। আমাকে একখানি বইও দিয়েছিলেন। সেটা বোধহয় আমার নামে উৎসর্গকৃত। আরও আগে তাঁর পিতৃব্য আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সাহেবের জীবনচরিত পেয়েছিলুম ও পড়ে খুশি হয়েছিলুম। সাহিত্য বিশারদ সাহেব একবার চট্টগ্রামে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন অধ্যাপক আবুল ফজল সাহেবের সঙ্গে। তার মতো সুপণ্ডিত দেখা যায় না। আহমদ শরীফ সাহেব তাঁরই বংশধর ও তাঁরই পাণ্ডিত্যের উত্তরাধিকারী। তাঁর পত্নীকে ও অন্যান্য আত্মীয়কে আমার সমবেদনা জানাই।

আদব ও শুভেচ্ছা জানবেন। ইতি।

বিনীত
অন্নদাশঙ্কর রায়

বিরল পণ্ডিত অধ্যাপক আহমদ শরীফ

চৌধুরী আবদুর রহমান

আরমানিটোলা মাঠের ঈশান কোণেই আনন্দময়ী স্কুল। খানিকটা এগিয়েই রাস্তাটি ডাইনে এবং বাঁয়ে বাঁক নিয়ে বাঁয়ের অংশটি মিটফোর্ড হাসপাতালের সম্মুখের রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। ডানদিকে বাঁক নেওয়া অংশটি বেচারাম দেউড়ি পার হয়ে বংশীবাজারে দিকে এগিয়ে আছে। রাস্তাটি যেখান থেকে বাঁক নিয়ে দু'দিকে এগিয়ে গেছে,—সেই তেকোনায় কালের সাক্ষী হয়ে মাথা উঁচু করে এখনও দাঁড়িয়ে আছে একটি বটবৃক্ষ। ওই তেকোনা রাস্তার ডানদিকে জগন্নাথ কলেজের ছাত্রাবাস ম. আবদুর রহমান হল; হলে প্রবেশ পথের বাঁদিক লাগোয়া একটি লম্বা একতলা বাড়ি। বিসিসি রোডের এই বাড়িটির হোল্ডিং নম্বর ৮।

এই একতলা ভবনের ডানপাশের বাসিন্দা অধ্যাপক ইরতাজুল ইসলাম। বাঁদিকে আহমদ শরীফ। দুই দরোজায় এই নামেই নামফলক ঝুলানো ছিল।

অধ্যাপক ইসলাম ছিলেন জগন্নাথ কলেজের রসায়নের অধ্যাপক। অধ্যাপক শরীফ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার শিক্ষক।

একি আজকের কথা? সেই উনিশ শ' একান্ন সালের। পুরো তিন যুগ আগের। ঢাকা তখন ছোট টাউন। পূর্বে পোস্তগোলা। পশ্চিমে আমলিগোলা। দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা। উত্তরে নবাবপুর রেলক্রসিং আর ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশন। এ-ই ছিল তখন ঢাকা টাউনের চৌহদ্দি। শান্তিনগর, মগবাজার, শাহজাহানপুর, কমলাপুর, মুগদা, মায়াকানন, মণিপুরিপাড়া, তেজতুরি বাজার প্রভৃতি অঞ্চল ছিল টাউন সংলগ্ন শহরতলী।

নাগরিক সকল সুযোগ-সুবিধার সুযোগ পেত শুধু উল্লিখিত চৌহদ্দির বাসিন্দারা। শহরতলীর লোকদের সেই সুবিধা পেতে বেশ কিছুদিন সময় লেগেছিল।

সহজ যাতায়াতের জন্য গোটা টাউনে ছিল দু'টি টাউন সার্ভিস রুট। একটি সদরঘাট, ইসলামপুর, বাবুবাজার, মিটফোর্ড, চক, লালবাগ, ঢাকেশ্বরি, পলাশি, মেডিকেল কলেজ, সাবেক রেলওয়ে হাসপাতাল, ঠাটারিবাজার, নবাবপুর, রায়সাহেব বাজার, ভিক্টোরিয়া পার্ক হয়ে সদরঘাট। অপরটি সদরঘাট, ভিক্টোরিয়া পার্ক, লক্ষ্মীবাজার, ঋষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, লোহারপুল পার হয়ে আইজি গেইট, পোস্তগোলা পর্যন্ত। চার আনায় (পঁচিশ পয়সা) বাসে চড়ে গোটা টাউন একবার চক্কর

দেয়া যেত। শহরের বাইরে যাতায়াতের জন্য মোমিন কোম্পানির বাসগুলো (মুড়ির টিন বলে খ্যাত) ভিক্টোরিয়া পার্ক থেকে ডেমরা পর্যন্ত যাতায়াত করত। টিকাটুলি ডেমরার রাস্তা তখন ছিল কাঁচা মাটির সড়ক। একটি সার্ভিস ভিক্টোরিয়া পার্ক থেকে সূত্রাপুর, গেণ্ডারিয়া, পোস্তগোলা হয়ে সদর নারায়ণগঞ্জ আসা-যাওয়া করত। টিকাটুলি ডেমরার রাস্তা তখন ছিল কাঁচা মাটির সড়ক। একটি সার্ভিস ভিক্টোরিয়া পার্ক থেকে সূত্রাপুর, গেণ্ডারিয়া, পোস্তগোলা হয়ে সদর নারায়ণগঞ্জ আসা-যাওয়া করত। আর ছিল ট্যাক্সি সার্ভিস। ভিক্টোরিয়া পার্ক থেকে নারায়ণগঞ্জ যাতায়াত করত। ভাড়া ছিল জনপ্রতি দেড় টাকা (এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা)। সন্ধ্যার পর এই ভাড়া কমতে কমতে জনপ্রতি বারো আনায় (পঁচাত্তর পয়সা) নেমে আসত।

রাজধানীর বাইরে যাতায়াতের জন্য ছিল স্টিমার, মোটর লঞ্চ আর গয়না নৌকা। বাদামতলী ঘাট থেকে বিকেলের পড়ন্তবেলায় হুইসেল বাজিয়ে 'গোরনা' স্টিমারখানি বুড়িগঙ্গার বুক চিরে মানিকগঞ্জের পথে ছুটে যেত। কিউই (KIWI), অস্ট্রিচ (OSTRICH) স্টিমার দুটি চাঁদপুর-বরিশাল-খুলনার পথে বাদামতলী ঘাট থেকে যাতায়াত করত। নারায়ণগঞ্জ থেকে গোয়ালন্দ রুটে চলাচল করত আরও ক'টি স্টিমার। মোটর লঞ্চ চলাচল করত নারায়ণগঞ্জ থেকে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে। সন্ধ্যার পর সদরঘাট থেকে অনেক গয়না নৌকা যাত্রী বোঝাই করে গ্রাম-গঞ্জে পাড়ি দিত। বুড়িগঙ্গার পানি ছিল স্বচ্ছ স্ফটিক। ওয়াইজঘাট সদরঘাটে অসংখ্য শহরবাসী দিনভর নদীতে অবগাহন করে পরম তৃপ্তিলাভ করত। অগণিত পালতোলা পণ্য বোঝাই নৌকা নির্বিঘ্নে নিরাপদে গন্তব্যস্থলে চলাচল করত। সদরঘাটে বাকল্যান্ড ব্যান্ডে দাঁড়িয়ে নদীর এই অপরূপ শোভা শহরবাসী উপভোগ করত পরমানন্দ।

বিনোদনের জন্য ছিল দুটি পার্ক। একটি সদরঘাট বাকল্যান্ড ব্যান্ড লাগোয়া করোনেশন পার্ক (বর্তমানে মার্কেট), অপরটি ভিক্টোরিয়া পার্ক (প্রাচীন নাম আন্টাঘরের ময়দান, বর্তমান নাম বাহাদুর শাহ পার্ক)।

আরমানিটোলা ময়দান আর পল্টন ময়দানও ছিল। এই ময়দান দুটিতে জনসভা অনুষ্ঠিত হত। মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বর্ষীয়ান নেতা আবুল হাশিম, শামসুল হক, হাশিমুদ্দিন প্রমুখ নেতার অনলবর্ষী বক্তৃতা শুনে জনতা উদ্দীপ্ত হয়ে মুহুর্মুহু করতালি আর জয়ধ্বনি দিয়ে ঢাকার আকাশ-বাতাস মুখর করে তুলত।

বেশুমার লোকের ঢল ছিল না তখন এই ঢাকা শহরে। গাড়ি-ঘোড়ার যানজট তো ছিলই না। ফুটপাত ছিল না, হকারদের ফুটপাত দখলের ঝুটঝামেলাও ছিল না। আগেই তো বলেছি—সহজলভ্য যানবাহন ছিল টাউন সার্ভিস। ফোর্ড আর চেবারলট গাড়ি ছিল এই সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত। গাড়িগুলো সেলফ স্টারট্ দিত না। গাড়ির হেলপার গলদঘর্ম হয়ে ইঞ্জিনের ভিতর হ্যান্ডেল ঢুকিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এই গাড়িগুলোকে স্টারট্ দিতেন। সেই সঙ্গে ছিল ঘোড়ার গাড়ি আর ছিল রিকশা . এগুলোর সংখ্যাও ছিল সীমিত। মাছের পোনার মতো অগণন ছিল না।

সেকালের পাবলিক বাসের ড্রাইভার-কন্ডাক্টররা অসহিষ্ণু ছিলেন না, অভদ্রও ছিলেন না। বেপরোয়া গাড়ি চালনার অভ্যাস তখনও ছিল, এখনও আছে। তবে সেকালের

ড্রাইভাররা ছিলেন খুব ঝানু। টাউন সার্ভিসের চাকায় পিষ্ট হয়ে বেঘোরে কোনো পথচারী কোনও দিন প্রাণ হারিয়েছে এমন সংবাদ কখনো পড়েছি বলে মনে পড়ে না। কন্ডাক্টর কখনো যাত্রীর গায়ে হাত দিয়ে ভাড়া চাইতেন না। ভাড়া নিয়ে কোনো সময় ঝগড়া-ফ্যাসাদও হত না। যাত্রীদের ভাড়া নিয়ে টিকিট দেয়ার রেওয়াজ ছিল। পাবলিক বাসগুলো সময় মেনে চলাচল করত। সময় নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থানে স্থানে নিয়ন্ত্রণ বক্স-এ বসে সুপারভাইজররা সময় নিয়ন্ত্রণ করতেন। সেকালে আইনের শাসন ছিল। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ছিল। আজ যার অভাব খুব প্রকট।

তবে ঢাকার ঘোড়ার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করতেন শহরের আদি বাসিন্দারা। ঘোড়ার লাগাম সেকালেও তাদের হাতের মুঠোয় ছিল--সে মুঠো আজও ফসকায়নি। ঘোড়াগাড়ির কোচোয়ানদের সুনাম-দুর্নাম দুই-ই ছিল। কিন্তু এঁরা ছিলেন খুব প্রত্যুৎপন্নমতি ব্যক্তি। এঁদের হঠাৎ বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না। এঁদের রসিকতা ও হাস্যরসের গল্পের প্রশংসাও না করে পারা যায় না। হঠাৎ কোনো যাত্রী কম ভাড়া দিতে চাইলে তাঁরা রসিকতা করে বলতেন, 'মিয়া সাব, আস্তে কন। ঘোড়ায় হুনলে হাসব!' ঢাকার আদিবাসীদের এ ধরনের প্রচলিত অনেক রসাত্মক গল্প শোনা যায়। যেমন--খুব ভোরে মহল্লায় হইচই শুনে এক ব্যক্তি তড়িঘড়ি গেঞ্জিটা উল্টা গায়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পথে আসতেই অন্যজন দেখে বলছে--'কি রে, তুই আইবার লাগছস না যাইবার লাগছস?'

প্রয়াত সাংবাদিক তোহা খান সাহেবকে নিয়ে এ ধরনের একটি গল্প পঞ্চাশের দশকে নিউজ টেবিলে প্রায়শ শোনা যেত। বলাবাহুল্য, তোহা সাহেব সে সময় সাইকেলে চড়ে দিয়াগঞ্জের বাসা থেকে 'আজাদ'-এ যাতায়াত করতেন। একদিন তিনি অফিস থেকে ফিরতি পথে কমলালেবু কেনার জন্য ইসলামপুরে [তখন ইসলামপুর ছাড়া আর কোথাও ফলের দোকান ছিল না] একটি ফলের দোকানে সাইকেল থামিয়ে কমলালেবু দামদস্তুর করছিলেন। [এখানে স্মরণযোগ্য যে সংবাদিক তোহা খান সাহেব ছিলেন ছিপছিপে গড়নের লম্বা মানুষ] ফল অলা ছোট ছোট কমলালেবুর বেশি দাম হাঁকায় তিনি বললেন, ছোট ছোট কমলালেবুর এত দাম চাইছেন কেন? উত্তরে ফল অলা বললেন, 'সাব, আপনে উপরতন দেখবার লাগছেন তো নিচে নাইমা দেহেন--বড় বড় দেখবার পাইবেন। এমন আরো অনেক গল্প প্রচলিত আছে। জাদুঘরের মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান মাঝে মধ্যে 'জনকণ্ঠে' এ ধরনের হাসির গল্প পরিবেশন করে পাঠকের নির্মল আনন্দ দান করেন।

আমি তখন অধুনালুপ্ত প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরির সেলসম্যান। এটি ছিল দেশের সর্ববৃহৎ প্রকাশনালয়। চার-পাঁচটি জেলা শহরে ছিল এর ব্রাঞ্চ। কলকাতায়ও ছিল এর শাখা। এই লাইব্রেরির পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য লেখক ছিলেন সর্বজনাব খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ, খান সাহেব আবদুর রব চৌধুরী, শামসুল ওলেমা বেলায়েত হোসেন, মওলানা মুহম্মদ মুসা, প্রফেসর এম. এ. করিম, কবি গোলাম মোস্তফা আর আহমদ শরীফ।

সে সময় যাদবের পাটিগণিত, কে পি বসুর এ্যালজাবরা, হল এ্যান্ড স্টিভেনসনের জ্যামিতি ছিল সেভেন থেকে নাইনের ছাত্রছাত্রীর প্রিয় নন্দিত পাঠ্যপুস্তক। এসব

ছাত্রনন্দিত বহুল প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি এ.আর. খানের এ্যালজাবরা, এম.এ. করিমের পাটিগণিত এবং এম. শাহাবুদ্দীনের রেখাগণিত জ্যামিতি বইগুলোর কদরও কম ছিল না। উল্লিখিত পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে প্রথমোক্ত দুটির প্রকাশক ছিল প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরি। শেষোক্তটির প্রকাশক ছিল আদিল ব্রাদার্স।

কবি গোলাম মোস্তফা প্রণীত ক্লাস সিক্সের ব্যাকরণ মঞ্জুরি ছিল বহুল প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক। আহমদ শরীফের ক্লাস সেভেনের সাহিত্যপাঠও ছিল ছাত্রনন্দিত। এই পাঠ্যপুস্তকের প্রুফ আদান-প্রদানের মাধ্যমে অভাজনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে স্যারের। প্রথম যেদিন বিসিসি রোডের ৮ নং হোল্ডিং এ গিয়েছিলাম সেদিন স্যারের সঙ্গে দেখা হয়নি। দু'দিন পর প্রুফ ফেরৎ আনতে গিয়েছিলাম--সেদিন দেখা হয়েছিল।

আমি তখন টগবগে কিশোর। শরীফ স্যার উদীয়মান তরুণ অধ্যাপক। নক্ করার সাথে সাথে দরজার কবাট খুলে গেলে যার দর্শন লাভ করেছিলাম তিনি অধ্যাপক আহমদ শরীফ--বুঝতে পেরেছিলাম। হাত তুলে সালাম করতেই স্যার জিজ্ঞেস করেছিলেন--কি চাই খোকা?

ঃ হারাণ বাবু (প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরির প্রোডাকশন ম্যানেজার প্রয়াত হারণ চন্দ্র রায়) পাঠিয়েছেন, স্যার।

ভেতরে এসে বস। বলেই তিনি অন্দরে গিয়ে তখনই ফিরে এসে আমাকে প্রুফশিট বুঝিয়ে দিয়ে 'একটু বস' বলে আবার অন্দরে গেলেন। খানিক বাদে একটা তশতরিতে দুটি সন্দেশ এনে আমাকে খেতে দিলেন। আমি লজ্জায় ইতস্তত করছিলাম। স্যার আমার মাথায় হাত বুলিয়ে 'ও কিছু না। দুটি মাত্র মিষ্টি। খাও! লজ্জা করো না।' কোনো রকমে খেয়েই সেদিন আমি পালিয়ে বেঁচেছিলাম।

বুক সিজন শুরু হওয়ায় আমি কাউন্টারে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। প্রুফ আনা-নেয়ার কাজ বর্তাল ফকির চানের ওপর (প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরির মালিক কাজী মোহাম্মদ বশীর হুমায়ুন সাহেবের কোচোয়ানের পুত্র)। তারপর স্যারের সেই বাসায় আর কোনো দিন যাওয়ার সুযোগ হয়নি।

আট-ন'বছর ইতোমধ্যে কেটে গেছে। উনিশ শ' উনষাট সালে তের জুলাই। এই দিনে বাঙলা একাডেমীর (বাংলা একাডেমীর বানান তখন ওভাবেই লেখা হত) প্রকাশন বিক্রয় বিভাগে যোগদান করি। ভাষাবিদ পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক তখন পরিচালক। তাঁর আনুকূল্যেই চাকরি পাই। তবে আমার এই চাকরির জন্য জোর সুপারিশ করেছিলেন ওস্তাদজি রাজা মিয়া (ইডেন প্রেসের ম্যানেজার প্রয়াত জনাব মাহবুব আলম রাজা)।

একাডেমীর প্রকাশনাধ্যক্ষ ছিলেন প্রয়াত মুহম্মদ ইদরিস আলী। বাঙলায় ফার্স্ট ক্লাস ছিলেন তিনি। সহপ্রকাশনাধ্যক্ষ ছিলেন হাসান জামাল সাহেব। তিনি শিক্ষা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কৃতী অফিসার ছিলেন। আমাদের তিন জনের সমন্বয়ে বাংলা একাডেমীর প্রকাশনা বিভাগের ভিত রচিত হয়েছিল। প্রফেসর মুহম্মদ ইদরিস আলী ছিলেন খুবই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। যেমন জ্ঞানী, তেমনি পণ্ডিত। তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ এবং জাঁদরেল সম্পাদক। তিনি রংপুরের জনৈক রেয়াজুদ্দিন আমীর আলীর 'হিস্ট্রি অফ সারাসিন' গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। এই অনূদিত গ্রন্থটির প্রকাশক বাংলা একাডেমী। প্রকাশনা কর্মের

সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে দেখেছি–প্রফেসর ইদরিস আলী কি দক্ষতা সহকারে ও সুচারুরূপে ইতিহাস গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর সযত্ন সম্পাদনা ছাড়া বিখ্যাত এই গ্রন্থটি বর্তমান রূপ কখনও ধারণ করতে পারত কি না বলাই বাহুল্য। এমন বিরল পণ্ডিত ও সুযোগ্য সম্পাদকের সঙ্গে দীর্ঘ সান্নিধ্য, নৈকট্য, সাহচার্য এবং হাতে-কলমে প্রকাশনা কর্মের শিক্ষা লাভে আমি কত যে উপকৃত হয়েছিলাম সেকথা লিখে প্রকাশ প্রকাশ করা আদৌ সম্ভব নয়। একাডেমীর প্রকাশনা তালিকায় সে সময় হাতে গোণা যায় মাত্র ক'টি বই। প্রফেসর আহমদ শরীফ সম্পাদিত *লায়লী মজনু* ছিল একাডেমী প্রকাশনার প্রথম বই। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত। ১/৬ ডবল ক্রাউন আকারের গ্রন্থটি ছাপা হয়েছিল বিজি প্রেস-এ। একাডেমীর পক্ষে প্রকাশ করেছিলেন অফিস তত্ত্বাবধায়ক এমদাদুর রহমান। মূল্য ১৷৷.।

১৯৬০ সালে স্যার সম্পাদিত *মধুমালতী* গ্রন্থটি প্রকাশ করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল আমার ওপর। রয়্যাল ১/৮ আকারে এ গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়। প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন বিসিকের নকশা কেন্দ্রের শিল্পী মোহাম্মদ ইদ্রিস। মুদ্রণ পরিপাটিতে সুশোভন করে গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়েছিল।

ঊনিশশ' একান্নের পর ১৯৬০ সালে আলোচ্য গ্রন্থের প্রকাশনা সূত্রে অভাজনের সঙ্গে পুনরায় শরীফ স্যারের নৈকট্য লাভের সুযোগ ঘটে।

বিসিসি রোডের ৮ নম্বর বাসায় ন'বছর আগে সন্দেশ খাওয়ার ঘটনা উল্লেখ করে সেদিন স্যারের কাছে নিজের পরিচয় তুলে ধরেছিলাম। সেদিন একরাশ বিস্ময়ভরা অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। তারপর, বাংলা একাডেমীতে কবে চাকরি নিলেন? এ কথাটি জিজ্ঞেস করলেন।

ঊনষাট থেকে পঁচান্নব্বই সালে বাংলা একাডেমী থেকে অবসর গ্রহণের পূর্বে পর্যন্ত মাঝখানে এই তিন যুগ স্যারের ফুলার রোডের এবং ধানমণ্ডির এক নম্বর রোডের বাসায় অনেকবার যাতায়াত করেছি তাঁর সম্পাদিত *মুসলিম কবির পদ সাহিত্যে* (১৯৬১), *মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ* (১৯৬২), *লায়লী-মজনু* দ্বিতীয় সংস্করণ এবং ওই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ সম্পর্কিত প্রকাশনা কাজকর্মের প্রয়োজনে।

একাডেমীর দীর্ঘ তিন যুগ চাকরি জীবনে প্রকাশন ও মুদ্রণ সম্পর্কিত কাজে নিয়োজিত থাকাকালীন দেশের বরেণ্য কবি-সাহিত্যিক প্রবন্ধকার গবেষক প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থকারের সঙ্গে পরিচয়, ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য এবং সাহচর্য আমাকে মহিমান্বিত করেছে। এই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য আমার বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান আহরণে সহায়ক হয়েছে। তাঁদের হাতে লিখিত পাণ্ডুলিপি পাঠের সুযোগ লাভেও আমি উপকৃত হয়েছি। অনেক দুর্বোধ্য এবং পাঠোদ্ধার অনুপযোগী পাণ্ডুলিপি সহজে পাঠ করার টেকনিক বাতলে দিয়ে শরীফ স্যার আমাকে কৃতার্থ করেছেন।

বস্তুত প্রয়াত লোকবিজ্ঞানী প্রফেসর মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন এবং মধ্যযুগের সাহিত্যিবিশারদ প্রফেসর আহমদ শরীফের পাণ্ডুলিপি আমরা সব সময় পেয়েছিলাম দুর্বোধ্য এবং অসংখ্য জোড়াতালি দেয়া নোট সংবলিত। স্বল্পশিক্ষিত কম্পোজিটরদের পক্ষে এরূপ জোড়াতালি সংবলিত পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার করে সঠিকভাবে কম্পোজ করা আদৌ সম্ভব হত না। কম্পোজিটরদের অনুদ্ধারিত শব্দ এবং নোটভুক্ত বাক্যগুলো

যথাস্থানে যথাযথভাবে সন্নিবেশ করার দুরূহ কাজ সম্পাদনার প্রশংসা করতেন তিনি। ফলে চাকরি জীবনে আমার তরক্কি লাভের সুবর্ণ সুযোগ ঘটে। কার্যব্যাপদেশে স্যারের বাসায় যখনই আমি গেছি তখনই তিনি আমাকে আপ্যায়ন না করিয়ে বিদায় দিতেন না। স্যারের এই সৌজন্য ও আতিথেয়তা থেকে কোনোদিন বঞ্চিত হইনি।

লায়লী-মজনু দ্বিতীয় সঙ্করণ যখন ছাপা হয়, তখন গ্রন্থটির আকার এবং টাইপোগ্রাফি পরিবর্তন করা হয়। সেই সঙ্গে প্রচ্ছদও পরিবর্তন করা হয়। প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী। সবুজ ব্যাকগ্রাউন্ডের ওপর একটি টুকটুকে লাল গোলাপ ফুল। ডিজাইনটা স্যারকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম ফুলার রোডের বাসায়। দেখে ভীষণ খুশি হন তিনি। গ্রন্থটির টাইপোগ্রাফি, পেইজ মেইকআপ ইত্যাদি দেখে স্যার খুব উল্লসিত। এ সময় স্যারের ছোট্ট পৌত্রটি নাশতার তশতরি আমার সামনে রেখেই টুক করে কদমবুসি করেছিল আমাকে। ছোট অবুঝ শিশুর এইরূপ শিষ্টাচারে যারপর নাই মুগ্ধ হয়েছিলাম সেদিন। শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে খুব আদর করেছিলাম—দোয়াও দিয়েছিলাম।

স্যারের বাসা ত্যাগের প্রাক্কালে শিশুটি পুনরায় কদমবুসি করে আমাকে 'আবার দয়া করে আসবেন' বলে বিদায় দিচ্ছিল যখন, আনন্দে পুলকিত হয়ে আবার কোলে তুলে নিয়ে আদর করে চুমু দিয়ে 'হ্যাঁ, আসব' বলে কথা দিয়ে বিদায় নিয়েছিলাম।

নানা কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে শিশুটির সঙ্গে দেখা করার প্রতিশ্রুতির কথা বিস্মৃত হই। অনেকদিন পর একাডেমী প্রাঙ্গণে একদিন স্যারের মুখোমুখি হই। তাঁকে অভিবাদন জানাতেই তিনি স্মিতহাস্যে বললেন, 'আবদুর রহমান সাহেব, আমার পৌত্রকে আপনি কি জাদু বলে বশ করেছেন জানি না, সে তো আপনার জন্য পাগল। সময় করে একবার তাকে দেখা দিয়ে আসবেন। না হলে আমাকে ঘরে টেকা দায় করে দেবে।' স্যারের সে আদেশ পালন করেছিলাম।

উনিশ শ' আটষট্টি সাল ছিল ফিল্ড মার্শল আইয়ুবের উন্নয়নের দশ বছরপূর্তি বছর। কুখ্যাত মোনেম খাঁ সদর্পে তখন এই দেশ শাসন করছিলেন। ঘটা করে উন্নয়ন দশক পালনের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল তখন দেশ জুড়ে। পরিচালক ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদের অতি উৎসাহে বাংলা একাডেমীতেও সেই হিড়িকের বান ডেকেছিল। একাডেমী প্রকাশ করেছিল *পূর্ব পাকিস্তানের দেশাত্মবোধক গান* আর *বাংলা একাডেমীর উন্নয়নের দশ বছর* শীর্ষক দুটি স্মারক গ্রন্থ। গ্রন্থ দুটির প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন কাইয়ুম চৌধুরী। এর একটি ছাপা হয়েছিল রহিমুদ্দিন সিদ্দিকীর উত্তরা প্রেস-এ। অপরটি তাজুল ইসলামের মিছিল প্রেসে। প্রেসদুটির স্বত্বাধিকারী দু'জনই এখন জান্নাতবাসী। এই দুই ব্যক্তিই ছিলেন পেশায় সাংবাদিক। তাজুল ইসলামের সাংবাদিক জীবন শুরু ফরিদপুরের মোহন মিয়ার 'মিল্লাত' পত্রিকায়। রহিমুদ্দিন সিদ্দিকীর 'আজাদ'-এ। সিদ্দিকী কৃতী অনুবাদকও ছিলেন। বাটলি বয়ের *রোমান্স অফ ইষ্টার্ণ সিটি* অনুবাদ করে তিনি যশ লাভ করেন।—*প্রাচ্যের রহস্য নগরী* নামে খ্যাত এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে বাংলা একাডেমী। ইতোমধ্যে গ্রন্থটির দুটি সংস্করণ হয়েছে। অপরদিকে তাজুল ইসলাম তাঁর 'বর্ণ মিছিল' প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করে রুচির পরিচয় দিয়েছেন।

প্রয়াত রহিমুদ্দিন সিদ্দিকীর আজিমপুরের সরকারি বাসায় একবার দাওয়াত খাবার সুযোগ ঘটেছিল। সময়টা উনিশশ' আটষট্টির এপ্রিলের ১১ তারিখ। অনুষ্ঠানটি ছিল একান্ত ঘরোয়া। মেহমানদের মধ্যে ছিলেন প্রফেসর আহমদ শরীফ, শহীদ অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম, বাংলা একাডেমীর তৎকালীন প্রকাশনাধ্যক্ষ জনাব ফজলে রাব্বি এবং অভাজন আমি। উপলক্ষ, সিদ্দিকী ভাইয়ের কন্যা মাহবুবার বিয়ে। [বাংলা কাব্যে সমাজ সচেতনতা সন্দর্ভ রচনা করে তিনি ডক্টরেট পেয়েছেন। বর্তমানে লালমাটিয়া গার্লস কলেজে বাঙলা বিভাগের চেয়ারম্যান। বিবাহোত্তর ঘরোয়া অনুষ্ঠানের তারিখ তিনিই আমাকে দিয়েছেন। এই সহযোগিতার জন্য তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ]। মেয়েটি সতীর্থ একটি ছেলেকে পছন্দ করে বিয়ে করেছে। এই বিয়েকে মেনে নিয়ে তিনি মেয়ের বিভাগীয় স্যার এবং একাডেমীর তিন আপনজনকে শুধু আপ্যায়নের আয়োজন করেছিলেন। স্যার খুব ভোজনবিলাসী ছিলেন না বটে, খাদ্যে রুচিবোধ ছিল তাঁর প্রগাঢ়। ভোজনপর্বে স্যার রসিয়ে রসিয়ে উপমহাদেশের জনগোষ্ঠীর নানাবিধ খাদ্যের এবং অঞ্চল ভেদে তাদের আচার-আচারণ, খাদ্যের প্রকারভেদ ও রুচিবোধের অনেক তথ্যপূর্ণ ইতিহাস আলোচনা করেছিলেন। মাহবুবার বিয়েতে সিদ্দিকী ভাইয়ের পরিবেশিত মুখরোচক সুস্বাদু খাদ্যের রসাস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে স্যারের রসাত্মক আলোচনাও গোগ্রাসে উপভোগ করেছিলাম সেদিন আমরা।

বাংলা একাডেমীতে মহাপরিচালক হয়ে যাঁরা আসেন তাঁরা সকলেই তাঁদের শাস-নামলে কোনো না কোনো চমক লাগানো পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যেমন মনজুর-এ-মওলা সাহেবের *চিরায়ত কিশোর গ্রন্থসিরিজ* ও *একশ' এক গ্রন্থ সিরিজ* প্রকাশ করেন। প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশীদের দুটি-একটি পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প, অপরটি অভিধান সিরিজ। বলাবাহুল্য, উল্লিখিত পরিকল্পনাগুলো একাডেমীর সুনাম বয়ে এনেছে। অর্থাগমেও সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছে।

নজরুল ইন্সটিটিউটের বর্তমান নির্বাহী পরিচালক কবি মুহম্মদ নুরুল হুদার নেতৃত্বে উল্লিখিত পুনর্মুদ্রণ প্রকল্পটি চালু হয়। প্রকল্পের শুরুতে হুদা ভাই আমার উপর প্রকাশনার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। শরীফ স্যারের *লায়লী-মজনু* গ্রন্থটি নিঃশেষিত হওয়ার এবং অনার্সের ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা মেটানোর জন্য এটিও প্রকল্পভুক্ত করা হয়। মোহাম্মদপুরের বাসস্থান থেকে অফিসে আসার পথে ধানমণ্ডির এক নম্বর রোডে স্যারের বাসায় একদিন ঢুঁ মেরেছিলাম। গ্রন্থটির ফাইনাল গ্রুফ দেখার অনুরোধ জানালে স্যার বললেন—

আবদুর রহমান সাহেব, বই'র পিছনে ঘুরেফিরে জীবনটা তো কাটিয়ে দিলেন। মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেছেন—গোঁফ দাড়িও। অভিজ্ঞতাও কি কম অর্জন করেছেন? প্রুফ পঠনে আপনার নিপুণতা তুলনাহীন। সবই আমার জানা। *লায়লী-মজনুর* ফাইনাল প্রুফ আমার দেখার দরকার নেই। আপনিই যথেষ্ট। পুথি বইটিকে আধুনিক বই-এ রূপান্তরে আপনারাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। অতএব, পুনর্মুদ্রণের সহজ কাজটিও আপনার দ্বারাই হোক। সব সময়ের মতো সেদিনও এক তশতরি পায়েশ খাইয়েই তবে আমাকে বিদায় দিয়েছিলেন।

এরপর স্যারের বাসায় আর কোনো দিন যাওয়া হয়নি। একাডেমী থেকে অবসর গ্রহণের পর আর প্রয়োজনও পড়েনি। তবে আসা-যাওয়ার পথে সান্ধ্য ভ্রমণের প্রাক্কালে

্যারের সঙ্গে এলিফেন্ট রোডে নয়তো জাদুঘর সংলগ্ন সড়কের ফুটপাতে দেখা হত। শল বিনিময় হত। দেখা হলেই জিজ্ঞাসা করতেন—একাডেমীতে আছেন তো?

আপাদমস্তক শুভ্র, সৎ, সুন্দর, তেজোদীপ্ত, নিরহঙ্কার, ঠোঁটকাটা, স্পষ্টবাদী, জ্ঞান-াধক এই পরিপূর্ণ মানুষটির দারিদ্র্যপীড়িত অবহেলিত খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি ছিল গাঢ় ভালোবাসা। তাছাড়া স্যার একটা পরিচ্ছন্ন জীবনাচরণ গড়ে তুলে পরম যত্নে তা ালন করতেন। তিনি যেমন ছিলেন দুর্মুখ, ঠিক তেমনি স্পষ্টবক্তা। তাই তিনি ছিলেন ারও কাছে নন্দিত পুরুষ। কারও কাছে নিন্দিত ব্যক্তি।

স্যার ছিলেন একজন স্পষ্টবাদী সুবক্তা। তিনি মননে লালন করতেন একটা দ্রোহী তনা। তাই বলনে-চলনে ভাষায় তিনি ছিলেন একেবারে জড়তাহীন। চিন্তা-চেতনা-র্যবেক্ষণে ছিলেন প্রগতিশীল। যে কোনো আলোচনা বৈঠকে উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ ্যারের অসাধারণ বাগ্মিতা, বিশ্লেষণ কৌশল এবং টান টান স্মৃতি ভাণ্ডারে সমৃদ্ধ ঘটনা, তিহাস, স্থান, দিনক্ষণের স্মৃতিচারণায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে অফুরন্ত প্রশান্তি নিয়ে ফিরতেন বাই।

সর্বোপরি প্রফেসর আহমদ শরীফ মধ্যযুগের পুথি সাহিত্যের সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ, র্বোধ্য শব্দের সঠিক অর্থ এবং পুথির পরিচয় তুলে পুথি সাহিত্যকে জনগণের মধ্যে হজবোধ্য করেছেন এবং পুথি সাহিত্যের পথিকৃৎ পিতৃব্য সাহিত্যবিশারদ আবদুল রিমের ঋণ শোধ করেছেন। বলাবাহুল্য, তিনি ছিলেন মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য ও মাজ সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন বিরল পণ্ডিত।

প্রিয় অধ্যাপক ডক্টর আহমদ শরীফ

সালেহা চৌধুরী

আমরা সবাই দাঁড়িয়েছিলাম এক তালাবদ্ধ ঘরের সামনে। প্রথমবর্ষের একদল ছাত্রী। ছাত্র ছিল না সঙ্গে। তখনকার নিয়মই এইমত। ছাত্রীগুচ্ছ স্যারদের পিছু পিছু ক্লাশে প্রবেশ করতেন। ঠিক যেমনটি বুদ্ধদেব বসু তার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। পুরনো আর্টস বিল্ডিং এর কোণের ঘরে সামনে যূথবদ্ধ ছাত্রীর দল, প্রথম দিনের টিউটোরিয়াল ক্লাস করবার অপেক্ষা করছিল। এক ধরনের গুঞ্জরণ-টিউটোরিয়াল ব্যাপারটি ঘিরে। বেশ কিছুক্ষণ পর একজন সুদর্শন, উজ্জ্বল ফর্সা, বড় বড় চোখ, প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে ঘরের সামনে দাঁড়ালেন। হাতে তার এক গোছা চাবি, তিনি তালা খুলতে খুলতে মুখ ঘুরিয়ে আমাদের দেখলেন। আমরা জানলাম ইনিই অধ্যাপক আহমদ শরীফ।

-তোমরা সব এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন? গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর তার। সবাই নিঃশব্দ। ঠিক বুঝতে পারছে না এ প্রশ্নের জবাবে কি বলবে? নেকড়ে বাঘ ও ছাগশিশুর উপমা অনায়াসেই মনে চলে আসে। সেই যূথবদ্ধতার মধ্য হতে আমি বলে ফেললাম-"এমনিই তো কথা ছিল স্যার।"

তিনি মুখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখলেন, তারপর উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন।

-এমনিই তো কথা ছিল?

আমারই মত সকলের ভয়ের মেঘ কেটে গেল। তিনি তালা খুললেন। আমরা তাঁর কক্ষে প্রবেশ করলাম। সেই তালা খোলা ঘর আমাদের পৌঁছে দিল এক আলোকিত প্রবেশাধিকারের অসীম জ্ঞানরাজ্যে, এক প্রাচীন বটবৃক্ষের ছায়াতলে। বয়সে তিনি প্রাচীন ছিলেন না; কিন্তু জ্ঞানে ত্রিকালদর্শী। সে খবর আমরা একটু একটু করে জেনেছিলাম। আরো জেনেছিলাম তাঁর মুক্ত আলোকিত মনকে। মনন ও মননশীলতাকে। জেনেছিলাম শুধু সাহিত্য কেন, পৃথিবীর তাবৎ বিষয়ের খবর তিনি রাখেন। ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভুগোল, দর্শন, ধর্ম এবং আরো নানা বিষয়। তাঁর জ্ঞানের পরিমাপ আমরা করতে পারি নি। শুধু জেনেছিলাম যে কোনো প্রশ্ন, যত কঠিনই হোক তিনি তার উত্তর দিয়ে দেবেন। তৎক্ষণাত এবং অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে।

তিনি টিউটোরিয়াল দিলেন। বোঝালেন কি লিখতে হবে, সহায়ক গ্রন্থের তালিকা দিলেন এবং আরো কিছু কথা বলে আমাদের বিদায় দিলেন। সেই কালে টিউটোরিয়াল

বাড়ি হতে লিখে আনবার রীতি ছিল। পরের সপ্তাহ। তিনি আমার অজস্র বানান ভুলের খাতাটি ছুঁড়ে মারলেন আমার মুখে। তিনি জানালেন–আমি বাংলা বলতে পারি; অতএব আমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পড়তে পারবো এমন ধারণায় কি প্রকার মুর্খতা থাকে? আমি কবিতা রচনা করতে পারি; অতএব বাংলা পড়ায় অসুবিধা কি? আসলে কবিতা না শিখলেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ভালোমত শেখার সম্ভাবনা–ইত্যাদি।' আমি নিঃশব্দে তাঁর 'অনলপ্রবাহ' শ্রবণ করলাম। এক সময় খাতা কুড়িয়ে একবার খর চোখে তার পানে চাইলাম।

তৃতীয় সপ্তাহে টিউটোরিয়াল দিলাম তাকে। তিনি সবটা পড়ে আমার মুখের পানে চাইলেন। আমি তাকিয়ে আছি তার দিকে। অপেক্ষা করছি কি বলবেন তিনি, কোন ভাষায় বকবেন। তিনি মৃদু কণ্ঠে বললেন শুধু–'কি ব্যাপার আজ যে একটিও বানান ভুল নেই।' উত্তর দিলাম–'টিউটোরিয়াল লিখতে লিখতে শুধু আপনার ক্রোধান্বিত মুখ মনে পড়ছিল তাই।' তিনি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। গত সপ্তাহের আহত মনের উপর দিয়ে লবণাক্ত ঝড়ো বাতাস বয়ে গেল। তিনি হাসতে হাসতে আমার খাতায় লিখলেন 'এ'। এই আমার প্রথম স্যারের নিকট হতে 'এ' পাওয়া। এরপর কেটে গেল আরো তিনবছর। প্রতি বছরই স্যারের সঙ্গে পড়ত আমার টিউটোরিয়াল।

ইউনিভার্সিটিতে ঢুকবার তিনমাস পরে আমার বিয়ে হয়। আমার বিয়ের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। আমার আব্বার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল। আমার প্রথম সন্তান সম্ভাবনার খবরে তিনি বলেছিলেন আব্বাকে-"ঘর সংসার দেখা, সন্তান প্রতিপালন করা, তাদের মানুষ করা এ কাজগুলো গুরুত্বপূর্ণ। সালেহা পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে এগুলো করলে কোন ক্ষতি হবে কি?" আমার পিতার এবং আমার এমন সদুপদেশ ভালো লাগেনি এবং আমি সর্বপ্রকার বাধা, বিপত্তি, কষ্ট, দুঃখ সহ্য করে বিরতিহীন ভাবে এম.এ. পরীক্ষা পর্যন্ত পড়াশুনা করেছিলাম। এর মধ্যে আমার দুজন সন্তানের জন্ম হয়। আমার বিয়ের পর প্রশ্ন করেছিলেন স্যার–কি মেয়ে এখন তোমাকে মেয়ে বলবো না মহিলা বলবো, বিয়ে তো হলো তোমার?' বলেছিলাম 'মেয়েই বলবেন, বিয়েটাকে কি আপনি আমার পদোন্নতি বলবেন?' স্যার তেমনি উচ্চকণ্ঠে হেসেছিলেন এবং মেয়েই বলতেন শেষদিন পর্যন্ত।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রায়ই তর্ক করতেন তিনি। একদিন বললেন-'বুঝলাম ঈশ্বর আছেন কিন্তু কৈ একদিনের জন্যও তো তিনি তোমাকে ফোন করেন না? কেমন করে বিশ্বাস কর তিনি আছেন?' এ প্রশ্নের কি উত্তর হবে জানি না। অতএব নিঃশব্দ ছিলাম। আমার বিশ্বাস অন্যকে সংক্রামিত করবার মত জোরালো যুক্তি আমার ছিল না। তিনি বলতেন–"কোরান শরীফ আল্লাহর গ্রন্থ কিভাবে বিশ্বাস কর?" উত্তরে বললাম, কেন নিরক্ষর নবী এমনি সব ভাষা, ছন্দ পেলেন কোথা হতে? এমনি সুললিত বাণী কি ভাবে রচনা করলেন?'

-কেন গ্রামে স্বভাবকবি দেখোনি? মোহাম্মদও তাই ছিলেন।–বললেন তিনি।

-মোহাম্মদ আলোকিত মানুষ ছিলেন স্যার, বোধিবৃক্ষের নিচে নয় হেরা পাহাড়ে তিনি তাঁর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলেন। জেনেছিলেন সৃষ্টি ও স্রষ্টার রহস্য। যেমন আপনি লাইব্রেরির এক কোনায় বসে অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যান।'

উচ্চকণ্ঠে তিনি হাসেন নি। স্মিত হেসে আমার কথা শুনছিলেন।

এমন একবার একজন ছাত্রকে ডাকলেন তিনি ঘরে। বললেন-'কি হে তুমি নাকি বলেছ আমার মুখ বোয়াল মাছের মত! বোয়াল মাছের সঙ্গে আমার মুখের কি সাদৃশ্য?' শুনেছি ছাত্রটি কোনোমতে পালিয়ে বাঁচে। এ গল্প বাংলা বিভাগের অনেকেই জানত।

আমার এক বান্ধবী লন্ডনে আছেন। ডলি ইসলাম তার নাম। তিনি এক মজার গল্প করেছিলেন। তিনি নাকি স্যারকে একবার বলেছিলেন-'বাংলা বিভাগের ছাত্রদের মেয়েরা বিয়ে করতে চায় না, কারণ বাংলা বিভাগ থেকে পাস করবার পর যে চাকরী তারা পায় তাতে তাঁদের স্ত্রীদের না খেয়ে থাকতে হয়।' তিনি তখন কিছু বলেননি। একদিন ডলি ইসলাম তাঁর বাড়িতে গেলে তিনি বলেছিলেন, 'যাও ভেতর বাড়িতে, গিয়ে তোমার ভাবীকে জিজ্ঞাসা কর, কতদিন তিনি না খেয়ে থাকেন?'

চার বছর টিউটোরিয়াল, তাঁর জ্ঞানে মন্ত্রমুগ্ধ, বিনীত (মাঝে মাঝে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাড়া) আমার পিতার বন্ধু, আমার পড়াশুনা বা পরীক্ষা পাশের আগ্রহ সব দিক দিয়েই মনে হয় আমার জন্য তাঁর স্নেহ ছিল অকৃত্রিম। এমন ভাবনা ছাত্র ছাত্রীরা করতে আনন্দ পায়, কিন্তু এ ছিল আমার বিশ্বাস। আমার সম্বন্ধে যে প্রশংসাবাণী তিনি মুখ ফুটে বলতেন সে এমন-'সালেহার বুঝবার ক্ষমতা অসাধারণ। সবকিছু সহজে বুঝে ফেলে এবং তাতেই সবদিক রক্ষে করে।' তিনি জানতেন ঘর সংসার, সন্তান বহন, উৎপাদন ও প্রতিপালনের পর আমার পড়াশুনার সময় বেশি থাকে না। একবার ক্ষণিকা কাব্যের বিচার বিশ্লেষণে মুগ্ধ হয়ে এমন এক আশাতীত প্রশংসাবাণী তিনি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন।

বানান সম্পর্কে তার নির্দেশাবলি এবং বানান ভুলের ব্যাপারে তাঁর প্রতিক্রিয়া আমাদের জানা ছিল। একদিন পিকনিকে যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম একটি বাসে লেখা আছে—"পর্য্যটন" শব্দটি, অনাবশ্যক য-ফলাসহ। আমার বান্ধবী সহপাঠিনী ফেরদৌসী বললেন-'এ বাসের মালিক নিশ্চয়ই শরীফ স্যারের টিউটোরিয়াল করেননি'। না হলে পর্যটন এ য-ফলা কি দিত?' সমবেত হাস্যরোলে খারাপ কাটে কি ভাবে?

তাঁর বাড়িতে গিয়ে কখনো না খেয়ে ফিরে আসিনি। কেউ এসেছে কিনা জানি না। আমি তার ছাত্রী ছিলাম এ গল্প করতে আমার ভালো লাগছে, একদা সহকর্মী হবার সুযোগ হয়েছিল সে গল্প নয়। কিন্তু একটি ঘটনা উল্লেখ না করে পারছি না। সাহিত্য প্রসঙ্গে নামে একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ লিখেছিলাম সেকালে। মানসী কাব্যের ঐতিহাসিকতা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। গ্রন্থটির একটি উজ্জ্বল ভূমিকা লিখে দিয়ে তিনি আমাকে চির বাধিত করেছিলেন। আমার প্রথম গল্পগ্রন্থ *যখন নিঃসঙ্গ* প্রকাশিত হবার সময় প্রশ্ন করেছিলেন—কেমন লাগছে সালেহা, প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হল তোমার? আমি কিছু বলবার আগেই তিনি বলেছিলেন—'প্রথম সন্তানের জন্মের মত নয় কি?'

শরীফ স্যারের অতলান্তিক জ্ঞান, তাঁর মুক্ত চিন্তা, ভাবনার বিষয় সবকিছুই ছিল বড় মাপের। কারো মুখের পানে চেয়ে কোনো কিছুর সঙ্গে তিনি সমঝোতা করেন নি। একবার বলেছিলাম তাকে-'স্যার বিদেশে বড় ভয়ে ভয়ে থাকি, কখন কি বলেন আর

কখন কি বিপদে পড়েন।' তিনি উত্তরে বলেছিলেন–'যা মনে করি তাই বলি, বিপদের জন্য ভয় পেয়ে নিস্তব্ধ হতে শিখি নি।'

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই বিশ্বাসকেই আঁকড়ে ছিলেন। সকলেই জেনেছিল তার সাহসিকতা ও নির্ভিকতা। সত্য উপলব্ধিতে আপোসহীন। আমি হঠাৎ ভাবি–সত্যিই তো ঈশ্বর যদি থাকেন কোথায় তাঁর কণ্ঠস্বর। কোথায় তার চরণভূমি স্পর্শ করে? আজো কেন অলৌকিকতায় পৃথিবীর রূপ বদলায় না। স্যার নেই। স্যারের কণ্ঠস্বর কোথাও নেই। কিন্তু এখনো কানে বাজে, ক্লাশে পায়চারি করতে করতে বলছেন তিনি–'কথাটা বুঝে দেখো'।

এমন এক চরিত্র যাঁকে ভোলা যায় না

কাজী আবুল কাসেম

মাত্র কয়েক দিন আগে বাংলাদেশ টেলিভিশনে ড. আহমদ শরীফের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হলো। সেই বিশেষ তারিখটাই এখন আমি স্মরণ করতে পারছি না। এ এক বিড়ম্বনা।

আমার বয়স এখন আশির কোঠায়। স্মৃতিশক্তি দুর্বল হবে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিছু ভুলে গেলে যিনি আমাকে দিক নির্দেশন করতেন তিনিই তো চলে গেলেন। এখন আর কার কাছে জিজ্ঞাসা করে জানবো যে, ওই তারিখটা ছিলো কবে? ড. আহমদ শরীফ আমার জন্য ছিলেন এক জীবন্ত 'এনসাইক্লোপেডিয়া'। টেলিফোনে তার কাছে জানতে চাইলাম, গান্ধি হত্যা ঘটেছিলো কোন সনে? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো, ওই অমুক সনের অতো তারিখে। আরেকবার জানতে চেয়েছিলাম, ডাইরেক্ট একশন-এর ডেট আপনার মনে আছে? সঙ্গে সঙ্গে সন তারিখ সামনে এসে হাজির। আরো কতো কিছু জানতে চেয়েছি তার কাছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম ঠিকানা ফোন নম্বর লেখা আলাদা একটা খাতা রাখতেন তিনি। যার পৃষ্ঠা উল্টিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বলে দিতে পারতেন, কার কোন ঠিকানা বা ফোন নম্বর। এ জন্যই তাকে জীবন্ত 'এনসাইক্লোপেডিয়া' হিসেবে উল্লেখ করলাম। তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগেও বরেণ্য কবি শামসুর রাহমানের ওপর সন্ত্রাসী হামলার বিষয়ে টেলিফোনে কথা বলেছি তাঁর সঙ্গে। টেলিফোনে তিনি সংক্ষিপ্তভাবে কথা বলতেন। বললেন, ওই সন্ত্রাসীরা অতীতেও ছিলো, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তারপর আগের আরো দু-একটি সন্ত্রাসী ঘটনার কথা উল্লেখ করে আরো কি কি যেন বলেছিলেন আমাকে। দুঃখের বিষয় এখন সে সব মনে করতে পারছিনা। বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়, এটা বুঝিয়ে বলেছিলেন আমাকে। আমার প্রশ্ন ছিলো, কবিকে কেন হত্যা করতে চেয়েছিলো?

তাঁর জবাব, কারণ ওরা প্রগতিবাদ-বিরোধী অতীতের অন্ধকারে ফিরে যাওয়ার দলে। আর শামসুর রাহমান প্রমুখ ব্যক্তিরা প্রগতিপন্থী, আলোর দিশারী সুতরাং এরা একে অন্যের শত্রু—এ হবেই ... ইত্যাদি।

সেদিন মাত্র কথা বললাম। আজ সেই ব্যক্তিটি নেই। এ যে কত বড় শূন্যতা তার পরিমাপ করা চলে না। বয়সে তিনি আমার বছর আটেকের ছোট ছিলেন। প্রজ্ঞা

পারমিতায় অসাধারণ। পাণ্ডিত্যে অপ্রমেয়। দেশ-বিভাগের পর কলকাতা থেকে ঢাকায় এসেছিলাম পঞ্চাশ সনে। তখন থেকে পরিচয়। তখন তিনি থাকতেন আর্মানিটোলা মাঠের পাশে বেচারাম দেউড়িতে একটা বট গাছের কাছাকাছি বাসায়। সেই আর্মানিটোলা মাঠের অন্য পাশে ছিলো আমার বাসা, জিন্দাবাহার লেন। আমার বাসায় চট্টগ্রামের বর্ষীয়ান সাহিত্যিক জনাব মাহবুব-উল-আলম প্রায়ই যাতায়াত করতেন। কলকাতা থাকতেই তার সঙ্গে আমার পরিচয় এবং সেই পরিচিতি পরে বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিলো। তিনি ঢাকায় এসে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বন্ধুবান্ধবের বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করতেন। একবার আমার বাসাতেও কয়েকদিনের জন্য ছিলেন। মাহবুব-উল-আলম শুধু আহমদ শরীফের জেলার অধিবাসী নন, তাঁর একান্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিও বটে। তাই শরীফ সাহেব আলম সাহেবের সাক্ষাৎকার মানসে আমার বাসাতেও গিয়েছিলেন। আমাদের পরিচয়ের গোড়াপত্তন ওখান থেকেই।

বেচারাম দেউড়িতে একটা প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ির নিচের তলায় ছিলো *মাসিক পূবালী* নামক একটা সাহিত্য পত্রিকার অফিস। সে বাড়ি ও পত্রিকার মালিক ছিলেন লঞ্চ ব্যবসায়ী প্রয়াত নূরুল ইসলাম। সম্পাদক হিসেবে *পূবালী*তে তার নাম মুদ্রিত হলেও পত্রিকাটির সামগ্রিক সম্পাদনার কাজ করতেন মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ও অন্য কয়েকজন সহযোগী। সেখানে প্রতিদিন বিরাট সাহিত্যিক আড্ডা বসতো। তৎকালীন সুধীবৃন্দ অনেকেই আসতেন। *পূবালী* পত্রিকার চিত্র-সম্পাদক ছিলাম আমি। সেই উপলক্ষে প্রায়ই সেখানে যেতাম। যাবার সময় ড. আহমদ শরীফের বাসার সামনে দিয়ে যেতে হতো। শরীফ সাহেব আমাকে দেখলেই তার কাছে একটু না বসে যেতে দিতেন না। চা-নাশতা খাওয়াতেন। তাঁকে বাইরে থেকে দেখে হাসিখুশি অমায়িক প্রকৃতির বলে মনে হতো। কিন্তু কিছুক্ষণ কথা বললেই বোঝা যেতো তাঁর মধ্যে রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরাট ভাণ্ডার। এমন পণ্ডিত লোকের সঙ্গে আমার মতো অপণ্ডিত লোকের বন্ধুত্ব অকল্পনীয়। কিন্তু এই পার্থক্য সত্ত্বেও আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে একটা আশ্চর্য মিল ছিলো। যে কারণে তার সঙ্গে কথা বলতে সত্যিই ভালো লাগতো আমার। তাছাড়া আমি যেমন তাঁর পাণ্ডিত্যকে, তিনিও তেমন আমার শিল্পীসত্তাকে শ্রদ্ধা করতেন।

আমি তাঁকে 'পূবালী'র সাহিত্যিক আড্ডায় যাওয়ার জন্য সাধ্য-সাধনা করতাম। তাঁর বাসা থেকে সামান্যই দূরত্ব। কোনো ফল হতো না। তিনি বলতেন, ওখানে গেলে নাকি তাঁর অসুবিধা হবে। কারণ ওখানে সবাই পণ্ডিত ব্যক্তি। তাদের সঙ্গে তাঁর মতের মিল হবে না। শেষ পর্যন্ত তর্কাতর্কি হয়ে আড্ডাটাই হয়তো নষ্ট হয়ে যাবে ... ইত্যাদি। আসলে তিনি ছিলেন এমন এক অনমনীয় চরিত্রের লোক, অন্য কারো দ্বারা কখনো প্রভাবিত হতে চাইতেন না।

ভিষক হতে হলে ভেজষের গুণাগুণ জানা দরকার। মানব-চরিত্র বিশ্লেষণের জন্যও চাই উপযুক্ত ভিষক বা গবেষক। দুঃখের বিষয় আমার তেমন কোনো ক্ষমতা বা যোগ্যতা নেই যে তাঁর মতো পণ্ডিত ব্যক্তির ভালোমন্দ বাছ-বিচার করবো। অথচ একথা অনস্বীকার্য আমি ছিলাম তাঁর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

আমার এক মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে পাত্র দেখার মতো 'ভেন্যু' খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পাত্রটি ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনির্ভাসিটির শিক্ষক। উন্নত দেশের ডক্টরেট ডিগ্রিধারী। অধ্যাপক

শরীফ সাহেবকে আমার সমস্যাটি জানাতেই সানন্দে তিনি রাজি হয়ে গেলেন তাঁর কোয়ার্টারে ব্যবস্থা করতে। বললেন, আরে পাত্র দেখা সেতো পূণ্যের কাজ। এমন একটি কাজ করতে পারলে আমিও বেহেশতে যাবো। কিন্তু সবাই জানেন, তিনি বেহেশত-দোজখ বিশ্বাস করতেন না। শুধু রহস্যচ্ছলেই কথাটা বলেছিলেন। আমার সেই মেয়ের বিবাহে তিনি পূর্বাপর আমার সাহায্যকারী হিসেবে ছিলেন। এছাড়াও তিনি আমাকে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। যেন বন্ধু নয়, কোনো পরম আত্মীয়। তাঁর অনেক ভক্ত-শিষ্য ছিলো। মনে পড়ে, একবার তাঁর আর্মানিটোলার বাসায় কয়েকজন ছাত্র এসেছিলো কোনো বিষয়ে তাঁর পরামর্শ নিতে। তারা কোনো একটি পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করছিলো তার ধরনটা যখন জানালো, তখন শরীফ সাহেব তাদের বললেন, 'তোমরা কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ছো কেনো? তোমাদের বুদ্ধি ওই মাদ্রাসার ছাত্রদের চেয়ে এক ইঞ্চিও বেশি নয়।' বলেই একটা উদাহরণ টানলেন। ব্যাপারটি এত সূক্ষ্ম এবং অবিসংবাদিত যে অবাক হয়ে আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। বিষয়টি আরো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতাম, কিন্তু ওই যে স্মৃতি-বিভ্রম, কিছুকাল আগেও মনে ছিলো, আজ নেই। গত বছর হার্টের অসুখে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলাম। সুস্থ হয়ে আমি বাসায় ফিরে এলে তিনি আমাকে দেখতে এসেছিলেন। এই পণ্ডিত ব্যক্তিকে আমার চেয়েও ঘনিষ্ঠতরভাবে অনেকেই জানেন। তাঁর প্রজ্ঞা-পারমিতার গভীরতা নির্ণয় করার মতো লোক থাকতে পারেন। তাঁরা সবাই আমার নমস্য। সম্প্রতি কোনো এক পত্রিকায় প্রকাশিত ড. হুমায়ুন আজাদ কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকারটা পড়লে তাঁকে কিছুটা চেনা যায়।

শেষে ড. আহমদ শরীফ সম্পর্কে বলতে চাই, মহৎ ব্যক্তিদের মৃত্যু নেই। তাঁরা মানুষের মনে চিরকাল বেঁচে থাকেন। তাঁর বিদেহী আত্মার কল্যাণ হোক।

আহমদ শরীফ : আমার স্মৃতিতে

আহমদ নূরুল ইসলাম

আমি গুরু বলতে তিন জনকে বুঝি-আমার বাবা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ড. আহমদ শরীফ। বাবা মিথ্যে কথা বলেছেন, এমন প্রমাণ আমি কিছুতেই পাইনি। বিদ্যাসাগরের আপসহীন জীবনচেতনা, মানব-হিতকামনা ও দুর্জয় সাহস, কালের সীমা ছড়িয়ে আমার অন্তর স্পর্শ করেছিল। আর আহমদ শরীফকে আমার মনে হয়েছিল বিদ্যাসাগরের মানস-সন্তান।

১৯৬৮ সনের আগস্ট মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভর্তি হবার পরে ঠিক কবে যে শরীফ স্যারের ক্লাশে বসেছিলাম, আমার মনে নেই। তবে যেদিন বসেছিলাম, মনে হয়েছিল এতকাল যাদেরকে মানুষ বলে মনে করেছি এ মানুষটা তাদের চেয়ে আলাদা। বিদ্যায়, বক্তব্যে, মতে, সাহসে, মৌলিকতায় এ মানুষটা অসাধারণ। দীক্ষাগুরু হবার মত মানুষই বটে।

ক্লাশে তার বক্তব্য ক'জনে বুঝতেন কে জানে। বহু বই পড়া না থাকলে যে আহমদ শরীফের বক্তৃতা অনুসরণ করা যায়না, একথা আমরা সকলেই স্বীকার করতাম। তাঁর *বিচিত চিন্তা* (১৯৬৮) প্রবন্ধ সংকলন যখন আমাদের হাতে এলো, তখন সাড়া পড়ে গিয়েছিল। ঐ গ্রন্থেই তিনি আমাদের সংস্কার ভেঙে দিয়ে বলেছেন, মধুসূদন, আমাদের প্রথম আধুনিক হলেও ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনার মত প্রাচীন বিষয় নিয়ে তিনি কাব্য রচনা করেছেন—যা মূলত আধুনিক হয়নি। *মেঘনাদ বধের* লেখকের নাম ঐ গ্রন্থ বহন করেনা। ঐ গ্রন্থেই তিনি বলেছেন নজরুলে বিদ্রোহ আছে সত্য, তবে সে বিদ্রোহ প্রত্যক্ষভাবে সমাজ ভাঙার চেয়ে মানুষের বিবেকের কাছে নির্যাতিতের পক্ষ হয়ে ফরিয়াদই বেশি। তিনিই প্রথম ঐ গ্রন্থে বলেছেন, বাঘা বাঘা পণ্ডিতরা বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ সৃষ্টির জন্য মুসলমানদের বঙ্গবিজয়কে দায়ী করা ভুল সিদ্ধান্ত। তিনি প্রমাণ করেছেন, বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ বলে কিছু ছিল না। তাঁর এ সিদ্ধান্তকে আজ পর্যন্ত কেউ ভুল প্রমাণ করতে পারেননি।

ক্লাশে তিনি প্রসঙ্গক্রমে শাসকদের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে কথা বলতেন অকুতোভয়ে। এ বিষয়টি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে অনেক। তিনি কথা বলতেন ফিগারেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজে। তাঁর প্রতিটি বাক্য গঠনে আমাদের মনে এক একটি চিত্র ভেসে উঠত।

তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে অসাম্প্রদায়িক মনে করতেন। বলতেন, বঙ্কিম ইতিহাসকেই বাঙ্ময় করেছেন, বঙ্কিমই বাংলা সাহিত্যে প্রথম ব্যক্তির ভিতর থেকে মানুষটিকে বের করে এনেছেন। রাজসিংহ উপন্যাসে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মধ্য দিয়ে চমৎকার মানবতাবাদ ফুটিয়ে তুলেছেন। রাজসিংহের তাড়া খেয়ে সম্রাট পাহাড়ের গুহায় বসে যখন খাদ্য ভিক্ষা চেয়েছেন, তখনই ফুটে উঠেছে মানুষ কতখানি মানুষ। আওরঙ্গজেব যখন নির্মলকুমারীকে ইমলি বেগম নামে সম্বোধন করে বলে, আমি এ জীবনে কাউকে ভালোবাসিনি, কারো ভালোবাসা পাইওনি–তখন নারীর কাছে পুরুষের আত্মনিবেদন পরম মানবিক রূপে ভেসে উঠে। বন্দিনীর কাছে সম্রাটের প্রতাপ নয়, হৃদয়ের কাছে হৃদয়ের আবেদন।

শরীফ স্যারের হৃদয়ের ছোঁয়া আমার মত এক নগণ্য ছাত্র কি করে পেলাম তা আমার কাছেই প্রশ্ন সাপেক্ষ। আমার এম.এ. মৌখিক পরীক্ষার দিনে তিনি, ড. মুহম্মদ এনামুল হক ও ড. নীলিমা ইব্রাহীম ছিলেন। আমি যখন কক্ষে ঢুকলাম, তখন শরীফ স্যার এনামুল হক স্যারকে লক্ষ্য করে বল্লেন, নূরুল ইসলাম, আমাদের আর একজন ভালো ছাত্র।

কিছু ঠাট্টার মধ্য দিয়ে ড. এনামুল হক স্যার যাচাই করতে চেষ্টা করেছিলেন আমি ভালো ছাত্র কিনা। আমি যে ভালো ছাত্র ছিলাম না সে কথা আমি নিজেই ভালো জানতাম। এনামুল হক স্যারকে বেশি চেষ্টা করতে হয়নি। এনাম স্যারের শেষ প্রশ্ন ছিল : বল তো বাংলা সাহিত্যের এখন কোন যুগ চলছে? ১৯৭৪ সনের এক সন্ধ্যায় আমি বলেছিলাম, দেশ স্বাধীন হয়েছে মাত্র আড়াই বছর। আড়ই বছরে কোনো দেশের সাহিত্যের চরিত্র গড়ে উঠতে পারে না। এ জন্য আমাদেরকে দশ থেকে বিশ বছর অপেক্ষা করতে হবে। আমার এ জবাবে শরীফ স্যার কি যে খুশি হয়েছিলেন!

আমার এম.এ. পরীক্ষার পরে আমার বাবার ওফাৎ হলো। শরীফ স্যারের স্নেহের জোরেই আমি ভেঙে পড়িনি। ৭.২.৭৫ তারিখে লিখিত শরীফ স্যারের চিঠি আমার গ্রামের বাড়ির ঠিকানায় গিয়ে পৌছলো। মুখে অগ্নিস্রাবী-ভয়াবহ পণ্ডিত আহমদ শরীফ, আমার মত এম.এ. পরীক্ষা সমাপ্তকারী অপগণ্ডকে চিঠি লিখেছেন এ ভাষায় :

প্রিয়বরেষু,

সেদিন ASIATIC SOCITEY'র সভায় গবেষণাবৃত্তির কথা উত্থাপন করেছিলাম। সভা একটি কমিটি নিয়োগ করেছে। কমিটির সুপারিশক্রমে গবেষণাবৃত্তির জন্যে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করা হবে। কাজেই তোমাকে কোন ভরসা দিতে পাচ্ছিনে বলে অত্যন্ত দুঃখিত।

আমার মনে হয়, বর্তমানে কোন কলেজে চাকরী নিয়ে তোমার ভবিষ্যৎ-সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করা উচিত। M.PHIL.-এর বৃত্তির কোন খবরও মিলছে না। এ অবস্থায় অস্তির হয়ে কেবল দেহমনকে পীড়িত করা উচিত হবেনা।

আমার সালাম, স্নেহ ও শুভেচ্ছা রইল।

শুভার্থী
আহমদ শরীফ
৭.২.৭৫

বাবার মৃত্যুর ঝড় কাটিয়ে ৭৫ সনের এপ্রিল মাসে ঢাকায় চলে আসি। উচ্চতর গবেষণার বিষয়টি আমি বহু আগে থেকেই স্যারের সঙ্গে আলাপ করে থাকতাম। এ জন্যই কুমিল্লায় হাসানপুর কলেজে চাকরী করতে আমি উৎসাহ বোধ করিনি। এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষণা বৃত্তির ঘোষণা যখন হল তখন শরীফ স্যার আমার এম.ফিল. গবেষণার তত্বাবধায়ক হতে রাজি হয়ে লিখে দিলেন :

কোন বিষয়ে গবেষণা করার জন্য তিনি সম্প্রতি কলেজের চাকরী ছেড়ে ঢাকায় এসেছেন, এতে তাঁর ইচ্ছার অকৃত্রিমতা ও সংকল্পের দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে।

গবেষণা কার্যের জন্য যে ধৈর্য, অধ্যাবসায়, শ্রম, বুদ্ধি, উৎসাহ প্রয়োজন, তা তাঁর পূর্ণমাত্রায় আছে বলেই আমি মনে করি। তাঁর নির্বাচিত বিষয়ে অভিসন্দর্ভ হতে পারে। আমি তাঁর গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক হতে রাজি আছি।

আহমদ শরীফ
৩১.৫.৭৫

প্রকাশ থাকে আমার গবেষণার বিষয় ছিল : বাঙলা আত্মজীবনীতে সমাজ ও সংস্কৃতি (১৮০১-১৯১১)। বিষয়টি নিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. ওয়াকিল আহমদ।

আমি এসিয়াটিক সোসাইটির বৃত্তি প্রাপ্ত গবেষক হিসেবে গবেষণা শুরু করি।

আমার গবেষণা পত্রের আওতায় এসেছে বিচিত্র বিষয় যার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য আমাকে অন্য কারো মুখাপেক্ষী হতে হয়নি। আমার শরীফ স্যারই সব বিষয়ে জানতেন।

আমি ১৯৭৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে গবেষণা শুরু করেছিলাম। এক বছর পরে প্রথম বর্ষের দুই পত্রের পরীক্ষা হল। পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হলাম কিন্তু ফল শরীফ স্যারের মনোমত হয়নি বলে তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করলেন। আমি উৎসাহ হারাইনি। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আগ্রহ নিয়ে আমার কথা শুনতে লাগলেন। বুঝিয়ে বলতে লাগলেন। ৭৫-৭৬ সনের বিকেল বেলায় শরীফ স্যার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনের লনে হাঁটতেন। প্রায়ই সঙ্গে থাকতেন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই ইসলামের ইতিহাস বিভাগের বিখ্যাত প্রফেসর মমতাজুর রহমান তরফদার। দ্রুত হাঁটতেন তাঁরা। শরীফ স্যারের সঙ্গে হাঁটার লোভে লাইব্রেরির থেকে নেমে আমিও মাঝে মধ্যে সঙ্গী হতাম। প্রথম দিকের এক দিন তরফদার স্যার বারবার আমার দিকে ফিরে তাকাচ্ছিলেন। শরীফ স্যার বল্লেন, নূরুল ইসলাম। আমার এম.ফিল. ছাত্র। দারুণ পণ্ডিত। বলেই আমার কাঁধে হাত রাখলেন এবং কিছুটা হাঁটলেন।

কিন্তু শরীফ স্যার আমাকে কেনো দারুণ পণ্ডিত বলেছিলেন, তা কিছুদিনের মধ্যেই টের পেয়েছিলাম। ঐ সময়েরই কাছাকাছি একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে বাংলাদেশ লেখক শিবিরের এক সভায় স্যার ছিলেন সভাপতি। বাংলা বিভাগের এক তরুণ শিক্ষক বক্তৃতা দিতে উঠে তালগোল পাকিয়ে বসে পড়লেন। একজন সাংবাদিকও বক্তা ছিলেন। তিনি উঠে তরুণ শিক্ষককে কিছুটা নিলেন। সাংবাদিকের উষ্মাকে কিছুটা প্রশমিত করেছিলেন ড. সিবাজুল ইসলাম চৌধুরী। শরীফ স্যার

বলেছিলেন, তরুণ বলেই উৎসাহ বেশি। উৎসাহ বেশি বলেই ভুলের সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু উৎসাহ না থাকলে কিছু হবার সম্ভাবনা নেই এবং আমি বুঝেছিলাম, এ ধরনের স্নেহ থেকেই বলেছিলেন, নুরুল ইসলাম দারুণ পণ্ডিত। অযোগ্যকে শরীফ স্যার বাজার করার কাজে ব্যবহার করেননি, বা লেখা কপি করার কাজে লাগাননি বরং তার সম্ভাবনাকে জাগিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলতেন, পণ্ডিত! লাখে ন-মিলিয়ে এক, কিন্তু আগ্রহ না থাকলে চলবে কি করে। তাই বলে আগ্রহ বশে যা কিছু লিখে নিয়ে শরীফ স্যারকে দিয়ে তা পাশ করিয়ে নেওয়া যেত না। আমি এম.ফিল. গবেষণার দ্বিতীয় বর্ষে থিসিসের প্রথম অধ্যায় লিখে নিয়ে তাঁকে তাঁর বাসায়, দেখাতেই, তিনি কিছুটা পড়ে, আমার লেখা ছুড়ে মাদুরের ওপর ফেলে দিলেন। বল্লেন, লেখা পড়া শেখনি, কলম ধরতে শেখনি, কোন সাহসে এসব আজে বাজে লেখা আমাকে দেখাতে এনেছ? যাও, কলম ধরতে শেখ, তার পর আমার সামনে এসো।

পরে আমি স্যারের সামনে গিয়েছিলাম—লেখার স্বীকৃতি আদায় করে তবে ফিরেছি। তবে বকুনি যতবার খেয়েছি নাস্তা খেয়েছি তার চেয়ে বেশি বার। ৭৫ সনে একবার নাস্তা দিলেন শুকনো টোস্ট আর চা। শুকনো টোস্টের শব্দে কামড় দিতে ইচ্ছে করছিলনা। শুধু চা-ই খাচ্ছিলাম। স্যার বল্লেন, খাও, খাও, এর চেয়ে ভালো নাস্তা দেওয়ার সাধ্য নেই। একটি কথা, ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষের কি সুন্দর ছবি তিনি এঁকে ফেল্লেন।

ঠিক সময়ে গবেষণার কাজ শেষ করতে পারিনি। তিন মাস সময় বাড়াতে হয়েছিল। স্যার ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখেননি। থিসিসের একজন পরীক্ষক ছিলেন প্রফেসর মোস্তফা নুর-উল ইসলাম। তিনি যথাসময়েই রিপোর্ট জমা দিয়েছিলেন। অন্য এক জন পরীক্ষক অনেক দেরি করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার কারণে আমার ১৯৭৮ সনের এপ্রিল মাসে জমাকৃত থিসিসের ফল প্রকাশিত হয়েছিল ০৩.৬.১৯৮০ তারিখের সিন্ডিকেট সিদ্ধান্তে—১২.৬.৮০ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে।

আমি পিএইচ.ডি. গবেষণা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণকালে কথা প্রসঙ্গে শরীফ স্যার যখন জানতে পারলেন যে, আমার এম.ফিল. থিসিসের বিষয় নির্বাচন করে দিয়েছিলেন ওয়াকিল স্যার তখন শরীফ স্যার আমাকে নির্দেশ দিলেন পিএইচ.ডি. গবেষণা ওয়াকিল স্যারের অধীনে করার জন্য। আহমদ শরীফ, শরীফ কাজটিই করেছিলেন। আমি বুঝতেই পারিনি যে, এ ধরনের পরামর্শও এক ধরনের সৃজনশীলতার মূল্য বহন করে। আমি শরীফ স্যারের নির্দেশ মেনে নিয়ে ওয়াকিল স্যারের নিকটেই পিএইচ.ডি. রেজিস্ট্রি করিয়েছিলাম।

আমার এম.ফিল.-এর ফল প্রকাশ না হওয়ায় ১৯৭৯ সনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে আমার চাকরী হয়নি। স্যার খুব দুঃখিত হয়েছিলেন। ওখানেই আমি ১৯৮০ সনে পেলাম প্রভাষক পদে চাকরী। আমার এম.ফিল.-এর ফল প্রকাশের দেরি হবার একটা কারণ ছিল। কারণটা এরূপ : আমি আমার থিসিসে মূর্তিপূজাকে অবৈজ্ঞানিক বলেছিলাম। যে পরীক্ষক দেরিতে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, তিনি চেয়েছিলেন আমি যেনো আমার ঐ মত পরিবর্তন করি। আমি রাজি হইনি। বলেছিলাম, আমার এম.ফিল. ডিগ্রি না হলেও আমি আমার মত পরিবর্তন করব না। এ জন্য চাকরীর ক্ষেত্রে সময়ে, পদে, বেতনে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হলাম বটে কিন্তু সত্য

বজায় রইল। আমার মতে আমার এ ধরনের স্থিতির জন্য শরীফ স্যার আমকে সাধুবাদ দিয়েছিলেন। চাকরীর চেয়ে আমার তা কম মূল্যবান মনে হয়নি।

আমার এম.ফিল.-এর ফল প্রকাশিত হবার পরে শরীফ স্যার প্রশংসাপত্র লিখলেন এ ভাষায়-"কলেজ শিক্ষক রূপে ইতোমধ্যেই তিনি তাঁর যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। এবার তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন বলেই আমি মনে করি। বাংলাদেশের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ঠাঁই হলে তিনি সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা করার সুযোগ পাবেন এবং তার গবেষণা জ্ঞান-রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করবে—এ বিশ্বাস নিয়ে আমি তাঁর স্বাস্থ্য, সুখ ও সাধনায় সাফল্য কামনা করি।

আহমদ শরীফ

৫.৬.৮০

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার চাকরী হল বটে কিন্তু আহমদ শরীফের মত আর এক জন গুরু আমি খুঁজে পাইনি।

সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠা, পাণ্ডিত্য, সাহস, অনবিল মানব-দরদ ও জীবে দয়া, এই কয়টি কারণে আহমদ শরীফকে আমার দীক্ষ' দাতা গুরুর আসনে পেয়েছি। সর্বোপরি ছিল তার সাহস। বিদ্যা ও সততা না থাকলে কোনো মানুষ সাহসী হতে পারেনা—একা কেবল আহমদ শরীফকে দেখেই বুঝেছি। ১৯৭৬ সনে একদিন বিকালে তাঁর বাসায় বসেছিলাম। একটি ইংরেজি দৈনিকের এক সিনিয়র সাংবাদিক এসে বলেছিলেন : আমরা 'বাংলাদেশে সংবাদ ও সাংবাদিকতা' নামে একটি সুভেনির বের করতে চাই। স্যার, আপনার একটা লেখা দিতে হবে। আহমদ শরীফ চিন্তা-মাত্র না করে গর্জে উঠলেন, আমি কি আপনাদের মত বদমাস? মুজিব যখন বাকশাল গঠন করেছিল, আপনারা সাংবাদিকগুলি আগে গিয়ে বাকশালে যোগ দিয়েছিলেন। এখন জিয়া এসে গণতন্ত্রের অভিনয় করছে, আর আপনারা জুটেছেন, সুভেনির বের করে প্রমাণ করবেন, সাংবাদিকরা খুব ভালো—সাংবাদিকরা গণতন্ত্রের পক্ষে। কোন সাহসে আমাকে এসব বদমাসির মধ্যে টানতে চান? আমি তো ভয় পেয়েছিলাম স্ক্যান্ডাল ছাপিয়ে স্যারকে না নাজেহাল করে। কিন্তু আহমদ শরীফের কিছুই হয়নি।

আহমদ শরীফের পুরো মূল্যায়নের ক্ষেত্র এটা নয়। দু একটি কথা বলি। তিনি বিজ্ঞানে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মানব-হিত ও জীবে দয়া জীবনের প্রধান কর্তব্য মনে করতেন। নারীর মানবাধিকারে তাঁর ছিল অবিচল আস্থা। দাম্পত্য সম্পর্ককে তিনি পূর্ণ মূল্য দিতেন। প্রেমের ব্যাপারে পুরুষের হীনতার কথা উল্লেখ করে ক্লাশে বলেছিলেন—বাবা মা আত্মীয়-স্বজন বউ জুটিয়ে না দিলে, মনুষ্যত্ব দিয়ে নারীর মন জয় করে বউ জোটানো আমাদের অনেকের পক্ষেই সম্ভব হতো না। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্বকে তিনি অসীম মনে করতেন।

মূল্যায়নের ব্যাপারে তিনি ভুল করেছেন, এমন প্রমাণ আমি পাইনি। রবীন্দ্রনাথকে তিনি মনে করতেন মানব-চেতনার উদ্বোধক হিসেবে। কিন্তু সমাজতন্ত্রে তাঁর আস্থা না থাকার বিষয়টির সমালোচনা আহমদ শরীফ করেছেন। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনকে মনে করতেন ইহজাগতিকতার পুরোধা হিসেবে। পটুয়াখালির কৃষক নেতা আবদুস সাত্তারকে

তিনি যেমন সম্মান করতেন, তেমনি তিনি স্বশিক্ষিত দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বরকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন।

আহমদ শরীফ মনে করতেন মানুষ যতদিন বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ে বিভক্ত থাকবে মানুষে মানুষে ততদিন বিভেদ থাকবেই। আর্থিক সাম্যের প্রয়োজনে তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। মনুষ্যত্বকেই তিনি ধর্ম মনে করতেন। মনুষ্যত্ব অর্জন করার জন্য তিনি ব্যক্তিগত সততাকেই প্রথম ও প্রধান উপায় মনে করতেন। তিনি প্রায়ই চরিত্র ও ভদ্রলোক শব্দ দুটি ব্যবহার করতেন। চরিত্র বলতে তিনি ব্যক্তিগত সততা বুঝতেন। ভদ্রলোক বলতে তিনি মনে ও অবয়বে মার্জিত মানুষকে বুঝাতেন।

আহমদ শরীফ মৌলবাদিদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন। কিন্তু মানব-হিতকামী ছিলেন বলে মরণোত্তর চক্ষু ও শবদেহ দান করে গিয়েছেন অবলীলায়। আমার নিজের কোনো দর্শন নেই। কিন্তু আমি আহমদ শরীফের অনুসারী বলে আমিও মরণোত্তর চক্ষু ও শবদেহ দানের অঙ্গীকার করলাম। আমি আহমদ শরীফের উপরে উল্লিখিত মতবাদসমূহকে স্মরণ ও বরণ করি এবং আমি মনে করি আহমদ শরীফের মৃত্যুতে আহমদ শরীফ যুগ শুরু হয়েছে।

ড. আহমদ শরীফের সর্বশেষ জন্মদিন

আহমদ ছফা

এক.

দেখতে দেখতে এক বছর চলে গেলো। গত বছর ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখটি ছিলো ড. আহমদ শরীফের জন্মদিন। বিকেলবেলা আমরা অনেকেই স্যারের বাড়িতে জন্মদিনের অভিনন্দন জানাতে গিয়েছিলাম। দেখলাম অনেক লোক, অনেক ফুল, অনেক মানুষ। বাড়ির লোকজনের কাছে প্রশ্ন করে জানলাম সকাল থেকেই মানুষের আসা-যাওয়া চলছে। ড. আহমদ শরীফের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের ঘাটতি ছিলো না। একাধিকবার একাধিক সাম্প্রদায়িক সংগঠন তাঁকে জানে মারার হুমকি দিয়েছে। তাঁকে অনেকদিন আগেই মুরতাদ টাইটেল দেয়া হয়েছে। ড. আহমদ শরীফকে যারা জানতেন তাঁর ঋজু এবং যুক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিটির সঙ্গে যারা পরিচিত ছিলেন, এ সমস্ত ভয়-ভীতির কারণে তাকে পরিত্যাগ করাতো দূরের কথা, সবসময় তাঁর চারপাশে অবস্থান গ্রহণ করতেন। তিনি যখন তাঁর প্রাত্যহিক নিয়ম মেনে ধানমণ্ডির এক নম্বর রোড থেকে হেঁটে হেঁটে সেহরাওয়ার্দী উদ্যানে যেতেন অনেক লোক তাঁর এ পদযাত্রার শরিক হতেন। যারা শরিক হতেন তাদের মধ্যে পাকা চুলের বুড়ো মানুষ যেমন থাকতেন, তেমনি অংশ নিতেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের জিজ্ঞাসু তরুণ ছাত্রছাত্রীর দল। গোধূলি বেলায় সূর্যের আলো যখন ম্লান হয়ে আসতো সে সময়টিতেই ড. আহমদ শরীফ, তার সান্ধ্য আসরটি করতেন। তাঁকে মাঝখানে রেখে চারপাশে অনেক মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে পড়তেন। এ আরো নানা বিষয়ের ওপর আলোচনা-পর্যালোচনা চলতো। সিরিয়াস বিষয় যেমন উঠে আসতো, তেমনি হাসি-ঠাট্টা-তামাশার কথাও আলোচনায় স্থান পেতো। অনেক কঠিন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ের ওপর সুদীর্ঘ বাদানুবাদ চলতো। ড. শরীফ বোধ করি বিশেষ একটি প্রয়োজনের তাগিদে এ আসরটি চালু করেছিলেন। বেশ কিছু দিন পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর চাকরির মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছিলো। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর চাকরির সময়সীমা বাড়াতে রাজি হননি। বাংলা একাডেমিতে একবার তাঁকে একটা বিষয়ের ওপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো। কিন্তু সে অনুষ্ঠানটির পূর্বের দিন তাঁকে টেলিফোন করে জানানো হলো, তিনি যদি অনুগ্রহ করে সভাটিতে না আসেন, তাঁরা খুব কৃতার্থবোধ করবেন। সুতরাং ড. আহমদ শরীফের সে

অনুষ্ঠানে যাওয়া হলো না। শরীফ সাহেব ছিলেন ভারি মিশুক এবং আমুদে মানুষ। তিনি লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে খুব পছন্দ করতেন। কিন্তু তাঁর মতামতের কারণে কথা বলার ক্ষেত্রগুলো ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে আসছিলো। ইদানিং তাঁকে লোকজন সভা-সমিতিতে ডাকতে শঙ্কিত বোধ করতেন, কি জানি কে কখন হামলা করে বসে। এ সমস্ত কারণে ড. শরীফ তার সন্ধ্যাবেলার আসরটি চালু করেছিলেন এবং শুক্রবারে বাড়িতে স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘের আসরটিও শুরু করেছিলেন।

শরীফ সাহেব ছিলেন মননে চিন্তায় অস্থিমজ্জায় একজন শিক্ষক। মুখ্যত শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করার আন্তরিক তাগিদ থেকেই তিনি এ সকল কাজ কর্ম অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে করে যেতেন। তাঁর এ জন্মদিনটিতে স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘ এবং সান্ধ্য আসরের লোকেরা অনেকটা পার্টিজান স্পিরিট নিয়ে অংশগ্রহণ করতেন। সমাজের নানা স্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ নিবেদন করতে সকাল থেকেই তাঁর বাড়িতে ভিড় করতে আরম্ভ করেছিলেন। তাদের মধ্যে তাঁর প্রাক্তন ছাত্ররা ছিলেন সহকর্মীরা ছিলেন, প্রগতিশীল রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের নেতা-কর্মীরা ছিলেন। তখন বোধ করি সন্ধ্যে ৭টা, আমার সঙ্গে ছিলেন ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা হায়দার আকবর খান রনো, বাংলাবাজার পত্রিকার চেয়ারম্যান ইয়াহিয়া খান এবং আরেক বন্ধু দেলোয়ার হোসেন। আমার মনে হলো আমাদের যাওয়াতে স্যার খুশি হয়েছেন। তার পেছনে একটা কারণ অবশ্য আছে। অনেকদিন থেকে স্যারের বাড়িতে যাওয়া-আসা আমি এরকম ছেড়ে দিয়েছিলাম। এ জন্মদিনটিতে আমি যে যাবো—এটা ছিলো স্যারের কাছে একরকম প্রত্যাশিত। তিনি আমার সঙ্গে কোলাকুলি করে বললেন, এসো তোমরা সঙ্গে একটা ছবি ওঠাই। আমি একটু শরমিন্দা হয়ে পড়লাম। বন্ধু-বান্ধবদের বাদ দিয়ে একা আমার সঙ্গে ছবি ওঠালে অন্যরা পাছে কিছু মনে করে, তাই আমি বললাম, তার আগে স্যার আমাকে সুযোগ দিন এ গণ্যমান্য ভদ্রলোকদের সঙ্গে আপনার ছবি ওঠাই। যা হোক ছবি ওঠানো হলো।

আমার মনের মধ্যে একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করে স্যারকে জন্মদিনের অভিনন্দন জানাতে গিয়েছিলাম। সে পরিকল্পনা অনুসারে স্যারকে আমি বললাম—স্যার আজ এ বিশেষ দিনটিতে আপনি মওলানা ভাসানী ১৯৫৭ সালে কাগমারিতে যে প্রকাণ্ড সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন, সে রকম একটা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের ঘোষণা দিন। শরীফ স্যার তৎক্ষণাৎই তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বললেন, এ জাতি অনেকদিন পর্যন্ত কাগমারি সম্মেলনের সুফল ভোগ করে এসেছে। সাম্প্রতিককালে আমাদের জনজীবনে কাগমারি সম্মেলনের আর বিশেষ গুরুত্ব নেই। এখন নতুন কিছু করার প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। আমি বললাম, সে জন্যেই তো স্যার আপনাকে ওই রকম একটা সম্মেলনের ঘোষণা দেয়ার কথা বলছি। স্যার অস্ফুটে আফসোস করে বললেন, দেখো আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি, কখন ওপারে যেতে হয়। আগে তোমরা আসতে এখন তোমরা আসনা, এতো বড়ো একটা ঘটনা ঘটিয়ে তোলার উদ্যম সাহস আমি এ বুড়ো বয়সে কোথায় পাবো। আমি বললাম, স্যার আপনি কমসে কম আরো পঁচিশ বছর বাঁচবেন। এ জন্মদিনে একটা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করার ঘোষণা দিয়ে এ জন্মদিনটাকে সার্থক করে তুলুন। কর্মীর ব্যাপারে আপনাকে চিন্তা

করতে হবে না। গায়ে খাটার যেটুকু কাজ আমরাই সেটা করবো। মনে হলো কথাটা স্যারের মনে ধরেছে। তিনি বললেন। দেখি কি করা যায়, ১৯৯৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে বামপন্থী দলসমূহের মান্যগণ্য নেতা এবং কর্মীদের, প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের কর্তা ব্যক্তদের তিনি তাঁর বাড়িতে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। বদরুদ্দীন উমর, রাশেদ খান মেনন, শ্রী নির্মল সেনসহ অনেকেই তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার বাড়িতে এসেছিলেন। ড. আহমদ শরীফ সমবেত অতিথিদের সামনে তাঁর পরিকল্পনাটি ব্যাখ্যা করছিলেন। ঠিক এ সময়ে সংবাদ এলো জনসভায় ভাষণ দেয়ার সময় জাসদ নেতা কাজী আরেফ কতিপয় সঙ্গী-সাথীসহ আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। এ মর্মান্তিক সংবাদ শ্রবণ করার পর আর আলোচনা সভাটি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ওই একই মাসের ফেব্রুয়ারি মাসের ২৪ তারিখ শরিফ স্যারতো এ পৃথিবী থেকে চলেই গেলেন, সেই প্রস্তাবিত সম্মেলনটি আর অনুষ্ঠিত হয়নি।

দুই.

ড. আহমদ শরীফ সাহেবকে নিয়ে অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে আলোচনা-পর্যালোচনা চলতে থাকবে। যদিও তিনি ছিলেন একেবারে একজন পারিবারিক মানুষ, দায়িত্বশীল স্বামী, স্নেহপরায়ণ পিতা এবং একটি একান্নবর্তী পরিবারের অবিসংবাদিত কর্তা তথাপি আমাদের সমাজে তিনি একজন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাঁর জীবদ্দশাতেই স্বীকৃতি অর্জন করে ফেলেছিলেন। অথচ এ কথাও মিথ্যে নয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত আইন-শৃঙ্খলা এবং নিয়ম-কানুন মেনে সুদীর্ঘকাল শিক্ষকতা করার পরও তাঁর চরিত্রের ব্যতিক্রমী লক্ষণটি তাঁর অন্যবিধ অনেক পরিচয়কে ছাপিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

ড. আহমদ শরীফ গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাওয়ার মানুষ ছিলেন না। তিনি সব সময় ভিন্ন রকম কিছু করার এবং বলার চেষ্টা করেছেন। তার বিশ্বাস এবং উচ্চারণের কতোখানি গ্রাহ্যতা লাভ করবে সেটা পুরোপুরি যাচাই করে দেখার সময় এখনো আসেনি, চমক সৃষ্টি করার একটা প্রবণতা বরাবরই তার মধ্যে ছিলো। সমকালে মানুষ তার এ ধরনের উচ্চারণের প্রতি কম-বেশি আকৃষ্ট বোধ করেছে। এ কারণে তাকে এন্তার প্রতিবাদেরও সম্মুখীন হতে হয়েছে।

আমি সামান্য মানুষ। ড. আহমদ শরীফের জীবন এবং কর্মের ওপর কোনো নির্ভরযোগ্য মন্তব্য করার ক্ষমতা থাকার কথা নয়। তথাপি আমি মনে করি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের গবেষক হিসেবে তিনি যে যোগ্য পরিচয় দিয়েছেন, তার সঙ্গে তুলনা করার মতো মানুষ, দুই বাংলার গবেষক সমাজে অধিক খুঁজে পাওয়া যাবে না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন ধর্মহীন নাস্তিক। মৃত্যুর পরও তার মরদেহটি ইসলামী অনুশাসন অনুসারে সমাহিত না করার নির্দেশ তিনি স্ত্রী-পুত্রদের কাছে দিয়ে গিয়েছিলেন। এ মানুষটি নেহাত সত্য উৎঘাটনের তাগিদে মধ্যযুগের সাহিত্য সংস্কৃতিতে মুসলিম সাহিত্য সাধকরা যে বিশাল এবং বিপুল অবদান রেখে গিয়েছেন, সেই জিনিটটি সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। শরীফ সাহেবের লিখিত এবং সম্পাদিত গ্রন্থের পরিমাণ একশ'রও

অধিক। তিনি যদি আর কিছু না লিখে জীবনে একটি মাত্র প্রবন্ধ লিখে যেতেন বাংলার সামাজে অনেকদিন পর্যন্ত স্মরণীয় হয়ে থাকতেন।

ঊনবিংশ শতাব্দি থেকে শুরু করে অদ্যাবধি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ব্যাখ্যাকাররা একটি বিষয়ই জোর দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছিলেন যে, তুর্কী আক্রমণের পরে বাংলাদেশে যে মুসলিম শাসন কায়েম হলো তার পুরো দেড়শ বছর সময়টি ছিলো বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ। শরীফ সাহেব সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে নয় প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য উদঘাটনের খাতিরে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন তুর্কি আক্রমণের পর বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ চেপে বসেছে। এতে আংশিক সত্যও নেই, শুরুর দিকে মুসলিম শাসকরা কিছুটা ধ্বংসাত্মক কাজ-কর্ম করেননি সেটা ঠিক নয়। কিন্তু সেটা দীর্ঘকাল অবধি বিস্তৃত হতে পারেনি। মুসলিম শাসন কায়েম হওয়ার পর বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এমন একটা ইতিবাচক যুগান্তর সৃষ্টি হলো, গভীরতা এবং ব্যাপ্তির দিক মিলিয়ে বিচার করলে একমাত্র ইংরেজ আমলে বাংলা সাহিত্যে যে উৎকর্ষ এবং সমৃদ্ধি ঘটেছে, তার সঙ্গে মুসলিম আমলে সূচিত উৎকর্ষের তুলনা চলতে পারে।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অধ্যাপক আহমদ শরীফ : স্মৃতিতে ভাস্বর

খায়রুল বাসার

শরীফ স্যারকে প্রথম দেখেছিলাম ১৯৭৮ সালে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ফ্রন্টের এক অনুষ্ঠানে। আমি সবেমাত্র পাড়াগাঁ থেকে তখন ঢাকায়। আটষট্টি-উনসত্তুর থেকে ছিয়াত্তর পর্যন্ত বৃহত্তর খুলনার বিভিন্ন জনপদ এবং গ্রামগঞ্জে কৃষক-শ্রমিকের মাঝে নাটকের মাধ্যমে গণসচেতনামূলক কাজ করেছিলাম অনেকটা ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টায়। উল্লেখিত সময়কালের মধ্যে অনেকবারই ইচ্ছুক কর্মীরা সমবেত হয়েছি। নাট্যদল গড়ে তুলেছি, আবার ভেঙ্গে গেছে। লোকজন চলে গেছে নানা কারণে, প্রয়োজনে। অনেকজন মিলে অনেকদিন ধরে একসাথে থাকা সম্ভব হয়নি। অবশ্য লোক বদল হলেও নাট্যক্রিয়া চলেছিল নির্দিষ্ট লক্ষ্য উদ্দেশ করে। লক্ষ্য ছিল শ্রমিক কৃষক তাঁতী কারিগরদের, নিম্নবিত্ত, বিত্তহীনদের অর্থনৈতিক মুক্তি আনতে ঐক্যবদ্ধ সশস্ত্র বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করা। আমরা একে বলতাম আনন্দদানের মাধ্যমে এই সব বঞ্চিত অবহেলিত মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে নাট্য আঙ্গিক ব্যবহার। ঐ নাট্যে নৃত্য, গীত, কমিক করে পৃথক কোনো বিনোদনের ব্যবস্থা ছিল না। কৃষক-কারিগরের বঞ্চনা-হতাশা-সংগ্রামের কথা থাকত। সরকারিভাবে নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের ভাইয়েরা ঐসব নাট্যকর্মে উৎসাহ যোগাতেন। সে সময় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে পড়াশুনা একটা প্রধান কর্মসূচী ছিল। যা নিয়ে দলাদলি কিংবা রেষারেষি কিংবা মনকষাকষি কিংবা ভাগাভাগি কিংবা চেঁচামেচি, সে বিষয়ে দেশি-বিদেশি তাত্ত্বিক এবং প্রয়োগকারীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সমন্বিত বই পড়ার প্রচলন ছিল। পড়ে সেগুলো মান্যগণ্য করে চলারও প্রচেষ্টা ছিল। রাজনৈতিক সংগ্রাম-বিপ্লবে নাটকও যে একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারে এ সব নিয়ে ঐ ভায়েরা যুক্তি দেখাতেন; বই পড়তে দিতেন। আমরা অবশ্য কৃষক-শ্রমিক-তাঁতী কারিগরদের মাঝে নাট্যানুষ্ঠানের পরে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ দেখেই এ সবের সত্যতা অনুধাবন করতাম। শরীফ স্যারের সাথে পরিচয়-পূর্ববর্তী ভূমিকা এমন হল এই কারণে যে, এ ছাড়া অন্য কোনো পুঁজি আমার ছিল না, যা নিয়ে তাঁর সান্নিধ্যে হাজির হওয়া যায়। ঐ সময়, আটাত্তরের দিকে, ভাঙা নাট্যদলের একজন কর্মী হয়ে ঢাকায়

গিয়ে উঠি। রাজধানী শহরে। সমমনা প্রগতিশীল ব্যক্তিত্বদের সমন্বয়ে তখন চেষ্টা চলছে ঐক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের। এরই একটা অনুষ্ঠানে আমি একটি একক নাটকে অভিনয় করি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ফ্রন্টের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে। খোলা জায়গা, দিনের বেলা (বিকেল), তাতে আবার একজন মানুষ (পুরুষ) নাটক করবে, আয়োজকদের ঘোষণায় উপস্থিত দর্শকবৃন্দের কেউ কেউ খুব একটা খুশি হননি। তবু কৌতূহলী হয়ে অপেক্ষা করেছিলেন। আমার মনে আছে, আয়োজকদের একজন ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক, উনার ঘাড়ে একটি জালের বোনা থলে ঝুলানো ছিল। থলেটা আমি চেয়েছিলাম অভিনয়ের প্রয়োজনে। উনি দেননি। বলেছিলেন চলে যাবেন। পা-ও বাড়িয়েছিলেন। আমি অভিনয় করতে করতে দেখছিলাম তিনি দর্শকদের পেছন থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে আমার অভিনয় দেখছেন এবং ঐ রকম অর্ধবক্রাকারে দাঁড়িয়ে ৪৫ মিনিটের নাটকটার সবটা দেখেছিলেন। নাটক শেষে অনেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। সবাইকে চিনতাম না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক জাফর ভাই চিনিয়ে দিয়েছিলেন অনেককে। তার মধ্যে সৌম্যদর্শন, প্রশস্ত ললাট, সুগভীর দৃষ্টিধারী বাবরী চুলের সুন্দর মানুষটিকে চিনেছিলাম–ড. আহমদ শরীফ। নির্ভীক সত্যাশ্রয়ী পণ্ডিত, অভিভাবক। বলেছিলেন, খুব ভাল হয়েছে। উনার সেই প্রশংসিত নিঃশব্দ হাসিমুখ আমৃত্যু আমার স্মৃতিতে জাগরূক থাকবে। এরপর গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ফ্রন্টের বেশ কিছু কাজ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি মিলনায়তনে (বড়) জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তখন ঢাকা বেশ মুখর। আমি কাজ করতাম 'অস্বীকার'-অধিকাঠামোমূলক প্রতিষ্ঠানের হয়ে। আফজালুল বাসার বাবলু সংগঠক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকটি হলের মিলনায়তনে তখন জাতীয় ছাত্রদলের আমন্ত্রণে আমার ঐ একক নাটকও অভিনয় করছি। অস্বীকারের ব্যানারে বাংলা একাডেমীর তিন তলায় এবং অন্যান্য মুক্তাঙ্গণে আমাদের অপরাপর নাটকগুলিও অভিনয় করছি। শরীফ স্যার তখন থাকেন ফুলার রোডের কোয়ার্টারে। নিয়মিত আড্ডা তখনও চলত। একদিন আমাকে ডাকা হল। পেছন দিকে বসেছিলাম। নানান প্রোগ্রামের খসড়া প্রণয়নের পর বললেন, আমাদের নাটকের ছেলেটা আসেনি? আমি বুঝেছিলাম আমাকেই বলছেন, সাড়া দিলাম। উনাদের "নাটকের ছেলেটি" হতে পেরে সেদিন আমার খুব ভালো লেগেছিল।

এর বেশ কিছুদিন পর, আমার *সৈনিক* উপন্যাসের প্রকাশনা উৎসবের সভাপতি তিনি। উৎসবের আয়োজন মেসবাহ কামালের বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, স্থান টিএসসি মিলনায়তন, তিনতলায়। আবুল কাসেম ফজলুল হক, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, শওকত আলী, মহসিন শস্ত্রপাণিদের যুক্তিগ্রাহ্য সমালোচনার পর তিনি আনাড়ি ঔপন্যাসিককে চুল ধরে টেনে দাঁড় করালেন। বললেন, উনার রচিত দুই একটি নাটক আমি দেখেছি। .... সবচেয়ে বড় কথা, সবচেয়ে কাজের কথা যে, এ যুগে জীবনের জন্যই সাহিত্য, শিল্প। জীবনের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য সব। জীবন জীবিকার জন্য যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামের সাহিত্য তিনি রচনা করেছেন। শিল্পের দিকে দৃষ্টি দিলে এ সাহিত্য সহজে সৃষ্টি

হয় না। এ সাহিত্য মুক্তির সাহিত্য, এ হচ্ছে ক্ষোভ এবং দ্রোহ জাগাবার সাহিত্য। এ ধরনের সাহিত্য কেজো সাহিত্য। আমরা এটাই চাই।' তিনি মহৎ বলেই এক ক্ষুদ্র কথাশিল্পীকে অলংকৃত করেছিলেন তার অনুপ্রাসলব্ধ বাক্যরাশিতে।

মহিলা সমিতি মঞ্চে আমার *বসতি* নামের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের প্রিমিয়ার শো হল। শো-এর পরে আলমগীর কবির এবং অধ্যাপক আহমদ শরীফ আলোচনা করেছিলেন। আলমগীর কবির চলচ্চিত্রটির বিভিন্ন দিক বিশেষ করে টেকনিক্যাল দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি এ ধরনের স্বল্পদৈর্ঘ চলচ্চিত্র নির্মাণকে স্বাগত জানান। এটা স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আন্দোলনের প্রথম দিককার কথা। তিনি তার ক্যামেরা এবং ল্যাবরেটরি আমার জন্যে মুক্ত ঘোষণা দেন। এরপর অধ্যাপক আহমদ শরীফ তার স্বভাবসিদ্ধ কথায় বলেন, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এদেশে নতুন। এতে কোনো ভাব দানা বাঁধতে না বাঁধতে অন্য প্রসঙ্গে চলে যায় বলে মানুষের আবেগের খেলা পুরোটা জমে না। তবে মস্তিষ্কে প্রশ্ন জাগে। এই চলচ্চিত্রে মানুষের ভালভাবে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা, উন্নতভাবে জীবনযাপনের অধিকার, শোষণ শাসন ত্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছে, আছে নতুন জন্মের নতুন আন্দোলনের আহ্বান। এ প্রয়াসকে আমরা স্বাগত জানাই।

এসব ঘটনা একটি দুটি নয়। অধ্যাপক আহমদ শরীফ এ রকম অজস্র সভা-সমাবেশের এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রয়াসের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন। জনগণের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রতি শরীফ স্যারের অকৃত্রিম সমর্থন এবং সক্রিয় নেতৃত্বদান অব্যাহত ছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন এ ধরনের আন্দোলনের পুরোধা।

রাজনৈতিক আন্দোলনে অধ্যাপক আহমদ শরীফ : এক স্মরণীয় বিকেল

হাসান ফকরী

১৯৯৪ সালের কথা। জুলাই মাসের ২৮ তারিখ। ভারতের মহান বিপ্লবী কমিউনিস্ট নেতা কমরেড চারু মজুমদারের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি সড়কদ্বীপে আয়োজন করা হয়েছিল এক আলোচনা সভার। উদ্যোক্তাদের মধ্যে আমিও একজন। আমার ওপর ন্যস্ত দায়িত্বের কারণে মঞ্চে লাইট মাইক ব্যানার যথাসময়ে যথাযথভাবে লাগানোর জন্যে নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই আমি সেখানে উপস্থিত হই। তখনও সভার কেউ আসেননি। এখানে ওখানে দুচারজন বসা, একদুজন ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ যেতে না যেতে ২০/২২ বছর বয়সের দুটি ছেলে ঘুরঘুর করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কাছে এসে বসল। ব্যানার দেখেও আমার কাছে জানতে চাইল কিসের মিটিং? বললাম, কমরেড চারু মজুমদারের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মিটিং। আবার জিজ্ঞেস করল কে চারু মজুমদার, তার বাড়ি কোথায় এবং আরো অপ্রিয় অনেক অনেক কিছু। প্রশ্নের ধরন দেখে বুঝতে কষ্ট হল না এরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া, অবশ্যই কোনো বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের পাতি ক্যাডার। আমি তাদেরকে যতই পাশ কাটাতে চাই তারা ততই গায়ে পড়ে একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকে। আজকের সভায় বক্তা কারা কারা জিজ্ঞেস করাতে আমি শুধু বলি প্রফেসর ডক্টর আহমদ শরীফসহ অনেকে। পাশের ছেলেটি শরীফ স্যারের নাম শুনেই বলে উঠলেন-আপনি কি আহমদ শরীফের ছেলে? এই কথা শুনে আমার মধ্যে প্রচণ্ড রাগ হল। আমারও বিরূপ কিছু বলার ইচ্ছা হল। কিন্তু আমার রুচিতে বাধল। আমি সংযত ও শান্ত কণ্ঠে বললাম, আমার জন্মদাতা বাবার নাম আব্দুল করিম। আমি আহমদ শরীফের রক্তের ছেলে না হলেও এবং তোমরা খোঁচা মারার জন্য বললেও আমি ভীষণ খুশি এবং আনন্দ অনুভব করছি। আমি তোমাদের কাছে নির্দ্বিধায় স্বীকার করছি--হ্যাঁ, আহমদ শরীফ আমার পিতা, আমি তাঁর আদর্শিক পুত্র। তোমরা তাঁকে আমার বাবা বলায়, অজান্তেই আমার বুক ফুলে উঠেছে এবং আমি ভীষণ গর্ববোধ করছি। এই সাথে আরেকটি কথা না বলে পারছি না। তা

হল তোমরাও যদি এমন সত্যবাদী পণ্ডিত নিরহঙ্কারী সাহসী পিতার আদর্শিক সন্তান হতে পারতে নিশ্চয়ই ক্ষেপে না গিয়ে খুশিতে আত্মহারাই হতে। আমার এই যথোপযুক্ত জবাবের পর ছেলে দুটো কথা না বাড়িয়ে তখনকার মত চটজলদি উধাও। ঠিক ক্ষতে ঠিক ঔষধ ঠিকমতো পড়লো কিনা বুঝলাম না।

যাক সে কথা। মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। যথাসময়েই সভা শুরু হল, সভা পরিচালনার দায়িত্বে আমি, দু'তিন জন বক্তার বক্তব্যের পর অকস্মাৎ সশস্ত্র আক্রমণ। বোমা ফাটল, চলল কাটা রাইফেলের গুলি। মঞ্চে উঠে ভাঙতে লাগল লাইট মাইক স্ট্যান্ড। সে এক ভয়ঙ্কর দুর্ধর্ষ ধ্বংসযজ্ঞ। মঞ্চে উপবিষ্ট আলোচকবৃন্দের কেউ কেউ আহত হয়ে সরে যেতে বাধ্য হলেন। এমনই এক ভয়াবহ বীভৎস পরিস্থিতিতে অদম্য চিত্তে শান্ত ধীর স্থির হয়ে বসেই রইলেন হিমালয় অটল বুকের পাটা নিয়ে অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ড. আহমদ শরীফ।

সেদিন সেখানে এমনতর পরিস্থিতিতে সামান্যতম বিচলিত বা আতঙ্কিত হতে দেখিনি স্যারকে। আমি শঙ্কিত হয়ে স্যারকে জড়িয়ে ধরলাম, যেন স্যারের গায়ে কোনো আঁচড় লাগতে না পারে। স্যারকে নিয়ে কোনোভাবে মঞ্চ থেকে রোকেয়া হলের দক্ষিণ পূর্ব কোণে গিয়ে একটি বেবি টেক্সিতে করে ধানমন্ডি ১ নং রোড রওনা দিলাম। টিএসসি থেকে ধানমন্ডি ১নং রোড স্যারের বাসায় যেতে যেতে স্যার আমাকে বেশ বকাঝকা করলেন। একটি কথা না বললেই নয়, স্যার যখন কোনো বিষয়ে কথা বলতেন বা বকাঝকা করতেন তখন আমি আমাকে মনে করতাম গ্রামের পাঠশালায় পন্ডিত স্যারের সামনে মাদুরে বসা সেই ছোট্ট শিশুটি। যেন অ আ ক খ শিখছি। সত্যি, স্যারের বকাঝকাই ছিল জীবন সংগ্রামের পাঠ, ছিল মহামূল্যবান সম্পদ।

সেদিন বেবি টেক্সিতে স্যারের বকাঝকার দুচারটা কথা যা আজও অবিকল আমার মনে পড়ে, শক্তি সাহস প্রেরণা জোগায় শোষণ মুক্তির সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হতে। স্যার সেই ক্ষণিক পথযাত্রায় বলেছিলেন, "তোমরা তোমাদের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট বলে দাবি করো, এই সব ভুল, মিথ্যা। খালি হাতে তোমরা তোমাদের আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে পারবে না। এই সকল বুর্জোয়া দল-ফ্যাসিস্টদের মোকাবেলা করতে হলে তোমাদের সর্বক্ষণ যথাযথ প্রস্তুত থাকতে হবে। আদর্শিক প্রস্তুতি খুবই প্রয়োজন। কিন্তু শুধু আদর্শিক প্রস্তুতিতেই কাজ হবে না। আদর্শকে বাস্তবায়নের উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন করতে হবে। খালি হাতে অস্ত্রের মোকাবেলা করা যায় না। কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী মতবাদ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্যে থাকতে হবে সশস্ত্র বাহিনী। মনে রেখো এই সমাজ শক্তের ভক্ত নরমের যম। শহরে ৩০/৪০ জন লোক নিয়ে সভা সমাবেশ করলে বিপ্লব হবে না। চেষ্টা করো গ্রামে গ্রামে গিয়ে যুবকদের কৃষকদের সংগঠিত করতে। তোমাদেরকে এই অস্ত্রের মোকাবেলা করতে শক্তি বাড়াতে হবে।" এই কথাগুলো আমার কাছে মনে হচ্ছিল টিএসসির সেই সভায় স্যারের বলতে না পারা মহামূল্যবান বক্তব্যেরই সারাংশ। যা আমার হৃদয়পটে অমোচনীয় স্মৃতি হয়ে থাকবে আমৃত্যু।

পরিশেষে আমি সদ্য প্রয়াত যুক্তিবাদী মহাপণ্ডিত সশস্ত্র শ্রেণীসংগ্রামের একনিষ্ঠ সমর্থক ড. আহমদ শরীফের এক বিকেলের স্মৃতিচারণেই আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই না। মেহনতী মানুষের বন্ধু, বিপ্লবীদের পথ প্রদর্শক ড. আহমদ শরীফের আদর্শ বাস্তবায়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকৃত মার্কসবাদীদের এগিয়ে আসার আহ্বানের মাধমে তাঁর প্রতি শোকাঞ্জলি জানিয়ে শেষ করতে চাই।

স্বাধীনতা সংগ্রামের পথিকৃৎ অধ্যাপক আহমদ শরীফ

আবদুল আজিজ বাগমার

মহাকালের চিন্তা চেতনা যুক্তি ও ভাবনার অনুশীলনকারী এক মহাপুরুষ ড. আহমদ শরীফ। একটি শব্দ ছিল তাঁর আজীবনের সাধনা ও তপস্যার মূল কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর ভাষায় বলছি, "লেখক যে 'শ্রেয়'-এর সন্ধানে ব্যাকুল ও দিশেহারা"।

এই মঙ্গলচিন্তা প্রাণে অনুভব করে, চোখে দেখে, তা প্রকাশের সাধনায় মগ্ন ছিলেন অধ্যাপক আহমদ শরীফ। স্বদেশের ইতিহাসবোধ তাঁর ছিল গভীর। ইতিহাসবোধ ছিল তাঁর মূল শক্তি ও প্রেরণার উৎস।

ভাষা আন্দোলন, আদমজী জুট মিলে (১৯৫৪ইং) নির্বিচারে জালিয়ানওয়ালাবাগ স্টাইলে বাঙালি শ্রমিক হত্যা ও ৯২ (ক) ধারা জারী তথা যুক্তফ্রন্ট সরকার খতম ও পরবর্তীতে সামরিক আইন ঘোষণার কারণে আমরা যুবকেরা এবং বাঙলার সচেতন জনগণ বাঙলার স্বাধীনতার জন্য, বেপরোয়া, ব্যাকুল ও দিশেহারা। আমরা তখন চূড়ান্ত পথের খোঁজে ব্যস্ত।

ফলশ্রুতিতে সংগঠিত হয় অস্থায়ী পূর্ব বঙ্গ সরকার, সাংস্কৃতিক নাম ছিল অপূর্ব সংসদ। প্রকাশনার পরিচয় ছিল অপূ। ১৯৬২ সালের কথা। অধ্যাপক শওকত ওসমান আমাদের পথের সঙ্গী, সাথী ও সহযোদ্ধা ছিলেন ১৯৬১ সাল থেকে। ইতোমধ্যে সাক্ষাৎ ঘটে জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-এর সঙ্গে। আমাদের কথা শ্রবণ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। প্রশ্ন করেন, "তোমাকে কে শিখিয়েছে এসব কথা?" জবাব দিলাম, মহান আল্লাহ পাক। ভূগোল আর ইতিহাসের চিত্র দেখে আমার মনে এসেছে। আমরা সিরাজের ঠিকানায় বাংলার স্বাধীনতা চাই। ঠিকানা জানতে চাইলেন। বললাম "টেকনাফ সম্বলপুর দার্জিলিং ইটানগর তথা সিরাজের ঠিকানায়।" আর কিছু জিজ্ঞেস করেননি। কঠিন উপদেশ দিলেন। "নিয়মিত নামাজ পড়বে, ব্যায়াম করবে, প্রাতঃভ্রমণ করবে, জীবন বিপন্ন অবস্থা ছাড়া সদা সত্য কথা বলবে। যেমন আমাকে বলেছ।"

অতঃপর চির নির্ভীক স্বাধীন এই ব্যক্তিত্ব লিখে দিলেন অনাগত কালের অবিনশ্বর বাণী :

"তুমি মুক্ত পাখীর মতন স্বাধীন,
খাঁচা তোমার মায়ার বাঁধা

নয়নে তোমার কুহকের ডাল
দুখ তোমার কেবলি বাঁধা।"

স্বাধীনতার স্বপ্ন প্রথম বাস্তবায়ন প্রয়াসে ইতিহাসের অমর উপাদান। তারিখ ৫.৪.১৯৬৩।

বাংলার মুক্ত বুদ্ধির ধারক ও বাহক ড. আহমদ শরীফ একই সময় আসেন পুরনো ঢাকায় পাকিস্তান মাঠে অতিথি হয়ে, ছাত্রলীগের আলোচনা সভায়। এই যোগাযোগ আজীবন অটুট ছিল। আলোচনা চলতে থাকে। তিনি আস্থা রাখেন। আমাদের বিশ্বাস করেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনার সকল জানালা খোলা থাকে আমাদের জন্য। অস্থায়ী পূর্ব বঙ্গ সরকারের (সাংকেতিক নাম অপূর্ব সংসদ) সকল কার্যক্রম বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়।

ড. আহমদ শরীফ নির্ভীক চিত্তে তখন থেকে এই অস্থায়ী পূর্ববঙ্গ সরকারের অন্যতম প্রধান উপদেষ্টার ঐতিহাসিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই মহান দায়িত্ব বাঙালি জাতির পক্ষে তিনি একশত ভাগ পালন করেছেন। কাজের সকল পর্যায়ে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এমনকি নিজের জীবন বিপন্ন করে।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে লাহোর ফ্রন্টে (ওয়াগা) পাকিস্তানের শোচনীয় পরাজয়কে গোপন করার জন্য সম্পূর্ণ অরক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানে তুমুল বেতার যুদ্ধ চলে। রাজপথে চলে মিছিল। লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করার প্রতিযোগিতা চলে। বেতার যুদ্ধ সফল হয়। ঠাকুরগাঁওয়ে ভারতীয় বোমা বর্ষণের ফলে পঞ্চাশ জনের মৃত্যুর খবর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে অসহায় অরক্ষিত বাঙালি জেনে যায় আসল খবর। সব মিথ্যা প্রচার। অপূর্ব সংসদ কালবিলম্ব না করে সংবাদপত্রে বিবৃতি পাঠায়। অবিলম্বে ঢাকা থেকে বুদ্ধিজীবী, ছাত্র ও সাংবাদিক লাহোরে নিয়ে যাবার জন্য এবং অনুরূপভাবে লাহোর থেকে বুদ্ধিজীবী, ছাত্র ও সাংবাদিক দল ঢাকা তথা ঠাকুরগাঁও পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। ইত্তেফাক ব্যতীত অন্যসব পত্রিকা বলল, ন্যায্য দাবি, বিবৃতি যাবে।

আমি সবার পরে স্বয়ং ইত্তেফাকের নিউজ সেকশনে উপস্থিত হই। দোতলায়, টিনশেডের নীচে, চীফ রিপোর্টার, চির রসিক, খন্দকার আবু তালেব ভাইয়ের সম্মুখে। প্রেস রিলিজ তার হাতে দিলাম। তিনি পড়লেন। আমাদের অনেকের প্রিয় শ্রদ্ধাভাজন তালেব ভাই আমার সঙ্গে কোনো কথা বললেন না। দক্ষিণ প্রান্তে মাঝখানে বসা সকলের মধ্যমণি সিরাজ ভাইকে ডাকলেন, "সিরাজ, তোর এই লোক ভীষণ খারাপ, যে বউ আমি এখনো বিয়ে করি নি, তাকে দেখতে চায়। দেখার দাবি লিখে নিয়ে এসেছে। আমি দেখাতে পারব না।"

পাল্টা রসিকতায় সিরাজ ভাই জবাব দিলেন, " তোর সব কথা আমাকে জানাস, আর এত বড় গোপন বিষয় আমি জানি না, বাগমার কিভাবে জানল?"

অতঃপর তালেব ভাই বিবৃতিটি সিরাজ ভাইয়ের নিকট হাওলা করেন। এবার সম্মিলিত জবাব আসে, "যাবে না।" গেলে পত্রিকা বন্ধ হবে। আমরা সব বেকার হব। আরও অনেক কথা। প্রসঙ্গত উল্লিখিত হতে পারে—এই পত্রিকায় ইতোপূর্বে বা পরে কখনো আমার তথা আমাদের কোনো সংবাদ মুদ্রিত না করার ঘটনা ঘটেনি। ড. আহমদ শরীফের ঐতিহাসিক ভূমিকা সহজ করে বলার জন্য এই পটভূমি উল্লেখ করলাম।

ইতোমধ্যে অস্থায়ী পূর্ববঙ্গ সরকারের স্বাধীনতার চূড়ান্ত ইস্তেহার রচিত হয়েছে, সম্পাদিত হয়েছে এবং মুদ্রণ প্রক্রিয়াধীন ছিল। প্রকাশের তারিখ নির্ধারিত হয়নি তখনও।

স্মর্তব্য, কোনো পত্রিকা পরদিন অপূর্ব সংসদের বিবৃতি প্রকাশ করেনি। অতঃপর জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। ১ অক্টোবর, ১৯৬৫ স্বাধীনতার চূড়ান্ত ইস্তেহার প্রকাশিত হল।

ইস্তেহারের শিরোনাম ছিল–

"অপূ-৩ ইতিহাসের ধারায় বাঙালি"। বাঙলার আবহমান কালের সঠিক ইতিহাস স্পষ্টভাবে স্থান লাভ করে। কেন স্বাধীনতা চাই? তার কার্যকারণ বলা হল।

রচয়িতা আর কেউ নন স্বয়ং ড. আহমদ শরীফ। সকল প্রধান দূতাবাসসমূহে কপি বিতরণ করা হয়। একটি বড় মাপের দূতাবাস তিন ঘণ্টার মধ্যে, স্বাধীনতার ইস্তেহার, পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থার নিকট হস্তান্তর করেন। আমাদের তরুণ ব্রিগেডের একজন সদস্য ঐ দূতাবাসের সম্মুখে (অল্প দূরে) চিনাবাদাম বিক্রি করছিল। ইস্তেহারের কভারে ছিল শহীদ মিনারের লাল রং-এর ছবি (পূর্ণ পৃষ্ঠাব্যাপী)। সে দেখতে পায় একজন অবাঙালি ঐ পুস্তিকা নিয়ে যাচ্ছে। দূরে রক্ষিত বাইসাইকেল যোগে অনুসরণ করে। ঐ মুহূর্তে হঠাৎ করেই ছেলেটি ভীষণ ভয় পেয়েছিল। ঐ দূতাবাস যে রাষ্ট্রের, সে রাষ্ট্র বর্তমানে আমাদের পরম বন্ধু।

ইস্তেহার পেয়ে পাক পুলিশ গোপন সিদ্ধান্তে পৌঁছে, এটি হুমায়ুন কবীর রচনা করেছেন। এই ভাষা হুমায়ুন কবীরের। সে ছাড়া (তৎকালীন পাকিস্তানে) আর কেউ এ কাজ করেনি। কবীর সাহেবের একজন ভাই তখন এই বিভাগে কর্মরত ছিলেন।

কপি বিতরণ করা হয় প্রেসক্লাবের নীচতলায় উত্তর-পূর্ব কক্ষে। যেখানে পত্রিকা পড়ার স্ট্যান্ড ছিল। হাইকোর্ট, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, তথা কমবেশি সর্বত্র, জেলা, মহকুমা ও কোনো কোনো থানা সদরে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আবদুর রাজ্জাকের (বর্তমানে মন্ত্রী) নিকট জানতে চাওয়া হয়, কারা এগুলো প্রকাশ করেছে। তিনি জবাব প্রেরণ করেন, "আমাদের লোক।"

ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী অপূর্ব সংসদের তরুণ ব্রিগেডের সক্রিয় সদস্য আবদুল ওয়াহেদ উনু ২১ ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনারে পাঁচ হাজার কপি বিতরণ করেন প্রকাশ্যে।

রচয়িতার পরিচয় ইতোপূর্বে দেওয়া হয়েছে। মুদ্রণে অপূর্ব সংসদের প্রধান সমন্বয়কারীর নাম সংক্ষেপে মুদ্রিত হয়েছিল, যথা-আবাআ বিদ্যুৎ। প্রকাশকের সংক্ষিপ্ত নাম ছিল : এস. কামাল (কবি বেগম সুফিয়া কামাল)।

এই ইস্তেহারে জাতীয় সঙ্গীতের নমুনা মুদ্রিত হয়। মুজিবনগর সরকার অপূর্ব সংসদের প্রস্তাবিত জাতীয় সঙ্গীত বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করেছে। অপূর্ব সংসদের মনোগ্রামও বাংলাদেশের মনোগ্রাম হিসেবে গ্রহণ করেছে। আমাদের প্রদত্ত "শহীদ সড়ক" নাম অক্ষুণ্ন রয়েছে। বিএনপি তাদের নির্বাচনী প্রতীক গ্রহণ করেছে অপূর্ব সংসদের মনোগ্রাম থেকে–সমৃদ্ধির প্রতীক ছিল "ধানের শীষ"।

অস্থায়ী পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রথম ইস্তেহারের নাম ছিল "বাঙালি কি চায়"। দ্বিতীয় ইস্তেহার ছিল : "শকুন শৃগালের আবার বাঙলা আক্রমণ।"

রচয়িতা যথাক্রমে শহীদ মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ও আবদুল আজিজ বাগমার। ড. আহমদ শরীফের স্বাধীনতার পক্ষে কার্যক্রম ছিল সুদূরপ্রসারী।

অপূর্ব সংসদের উপদেষ্টা ছিলেন অধ্যাপক আবদুল হাই, শহীদ মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, শওকত ওসমান, ড. আহমদ শরীফ, কবি বেগম সুফিয়া কামাল প্রমুখ। প্রধান সমন্বয়কারী আবদুল আজিজ বাগমার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়কারী ছিলেন শান্তি নারায়ণ ঘোষ ও এনামুল কবির। রাজশাহী বিভাগে মিয়া মোঃ নজরুল ইসলাম। ঢাকা বিভাগে হাবিবুর রহমান। চট্টগ্রামে আবদুল ওয়াহেদ ও বিএম আমিনুল ইসলাম।

এ ছাড়াও কেন্দ্রীয়ভাবে কাজ করেছেন ডাঃ খন্দকার বজলুল হক, রিয়াজ উদ্দিন আহমদসহ আরও অনেকে। প্রতিটি ক্ষেত্রে ড. আহমদ শরীফের ভূমিকা ছিল নক্ষত্রতুল্য।

অগত্যা আমি যখন লন্ডন পৌঁছে যাই তখন সকল মহামান্য উপদেষ্টামণ্ডলী আমার সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন। তবে সিদ্ধান্ত পেলাম শুধু ড. আহমদ শরীফের মাধ্যমে। (সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্রঃ *স্বাধীনতার স্বপ্ন : উন্মেষ ও অর্জন* গ্রন্থে) ১৯৬৮ সালে লন্ডনে প্রকাশ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দাবি করি। পৃথিবী-বিখ্যাত দৈনিক দি টাইমস-এর প্রথম পৃষ্ঠায় আমার ছবিসহ ছাপা হয়। ১৯৬৯ সালে পুনরায় এই পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয় স্বাধীনতার দাবিসহ আমার ছবি। এমনিভাবে অনেক দেশের রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ভারতের শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁদের অন্যতম। সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গাফ্ফার খানের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় দ্বারা শাহ যোগাযোগের ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন।

পাকিস্তান হাই কমিশন দখল করার পর আমার ও জাকারিয়া খানের বিরুদ্ধে পাকিস্তান হাই কমিশন মোকদ্দমা দায়ের করে। Scotland Yard আমার সঙ্গে আলোচনায় বসে। জানালাম আমি সন্ত্রাসী নই। পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চলছে। শেখ মুজিব ক্যান্টনমেন্টে বন্দি কেন? আমরা স্বাধীনতা চাই। তোমরা মামলা করো আর না করো, আমরা স্বাধীনতার দাবি অব্যাহত রাখব। পরে ছাত্রদের তীব্র হুমকির মুখে হাই কমিশনার মোকদ্দমা প্রত্যাহার করে নেন। ড. আহমদ শরীফ সব ঘটনা অবগত ছিলেন।

এ দেশবাসী নিশ্চয়ই স্মরণ করবেন ৫ মার্চ ১৯৭১ সালের কথা। সেদিন ছিল শুক্রবার। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বৃহত্তর সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে।

স্বাধীনতার জন্য অনেকের ধারণা ছিল না—বুদ্ধিজীবীরা কি ভূমিকা রাখতে পারেন? অগত্যা পূর্ববঙ্গ সরকারের দু'জন উপদেষ্টা এগিয়ে যান, ড. আহমদ শরীফ ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী।

মহামান্য অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা ড. আহমদ শরীফ ঐ বৃহত্তম বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, জনতার সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন। ছাত্র-জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী 'বাঙলা ভাষা' আবৃত্তি করেন। সভায় অন্য কেউ কিছু বলেননি। সভাপতি তাঁর ঐতিহাসিক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, "বাংলাদেশের স্বাধীনতা আমাদের জীবনের বিনিময়ে রক্ষা করতে হবে।" অতঃপর তিনি স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষা করার ঐতিহাসিক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

রাতের সংবাদ বুলেটিনে টেলিভিশন শপথ গ্রহণের সচিত্র খবর পরিবেশন করেছিল। বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাচ্ছি, তারা যেন প্রতিবাদের এই ঐতিহাসিক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ৫ মার্চ পুনঃপ্রচার করেন। জাতীয় স্বার্থে এ কাজ করতে হবে।

ইতিহাস কিভাবে এক দেহে লীন হয়ে যায় এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে? এক যুগের বেশী সময়কালের প্রস্তুতি কিভাবে বাস্তবায়িত হয়, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

জাতির স্বার্থে ইতিহাসের প্রয়োজন। মহামান্য উপদেষ্টাদ্বয় সেদিন সঠিক ও নির্ভুল নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন। এর সকল কৃতিত্ব সকল বাঙালির।

আমাদের স্বাধীনতার পথিকৃৎ ড. আহমদ শরীফের ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শিক্ষক, অনেকের মত আমারও অতি শ্রদ্ধেয় শিক্ষক তিনি।

অপূর্ব সংসদের সকল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অধ্যাপক আহমদ শরীফ অবগত ছিলেন। বিশ্বের সকল গরিব মানুষের জন্য তাঁর অন্তরাত্মা ছিল চির ক্রন্দসী। তাই তাদের জন্য, গরিব দেশের জন্য কামনা করেছেন সমাজতন্ত্র। যদিও Communism কোনোমতেই চরম সমাধান নয়, কেবল কালের ধারায় বিবর্তনের একটি স্তর মাত্র। এই কথা বলার ২৫ বৎসরের মধ্যে ইউরোপ থেকে কমিউনিজম বিদায় নিয়েছে। তিনি জীবনকেই মুখ্য জানতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, জীবন গড়ে ওঠে দেশে ও কালে। মানুষের স্বাতন্ত্র্যে জীবন উপভোগ সম্ভব নয়, তাই পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক সংস্থা ও দেশ-কালভিত্তিক জাতীয়তা তার প্রয়োজন। এ নিয়ে বিচার-বিতর্কের অবকাশ নেই। দেশের ঐতিহ্য সকলের। তাই দেখা যায় আরব, ইরান, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া এসব দেশে অমুসলিম ও মুসলিম কোনো ঐতিহ্যকেই অবহেলা করে না।

সুন্দরের ও কল্যাণের প্রসাদকে বিদেশী ও বিজাতি বলে এড়িয়ে চলবো না—বঞ্চিত করবো না নিজেদের। বিশ্বের সকল মানুষের শ্রেয় তথা মঙ্গল চিন্তা ও সাধনা ছিল তাঁর জীবনে স্বপ্ন। এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন প্রয়াসে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। বাংলাদেশের একটি সরকার তাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট মনোনীত করতে চেয়েছিল। অন্য একটি সরকার তার লেখা 'কর্তব্য স্থির করুন' প্রবন্ধের জন্য ড. আহমদ শরীফের বিরুদ্ধে ছয় লক্ষ পোস্টার মুদ্রিত করে বিতরণ করে। দু'কোটি টাকা খরচ করে মাদ্রাসার অসহায় ছাত্রদের রাজপথে নৃত্য করতে বলে। অকারণে মুর্তাদ বলা হয়। ফলে জীবনের শেষ দশকের অনেকগুলি দিন অঘোষিত গৃহবন্দি জীবযাপন করতে হয়। কিন্তু তারপরও তার মধ্যে মানুষের কল্যাণ চিন্তা, শোষণ বঞ্চনা থেকে মুক্তির চিন্তা কোনোভাবেই হ্রাস পায়নি।

পটিয়াবাসীর পাশে অধ্যাপক আহমদ শরীফ

হরিসাধন দেব ব্রহ্মণ

একেবারে গজকাঠি দিয়ে মাপলেও বাঙালির হাজার বছরের আন্দোলনের ইতিহাস থেকে চট্টগ্রাম জেলাকে বিচ্যুত করা যাবে না। কারণ চট্টগ্রামের মানচিত্র থেকে উঠে আসা কতিপয় মনীষী সমগ্র বাংলাদেশকে ঋদ্ধ ও গৌরবান্বিত করেছে। এঁরা বিদ্রোহ, বিপ্লব ও মনন চর্চায় আজো আমাদের অনুপ্রাণিত করে। সূর্যসেন, প্রীতিলতা, যতীন্দ্র মোহন সেন, মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী, শশাঙ্ক মোহন সেন, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, আবুল ফজল থেকে কথাশিল্পী সুচরিত চৌধুরী পর্যন্ত সবাই তাঁদের সমকালে পালন করেছেন অজেয় অমর ভূমিকা।

দেশের স্বার্থের কাছে ব্যক্তির স্বার্থ যে কত ক্ষুদ্র এই পাঠ আমরা গ্রহণ করি এঁদের জীবনাচরণ থেকে। যখন আমরা পথের বাধা সরিয়ে একটু একটু করে সামনের দিকে এগিয়ে যাই, তখন এসব মনীষী আমাদের কাছে হয়ে ওঠে জীবন্ত পথ প্রদর্শক। এই ঐতিহ্য ও সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আমরা আমাদের কালে শুধু একজন মহান ব্যক্তিকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম যার নাম আহমদ শরীফ। শহর চট্টগ্রামের চোখ ধাঁধানো বিলাস বৈভব থেকে খানিক দূরে পটিয়া থানা। এ পটিয়ার আটপৌরে একটি গ্রামের নাম সুচক্রদণ্ডী। পশ্চাৎপদতার কারণে আধুনিক সভ্যতার যে জৌলুস তার স্পর্শ এখনো পর্যন্ত যে গ্রাম লাভ করে নি। এই অখ্যাত গ্রামে ১৯২১ সালে ডক্টর আহমদ শরীফ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

আশির দশকে সামরিক সরকার দেশের ৬৪টি মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করার ঘোষণা দিলেও পটিয়া মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করা হয়নি। ফলে পটিয়ার স্থানীয় রাজনৈতিক দল ও পেশাজীবী সংগঠন এবং সচেতন নাগরিকদের উদ্যোগে পটিয়া জেলা বাস্তবায়নের আন্দোলন গড়ে ওঠে। এক পর্যায়ে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে পটিয়াকে জেলা ঘোষণার দাবি প্রকাশ ও আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণার আয়োজন করে। নেতৃবৃন্দ পটিয়ার ড. আহমদ শরীফের বাসায় গিয়ে তাঁকে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকার সনির্বন্ধ অনুরোধ করলে তিনি পটিয়া জেলার আন্দোলনকে Parochial আন্দোলন হিসেবে আখ্যায়িত করেন। পরবর্তীতে উদ্যোক্তাদের সাথে তিনি একমত হন। কারণ দেশের অন্যান্য মহকুমা

যেখানে জেলায় উন্নীত হয়েছে, সেখানে পটিয়াকে জেলায় উন্নীত না করা বৈষম্যমূলক। পরবর্তীতে যথাসময়ে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র জাহেদ করিমসহ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হন এবং সাংবাদিকদের কাছে পটিয়ার ইতিহাস ও জেলা বাস্তবায়নের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। উদ্যোক্তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য বিভিন্ন পরামর্শ দেন ও উৎসাহিত করেন। এমনিভাবেই অধ্যাপক আহমদ শরীফ তাঁর জন্মস্থানের মানুষের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন।

ব্যক্তিগতভাবে এ আন্দোলন সূত্রে আহমদ শরীফের সাথে আমার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু আমার কর্মস্থল মফস্বল কোর্টে হওয়ায় তার সাথে রীতিমতো যোগাযোগ রাখা কঠিন ছিল। তবে তাঁর আন্তরিকতা, স্পষ্টভাষী ভূমিকা আমাকে দারুণভাবে মুগ্ধ করেছিল। ১৯৯২ সালে আমি পটিয়া ছেড়ে ঢাকা সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে যোগদান করি। ১৯৯৪ সালের ২২ মার্চ চট্টগ্রামে মাষ্টারদার জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। কলিকাতার মেয়র প্রশান্ত চ্যাটার্জীসহ ভারত থেকে এক বিশাল প্রতিনিধিদল চট্টগ্রাম আসবেন। এ প্রতিনিধিদলের সাথে চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী পটিয়ার সূচক্রদণ্ডী ইউনিয়নের দক্ষিণভূর্ষি গ্রামের ফনীন্দ্র গুহও থাকবেন। বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরীর একান্ত ইচ্ছা ভারতীয় প্রতিনিধিদলের উপস্থিতিতে ঢাকায় মাষ্টারদার জন্মশতবার্ষিকীর আর একটি অনুষ্ঠান করা। তিনি আমাকে অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নিতে বললেন। ঢাকায় আমি নবাগত। এ ধরনের একটি জাতীয় অনুষ্ঠান করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা আমার পক্ষে কঠিন। আমি অনেক বিপ্লবীর সহায়তা চেয়েও ব্যর্থ হলাম। এক পর্যায়ে ড. আহমদ শরীফের বাসায় গিয়ে তাঁর কাছে সূর্যসেন জন্মশতবার্ষিকী পালনের ব্যাপারটি ব্যক্ত করলাম। উনি উৎসাহিত করে বললেন, "তোমার সাথে কেউ না থাকলেও আমি থাকব, প্রয়োজনে স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘের মাধ্যমে অনুষ্ঠান করব।" পরে এডভোকেট সুব্রত চৌধুরীর মাধ্যমে ঢাকাস্থ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, সংস্কৃতিসেবী, সাংবাদিক ব্যবসায়ী ও আইনজীবিদের সহায়তায় মাষ্টারদা সূর্যসেন জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন পরিষদ গঠন করা হয়। ড. আহমদ শরীফ এ কমিটির একজন সম্মানিত সদস্য হন।

ভারতীয় প্রতিনিধিদলের উপস্থিতিতে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে, জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গনে এবং টি.এস.সি. মিলনায়তনে ব্যাপক আয়োজনের মাধ্যমে মাষ্টারদার জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয়। ১৯৩৪ সালে মাস্টারদাকে গ্রেফতারের পর যখন পটিয়া থানায় আনা হয় ড. আহমদ শরীফ তখন ৭ম শ্রেণীর ছাত্র হিসেবে কিভাবে সূর্যসেনকে দেখেছিলেন তা বর্ণনা করলে টি.এস.সি. মিলনায়তনের অগনিত দর্শক শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনেন। পরবর্তীতে সৌজন্য সাক্ষাতে উনি বলেন, "সূর্যসেন-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আমার প্রোগাম তুমি হাইজ্যাক করেছ"। তাঁর ধারণা ছিল এ অবক্ষয়ের যুগে ঢাকায় মাষ্টারদার জন্মশতবার্ষিকী ব্যাপক কর্মসূচি পালন করা কঠিন হবে। কিন্তু জাতীয় ভিত্তিক প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে তিনদিন ব্যাপী কর্মসূচি পালনের ফলে মাষ্টারদার প্রতি সম্মিলিত শ্রদ্ধা জানাতে পেরে ড. আহমদ শরীফ সেদিন খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন।

ঢাকায় অবস্থানরত বিভিন্ন জেলা ও থানার লোকজন বিভিন্ন সমিতি গঠন করে বিভিন্ন এলাকার ঐতিহ্য ও গুণীজনদের স্মরণ করে থাকেন। সে হিসেবে ঢাকায়

অবস্থানরত পটিয়াবাসীর 'পটিয়া সমিতি ঢাকা' নামে একটি সংগঠন আছে। সমিতির প্রথম কর্মসূচি হিসেবে তাঁরা আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের স্মরণ সভার আয়োজন করে। সমিতির কর্মকর্তাদের অনুরোধে ড. আহমদ শরীফ উক্ত স্মরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। পটিয়া সমিতি জনাব এস. এম. এফ. জাহাঙ্গীর রচিত *পটিয়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য* বই-এর প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন করে ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে। অধ্যাপক আহমদ শরীফ প্রধান অতিথি হিসেবে এই প্রকাশনা উৎসবেও অংশগ্রহণ করেন। অধ্যাপক শরীফ আঞ্চলিকতা, সঙ্কীর্ণতা ও বিভিন্ন আঞ্চলিক সমিতি অপছন্দ করলেও কোনো সংগঠন যখন কোনো মহত কাজে হাত দেয় সেখানে অকপটে সাহায্য সহযোগিতা করতেন।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ স্পষ্টভাষী ছিলেন। উনি যা বিশ্বাস করতেন তা অকপটে প্রকাশ করতেন। এমনিভাবে রক্ষণশীলতা, ধর্মান্ধতা ও পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে এদেশের জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। বিগত ২১.১০.৯২ তারিখে জাতীয় যাদুঘর শিশু মিলনায়তনে 'স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘ' আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতির ভাষণে প্রদত্ত বক্তব্যকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে দেশের দক্ষিণপন্থী মহল তাঁর ফাঁসি দাবি করেন। এমনকি তাঁর জন্মভূমি পটিয়ায় শাহচান্দ আউলিয়া মাদ্রাসার ছাত্ররা তাঁর বিরুদ্ধে এক মিছিল বের করে তার ফাঁসি দাবি করে। ঢাকায় বসে তিনি এ খবর পান। এর কিছুদিন পরে পটিয়ায় একটি অনুষ্ঠানে তাঁকে অতিথি হবার জন্যে অনুরোধ জানালে সাথে সাথে তিনি অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, "যে পটিয়ায় আমার জন্ম, সে পটিয়ায় আমার বিরুদ্ধে মিছিল হয়। আমার জীবদ্দশায় পটিয়ায় যাব না।" অধ্যাপক আহমদ শরীফ আর পটিয়ায় যান নি।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের আড্ডাটা আজ আর নেই

সুভাষ কান্তি বড়ুয়া নেপাল

ড. আহমদ শরীফ স্যারকে ঘিরে জমে ওঠা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আড্ডার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। ফুলার রোডে স্যারকে ঘিরে জমে ওঠা দীর্ঘ দিনের গুঁড়ির আড্ডা সময়ের বিবর্তনে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বৃহত্তর কলেবরে বিকশিত হয়। তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এ আড্ডায় ছাত্র-শিক্ষক ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবীর মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করত। আড্ডা জমত সাধারণত বিকাল ৫টার পর থেকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলমান মুক্তালোচনার নির্ধারিত কোনো বিষয়বস্তু থাকত না। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, ধর্ম-দর্শন, বিজ্ঞান, চলতি ঘটনাসহ ব্যক্তিগত প্রসংগ আলোচনায় স্থান পেত। আলোচনা অনেক সময় জোরালো হাস্য কৌতুকে রূপ নিত।

আড্ডার মধ্যমণি ছিলেন অধ্যাপক আহমদ শরীফ। অনেক প্রবীণ শিক্ষক ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা এখানে উপস্থিত থাকতেন। তাঁদের দৃপ্ত পদচারণায় মুখরিত হত উদ্যানের গোল চত্বর কিংবা কোমল তুলতুলে সবুজ ঘাসাচ্ছাদিত কোনো ছায়া সুশীতল অঙ্গন। বার্ধক্যজনিত কারণে ইতোমধ্যে অনেকে একে একে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। এদের মধ্যে আকবর সাহেব (অব. উপ সচিব), মন্ডল বাবু (অব. যুগ্ম সচিব), রশীদ সাহেব (অব. যুগ্ম সচিব), ড. আব্দুল্লাহ ফারুক (ডীন, বাণিজ্য অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ছাড়া আরো কেউ কেউ আছেন।

সে সময় প্রবীণ বা মাঝবয়সীদের মধ্যে অন্যান্য যাঁরা নিয়মিত আড্ডায় উপস্থিত থাকতেন তাঁদের মধ্যে শামসুল হক (অতিরিক্ত সচিব), শরদিন্দু শেখর চাকমা (অতিরিক্ত সচিব, বর্তমানে ভুটানে নিয়োজিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত), অরুণ কুমার সরকার (পোস্টমাস্টার জেনারেল), সেলিম সাহেব (উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ডাক বিভাগ) মতিউর রহমান (কমিশনার, আয়কর বিভাগ), আবদুল লতিফ (অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), সুভাষ ভট্টাচার্য্য, সেলিম সাহেব (সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, উত্তরা ব্যাংক) পুরানো ঢাকার ব্যবসায়ী মতি ভাই ও বাগমার সাহেবের নাম উল্লেখযোগ্য। আর তরুণদের মধ্যে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন অমূল্য কুমার বৈদ্য (ইংরেজির শিক্ষক, বাংলাদেশ রাইফেলস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা), প্রকৌশলী ফরিদ, প্রকৌশলী ভজন সরকার, নীহার মল্লিক (রসায়নবিদ), ব্যবসায়ী সালাম শামীম (বর্তমানে ইনভেস্টমেন্ট

কর্পোরেশনে কর্মরত), তপন দে (ইতিহাসবিদ), ফরহাদ সাহেব (একটি সরকারী কলেজের ইংরেজি বিষয়ে অধ্যাপনায় নিয়োজিত), সুভাষ (বর্তমানে দুর্নীতি দমন বিভাগে কর্মরত) প্রকৌশলী হান্নান, শামীম রেজা, আজাদ, মোহন সাহা, মিঠু, তৈয়ব, মিজান, শৈলেন, বিশ্বজিৎ, আনিস, রতন বাবু, ফেরদৌস, ডাঃ দীপল অধিকারী, তপন ঘোষাল, বিকাশ রায়, জাহাঙ্গীর কবীর প্রমুখ ছাড়াও নাম না জানা আরো অনেকেই। তরুণদের অধিকাংশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র ছিলেন। এদের অনেকে বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন।

১৯৯২ সনে ধর্মব্যবসায়ীদের হুমকির মুখে শরীফ স্যারের দীর্ঘদিন যাবত উদ্যানে অনুপস্থিতির কারণে আড্ডা যখন একেবারে স্তিমিত হয়ে পড়েছিল তখনও প্রবীণদের মধ্যে বার্ধক্যে উপনীত চিরকুমার রশীদ সাহেবের প্রাত্যহিক উপস্থিতি বিদ্যমান ছিল। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি অথবা কালো মেঘের ঘনঘটা উপেক্ষা করেও অনেক সময় উদ্যান চত্বরে তাকে বিমর্ষ বদনে নিঃসঙ্গ অবস্থায়ও কাটাতে দেখা গেছে। আমাদের মধ্যে কয়েকজন বিশেষ করে আয়কর বিভাগের কমিশনার জনাব মতিউর রহমান সাহেব, রতন বাবু, ফেরদৌস, সুভাষ ভট্টাচার্য্য, অমূল্য কুমার বৈদ্য, ফরিদ সাহেব, আজাদ, শামীম রেজা, গৌতম, সুভাষ বাবু, ধ্রুবসহ অন্যান্য কয়েকজন কর্মদিবস শেষে বিলম্বে হলেও উদ্যান চত্বরে উপস্থিত হতাম। আড্ডাকে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে আমরা যেমন সতর্ক ছিলাম তেমনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধও ছিলাম। বিলম্বে উপস্থিতির কারণে আমাদের অনেকের সাথে রশীদ সাহেবের নিয়মিত দেখা হত না। আড্ডার এহেন দুর্দিনে অকস্মাৎ একদিন বার্ধ্যকজনিত কারণে রশীদ সাহেবের মৃত্যু সংবাদ আমাদের কাছে যেন বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত মনে হল।

গত কয়েক বছর ধরে শরীফ স্যার উদ্যানে নিয়মিত উপস্থিত হওয়ায় আবার আড্ডার আসর জমতে থাকে। ক্রমান্বয়ে ভক্তদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পেলেও '৯৪ পূর্বাবস্থায় আর কখনও ফিরে আসেনি। কারণ প্রবীণদের অনেকেই চিরতরে হারিয়ে গেছেন। আবার নবীণ প্রবীণের একাংশ নতুনভাবে আড্ডায় শরীক হয়েছেন। নতুনদের মধ্যে ড. হুমায়ূন আজাদ ও ড. সমীরণ ভট্টাচার্য্য (প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা) ছাড়াও আরো কয়েকজন।

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারি সকালে স্যারের মৃত্যু সংবাদ শুনে আমরা যে যেখানে যে অবস্থায় ছিলাম না কেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। কারণ মৃত্যুর দুই দিন পূর্বেও উদ্যানের আড্ডায় তাঁকে বেশ তারুণ্যদীপ্ত মনে হচ্ছিল। হঠাৎ এই দুঃসংবাদ আমাদের মতো অগনিত ভক্তকুলকে অত্যন্ত শোকবিহ্বল করে তুলেছিল।

শরীফ স্যার আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু তার আড্ডা ও অন্যান্য কাজের মাধ্যমে মুক্তচিন্তা, অসাম্প্রদায়িকতা, স্পষ্টবাদিতা, প্রগতিবাদিতা, যুক্তিবাদিতা ও বিজ্ঞান মনস্কতার যে বীজ তিনি ধর্মান্ধ, যুক্তিহীন, অপসংস্কৃতি ও কূপমণ্ডুকতায় পরিপূর্ণ সমাজে রোপন করেছিলেন তা অদৃষ্টপূর্ব।

আমরা কেন তরুণ থেকে বৃদ্ধ, বেকার থেকে চাকুরে, মূর্খ থেকে পণ্ডিত সকলেই এই আড্ডার প্রতি এত আকর্ষণ বোধ করতাম? এতে আমাদের মনের মঞ্জরী মুকুলিত হয়ে উঠত। ঝড় যেমন বৃক্ষ আর লতাপাতাকে আন্দোলিত করে, বৃষ্টি তাকে রস

যোগায়, সূর্য তাকে পুষ্টি দেয়, সমীরণ তাকে স্নেহের কবোষ্ণ পরশে চঞ্চলিত করে– অধ্যাপক আহমদ শরীফের উদাত্ত কণ্ঠ, তীক্ষ্ণ কৌতুক ও কৌতূহল, তীব্র বাণ, অখণ্ডনযোগ্য যুক্তি, শাল-তমালের ব্যক্তিত্ব, শ্বেতশুভ্র বর্ণচ্ছটার ঝিলিক, সাদর আমন্ত্রণ ও বিদায় সম্ভাষণ আমাদের চিত্তকে ঝাঁকিয়ে দিত, ঝলমল করে তুলত।

প্রতি বছর বসন্ত আসলে উদ্যানের গোল চত্বরের উত্তর পার্শ্বস্থ মহুয়া বৃক্ষে পূর্ণ প্রস্ফুটিত মহুয়ার সুরভিত গন্ধে ব্যাকুল করা বাতাস আড্ডায় অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে আরো প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করত। বসন্ত ফিরে আসবে বারে বারে আর মহুয়ার সুবাস ছড়িয়ে যাবে বহুকাল ধরে কিন্তু আমাদের ফেলে আসা আড্ডার সেই সোনালী বিকেলগুলো আর কখনও ফিরে আসবে না।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ : স্মৃতি তর্পণ

কল্পনা ভৌমিক

মানুষ জন্ম লাভ করে, আবার মৃত্যুবরণ করে। কিছু মানুষ জন্মলাভ করার পর নিজেদের ক্রিয়ানুষ্ঠান ও স্বস্বার্থ-মধ্যে ব্যাপৃত থাকে। মৃত্যুতে তারা বিলীন হয়ে যায়। আর কিছু মানুষ আছেন যাঁরা সাধারণ্যকে অতিক্রম করে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেন। তাঁরা স্বস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সমাজের কথা ভাবেন, দেশের কথা ভাবেন, মানুষের কথা ভাবেন, দেহের বিনাশেও তাঁরা রয়ে যান অমর হয়ে। তেমনি একজন ছিলেন অধ্যাপক আহমদ শরীফ।

বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে আহমদ শরীফ ছিলেন অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। বিশেষত প্রবন্ধ ও গবেষণাধর্মী রচনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। মধ্যযুগের সাহিত্যকর্মকে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উন্মোচন করেছেন আধুনিক পাঠকদের কাছে। মধ্যযুগের সাহিত্যকে তাঁর মত করে আর কেউ এত গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। তিনি সে যুগের কবি, কাব্য, জীবন, জগৎ, মানুষের কর্মপ্রকৃতি, রীতি-নীতি, সামাজিক সংগতি-অসংগতি, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি বিষয়ে বলিষ্ঠ ভাষায় অসংখ্য গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে, গ্রন্থে বিবরণ-বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। কেবল মধ্যযুগেই তাঁর সাহিত্যকর্ম সীমিত ছিল না। বাংলাসাহিত্য ও বাঙালির চিন্তা-চেতনা, কর্ম-প্রকৃতি নানা বিষয় নিয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন। যেমন-বাঙালির ইতিহাস সন্ধানে, বাঙালীর সংস্কৃতি, বাঙালীর মনন বৈশিষ্ট্য, বাঙালীর মৌলধর্ম, ইতিহাসের ধারায় বাঙালী, বাঙলার গতর-খাটা মানুষের ইতিকথা, বাঙলার রাজনৈতিক ইতিকথা, দেশকাল, বাঙালী, বাঙলাদেশী, ভবিষ্যতের বাঙলা, বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি, ইতিহাসের ধারায় বাঙলা ও বাঙালী, বাঙালী সত্তার বিলোপ প্রয়াসে ১৯০৫ সনের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি। যুক্তিনির্ভর বক্তব্য প্রকাশে তিনি ছিলেন আপোসহীন।

অধ্যাপক শরীফের সঙ্গে আমি পরিচিত হই ১৯৮৩ সালে। আমার প্রথম প্রবন্ধ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি' ও 'পনের শতকের অপর দুইখানি পুথি : একটি লিপিতাত্ত্বিক পর্যালোচনা' মুদ্রণের জন্য বাংলা একাডেমীর গবেষণা পত্রিকায় জমা দেই। তখনকার পত্রিকার সম্পাদক আমাকে বলেছিলেন—"পূর্বে আপনার কোনো প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়নি, সুতরাং এ বিষয়ে অভিজ্ঞ কেউ যেমন—আহমদ শরীফ যদি প্রবন্ধটি দেখে ছাপানোর যোগ্য মনে করেন তবেই আমরা ছাপার জন্য গ্রহণ করতে পারি।" আমি তখন প্রবন্ধটি

নিয়ে শরীফ স্যারের সঙ্গে পরিচিত হই। স্যার ১৫ দিন পরে খোঁজ নিতে বলেন। আমি খুবই শঙ্কিত ছিলাম–প্রবন্ধটি ছাপার যোগ্য হবে কিনা এই ভেবে। কারণ অধ্যাপক আহমদ শরীফের মতো পণ্ডিতের দৃষ্টিতে আমার প্রবন্ধটি হয়তো মূল্যহীন গণ্য হতে পারে। কিন্তু আমার সব ভুল ভাঙলো প্রবন্ধটি হাতে পেয়ে। তিনি প্রবন্ধের উপর লিখেছিলেন, "প্রবন্ধটি আমি যত্ন সহকারে পড়েছি। লেখিকার যুক্তি তাচ্ছিল্যে উড়িয়ে দেয়ার নয়। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবন্ধটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রবন্ধে তেমন কোনো ভুল-ত্রুটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। এটি ছাপা হওয়া আবশ্যক।"

তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে আমাকে বলেছিলেন, 'তোমার প্রবন্ধটি ভালো হয়েছে।' নিয়মিত লেখার জন্য তিনি অনেক উপদেশ এবং উৎসাহ দিয়েছিলেন। তখন আমি সংস্কৃতের শেষ পর্বের ছাত্রী। সম্ভবত সে কারণে তিনি আমাকে বলেছিলেন, "আমি কবীন্দ্র মহাভারত সম্পাদনা করতে চাচ্ছি। কিন্তু মূল সংস্কৃতের সঙ্গে *কবীন্দ্র মহাভারতের* সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য লেখার ব্যাপারে আমি তোমার সাহায্য চাই।" সংস্কৃতের ছাত্রী হলেও তখন ব্যাসদেবের মূল মহাভারতের সংস্কৃত সঠিকরূপে অনুধাবন করতে পারব না ভেবে তাঁর কথায় তখন সম্মত হতে পারিনি। তাই বলেছিলাম, এ কাজ করার জন্য আমার আরও সংস্কৃতের জ্ঞান প্রয়োজন। সেদিন আমি সাহস পেলে *কবীন্দ্র মহাভারত*কে প্রকাশিত করার মহৎ কাজটা তাঁর দ্বারাই সম্পন্ন হত। তারপর তাঁর উৎসাহেই আমি পুথি নিয়ে কাজ আরম্ভ করি। আমার *পাণ্ডুলিপি গঠন সহায়িকা* গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। তখন একদিন তিনি আমাকে বলেছিলেন, "*কবীন্দ্র মহাভারতের* কাজটা তুমি আরম্ভ কর। এ কাজ একমাত্র তুমিই পারবে বলে আমার ধারণা।" তখন আমি তাঁর পরামর্শ অনুযায়ীই *কবীন্দ্র মহাভারতের* উপর কাজ আরম্ভ করি। এ কাজে তিনি আমাকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। কবীন্দ্র সম্পর্কিত নানা তথ্য, সহায়ক বিবিধ গ্রন্থের পরিচয়, পুথি প্রাপ্তির স্থান ইত্যাদি বিষয়ে তিনি পরামর্শ ও সাহায্য প্রদান করেছিলেন। তিনি নিজের হাতে এর বিষয়সূচির একটি খসড়া পরলোক গমনের ২০/২৫ দিন পূর্বে তৈরি করে দিয়েছিলেন।

অধ্যাপক শরীফের স্বহস্তলিখিত সূচিপত্র :

কবীন্দ্র অনূদিত মহাভারত

১ম অধ্যায় : কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস পরিচিতি

২য় অধ্যায় : কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসের রাজদরবারে পদপ্রাপ্তি : চট্টগ্রামে প্রবাসকালে কাব্য রচনা

৩য় পরিচ্ছেদ : কবি চন্দ্র মিশ্রের সঙ্গে বিরোধের সম্ভাব্য কারণ

৪র্থ অধ্যায় : কবির অনুবাদের জন্যে নির্বাচিত পর্ব

৫ম অধ্যায় : গ্রন্থনামের উৎস ও ভিত্তি আলোচনা

৬ষ্ঠ অধ্যায় : বর্ণিত সমাজচিত্র কি মূলানুগ বা কবির সমকালীন সমাজরুচি অনুগ।

গ্রন্থটি বর্তমানে প্রকাশের আলো দেখেছে, কিন্তু তার আগেই আলো নিভে গেছে তাঁর–যিনি সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন গ্রন্থটি হাতে পেয়ে। অবশ্য গ্রন্থটির কাজ সম্পন্ন হয়েছে তা তিনি দেখে গিয়েছেন। গ্রন্থের অনেক অধ্যায় তিনি পড়েছেনও। গ্রন্থটির সম্পূর্ণতা

দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরই উৎসাহ, প্রেরণা ও সহযোগিতা এই গ্রন্থ প্রণয়নে সফলতা এনেছে। আমি এ গ্রন্থটি তাঁকে উৎসর্গ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। তিনি ছিলেন–

'আত্মবিশ্বাস ও মননে স্বনিষ্ঠ
বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐকান্তিক সাধক
চেতনায় দীপ্র অজেয় পৌরুষদীপ্ত'–

তাই তিনি আমার তথা সকল বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিসেবী মানুষের কাছে সতত স্মরণীয়, সতত প্রণম্য।

শেষ আড্ডা

আবু তাহের কাজল

পৌঁছুতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, আলাপ হচ্ছিল মধ্য এশীয়দের দ্বারা বার বার সফল ভারতবর্ষ আক্রমণ ও তার কারণ প্রসঙ্গে। বরাবরের মত এ ধরনের তথ্যসমৃদ্ধ, বিজ্ঞানভিত্তিক, বিশ্লেষণাত্মক ও সমৃদ্ধ আলোচনায় তাঁকে মনে হচ্ছিল অন্ধকার আকাশে একমাত্র উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। আশেপাশে নক্ষত্রদের শারীরিক উপস্থিতি থাকলেও উজ্জ্বলতায় তাঁর তুলনায় যে অনেক অনেক ম্রিয়মাণ তা তাদের এই ধরনের সমৃদ্ধ তথ্যের নির্বাক গলধঃকরণেই বোঝা যাচ্ছিল। এক পর্যায়ে তিনি বললেন যে, মুলতান তখন ভারতবর্ষের দখলে ছিল না। ওটা ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের সর্বপূর্বের একটা সমৃদ্ধ নগর এবং যেহেতু আলেকজান্ডার গ্রীকদের চির প্রতিদ্বন্দ্বী পারসিকদের পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন তাই পারস্য সাম্রাজ্যের ১৬ আনা সার্বভৌমত্ব দখলে আনার বা ধ্বংস করার জন্যই আলেকজান্ডারকে মুলতান পর্যন্ত আসতে হয়েছিল, তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেননি। সর্বপ্রথম প্রতিবাদ করলাম আমি। অধ্যাপক আহমদ শরীফের সরাসরি সামনে উপবিষ্ট ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা। মনে হলো তিনিও প্রতিবাদে শরিক হলেন। আমার বক্তব্য ছিল 'মুলতান চিরকালই ভারতবর্ষের অংশ। এখনও পর্যন্ত মুলতান দক্ষিণ-পশ্চিম পাঞ্জাবের আওতাধীন; মূলত সমতলভূমি ও সুজলা সুফলা এলাকা। তার বেশ পূর্ব দিকে অনেকটা আধা মরু এলাকা হলেও দূরতিক্রম্য নয় বরং তার সরাসরি পশ্চিম দিকে সিন্ধুর ওপারে কয়েকশ' কিলোমিটার দূরে প্রায় একই অক্ষাংশে অবস্থিত কোয়েটা—যা দুগর্ম গিরি-সঙ্কটের মধ্যে অবস্থিত। সিন্ধু নদের বর্তমান মূলধারার ওপার থেকেই সুলেমান পর্বতের বিভিন্ন রেঞ্জ, খিরথর পবর্তের শাখাগুলি মূলত সিন্ধুর মূল প্রবাহের সমান্তরালেই প্রলম্বিত, খিরথর থেকে শুরু করে সুলেমান হয়ে পামীর-হিন্দুকুশ পর্যন্ত পর্বতসমূহের রেঞ্জগুলি এখনও পর্যন্ত আফগানিস্তান বা ইরানের সাথে পাকিস্তানের শুধু রাজনৈতিক সীমারেখাই নির্দেশ করেনি—ওগুলো প্রাচীরের ন্যায় প্রাকৃতিক বেরিয়ার হিসেবে কাজ করছে। যার কারণে দুই ধারের সাংস্কৃতিক ব্যবধান কেবলমাত্র ব্যাপক নয়, মনে হবে যেন সম্পূর্ণ পৃথক দু'টি ধারা। এখন অবশ্য এই প্রাকৃতিক বেরিয়ারের দুই পাশের অর্থাৎ পশ্চিম ও পূর্বের সাংস্কৃতিক ব্যবধান দিনে দিনে যথেষ্ট কমে আসছে। যার মূল কারণই হল সহস্রকের পর

সহস্রক ধরে পশ্চিমের মানুষ এই বেরিয়ার পার হয়ে পূর্বে এসেছে মূলত জীবনধারণের জন্যে। আলেকজান্ডারের আসার কারণ অবশ্য ঠিক জীবনধারণ নয়।

ঠিক এইভাবে আমি এই প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকের উপর বেশ জোর দিচ্ছিলাম এবং যুক্তি যোগানোর চেষ্টা করছিলাম যে, এই প্রতিবন্ধকের পূর্ব পাশ কখনোই পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল না।

–'বেলুচিস্তান তখন পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।' কথাটা যেন চট্ করে আমার দিকে ছুড়ে দিলেন।

–'শুধু তখন না, এখনও বেলুচিস্তান রাজ্যমণ্ডলীর অনেক অংশই ইরানের সরাসরি দখলভুক্ত; দু'দেশভুক্ত হলেও এসব এলাকার শুধু যে ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যেই মিল রয়েছে তা নয়, ভাষা, কৃষ্টি ও নৃগত বৈশিষ্ট্যেও কাছাকাছি, বিশেষত তাদের নাকের গঠনটা...।' কথাটা শেষ করার আগেই আমারই নাক বরাবর সামনের দিকে আমাদের এই এককেন্দ্রিক আড্ডাটা যেন দ্বিকেন্দ্রিক হয়ে উঠল। এই একটাই ছিল এ আড্ডার প্রধান সমস্যা, এ ক্ষেত্রে অধ্যাপক আহমদ শরীফকেই চিৎকার ও পরিশ্রম করে বিকেন্দ্রী রথীদেরকে বাগে আনতে হত। আমাদের কথার খেই হারিয়ে গেল, আলেকজান্ডার বেলুচিস্তানের যে দুর্গম এলাকা অথবা বেলুচিস্তানের উত্তর দিকের একটা প্রাচীন এলাকা, যেটার নাম তিনি তৎক্ষণাৎভাবে স্মরণে আনতে পারছিলেন না, মনে হচ্ছিল যেন তাঁর বিশাল স্মৃতিভাণ্ডারটা অতিদ্রুত হাতড়াচ্ছেন, তাঁকে সহায়তার উদ্দেশ্যেই বললাম- 'খোরাসান'।

–হ্যাঁ-হ্যাঁ, খোরাসান–খোরাসান অথবা বেলুচিস্তানের দুর্গম এলাকা অতিক্রম করেই তিনি মুলতান পর্যন্ত এসেছিলেন; আবার মূলতান থেকেই ফেরত গিয়েছিলেন। ঐ মুহূর্তে আমি স্মরণে আনার চেষ্টা করছিলাম সেই নামটা, সম্ভাব্য যে গিরিপথ দিয়ে আলেকজান্ডার ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন, সেটা হতে পারে আজকের 'ঘোজাক' বা 'বোলান'; কিন্তু প্রকাশ করতে পারলাম না সম্ভবত আড্ডার বহুকেন্দ্রিকতার কারণে। তবে যেটা প্রকাশ পেল সেটা হল আবার একটা সবিনয় প্রতিবাদ–'স্যার, আলেকজান্ডার শুধু মুলতান পর্যন্ত এসেই ফিরে যাননি, তিনি ভারতের বেশ অভ্যন্তর পর্যন্ত এসে ফিরে গিয়েছিলেন।'

এতক্ষণ অধ্যাপক আহমদ শরীফ যেন কথা বলছিলেন তাঁর সরাসরি সামনে বসা মনিরুজ্জামান মিঞার সাথে, এবার তার সর্বদক্ষিণে এই দিকে ফিরে তাকালেন। আমি তাঁকে বলতে চাচ্ছিলাম যে, অনেক বছর আগে পশ্চিম বাংলা থেকে প্রকাশিত মানচিত্রে ইতিহাস নামক সচিত্র পুস্তিকাতে দেখেছিলাম–আলেকজান্ডার সিন্ধুতীর–যেটা মুলতানের কাছাকাছি কোনো জায়গা–তার থেকে আরও পূর্বে ও উত্তরপূর্বে এসে গঙ্গা বা গঙ্গার কোনো উপনদী পেরিয়ে লুপ-এর মত একটা এলাকা ঘিরে ঘুরে আবার সেই সিন্ধুতীরে ফিরে গিয়েছিল, সেখানে তার চার খলিফাদের দু'জনকে পাঠালেন জলপথে সিন্ধু-আরব সাগর-ইউফ্রেটিস বেয়ে বেবিলনের উদ্দেশে–আর অপর দুই খলিফা ও স্ত্রী রোকসানাকে সাথে নিয়ে বেলুচিস্তানের বিরূপ আবহাওয়া আর দুর্গম স্থলপথ অতিক্রম করে সপুত্রক পৌঁছলেন তিনি বেবিলনে। ব্যস্ ওখানেই শেষ। এটুকুই সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপন করা গেল না।

বিকেন্দ্রী রথীরা আবার সরব হয়ে উঠলেন, এর ফাঁকেই তিনি বললেন—তুমি যে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান বা ইরানের মাঝে প্রাকৃতিক বেরিয়ারের কথা বলছো, অতীতের অনেক সময়ে ঐ বেরিয়ারের পশ্চিম পাশে কাবুল, কান্দাহার প্রভৃতি আফগানিস্তানের বহু জায়গাও ভারত সাম্রাজ্যের অংশ ছিল।

—জি স্যার, ছিল। আমি প্রাচীন যুগের মানচিত্রে ওটা দেখেছি, কান্দাহারের প্রাচীন নাম ছিল গান্ধার—সে সময়ের বৌদ্ধ সংস্কৃতির মধ্যে এশীয় পীঠস্থান। কিন্তু তারপরেও খিরথর থেকে খাইবার পর্যন্ত এই প্রাকৃতিক বেরিয়ারের পূর্ব পাশ কখনই পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল না; তা সে ভূপ্রাকৃতিকভাবে হোক অথবা রাজনৈতিকভাবেই হোক 'মুলতান' সব সময়ই বা সর্বক্ষেত্রেই ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আলোচনার বিষয়টা আবার মধ্যযুগের মধ্য এশিয়াতে ফিরে গেল। সে সময় মাঝে মাঝে বছরের পর বছর ঐ এলাকায় চলতো একটানা খরা; পশ্চিমের ককেশাশ পর্বতমালা ও কৃত্রিম বেরিয়ার (সম্ভবত কোরানের তফসীরে যেগুলিকে জুলকারনাইনের প্রাচীর বলে সন্দেহ করা হয়েছে) তদুপরি পূর্বে চীনের মহাপ্রাচীর, তিব্বতের মালভূমি বা ঐ এলাকার পর্বতমালার অবস্থানগত কারণে যেমন সম্ভব হয়নি পশ্চিমের ইউরোপে হানা দেওয়া তেমন সম্ভব হয়নি পূর্বের চীনেও, বিধায় ঐসব খরা-প্রপীড়িত ক্ষুধার্থ লোকেরা সংগঠিত হয়ে ধেয়ে চলে আসতো খাইবার গিরিপথের দিকে, উদ্দেশ্য একটিই—সুজলা সুফলা ভারতবর্ষে হানা দেওয়া। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হানা হল ৪ বার, বলা বাহুল্য প্রত্যেকবারই এই আক্রমণ সফল হয়েছে।'

—কেন?

—কারণ হল, পিছনে ফিরে গেলেই মৃত্যু অবধারিত, এটা তারা খুব ভালোভাবেই জানতো।

—ঠিক একই রকম কারণ ও সংখ্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে আরবদের ব্যাপারেও, ইউরোপ তথা আরবদের পার্শ্বস্থ সুজলা সুফলা অঞ্চলে সেমেটিক অভিযান সম্পর্কে বার্ট্রান্ড রাসেলের একটা লেখায়, যার মধ্যে অন্তত একটিকে ইসলামের প্রথম দিককার বিজয় অভিযান হিসাবে চিহ্নিত/কটাক্ষ করা হয়েছে, বললাম আমি। তিনি আমার কথাটা মেনে নিতে পারলেন কি না তা বোঝা গেল না; তবে আমরা বিকেন্দ্রী রথীদের কারণে অতিদ্রুত প্রসাঙ্গান্তরিত হয়ে গেলাম।

অধ্যাপক আহমদ শরীফের মাথার উপর দেয়ালঘড়িটা বলছিল যে, আমাদের এই আড্ডার আয়ুটা দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। এর মধ্যে আবার কোরান ও হাদিসে বর্ণিত বেহেস্তের উপকরণগুলো নিয়েও আলাপ করতে স্যারকে উস্কে দিলাম; স্যার বেশ সকৌতুক রসালো আলাপ করলেন, আমরা প্রায় সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলাম।

উঠে দাঁড়ালেন তিনি, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা, গিয়াসউদ্দীন মোল্লা, আবু ইউসুফ, আফজালুল বাসার, গজনফর কবির, সেলিম আহম্মদ প্রমুখ কয়েকজন। উঠে দাঁড়ালাম আমিও, ততক্ষণে তিনিও উঠে দাঁড়িয়েছেন। সাইট-এ কাজ ছিল তাই সবিনয়ে তাঁর কাছে বিদায় চাইলাম; সম্মতি পেয়ে দ্রুত নিচে নেমে আসলাম। গজনফর কবির, সেলিম আহম্মদ সাহেব আমার সাইট দেখবেন বলে রওনা হলেন, শেষ পর্যন্ত না পৌঁছে পথিমধ্যে জনাব গজনফর কবির বিদায় হলেন। সেলিম আহম্মদ সাহেব ইংল্যান্ড প্রবাসী

বিধায় দ্রুত পথ চলা অভ্যাস। তার সাথে তাল মিলিয়ে পথ চলতে লাগলাম আর মনে মনে ভাবতে লাগলাম-'পরের শুক্রবার (২৬.০২.৯৯) স্যারকে বলবো-পাঁচ শত মিলিয়ন বছর আগে CAMBRIAN যুগে যখন ইন্ডিয়ান প্লেট দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, এন্টার্কটিকা প্রভৃতি প্লেটের সাথে সহাবস্থান করছিল এবং তারপর যখন ইউরো এশিয়াটিক প্লেটের পামীর তিব্বত এলাকাকে টার্গেট করে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে শুরু করে, তখনও মুলতান এলাকার সরাসরি নীচের মূল প্লেটের অংশটি ইন্ডিয়ান প্লেটেরই অংশ ছিল। তার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রমাণ হল, সিন্ধুনদের মূলধারা এখনও মুলতানের পশ্চিম পাশ অর্থাৎ মুলতান ও সুলেমান-খিরথর পর্বতসারির মাঝে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ঠিক যে কারণে ও উদ্দেশ্যে গঙ্গা নদীর মূলধারা তৈরি হয়েছে, ঠিক সেই একই কারণ ও উদ্দেশ্যে সিন্ধুনদের মূলধারা সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমরা তত্ত্বগতভাবে বলতে পারি যে, নালন্দা যেমন তদ্রূপ মুলতানও সব সময়ই ইন্ডিয়ান প্লেটের অংশ ছিল। আমার দেওয়া এ তথ্য সত্য তথ্যের কাছাকাছি হোক বা না হোক, অন্তত অধ্যাপক আহমদ শরীফের এ আড্ডায় বেশ একটা হাস্যরসের উস্কানিমূলক উপকরণ হবে তাতে আমি প্রায় নিশ্চত ছিলাম।

পরের সেই শুক্রবার আর এলো না।

আমি আগে অধ্যাপক আহমদ শরীফকে চিনতাম না। নাম ধাম তেমন খুব বেশি শুনেছি বলে মনে হয় না। কিন্তু যখন তাঁর ফাঁসি চেয়ে মুরতাদ ঘোষণা দেওয়ার জন্য মিছিল মিটিং ইত্যাদি শুরু হল, তখনই আস্তে আস্তে মুরতাদ আহমদ শরীফ সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম, তাঁর সম্পর্কে জানার চেষ্টা করলাম। অনিয়মিতভাবে তাঁর বৈজ্ঞানিক আড্ডায় বেশ কয়েকদিন বসে তাঁর সমৃদ্ধ তথ্যের গভীরতা সম্পর্কে আঁচ করতে পারলাম। তাই সময় পেলে প্রায়ই তাঁর আড্ডায় গিয়ে বসতাম তাঁর দেওয়া তথ্য গলধঃকরণ করার জন্য। আস্তে আস্তে কখন যে অনিয়মিত থেকে নিয়মিত হয়ে উঠেছিলাম তা বুঝে উঠতে পারিনি।

পাবলিকদেরকে উন্মাদনায় উন্মাদিত করা এবং একটা action সংগঠিত করে তার ফলাফলটা পকেটস্থ করা হল ধান্ধাবাজ ধর্মতাত্ত্বিক, ধুরন্ধর রাজনীতিক ও কিছু ক্ষেত্রে ধর্মবেত্তাদের কাজ। কোনো উদাহরণ না টেনে বলতে চাই যে এই ধারণাটা আমার কাছে বেশ কিছুকাল আগে থেকেই স্পষ্ট হয়ে আসছিল; স্পষ্টতর হয়ে উঠছিল তাদের সুনিপুণ ও নিশ্ছিদ্র সামাজিক অভিনয়। যদি কখনও ঐ সব ধাপ্পাবাজ ধর্মতাত্ত্বিকরা জিজ্ঞাসিত হন এই বলে যে, তারা ধর্মকে ব্যবহার করছেন? তখন তাদের অভিব্যক্তি ও অভিনয় experiment করে দেখার আহ্বান করছি। এসব ধর্মধর্ষকদেরকে অজস্র ধন্যবাদ দিতে চাই এই কারণে যে, তারা অধ্যাপক আহমদ শরীফের মত আরও মহামেধাবী মুরতাদকে খুঁজে বের করুক। তাহলে আমাদের অনেক শ্রম ও সময় বেঁচে যাবে, আমরা পারব ঐসব মহামেধা ও তথ্যের মহাসম্মেলনে অবগাহন করতে।

একটি মৃত্যু, একটি যন্ত্রণাহত বিবেক ও কিছু স্মৃতি

প্রথমা রায় মণ্ডল

মৃত্যুই শেষ সীমারেখা নশ্বর জীবনের, মৃত্যুতেই জীবনের অবসান। তবু মরণের পরেও, জীবনের দীর্ঘ ছায়া জড়িয়ে থাকে চারপাশের হাজারো বিচূর্ণিত স্মৃতিকণায়, চেতনার শৈল্পিক পুনর্জাগরণে ও পুনর্নির্মাণে, এ্যালবামে, টেপ-এ ধরা কণ্ঠস্বরে, ভিসিডি'র চলচ্ছবিতে। কাজেই মহাকালের 'সোনার তরী'তে জীবনের 'ছোট আমি'র ঠাঁই না হলেও, তার আচ্ছন্ন করা উপস্থিতি, অন্তত মানসলোকের অলিন্দে তার নিয়ত আনাগোনা, 'যাওয়া-আসা', অশরীরী নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস অনেক অনেক কাল ধরে মানুষ-মানুষীকে স্মৃতিতাড়িত করে, তার বুকে ও অনুভবে বাজায়ও বটে এক ধরনের মিশ্র 'সুখের মতো ব্যথা' এবং ব্যক্তিবিশেষে বিবেকী যন্ত্রণায় তাকে দগ্ধ করে, গন্ধবিধুর জ্বলন্ত ধূপের মতো সবার অলক্ষিতে একটু একটু করে নীরবে নিঃশেষ করে। আহমদ শরীফের মৃত্যু আমার কাছে এমনি এক অভিনব অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভব। তাঁর চলে যাওয়া আর পাঁচটি মৃত্যুর মতো স্বাভাবিক ঘটনা হলেও একে সরলীকরণের দ্বারা বিশ্লিষ্ট করা যায় না। এখানেই তাঁর অমোঘ প্রভাব 'স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যতে'। আত্মীয়-স্বজনের বহু মৃত্যু দেখেছি, সম্প্রতি [দু'বছর আগে] আমার জন্মদাতা পিতার মৃত্যুও। কিন্তু এমনি করে এর আগে কেউ আমায় নিরলস সুতীব্র যন্ত্রণায় আন্দোলিত করেনি, বিবেকী দংশনে-মর্মপীড়ায় শূন্যতার হাহাকার ছড়ায়নি। কেন এমন হয়? কে ছিলেন তিনি আমার?

না, রক্তের সম্পর্কে তিনি আমার কেউ ছিলেন না, না প্রচলিত ধর্মের বন্ধনেও। সাধারণেরা এখানে-সেখানে মুখ খুলতেন 'ধর্মকন্যা' পরিচায়কে; সাধারণ মাপের কোন কোন বুদ্ধিজীবী বলতেন 'কন্যাকল্প', 'কন্যাতুল্য' কিংবা 'মানসকন্যা' ইত্যাদি। কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রীর, তাঁর ভাষায় 'রক্তের সম্পর্কের বাড়া'। তিনি মধ্যযুগের কবি সৈয়দ সুলতানের উপমায় বলতেন : 'কন্যারত্ন', 'আমার হৃদয়লতার পুষ্প'। একজন দায়বদ্ধ পিতা তাঁর সন্তানের জন্যে যা যা করে থাকেন, তিনিও তাঁর আত্মজার জন্যে পুরোমাত্রায় তাই করে আমাকে আমৃত্যু ঋণের জালে জড়িয়ে রেখে গেছেন। অবশ্য এই সম্পর্ক দাঁড়িয়েছিল বুদ্ধি এবং হৃদয়, মন ও মননের মিথষ্ক্রিয়ার উপর, 'মানস' যার অন্য নাম। আর এ কারণেই মর্মমূলে প্রোথিত আবেগের তলদেশ থেকে উঠে আসা যন্ত্রণা আমাকে তীরবিদ্ধ পাখির মতো আহত

করে। রক্ত নয়, ধর্ম নয়, তার চেয়েও এক 'বিপন্ন বিস্ময়' আমাদের চেতনায় খেলা করতো। তাঁর সঙ্গে আমার শিক্ষক-ছাত্রী পরিচয়ের সম্পর্ক ছাব্বিশ বছরের, পরে তা রূপ নেয় সাহিত্য-সংস্কৃতি ভাববিনিময়ের বন্ধুত্বে, যার নাম তিনি দিয়েছিলেন 'মানস বিলাস'। ক্রমে সেই সম্পর্ক আত্মার নিবিড় আত্মীয়তায়, অন্তরের অবিচ্ছেদ্য-অবিমোচ্য অঙ্গীকারে, পরস্পর নির্ভরতায় একযুগ আগে পৌঁছে গিয়েছিল পিতা ও আত্মজার সীমানায়। অপত্য স্নেহ ও ভালোবাসার এক স্বতঃপ্রণোদিত পবিত্রমধুর সম্পর্ক ভৌগোলিক-রাষ্ট্রিক সীমানা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক সমুন্নতি পেয়েছিল। জীবিতকালে যে সম্বন্ধ তিনি গড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর স্মৃতিময় অনিন্দ্য এক পারিজাত বাগানে বসে অনুভব করছি : স্মৃতি ও সম্পর্কের ওজন এবং তার দায় কত ভারী ও যন্ত্রণার। লোক শিক্ষার স্বার্থে গল্পে উপন্যাসে 'অসাম্প্রদায়িক' সম্পর্ক বিষয়ে বহু কাহিনী বানানো হয়। কিন্তু সম্পর্ক-লালন ও বলিষ্ঠায়নের তথা শ্রীবৃদ্ধির প্রশ্নে ধর্ম যে সত্যিই কোনো বাধা নয় এবং কেবল রক্তই নয় কোনো অচ্ছেদ্য বন্ধন—আমায় যথার্থ আত্মজার বেদিতে প্রতিষ্ঠিত করে অতঃপর পিতৃদায় পালনের মধ্য দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন-জাতপাত-ধর্ম-বর্ণ কত ঠুনকো। মানুষের সঙ্গে মানুষের, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের এবং মানসিকতার সঙ্গে আবেগের এই মেলবন্ধন, পিতার সঙ্গে কন্যার এই মানস ঐশ্বর্যময় সমৃদ্ধি আসলে কৌম চেতনাজাত, যা তিনি অর্জন করেছিলেন আফ্রিকায় স্থিত বিশ্বের প্রথম আদিমানব-মানবীর কাছ থেকে, যারা পৃথিবীর তাবৎ মনুষ্যকুলের উৎস, এবং সে বিচারে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের একে অপরের সম্পর্ক আত্মীয়তার, জ্ঞাতিত্বের, শর্তহীন বন্ধনের। এভাবেই তিনি আমার অন্তরের গুপ্ত ও সুপ্ত মানবিক বোধের জাগরণ ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু আমার যন্ত্রণার উৎস অন্যত্র। আর বিবেকের পীড়ন? সে তো আরো এক দীর্ঘ-দীর্ঘতর ইতিহাস—সে ইতিহাসের জমিতে বীজ বোনার সময় এখনো আসেনি। সে এক কিংকর্তব্যবিমূঢ় পিতার সঙ্গে স্নেহান্ধ কন্যার মান-অভিমানের রক্তাক্ত লড়াইয়ের অধ্যায়। আর একারণেই তাঁর মৃত্যু আমাকে নিয়ত যন্ত্রণাহত বিবেকীদংশনে দীর্ঘ করে, কষ্টবমন হয় সত্তার গভীরতম জিজ্ঞাসা থেকে।

আমি তাঁকে সম্বোধন করতাম 'বাবা' বলে। তিনি আমায় জানতেন মেয়ে ও মা রূপে, ডাকতেন প্রথমা, লিখতেন 'মা প্রথমা' [সহস্রাধিক চিঠিতে] এবং পত্র শেষে 'বাবা'। ১৯৮৮ সনের পরে আর কখনো [মৃত্যু পর্যন্ত] পত্রান্তে 'আহমদ শরীফ' লেখেননি তিনি। সম্পর্কের ডালপালা ক্রমে ছায়াদায়ী মহীরুহে রূপ নেয়। তিনি প্রায়শই লিখতেন—বলতেন : 'তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক রক্তের বাড়া। তুমি আমার কন্যা হয়ে আছোই-আছোই-আছোই। তোমার স্থান আমার চিত্তলোকে, মর্মমূলে। .... এ সম্পর্ক আমৃত্যু জীবন-মরণ ঘিরে।' বোধ হয় তিনি ঠিক বলেননি, সম্পর্কের এ বাতাবরণ মৃত্যুকে ছাড়িয়ে, কালান্তরে এর স্থিতি। ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা ও কৌতূহলাক্রান্ত দূরত্ব বজায় রেখে অধিকাংশ মানুষ আহমদ শরীফকে জানতেন একরোখা জেদি-তেজী, গম্ভীর-রাশ-ভারি, যুক্তিনির্ভর, নাস্তিক পরিচয়ে—যিনি কথা বলতেন ভনিতা না করে, শানিত উচ্চারণে, মাছ ভাজার মতো কথাকে উল্টে-পাল্টে বিচার করতেন, চিরে চিরে দেখেছেন প্রতিটি বাক্যার্থ। ফলে তাঁর মননঋদ্ধ গদ্যের শরীর বিশেষণ ও অনুপ্রাসযুক্ত, যেন বেতের মতো টান টান। এই আবরণ ভেদ করে যাঁরা তাঁর কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছেন

কেবল তাঁরাই জানেন—আহমদ শরীফ কতটা ঘরোয়া, স্নেহপ্রবণ, আবেগতাড়িত, অকপট, আটপৌরে এবং কোমল রসের এক সাধারণ মিশুক মানুষ ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে সাহিত্যের ইতিহাসের পাঠদান কালে বিভিন্ন উদ্ধৃতি এবং পাঠপ্রসঙ্গ ধরিয়ে দেবার সূত্রে আহমদ শরীফের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় (১৯৭৩), আর পিতৃদত্ত 'প্রথমা' নামটি আমার প্রতি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণের প্রথম কারণ। পাঠ্যাবস্থায় মুখে মুখে অকুতোভয়ে তর্ক করেছি, প্রতিবাদ করে তাঁর উত্তেজনা ও তার্কিক-চৈতন্যকে উসকে দিয়েছি। আর তখনই চিনতে শুরু করেছিলাম তাঁর অন্তরের সুপ্ত মানুষটিকে। তিনি চাইতেন, তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা যে কোনো বিষয়কেই যুক্তির শানিত তরবারিতে ব্যবচ্ছেদ করে জগৎ ও জীবনকে সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে চিনতে শিখুক—বৈজ্ঞানিক-নিরাসক্ত যুক্তিবাদী মনই তাকে একদিন নাস্তিক্য চেতনায় পৌঁছে দিক। একদা আমি তাঁর মন-মনন-যুক্তি-মেধা-নাস্তিক্য মেশানো যে কঠিন মানুষটিকে তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি-মনীষা মিশ্রিত মানুষ গড়ার পাঠশালায় দেখেছি, সেই মানুষটিই পরবর্তীকালে পিতা-পুত্রীর সম্বন্ধ গড়ে ওঠার পর যখন বলেছেন : 'তুমি হচ্ছো আমার টবে ফোটানো আদরের ফুল, তার সযত্ন লালন দরকার, নইলে অনাদরে শুকিয়ে যেতে পারে'-তখনই বুঝেছি এ এক ভিন্ন মাত্রার মানুষ—দোর্দণ্ড দাপটের আড়ালে এক আবেগাশ্রিত কবির চেতনায় ঋদ্ধ আহমদ শরীফ, যেখানে দার্শনিক সূক্তির কারুকৃতি ওজন বাড়াতে পারে না; সেখানে স্নেহমিশ্রিত আবেগ শুধুই অনাবিল সৌন্দর্যের গন্ধ ছড়ায়। সম্পর্কের সযত্ন-লালনের কথা তিনি বহুবার বহুভাবে বলেছেন, যেমন বলতেন শিল্পের সযত্ন-পালনের অপরিহার্যতার কথা। আর এ কারণেই অসম বয়সের [সাড়ে বত্রিশ বছরের ব্যবধান] দুটি মানুষ কেমন মরমী বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম। তাঁর অনুগত নিবেদিত সেবক-সন্তান স্বপন; আর তাঁর দৈনন্দিন গার্হস্থ্য জীবনের বন্ধু কাজল ভাবী, ভাবী থাকতো তাঁর চারপাশে, আমি থাকতাম তাঁর 'জাগ্রত মুহূর্তগুলি সর্বক্ষণ আচ্ছন্ন করে' মানসে। ফলে তাঁর প্রতিদিনের সব কথা, সমস্ত ঘটনা, লেখালিখির হিসাব, মানসিক শৈথিল্য-টানাপোড়েন, সভা-সমিতি-মিটিং-মিছিল-বিবৃতির খতিয়ান, রাষ্ট্রিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক অবক্ষয়-নৈরাশ্য, লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীর অবস্থান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ছদ্মআবরণের বিড়ম্বনা, আপোসকামিতা, পত্র-পত্রিকা পুস্তক-প্রকাশক সমাচার, শিক্ষাঙ্গনের নৈরাজ্য, এমন কি তাঁর যে কোনো গ্রন্থ উৎসর্গের সিদ্ধান্ত ও তাঁর পুনর্বিবেচনা বিষয়ক পরামর্শ এবং সর্বোপরি তাঁর প্রতি মূহূর্তের প্রতিটি অনুভূতির খবর একান্ত নির্ভরযোগ্য বন্ধুর মতো, দিনের শেষে নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলার মতোই, আমাকে লিখে না জানানো পর্যন্ত যেন তাঁর স্বস্তি ছিল না। এ লেখাগুলোর (চিঠি) ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকৃত হলে আহমদ শরীফ-চর্চাও খণ্ডিত হতে বাধ্য। তিনি ছিলেন আমার জীবনে বটবৃক্ষের মতো—যাঁর শিকড় ধরে আমি বেড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিলাম আর তাঁর স্নিগ্ধ ছায়ায় স্নাত হয়ে যথাসম্ভব 'পরিণত' হবার চেষ্টা করেছিলাম। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে বর্ষীয়ান অধ্যাপক ড. বিজিত দত্ত যথার্থই বলেছিলেন : 'প্রথমার মাথার উপর থেকে ছাদটাই খসে গেল।' এ ক্ষতি শুধুই কি আমার একার? তিনি তো ছিলেন বাংলাদেশের তাবৎ প্রগতিশীল সাহিত্য ও সংস্কৃতিকর্মীর অভিভাবক, রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে তাঁদের 'অভয় শরণ'।

তাঁকে নিয়ে কোনো লেখাই আমার 'শেষ লেখা' নয়, তবু এ মুহূর্তেও কিছু লিখতে বসা মানে কাঁচা ঘা'কে খুঁচিয়ে আরো সজীব করে তোলা, তৎসত্ত্বেও ট্রাজেডির আনন্দদানের মতো, কিছু লিখতে পারার মাধ্যমে হয়তো একটু স্বস্তিসুখ মেলে। সাগরের ঊর্মিমালার মতো অসংখ্য স্মৃতির ঢেউ আমাকে আন্দোলিত করে, আচ্ছন্ন করে এবং একটি ঢেউ বিচূর্ণিত হয়ে জায়গা করে দেয় অন্য ঢেউয়ের। তিনি মাঝে মধ্যেই বলতেন : 'তুমি আমার বিদুষী কন্যা, মহাভারতে চিত্রিত যজ্ঞোদ্ভূতা যাজ্ঞসেনীর মত, একেবারে Ready made, আমার তৈরি করে নিতে হল না'। এমনই একটি কন্যা সন্তানের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর মনোলোকে, যে বহন করতে পারবে তাঁর ভাবনার-চিন্তার-মননের উত্তরাধিকার। তিনি বলতেন, 'তোমার মতো সন্তানের বড় প্রয়োজন আমার, ভাববিনিময়ের জন্যে। তাতে লেখা সহজ হয়, আলোচনা বিষয়সাপেক্ষ হয়, তর্ক করে আনন্দ মেলে।' তিনি বুদ্ধিমানের সঙ্গে তাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক করে, আড্ডা দিয়ে আনন্দ পেতেন, কিন্তু ইডিয়সিকে একেবারে বরদাস্ত করতে পারতেন না।

বলেছি, তাঁর ছিল একটি আবেগতাড়িত হৃদয়, সেখানে তিনি ভিন্ন মাত্রার মানুষ। অন্তরে ছিলেন শিশুর মতো সরল। আমাকে শাসন করতে ব্যর্থ হয়ে এবং নিজেই আমার শাসনকে সন্তানের মতো অবলীলায় শিরোধার্য করে তৃপ্ত হতেন। 'বনফুল স্মারক বক্তৃতা' দিয়ে ফেরার পথে বললেন : 'আমি ভয়ে ভয়ে ছিলাম, এই বুঝি তুমি ধমক দিয়ে স্লিপ পাঠাও, বক্তৃতা ঝুলে যাচ্ছে বলে' (৫.৫.৯৪); লিখতেন : তোমার ধমক, হুমকি আর বকুনি খাওয়ার ভয়ে হৃদয়ের কথা আজ আর বললাম না (৪.৩.৯৩)'। কখনো কখনো তাঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া হত, হত পিতা-পুত্রীর মান-অভিমান। রাগ করে কখনো না বলে চলে যেতাম অধ্যাপক মনসুর মুসার কিংবা অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের বাসায়, কখনো বা ঘুরে বেড়াতাম রমনায়, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে, বাঙলা একাডেমীতে কিংবা নিউমার্কেটে। সেই সময়গুলিতে তিনি ভেতরে ভেতরে বড়ই উতলা হয়ে পড়তেন। আমার মতো একগুঁয়ে-আত্মাভিমানী মেয়েটিকে নিয়ে তাঁর যন্ত্রণার অন্ত ছিল না।

দুই.

সত্তরের প্রথমার্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ক্লাসে তাঁর শাস্ত্র-সংস্কার-অলৌকিকতা বিরোধী পাঠদান আমাকে তাঁর সম্পর্কে ভীতি নয় এবং সম্ভ্রমমিশ্রিত মন্ত্রমুগ্ধ আকর্ষণ জাগিয়ে দিত। আমার পারিপার্শ্বিক সঙ্কটে মুশকিল আসান ছিলেন তিনি, মানস সঙ্কটে তো বটেই। ইতিহাসের ধারায় বৈষ্ণব পদাবলী বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি প্রেমৈশ্বর্যময়ী রাধার পক্ষে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকে যুক্তি দিয়ে যেভাবে তুলোধুনো করতেন, পদাবলীর অলৌকিকত্বের অসারতা প্রমাণ করে মানবী প্রেমের স্নিগ্ধ দুয়ার দিতেন খুলে, কিংবা মনসামঙ্গলের পাঠদানকালে যেভাবে মনসার সঙ্গে চাঁদ সওদাগরের লড়াই এবং বিদ্রোহী সওদাগরের যেভাবে সন্তানতুল্য বেহুলার প্রতি স্নেহ-বাৎসল্যের শৃঙ্খলে আত্মসমর্পণের বিষয়টি দেখিয়ে দিতেন, তখন এর মধ্যে দিয়েই ড. শরীফের প্রতি তৈরি হয়ে যেত একটা আনুগত্য ও ভালোলাগা বোধ। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর ব্যক্তিত্ব, যুক্তি ও নাস্তিক্যবোধের ভাষা আমি আত্মস্থ করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। এক

অভূতপূর্ব ভালোলাগা বোধ থেকে প্রথম বর্ষের ছাত্রী থাকাকালে কোনরকম অনুমতি না নিয়েই দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় বর্ষ, প্রিলিমিনারী ও শেষ বর্ষের (এম.এ) ক্লাসে ঢুকে পড়তাম। একদিন তিনি আবিষ্কার করলেন আমার নিয়ম বহির্ভূত অবাধ বিচরণের ঘটনাটি; বললেন, 'এই যে বর্ণচোরা, আসলে তুমি কোন্ ইয়ারের ছাত্রী?' তাঁর কথার জবাব না দিয়ে নির্ভয়ে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়েছিলাম; 'কেন, ক্লাস করায় আপনার আপত্তি আছে?' বলা বাহুল্য এমন বেয়াদব ভক্তের কাছে সেদিন তিনি হার মেনেছিলেন আর আমি সেদিনই আবিষ্কার করেছিলাম গাম্ভীর্যের আড়ালে তাঁর স্নেহে বিগলিত সত্তাকে। পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত, আমার ভেতরের আস্তিক্য চেতনার শরীর ধরে এরপর তিনি এমন জোরে নাড়া দিয়েছিলেন যে দীর্ঘকাল ধরে লালিত আমার সংস্কার-দেবভক্তি ও বিশ্বাসের দেয়াল তাসের ঘরের মতো পড়লো ভেঙে। আর সেই ভাঙা বিধ্বস্ত 'বাস্তিলে'র উপরেই গড়ে উঠেছিল বোধ ও বোধি, মন ও মননের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌধ। আমি যেন তাঁর ভাষায়, তাঁর যুক্তিতে কথা বলতে শিখলাম। আমি চেতনে-অবচেতনে জীবন ও জগৎকে বোঝার দৃষ্টিভঙ্গিটি অতি দ্রুত আয়ত্তে আনতে সচেষ্ট হলাম। আটের দশকের গোড়ার দিকে, আমার ডক্টরাল থিসিসের সময়, সাতের দশকের সেই বাঙলা ক্লাসগুলো যেন চোখের সামনে ঝলসে উঠলো বিষয়-নির্বাচনের প্রশ্নে। তখন আমি কোলকাতার বিদ্যাসাগর মহিলা কলেজে পড়াই। ছাত্রীদের যুক্তি আর নাস্তিক্যবাদের ভিয়ান দিয়ে মগজ ধোলাই করি। শুরুতে পিএইচ. ডি.'র বিষয়বস্তু হিসেবে বোকার মতো সরাসরি আহমদ শরীফের নাম প্রস্তাব করে ব্যর্থ হই; বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিবৃত্তিক জটিলতার 'লাল ফিতের গিঁট' তখনও আমার সরল মস্তিষ্কে ঢোকেনি। এরপর 'বাঙলাদেশের প্রবন্ধ ও সমাজ-রাজনীতি' শিরোনামটিও পরিত্যাগ করে, উদ্দেশ্য অটুট রেখে সরল নামকরণ করি, 'বাঙলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি'। তাতে আরো ষোলজন ব্যক্তিত্ব সংযোজিত হলেও আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্যের কারণে হাজার পৃষ্ঠার মধ্যে তিনি একাই পেয়ে গেলেন সাড়ে তিন শ' পৃষ্ঠা। পুরো বিষয়টি বিশ্লেষিত হয়েছিল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আলোকে। অভিসন্দর্ভটি পরে সংক্ষেপে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবী ও প্রগতি প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব' শিরোনামে। হ্যাঁ যা বলছিলাম, গবেষণা কর্মের সুবাদে পুনরায় তাঁর সঙ্গে সংযোগ এবং পরিবর্তিত সম্পর্কের সূচনাও সেখান থেকেই, যা আজো অব্যাহত।

ধীরে ধীরে সম্পর্ক ততটাই পারিবারিক হয়ে উঠলো যে পুজোর, শীতের কিংবা গরমের ছুটিতে, অথবা কোনো পরিবারিক উৎসবে কোলকাতা-ঢাকা-কোলকাতা যাতায়াত যেন আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আর ঢাকায় যাওয়া মানেই তো চিন্তক-পণ্ডিত আহমদ শরীফের অসংখ্য বুদ্ধিবৃত্তিক ফাইফরমাশ খাটা, তাঁর চেয়ার-টেবিলে বসে একটানা প্রুফ দেখা, বাছাই রচনার ফেয়ার কপি বানানো, পরবর্তী বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করা, পুথির পাঠোদ্ধার ও পুনর্লিখন, গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা, যুক্তি-যুক্তিখণ্ডন ইত্যাদি নানা বিষয়ে জড়িয়ে পড়া। এত কাজ দিয়ে আমাকে আটকে রাখার অন্য একটি অপ্রকাশ-উদ্দেশ্যও তাঁর ছিল। তিনি চাইতেন, যে ক'দিন ঢাকায় থাকি আমি যেন তাঁর কাছছাড়া হবার সুযোগ না পাই, তাঁর চারপাশেই যেন তাঁর আদরিণী কন্যা ঘুর ঘুর করে বেড়ায়। এমনকি শুক্রবারের আড্ডার আসর ছেড়েও হঠাৎ

হঠাৎ উঠে আসতেন লেখার খোঁজ নেবার অছিলায়। বলাবাহুল্য ঢাকায় প্রাণ খুলে বেড়ানোর সুযোগ আমার বড় একটা হত না। আমাকে আরো বেশিদিন কাছে পাবার জন্যে মাঝে মধ্যেই শিশুর মতো অপরিণামদর্শী এবং প্রায় অসম্ভব আবদার জানিয়ে লিখতেন : তুমি ইচ্ছে করলেই এবং চেষ্টা করলেই ৩/৬/১২ মাসের ফেলোশিপ নিয়ে ঢাকায় চলে আসতে পারো ...।' কোনোবার ফ্লাইট পৌছতে বিলম্ব হলে অস্থির হয়ে পায়চারি করতেন, উৎকণ্ঠায়-উদ্বেগে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, কিংবা কোনোবার তাঁর বাস-নানুযায়ী যেতে না পারলে একের পর এক চিঠি জুড়ে উপচে পড়তো হতাশা-কারুণ্য-বিষণ্নতা আর মিথ্যে করে শেষ নিঃশ্বাসের 'অশনি সংকেত'। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, আমার বিভিন্ন সময়ের ছুটি ছাটার এবং যাওয়া-আসার দিন-ক্ষণ-তারিখের হিসেব আমার চেয়েও বেশি মুখস্থ থাকতো তাঁর। পিতৃত্বের এ এক অদ্ভুত দুর্বলতা।

বাঙলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ, বিশেষত পণ্ডিত-সাহিত্যসেবী-সংস্কৃতিকর্মীরা জানেন আহমদ শরীফ মানেই তত্ত্বকথা, ড. শরীফ মানেই যুক্তিনির্ভর প্রামাণ্য টীকা-টিপ্পনীতে সজ্জিত বিশ্লেষিত নতুন কথা, বিতর্ক এবং আবহমান চিন্তাচেতনার নতুন বিন্যাস ও মূল্যায়ন; তাঁরা জানেন একজন দ্রোহী পণ্ডিত ব্যক্তিত্বকে, যিনি প্রায় শত গ্রন্থের প্রণেতা, যিনি সারাজীবন ব্যয় করেছেন বাঙালির আত্মপরিচয় সন্ধানে। আর আমি তাঁর মধ্যে দেখেছি 'অন্তর বাহির' দর্পণে বিম্বিত এক গৃহস্বামীর মুখচ্ছবি, যিনি সংসারের হাল ধরেছিলেন শক্ত হাতে, সংসারের প্রতিটি মানুষের যিনি সুখ-দুঃখের খোঁজ নিতেন, যিনি আটপৌরে স্নেহবুভুক্ষু এক মধ্যবিত্ত বাঙালি, যিনি নিজে কম হেসে অন্যকে হাসাতেন বেশি, ছেলে মানুষের মতো মমতায় বেদনায় যাঁর চোখ অশ্রুর ঝর্ণাধারায় স্নাত হত, সমস্যায় আলোড়িত হতেন এবং কন্যার চিঠি সপ্তাহান্তেও না পেলে উতলা হতেন, ডাক বিভাগকে আর পাঁচজনের চেয়ে একটু বেশিই দোষারোপ করতেন, কন্যার বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে উৎফুল্ল হয়ে ডায়েরিতে লিখতেন 'আজ আমার প্রাণপ্রিয় প্রথমার অতি স্মরণীয় দিন (২৩.১.৯৬)'। কিংবা মেয়ের সাফল্য সংবাদে উৎফুল্ল হয়ে টেলিফোনে তা জনে জনে জানিয়ে দিয়ে শিশুর মতো আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠতেন। এ আর এক আহমদ শরীফ। তাঁর ভেতরে এবং বাইরে দু'জন মানুষ পাশাপাশি বাস করতো, সম্পর্কের অতলান্ত স্পর্শ অধিগত না হলে বোঝাই যেত না তা।

বছরের ঐ দু'এক মাসই আমাদের দেখা হত। বাকি সবকথা নিরন্তর চিঠিপত্রে। সৌজন্যের কৃত্রিম ভদ্রতার আবরণ সরে গিয়ে ক্রমেই বেরিয়ে পড়ে এক শিশুর সারল্যে ভরা স্নেহময় পিতৃহৃদয়ের গোপন বাসনা, যার শিকড়টি আবেগের জারকরসে সিক্ত। কখনো পিতার প্রতি কন্যার অভিমানের পাল্লাটা ভারি হয়ে উঠলে তিনি বলতেন : 'আমার কন্যার প্রতি তথা সন্তানের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য ও মমতা প্রকাশচেতনা সুষ্ঠু নয়, তাই ত্রুটি থেকে যায় আমার অজ্ঞাতেই। তবে মনে রেখো আর বিশ্বাস করো যে তুমি একাধারে আমার মা ও মেয়ে। বুড়ো মানুষও মনে মনে শিশু হয়ে মায়ের কোলে আশ্রয় খোঁজে, মা বা মেয়ের কোলে দুঃখ-বেদনা-হতাশার মুহূর্তে মাথা রেখে চোখ বুজে শান্তি ও স্বস্তি পেতে চায়। এজন্যে তো তোমাকে সবসময় কাছে পাওয়া যায় না, যাবে না, মাঝে মধ্যে বড় বৌমাকে পাই। তবে তখন সত্যই বাস্তব অনুভবে আমি তোমার কোলই পাই—বুড়ো বাপের একথাটি আক্ষরিকভাবে বিশ্বাস করো' (২৯.৩.৮৯)। এ আহমদ

শরীফ আমার সন্তানের মতো যিনি মায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করে অতিসহজেই পোষ মেনে যান এবং মাকে কাছে না পাওয়ার জন্যে শিশুর মতোই অনুযোগ করেন।

অভিসন্দর্ভ রচনাকালে তাঁর সমস্ত মৌলিক রচনা পাঠের সুযোগ পেয়ে তাঁকে আরো গভীর আরো ব্যাপকভাবে জানার পরিপ্রেক্ষিতেই অতঃপর ১৯৮৭/৮৮ সন নাগাদ আমি এখানকার বাতাসে চোখ বুলিয়ে উপলব্ধি করি : এমন একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত, সমাজ ও মানুষ-সচেতন চিন্তাবিদের খ্যাতি পরিচিতি কোলকাতার বুদ্ধিজীবী মহলে অত্যন্ত সীমিত। অবশ্য মুষ্টিমেয় দু'চার জন পরিচিত বন্ধুবান্ধব তাঁর দু'চারখানা গ্রন্থ পাঠ মাধ্যমে কিংবা দু'চারটে প্রবন্ধ প্রাপ্তিকে সম্বল করে, কেউ বা ঈর্ষাকাতরতাকে গোপনে রেখে একটা খণ্ডিত অস্পষ্ট ধারণা তৈরির চেষ্টা করছিলেন। এবার আমার মনে হল, আমার এ মুহূর্তের প্রথম ও প্রধান কাজ—এখানকার সচেতন-শিক্ষিত জ্ঞানপিপাসুর মধ্যে আহমদ শরীফ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা করা এবং সে প্রয়াসে তাঁর বিভিন্ন রচনা, পরিচিতি, সাক্ষাৎকার, বিভিন্ন সংকলন মুদ্রণ বা পুনর্মুদ্রণ পুস্তক পর্যালোচনা প্রকাশ প্রভৃতি কাজে যথাসম্ভব বিভিন্ন গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে, নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। আমার সীমিত সাধ্য অনুযায়ী সেদিন থেকে আজ অবধি সে দায়িত্বই আমি নিষ্ঠার সঙ্গে পালনের চেষ্টা করে যাচ্ছি।

এ সময়ে [মে, ১৯৮৯] বাবা তাঁর জেদি মেয়েটির জন্যে একটি মহান কাজ করে ফেললেন। বিষয়ী মানুষের কাছে এর তেমন গুরুত্ব না থাকলেও, আমি পেয়ে গেলাম এক বিরল সম্মান, এক বিশাল অমূল্য রত্নভাণ্ডারের আইনসম্মত অধিকার। তিনি পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে তাঁর যাবতীয় রচনা/সম্পাদনা/গ্রন্থ প্রকাশ করার, চুক্তি করা ও চুক্তি বাতিল করার ক্ষমতা এবং গ্রন্থস্বত্বের যাবতীয় অধিকার সুপ্রিমকোর্টের মাধ্যমে আইনসিদ্ধ দলিল করে আমায় দিলেন। বিধি মতো দুই দেশের বৈদেশিক দপ্তরের কালচারাল অ্যাটাসে'দের স্বাক্ষর রইল তাতে, সম্মতি স্বাক্ষর দিলেন তাঁর মেজ ছেলে ড. নেহাল করিম। এই প্রথম সরকারীভাবে কন্যার মর্যাদা ও স্বীকৃতি দিয়ে এক মহানুভবতার এক বিরাট হৃদয়ের পরিচয় দিলেন তিনি। আমার কাছে এটি শুধু কাগুজে স্বীকৃতি নয়, এতবড় একজন মানুষ, তাঁর সমস্ত বিশ্বাস-আনুগত্য-নির্ভরতা নিয়ে তাঁর সারাজীবনের সমস্ত সাহিত্যকৃতি, সন্তানতুল্য অশরীরী সম্পদ আমার হাতে তুলে দিলেন। এ অমূল্য প্রাপ্তির কি কোনো তুলনা হয়? লক্ষ/কোটি স্বর্ণমুদ্রা কিংবা বিপুল স্থাবর সম্পত্তির সাধ্য কি এর সমতুল্য হয়!

সে সময়ে তিনি অবশ্য কৌতুক করে কিংবা আক্ষেপ করে বলতেন, 'কোলকাতার মানুষ এখানকার দু'জনকেই মাত্র প্রখ্যাত হিসেবে জানেন ও মানেন : একজন কম্যুনিস্ট লেখক বদরুদ্দীন উমর, অন্যজন কবি শামসুর রাহমান।... আমার লেখার কদর এদেশেই হয় না—সীমানা পেরিয়ে তা আবার ভিন রাষ্ট্রে যাবে তা হয় নাকি?'-এমনই একটা অভিমানের তাৎক্ষণিক জবাব হিসেবে দৈনিক কাগজের পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে সাক্ষাৎকারের আলোকে পরিচিতি মূলক নিবন্ধ লিখলাম, তা দেখে [ছবিসহ] অবশ্য তখন খুশিই হয়েছিলেন তিনি।

তিনি তাঁর পরিবারে, মননে ও চিন্তনে, ছিলেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা। সেখানে তিনি একা, সম্রাটের মতো তাঁর অবস্থান। চিন্তা-দর্শন, অফুরন্ত তথ্যসম্ভার, বিশ্লেষণের

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির এই রাজা সেখানে চাষবাস করেন একা, বাইরের পৃথিবীর কেউ সেখানে দোসর নেই, গৃহেও নেই অনুকারক। কাজেই তাঁর চিন্তা-চেতনার উত্তরাধিকার ছিল না বলে অন্তরে একটা গ্লানিবোধও ছিল তাঁর। নতুন কথা বললেই তাঁকে নিয়ে বিতর্ক—কখনো রবীন্দ্রনাথ, কখনো বঙ্কিম, কখনো বাঙালিত্ব, কখনো মৌলবাদ, যেখানেই তিনি দিয়েছেন হাত সেখানেই শ্যাওলাধরা পলেস্তরা খসে পড়ে উঠেছে এক নতুন ইমারত। বিষণ্ন জর্জরিত বুড়োসমাজে এত তীক্ষ্ণধী-অন্তর্ভেদী ও মরমী চোখ নিয়ে তবে তিনি করবেন কি? তাঁর কি কোনো সহযোদ্ধা ছিল না। পূর্ণাঙ্গ সহযোদ্ধা না থাকলেও তাঁর মুক্তচিন্তার পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা নেহাত কমও ছিল না। অবশ্য অপটু ও ক্ষতিভীরু, তাদের কারো কারো অবস্থা ও অবস্থান। আসলে সময় থেকে, চিন্তা-চেতনায় তিনি ছিলেন শ'খানেক বছর এগিয়ে। তাই অন্তরে তিনি ছিলেন বড় বেশি নিঃসঙ্গ, বাইরে তাঁকে ঘিরে কোলাহল ও জনাড়ম্বর যত ব্যাপকই থাকুক না কেন। বলতেন : 'এখন না বুঝলেও একদিন আমার...এসব কথার ও লেখার কদর হবে, দেখে নিও।' এমনই ছিল তাঁর আত্মবিশ্বাসের ও আশাবাদের ভিত্তি। তত্ত্বকথা, ওজনদার দর্শনের কথা, ইতিহাস-বিকৃতির মুখোশ উন্মোচন করতে করতে, মিথ্যে বিশ্বাস-সংস্কারের ধ্বজা ভেঙে দিয়ে তিনি যখন মধ্যযুগের সাহিত্য-সংস্কৃতির রত্নভাণ্ডার জরিপ করে সন্ধান করে চলেছেন খেটেখাওয়া-নিরন্ন মানুষের ইতিহাস, একটার পর একটা চিন্তামূলক বই লিখে চলেছেন—তখন তাঁর মনে সাধারণ মানুষের জন্যে কল্যাণবোধ আলোড়ন তুলেছে নতুন করে। ১৯৯০ সনে জন্মদিনের ঝলমলে সকালে হঠাৎ তাঁর উপলব্ধিতে এলো : 'জীবনে আমার ভাত-কাপড়ের অভাব হয়নি, হয়নি কোনদিন হাড়ভাঙা কায়িক পরিশ্রম করতে। এ নিরাপত্তাসুখের তুলনা হয় না, যখন ভাবি শতকরা আটানব্বই জন মানুষই হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে আমৃত্যু, তবু ভাত-কাপড়ের অভাব ও অভাবের আশঙ্কা-আতঙ্কমুক্ত হয় না। এদের দুঃখ ঘুচানোর মন ও যোগ্যতা যে ছিল না, সেজন্যে এ মুহূর্তে গ্লানি বোধ করছি,' [১৩ ফেব্রুয়ারি, '৯০-এ লেখা পত্র]। এই গ্লানিবোধ অবচেতনে তাঁকে সারাজীবন তাড়িয়ে বেড়িয়েছে, ফলে পরবর্তীকালের বিভিন্ন রচনায় তা বিষয়বস্তুরূপে প্রকাশ পেয়েছে; কলাম লিখে সাধারণ মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছেন আমৃত্যু।

ঊননব্বুই সনে ঢাকায় যেতে না পারায় তাঁর মন কন্যা অদর্শনজনিত ব্যথায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। নব্বুই-এর জুন মাসে ঢাকায় যাবার পর আনন্দঘন পরিবেশে বাপ-বেটীর দিনগুলো ভালোই কাটলো বটে, কিন্তু কোলকাতায় ফেরার দিন ক্রমশ ঘনিয়ে আসতেই, একটি একটি করে ভিসার মেয়াদ ফুরোবার দিন গুনতে থাকতেন আর তাঁর বারান্দার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সুপুরি গাছটির পাতা ঝরার মতো নিজের ফুরিয়ে আসার কথা বলতেন বড় করুণভাবে। দশমীতে উমা-বিদায়ের প্রাক্কালে মেনকার পরিবর্তে এখানে গিরিরাজের আচ্ছন্ন হয়ে থাকা অসহায় করুণ মূর্চ্ছনা, প্রাণন্তচেষ্টায় মর্মভেদী গোপন অশ্রু সংবরণ প্রভৃতি বড় বেশি বিচলিত করতো আমাকে। তারপর ফিরে আসতে না আসতেই চিঠির পর চিঠিতে শুধুই স্মৃতি হাতড়ে বেড়ানো। বলতেন : 'স্নেহ-মমতা, প্রেম-ভালোবাসা প্রিয়জনকে সর্বক্ষণ মানস-মুকুরে প্রতিভাত করায়—তা-ই বেদনামধুর হয়ে অনুভবের ও স্মৃতির সঞ্চয় হয়ে থাকে, হয় জীবন পথের পাথেয়—এই জীবন ও

জীবনানুভূতি। বেদনা হচ্ছে বিচ্ছেদের, অদেখার, দূরত্বের আর মধুর হচ্ছে পূর্বতন সাক্ষাতের, মিলনের, ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ও অনুভবের মাধুর্য স্মারক।'—জীবনের গভীরতম তত্ত্বকথা তিনি এমনই অনায়াস দক্ষতায় মুহুর্মুহু উচ্চারণ করতে পারতেন, যা সাধারণ শিক্ষিতের কাছে গ্রন্থ-মুখস্থের উদ্‌গীরণ বলে ভ্রম হবে। গভীর অনুশীলন এবং তত্ত্ব-তথ্যের সমাবেশ ও তাদের মধুচন্দ্র যুগলবন্দি ঘটাতে না পারলে হৃদয় উথলে এমন জীবনাদর্শ স্রোতস্বিনী হতে পারতো না। তাঁর স্বকীয়তা ও নিজস্বতা এখানেই।

তিনি চাইতেন, কোলকাতার বিদগ্ধজনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও সংযোগ তৈরি হোক, চাইতেন ঢাকার বুদ্ধিজীবী মহলে আমার কদর বাড়ুক এবং এ-বাঞ্ছা থেকেই অনেক সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে চেষ্টা করতেন। এ যেন তাঁর এক বিদুষী কন্যার প্রতি বিদগ্ধ পিতার 'কন্যা দায়'। একজন দায়িত্ববান পিতা তাঁর সন্তানের জন্যে যা যা করেন সংসারে-স্নেহ, অর্থ-যশ-সম্মান, তিনি তার সবটাই করেছেন আমার জন্যে [আমার নিজের বাবার উদারতা থাকলেও সেই সঙ্গে সাধ্যের কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল বিভিন্ন দিক থেকে]। চোখের আড়াল হলেই সপ্তাহে দু/তিন/চার খানা করে চিঠি লিখতেন। যেন চিঠিতে চিঠিতে অবিরাম অনর্গল কথা বলা। কি নেই সে সব চিঠিতে। সর্দি হওয়া, দাঁত পড়া, পেট খারাপ, হাতের ফাঙ্গাস থেকে শুরু করে কাজের মেয়ে ঘণ্টার প্রেমে পাড়ার পূর্বাভাস, সংসারের আয়-ব্যয়ের হিসেব-নিকেশ, দেশের আর্থ-রাজনীতিক সাংস্কৃতিক সংবাদ, ফন্দিবাজ টাউট-মস্তানদের কথা, কাছের-দূরের আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবদের কথা, শুক্রবারের ও মাঠের আড্ডার বিবরণ, দেশের খরা-বন্যা-দুর্ভিক্ষের কথাও। জানাতেন কখন কোন্ প্রবন্ধের আইডিয়াটা মাথায় এল, সপ্তাহে ক'টা লেখা হল, কোনটির ধার ও ভার উৎকৃষ্ট মানের, কোন্ বইয়ে কি কি প্রবন্ধ গেল, ছাপার মান ও প্রুফ দেখার ক্লান্তিকর কষ্টের বয়ান প্রভৃতি সব—সব। এসব সংবাদ-পরিক্রমা এবং মত মন্তব্য, টীকা-ভাষ্য সমকালের এক অনন্য দলিল। সে সব চিঠি প্রকাশিত হলে বহু মুখোশধারী সজ্জনের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়বে।

ঘটনার প্রেক্ষিতে নব্বুই সনে একাদিক্রমে যেতে হল তিন বার। ২২ জুলাই ঘরে ফিরতে না ফিরতেই, স্বপনের বিয়েতে যাবার জন্যে ৩ অক্টোবর এল জরুরি ফোন, ভায়া হয়ে। ৪ অক্টোবর অর্থাৎ একদিনের মধ্যেই আমি ঢাকায় পৌঁছে যেতে পারায় অতিআনন্দে-বিস্ময়ে অভিভূত হলেন তিনি—তাঁর হুকুম যে আমার কাছে অলঙ্ঘনীয় আদেশ। অনুষ্ঠানের সকল আনুষ্ঠানিকতা পেরিয়ে বাপের অন্তরে একরাশ অভিভূতি সঞ্চিত রেখে কোলকাতার ব্যস্তজীবনে জাঁকিয়ে বসতে না বসতেই ১২ নভেম্বরের চিঠিতে তিনি জানালেন প্রাথমিকভাবে হৃদরোগ ধরা পড়ার খবর, আসলে আগের থেকেই মধুমেহ রোগের অধীনে থাকায় হৃদয়-আক্রমণের প্রথম ধাক্কাটা পষ্ট করে তিনি অনুভবই করতে পারেননি। ফলে জীবনকে নিয়ে ব্যঙ্গ আর অসুখ নিয়ে রসিকতা করেছেন চিঠিতে: '...আমার কলিজা (হার্ট) সামান্য অসুস্থ। অবশ্য এতে হাঁটাটা মন্থর ও সীমিত হল এবং আমার ডায়েবেটিক রোগের আবশ্যিক ব্যায়াম ব্যাহত হল মাত্র। অন্য ক্ষতির কোন আশু-আশঙ্কা নেই।... কাজেই এ খবরে তুমি যদি বেশি বিচলিত হও তাহলে আমি কেবল রেগেই যাব...।' কিন্তু এরপর হার্টের আরো অবনতি ঘটলো, হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ারে দশ দিন থেকে [২২ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর] চিকিৎসান্তে ঘরে

ফিরে এলেন প্রাণ হাতে নিয়ে। আমাকে দর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় অন্তরে আহত এ মানুষটি ঐ অবস্থায় ব্যক্তিগত হাত চিঠির মাধ্যমে এবং ৩/৪টি পোস্টকার্ডের কাঁপা কাঁপা অক্ষরে লিখে সব খবর জানালেন। কিন্তু আমার কাছে এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটিই বিলম্বে পৌঁছোয়—জেনারেল এরশাদ-পতন সংক্রান্ত বাঙলাদেশের তীব্র রাজনৈতিক অস্থিরতা-অরাজক অবস্থা এবং ডাক বিভাগের প্রচণ্ড গোলযোগের কারণে। আমার ঘরে তখন টেলিফোন ছিল না। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে যদিও অনতিবিলম্বে টেলিফোন সংযোগের ব্যবস্থা করেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রাক-অন্তিম মুহূর্তে কাছে থাকার সুযোগ ঘটলো কোথায়।

বিলম্বে খবর প্রাপ্তির কারণে ঢাকায় পৌঁছলাম ২৩ ডিসেম্বর, কন্যাদর্শনের আনন্দে তাঁর হৃদয়ের ক্ষত যেন দ্রুত স্বাভাবিক হতে শুরু করলো, মানস স্বাস্থ্যের উন্নতি বলাই বাহুল্য ঘটতে লাগলো ততোধিক দ্রুত গতিতে। সান্নিধ্য-সাহচর্য-সেবা ও শাসনের মধ্য দিয়ে এ যাত্রায় বাপ-বেটির সম্পর্ক আরো মধুর হয়ে ওঠে। এসময়ে কেন যেন আমার মনে হয়েছিল-তাঁর অসুস্থ হৃদয়ের ক্ষত নিরাময়ে মানস স্বাস্থ্যের ও মানসৈশ্বর্যের যেমন আবশ্যিকতা রয়েছে, তেমনি প্রয়োজন রয়েছে তাঁর মতো একজন বড় মাপের চিন্তাবিদের রোগ শয্যাকালীন বিবিধ ও বিচিত্র ভাবনা-চিন্তাসমূহ লিপিবদ্ধ রাখার। মনে হয়েছিল, যে কোনো কৌশলে তাঁকে একবার লেখায় নিমগ্ন করাতে পারলে তাঁর জীবনাকাঙ্ক্ষা বাড়বে, মৃত্যুভয় কাটবে, আরোগ্যলাভ ত্বরান্বিত হবে। এই বিবেচনায় তাঁকে জীবন-জগৎ ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পৃক্ত এক একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা উসকে দিয়ে, নিরাসক্তির ভান করে, কাগজ-কলম নিয়ে তৈরি থাকতাম। তিনি কখনো শোয়া অবস্থায়, কখনো বা বসে, মুখেমুখে বলে যেতেন আর আমি অতি দ্রুত তা লিখে নিতাম। পরে, ঐসব তাৎক্ষণিক ভাবনাপ্রসূত রচনাগুলো নিয়ে প্রথম যে ভিন্ন স্বাদের সংকলন-গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল সেটি তিনি, আমার সম্মতি নিয়েই, তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী পৌত্র অভীকে উৎসর্গ করেছিলেন।

আমার উপস্থিতি ও আচরণ তাঁকে দ্রুত সতেজ করছে অনুভব করে এবং মায়ের ইচ্ছে ও সম্মতিক্রমে আমার ভিসার মেয়াদ কিছুদিন বাড়িয়ে নিলাম। তবে চিকিৎসকের ও পরিবারের বাধা উপেক্ষা করেই মৌখিক নিবন্ধ রচনায় আমি তাঁকে স্বতঃপ্রণোদিত সাগ্রহে নিয়োজিত রেখেছিলাম। কারণ আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয়েছিল—লেখাই যে মানুষটির সারাজীবনের শ্রেষ্ঠতম বিনোদন এবং দায়বদ্ধতা পালনের প্রধান হাতিয়ার, তাঁর হাতে সেই অস্ত্রটিই ফের তুলে দেয়া গেলে তিনি সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় ও আনন্দে জীবনাসক্তি ফিরে পাবেন, সুস্থ হবার তাগিদ অনুভব করবেন নিজের ভেতর থেকেই। এ সূত্রে বলে রাখি, আমার এ-দাওয়াই ভালোই কাজে লেগেছিল। অবশ্য সে সময় তিনি আমাকে দিয়ে এমন কিছু কঠিন শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন যার গুরুভার আমাকে বইতে হবে আজীবন।

ড. শরীফের রচনার সচেতন পাঠক হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন, এ সময় থেকেই সূচিত হয় তাঁর ভিন্নধর্মী চিন্তা-ভাবনা, জন্ম নেয় নতুন স্বাদের প্রবন্ধ-নিবন্ধ। চারপাশের মাটিলগ্ন মানুষের চালচিত্র তাঁর রচনার বিষয়বস্তুরূপে জায়গা করে নেয়, তৈরি হতে থাকে সাধারণ মানুষের আরো কাছাকাছি যাবার সরণী। মাত্র ক'দিন আগেও যে মানুষটি

মৃত্যুচিন্তায় আচ্ছন্ন থাকতেন, তা ধীরে ধীরে অবসিত হতে থাকে, পরিবর্তে দেহে-মনে সতেজ হতে থাকেন উল্লেখযোগ্যভাবেই, আমার প্রতি তাঁর মানসনির্ভরতা আশাতিরিক্ত বাড়তে থাকে, বাড়ে জীবনাকাঙ্ক্ষা, কমে মৃত্যুভয়। এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, '...আমার হৃদরোগের বদৌলত আমার নতুন অনুভব-উপলব্ধি-অভিজ্ঞতা হল, আমায় নতুন করে বাঁচার প্রেরণা যোগালে তুমি। এ সত্য আমি অস্বীকার করিনে। মৃত্যুভয় কাটলো।... এখন আমার মন আনন্দাশ্রিত' (২৩.৫.৯১)। পিতা যদি হন একজন সৃজনশীল বা মননশীল ব্যক্তি তবে তাঁর শারীর ও মানস আরোগ্য কামনায় ও চেষ্টায় তাঁরই সমমনোভাবাপন্ন কন্যা যে এ সময়ে বহুমুখী ভূমিকা পালনেও পারদর্শী হয়ে উঠতে পারে এবং নিবেদিতপ্রাণ হতে পারেন-এ তথ্যটি তিনি প্রথম জানলেন 'অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতি'র মতো। তখন তিনি বলতেন : 'দেখো, আমার মানস স্বাস্থ্য এখন তুঙ্গে। তোমার মতো অনন্যসাধারণ কন্যা পেয়েছি আমি। এই নতুন আনন্দ এবং অনুভূতি আমার কর্মহীন জাগ্রত সময়ে মধুর উপলব্ধি এবং সুখ দেয়।'

আমি পিতা আহমদ শরীফকে, চিন্তাবিদ আহমদ শরীফ থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন করে ভাবিনি। তাই প্রচলিত প্রথায় পিতা-পুত্রীর চাওয়া-পাওয়া, দেয়া-নেয়ার সীমিত সম্পর্কের আবর্তের ন্যায় মামুলি গার্হস্থ্য বিষয়ে নিজেদের গণ্ডিবদ্ধ রাখতে চাইনি। আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম তাঁর মানস জগতের ফাঁকা অপূর্ণ স্থানটির পরিধি ও পরিমাণ। একজন স্রষ্টা বা শিল্পী জীবনবিধ্বংসী ব্যাধির সর্বাত্মক আক্রমণের পরেও হয়তো প্রাণশক্তি ফিরে পেতে পারেন যদি তাঁর মানসস্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি ঘটানো যায়। আমি বুঝেছিলাম, একজন পণ্ডিত গবেষকেরও রয়েছে সৃষ্টির স্বার্থে প্রেরণার প্রয়োজনীয়তা। তিনি যত বড় প্রতিভাধরই হোন না কেন, তাঁর সে প্রতিভার শৈল্পিক সযত্ন লালন ও পরিচর্যা দেয়া গেলে জীবনের পড়ন্ত বেলায়ও সৃষ্টির আনন্দে তাঁকে আপাতত সজীব-সচল-সতেজ রাখা সম্ভব। তাতে ব্যক্তিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েও লাভ হবে দেশের-দশের এবং সর্বোপরি গোটা বাঙালি জাতির। কোলকাতার, প্রয়াত বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, ১২.২.৯০ তারিখে লেখা এক চিঠিতে আমাকে জানালেন : 'তুমি বহুবিধ ব্যক্তিগত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও বিপদের সময় ড. শরীফের রোগশয্যা পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলে এবং তাঁর সেবা পরিচর্যা করেছ। এ তোমার স্নেহশীল উদার অন্তঃকরণের পরিচায়ক। মতিন ভাই তাঁর চিঠিতে সেই কথাই উল্লেখ করে তোমার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। শরীফ সাহেবও তোমার স্বতঃপ্রণোদিত ত্যাগপরায়ণতার দৃষ্টান্তে যথার্থ অভিভূত।' 'স্নেহশীল উদার অন্তঃকরণ' কিংবা 'ত্যাগপরায়ণতার দৃষ্টান্ত' বা 'ভূয়সী প্রশংসা' শব্দবাহী বিশেষণই বড় কথা নয়—বড় কথা হৃদয়ের গভীর আর্তি, অন্তরের টান। কন্যা অসুস্থ পিতার কাছে ছুটে আসবে সেটাই তো প্রকৃতির নিয়ম। নতুবা 'চারি বৎসরের কন্যাটির মতো' প্রকৃতি কেন দরজা আগলে দাঁড়িয়ে বলবে 'যেতে আমি দিব না তোমায়।' এ সময়ে, তাঁর সান্নিধ্য বেশি লাভের ফলে আমি অনুভব করছিলাম, স্নেহের একটা অন্তর্স্রোত সহস্রধারায় প্রবাহিত হচ্ছে তাঁর মনের গভীরে। তাঁর কন্যারূপে গৃহীত হবার পর, এই প্রথম আমি সচেতনভাবে উপলব্ধি করলাম—বিদ্যাসাগরের মত তাঁরও মনের গভীরে লুকিয়ে আছে একটি অতিকোমল মাতৃহৃদয়—যা স্নিগ্ধ, রসসিঞ্চক, মোলায়েম এবং অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো।

মননঋদ্ধ হার্দিক সম্পর্ক যে মলমের মতো কাজ দেয় এবং প্রাণের আরাম হয়ে ওঠে তার প্রমাণ মিললো হাতে হাতেই। কোলকাতায় ফিরে আসার প্রাক্কালে যে সঞ্জীবনী-কলম তাঁর হাতে আমি ধরিয়ে দিয়ে এসেছিলাম, সামান্য কয়েকদিন যেতে না যেতেই তার গতি হলো অপ্রতিরোধ্য, প্রতিদিন কমপক্ষে একটি নিবন্ধ লেখা তাঁর চাই-ই চাই। ইন্ধনরূপে শাসন-সোহাগ-হুকুম-হুমকি, ফরমায়েশ-ফরমান, অভিমান-অনুযোগ ইত্যাদি সব পেলেন মেয়ের পত্র মাধ্যমে কখনো বা সশরীর উপস্থিতিতে। একটি হিসেব কষে দেখা গেছে ১৯৯০ সনের নভেম্বর মাস বা হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, চল্লিশ বছরে, তাঁর প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও অন্যান্য সমস্ত 'মৌলিক রচনা'র মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় সাড়ে সাত শ'। আর ১৯৯০ এ হৃদরোগের পর অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে বাপ-বেটির সম্পর্ক সম্পূর্ণ সৌজন্যমুক্ত এবং 'দৃঢ়মূল' হওয়ার পর অন্তিম আট বছরে তিনি লিখেছেন এগার শ'রও কিছু বেশি প্রবন্ধ-নিবন্ধ। উপযুক্ত সন্তান, সে যদি হয় তত্ত্বে-তথ্যে ও জীবনাদর্শে সমমাত্রিক চিন্তার দোসর; আর পিতার প্রতি যদি থাকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ভালোবাসার নিষ্ঠা তাহলে পণ্ডিত পিতাকে দিয়ে যে অনেক কিছুই করিয়ে নেয়া সম্ভব-তার কিছু পরিচয় মিলবে তাঁর রচনার সংখ্যা ও চিন্তার বৈচিত্র্য দেখেই। এ ক্ষেত্রে আমি অলক্ষিত অনুঘটকের কাজ করেছি মাত্র। দৃষ্টিভঙ্গির নতুনত্বে ও বৈচিত্র্যে আমরা বাপবেটিতে মিলে সৃজনশীল এক আবহের প্রতিবেশ তৈরি করে নিতে পেরেছিলাম। এ ব্যাপারে আমাদের একটা গোপন চুক্তি ছিল, শর্তও-যা পার্থিব হয়েও প্রচলিত নীতি-নিয়ম, প্রথা-পদ্ধতি, অনুশাসন ও খণ্ড-ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে। আর সেই অনড়-অটল বিশ্বাসের ভিত-এ দাঁড়িয়ে তিনি আক্ষরিক অর্থেই অকৃত্রিম মর্মোত্থিত ধ্বনি আমৃত্যু জপমন্ত্রের মতো উচ্চারণ করেছেন, 'তুমি আছো মোর জীবন মরণ ঘিরে।'

হার্ট অ্যাটাক পরবর্তী দিনগুলিতে [ডিসেম্বর-জানুয়ারি, ১৯৯০-৯১] পর্যাপ্ত সময়-সুযোগ পেয়ে, সবার অলক্ষিতে তাঁর জীবনের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি গ্রহণের ব্যাপারে আমি জেদ ধরি। আমার নিজের মরণোত্তর চক্ষুসহ-দেহদানের সিদ্ধান্তের কথা তাঁকে জানিয়ে খানিকটা শাসনের সুরেই বলি : 'তোমার মতো একজন ইহজীবনবাদী-নাস্তিকের দেহ কবরে অপচিত হতে পারে না।' আলোচনার প্রথম পর্যায়ে তিনি ইসলামী সমাজ আবেষ্টনীতে দেহদানের প্রশ্নে উদ্ভূত জটিল সমস্যার আশঙ্কা প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত আমার ক্রমাগত জেদ-অভিমান ও আবদারের কাছে হার মানেন এবং 'চিকিৎস্যা বিজ্ঞানের কাজে মরণোত্তর দেহদানে সম্মত'—এই মর্মে একান্ত নিভৃতে (যেন দেয়ালেরও কান আছে শুনে ফেলার) তিনি আমায় দৃঢ় অঙ্গীকার করলেন—যা শ্রেষ্ঠ গোপন শপথেরই নামান্তর। ১৯৮৭ সনের জুলাই মাসের এক চিঠিতেও তিনি জানিয়েছিলেন : 'বাকি জীবনে ঘর থেকে কেবল 'গোরে' যওয়াই স্থির করেছি', (১৭.৮.৮৭)। তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর ডান হাতখানা কবর খুঁড়ে তুলে নেবার সাহস আমার আছে কি না—এমনতরো রসিকতাও করেছিলেন ডিসেম্বর, '৮৮তে। পারিবারিক এক অর্থসঙ্কটের সূত্রে ১৯৮৯ সনের এক পত্রেও 'বনানীতে দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার 'কবর' কেনার কারণে চল্লিশ হাজার এবং আনুষঙ্গিক ১০/১২ হাজার টাকার মজুত' রেখেছেন বলে জানিয়েছিলেন [১৩.৯.৮৯]। বুঝলাম সংশয় কাটেনি। অতএব এক পত্রের মাধ্যমে তাঁকে দেহদানের প্রস্তাবটি ভেবে দেখার জন্যে অনুরোধ করি, তখনও দ্বিধান্বিত জবাব তাঁর : 'আমি নাস্তিক, তবে আমার

দেহ হাসপাতালে যাবে, না গাঁয়ের বাড়িতে যাবে তা এখনও স্থির করিনি', [৬.১১.৮৯]। তারপরই হল হার্ট অ্যাটাক; এ সময়ে তিনি তাঁর অন্তরের গভীরের জমিটুকুই আমায় ছেড়ে দিলেন। আর এই সুবর্ণ সুযোগটিই তাঁর, দেহদানে অঙ্গীকারের সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছিল। তারপর ক্রমাগত কয়েক বছর গেল অঙ্গীকার বা সিদ্ধান্ত স্মরণ করিয়ে দিতে। অবশেষে অতীব সুকৌশলে ও সন্তর্পণে তৈরি 'অসিয়তনামা' [১৯.৫.৯৫] এবং পরবর্তী পর্যায়ে রচিত আইনসিদ্ধ 'অঙ্গীকারপত্রে'র [৩১.১২.৯৬] জেরক্স কপি অনতিবিলম্বে আমার হাতে তুলে দিয়ে তিনি আমায় আশ্বস্ত করেন। বিষয়টি আইনসিদ্ধ হবার ব্যাপারে নিঃশব্দে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল আহমদ শরীফের নীরব সহযোগী, তুলনাহীন সন্তান এ্যাডভোকেট জাহেদ করিম, স্বপন। 'প্রদীপ জ্বালবার আগে সল্‌তে পাকানো'র মতো সব বাহ্য ইতিহাসেরই নেপথ্যে থাকে দীর্ঘতর অন্তর্নিহিত ইতিহাস।

১৮ জানুয়ারি (১৯৯১) আমি কোলকাতায় ফিরে আসার পর, ১৯ জানুয়ারি তিনি চিঠিতে লিখলেন : 'ঘরের কোনো অংশের বাতি হঠাৎ নিভে গেলে যেমন অস্বস্তি লাগে, তোমার যাওয়ার পর তেমন এক শূন্যতা ও অভাব বোধ করছি।' এ মাসেই তাঁকে ভর্তি হতে হল ডায়াবেটিক হাসপাতালে ইনসুলিনের পরিমাপ নির্ধারণের প্রয়োজনে—দু'বেলা ইনসুলিনের সূচিকাঘাতে প্রথমে দু'হাত এবং ক্রমে দুই উরু ঝাঁঝরা হতে থাকে [১৫.১২.৯১ তারিখের দেয়া পরিসংখ্যানে ফোঁড়ের সংখ্যা ৭৫০টি], হৃদরোগের উপদ্রব শরীরে হামাগুড়ি দিয়ে স্থায়ী বাসা বানিয়ে ফেলে, এতকাল পেরিয়ে এ বছরেই তাঁকে দেয়া হয় 'একুশের পদক'; বিভিন্ন নিমন্ত্রণসূত্রে কোলকাতায় আসার জন্যে তাঁর উপরে চাপ পড়ে। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে বাইরে একগুঁয়ে অনড়, আর ভেতরের সত্তায় কন্যাহীন জীবনে কন্যাসন্তান পাওয়ার এক নতুন অনুভূতিতে আচ্ছন্ন তাঁর এক আনন্দঘন অনুভব। শেষমেষ যুক্তিতে আমার সঙ্গে পেরে না উঠে অন্তরের গভীরে লুকানো অভিমানের আসল উৎসটি জানিয়ে দেন, '১৯৭২-৭৩ সনে বাংলাদেশ সরকার এবং এদেশের শিল্পী লেখক আমাকে অবহেলা করেছে। কেউ আমাকে কোলকাতায় নেয়নি। কেউ কোলকাতা থেকে আমাকে আমন্ত্রণও করেনি। আমি আওয়ামী লীগার ছিলাম না বলে, স্পষ্টবাদী ও বামসমর্থক ছিলাম বলে। তাই অভিমান করে আত্মসম্মান রক্ষার খাতিরে কোলকাতা না যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করি। ... সামান্য সভায়-সম্মেলনে-সেমিনারে যাওয়ার গুরুত্ব আমার কাছে আজো নেই। তাই এ বিড়ম্বনা। তখন তুমি মেয়ে হওনি আমার। বাবা-মেয়ে হলে হয়তো তোমার টানেই তখন যেতাম' [৭.৫.৯১]। মাত্র জানুয়ারি মাসে, তাঁকে আপাতত সুস্থ করে ফিরেছি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও অদর্শন ও কন্যাবিচ্ছেদের হাহাকার নিরন্তর প্রকাশ পেতে থাকে তাঁর চিঠিপত্রে, যেমন-'তোমার আমার সম্পর্ক-সম্বন্ধ বাবা-মেয়ের। এটি স্থায়ী, দৃঢ় এবং জীবৎকালের। ... প্রিয়তর জনকে ঘন ঘন দেখার আকুতি থাকে। বিশেষ করে যদি রক্তসম্পর্কহীন কারো সঙ্গে আত্মীয়তা, ভালোবাসা, প্রিয়তা, সঙ্গসুখ, আলাপচারিতার মাধুর্যে আনন্দ থাকে তাহলে তাকে ঘন ঘন দেখার আকুতি অনেকগুণ বেশি হয়। তার মানস উপস্থিতি থাকে সার্বক্ষণিক এবং অম্লান ও সুখকর' [৮.৩.৯১]। 'দেখার আকুতি'র এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, জীবনকে-জীবনের গভীরতাকে চিনতে শেখায় আমাকে; বিদ্যাসাগরের

প্রভাবতী সম্ভাষণের কথা বার বার মনে করিয়ে দেয়। পুজোর ছুটি কাটিয়ে ফিরে আসার পর একমাস না কাটতেই কন্যার উপস্থিতির বাস্তব প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—বিশেষত পিতা এবং আত্মজা উভয়েই যদি হন শিল্পের কুশীলব : 'সৃষ্টিশীলতার জন্যে আগুন আবশ্যিক ও জরুরি, কিন্তু চাইলেই তো মিলবে না; তোমার মতো কন্যারও ঘন ঘন সাক্ষাৎ মিললে সাহিত্য-দর্শনের আলোচনায় সময় কাটতে পারতো, যেমন এবার কেটেছে' [৩.১২.৯১]। এভাবেই শিল্প-সংস্কৃতি ভাবনার ও পারস্পরিক সহযোগিতার এক নির্মল মানস-প্রতিবেশে পিতা-পুত্রীয় সম্পর্ক ক্রমশ পল্লবিত হতে হতে বিশাল মহীরুহে রূপ নেয়।

অভাবিত মাত্রাতিরিক্ত সহনশীলতা ছিল ব্যক্তি আহমদ শরীফের অতি দুর্লভ এক গুণ। ক্ষেত্রবিশেষ, দুঃসহ কঠিন কষ্ট ও যন্ত্রণাকে নির্লিপ্তভঙ্গিতে নীরবে বুকে ধারণ করবার—সহ্য করবার ক্ষমতা, আমার এতখানি বয়সে আমি এর আগে আর কারো মধ্যে দেখিনি। অন্যধারে অসামান্য ছিল তাঁর কৃতজ্ঞতা ও সৌজন্য বোধ। কেউ তাঁর জন্যে সামান্য কিছু করলেও তার প্রতি সকৃতজ্ঞ-স্বীকৃতি জ্ঞাপনে কার্পণ্য করেননি কখনো। যে কেউ তাঁকে চিঠি লিখলেই, তার ব্যক্তিত্বে কিংবা বক্তব্যে গুরুত্ব না থাকলেও তিনি সৌজন্যবশে সে সব এবং সকলের চিঠির জবাব দিতেন, স্বহস্তে—স্বহস্তাক্ষরের ব্যতিক্রম ঘটেছিল কেবল হৃদরোগের সময়। তেমনি কেউ কোনো বই পাঠালে—তা হালকা চটুল কিংবা সাহিত্যগুণঋদ্ধ না হলেও তাতে দাগ কেটে তাঁর মত-মন্তব্য লিখে রাখতেন এবং অনেক সময় পত্রযোগে তা জানিয়েও দিতেন। অনুরূপভাবে, চাক্ষুষপরিচয়হীন ব্যক্তির লেখাও, উৎকৃষ্ট মনে হলে তা নির্দ্বিধায় লিখে জানাতেন তিনি। সদাজাগ্রত এই শুভবোধ থেকেই তিনি পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং বিধানসভার অধ্যক্ষ হাশিম আবদুল হালিমকে টেলিগ্রাফ পাঠিয়ে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন কোলকাতার বিভিন্ন থানা ও অফিস চত্বরে মন্দির বা অনুরূপ কিছু প্রতিষ্ঠার সরকারি বিরোধিতার সংবাদ জেনে। আত্মকেন্দ্রিকতার যুগে, এ ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের আর এক অভিনব দিক।

১৯৯২ সনের জানুয়ারিতে *বাঙলা, বাঙালি ও বাঙালিত্ব* শিরোনামে প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠার, তাঁর একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় কোলকাতার 'সাহিত্যলোক' থেকে। বাঙলা, বাঙালি ও বাঙালিসত্তার বিভিন্ন বিষয়-সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহ তাঁর সমস্ত গ্রন্থ চষে, বাছাই করে এবং তার টীকা-ভাষ্য-বিন্যাস-সম্পাদনা, পরিচায়িকা, প্রুফপাঠ, দৌড়-ঝাঁপ ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে পুরো কাজটিই আমার দায়িত্বে এবং ইচ্ছেতেই সম্পাদিত হয়। বিষয়টি তিনি জানান পর থেকেই একাধিক চিঠিতে অনুরোধ জানিয়ে লেখেন, *বাঙলা বাঙালি ও বাঙালিত্ব* বইয়ে তোমার নাম সংকলন-সম্পাদক হিসেবে অবশ্যই যুক্ত করবে। এ আমার অনুরোধ নয় কেবল, আদেশ। ... বইটি তো প্রকৃত অর্থে তোমারই। ... এটি তোমার-আমার সম্পর্ক সম্বন্ধের স্থায়ী স্মারক হিসেবে চিহ্নিত থাকবে। ... যা অন্য কোন অভিজ্ঞানের চেয়ে দামী' [১৩.১.৯২]। কিন্তু আমি এই একটি ব্যাপারে তাঁর প্রবল আগ্রহ ও অনুরোধ উপেক্ষা করে, সম্পাদকবিহীনভাবে সরাসরি তাঁর নামেই বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা করি। নিজের একটু ক্ষতি স্বীকারের মাধ্যমে কোলকাতার জনসমক্ষে তাঁকে লেখক-গবেষক হিসেবে উপস্থিত করতে পারার এই প্রথম দুর্লভ সুযোগের সদ্ব্যবহার করাকে, আহমদ শরীফের মেয়ে হিসেবে আমি আমার

দায়িত্ব বলে মনে করেছিলাম। পূর্ববর্তী ঘটনার অভিজ্ঞতায়, বলাবাহুল্য, তিনি নিজেই কবুল করেছেন : 'অবশ্য আমার জন্যে ক্ষতি স্বীকারের শক্তি যে তোমার অতুল্য তা আমার চেয়ে বেশি আর কে জানে', [১৬.১.৯১]।

এরই পাশাপাশি, ১২ জানুয়ারি রবিবার *দৈনিক বসুমতী*তে তাঁর মার্কসীয় চিন্তা-ভাবনা সম্পৃক্ত রচনা থেকে তথ্য ও বক্তব্য নিয়ে 'বিশ্বজুড়ে চলবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন' শিরোনামের সাক্ষাৎকারধর্মী নিবন্ধ তৈরি করে এবং সেই সঙ্গে তাঁর ছবি ও পরিচিতি জুড়ে দিয়ে প্রকাশিত করাই। এর পরের মাসেই, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২, রবিবার সাক্ষাৎকার ও বিভিন্ন রচনা থেকে গুছিয়ে নিয়ে 'একুশে ফেব্রুয়ারি : প্রতিবাদের অঙ্গীকার' শিরোনামের নিবন্ধটিও প্রকাশের ব্যবস্থা করি দৈনিক বসুমতীতে। পুরো অর্ধপৃষ্ঠা জুড়ে দৈনিক কাগজে মাসান্তরে লেখা দু'টি প্রকাশিত হবার ফলে এপারের লেখক ও পাঠককুলে বিশেষত বামপন্থীদের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যায়। [অবশ্য পরবর্তীকালেও *কবিতীর্থ, লেখক সমাবেশ, বাতায়নিকের পত্র, আবর্ত* প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁকে নিয়ে দীর্ঘ সাক্ষাৎকারধর্মী রচনা এবং প্রবন্ধ লিখেছি আমি এবং তিনি জীবদ্দশাতে এর অধিকাংশই তাঁর গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করে রেখে গেছেন।]

একজন চিন্তাবিদ ও মননশীল পিতার প্রতি কন্যার যে দায়, আমি আমার সীমিত সামর্থ্যানুযায়ী তার সামান্য অংশ পালন করবার চেষ্টা করেছি মাত্র। কিন্তু আমার এসব আচরণে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নির্মল কৃতজ্ঞতা বোধ। তিনি কৃতজ্ঞতা ও মুগ্ধতা প্রকাশ করে ফেব্রুয়ারির ('৯২) একাধিক চিঠিতে তা পরিত্যক্ত করেছেন, যেমন : *বসুমতী*তে আমাকে পরিচিত করানোর প্রয়াস-প্রসূন আমার সাক্ষাৎকার পড়ে তোমাদের দু'জনের ধৈর্য, অধ্যবসায় আর সময় ও শ্রম ব্যয়...আমাকে একাধারে মুগ্ধ, কৃতজ্ঞ এবং সংকুচিত ও লজ্জিত করেছে, কেননা আমি এই সম্মানের যোগ্য নই। লোকে বলবে তুমি কন্যাকৃত্য করেছ, একটা অজ্ঞাত সাধারণ লেখককে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে ঢোল করে। যা হোক চিত্ত-মণ্ডল ও তুমি অনেক খেটেছ, প্রাণের টান না থাকলে একাজ তোমাদের পক্ষে সম্ভব হত? তোমাদের অশেষ অনুরাগ আমাকে মুগ্ধ ও অভিভূত করেছে;' [৭.২.৯২]। *বাঙলা, বাঙালি ও বাঙালিত্ব* গ্রন্থে আমার লেখা ভূমিকা বা পরিচায়িকাটি পড়ে লিখেছেন: 'তুমি অভাবিতভাবে অসাধারণ একটা উঁচু মানের ভূমিকা লিখেছ। ভাষায়-বিন্যাসে-শৈলীতে চমৎকার হয়েছে আমাকে—এমন পরিচ্ছন্ন ও প্রাঞ্জলভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছ যে আমি নিজেই বিস্মিত ও মুগ্ধ।... আমি এমনই সব মত-মন্তব্য-সিদ্ধান্তের যোগ্য হয়ে উঠিনি' [১৪.২.৯২]। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক আবদুল মতিন খান সাহেবের মুগ্ধ মন্তব্যের কথাও উল্লেখ করেছেন। এমনই এক নির্মল শিশুর সারল্যে তৈরি ছিল তাঁর মন-মনন-মানসিকতা-সৌজন্যবোধ ও শিষ্টাচার। অহংকারের বিপরীত মেরু থেকে উচ্চারিত তাঁর এই ভাষা আমাদের সহবৎ শেখায়, অহংবোধকে লজ্জা দেয়।

বাঙলা, বাঙালি ও বাঙালিত্ব যে আহমদ শরীফের সাম্প্রতিকতম রচনা নয়—এটি একটি সংকলিত গ্রন্থ মাত্র, তা পশ্চিমবঙ্গের পাঠককে ঐ মুহূর্তেই অবহিত হতে না দেবার দুরভিপ্রায়ে আমি গ্রন্থের সূচিপত্রে বিন্যস্ত বিষয়গুলির উৎসস্থল ও রচনাকালের উল্লেখ না করে এবং কালানুক্রমিকভাবে না সাজিয়ে বিষয়-পারম্পর্যে গুরুত্ব দিয়ে সাজিয়েছিলাম। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অন্ধ-রবীন্দ্রভক্ত ড. অরবিন্দ পোদ্দার,

নির্মোহ রবীন্দ্র বিশ্লেষক ড. আহমদ শরীফকে আক্রমণ বাঞ্ছায় ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২ সনে *আনন্দবাজার পত্রিকায়* 'পুস্তক পর্যালোচনা'র সূত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে একটি বিভ্রান্তিকর ও নেতিবাচক নিবন্ধ রচনা করেন। তাঁর এই বিদ্বিষ্ট মানসিকতার প্রকাশ পুনর্বার ঘটতে দেখা যায় ১৯৯৩ সনে রবীন্দ্রভারতী কর্তৃক 'রবীন্দ্র বিদ্বেষী' আহমদ শরীফকে সাম্মানিক ডি.লিট. প্রদানের খবরে *আনন্দবাজারে* তাঁর সখেদ-উচ্চারণের মাধ্যমেও।

আমাদের ইচ্ছে ছিল পুস্তক 'পর্যালোচনা'টির প্রতিবাদে একটি যথার্থ পর্যালোচনাধর্মী চিঠি আহমদ শরীফের কলম থেকে বেরিয়ে আসুক। সে-অভিপ্রায় জানিয়ে তাঁকে পেপার কাটিং পাঠালে তিনি প্রতিবাদে নিস্পৃহ থেকে কেবল আমাকে একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে ড. পোদ্দার সম্পর্কে লিখলেন : 'ডক্টর পোদ্দার আমার ইদানীংকালের লেখা দেখেননি, তাছাড়া তিনি রবীন্দ্রভক্ত। তাই বিষ উদ্গারের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের, কয়েক বছরের মধ্যেই অন্ধ ভক্ত সংখ্যা মরে মরে কমবে, সমালোচক ও নিন্দুকের সংখ্যা নিশ্চিতই বাড়বে। আমার এই প্রত্যয়ী উক্তি মনে রেখো। তিনি যে অংশ উদ্ধৃত করেছেন 'হিন্দু হিন্দু হয়েছিল, মুসলিম হয়েছিল বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বে আস্থাশীল'-তা তো উনিশ শতকের কথা। তিনিই কি দৃষ্টান্ত দিতে পারবেন কম্যুনিষ্টরা ব্যতীত অন্য কেউ [ব্যতিক্রম এক্ষেত্রে আলোচনা নয়] কেবল মানুষ নিয়ে মানুষের জন্যে সাহিত্য রচনা করেছেন, গীতিকবিতা ব্যতীত? রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রে কি এর ব্যতিক্রম মেলে? এবং নজরুল এক্ষেত্রে অনন্য। তাছাড়া আমি যে সেক্যুলারিজমের জন্যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দিবারাত্র সংগ্রাম করছি সে খবর তো তাঁর জানা নেই। পুরনো প্রবন্ধ সংকলনের কুফল এ-ই। কেননা চিন্তা-চেতনা তো দেশ-কাল-সমাজ পাত্রগত', [১৫.১২.৯২]। ব্যাস এটুকুই, এর চেয়ে একটাও বাড়তি কথা নয়, বিষোদ্গার নয়। যেন যুক্তির অস্ত্র দিয়ে প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করা। এই হচ্ছেন আহমদ শরীফ, যাঁর আচরণ স্বব্যক্তিত্বেরই সমধর্মী। আগেই বলেছি সংকলনটি তৈরি হয়েছিল সম্পূর্ণত আমার মর্জিমাফিক। বিষয়টি পাঠকের অজ্ঞাত বলেই আক্রমণের কোপ আহমদ শরীফের উপরে পড়েছে-পড়ছে এবং পড়বে। সম্পাদক-সংকলকের উল্লেখ থাকলে এ-ভ্রান্তি সৃষ্টির সুযোগ থাকতো না। যে গালি আমার প্রাপ্য তা খেতে হত না এই সহনশীল মানুষটিকে।

অবশ্য বিতর্ক উসকে দেয়াতেই ছিল তাঁর আনন্দ, তারপর সন্ন্যাসীর নিরাসক্তি নিয়ে চোখ মুদে থাকা; সমালোচকরাই টেনে নিয়ে যাবে সে বিতর্ক, জড়িয়ে পড়ুক না গোটা সমাজ। তাঁর শুধু শীতল সহিষ্ণুতা নিয়ে নির্লিপ্ত উপেক্ষা। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যখন বিতর্কের ঝড় তুঙ্গে ওপারে-এপারে-রবীন্দ্রভক্ত অতিবৃদ্ধ গোপালচন্দ্র রায় পর্যন্ত আহমদ শরীফের প্রতি সশ্রদ্ধ-বিরোধিতা প্রকাশ করে লিখে ফেললেন প্রায় আস্ত একখানি গ্রন্থ, পুরসভার পত্রিকা *পুরশ্রী*তে কলম ধরলেন শ্রীনারায়ণ চৌধুরী—তখন বলতে গেলে তাঁকে দিয়ে এরকম জোর করেই একটি জবাব লেখানো হয়েছিল, যা *লেখক সমাবেশ*-এ ছাপা হয়। তাঁর নিজের রচনা সম্পর্কেও দেখেছি এই উদাসীনতা। কোন লেখা শেষ করার পর তা সংশোধনের জন্যে চোখ বোলানো কিংবা মুদ্রিত হবার পর দ্বিতীয় বার পাঠ করার ধৈর্য অথবা আসক্তি ছিল না তাঁর। আর তাঁর লেখার প্রশংসা করলে প্রখ্যাত সমালোচক-গবেষক গোপাল হালদারের মতো কুণ্ঠিত হতেও দেখেছি তাঁকে।

এ বছরের প্রথম দিক থেকেই তাঁর কোলকাতায় আসার স্বপ্ন-সাধ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পেতে থাকে একাধিক চিঠিতে, চিকিৎসার প্রয়োজনকে আশ্রয় করে। কিন্তু ততদিনে ঢাকা শহর জুড়ে শুরু হয়ে গেছে গোলাম আজমকে কেন্দ্র করে গণবিক্ষোভ এবং তারই জেরে গঠিত হল আহমদ শরীফসহ বাইশ জন সদস্যকে নিয়ে বিচারক মণ্ডলী ও গণআদালত, আর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আহূত গণ আদালত (২৬ মার্চ, '৯২) থেকে উচ্চারিত হল গোলাম আজমের যে মৃত্যুদণ্ডাদেশ, তার অন্যতম বিচারক হওয়ার অপরাধে আহমদ শরীফও হলেন অন্য বিচারকদের মতোই অবাঞ্ছিত কিছু অলীক অপরাধে অভিযুক্ত সরকারী মামলার আসামী। তারপর ঘরে বাইরে পরিবেশ-পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে ও জটিল হতে শুরু করায়, স্বভাবতই তাঁর কোলকাতায় এসে চিকিৎসার বাসনা প্রকাশের পথ হল রুদ্ধ। এদিকে আমার পাসপোর্টের আয়ু শেষ হওয়ার মুখে, অতএব আমাকেই দুরু দুরু বক্ষে এপ্রিল মাসে কলেজ থেকে পনের দিনের ছুটি নিয়ে [৮-২২এপ্রিল] ছুটে আসতে হলো ঢাকায়, কারণ ১৭.৩.৯২ তারিখের চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন : 'তুমি আগামী মাসে আসবে তো? কারণ বয়সের ভরসা কি! আজ সকালেও মৃদু ব্যথা অনুভূত হয়েছিল বুকে...।' কিন্তু ২২ এপ্রিল আমাকে বিমানবন্দরে বিদায় জানিয়ে ঘরে ফিরে গিয়ে ঐদিনই আবার সেই কাতরোক্তি প্রকাশ করলেন চিঠিতে, ভিন্ন সুরে : '... যে বিদায় নিয়ে যায় সে পথের শোভা দেখে... সুখ পেতে পেতে যায়। যে বিদায় দেয় সে শূন্য ঘরে বেদনাসিক্ত মন নিয়ে ফেরে, শূন্যতায় আচ্ছন্ন হয়ে মিইয়ে পড়ে',... 'ইচ্ছা করে এ বুক চিরিয়া যেথায় পরাণ সেখানে তোমারে থোব' [২৫/৪]-হৃদরোগে পর্যুদস্ত একাত্তরোর্ধ এই অবোধ শিশু সন্তানটিকে কিভাবে আমি এর জবাব দেব। স্নেহের শেকলে বাঁধা এ আমার এক অপ্রতিরোধ্য যন্ত্রণা।

মূলত দু'টি কারণে '৯২ সনটি, ঐতিহাসিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ হলেও, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনাচরণ ক্ষেত্রে জটিলতর হয়ে উঠেছিল, তাঁর লেখকসত্তার বাইরেও প্রকাশ্য ময়দানে ও সভাগৃহে যথাক্রমে গণদাবি পূরণে অংশগ্রহণ (২৬ মার্চ) এবং যুক্তি ও বিজ্ঞানের আলোকে বৈশ্বিক মানবতার জাগরণার্থে মনুষ্যত্ব ও সর্বমানবিক সত্তার অগ্রাধিকার প্রদানের ন্যায় দুঃসাহসী বলিষ্ঠ উচ্চারণের (২১ অক্টোবর) খেসারত দিতে গিয়ে—একটি গণআদালত (২৬ মার্চ), অপরটি জাদুঘর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সেমিনার (২১ অক্টোবর)। প্রথম দিকটায় গণআদালতিদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার ভার নিতান্ত লঘু মনে হলেও, প্রতিপক্ষ যেহেতু সরকার স্বয়ং কাজেই তার প্রভাবে, সুখ-শান্তি, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীন জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হতে বাধ্য। কয়েকটি চিঠিতেই তাঁর বিরুদ্ধে সরকারী মামলার কথা এবং দেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিষয়ে জানিয়েছেন তিনি, সংযত উচ্চারণে। মে মাসের এক চিঠিতে বলেছেন : 'আমরা গণ আদালতের উত্তেজনায় দিন কাটাচ্ছি' [২.৫.৯২], কিংবা 'আমাদের এখানকার আর্থিক রাজনীতিক অবস্থা মন্দের দিকে। এখানেও চরিত্রবান আদর্শনিষ্ঠ মনুষ্যত্বসম্পন্ন ব্যক্তি দু'চারজন মেলে। কিন্তু বুর্জোয়া মানবতার মহত্ত্বের বিস্ময়কর চমক চিরকালই ছিল, তাতে মন ভোলে, হৃদয় গলে, প্রাণ জুড়ায়, কিন্তু মানুষের উপর পীড়ন-শোষণ-নির্যাতন ঘোচে না, ঘোচেনি অতীতে, ঘুচবে না ভবিষ্যতেও [১২.৫.৯২]। —এভাবেই তিনি সমকালকে কাটা-ছেঁড়া করে দেখেছেন প্রতিনিয়ত, দৈনন্দিন কাজ, লেখালিখি চালিয়ে যাচ্ছেন যথানিয়মে, আর

তারই পাশাপাশি মাতা-পরিত্যক্ত শিশুর মত অদ্ভুতভাবে দিন গুনছেন : 'এখন জুন মাস চলছে, আর তিন মাস পরে তোমার আসার কথা' [১৫.৬.৯২]।

১৪ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে পাঠানো তাঁর হুকুম মেনে ৪ অক্টোবর পুজোর ছুটিতে আবার ঢাকায় গেলাম স্বপন-নাসিমের বিবাহ-বার্ষিকী, পান্থ'র আকিকা—এ দুটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দেবার উপলক্ষে, লিখলেন : আমার ঘরে, আমার পরিবারে রয়েছে তোমার স্থায়ী আসন, অধিকার ও দাবি। তুমি আমাদের পরিবারের অপরিহার্য সদস্যা'। আমাকে ছাড়া তাঁদের আনন্দ-অনুষ্ঠান নাকি পূর্ণতা পাবে না। আমার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যও একটা ছিল। আমি চেয়েছিলাম আহমদ শরীফ যেন বিশ্ববিদ্যালয়গত প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলায়, উচ্চতর গবেষণা (ডি.লিট.) ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রি প্রাপ্তির বিষয়বস্তুরূপে নির্বাচিত হবার মর্যাদা পান এবং তার পরিণতি যেন সজ্ঞানে-স্বচক্ষে দেখে মরতে পারেন—একজন কীর্তিমান শিক্ষক ও গবেষকের, জীবদ্দশায়, এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কিছু হতে পারে না। প্রথমত যিনি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক এবং 'আমার চেতনার দ্বিতীয় জনক'-তাঁর উদ্দেশে এই বিরল সম্মানটি নিবেদনের যথাসাধ্য চেষ্টা তো আমাকে করতেই হবে। সুতরাং গবেষণার কাজে সরাসরি তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনেও আমাকে ঢাকার দিকে ঘন ঘন পা বাড়াতে হয়েছে।

বহু কাঠ খড় পোড়ানোর পরেও ডি.লিট.-এর মতো উচ্চতর গবেষণার বিষয়বস্তুরূপে সরাসরি আহমদ শরীফের নামে অভিসন্দর্ভ জমা দেয়ার অবশ্যম্ভাবী সংকট এড়াতে আমি তৎকালীন উপাচার্য ড. পবিত্র সরকারের সহযোগিতামূলক রণকৌশল মেনে নিয়ে, তাঁরই নির্বাচিত *আত্মপরিচয়ের আবর্তে বাঙালি মুসলমান* শীর্ষক অভিসন্দর্ভ-নাম রেজিস্ট্রেশন মাধ্যমে গবেষণার অনুমতি পেলাম রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। আমার এই অভিসন্দর্ভে বাঙালির আত্মপরিচয়ে আহমদ শরীফের নিরলস অনুসন্ধানের ইতিবৃত্তই নির্মাণ করা হয়েছে।

২১ অক্টোবর ঢাকার জাদুঘর শিশু মিলনায়তনে আহমদ শরীফ প্রতিষ্ঠিত 'স্বদেশ চিন্তা সংঘ' আয়োজন করলো এক সেমিনারের; বিষয় : 'আমাদের সংস্কৃতির উপর সাম্প্রতিক হামলা'; মূল প্রবন্ধপাঠক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, বক্তা বদরউদ্দীন উমর, কাজী নুরুজ্জামান, হায়দার আকবার খান রনো প্রমুখ, সভাপতি আহমদ শরীফ। সেমিনার আয়োজনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই আমার চোখের সামনে ঘটেছে। সভাপতির দীর্ঘ ভাষণে সেদিন ধর্ম, ধর্মাচরণ, ধর্মীয় ভাষার অনাবশ্যকতা, মানবাধিকার, সুস্থ সংস্কৃতি, সর্বমানবিকতা, মনুষ্যত্বের বিকাশ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক শরীফ মূলত 'সবার উপরে মানুষ সত্যে'র জয়গানই গেয়েছিলেন।' বক্তব্যটিকে বিস্তৃত করতে গিয়ে তিনি বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, আবিষ্কার উদ্ভাবনে মানুষের অমিত শক্তি ও সম্ভাবনার কথা বলেছেন, বলেছেন শাস্ত্র-ধর্মের আড়ষ্টতা কাটিয়ে মানুষকে যুক্তি ও বুদ্ধিনির্ভর ও বিজ্ঞানমনস্ক হতে, তত্ত্ব-তথ্য যোগে দেখিয়েছেন ধর্মের গোড়ার কথা ও বিবর্তনের ইতিহাস এবং সর্বোপরি-নৈতিকতা, শ্রেয়োবোধ, মনুষ্যত্বের বিকাশ ও বৈশ্বিক তথা নির্বিশেষ মানব কল্যাণ বাঞ্ছায় তাঁর আকুল আর্তি যেন ঝরে পড়ছিল বক্তব্যের খাঁজে খাঁজে। তাঁর এই ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে পরদিন সকাল থেকে, গোলাম আজম অনুসারী মৌলবাদীদের মুখপত্র *দৈনিক ইনকিলাব*

[পরে আরো কাগজ]-এর অপচেষ্টায়, ভাষণের পূর্বাপর সম্পর্কবিচ্ছিন্ন প্রক্ষিপ্ত বাক্যাংশ সংবাদপত্রে পরিবেশনের ফলে যা ঘটতে শুরু করলো তা সকলেই জানেন; আধুনিক সভ্য সমাজে সে এক করুণ মর্মভেদী দীর্ঘ ইতিহাস। গোটা দেশ জুড়ে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি, 'মুরতাদ' ঘোষণা ও ফাঁসির দাবি, বিরাট ধর্মীয় জনসভা, মিছিল, অনেকগুলো মামলা (১৮টি), বাড়িতে বোমা নিক্ষেপ ... কি নয়। বয়সের ভারে জীর্ণ একটি মনুষ্য শরীরকে মানসিকভাবে যতটা নির্যাতন করার সামর্থ্য ওদের ছিল তার কিছুই বাদ গেল না। অথচ সেই মানুষটিরই দান করা চোখ দিয়ে মৌলবাদীদেরও একজন আজ পৃথিবীর আলো দেখছেন। সেদিন যে ব্যাপারটিতে আমার খুব অবাক লেগেছিল তা হল, সংবাদ মাধ্যমগুলি তাঁর বক্তৃতার মূলবক্তব্য নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামালো না; বয়সের ভারে অগোছালোভাবে কোন্ অপ্রীতিকর কথাটি তাঁর মুখে উচ্চারিত হল সেটাই সংবাদের একমাত্র বিষয়বস্তু হয়ে গেল। আর, অন্য কিছু কাগজ, তাকেই অন্ধ অনুকরণে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। হায়রে সংবাদপত্রের অবাধ স্বাধীনতা!

মৌলবাদীদের সৃষ্ট এহেন দুর্বার ধর্মীয় আন্দোলন তাঁর উৎকণ্ঠা বাড়ালেও প্রথম দিকে তিনি বিচলিত ছিলেন না তেমন একটা। তারই মধ্যে গবেষণার গুরু গম্ভীর বিষয়ে পাঠ নিচ্ছিলাম আমি, অবাক বিস্ময়ে ভাবতাম, এত কথা-স্মৃতিনির্ভর এত অজস্র তথ্য কি করে যোগাতে পারেন তিনি। কি করে এই বয়সেও মস্তিষ্ক এতটা কাজ করে এ যেন এক জীবন্ত এনসাইক্লোপেডিয়া, বিপন্ন সেই সময়েও, বাঙালি মুসলমানের অস্তিত্ব এবং আত্মপরিচয় সন্ধানে খুটিনাটি তথ্য পর্যালোচনা করে যাচ্ছেন। বাইরের আঁচ যেন স্পর্শও করছে না তাঁকে। বাপ বেটি মিলে ঘটনার শরীর চিরে চিরে, পুরনো নথি ঘেঁটে অনর্গল-অকপট বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে গেছি। তারপর ১ নভেম্বর ফিরে এসেছি কোলকাতায়। অতিক্রান্ত ঐ সময়ের আনন্দ-নিরানন্দের এক বেদনামধুর স্মৃতি ধরে রেখেছেন তিনি ৫ ডিসেম্বরে লেখা চিঠিতে : কলাম লিখি। তবে মনে আনন্দ ধরে রাখতে পারি না আগের মত। স্বস্তি যে বিঘ্নিত হয়। প্রবল ঝড়ের সময় যখন পত্রিকা খুললেই 'মুরতাদ' বয়ান মিলতো, সে সময়েও তুমি কাছে ছিলে বলে কোন শঙ্কা-ক্ষোভই মনের স্বস্তি-আনন্দ-সুখ নষ্ট করতে পারেনি, কিংবা তুমি কাছে থাকলে আমি মুখে মুখে বলতে পারতাম, আর তুমি লিখে স্বল্প সময়েই আমার প্রবন্ধ দাঁড় করিয়ে দিতে পারতে' [১৫.১২.৯২]।

তিনি দীর্ঘদিনের চেষ্টায়-নিষ্ঠায় ও নিরীক্ষায় গড়ে তুলেছিলেন তাঁর গদ্যে অননুকরণীয় এক ভাষাশৈলী। তিনি ব্যবহার করতেন বহু অপ্রচলিত শব্দ, কিংবা প্রত্যয়যোগে তৈরি করতেন নতুন শব্দরাজি, কখনো বা শব্দের বহুল প্রচলিত অপপ্রয়োগ বদলে দিয়ে ব্যবহার করতেন যথার্থ শব্দটি [যেমন ইতিপূর্বে>ইতোপূর্বে, অধঃপতন>পতন]। প্রতিটি শব্দ প্রয়োগ করতেন বক্তব্যের ওজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে-হিসেব করে, যেন অংক কষে। অসাধারণ ছিল তাঁর শব্দপ্রীতি, তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন শব্দের পরিবর্তন ঘটানো যেত না সহজ-কোনো লেখকেরই অবশ্য যায় না, যাওয়া উচিতও নয়। তাঁর লেখার অসচেতন ও সাধারণমানের পাঠকের অবশ্য মনে হতেও পারে যে তিনি একই বিশেষণার্থক শব্দ অকারণে সর্বত্র বার বার ব্যবহার করেন। কিছু কিছু শব্দের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেবার কারণও তিনি আমায় ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন।

কোনো লেখা শেষ করে দ্বিতীয় বার চোখ বুলিয়ে নেবার অনীহায় এবং ভাষার ব্যতিক্রমিতার কারণে ঐ লেখা ছাপাখানায় গিয়ে মুদ্রিত আকারে তাঁর বইয়ে কিংবা পত্র পত্রিকায় যখন বেরুতো তখন দেখা যেত, মাঝে মধ্যেই অর্থহীনভাবে বদলে গেছে কিছু শব্দ, ফলে বাক্যে একটু আধটু অর্থ-বিভ্রান্তিও দেখা দিয়েছে যথার্থ প্রুফ দেখার অভাবে, (পত্রিকার লেখায় এ ঘটনা বেশি দৃষ্ট হয়েছে)। কাজলভাবী মাঝে মাঝে বলেছেন, 'দিদি, তুমি মিছেই কষ্ট পাচ্ছো, বাবার লেখার ভুল খুঁজে বের করে পড়ার মতো পাঠক এদেশে খুব কমই আছে।' এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে গেলেই তাঁর সার্বক্ষণিক সহযোগী (এ্যাসিসট্যান্ট) হতে না পারার অক্ষমতায় তিরস্কৃত হয়েছি। তবে যেহেতু আমি তাঁর শব্দের এ্যানাটমি বুঝতাম, সে কারণে এবং হয়তো বা স্নেহের কাছে পরাভূত হয়েই তাঁর লেখায় কলম ধরার একমাত্র অধিকার দিয়েছিলেন আমাকে। এ ব্যাপারে লেখা তাঁর কয়েকটি চিঠি এখন আমার কাছে এক অনন্য দলিল; যেমন, 'আমার লেখার ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের অধিকার, অনুমতি ও দায়িত্ব রইল তোমার ও চিত্ত মণ্ডলের। আমি তো বলেইছি বার্ধক্যের জরা জীর্ণতা আমাকে পেয়ে বসেছে, জেনে-বুঝে ও আবার দেখে-পড়ে শুদ্ধ করবার ধৈর্যও আমি হারিয়ে ফেলেছি। কাজেই কন্যা হিসেবে আমাকে, আমার ত্রুটিকে অন্যের উপহাস, অবজ্ঞা ও নিন্দা থেকে আড়াল করার দায়িত্ব তো তোমারই' [১৯.৭.৯২]। কারণ তিনি অন্তর দিয়ে বুঝেছিলেন, তাঁর লেখা, আমার কাছে, তাঁর মতোই সমান গুরুত্ব পাবে। তাই কন্যার কাছে এ এক নির্বিরোধ নির্মোহ আত্মসমর্পণ। একেই কি বলা যায় সন্তানের কাছে হেরেও সুখ!

সব মিলিয়ে তাঁর '৯২ সনটি বহুবর্ণে রঞ্জিত, বহু ঘটনার সমাহারে উজ্জ্বল-বন্ধুর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ, যার সবটাই পত্র মাধ্যমে জানিয়েছেন কথকতার ভঙ্গিতে। যেমন : ১. একুশের পদক ফৈজীর নিয়ে আসার কারণ দর্শানো থেকে শুরু করে ২. জন্মদিন অনুষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ বয়ান, ৩. কবি মতিয়ুর রহমান স্মারক বক্তৃতার বিষয় (সংস্কৃতি), তারিখ ও সাম্মানিকের অঙ্ক উল্লেখ, ৪. ডান পায়ে চোট লেগে ফুলে যাওয়া, ৫. দাঁত পড়া নিয়ে কৌতুকপূর্ণ ও চমকপ্রদ বিবরণ এবং আমার জন্যে সেটি সংরক্ষণ, ৬. একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাঙলা একাডেমীর সভাপতিত্ব গ্রহণে সম্মতি, ৭. 'হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান পরিষদে' বক্তৃতার তারিফ, ৮. কর্নেল তাহের সভায় সভাপতিত্ব এবং আমার নির্দেশ অনুযায়ী ভাষণের সময় ও বক্তব্য নির্ধারণ, ৯. ক. নাস্তিকের ধর্মচিন্তা, খ. অনুরাগ, গ. ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা ও বর্তমান সমাজ, ঘ. বঙ্কিম ইত্যাদি নামের কিছু বাছাইকৃত প্রবন্ধ ডাকযোগে প্রেরণ, ১০. ক. 'শাস্ত্র, সমাজ ও নারীমুক্তি' প্রবন্ধের ফাইনাল প্রুফ *লেখক সমাবেশ* থেকে নিয়ে সংশোধনের, খ. 'নারায়ণ চৌধুরী স্মরণে' লেখাটিতে পরবর্তী প্রেরিত অংশ জুড়ে দিয়ে আসার, এবং গ. বিতর্কিত ভাষণের ক্যাসেট থেকে লিখিত বয়ান পাঠানোর নির্দেশ, ১১. 'স্বদেশ চিন্তা সংঘে'র পরবর্তী সেমিনারের বিষয় ও তারিখ (সংস্কৃতি অপসংস্কৃতি প্রচারে মাস-মেডিয়া, ৫ ডিসেম্বর '৯২) জানানো ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য ঘটনার অনুভবের-অভিজ্ঞতার বর্ণনায় ঠাসা ছিল সব চিঠি-যা পরবর্তী বছরগুলোতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়েছে।

১৯৯৩ সনের ৭ মে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আহমদ শরীফকে, তাঁর সাহিত্য কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ, সাম্মানিক ডি.লিট. উপাধি প্রদান করে সংবর্ধিত করলো। স্বীকার

করতেই হবে, এক্ষেত্রে উপাচার্য (তৎকালীন) ড. পবিত্র সরকারের কাছে আমার ঋণ অশেষ। আহমদ শরীফ সম্পর্কে তাঁর গুণমুগ্ধতা, আন্তরিক আগ্রহ ও সদিচ্ছাই তাঁকে খণ্ড-ক্ষুদ্র প্রতিকূলতা অতিক্রম করেও এমন একটি মহৎ ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত দ্রুত গ্রহণে প্রাণিত করেছে। আমরা স্বামী-স্ত্রী মিলে ঐ সিদ্ধান্তটি গ্রহণের অনুকূলে তাঁর মনোভূমিকে যথোপযুক্ত আবাদ করে দিয়েছি মাত্র। ১৯৮৭-৮৮ সনে, আমার পিএইচ. ডি. ডিগ্রির অভিসন্দর্ভ পরীক্ষণের সময়, ড. সরকার আমার পরীক্ষক হবার সুবাদে (বহিরাগত এবং মৌখিক), আহমদ শরীফ সম্পর্কে আলোচিত সুদীর্ঘ সাড়ে তিন শ' পৃষ্ঠা অভিসন্দর্ভাংশ পাঠের মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে অনুপুঙ্খ এবং বিস্তারিত জানার সুযোগ পান। সেই '৮৭-৮৮ সন থেকেই প্রস্তুতি পর্বের সূচনা। এরপর পড়িয়েছি তাঁকে হুমায়ুন আজাদের সাক্ষাৎকারটি; হাতে তুলে দিলাম *বাঙলা, বাঙালি ও বাঙালিত্ব* গ্রন্থের কপি এবং তারপর আরো কিছু টুকিটাকি, আর সর্বশেষে প্রস্তাব।

অবশ্য এরই মধ্যে বিভিন্ন কাগজে আহমদ শরীফের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়েছি, আমি নিজেও তাঁকে নিয়ে লিখেছি গোটা তিনেক প্রবন্ধ আর *কবিতীর্থ* নামের এক ব্যতিক্রমধর্মী ত্রৈমাসিকে তাঁর ব্যক্তিত্ব-যোগ্যতা-পারদর্শিতা ও কার্যাবলী নিয়ে ২৪ পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার। শিরোনাম ছিল 'আহমদ শরীফ : বৈদগ্ধের অম্লান দীপ'। সাক্ষাৎকারটি পাঠের পরই তিনি ১৪ মার্চ উচ্ছ্বসিত হয়ে চিঠিতে লেখেন: 'আমাকে আবার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে কোলকাতার পাঠকদের কাছে পরিচিত করে দিলে। এ তো তোমার অন্তরের প্রেরণা-প্রণোদনাতেই করেছ।... ভাবতে অবশ্যই ভালো লাগছে আমার এমন আপনজনও আছে যে দেহ-প্রাণ-মন-শ্রম-সময়-অর্থ দিয়ে আমার কল্যাণ সাধনে সদা সচেষ্ট, সদা আগ্রহী। এ ভাগ্য কয়জনের হয় দুনিয়ায়? সে দিক দিয়ে, আমি নিশ্চয়ই অনেকের ঈর্ষার পাত্র।' তিনি তখনো পর্যন্ত জানতেন না ঠিক ঐ সময়ে ওরকম দীর্ঘ একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশের অন্তর্নিহিত কারণটি কি ছিল।

ছোট কাগজ হলেও মিহির আচার্যের *লেখক সমাবেশ* বিভিন্ন সময়ে আহমদ শরীফ প্রসঙ্গে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। এই কাগজের বিশেষ সংখ্যায় ('৯৩) প্রকাশিত হয়েছিল আমার দীর্ঘ প্রবন্ধ 'আহমদ শরীফের মধ্যযুগ জরিপ ও প্রগতি চেতনা।' আহমদ শরীফ নিজেও লিখেছেন এ কাগজে।

চিরাচরিত প্রথার বিরোধিতা, যুক্তিপ্রয়োগ প্রবণতা, নতুন তত্ত্ব-তথ্যের আবিষ্কার-উদ্ভাবন, মূল্যায়নে নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্পষ্টবাদিতা তথা ঠোঁটকাটা স্বভাবের গুণে আহমদ শরীফ দুই বাংলার কোথাও যথাযোগ্য মর্যাদা পাননি এতদিন। প্রথম যেদিন তাঁকে টেলিফোনে ডি.লিট-এর খবরটি জানালাম, তিনি এই অভাবিত সম্মান লাভের খবরে খুশি হয়ে, পূর্বাপর কিছুই না জেনে, আমাকে লিখলেন : 'আজ দুপুরে তোমার ফোন পেয়ে, কণ্ঠধ্বনি শুনে এবং মহাসম্মান প্রাপ্তির সম্ভাবনা সংবাদে আপাতত মহা আনন্দিত।... রবীন্দ্রভারতী এতসদয় হল কেন বা আমার জন্যে তদবির করল কে, জানতে ইচ্ছে করছে' [৮.৪.৯৩]। কারণ এই তার্কিক-স্পষ্টবাদী মানুষটিকে অধিকাংশ স্বদেশবাসী চাইতেন এড়িয়ে চলতে। আসলে আজন্মলালিত বিশ্বাসে এবং শাস্ত্রিক ও আচারিক সংস্কারে বর্ধিত ও রোমন্থনে আশ্লিষ্ট মানুষের কাছে তিনি যে নতুন কথা বলতে চাইতেন, তা মানতে চাইতেন না অনেকেই, চাইতেন না যুক্তি-বুদ্ধি-তর্কের ধারে কাছে

যেতেও। ফলে আহমদ শরীফের এই উপাধি প্রাপ্তি, ঢাকার অনেককেই খুশি করেনি। তা ছাড়া আগে থেকেই তিনি ছিলেন অনেকের ঈর্ষাভাজন।

প্রকাশিত সাক্ষাৎকারটি যখন তাঁর মনে-মেজাজে ছড়িয়ে দিয়েছে এক আনন্দঘন অনুভূতি, তার অনতিকাল পরেই ডি.লিট. উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে তাঁকে কোলকাতায় আনার প্রথম সুযোগ মিললো। ৫ মে, ১৯৯৩, বুধবার রাত এগারটায় (বিমান-বিলম্বের কারণে) কোলকাতা বিমানবন্দর থেকে তাঁকে নেহালসহ নিয়ে আমার ঘরে এলাম উপাচার্যের নির্দেশেই, সরকারী অতিথি হওয়া সত্ত্বেও; কন্যার সেবা-যত্ন আর সান্নিধ্য পাবেন বলেই, যে বাড়িতে 'আস্তিকের স্বর্গসুখ' লাভ করেছিলেন বলে তিনি মন্তব্য করেছেন তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরিতে। ৭ মে রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অনুষ্ঠিত কনভোকেশন তথা সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়তো তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবিস্মরণীয় দিন ছিল।

এর পরের বাকি দিনগুলি (২২ মে পর্যন্ত) তাঁর কেটেছে আমার পূর্বনির্ধারিত তালিকা অনুযায়ী—ঝটিকা কোলকাতা-দর্শনে, কিছু গুরুত্বপূর্ণ সভায় ও সংবর্ধনায়, বহুগুণিজন ও সাংবাদিক সান্নিধ্যে এবং বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে ও কিছু নামী চিকিৎসাকেন্দ্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্যে ছুটোছুটিতে। যেমন :

৮ মে অন্নদা শঙ্কর রায় এবং এ. ডব্লু. মাহমুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, ৯ মে কোলকাতা দর্শন, ১০ মে প্রধান অতিথি হয়ে হীরালাল কলেজের রবীন্দ্র জন্মোৎসবে অংশগ্রহণ, ১১ মে ডাক্তার দেখানো, ১২ মে নারায়ণ চৌধুরী স্মারক গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ, ১৩ মে ইকো কার্ডিওগ্রাফি টেস্ট, ১৫ মে সকালে বিড়লা হার্ট রিসার্স সেন্টারে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, সন্ধ্যায় মিহির আচার্যের *লেখক সমাবেশের* পক্ষে সংবর্ধনা গ্রহণ, সঙ্গে ছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত; ঐ অনুষ্ঠানেই আত্মপ্রকাশ করে আহমদ শরীফকে নিয়ে লেখা আমার প্রথম প্রকাশিত বই *আহমদ শরীফ : দ্রোহ ও সাহসের সমাচার* [আহমদ শরীফের চোখের সামনে মাত্র ৪/৫ দিনের চেষ্টায় ও রাতজাগা পরিশ্রমে, ব্যক্তিগত অর্থে ও উদ্যোগে প্রকাশিত এ বইটি আসলে তাঁর সম্বন্ধে তাৎক্ষণিক একটি জনমত গঠনের চেষ্টাতেই তাঁর অতিসংক্ষিপ্ত সার্বিক পরিচয় দিয়ে বিন্যস্ত করা হয়েছিল এবং বলাবাহুল্য, বিনামূল্যে বহু সংখ্যক গুণিজনকে তা বিতরণ করাও হয়েছিল]; ১৬ মে নীতীশ বিশ্বাসের *ঐকতান* গবেষণাপত্রে'র উদ্যোগে 'আলাপন' অনুষ্ঠানে সমকাল নিয়ে রণেশ দাশগুপ্তসহ বহুবিশিষ্ট বামপন্থী লেখক ও সংস্কৃতিকর্মীর সমাবেশে ভাষণ ও প্রশ্নোত্তর দান; ১৭ মে বিড়লা হার্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে শরীর পরীক্ষা; ১৮ মে সকালে হীরেন মুখার্জীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, সন্ধ্যায় ড. ক্ষেত্র গুপ্তের সভাপতিত্বে ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বিভিন্ন প্রকাশক দ্বারা বিশাল ব্যাপক সংবর্ধনা [এই ক্ষেত্রগুপ্তই পরবর্তীকালে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাঙলাদেশের সাহিত্য' নামের ঐচ্ছিক পত্রে [এম.এ., এম.ফিল.] আহমদ শরীফের সাহিত্য সমগ্র সিলেবাসভুক্ত করান]; ২০ মে শেষ বার ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ; ২১ মে ভিড়ে ঠাসা সভাগৃহে 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি'র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর বিশেষ ভাষণ দান, বিষয়—"বাঙালির জ্ঞাতিত্ব বন্ধন"। পরে লেখাটি একাডেমীর গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরই ফাঁকে ফাঁকে, আমার ঘরে প্রায় বিরতিহীনভাবে আলাপচারিতায় মগ্ন থেকেছেন—রণেশ দাশগুপ্ত, ড. জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. জ্যোতির্ময় ঘোষ, ড. অরুণ

মুখোপাধ্যায়, ড. প্রতাপ মুখোপাধ্যায় দম্পতি, মিহির আচার্য দম্পতি, সাংবাদিক বাহার উদ্দীন, নীতিশ বিশ্বাস প্রমুখ গুণিজনদের সঙ্গে। এই ১৮ দিন তাঁর শরীর-মনের অভাবিত অকল্পনীয় তারুণ্য ও সুস্থতা আমাকে বিস্মিত করেছে। ২২ মে, '৯৩ রবিবার, তাঁর ১৮ দিন অতিবাহনের সার্বক্ষণিক কায়াসঙ্গী তাঁর আদরের আত্মজাকে পেছনে ফেলে রেখে তিনি ঢাকার উদ্দেশে আকাশপথে উড়ে গেলেন।

ডি.লিট. প্রাপ্তি উপলক্ষে, কোলকাতায় অর্জিত তাঁর সুখানুভূতির বর্ণনা দিয়েছেন তিনি ঢাকায় ফিরে গিয়ে অনেকদিন ধরে, বেশ কিছু চিঠিতে। তা থেকে সামান্য কয়েকটি বাক্য মাত্র উদ্ধৃত করা হল :

ক. 'আমি আজো অভিভূতি কাটিয়ে উঠতে পারিনি।... সত্যি কথা বলতে কি তোমার ও চিত্ত মণ্ডলের আমার প্রতি অনুরাগের .... যে গাঢ়তা দেখেছি, তাতেই এক অব্যক্ত ধ্বনির সে আনন্দ মনে মনে উচ্চারণ করে বলেছি।... তুমি ও চিত্ত কোলকাতায় আমার পরিচিতি পাকা ও স্থায়ী করে দিলে।' [২৫.৫.৯৩]।

খ. 'আজ মে মাসের শেষ দিন। এই মে মাসে আমার জীবনে আকস্মিকভাবে, অভাবিত সম্মান প্রাপ্তি ঘটেছে। আমার কোলকাতা যাওয়ার স্বপ্ন বাস্তব রূপ পেয়েছে।... সব মিলিয়ে মে-মাস আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখের সঞ্চয় হয়ে থাকবে।... এত সুখ আগে কখনো পেয়েছি বলে মনে পড়ে না।... তুমি আমাকে ঋণী করেছ, ধন্য করেছ'। [৩১.৫.৯৩]।

গ. 'স্বপ্নে অনুভূত সুখের মতো, কল্পলোকের অপ্রাপ্যকে পাওয়ার মতো মনে জাগছে গত মাসের এ-দিনটি'; [৭.৬.৯৩]।

ঘ. 'বার বার লিখলে তুমি বিরক্ত হও। কিন্তু আমি ভুলি কি করে! এমন দিন কি জীবনে আগে কখনো এসেছে! পরেও কি আর আসবে কোনো দিন!... এ কথাগুলো তোমায় গুছিয়ে বলতে পারিনি যে জীবনে এক মহামুহূর্ত এসেছিল যা অনন্য, অতুল্য ও আমার কল্পনাতীত। তাই এ উল্লাস', [১৩.৬.৯৩]।

ঙ. 'কোনটা ভুলি! কি করে ভুলি তোমার বাড়ি, যা ছিল সুখ নীড়!' [১৭.৬.৯৩]।

চ. 'তোমার ও চিত্তর ঘর নিতান্ত ছোট কিন্তু তোমাদের মন অত্যন্ত বড়। তাই... যেন স্বর্গবাসের আরাম-আনন্দ-সুখ পেয়েছিলাম', [২২.৬.৯৩]।

ছ. খনিতে কয়লাই মেলে, টান টান হীরে মেলে ক্বচিৎ-দৈবাৎ। তেমনি তোমাদের বাড়িতে... আন্তরিকতার-ভালবাসার হীরে মিলেছিল ১৮ দিন, তোমাদের অন্তরে ঐশ্বর্য আছে বলেই', [২৪.৬.৯৩]।

কিছু কিছু ব্যাপারে তিনি ছিলেন যুক্তিতে অটল, একগুঁয়ে লক্ষ্যভেদী। ডি.লিট. প্রাপ্তির পরেই *গণশক্তি* ও অন্যান্য কাগজে তাঁর লেখা প্রবন্ধ এবং নিউজ বেরুচ্ছিল একাদিক্রমে। সঙ্গতকারণেই *আনন্দবাজার পত্রিকা* থেকে বর্ষীয়ান-প্রাজ্ঞ সাংবাদিক নিখিল সরকার (শ্রীপান্থ) টেলিফোনে তাঁকে 'ওপার বাংলার সাহিত্য' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখার অনুরোধ জানালে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই নিখিল বাবুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে জানিয়ে দিলেন : অভিন্ন বাঙলাভাষা ও সাহিত্যে তিনি বিশ্বাসী, এভাবে সীমারেখা টেনে তিনি লিখবেন না। এহেন কাটা কাটা ভাষায় মাত্র দুটো কথা বলেই বেশ শব্দ করে ফোনটি নামিয়ে রাখলেন। উপস্থিত কয়েকজন অধ্যাপকের চোখে ব্যাপারটি অদ্ভুত ঠেকলেও

তিনি নির্বিকার এবং আমিও তাঁর এ ধরনের স্বভাবের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত বলে (আমার প্রিয় ভাইপো অর্চির জন্মের বছরেও এ ধরনের আচরণ করেছিলেন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব মি. মল্লিকের সঙ্গে) সময়ান্তরে বুঝিয়ে বলার অপেক্ষায় রইলাম। পরে অবশ্য ঐ ফরমায়েশী প্রবন্ধটি তাঁরা (আনন্দবাজার) ড. আনিসুজ্জামানকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলেন। সেই নিখিল সরকারই আহমদ শরীফের মৃত্যুর পর, খোঁজ নিয়ে ঢাকায় আমার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে (নিউজটি অবশ্য রিসিভ করেছিল কাজলভাবী), ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাঁর সম্বন্ধে আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলেন একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয় নিবন্ধ : 'আহমদ শরীফ চলে গেলেন/প্রতিবাদী মানবতার এক নাম।' সর্বোচ্চ সারকুলেশনে আসীন *আনন্দবাজার পত্রিকায়* প্রকাশিত ঐ সম্পাদকীয়টি তাঁর বিরল চরিত্রবৈশিষ্ট্যের অনালোচিত ও অভূতপূর্ব পরিচয় তুলে ধরে লক্ষ লক্ষ বাঙালির কাছে আহমদ শরীফের প্রতিবাদী মানবতার তথা আপোসহীন সংগ্রামের বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল। লেখাটির জন্যে আমি নিজে অন্তত ১৫০/২০০টি ফোন পেয়েছি পণ্ডিত-বুদ্ধিজীবী ও অধ্যাপকদের কাছ থেকে।

বাহ্য আচরণে কখনো সখনো 'অবিমৃশ্যকারী' তাঁকে মনে হলেও, সন্তানের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে এবং তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা ও স্বীকৃতি দানের ক্ষেত্রে পিতা আহমদ শরীফের কোন তুলনা নেই। মৃত্যুর নিথর হীমশীতলতায় যে কোন মুহূর্তে তিনি অবসিত হতে পারেন, ভেবেই হয়তো প্রতিবারই আমার অজান্তে আমারই ডায়েরিতে কয়েকপাতা করে লিখে রেখে গেছেন, যাতে ধরা পড়েছে দায়িত্বপূর্ণ বহু অমূল্য কথা। তেমনই একটি দৃষ্টান্ত :

'তোমাকে কন্যারূপে জেনেছি, মেনেছি, অন্তর দিয়ে গ্রহণও করেছি। তুমি আমার মৃত্যুমুহূর্ত অবধি স্বীকৃত কন্যাই থাকলে এবং ভারতে অর্থাৎ কোলকাতায় আমার কোনো বই কখনো প্রকাশিত হলে,... আমার 'Power of Attorney' যোগে তোমারই হবে আমার সমস্ত গ্রন্থস্বত্ব। আমার ছেলেদের বলে যাব, তারা যেন আমার এ অভিপ্রায় মেনে চলে। আজকের এ লেখা তুমি তাদের দেখাবে এবং দেখানোর জন্য রক্ষা করবে। এখানকার কিছু দেয়া হয়তো ওরা পছন্দ না-ও করতে পারে...। তুমি যে আমাকে কোলকাতায় তথা ভারতে খ্যাতিমান করেছ, তোমরা স্বামী-স্ত্রী তদবির না করলে যে আমার ডি.লিট. পাওয়া এবং কোলকাতা থেকে আমার বই বের হওয়া, আমার নাম এমন ব্যাপকভাবে ছড়ানো সম্ভব হত না তা আমার সন্তানেরা অস্বীকার করবে না নিশ্চয়ই। তারাও তাই তোমার প্রতি, আমার মৃত্যুর পরেও কৃতজ্ঞ থাকবে এবং বোনের মতোই সমাদর করবে-আশা করি এবং ভরসা রাখি,' [২.১২.৯৩]।

এমন অকপট স্বীকৃতি, দায়িত্ব পালনের এহেন আন্তরিক প্রয়াস আজকের জটিল-কুটিল পৃথিবীতে কি বড় একটা দেখা যায়, একমাত্র স্নেহময় পিতা ছাড়া? তিনি ছিলেন সেরকমই একজন ব্যতিক্রমী পিতা, জটিলতাহীন সরলমানুষ, একেবারে শিশুর মতো সরল—অধ্যাপক ড. পবিত্র সরকারের ভাষায় 'আবেগজীবী মনীষা'।

আমার ডায়েরির পাতায় কখনো সম্বোধনে কখনো বা বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে তাঁর বক্তব্যকে গুরুত্বপূর্ণ করে ভাবাবার বাসনায় লিখে রেখে গেছেন সম্পর্কের নিগূঢ়তার তত্ত্বকথা। যেমন :

ক. 'আমি ও আমরা চিরকাল তোমার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ রইলাম। তুমি আমার কন্যা, আমার পরিবারের সদস্যা। তোমার সুখে-দুঃখে, আনন্দে-সাফল্যে, গৌরবে-গর্বে আমরাও সমভাবে আবেগে উদ্বেলিত হই, হব।' [১.১২.৯৩]।

কিংবা, খ. 'যথার্থ প্রিয়জনের সঙ্গে আর কারুর তুলনা চলতে পারে না। রক্ত-সম্পর্কের লোকের জন্যে আকুলতা থাকে না, কেননা তাতে আত্মীয়তা হারানোর আশঙ্কা থাকে না, তা ভেঙে ভেঙে পানির মতো অভিন্ন রূপ পায়। .... কিন্তু পর যদি কন্যাত্বের বন্ধনে অনুরাগে-আসক্তিতে পিনদ্ধ হয়, তখন সে হয় অতুল্য, অনন্য, অসামান্য অসাধারণ, অবিকল্প-প্রিয়জন, যার সঙ্গে সম্পর্ক গাঢ়-গভীর ও নিবিড় করে ধরে রাখতে আপনার থেকেই আকুতি জাগে। এ অনুভবে শৈথিল্য এলে বন্ধন টুটে যায়,' [২.১২.৯৩]।

'৯৩ এর ২৪ অক্টোবর ঢাকায় গেলাম পুজোর ছুটিতে পিতৃদর্শনে তো বটেই, সেই সঙ্গে তাঁকে নিয়ে গবেষণার কাজটি এইবার ত্বরান্বিত করার তাগিদেও। এইবার বলছি কারণ, তাঁকে বলেছিলাম, তাঁর আগে আমি ডি.লিট. সম্মান নেব না। নানা প্রতিকূলতা সয়ে, এবারও যথারীতি তাঁর এবং আমার কিছু কাজ ভাগাভাগি করে সেরে নিয়ে, পিতৃদর্শনের সুখস্মৃতি অন্তরে বহন করে ২ ডিসেম্বর ফিরে এলাম কোলকাতায়, সঙ্গে এলো একরাশ বিষণ্নতা। প্রতিবারই এ দৃশ্য বিম্বিত—এ যেন উমার পিতৃগৃহ থেকে দশমীতে প্রত্যাবর্তনের বা বিসর্জনের করুণ প্রভাত, এবং পরদিনই মনোকষ্ট পত্রমাধ্যমে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পেরে কিছুটা আপাত স্বস্তি : 'ঘরভর্তি মানুষ, তবু তোমার অনুপস্থিতি একটা শূন্যতা সৃষ্টি করেছে আমার ঘরে, আমার চোখে, আমার মনে। এখন সকাল ৯টা। কিছুক্ষণ বাদে আড্ডা বসবে, জনবহুল। তবু মনে হচ্ছে ২২/২৫ জনের আড্ডাও এ শূন্যতা আড়াল করতে পারবে না। ... যুক্তি ও আবেগ প্রায় পরস্পরবিরোধী অনুভব। তাই যুক্তি দিয়ে জীবন চলে না' [৩.১২.৯৩]।

কিংবা, '... শোয়া মাস তুমি ঘর-মন ভরে রেখেছিলে।... কাজে-চিন্তায়, তত্ত্বে-তথ্যে আচ্ছন্ন থাকতো. দেহ-প্রাণ-মন। ... এখন বেকার,... মনে আনন্দ নেই, তাই দেহেও শক্তি অনুভব করিনে ' [১২.১২.৯৩]।

বা, '... আমি ঘরে পূর্ণতার মধ্যে বাস করেও শূন্যতা-শূন্য হতে পারছি না,... কে আমার বইয়ের প্রুফ পড়ে দেবে...।' (২৯.১২.৯৩]।

বলেছি, তিনি বরাবর আমায় পেতে চেয়েছেন এবং পেয়েওছেন তাঁর 'সাহিত্যকর্মের সহায়ক' রূপে, কিন্তু তার জন্যে গড়ে তুলতে পারেননি পরিশুদ্ধ-নির্বিরোধ পারিপার্শ্ব। তাঁর সঙ্গে আমার স্মৃতির শেষ নেই; অভিমানের পাহাড় সুউচ্চ, স্নেহের সমুদ্র অতলান্ত, আর পিতা-আত্মজার পরিচয়ে সম্পর্ক আত্মার। তবু কখনো কখনো, জীবনের প্রান্ত পর্বের অনিবার্য অসহায়তা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর লেখায় : 'তুমি অভিমান করে বসে আছ। তোমার পত্রের স্পর্শ পাই না। এতে আমার হৃদয়ে-মনে-মর্মে কষ্ট লাগে, অসুস্থ বোধ করি তোমার পত্র না এলে। ... আমি কৃতঘ্ন, তাই রাগ বা অনুযোগ করতে পারি না।... আমার উপর অভিমান করে অভিসন্দর্ভের কাজটা ছেড়ে দিলে তা হবে আত্মহত্যার মতোই শোকাবহ...'। ৮.৮.৯৪]।

১৯৯৩ সনের ৯ মে, ঝটিকা কোলকাতা দর্শনের দিন বিকেলে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' পরিদর্শনে এসে আহমদ শরীফ নিশ্চিত করে জানালেন, এখানেই সংরক্ষিত আছে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের সমস্ত গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বহু রচনা। অতঃপর তাঁর ইচ্ছে ও আদেশ অনুযায়ী, বিশারদের সমস্ত গ্রন্থের কপি, পরিষদের কঠোর নিয়ম মেনে সপ্তাহে ১০-২৫ পাতা করে ফটোস্ট্যাট করিয়েছিলাম গ্রন্থাগারিক অরুণা চ্যাটার্জীর সাহায্যে, সম্পাদক অগ্রজপ্রতিম প্রদীপ চৌধুরীর অনুমতিক্রমে; পরে তা এক সঙ্গে ঢাকায় পাঠিয়ে দিই। কিন্তু অনতিকাল পরেই জানতে পারলাম, অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরী পরিষদের এক কর্মী অশোক মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় অন্য উপায়ে বিশারদের সব রচনারই জেরক্স কপি সংগ্রহ করে নিয়ে গেছেন 'রচনাবলী' প্রকাশের অঘোষিত উদ্দেশ্যে। অতএব, আমাকে দিয়ে সোজাপথে করানো এতদিনের পরিশ্রম আপাতত বৃথা এবং ব্যর্থই হয়ে গেল। তবে ১৯৯৩ এর জুন থেকে একাজের জন্যে দীর্ঘদিন যাতায়াত সূত্রে তৈরি হল একটা ভালো সম্পর্ক এবং তার একটি পরোক্ষ প্রভাবও পরবর্তীকালে পড়লো। সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ।

বলেছি, '৯৩ সনে ডি.লিট. প্রাপ্তি উপলক্ষে কোলকাতা থেকে তিনি অর্জন করে নিয়ে গেলেন অভাবিত ও অভূতপূর্ব সংবর্ধনার-সম্মাননার-ভালবাসার-আত্মীয়তার এক অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতি। এই সুখানুভূতিতে তিনি অনুরণিত হয়েছেন প্রায় পৌনে এক বছর--কোলকাতা ও কোলকাতাবাসীর প্রতি অনুভব করেছেন এক অবচেতন টান। আবার এমনই আনন্দঘন পরিবেশে প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হতে দেখেছি--জেনেছি আমি, তাঁর মনের দোসররূপেই। কিন্তু তাঁর আগমনের জন্যে তো উপযুক্ত মর্যাদাসম্পন্ন অনুষ্ঠান চাই। সুযোগ এলো ১৯৯৪ এর এপ্রিলে। বাঙলা সাহিত্যের অধ্যাপকদের সংগঠন (সর্বভারতীয়) 'বাংলা বিদ্যা সম্মিলনী'র দু'দিন ব্যাপী (৩০ এপ্রিল ও ১ মে, '৯৪) প্রথম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে সল্টলেক স্টেডিয়ামে; সংগঠনের পক্ষ থেকে আহমদ শরীফকে দেয়া হবে বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের সম্মান ও সংবর্ধনা। সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, উপাচার্য ড. পবিত্র সরকারের সহযোগিতা ক্রমে রবীন্দ্রভারতীয় বাঙলা বিভাগ এই সঙ্গে আমন্ত্রণ জানালো 'বনফুল স্মারক বক্তৃতা' দেবার। সমস্ত ব্যবস্থা যখন পাকা, আমার মাধ্যমে তাঁর সম্মতি নিয়ে, তারপরেও অদ্ভুতভাবে আসা না-আসার টানাপোড়েন চলছে তাঁর টেলিফোন মাধ্যমে। অবশেষে আমার অসম্মানিত পরিস্থিতি অনুভব করে, প্রতিকূলতা সত্ত্বেও স্নেহের কাছে হার মানতে হল তাঁকে। ২৯ এপ্রিল শুক্রবার বিকালে পৌত্র কান্তসহ, দ্বিতীয় বারের জন্যে তিনি এলেন কোলকাতায়, স্বভাবতই আমার বাসায়। পূর্বনির্ধারিত ও অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী তাঁর এবারকার উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি হল : ৩০ এপ্রিল 'বাংলা বিদ্যা সম্মিলনী' থেকে সংবর্ধনা গ্রহণ ও সংক্ষিপ্ত ভাষণ, ২ মে অধ্যাপক এ. ডব্লু. মাহমুদের (আত্মীয়) সঙ্গে সাক্ষাৎ, ৩ মে কোলকাতা তথ্যকেন্দ্রে অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী ও রণেশ দাশগুপ্তের গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ, ৪ ও ৫ মে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগে 'বনফুল স্মারক বক্তৃতা' প্রদান। বিষয়, 'বাঙলাদেশে বাঙলাসাহিত্যের বিবর্তন ধারা' (যা তাৎক্ষণিকভাবে আগের রাত্রে আমায় ডিকটেশন দিয়ে লেখানো হয়েছিল), ৬ মে সাহিত্য একাডেমীতে বিশিষ্ট পণ্ডিত-গবেষক লেখক-বুদ্ধিজীবী সমাবেশে দেবেশ

রায়ের সভাপতিত্বে একক বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণ [এখানেই তাঁকে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র শতবর্ষপূর্তির বিশেষ নিমন্ত্রণের (২৭-২৯ জুন, '৯৪) আগাম সংবাদ জানানো হয়। সাহিত্য একাডেমীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠেয় এ অনুষ্ঠানের ২৮ তারিখের বিষয় সূচিতে তাঁকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে দিল্লী থেকে সম্পাদক ইন্দ্রনাথ চৌধুরী চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন (২৮.৪.৯৪) বলেও তাঁকে অবহিত করা হয় এবং একাডেমীর ঘরে বসে তিনি জুন মাসে আসার ইচ্ছেও প্রকাশ করেন—যদিও আর আসেননি, না হয় টানাপোড়েনে পড়ে আসতে পারেননি। এসব কিছুর প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমি, তাঁর সার্বক্ষণিক কায়াসঙ্গিনী। অবশেষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ তাঁকে আজীবন সদস্য ও ফেলো নির্বাচিত করে চিঠি পাঠান ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪; [আগাম খবর অবশ্য প্রদীপদা আমাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন।]; ৭ মে আমার বাসায় আহূত সাংবাদিক বৈঠকে মার্কসবাদ, বাঙলাদেশের সংস্কৃতি-রাজনীতি এবং তসলিমা প্রসঙ্গ নিয়ে প্রশ্নোত্তরধর্মী আলোচনা; [এসব সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে *দৈনিক আজকাল* ও *দৈনিক প্রতিদিন* পত্রিকায়], ৮ মে বাল্যবন্ধু শ্রী অমরেন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে আমার বাসায় বসেই সাক্ষাৎলাভ, এরই মাঝে এবং পরবর্তী দু'দিন পুরনো পরিচিত জনদের সঙ্গে ও কিছু নবাগতের [যেমন, রবীন্দ্র সঙ্গীত গায়ক ডাঃ শৈলেন দাস] সাথে ঘরোয়া আলাপচারিতার সময় যাপন; ১১ মে বুধবার ৬ ঘণ্টা বিমান বিলম্বের পর বিকেলে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। এবারও তিনি কোলকাতায় এসে পৌছবার আগেই তাঁর রবীন্দ্রভাবনা সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা নিরসনার্থে *বাতায়নিকের পত্রে* [২৯ এপ্রিল, '৯৪] লিখলাম আবার একটি সাক্ষাৎকারধর্মী আলোচনা; শিরোনাম; 'মনুষ্যত্বের উন্মেষ-বিকাশে রবীন্দ্র সাহিত্যের বিকল্প নেই।'

ঢাকায় ফিরেই ১২ মে লিখলেন : 'সকাল বেলা ঘুম ছুটতেই দেখলাম আমি তোমার কাছে, তোমার ঘরে, তোমার তত্ত্বাবধানে ও আদর যত্নের আওতায় নেই। ... তোমাদের বাড়িতে যাপিত জীবনের ১৩ দিন স্মৃতির সঞ্চয় ও বাকি জীবনের পুঁজি পাথেয় হয়ে রইল। আমার সুগার বৃদ্ধির আশঙ্কা তোমাকে যেভাবে বিচলিত ও বেপরওয়া করেছিল, তা দেখে, অনুভব করে ও উপলব্ধি করে বিস্মিত, প্রীত ও ধন্য হয়েছি।' এবারের সুখস্মৃতি তাঁকে আনন্দ দিলেও মনের উপরে দেশের সমকালীন ঘটনা প্রবাহ এবং মৌলবাদীদের জঙ্গি আক্রমণ, মামলা ইত্যাদি চাপ ফেলেছিল। ২৯ জুলাইয়ের চিঠিতে এ সম্পর্কে লিখলেন, 'আমি এখন বিপন্ন। 'মুরতাদ' বলে আজ মোল্লারা লংমার্চ করে ঢাকায় এসেছে। প্রায় লক্ষাধিক সংখ্যায়।' মনের উপরে চাপ ফেলেছে আরো কিছু দুঃসহ প্রতিকূল পরিস্থিতি, যাকে ক্ষমা করা গেলেও এড়িয়ে চলা যায় না। অবসাদে দীর্ণ হৃদয়ের ধ্বনি বেজে উঠেছে তাঁর, ১৫ আগস্টের লেখা চিঠিতে : 'আজ কয়েক দিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছি। জীবন সায়াহ্নে আনন্দঘন পরিবেশে ও চেতনায় জীবনের অবসান কামনা করেছিলাম। তা আর হয়ে উঠল না...।' অবসাদে ক্লিষ্ট যে আমাকেও হতে হয়েছে। থিসিস জমা দেবার শেষ তারিখ জানিয়ে দেয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে; একটা লম্বা সিটিং দরকার কিন্তু উপায় নেই। আমাদের সমাজে একটি প্রচলিত কথা আছে—যেচে কিছু করতে গেলে, ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধিতে মানুষ তার অবমূল্যায়ন করে। কেবল মাত্র কোনো নিষ্ঠ-গবেষকই অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারবেন—যাঁর সম্পর্কে

কোনো রেফারেন্স বই পর্যন্ত মিলবে না, এমন কোনো জীবিত ব্যক্তিত্বকে নিয়ে উচ্চতর গবেষণার (ডি.লিট.) কাজ নিষ্পন্ন করার ক্ষেত্রে 'বিষয়'-ব্যক্তির দীর্ঘ মেয়াদী নিরঙ্কুশ সহযোগিতা ও সান্নিধ্য কতটা বেশি জরুরি। ফলে ক্রমেই আমার অভিমানের পাল্লা ভারী হয়েছে। তাঁর চিঠিতে পাঠানো নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর authorise করা যাবতীয় জটিল কাজ করে গেছি নীরবে। কেবল অনীহা জেগেছে পত্রালাপে। বহুদিনের ব্যবধানে আমার চিঠি পেয়ে লিখলেন : 'সুদীর্ঘ অসহ্য খরার পরে যেন প্রত্যাশিত বর্ষণের মতো এলো তোমার পত্র মুসার মাধ্যমে। প্রতীক্ষায়, বেদনায়-প্রত্যাশায় অপূর্তির ঘায়ে আহত হৃদয় তৃপ্তি-তুষ্টি ও হৃষ্টি পেল তোমার পত্রে' [১৬.৯.৯৪]। কিংবা 'তুমি বিশ্বাস করবে না জেনেও বলতে পারি, আমার হৃদয়ের কন্দরেই তোমার বাস।... আমি তোমার কাছে আবদার করার অধিকারও হারিয়েছি আজ... তোমার পত্র পড়ে এবার আমার চোখে জল এসেছিল' [১৫.১০.৯৪]; 'তোমার ডি. লিট. অভিসন্দর্ভ সমাপ্তিকালে তোমার কোনো সাহায্য-সহায়তায় সমর্থ হলাম না বলে মনের কেণে অপরাধবোধ উঁকি দিচ্ছে। তবু শেষ কর, সফল হও। আমার ভাবতে ভালো লাগে যে তোমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ডক্টরেট ডিগ্রিধারী। সমাজে প্রতিষ্ঠাগৌরবে ধন্য হও। তাতেই আমার সুখ-আনন্দ-গর্ব [১৪.১১.৯৪]। অবশেষে বহু জটিলতা-প্রতিবন্ধকতা ও অন্তর্দহনের উত্তাপ পেরিয়ে অভিসন্দর্ভ জমা দিতে সমর্থ হলাম। আগেই বলেছি, থিসিসের নায়ক মহানায়ক তিনিই, তবু শিরোনামটি ঘুরিয়ে দিতে হয়েছিল; সরাসরি তাঁর নামে সিনপসিস জমা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গিঁট ছাড়াতে গিয়ে সংকটে পড়েছিলাম বলেই।

তারপরও সমস্যার গ্রন্থিমোচন যেন আর হয় না। ভারতীয় পরীক্ষকদের সপ্রশংস রিপোর্ট পেতে কোনো সমস্যা হলো না, সংকট দেখা দিল বাঙলাদেশের পরীক্ষককে নিয়ে। যেহেতু আহমদ শরীফ আমার থিসিসের মূল বিষয়, সে কারণে উপস্থাপন উচ্চমানের ও তথ্যবহুল এবং প্রামাণ্য হওয়া সত্ত্বেও বাঙলাদেশের জনৈক অধ্যাপক পরীক্ষক তাঁর অহেতুক হঠকারিতা ও অজ্ঞতাপ্রসূত সিদ্ধান্ত ও ঈর্ষী চেতনার কারণে রেজাল্ট ঝুলিয়ে রাখেন অনেকদিন; শেষে উদ্ধার করেন অবশ্য ড. ক্ষেত্রগুপ্ত মহাশয় স্বয়ং। আহমদ শরীফকে নিয়ে ডি.লিট. করার পিছনে রয়েছে যেমন দীর্ঘ যন্ত্রণাদায়ক ইতিহাস, তেমনি ছিল দুস্তর বাধার পাল্টা এক প্রতিবাদী চ্যালেঞ্জও। থিসিসটির একটি টাইপ কপি আহমদ শরীফকে পাঠানোর পর সেটি পাঠ করে পর পর কয়েকটি চিঠিতে কিছু কিছু মন্তব্য করেছেন তিনি। যেমন :

ক. 'আমার সম্বন্ধে যা লিখেছ তাতে আমাকে লজ্জিতই করেছ।... তবে তোমার হৃদয়ের গভীরে আমার স্থিতি যে সর্বাত্মক ও সর্বার্থক তা সুস্পষ্টই হয়ে গেল। ভক্তি ভালোবাসার এমনি যাদু।' [১২.৮.৯৫]

খ. 'তুমি যে আমাকেই জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্যেই বিরুদ্ধ পরিবেশে, অসুস্থ শরীরে একাজে ব্রতী হয়েছিলে, ডিগ্রির জন্যে যে নয়, তা অনুভব-উপলব্ধি করার মতো মন-মগজ আমার আছে' [১৩.৯.৯৫], '...তোমার প্রাণ-মন সমর্পণ করে জীবন-সমাজ ও জগৎ ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ-বঙ্কিমের তুল্য করে তুলেছ, আমি এর যোগ্য নই।' [১৩.৯.৯৫]

গ. তোমার এখানকার পরীক্ষক অভিসন্দর্ভে বিরূপ রিপোর্ট দিয়েছেন... আমাকে নায়ক বানিয়েছ বলেই।' [১৩.৯.৯৫]

ঘ. আমাকে প্রাধান্য দেয়াতেই তোমার এ বিপর্যয় ঘটেছে, নইলে এ রচনা তো অনিন্দ্য সুন্দর ও তথ্য নির্ভর' [২১.৯.৯৫]।... 'তোমার এ থিসিসে ডিগ্রি দানের সুপারিশ করবে না তেমন লোক বা বিদ্বান বাঙলাভাষীর মধ্যে মিলবে না, তা আমি জোর গলায় বলতে পারি।' [১৫.১১.৯৫]

ঙ. '...আমাকে Hiro বানাবার জন্যে তুমি নিজে থেকেই, যখন আমার সঙ্গে বাপ-মেয়ের সম্পর্ক হয়নি, তখনই পিএইচ. ডি'র অভিসন্দর্ভ লিখেছিলে। দ্বিতীয় অভিসন্দর্ভও আমাকে তুলে ধরার জন্যেই করেছ, এবং তা তুমি আমাকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা কর। ভালোবাসো বলেই করেছ' [১১.৬.৯৫]।

শেষ পর্যন্ত ২৩ নভেম্বর '৯৫ রেজাল্ট পেয়ে তাঁকে ফোনে জানানোর পর তাঁর সে কি উল্লাস। শিশুর সারল্য নিয়ে একে একে অনেককে (আবুল কাসেম ফজলুর হক, মনসুর মুসা, আজিজ মেহের, শিল্পী, হাবিবুল্লাহ প্রমুখ) বিতরণ করেছেন সে খবর।

আহমদ শরীফের নিরলস চেষ্টা সময় ও শ্রম ব্যর্থ করে দিয়ে ঢাকার সড়কে দীর্ঘ সময় পেরিয়ে, অনেক পথ হেঁটে, অনেক হোঁচট খেয়ে অবশেষে ১৯৯৬ এর জানুয়ারিতে কোলকাতায় এসে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে আত্মপ্রকাশ করলো আমার দ্বিতীয় গ্রন্থ *বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবী ও প্রগতি প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব*। এর মাসখানেকের মধ্যেই আহমদ শরীফকে নিয়ে লেখা আমার একটি আস্ত বই প্রকাশিত হল ১৯৯৬ এর ফেব্রুয়ারিতে, তাঁর পঁচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে; নাম : *আহমদ শরীফ : নির্মোহ চিন্তার প্রতিকৃতি*। দুটো বইয়েই ড. পবিত্র সরকার ও ড. ক্ষেত্র গুপ্ত দুটি (২+২) অসাধারণ ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে ঋণী করেছেন। আমার এ বই দু'টি প্রকাশিত হওয়ায় ড. শরীফ নিজের বই প্রকাশের আনন্দের চেয়েও একটু বেশিই খুশি হয়েছিলেন।

একজন রাশভারি তাত্ত্বিক, চিন্তাবিদ এবং দার্শনিক পণ্ডিতের মধ্যে কোথায় যে লুকিয়ে ছিল স্নেহের এমন স্রোতস্বিনী ফল্গুধারা, তার সূত্র কোনদিনও আমি উদ্ধার করতে পারিনি। শুধু বুঝেছি, এ এক মরমী মানুষের প্রতিকৃতি। একমাত্র তিনিই তাঁর তুলনা। যিনি আমার দেয়া শত আঘাতকে নীলকণ্ঠের মতো ধারণ করেছেন, হজম করেছেন নীরবে। আমার প্রতি যাঁর ভালোবাসার সমুদ্র ছিল অতল, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছিল আমৃত্যু পাহাড় প্রমাণ, কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ ছিল না ছিটেফোঁটাও।

১৯৯৫-৯৬ এ লেখা চিঠিতে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক. 'তুমি দেখতে পাও না,... তবে আমি 'বাতাসে পাতিয়া কান' তোমাদের আমার প্রতি যে মমতা, তার ধ্বনি শুনতে পাই'। [৩০.১.৯৫]।

খ. 'মৃত্যুর আগে তোমাকে একবার দেখতে না পেলে চিত্তের গভীরে ঘা থেকে যাবে [২.১০.৯৫]।

গ. 'আমার হৃদয়ে তোমার স্থান মৃত্যু মুহূর্ত অবধি অটুট থাকবে' [২০.২.৯৫]।

ঘ. 'তোমাকে গতকালও স্বপ্নে দেখলাম—তুমি ও আমি কোন এক সভায় যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছি, তারপর ঘুম ছুটে গেল।' [৭.৩.৯৫]

ঙ. 'আমার ... বইয়ের ১,২,৩ ও ৫ সংখ্যক প্রবন্ধ সম্বন্ধে তোমার মত জানালে সুখী হব।' (৭.৩.৯৫]

চ. 'টাকাগুলো দিয়ে আমার দেহাবসানের আগে একটা লাল পেড়ে সাদা শাড়ী যদি গায়ে জড়াও তাহলে আমি কল্পনায় মানশ্চক্ষে আমার মায়ের অবয়ব প্রত্যক্ষ করব আর আনন্দ ও সুখ পাবো।' [১৩.৬.৯৫]

ছ. 'তোমার স্মারক সামগ্রীর সংরক্ষণ সংক্রান্ত বয়ান আক্ষরিকভাবে আমাকে আনন্দে কাঁদিয়েছে। ... তোমার প্রসন্নতা-কল্যাণ যে আমার কতটা কাম্য তা কি পত্রে ব্যক্ত করে সবটা বোঝানো যায়।' [৯.৭.৯৫]

জ. 'প্রবাসী সন্তানকে মা-বাবা যেমন স্মরণ করে, দেখতে আকুল হয় ... তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক তেমনি। .... নিত্য তোমায় স্মরণ করি, এ স্মরণ অকৃত্রিম তা তুমি বিশ্বাস কর না।' [২৯.৭.৯৫]

ঝ. তোমার বইয়ের প্রকাশনা উৎসব হবে (২৩.১.৯৬) জেনে আমি মহা আনন্দিত। শিশুর মতো সানন্দ-উল্লাসনৃত্যে মেতে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে।' [২১.১.৯৬]

ঞ. 'তোমার শবদেহ দান করতে চাও কর। কিন্তু আমার অনুরোধ, তুমি চিকিৎসা করাও, করাও, করাও—যাতে আমার মৃত্যুর আগে আমার কন্যার দেহ-প্রাণ-মন বিপন্ন, এ সংবাদ শুনতে না হয়।' [২১.১৯৬]

ট. গত বধুবারে মেয়ে রূপে চোখের সামনে ছিলে, আজ বুধবারে মানশ্চক্ষে মায়া হয়ে হয়েছ আবির্ভূতা। মেয়ে যেমন নন্দিনী, মায়াও তেমনি সত্যরূপে আবিষ্ট রাখে। .... আজ বুধবারেও আমার চেয়ার টেবিল ঘর শূন্য।' [২৬.৬.৯৬]

ঠ. আমি আবার দুটো পুথির কাজ ধরেছি, একটি তো তোমার সাহায্যে শেষ করেছিলাম।... আমার অনেক কাজেই তোমার হাতের ছাপ রয়েছে, নিত্যই তোমাকে নানা কারণে স্মরণ করতে হয়।... 'নয়ন তোমারে পায় না হেরিতে রয়েছ নয়নে নয়নে'... এ আক্ষরিক অর্থেই সত্য' [১১.৯.৯৬]। 'দূরের আপন জন এমনিভাবেই কাছে থাকে, পাশে থাকে, মনে থাকে মর্মে থাকে' [১১.১০.৯৬]

ড. আমি তোমাকে লিখি এবং লিখতেই থাকব মৃত্যুর পূর্বক্ষণ অবধি, যদি শরীর বা হাত চালু থাকে।' [৯.১২.৯৪]

১৯৯৩ এর ২ ডিসেম্বর ফিরে আসার পর দীর্ঘ আড়াই বছরের ব্যবধানে ১৯৯৬ এর ২২ মে আবার ঢাকায় গেলাম। এই দীর্ঘ বিরতির কার্যকারণ ব্যাখ্যার সময় এখনও আসেনি। আমাদের পিতা-পুত্রীর সম্পর্কের গভীরতার মান-অভিমানের ও পার্শ্বজটিলতার অনেক কথাই, জানতেন গভীরভাবে একমাত্র অধ্যাপক মনসুর মুসা। কোলকাতায় ও তার বাইরে বিবিধ দায়িত্বশীল কর্ম (বাঙলা একাডেমীর ডি.জি. থাকাকালে) এবং বিভিন্ন সেমিনার উপলক্ষে আসা-যাওয়ার সূত্রে কিংবা আমার ঢাকায় অবস্থানকালেও তিনি ছিলেন পিতা-পুত্রীর সম্পর্কের মাঝে বহুক্ষেত্রে আমার সহযোগী-অগ্রজপ্রতিম সহমর্মী এবং আহমদ শরীফের ফরমায়েশ মেনে সংযোগ রক্ষায় সহায়তাকারী। [এ প্রসঙ্গে স্বল্প হলেও কাজল ভাবীর বাবা-মায়ের নাম স্মরণ করতে হয়]। অধ্যাপক মুসা ব্যক্তিগত

আলাপচারিতায় একাধিকবার বলেছেন : 'আহমদ শরীফকে নিয়ে, তাঁর নাড়ি নক্ষত্র খুঁজে প্রথম বই লিখে জন সাধারণের কাছে তাঁকে পৌঁছে দিল প্রথমা; ... নইলে কে জানতো এত কথা।' আর আহমদ শরীফ নিজে বলতেন : 'ইতিহাস তোমাকে মূল্য দেবে, আহমদ শরীফকে মূল্যায়িত করতে গেলে।' আর মূল্য! যাঁর অমূল্য স্নিগ্ধ ছায়ার মহিমায় আমার মূল্য বিচার–তিনিই তো ছেড়ে চলে গেলেন, একেবারে কাঙাল করে। মূল্যের প্রশ্নে নয়–আমি শুধু বুঝেছিলাম, তিনি আমাদের অস্তিত্বের অঙ্গীকার, প্রতিবাদী মানবতার এক অনিন্দ্য প্রতিমূর্তি যাঁকে জানা দরকার, বোঝা দরকার, ধারণ করা দরকার চেতনায়-সত্তায়। প্রথমত এই বোধ থেকেই ব্রতী হয়েছিলাম তাঁকে নিয়ে গবেষণার কাজে। কিন্তু তিনি নিজে এসব কথাকে ফাঁকা বুলি বলে উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন : 'তুমি যে আমাকে বিশিষ্ট ও প্রখ্যাত করে তুলবার জন্যেই জীবন উৎসর্গ করেছ তা আমি জানি এবং তোমরা স্বামী-স্ত্রী আমার জন্যে যা কিছু করেছ তা লিপিবদ্ধ করেছি আমার ডায়েরিতে। এ ডায়েরি প্রকাশিত হবে আমার মৃত্যুর পরে তোমারই সম্পাদনায়। ...কাজেই তুমি পিএইচ. ডি. ও ডি.লিট. সন্দর্ভে যে আমাকে নায়ক করার জন্যেই তোমার দেহ-প্রাণ-মন-মনীষা-শ্রম ও সময় আর ধৈর্য-অধ্যাবসায় ব্যয় করেছ তা কেউ অবিশ্বাস করতে পারবে না। .... তুমি আমাকে সাহিত্যে ও সারস্বত সমাজে উজ্জ্বল নক্ষত্রবৎ প্রতিষ্ঠিত করেছ–আমি এ স্বীকৃতি জীবৎকালে তো নয়ই, মৃত্যুর পরেও পেতাম না' [২১.১.৯৬]; তিনি এও বলেছেন : 'জীবৎকালে রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও পর্যন্ত কোন ডক্টরেল ডিগ্রি হয়নি, 'ভানুসিংহ' ছিল ভুল ধারণা ভিত্তিক অভিসন্দর্ভ, তাতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না।... তোমার মতো এমন করে কেউ আমাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালোবাসা আজ অবধি অর্পণ করেনি, তাই এ শ্রদ্ধাকে শুধু গাঢ় গভীর নয়, অশেষ বলেই মানি'। [২১.৪.৯৬]।

১৯৯৬ সনের ৩১ মার্চ লেখা চিঠিতে এ বিষয়ে তিনি যেভাবে আমার কাজের আন্তরিকতার, সম্পর্ক-সম্বন্ধের মূল্যায়ন করেছেন তা আমার জীবনের এক পরমপ্রাপ্তি; ডি.লিট. ডিগ্রির খ্যাতি-সম্মান লাভ ও তাঁর এরূপ উদার-নির্ভেজাল স্বীকৃতির কাছে ম্লান হয়ে যায় : 'তোমার বই দুটো উল্টে-পাল্টে দেখলাম। দেখে বুঝলাম, আজ অবধি লেখা তোমার দুটো অভিসন্দর্ভ এবং আমার দুটো জীবনচরিতই তোমার মূল সাহিত্য কর্ম। চারটেরই নায়ক-মহানায়ক আহমদ শরীফ। অর্থাৎ আমাকে মহৎ ও পরিচিত করার জন্যেই 'পিতা স্বর্গ' তত্ত্বের ও আদর্শের অনুসরণে পরম নিষ্ঠায় তুমি তোমার দেহ-প্রাণ-মন-শ্রম ও সময় উৎসর্গ করেছ। আমার জন্যে এমন ত্যাগ তুমি ছাড়া এজগতে আর কে করত, কল্পনাও করতে পারছি না। আমার তিন পুত্রসন্তানও এমন মমতায় আমার জন্যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করবে বলে বিশ্বাস করি না। তুমি আমাকে ধন্য ও কৃতার্থ করলে।

আমি বিস্মিত অভিভূত তোমার আদরে-কদরে-ভালোবাসায় ও আমার প্রতি তোমার ভক্তি-শ্রদ্ধার গাঢ়-গভীরতায় ও অশেষতায়। তোমাকে কন্যারূপে পেয়ে এ জীবনে যেন আমি সার্থক হলাম, ধন্য হলাম, কৃতার্থ হলাম। আমার যেন আর কিছু চাওয়ার-পাওয়ার রইল না। আবার বলি, আমি ধন্য, আমি কৃতার্থ। আমার এ সুখ ও আনন্দ অনুভূতির-অভিভূতির তোমার মমতার গভীরতার ও অশেষতার-অসীমতার উপলব্ধির অনুভবের শেষ নেই।' 'প্রথমা' শিরোনামে ২২ পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ আলোচনাও তিনি লিখে রেখে

গেছেন তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরিতে। অবশ্য তারও আগে এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন : '.... আমি যদি সৃষ্টিশীল লেখক হতাম, তাহলে তোমাকে 'মহিয়সী মহিলা' করে উপন্যাস রচনা করতাম ...' [৮.৩.৯৩]। না-ই বা লিখতে পারলেন বিদ্যাসাগরের মতো *প্রভাবতী সম্ভাষণ*, যা দিতে পেরেছেন তার মূল্য তো অসামান্য। ১৩.১.৯৬ তারিখে লিখলেন : 'একটা বই তৈরি হয়েছে প্রবন্ধের, নাম *জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা*। এটি তোমাকে শেষ উপহার রূপে দেব স্থির করেছি।' বইটির উৎসর্গ পত্রে লিখলেন : 'আমার কন্যা/বিদ্যাসাগর মহিলা কলেজের অধ্যাপক/ড. প্রথমা রায় মণ্ডলের নাম/তাঁর আত্মীয়তার, মমতার, সেবার ও আমার অনেক অপরিশোধ্য ঋণের স্মারক রূপে মুদ্রিত রইল।' আগে আরও চারটি বইয়ের উৎসর্গপত্রে এবং গ্রন্থস্বত্বে (ঢাকার স্বত্ব ২টি) আমাকে জায়গা দিয়েছেন ঠিকই, তবে এককভাবে এই প্রথম। কাজেই আমার কাছে এ উপহার অমূল্য অতুল্য অসামান্য।

১৯ জুন (৯৬) ঢাকা থেকে কোলকাতায় ফিরলাম (২২ মে, ১৯ জুন)। প্রতিবারের মতো এবারেও একই শূন্যতার হাহাকার, 'হারানোর বেদনার্ত স্বর। একই আর্তনাদ প্রকাশ পেল তাঁর ২৪ জুন এবং এর পরের লেখা কয়েকটি চিঠিতে। তাঁকে আমি তাঁর জীবন সায়াহ্নেরও একেবারে অন্তিম পর্বে গিয়েও বোঝাতে চাইলাম না যে তাঁর শারীর ও মানসস্বাস্থ্যের স্বার্থে যে কোন সময় তাঁর ডাক পাওয়া মাত্র ঢাকায় ছুটে যাবার অনিবার্য প্রয়োজনে শুধু আমি নই, আমার স্বামী সন্তানও নিজেদের যে কোন ক্ষতি স্বীকারে প্রস্তুত থাকতো সর্বদা। সংকটের শিকড় ছিল অন্যত্র--অভিনব তার অবয়ব, বিচিত্র তার অভিব্যক্তি।

নানা জটিলতায়, কিছু অপ্রকাশ্য কারণে, কষ্টের হলেও, আমি পত্র সংযোগ ক্রমশ কমাতে শুরু করি। যদিও রাষ্ট্রীয় ব্যবধানের মাঝে টেলিফোন এবং চিঠিপত্রই ছিল আমাদের যোগাযোগের একমাত্র ভরসা, কিন্তু সে চিঠিও কখনো কখনো হারিয়ে যেত মাঝপথেই। তাই বাহ্যিক সংযোগসম্পৃক্ত সম্পর্কটি ফলে একদিকে ঝুলে যেতে থাকে। তিনি তাঁর অঙ্গীকার মতো সপ্তাহে দু'তিনটি করে পত্র লিখেই চলেছেন অনিয়মিত জবাব পেয়েও। অভিমানের মাত্রাটা এত বেশি হয়ে গিয়েছিল সেসময়ে আমার যে, নীরব যন্ত্রণায় নীল হতে হতে এক সময় আমি অসুস্থও হয়ে পড়ি। আমার অবস্থাটা বহুদিন গেছে শাঁখের করাতের মতো। জীবনের শেষ প্রান্তের এক ধরনের ক্ষয়িষ্ণু উদাসীন নিরাসক্তি এবং অতিমাত্রিক শিশুর সারল্যে নির্বাসিত তাঁর মন, এসব বাহ্যিক জটিলতায় ডুবে গিয়ে জীবনের সর্বশেষ অমূল্য সময় আর সম্পর্কের মধুরতাটুকুকে অপচিত হতে দিতে চায়নি। ১৯.৬.৯৬ তারিখে ঢাকা পরিত্যাগের প্রাক্কালে আমার ডায়েরীর পাতায় তিনি লিখে রাখলেন, 'তুমি রক্তসম্পর্কের কন্যার মতোই অকৃত্রিম হার্দিক বন্ধনে বদ্ধ থাকবে আমার চোখে, বুকে, স্মরণে, স্মৃতিতে মনে-মননে মগজে। জেনো, তুমি আমার পরমাত্মীয়--আত্মার ও অস্তিত্বের অংশ, জাগ্রত জীবনের পুঁজি ও পাথেয়, বেঁচে থাকার শক্তি ও প্রেরণা, বল-ভরসার উৎস ও ভিত্তি। এ বিশ্বাস রেখো।'

তাঁর অন্তর আচ্ছন্ন করা একটা হতাশা পরিলক্ষিত হচ্ছিল '৯৭-এর গোড়ার দিক থেকেই। ৭৬-ঊর্ধ্ব বয়সের, হৃদরোগে ও মধুমেহরোগে আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত একজন তরুণ এবং মননশীল-স্রষ্টা-গবেষক উদার মানবতাবাদী বিজ্ঞানমনস্ক পণ্ডিত আর

আক্ষরিক অর্থেই সেক্যুলারিজম প্রতিষ্ঠায় অদম্য আগ্রহী এই মানুষটিকে আরো কিছুকাল বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে খুব বেশি করে প্রয়োজন ছিল তাঁর 'প্রাণিত-বিন্দু'টিকে আহত না করা, অন্তরের আনন্দের পাত্রটিকে কানায় কানায় পূর্ণ রাখা। এই মনস্তাত্ত্বিক সত্যটিই উপেক্ষিত হল বহুভাবে কারো কারো দ্বারা, মনের অজান্তেই। আমার শারীরিক উপস্থিতি ও নিরন্তর পত্রালাপ, জানি, তাঁকে শারীরিক দৌর্বল্য ভুলিয়ে হৃদয়ের রক্তে বারিসিঞ্চনে সহায়তা করতো : 'উৎকণ্ঠার সঙ্গে আমি প্রতীক্ষায় থাকি তোমার পত্রের' [৯.১.৯৭]। কিন্তু শেষ দিকে তাও যেন আর সম্ভব হচ্ছিল না। আড়াই মাসের মধ্যেও একটা পত্র না পেয়ে তীব্র অথচ সংযত অভিমানে তিনি লিখেছেন ২৪.১.৯৭ তারিখের পত্রে : 'মনে হচ্ছে তুমি অতিব্যস্ত মানুষ অথবা আমাকে ভুলতে চেষ্টা করছ।... ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা-কোলকাতা বাস চালু হলে স্বল্প ব্যয়ে আসতে পার, অবশ্য যদি আমাকে দেখার আগ্রহ থাকে।... পুনঃ যেহেতু পত্র হচ্ছে চিত্তদূত, চিন্তা-চেতনার বাহন, মানস সেতু, পরোক্ষকে প্রত্যক্ষ করার অবলম্বন, সেহেতু সময় করে চিঠি লেখা চালু রেখো, যদি ইচ্ছে হয়।... তুমি আমার চোখের আড়ালে আছ বটে তবে মনের আড়ালে নয়।' এমনই ছিল তাঁর অভিমানের ধরন, আমি তাঁকে কি করে বোঝাই, আমার সব বিরূপ আচরণই অনিচ্ছাকৃত। এতএব তাঁর ভ্রান্ত অভিমান নিরসনার্থেই ফের ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় গেলাম (১১-২৩ ফেব্রুয়ারি) তাঁর জন্মদিন অনুষ্ঠানটি আনন্দের মাধুর্যে ভরিয়ে দিতে। সেখানেও ছন্দপতন ঘটলো।

তিনি অবশ্য পুরনো কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন 'তুমি তো জন্মেছই দেয়ার জন্যে, পাওয়ার জন্যে তো নয়।' আজিজ মেহেরের একটি কথা মনে পড়ে, 'ভালবাসা—দেয়, কিছু প্রত্যাশা করে না।' ২৩ ফেব্রুয়ারি ('৯৭) কোলকাতায় ফিরে আসার পর তাঁর ২৫ ফেব্রুয়ারি লেখা চিঠিতে তিনি আমার অভিমানের অবসান কল্পে কিছু নিদান দিলেন : 'তোমার এবারকার বিদায় আমার বেশি বেদনা জাগিয়েছে। তার কারণ তোমার দেহ-মনের অসুস্থতা ও অশান্তির আভাস আমাকে গাঢ়-গভীরভাবে আহত করেছে।... মনে রেখো জীবন একটা বৃক্ষ। জীবনবৃক্ষে ফুল-ফল-ফসল ধরাতে হয় সতর্ক সযত্ন প্রয়াসে। .... জীবনে আনন্দের আয়োজন থাকা চাই, থাকা চাই বিনোদন। ভাববার চেষ্টা কর, আমি আছি, বিশ্ব আছে, রক্তে রক্তে জীবন নাচে—মৃত্যু কোথাও নেই'। তাহলেই নিত্যকার জীবন রূপ-রস কর্মময় হয়ে উঠবে। ... সব ব্যাধি উবে যাবে।'

কিন্তু বাস্তবে '৯৭ থেকে তাঁর শরীর ভেতরে ভেতরে ক্রমশ ভাঙতে শুরু করে। মনও। শরীর ভাঙলে তবু চোখে পড়ে, মন ভাঙলে? মনের খবর কে রাখে! জানুয়ারি থেকে প্রায় প্রতিটি চিঠিতেই থাকতো অসুস্থতার কথা। অসহায়তা ক্রমশ ঘিরে ফেলে তাঁকে। এদিকে নানা জটিলতায় আমিও অসুস্থ-অস্থির-মূক। ফলে যন্ত্রণা বেড়েই চলে, তার ছায়া ফেলে শরীরে ও মনে। ৯.১.৯৭ তারিখে লিখেছেন 'আমার শরীর দুর্বলতর হয়ে যাচ্ছে।... কেবলি ঘুম পায়।' ৭.৫.৯৭ [তার ডি. লিট. (সাম্মানিক) প্রাপ্তির তারিখ এটি] তারিখে লিখেছেন : 'আমি চিঠি লিখেই চলেছি, পাচ্ছো কি না জানি না।... এত কাছে তবু মেরুর ব্যবধান। ডাকের পথ দুর্গম-দুর্লঙ্ঘ্য যেন। কেউ মাথা ঘামায় না।... তোমাকে মনে পড়ে, মনও পোড়ে, মনে মমতাজাত দূরত্বের বেদনাও জাগে, দেখার ইচ্ছে হয়। কোলকাতা যাওয়ার স্বপ্ন আজও রয়েছে অটুট। তবু কোনো সাধ পূর্ণ হয়

না। আমি দিন দিন হীনবল হচ্ছি, বুঝতে পারি ...।' ২.৭.৯৭ তারিখে লিখেছেন : 'নিয়মিত তোমাকে আমার অঙ্গীকার মতো লিখে যাচ্ছি, ...। আমার শক্তি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে, হারাচ্ছি স্মরণশক্তি...। তবু লিখছি, প্রাণের পরিচর্যার প্রয়োজনে। ঢাকা-কোলকাতা বাস চালু হলে একবার অন্তত এসে দেখে যেয়ো এখানকার তিক্ততার লাঞ্ছিত স্মৃতি থাকা সত্ত্বেও। নিত্য তোমায় স্মরণ করি। ভুলতে কি পারি?' ২১.৭.৯৭ তারিখে লিখেছেন : '... স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি' বটে তবু চোখে দেখার সাধ থেকেই যায়।' ৪.৯.৯৭ তারিখে লিখেছেন হতাশার বাণী : 'গত সপ্তাহে তোমাকে চিঠি লেখা হয়নি। ... আমার শরীর দিন দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। খাদ্যে রুচি কমে গেছে, ঔষধ সেবনে কি হয়? তোমাকে দেখার প্রতীক্ষায় দিন গুনছি। মানুষ তো আশাকে ও আশ্বাসকে পুঁজি-পাথেয় করেই বাঁচে। বার্ধক্যে মানুষের চাওয়া-পাওয়ার, দেয়া-নেয়ার কিছু কৃচিৎ থাকে। তাই বৃদ্ধের জীবন হয় নিরানন্দ-একঘেয়ে, দিন যাপনের গ্লানিবহুল। এ অবস্থায় স্নেহ-মমতা-ভালোবাসাই জীবন-রস যোগায়। তুমি আসবে—এ আশা ও আশ্বাস তাই বাঁচার আগ্রহ ও জীবনীশক্তি যোগায়। ভালো থেকো তুমি, ভালোবাসি।'

১৯৯৭-এর ২২ সেপ্টেম্বর আমার জন্মদাতা পিতার জীবনাবসান হল, তিনি বয়সে আহমদ শরীফের চেয়ে সাড়ে ছ'বছরের ছোট ছিলেন। হয়তো পিতৃশোক ভোলাবার চেষ্টায়, তিনি টেলিফোন করলেন, ঢাকায় চলে আসবার জন্যে। কারণ তিনিই জানতেন একমাত্র কন্যাসন্তান রূপে আমি আমার বাবার কতটা আদরের ছিলাম। বাবার, মৃত্যুশোকের ভয়াবহ শূন্যতা প্রশমিত হবার আগেই কেন জানি না, আর একজনের জন্যে এক অশুভ চিন্তায়-আশঙ্কায়-উদ্বেগে আমার বুক কেঁপে উঠলো। আমার দুশ্চিন্তার শরিক হলেন আমার মা। বললেন : তুমি তো এখনো পিতৃহারা হওনি, শোক বুকে চেপে, আগে তাঁকে একবার দেখে এসো।' বাবার মৃত্যুর মাত্র পঁচিশ দিন পরে ১৭ অক্টোবর, '৯৭, আর এক বাবাকে সুস্থ দেখার উদগ্র বাসনায় ঢাকায় ছুটে গেলাম। যিনি ডাকলেন, কেবল তিনি বুঝলেন কি 'মর্মপীড়া মর্মমাঝারে' বহন করে আমি এসেছি। তিনি যথাসাধ্য আমার সঙ্গদিলেন কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে, যদিও আমার ডান হাতখানা আর্থরাইটিসের ব্যথায় তখন যথেষ্টই কাতর। ৫ নভেম্বর আমার ভিসা শেষ, ৭ নভেম্বর আহমদ শরীফের দাম্পত্যের পঞ্চাশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান। অনুরোধক্রমেই এক সপ্তাহ ভিসা বাড়ানো হল।

ব্রাসোতে খোদাই করে বাঁধিয়ে যে কথা কয়টি সেদিন তাঁদেরকে স্মারক উপহাররূপে তুলে দিলাম : 'বাবা [অধ্যাপক ড. আহমদ শরীফ/ও/মায়ের (শ্রীমতী সালেহা শরীফ)/দাম্পত্যের/অর্ধশতবর্ষ পূর্তিতে/স্মারক প্রতীকে/রেখাঙ্কিত থাক/প্রথমার বিনম্র প্রণাম-৭.৯.৯৭'-আহমদ শরীফের বিবেচনায়-ঘোষণায়, এটিই উৎসবের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার।

কোলকাতায় ফিরে আসার প্রাক্কালে, তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরীর পাতায় 'বুদ্বুদ' শিরোনামে তাঁর উপলব্ধ অনুভূতি ছিল : 'প্রথমা আগামীকাল সকালে চলে যাবে। তাই আজ থেকেই কন্যা বিচ্ছেদের অনুভূতি প্রাণে ক্ষণে ক্ষণে বেজে উঠছে। সে প্রতিবার আমাকে দেখতে আসে... তার দুঃখ গভীর, বেদনা অশেষ এবং অভিমান হিমালয় প্রমাণ। তবু সে আসে...। প্রতিবারই সে যেন আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে যায়। তার এ দশা দেখা-শোনা আমার পক্ষে মর্মান্তিক, কেননা প্রতিকারের শক্তি আমার নেই'

[৮.১১.৯৭]। হৃদয়ের কন্দর থেকে দেখা এই মর্মান্তিক বাস্তবতাকে তিনি দেখেছেন যেন এক নিস্পৃহ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে ২১.১১.৯৭ তারিখে লেখা চিঠিতে : 'তুমি ২১/২২ দিন থেকে গেলে, তার মধ্যে আনন্দ-বেদনা...দুঃখ-যন্ত্রণা...প্রত্যাশা পূর্তি-অপূর্তি প্রভৃতি সব কিছুরই অভিজ্ঞতা-অনুভব-উপলব্ধির বিচিত্র স্বাদ পেয়েছ। একে লাভ বললে লাভ, আবার ক্ষতি বললে ক্ষতিই মনে করতে পারো। বিশেষ করে দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে আমার অসামর্থ্য মাঝে মাঝে তোমার কাছে এবার ক্ষমারও অযোগ্য মনে হয়েছে নিশ্চয়ই। স্বপ্ন ও সাধ, সাধ্যের বাইরে হলে অপূর্ণই থেকে যায়। কবে, কার জীবন সাফল্যে টইটম্বুর হয়েছে? ব্যর্থতার গ্লানি, অপূর্ণতার দৈন্য, অসাফল্যের ক্ষোভ কার নেই, কার ছিল না, কোথায় কবে!'

সে'বার যাতায়াত করেছিলাম বাসে; ঢাকা ছেড়ে এলাম ৯ নভেম্বর, ১৯৯৭ এর ভোরের আলোয়। প্রতিবারের মতো এবারও যথারীতি খুব ভোরে উঠে, আমার আহার্যের তদারকি করে, তৈরি হয়ে তিনি অপেক্ষা করছেন। জীবদ্দশায়, ঐ দিনই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। আমার আর্থরাইটিসের ব্যথা উপশমের বৃথা চেষ্টায় ডান হাতের হাড় সংযোগ স্থানসমূহে পরম মমতায় ম্যাসাজ করে দিলেন। তিনি কলাবাগানে সোহাগ-এর ওয়েটিং রুমে বসে। তাঁর সেই স্নেহসিক্ত শেষ মরমী স্পর্শ আমি আজো আঁখি পল্লব মুদে অনুভব করি।

১৯৯৮-এর ১০ জানুয়ারিতে লেখা তাঁর চিঠি বয়ে আনলো কাজলভাবী—সেই সঙ্গে কিছু গার্হস্থ্য জিনিসসহ এক অমূল্য প্রামাণ্য উপহার। কেবল এই নারীই বোধ হয় নিজের দুর্বলতা দিয়ে বুঝেছিল অন্যের ভালোবাসার মূল্য ও মহিমা। ওরা যখন আমার 'ভাঙা ঘরে' আমি তখন ত্রিপুরা সরকারের নিমন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় অতিথি হয়ে ভাষণ দিতে গেছি ত্রিপুরার রবীন্দ্রভবনে। ওখান থেকেই অধ্যাপক ড. নারায়ণ বিশ্বাসের হাতে [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান] দিয়ে দিলাম চিঠি আর আমার একটি দীর্ঘ স্মারক বক্তৃতার মুদ্রিত পুস্তিকা যথাব্যক্তির কাছে (আঃ শঃ) পৌঁছোবেন জেনেই; একই সময়ে পেলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণার প্রাথমিক নিমন্ত্রণও। কোলকাতায় ফিরে কাজলের কাছ থেকে পেলাম তাঁর ১০.১.৯৮ এর লেখা চিঠি; তাতেও প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ক্রমবর্ধমান শরীর দৌর্বল্যের কথা : 'আমার শরীর দুর্বল। এ সপ্তাহে একদিনও হাঁটতে বের হইনি শীতের ভয়ে।... আমার স্মৃতিশক্তি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। লেখায় প্রায়ই বাক্য অশুদ্ধ হয়, বানানে ভুল দেখা যায়। কাজেই আমার যে তোমার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তা পালন করা ন্যূনতম মাত্রায়ও ক্রমে অসম্ভব হয়ে উঠবে। এ-ই বয়োধর্ম। এ-ই জীবনাচারের পরিণতি। নিয়তি অমোঘ। তাকে অস্বীকার করার সাধ্য কার, উপায়ই বা কি? ... আজো হয়তো তুমি ত্রিপুরায় ঘুরে বেড়াচ্ছ। তোমার এ সামাজিক-রাষ্ট্রিক-সাহিত্যিক স্বীকৃতিতে আমি আনন্দিত ও গর্বিত; এ সম্মান সবার সব সময় মেলে না।... আমার অসামর্থ্যের কথা কিছুই তোমার অজানা নয়। মুসা সাহেব তোমার শারীরিক ও মানসিক করুণ অবস্থার কথা আমাকে জানিয়েছেন। তোমার জন্যে অন্তরের রূপ-স্বরূপ অভিন্ন রয়েইছে, রবে চিরকাল।' ১.২.৯৮ তারিখের চিঠিতেও শারীর সংকট ঢাকা পড়েনি, আমার সাফল্যে তাঁর গর্বিত উচ্ছ্বাস ও অসুস্থতায় উদ্বেগ প্রকাশ সত্ত্বেও : '...কয়েক ঘণ্টা লাগাতার চেয়ারে বসে থাকলে পায়ে 'রস' আসে, পায়ের পাতা ফুলে যায়; একা প্রুফ দেখি...।

তুমি ত্রিপুরা জয় করে ফিরেছ, সবার প্রশংসা পেয়েছ—সংস্কৃতের অধ্যাপক নারয়ণ বিশ্বাসের মুখে সব শুনে এবং মানশ্চক্ষে তা দেখে ও অনুভব করে গর্ববোধ করছি। এমনি জীবনে শতবার শত প্রশংসা পাবে। তুমি জান, বোঝ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে সমর্থ, আমার বিদুষী কন্যা তুমি, কাজেই তোমায় ঠেকাবে কে!... কাজলরা তোমায় অসুস্থ দেখে এসেছেন। বহুকাল থেকে তোমাকে দিব্যি দিয়ে বলছি, তুমি ভালো চিকিৎসকের পরামর্শ মতো চলো, চিকিৎসায় অবহেলা করো না...।'

আমার ছেলে সেতুর ফুসফুস আক্রান্ত হওয়ার খবর শুনে ১৯.২.৯৮ তারিখসহ আরো কয়েকটি পত্র মাধ্যমে তিনি অসহায় অস্থিরতায় উদ্বেগে ছটফট করেছেন, এ সময়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াতে না পারার জন্যে নিজেকে অপরাধী মনে করেছেন, বিবেকের দংশন অনুভব করেছেন—তবে যতটা চিন্তিত হয়েছেন দৌহিত্রের জন্যে, তার চেয়ে বেশি আমার ভগ্নস্বাস্থ্যের, ছেলের কারণে আরো অবনতি ঘটার আতঙ্কে, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণার (ঢাঃ বিঃ) সেমিনারে আমার যোগ দিতে না পারার আশঙ্কায়। অথচ তাঁর নিজের দৈহিক অবনতি ঘটছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে গাণিতিক হারে। হায়রে দুর্বল হৃদয়। সন্তানের স্বাস্থ্য চিন্তায় এত উৎকণ্ঠা ক'জন বাবা এভাবে এত গভীর তাৎপর্যে বহন করেন। ২৭.৩.৯৮ তারিখের চিঠিতে আবার প্রকাশ পেয়েছে তাঁর শারীরিক অবক্ষয়ের কথা : 'আমার দিন এক প্রকার কাটছে। শরীরে শক্তি কমছে, মস্তিষ্ক এখন ধারণ শক্তি দ্রুত হারাচ্ছে। কিছু পড়ে মনে রাখা যায় না। দু'ঘণ্টার মধ্যেই ভুলে যাই। চিঠি না পেলেও একথাটি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে মনে রাখবে আমি তোমাকে ভুলতে পারি না, পারব না।... আমি যে তোমাদের দুর্দিনেও কোলকাতায় যেতে পারি না সেজন্যে সদা মর্মপীড়াগ্রস্ত। দুটো বই বেরিয়েছে ..।' ২৩.৫.৯৮ তারিখের লেখা পত্রে বেদনাবোধ-শারীরিক অবনতিজনিত অবসাদ, হতাশা ও অভিমান আরো গভীর : 'আমার শরীর ভালো নয়। হাঁটতে কষ্ট হয়। গতি এখন নিতান্ত ধীর এবং হাঁটি মাত্র আধঘণ্টার বেশি। পড়তেও পারি না লাগাতার এক ঘণ্টা, লিখতেও কষ্ট হয়। তাছাড়া স্মৃতিশক্তি দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দিন তবু কাটছে কোন মতে। উত্তর না পেলে আর লিখবো না, এটাই শেষ পত্র হবে সে ক্ষেত্রে।' এ চিঠিটি তিনি অসুস্থ শরীরে ঢাকার একটি হোটেলে গিয়ে ড. ক্ষেত্র গুপ্তর হাতে দিয়ে এসেছিলেন। ২০.৬.৯৮ তারিখের লেখা চিঠিটিও হতাশায় ভরা এবং কন্যাদর্শনের আকুতিতে স্নাত : 'আমার জীবনদীপ নেভার মুখে বলেই অনুভব করছি। হাঁটতে কষ্ট হয়, অতিধীরে হাঁটলেও বুকে ব্যথা জাগে, পায়েও থাকে শক্তিহীনতা। মনে হয় মাসখানেকও চলতে পারব না। আর একবার ডাক্তারের কাছে যাব কোন চিকিৎসা নেই জেনেও, আগামী সপ্তাহে।

কয়েকদিন আগে তোমার সঙ্গে স্বপ্নে সাক্ষাৎ হয়েছিল আমার—তোমারই কলেজে যাওয়ার পথে। তোমার ব্যস্ততা ছিল, 'ভালো আছি, পরে বাড়িতে দেখা হবে' বলেই তুমি চলে গেলে।' এই স্বপ্নই আমাকে জানিয়ে দিল, তুমি আমার উপর চটে আছ।' কিংবা পত্রের শেষাংশে : 'আমার অপরাধ একটাই আমি কোলকাতা যেতে পারি না কথা দিয়েও। তোমাদের সঙ্গে প্রীতি ভালোবাসার সম্পর্ক কি ভোলা যায়, না ভোলা যাবে। তুমি তো মনে-মর্মে-চোখে ঠাঁই করে নিয়েছো, কথায় বলে জন্মের চেয়ে ধর্মের তথা আত্মিক সম্পর্ক বড়। তাতে আবেগ বেশি, বন্ধন চেতনা অবিমোচ্য থাকে। তুমি 'বাবা'

বানিয়েছিলে, আমিও তোমাকে কন্যারূপে বরণ করেছিলাম মনে প্রাণে স্বাভাবিকভাবে এবং সামাজিকভাবে। তোমার অভিমানের প্রতিকারের সাধ্য আমার নেই, ক্ষমা চাওয়া ছাড়া আমার অন্য কোন উপায় নেই। ... শিগগির আমার জীবনাবসানের সংবাদ শোনার আশঙ্কা রইল কিন্তু।' এ চিঠি পাওয়ার পর মনের ভার নামাতে চেষ্টা করেছিলাম একটা দীর্ঘ চিঠি লিখে। তার জবাবে তিনি ১৮.৮.৯৮ তারিখে লিখলেন : 'তোমার ক্ষোভ-অভিমান ও বেদনামাখা দীর্ঘ পত্র পেলাম এবং তোমার প্রাণের কথা মনের কথা জানলাম। শুধু বলি তোমার যখন খুশি আসবে, যেমন খুশি থাকবে। তার জন্যে কারো অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। ভুলে যেও না যে এটা তোমারও বাপের বাড়ি।' যেতে তো চেয়েইছে সর্বক্ষণ আমার স্নেহবুভুক্ষু মন, কিন্তু পরমুহূর্তেই স্মৃতিতে জেগেছে অভিমান, কিছু অতীত আর সংকুচিত হয়ে গেছে হৃদয়ের উন্মুক্ত জানালা। ২৬.৯.৯৮ তারিখের চিঠিতে দৈহিক অবনতির খবর আরো স্পষ্ট : 'তুমি কি পুজোর ছুটিতে আসবে? ... তোমার নতুন বাড়ি কি এখনও পড়ে রয়েছে?.... আমার দৈহিক শক্তি অনেক হ্রাস পেয়েছে। এখন হেঁটে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে যেতে পারি না। বুকে আর্টারিগুলোতে Cold বাড়ছে। নিত্য তোমায় স্মরণ করি। আমার বইগুলো এখনও পাঠাতে পারলাম না। তিনটে প্রবন্ধ সংকলনের পাণ্ডুলিপি তৈরি, প্রকাশক মিলবে না আকালের কারণে...।' যোগাযোগ বাহ্যত প্রায় বিচ্ছিন্ন করলেও আমি নিয়মিত খোঁজ নিয়েছি যাদের কাছে, যাদের মাধ্যমে–তারা কেউ আমাকে ঠিক খবর দেয়নি, সবাই একবাক্যে জানিয়েছেন-'উনি/স্যার ভালো আছেন'। আমার কেনইবা এমন দুর্মতি হলো? কেনই বা ভাবলাম, আমাকে কাছে পাওয়ার জন্যে বেশি করে তিনি অসুস্থতার খবর লিখছেন; কেনইবা খবরের জন্যে অন্যের মুখে ঝাল খেতে গেলাম; যিনি আমায় 'আত্মার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ' ভাবতেন তাঁর আত্মার রোদন ধ্বনি কেন আমি শুনতে পেলাম না বার বার সাঙ্কেতিক স্বপ্নে দেখা সত্ত্বেও। কেন ঠুনকো অভিমান অমন আকাশচুম্বী হল আমার? ২৬.৯.৯৮ তারিখে শুধু আমাকেই নয়, তাঁর বাল্যবন্ধু শ্রী অমরেন্দ্র মজুমদারকেও ঐ একই তারিখে জানিয়েছেন আসন্ন মৃত্যুর পূর্বাভাস : 'দেহাবসানের জন্যে জরা-জীর্ণতা থেকে মুক্তি পায় কেবল ভাগ্যবান, আকস্মিক মৃত্যুতে, সে ভাগ্য সবার হয় না।' তাঁর কথানুযায়ী ভাগ্যবানের ন্যায় আকস্মিক পরিণতিই ঘটেছে তাঁর।

অবশেষে মনোস্থির করেই ফেললাম, মার্চ মাসে ছেলের মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়ে গেলে মে-জুনের গরমের ছুটিতেই আসছি বলে পত্র মাধ্যমে এবং বিশ্বস্ত লোকমুখে জানিয়ে দিলাম। ছাই লোকমুখের বিশ্বাস। তৃতীয় ব্যক্তির প্রতি নির্ভরতার মতো চরম বোকামি বোধ হয় আর কিছুতে নেই। নইলে, যাকে টেলিফোনে বলেছিলাম ৭৮টি গোলাপ জন্মদিনের [১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯] সকালে পৌঁছোতে তিনি কি তা পৌঁছিয়ে ছিলেন? তাহলে আহমদ শরীফের শেষ চিঠিটিতে অবশ্যই এর উল্লেখ থাকতো। আমি তো ঢাকার বিশ্বস্ত লোকদের কাছ থেকে মৃত্যুর দশদিন আগে পর্যন্ত শুনে এসেছি : 'তিনি ভালো আছেন'।

'৯৯ এর ৩/৪ ফেব্রুয়ারি কোলকাতায় বইমেলায় গিয়ে বিদ্যাপ্রকাশের মালিক খোকা সাহেবের হাতে তুলে দিলাম কার্ড ও চিঠিসহ একটি পাঞ্জাবির প্যাকেট, ১৩ ফেব্রুয়ারির আগেই পৌঁছোবার জন্যে।

১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯ তারিখে, মৃত্যুর মাত্র ৯ দিন আগে সেই প্যাকেটের প্রাপ্তি সংবাদ জানিয়ে লিখেছেন তাঁর জীবনের সর্বশেষ চিঠি : 'তোমার পাঠানো পাঞ্জাবি পরেছি জন্মদিনে। তোমার প্রতীক্ষায় থাকবো মে-জুন মাসে, যদি ততদিন বাঁচি। আমার আজঅবধি চারটে বই-ই বেরিয়েছে। পাঠানোর লোক মেলেনি। তুমি এলে পাবে। ... তিনটে সংকলন তৈরি...। এখান থেকে *বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য ১ম খণ্ড* বেরিয়েছে ...। আমার প্রীতি-স্নেহ-ভালোবাসা রইল সেতুর, চিত্তর ও তোমার জন্যে। চিত্ত কি কোলকাতায় চাকরি পেল?' এ চিঠি যখন এসে পৌঁছলো তখন তিনি লাশ হয়ে বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যবহারিক উপকরণরূপে টেবিলে শুয়ে আছেন। বইগুলো তিনি প্রথমার জন্যে আলমারিতে সাজিয়ে রেখে গিয়েছিলেন স্বপনকে জানিয়ে। *বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য ১ম খণ্ডের* পুনর্মুদ্রণের [জানুয়ারি, ১৯৯৯] গ্রন্থস্বত্বও তিনি আমায় দিয়ে গেছেন তাঁর শেষ 'সাহিত্য-বন্ধন' স্মারক হিসেবে। এটিও সাজানো ছিল আমাকে চমকে দেবার জন্যে। কন্যা আসবে বলে এ ছিল তাঁর একান্ত নিজস্ব আয়োজন।

২৩ ফেব্রুয়ারি, রাত সাড়ে তিনটায় কাজলভাবীর ফোন পেয়ে পরদিন সকালে আমি ছুটে গেলাম ছেলের পরীক্ষা ফেলে রেখেই, তাঁর নিথর দেহের পাশে। কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। সব মান-অভিমানের উর্ধ্বে তিনি আজ। তাই অপরাধবোধের যন্ত্রণায় আজ শুধু নিষ্ফল মাথা কোটা। তিনি বলতেন : 'আমাকে অসহায় জেনেও এত বকো, এত কষ্ট দাও! আমার মৃত্যুর পর দেখবে কি কষ্টই না পাও তুমি। তখন তো একা একা লুকিয়ে কাঁদবে।' ত্রিকালদর্শীর মতো এত বড় সত্য উচ্চারণটি তিনি কি করে করেছিলেন সেদিন? পর্বত তুল্য ভারী এ মৃত্যুশোকের প্রদাহ কি তবে তিনি আগেই অনুভব করতে পেরেছিলেন?

আজ মনে হয়, কন্যার প্রতি বৈষয়িক দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত এক আর্থিক জটিলতা ও ভুল বোঝাবুঝি, তাঁর প্রতি আমাকে করে তুলেছিল তীব্র অভিমানিনী। আসলে আশৈশব যথাসাধ্য সততায় ও স্বাবলম্বনে তেজি তাঁর এই মেয়েটি চায়নি তুচ্ছ-স্থূল একটি কারণে মনের স্বাধীনতা খর্ব হোক—চায়নি দ্বিতীয় প্রজন্মের ক্রমাগত দুরপনেয় কটাক্ষের শিকার হতে। কিন্তু আমার উপর্যুপরি পীড়াপীড়িও তাঁকে বিচলিত করেনি বরং কন্যাকৃত্যের সিদ্ধান্তে তিনি অন্তিম দিন অবধি থেকেছেন অনড়। এ ঘটনা শাঁখের করাতের মতো দ্বিবিধ মানসিক যন্ত্রণায় আমাকে জর্জরিত করছিল। আমার অভিমানাহত ক্ষুদ্র হৃদয়, তাঁর হৃদয়ের ব্যাপ্তি ও বিশালতার গুরুত্ব না বুঝে উপহারকে ঋণ ভেবে একাদিক্রমে তাঁকে বিরক্ত করেছে, কমেছে পত্রালাপ। তিনি তাঁর পিতৃত্বের উঁচু মাথাটি অব্যাহত রেখেই চলে গেলেন আমাকে সম্পূর্ণ বোকা বানিয়ে। এবিষয়ে অবহিত সুভাষ ভট্টাচার্য একাধিক বার ফোনে বুঝিয়েছেন আমাকে।

কিন্তু তখন ভুলেও একবার মনে হয়নি, নীরব ব্যথায় জর্জরিত এ মানুষটি এমন করে আমার দু'গালে কষে চড় মেরে আক্ষরিক অর্থেই আমাকে কাঙাল করে, নিজে ভারমুক্ত হবেন এভাবে।

'আত্মায়' কিংবা 'পরলোকে' আমার আস্থা ও বিশ্বাস থাকলে আজ বড় শান্তি পেতাম। এভাবে বিবেক-দংশনে জীর্ণ-বিবর্ণ-বিধ্বস্ত হতে হত না আমায়। মনের গহনে

লুকনো বেদনার কি কোন ভাষা আছে? ছিল কখনো? তাহলে তাঁর চলে যাওয়ার ন'মাস পরেও লিখতে গিয়ে কেন হৃদয়ের রক্ত ঝরে? আজো কেন তাঁর বহু প্রার্থিত 'স্মরণে রেখো' শব্দ দুটি ভারি হয়ে মস্তিষ্ককোষে আঘাত হানে; স্মরণীয় করে রাখার উপায় খোঁজে অবিরত?

এখন আর কেউ দিব্যি করে আমাকে বলবে না 'তোমাকে তিন সত্যি করে কথা দিচ্ছি আমি বাঁচবো' [৯.৮.৯২]; কেউ বলবে না, চোখের অপারেশনটা না করালে যে তোমায় ভালো করে দেখতে পেতাম না, আমার উচ্চ রক্ত চাপ এখন আর কাউকে প্রাত্যহিক উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় দুশ্চিন্তায় রাখবে না; ২৫/বি ধানমণ্ডির বাড়ি থেকে জন্মদিনের আশীর্বাণী বহনসহ কোনো চিঠিই আর আসে না, নিত্য অভ্যাসের দোষে চিঠির বাক্স হাতড়ালেও; কোলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে বিবিধ কাজে ছুটিয়ে কেউ আর আজ আমায় ক্লান্ত করায় না।

শুধু একটিবার মাত্র দর্শনাকঙ্ক্ষায় যিনি আসন্ন মৃত্যুর নিশ্চিত পদধ্বনির বার্তা শোনাতে অবিশ্বাস্য রকমের সরব হয়েছিলেন চিঠির পর চিঠিতে, তাঁকে মে-জুনে আসছি বলে কথা দিলেও তাঁর সঙ্গে বহু বাঞ্ছিত বহু প্রতীক্ষিত শেষ সাক্ষাৎ আমার হলো না; শোনা হলো না তাঁর অন্তরের গহনে গভীরে গুমরে মরা সর্বশেষ কথাগুলো।

স্মৃতিভারে আমার এ যন্ত্রণাহত বিবেক আমি রাখবো কোথায়! এ আধির মুক্তি নেই।

নৈর্ব্যক্তিক

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের উত্তরাধিকারী অধ্যাপক আহমদ শরীফ

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

বিভিন্ন রাজ্য, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বিভিন্ন ঐতিহাসিক পরাক্রমের কারণে কখনো একসূত্রে মিলিত হতে বাধ্য হয়, কখনো ছিন্নসূত্র হয়ে নিজস্ব বলয় তৈরি করে অথবা ফিরে যায়। পৃথিবীর তাবৎ ইতিহাসের মতো ভারতবর্ষ নামক উপমহাদেশের ইতিহাসও তার থেকে পৃথক নয়। এটা ইতিহাসের সত্য। এটা মানবিক সবলতা, দুর্বলতার মর্মকথা। ভারতের ইতিহাস যখন ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রবল পরাক্রমের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য খণ্ড ও বৃহৎ, সশস্ত্র ও নিরস্ত্র সংগ্রামে রত এবং যখন অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল আবেগ আসমুদ্র হিমাচলকে উদ্বোধিত করে তুলেছে তেমনি সময়ে এ উপমহাদেশের প্রায় প্রান্তভূমি চট্টগ্রামের পটিয়া অঞ্চলের সূচক্রদন্ডী নামক এক প্রায় নিভৃত অথচ সংস্কৃতি সমৃদ্ধ গ্রামে জন্ম নিলেন আহমদ শরীফ।

আহমদ শরীফের পিতৃব্য আবদুল করিম ছিলেন কখনো সাধারণ করণিক, কখনো বা শিক্ষক। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও আধুনিক প্রেক্ষিতে নগণ্য। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মানুষকে জ্ঞান ও চৈতন্যের আধারে রূপান্তরিত করবে এমন আশা প্রায়শ দুর্লভ। পরিপার্শ্ব অথবা মগ্নচৈতন্য থেকে উঠে আসা যে তৎপরতা মানুষকে সংস্কৃতি চর্চায়, মানব-হিতৈষণায় উদ্বুদ্ধ করে সেই চৈতন্যের অধিকারী ছিলেন এই আপাতদৃষ্টিতে ও বৈষয়িক মানদণ্ডে পদাধিকারবিহীন ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চার যে দুর্লভ ও দুর্দান্ত স্পৃহা তা তাঁকে বাংলার শিক্ষা, জ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চার জগতে এক অনন্য মানসের অধিকারী করে। প্রতিষ্ঠানসমূহও তাঁকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দিতে এগিয়ে আসে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁকে যে সাহিত্য বিশারদ অভিধায় ভূষিত করা হয়েছিল তা তাঁর পরিবার প্রদত্ত নামকে ছাড়িয়ে বিশ্বজনীন হয়ে পড়ে। ৮২ বৎসর বয়সে মৃত্যুর প্রাক্কালে কুমিল্লা সংস্কৃতি সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণে তিনি আজন্ম লালিত উদার, অসাম্প্রদায়িক, মানববাদী ও প্রগতিশীল চিন্তাচেতনার যে আহ্বান জানান তা তৎকালীন পূর্ববঙ্গবাসীর জন্য দিক নির্দেশনা হয়ে দাঁড়ায়।

এমনি প্রেক্ষিতে, এমনই পিতৃব্যের অভিভাবকত্বে লালিত শিশু-কিশোর-তরুণটিই ভবিষ্যতে স্বীয় নামকে নিজস্ব অধিকারে বাংলার মানসে প্রতিষ্ঠিত করেন। সাহিত্য

বিশারদের উদার, অসাম্প্রদায়িক, মানববাদী ও প্রগতিশীল চিন্তাচেতনাকে সমৃদ্ধ করে আহমদ শরীফ আজীবন হিতবাদী ও সর্বপ্লাবী কল্যাণমুখী বিশ্বমানবতার মঙ্গল সৃষ্টির চৈতন্যে রূপান্তরের সাধনায় নিরত থাকেন। কখনো সরবতার প্রাবল্যে, কখনো নীরবতায় কখনো ক্ষুব্ধতায় তিনি প্রোজ্জ্বল।

আহমদ শরীফকে ছাত্র হিসেবে জ্যোতিষ্ক হয়তো বলা যাবে না, চাকরি জীবনেও তাঁকে চড়াই পেরোতে হয়েছে অজস্র। কিন্তু সাহিত্য বিশারদের যোগ্য উত্তরাধিকারীর মতোই তিনি অর্জুনের লক্ষ্যভেদ করার পথে ক্রমশ এগিয়েছিলেন। নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনের মাতামহ বিশ্বভারতীর প্রখ্যাত অধ্যাপক ক্ষিতি মোহন সেন শাস্ত্রী সাহিত্য বিশারদ সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'তিনি ব্যক্তি নহেন, তিনি একটি প্রতিষ্ঠান।' আহমদ শরীফের ছাত্ররা, তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী ও সঙ্গীরা তাঁকেও 'প্রতিষ্ঠান' বলেই অভিহিত করতে চেয়েছেন। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরে, বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানের ঘরে দুর্লভ বটে—এই দুই প্রজন্মের উত্তরাধিকার।

আহমদ শরীফের কৃতিত্ব এই যে তিনি হঠাৎ গজিয়ে ওঠেন নি। তিনি তাৎক্ষণিকতার রোমাঞ্চে ক্ষণকালের ছন্দে উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে যান নি। ক্ষণকালীন রোমাঞ্চ আমাদের জীবনচর্চাকে একটি প্রাজ্ঞ ও মননশীল রূপ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আহমদ শরীফ তাঁর পিতৃব্যের অর্জিত সম্পদকে আত্মস্থ করেছেন, বাংলার পুথি সাহিত্যের সাগরে অবগাহন করেছেন, তার মধ্যে যে অমূল্য রত্ন সাহিত্য বিশারদ আবিষ্কার করেছিলেন তাকে আরো নতুনতর বিশ্লেষণে অধিকার ও আবিষ্কার করেছেন। আধুনিক মানসে যাঁরা বসবাস করেন তাঁরা হয়তো সে রত্নকে সম্যক উপলব্ধিতে আনতে উদ্বুদ্ধ হননি। কিন্তু আহমদ শরীফ কেবল যে মধ্যযুগের পুথি সাহিত্য থেকেই তাঁর রত্নসম্ভার আহরণ করলেন তাই-ই নয়, তিনি মানব চৈতন্যের আধুনিক ও বিশ্বজনীন সত্য সন্ধানেও অনুরাগী হলেন। সমাজসত্তার গভীরে যে মানব ইতিহাসের রূপরেখা তাকে তিনি আত্মস্থ করলেন। সাধারণ সমাজতন্ত্রীর মতো করে হয়তো নয়। প্রাণের সঙ্গোপন অনুপ্রেরণায় বৈদগ্ধ্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করে তিনি মানবকল্যাণের প্রচেষ্টায়, অশুভের বিরুদ্ধে শুভের সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। তাঁর শুভের সংগ্রামের কাহিনী বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের ইতিহাসের অঙ্গাঙ্গী।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নজরুল চেয়ার'-এর অধিকারী ছিলেন—এগুলো তাঁর বেলায় কোনো গণ্য বিষয়ই নয়। তাঁকে তাঁর ছাত্র, সহকর্মী, সঙ্গীরা জেনেছেন প্রবাদপ্রতিম ড. স্যামুয়েল জনসনের মতো। জনসন যেমন লন্ডনের কাফেতে বসে আড্ডার মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেন তেমনি করেই আহমদ শরীফও তাঁর চৈতন্যকে বিশ্ববিদ্যালয় লাউঞ্জে, তাঁর বসবার ঘরে বা সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে মুক্ত আসরে উপস্থাপন করতেন। ইংল্যান্ডে ড. জনসনের বক্তব্যকে নিবিড় অনুগত্যে ধরে রাখবার জন্য একজন জেমস বসওয়েলের জন্ম হয়েছিল কিন্তু বাংলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য যে আহমদ শরীফ বা অন্যদের এমনি ধরনের চেতনাসঞ্চারী বক্তব্য ধরে রাখবার জন্য বাংলাদেশে অনুরাগীর একান্ত অভাব। আসলে আমরা বাঙালিরা যতটা সৃষ্টিশীল হতে উদগ্রীব ততটা কষ্টসহিষ্ণু হতে চাই না।

আহমদ শরীফ একজন সাহিত্যশিল্পী ছিলেন, পরবর্তীকালে ক্রমশ তিনি রাজনীতিমনস্ক হয়ে উঠেছিলেন। যে কোনো মানুষেরই—দার্শনিকের তো বটেই চিন্তা-চেতনাই তাঁর দার্শনিকতার অভিব্যক্তি। আহমদ শরীফের দৃষ্টিভঙ্গি বা মতাদর্শ তাঁর ব্যক্তিসত্তার বিকাশেরই ইতিবৃত্ত। সবাই যে আমরা তাঁর সাথে ঐকমত্য পোষণ করব এমন কখনো হতে পারে না। মতানৈক্যের মধ্যেই, চিন্তার বৈপরীত্যের মধ্যেই মানুষ বিকাশকে অব্যাহত রাখে। অবশ্য মানব-হিতৈষণা বিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডকে বৈপরীত্যের নামে গ্রহণ করা যায় না। যে কোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই তাই অশুভের বিরুদ্ধে, অমঙ্গলের বিরুদ্ধে, অকল্যাণের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে ওঠে। আহমদ শরীফ তাঁর জ্ঞান, বৈদগ্ধ্য ও প্রজ্ঞা দিয়ে তা উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হয়েছেন। মধ্যযুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে, সাহিত্য বিশারদের উত্তরাধিকার উপলব্ধি করতে গিয়ে তিনি ক্রমশ মানব ইতিহাসের মর্মে যে রহস্য রয়েছে তাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন।

তাঁর চৈতন্যের সব অনুভবের সাথে তাঁর সব ছাত্র, সব সহকর্মী, সব সঙ্গী এবং আমাদের মতো অজস্র গুণগ্রাহী হয়তো একাত্ম হব না; কিন্তু আহমদ শরীফের মধ্যে যে ব্যক্তিগত সততা জীবনযাপনে ও জীবন অনুধ্যানে ছিল, তা অস্বীকার করা যাবে না বলেই প্রতীয়মান হয়। এখানেই আহমদ শরীফ সক্রেটিস প্রমুখের মতো ইতিহাসের অন্তর্গত হবেন। পৃথিবীর রেনেসাঁসের তাবৎ ঐতিহ্য ও ইতিহাস আহমদ শরীফকে স্মরণযোগ্য মনে করবে বলেই মনে হয়। রেনেসাঁস এক ধরনের নীরব উত্তরণ। সেই উত্তরণ যে সবসময়ে সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন হবে, এমন নাও হতে পারে। মানবসভ্যতার ইতিহাস ক্রমবিকাশের ইতিহাস। সেই ক্রমান্বয়ের ইতিহাসে নানা যুগে নানা নাম, নানা তত্ত্ব, নানা ব্যাখ্যা। আহমদ শরীফ বোধহয় বাঙলাদেশে সেই চলমান সিঁড়ির একটি ধাপ। হয়তো সেজন্যই প্রাচীন ভারতে একটা কথা ছিল, 'চরৈ বেতি'। এগিয়ে চলার কথা আছে তাতে। সবসময়ে সব মত মানার মতো নাও হতে পারে—সমকালে বা ভবিষ্যতেও। সেটা বিচারের ভার পড়বে চলমান সমকালের অথবা সংগুপ্ত ভবিষ্যতের ওপর। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, এঁদের সাথেও যে আমরা সবসময়ে সহমত পোষণ করেছি এমন বলা যাবে না। রবীন্দ্রনাথ তো নোবেল প্রাপ্তির পর বাংলার বিদগ্ধমন্ডলী যখন তাঁকে সংবর্ধনা দেবার জন্য ট্রেন রিজার্ভ করে শান্তিনিকেতনে যান তখন তাঁদের সে সংবর্ধনা সর্বান্তকরণে গ্রহণে অপারগতা জানিয়ে অনেকেরই বিরাগভাজন হয়েছিলেন। নজরুল তো অনুরাগ-বিরাগের প্রাবল্যের মধ্যে বসবাস করতেন। শিল্পী, সংস্কৃতিসেবী ও প্রজ্ঞাবানরা যেহেতু প্রবল অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি তাই তাঁদের মধ্যে তাঁদের চৈতন্যের যে উপলব্ধ দৃষ্টিভঙ্গি থাকে তাকে আমরা কখনো মান্য করি, কখনো অগ্রাহ্য করি। কিন্তু যেহেতু চৈতন্য একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং চলমানতা সভ্যতার অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ, তাই আহমদ শরীফকে আমরা তার একজন প্রতিভূ গণ্য করতে পারি।

আহমদ শরীফ : আমাদের সক্রেটিস

হারুন-উর-রশিদ আসকারী

জ্ঞানের চর্চা, অর্জন ও বিতরণের প্রশ্ন বিশ্বের যেখানেই যখন উঠেছে, সেখানেই তখন উঠেছে সক্রেটিসের কথা। জ্ঞান-সাধনায় তাঁর অবদানের কথা। জ্ঞান-বিতরণে তাঁর আত্মদানের কথা। সক্রেটিস, সন্দেহ নেই, বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষগুলোর একজন। অবশ্য একারণে নয় যে, তাঁর বুদ্ধ্যঙ্ক ছিল মিলের চাইতে অধিক ধারালো; কিংবা তাঁর মস্তিষ্কে গ্রে-ম্যাটারের পরিমাণ ছিল আইনস্টাইনের চাইতেও বেশি। বস্তুত ওসব কিছুই নয় সক্রেটিসের জন্যে প্রযোজ্য। তবুও তিনি শ্রেষ্ঠ। অল্পের মধ্যে একজন। মানবেতিহাসে যাঁরা জ্ঞানান্বেষণের জন্যে নিরন্তর সাধনা করে গেছেন; সত্যান্বেষণের জন্যে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সয়ে গেছেন; প্রথাবিরোধের জন্যে মৃত্যুদণ্ডের রায় মাথা পেতে নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে শীর্ষতম হলেন সক্রেটিস। সক্রেটিস জন্ম-জ্ঞানপিপাসু, চির-সন্ধিৎসু, নির্মোহ, নিরাসক্ত, সৎ, সাহসী ও সত্যানুরাগী। সত্যের অনুসন্ধান, অনুশীলন ও প্রচারণার জন্যে তাঁকে আজীবন সইতে হয়েছে কায়েমী মহলের দৈহিক ও মানসিক লাঞ্ছনা; মাথা পেতে নিতে হয়েছে অন্যায় বিচারের রায়; পান করতে হয়েছে পেয়ালা ভর্তি হেমলক। আর এভাবেই তাঁর জায়গা পোক্ত হয়েছে ইতিহাসের পাতায়।

সক্রেটিস আজ আর কেবলি একজন ব্যক্তি নন। সক্রেটিস আজ একটি প্রতিষ্ঠান; একটি ঘরানা। সক্রেটিস বলতে আজ বোঝায় জ্ঞানান্বেষণের প্রবল স্পৃহা, নিরন্তর আত্মানুসন্ধান, ন্যায় ও সত্যের প্রতি অবিচল আস্থা, প্রচলিত প্রথা-বিরোধিতা, ভাবনার প্রাগ্রসরতা এবং প্রয়োজনে আত্মবলিদান। মানবসভ্যতার আজ যা কিছু শ্রদ্ধেয়—বুদ্ধির মুক্তি, ন্যায়ানুবর্তিতা, স্বাদেশিকতা, মানবতাবাদ—এসবের একটা প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে সক্রেটিসের দর্শন। তাঁর জীবনাদর্শ। সেকারণেই যখন কাউকে দেখা যায় সমাজের বৈরী আবহাওয়াকে অগ্রাহ্য করে মুক্তবুদ্ধির চর্চা করতে; সমাজপতিদের রক্তচক্ষুকে ভ্রূকুটি করে যুক্তিবাদের অনুশীলন করতে; জীবন ও জগতের বড়ো বড়ো প্রলোভনকে পায়ে দলে সত্য ও ন্যায়ের নির্লোভ পথকে বেছে নিতে; প্রথা ও কুসংস্কারের গড্ডলিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে প্রথাবিরোধের মহাসমুদ্রে উল্টো সাঁতার দিতে; ধর্ম ও লোকাচারের সহজ পথের চেয়ে যুক্তি-বুদ্ধির বন্ধুর পথকে বেছে নিতে; তখন তাঁকে এক করে দেখতে হয় সক্রেটিসের সাথে। সক্রেটিসের সাথে একাকার হয়ে তিনি হয়ে যান

সক্রেটিস ঘরানার মানুষ। আক্ষরিক অর্থে তাঁদের তুলনা হয়ত অবান্তর। কিন্তু স্থান-কাল প্রভৃতির কথা মনে রেখে তাঁদের আদর্শ-উদ্দেশ্যকে সমার্থক ভাবা হয়ত অবান্তর নয়।

এই রকমের একজন মানুষ হলেন আহমদ শরীফ। আমাদের সময়ের, আমাদের সমাজের সক্রেটিস। যে যুগ ও সমাজব্যবস্থা সক্রেটিসের মত মহামানব জন্ম দিতে পেরেছিলো, কিংবা সক্রেটিস যে যুগ ও সমাজব্যবস্থার জন্ম দিতে পেরেছিলেন, তার কোনোটাই হয়ত আমাদের সময় ও সমাজের ক্ষেত্রে হুবহু প্রযোজ্য নয়। তবুও একথা বলা মনে হয় অন্যায় হবে না যে, আহমদ শরীফ এ যুগের সক্রেটিস, অন্তত প্রতীকী অর্থে। যে প্রত্যয় ও নিষ্ঠা, যে মনোবল ও দৃঢ়তা, যে শুদ্ধতা ও আত্মসংহতি, যে জ্ঞানতৃষ্ণা ও সত্যান্বেষা, যে প্রথাবিরোধ ও আপোষহীনতা, সর্বোপরি যে মানবপ্রেম ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা বিশিষ্টতা দিয়েছিল প্রাকখ্রিস্ট যুগের সক্রেটিসকে; কমবেশি সেই সবই আবার বিশিষ্টতা দিয়েছে আহমদ শরীফকে, আমাদের সময়ে, আমাদের সমাজে।

উপরিকাঠামোগত সামান্য কিছু পোশাকী পরিবর্তন ছাড়া আমাদের সমাজ মূলত একটি অনগ্রসর, প্রথাপীড়িত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ। ধর্মান্ধতা, যুক্তিহীনতা, কূপমণ্ডূকতা, বিজ্ঞানবিরোধিতা প্রভৃতি এই সমাজের নিত্যসহচর। উনিশ শতকের কলকাতাকেন্দ্রিক কথিত বাংলার রেনেসাঁসের একটা ঝলকানি পরবর্তীকালে আমাদের সমাজের এলিটদের সামান্য আলোকিত করলেও সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এর তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি। ফলে জগতের সবকিছুর মূলে যে মানুষ—রেনেসাঁসের এই মর্মবাণী উনিশ ও বিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজের ভেতর তেমন কোনো সাড়া জাগাতে পারেনি। অবশ্য এই শতকে বিশের দশকে ঢাকায় বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছিল। বৃহত্তর অর্থে সর্বস্তরের বাঙালি সমাজে রেনেসাঁসের মূল্যবোধ পৌঁছতে পারেনি, এখনও। তাই এই সমাজে আজও ধর্মের নামে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, যুক্তিহীনতা, বিজ্ঞানবিরোধিতার বীজ থেকেই গেছে। সাতচল্লিশের দেশবিভাগের পর কথিত দ্বি-জাতিতত্ত্বের অসারতা প্রমাণিত হলে অসাম্প্রদায়িকতার একটা ধারা পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে লক্ষ্য করা যায় এবং তাতে গণমানুষের ভেতরে একটা সাড়াও পড়ে যায়। কিন্তু এই গণজাগরণ নয়া ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে বাঙালি সমাজকে প্রতিবাদমুখর করে তুললেও এর ফলে বাংলাদেশে কোনো যথার্থ মুক্তবুদ্ধির অসাম্প্রদায়িক সমাজ গড়ে তোলার সম্ভাবনা দেখা দেয়নি। বস্তুত তৎকালীন পূর্ববাংলার বাঙালি সমাজে যতটুকু প্রগতি ও বিজ্ঞানমনস্কতার চর্চা হয়েছে, তা ধর্মকে সামনে রেখেই। একটি সেক্যুলার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মুক্তিযুদ্ধ হওয়ায় বাহাত্তরের সংবিধানে সেক্যুলারিজমকে স্থান দেওয়া হলেও তার অর্থ বেশ খানিকটা সম্পাদনা করে ধর্মনিরপেক্ষতা করা হয়েছে, যা-ও কিনা পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর নির্বাসিত হয়েছে। পরে ধর্মকে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছে। এভাবে ধর্মপ্রাণ বৃহত্তর জনগোষ্ঠিকে শাসনের স্বার্থে এই দেশে স্বাধীনতা-পূর্ব ও স্বাধীনতা-উত্তর উভয় কালেই ধর্মকে শাসনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং মুক্তবুদ্ধি চর্চার পথকে সরকারীভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

এই রকমের একটি সমাজে ধর্মহীনতার কথা বলে, সেক্যুলারিজমের কথা বলে, মুক্তবুদ্ধির কথা বলে, ফ্রি থিঙ্কার্স সোসাইটি গঠনের কথা বলে যে কজন হাতে গোনা

মানুষ জীবন ও প্রতিষ্ঠার ঝুঁকি নিয়েছেন, আহমদ শরীফ তাদের শীর্ষে। যে সমাজে এখনও ধর্মের নামে পাথর ছুঁড়ে মানুষ হত্যা করা হয়, যে সমাজে এখনও হাত পায়ের রগ কেটে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা হয়, বিজ্ঞান ও প্রগতির কথা বলতে গেলে মুরতাদ উপাধি পেতে হয়-সেই সমাজে, সেই ধর্মশাসিত সমাজ কাঠামোর ভেতর থেকে উঠে এসে তার মূলে কুঠারাঘাত করে গেছেন যে অকুতোভয় চিন্তাবীর; তিনিই হলেন আমাদের আহমদ শরীফ। তৎকালীন এথেনীয় সমাজ কাঠামোয় বেড়ে ওঠা সক্রেটিস যেমন আমৃত্যু প্রতিবাদ করে গেছেন সমাজের প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে, মৃত্যুদণ্ড ভোগ করেছেন সে কারণে; আহমদ শরীফও তেমনি আমৃত্যু প্রতিবাদ করেছেন ধর্মকাতর, প্রথাপীড়িত, পশ্চাৎমুখী আপন সমাজের বিরুদ্ধে, হাসিমুখে সয়ে গেছেন লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপবাদ আর কুৎসার চাবুক। হাস্যকর এথেনীয় দেবদেবীর বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে সক্রেটিস যেমন পেয়েছিলেন 'নাস্তিক' উপাধি; যুক্তিহীন ধর্মান্ধদের বিরুদ্ধে, ধর্মের ঐশ্বরিকতার বিরুদ্ধে, স্বঘোষিত অবতারের বিরুদ্ধে, কল্পিত পুনরুত্থান ও পরকালের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে আহমদ শরীফও তেমনি পেয়েছিলেন 'নাস্তিক' উপাধি। তার চেয়েও বড়ো কথা হল তিনি নিজেই নিজের আদর্শিক পরিচয় দিতেন নাস্তিক হিসেবে। তিনি স্বঘোষিত নাস্তিক। এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। এখানেই তাঁর অনন্যতা। আমাদের সমাজে যে কেবল তিনিই নাস্তিক, তা নয়।

বস্তুত ঐহিকতাবাদী অনেকেই পরোক্ষ নাস্তিক্যবাদ চর্চা করে যাচ্ছেন। কিন্তু সামাজিক কারণে তা প্রকাশের কিংবা প্রচারের সাহস পাচ্ছেন না। অথচ আহমদ শরীফ নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ ও প্রচার করে গেছেন তাঁর নাস্তিক্য-প্রেম। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না। তিনি মানতেন যুক্তি-বুদ্ধি ও বিজ্ঞান। যা যুক্তিনির্ভর নয়, বিজ্ঞান সমর্থিত নয়, প্রতিপাদনযোগ্য নয়, তা কোনোমতেই কল্যাণকর হতে পারে না-এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। বিজ্ঞানের আপাত ব্যর্থতাগুলোকে পুঁজি করে ধর্ম গড়ে উঠেছে বলে তিনি মনে করতেন। অত্যন্ত নির্মোহ উপলব্ধিতে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, ঈশ্বর, ধর্ম, অবতার, পুনরুত্থান, পরকাল ইত্যাদির ধারণা পৃথিবীর আবহমানকালের মানুষের আস্তিত্বিক অসহায়ত্ব, প্রাতিবেশিক সীমাবদ্ধতা, ভীতি ও প্রলোভনস্পৃহা প্রভৃতি থেকে পর্যায়ক্রমে উৎসারিত হয়েছে এবং ঐতিহ্য পরম্পরায় লালিত হচ্ছে। ধর্ম ও ঈশ্বর সংক্রান্ত এই কুহক, এই ভ্রম ও মোহ যুগে যুগে মানবসমাজের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করেছে বলে নীৎশের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন। তিনি বলতেন এই সকল কুহকের স্থান মানুষের চেতনার অন্ধকার গলিতে।

শিক্ষার আলো সেখানে ফেললেই দেখা যাবে ধর্ম বলে অনন্তকাল ধরে যা মানুষ বুকে আগলে রেখেছে, তার আসলে মানুষের ক্ষতি কিংবা কল্যাণসাধনের কোনোই ক্ষমতা নেই। ধর্মতাত্ত্বিক এই সকল বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা তাঁর রচনায় যতটুকু এসেছে, তারচেয়ে অনেক বেশি এসেছে তাঁর আড্ডা-আলোচনায়। সক্রেটিসের মতো তিনিও মাঠে, ঘাটে, ভোজসভায়, বাসায় নিয়মিত আড্ডা দিতেন। ভক্তকুল পরিবেষ্টিত হয়ে অনর্গল বলে যেতেন দুর্লভ জ্ঞানের কথা। খ্রিস্টপূর্ব সোফিস্ট থেকে শুরু করে পোস্টমডার্নিস্ট পর্যন্ত অনায়াসে উপস্থাপন করতেন রাশি রাশি তথ্য। প্রতিষ্ঠা করতেন তাঁর যুক্তি। বিতর্কের সুযোগ দিতেন সবাইকে। কখনও হাসিমুখে, কখনও বা কৃত্রিম রাগে খণ্ডন করতেন প্রতিপক্ষের যুক্তি। বস্তুত তিনি তর্ক করতে ভালোবাসতেন।

ভালোবাসতেন প্রশ্ন করতে। তাঁর ভাষায় সত্য কখনও তর্ককে ভয় করে না, ভয় করে না প্রশ্নকে। মিথ্যের ভয় হলো তর্কে আর প্রশ্নে। বিজ্ঞানের তর্কভীতি বা প্রশ্নভীতি নেই। তা আছে ধর্মের। আর তাই কঠোর ভীতি প্রদর্শন করে কিংবা অপার্থিব প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ম পাশ কাটাতে চায় তর্ক আর প্রশ্নকে। ধর্মে প্রশ্ন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এইসকল কথা বিভিন্ন আঙ্গিকে, বিভিন্ন ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত হতে দেখেছি আহমদ শরীফের আড্ডায়। যাদের তাঁর আড্ডায় অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছে, তাদের বিষয়গুলো অবিদিত নয়। সক্রেটিসও তর্ক করতেন। প্রশ্ন ভালোবাসতেন। তিনি মানুষকে জগত ও জীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করতেন। উত্তর নিতেন। প্রতিপ্রশ্ন করতেন। এভাবে নিরন্তর প্রশ্নোত্তরের ভেতর দিয়ে বের করে আনার চেষ্টা করতেন যুক্তিনিষ্ঠ সত্যকে। আহমদ শরীফও তাই। প্রশ্নহীন, যুক্তিহীন, প্রমাণহীন কোনোকিছুকেই তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। কারণ তা ক্ষণিকের মোহ সৃষ্টি করলেও মানুষের চূড়ান্ত মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না। আহমদ শরীফের এই সকল ভাবনার মূলে কাজ করতো মানুষের জন্যে তাঁর ভালোবাসা। জন-জীবনের জন্যে একটা সুগভীর মমত্ববোধ, যাকে বলা যেতে পারে মানবতাবাদ। সেই প্রোটাগোরাসের মতো, সক্রেটিসের মতো, মানুষকেই তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন সবকিছুর মূলে। চূড়ান্ত মানবকল্যাণের লক্ষ্যেই তিনি জীবন ও জগতের বোধ ও ব্যাখ্যাসমূহকে মানুষের জন্যে নির্মোহ নিরাসক্ত করতে চেয়েছেন। সকল প্রকার কুহক ও মোহকে নির্বাসন দিতে চেয়েছেন মানবকল্যাণের জন্যেই।

মানুষ চারপাশের সব কিছুকেই রহস্যাবৃত করে রেখেছে। তার ধর্ম, ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্পকলা সব কিছুই রহস্যাবৃত। মানুষ রহস্য পছন্দ করে। রহস্যের কুহকী যাদু মানুষকে আকৃষ্ট করে। মানুষ নির্মম বাস্তবতা ভুলে থাকতে চায়। কঠিনের মুখোমুখি হতে ভয় পায়। এই ভয় আহমদ শরীফ ভাঙাতে চেয়েছেন। বিজ্ঞানের আঘাতে, বিজ্ঞানমনস্ক চেতনার আঘাতে সকল রহস্যের জাল ছিড়ে মানুষকে নির্মোহ-নিরাসক্ত বাস্তবের মুখোমুখি, কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করাতে চেয়েছেন। সব কিছুকে বি-রহস্যকৃত করে পারলৌকিক মঙ্গলের পরিবর্তে ইহলৌকিক মঙ্গল নিশ্চিত করার কথা ভেবেছেন। তাঁর এই সর্বজনীন মানবপ্রেম এবং নির্মোহ আদর্শ তিনি প্রমাণ করে গেছেন জীবনে, প্রমাণ করেছেন মরণে। জীবদ্দশায় তাঁর দ্বারা এতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত কেউ হয়েছে বলে জানা যায়নি। বরং নানাভাবে উপকৃত হয়েছে নানাজন। কিংবদন্তীর মতো ছিল তাঁর সততা ও নিষ্ঠা। খ্যাতি-যশ কিংবা অন্য কোনো বৈষয়িক মোহ তাকে মুহূর্তের জন্যেও প্রলোভিত করতে পারেনি, কিংবা পারেনি কোনো কায়েমী রক্তচক্ষু তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে। তাঁর কোনো লোভ, মোহ, কিংবা ভীতি ছিল না।

তাঁর সাধনা ছিল জ্ঞান চর্চা, জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান বিতরণ এবং এসবের ভেতর দিয়ে মানবকল্যাণ। মরণের ভেতর দিয়ে আহমদ শরীফ তাঁর মানবতাবাদ প্রমাণ করে গেছেন। কথা ও কাজের মধ্যে অমন অবিশ্বাস্য রকমের মিল কজন বাঙালি মুসলমানের মধ্যে পাওয়া গেছে? মুখে ধর্ম আর পরকালের তুবড়ি ছোটানো অনেককেই দেখা যায় বিষয় বুদ্ধির পান থেকে চুনটুকু পর্যন্ত না খসতে দিতে। অথচ নৈতিকতা যাঁর ব্রত; সেই আহমদ শরীফকে বৈষয়িক স্বার্থে এতটুকু আগ্রহী হতে দেখা যায়নি। এইখানেই তাঁর মহানুভবতা।

আহমদ শরীফ আজ আমাদের মাঝে নেই। তাঁর আদর্শ কাজে আসছে একটি মুক্তবুদ্ধির সমাজ বিনির্মাণে। ধর্মপীড়িত, রাজনীতিপীড়িত, পুঁজিশাসিত, দুর্নীতিগ্রস্ত ও অবক্ষয়িত আজকের বাঙালি সমাজকে ঢেলে সাজাতে আজ বড় প্রয়োজন আহমদ শরীফদের মতো মানুষের। নাস্তিক্য বা আস্তিক্যের দলাদলিতে নাইবা গেলাম, আহমদ শরীফ একজন ভালো মানুষ ছিলেন, একথা মনে হয় তাঁর শত্রুরাও অস্বীকার করবে না। তাঁকে নাস্তিক প্রমাণের জন্যে একশ একটা যুক্তি পাওয়া যাবে; কিন্তু তাঁকে মন্দ প্রমাণের জন্যে একটি যুক্তি মেলাও ভার। আর আমাদের সমাজের জন্যে আজ সবচেয়ে জরুরি হয়ে পড়েছে আহমদ শরীফের মতো মানবীয় উপাদান। তা-সে নাস্তিকই হোক আর আস্তিকই হোক। এরকম একটি ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যায়নও করা যেতে পারে আহমদ শরীফের, যার মধ্যে একটা সমন্বয়ী ভাব থাকলেও গ্রহণযোগ্যতা থাকবে বেশি।

যাই হোক আহমদ শরীফ একটি সাহসী নাম। এদেশের মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান সমাজ থেকে এরকম একজন মানুষ বেরিয়ে আসা অসম্ভবপ্রায় একটি ঘটনা। তবে তাঁকে কোনো অবস্থাতেই যুগের সৃষ্টি বলা যাবে না। যে সমাজ থেকে একজন ধর্মান্ধ, নিয়তিবাদী, স্বার্থপর ও আপোষকামী মানুষ বেরিয়ে আসবার কথা, সেখানে থেকে আহমদ শরীফের মতো একজন মানুষের আবির্ভাব কেবল আকস্মিকই নয়; অভিনবও বটে। শুধু তাই নয়। আপন সময় ও সমাজকে অগ্রাহ্য করে, তার তমসা, অচলায়তন ও জাড্য ভেঙে একটি নতুন সভ্য সমাজ গড়ার কাজ করে গেছেন তিনি।

ধর্ম, কুসংস্কার, গোঁড়ামি আর প্রথার বদ্ধ ডোবা থেকে তুলে এনে তিনি তাঁর সময়ের মানুষকে উপহার দিতে চেয়েছেন একটি 'ফি থিঙ্কার্স সোসাইটি' যার চালিকা শক্তি হবে ইহজাগতিকতা ও বিজ্ঞানমনস্কতা। আর এরকম একটি ধর্মহীন, বর্ণহীন, গোত্রহীন শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যেই তিনি জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং বিতরণ করেছেন সক্রেটিসের মতো। আমরা সক্রেটিসের নাম শুনেছি, কিন্তু দেখেছি আহমদ শরীফকে। দুজনের চেহারা দুরকমের হলেও, দুজন আসলে সতীর্থ, সহকর্মী এবং সহযোদ্ধা। মাঝখানে ব্যবধান শুধু কালের। আর কাল তো নিরবধি।

উৎস কোথায়

সমুদ্র গুপ্ত

শিক্ষক আহমদ শরীফ। এটি জ্ঞাত যে তিনি নিরীশ্বরবাদ চর্চা করতেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বলা যায় আহমদ শরীফ ইহলৌকিক ছিলেন। অনেকেরই মতো ধর্মপরায়ণ পরলোকনিষ্ঠ একটি পরিবারের একেবারে অভ্যন্তরে থেকেও কীভাবে তিনি পরিপূর্ণ একজন ইহলৌকিক তথা নিরীশ্বরবাদিতে রূপান্তরিত হলেন। মুক্ত জ্ঞানচর্চার দ্বারা হয়তো বা তিনি সমগ্র হয়ে উঠেছেন কিন্তু এর সূচনা তথা প্রাথমিক স্তরটি কোথায় এবং কীভাবে। খানিকটা বিস্ময়কর ঘটনা হচ্ছে ইহলোকচর্চা তথা নিরীশ্বরবাদিতার ক্ষেত্রে তাঁর অতি স্বাভাবিক এবং সহজ অভিব্যক্তিসমূহ। এই বিষয়টি নিয়ে কখনও উচ্চকণ্ঠ হননি। প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন দৃঢ় এবং উচ্চকণ্ঠ এই বিষয়টিতে তিনি এতোটা নন। এর কারণ মনে হয়, এই বিষয়টিতে তিনি বিশেষ কোনো মতবাদ বা বিশেষ কোনো ব্যক্তিপ্রভাবের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেননি। ঘটনাটি যেহেতু ঘটেছে তাঁর জ্ঞানচর্চা ও ধারণা নির্মাণের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার সহগামী ফল হিসেবে সেহেতু এটি তাঁর জীবনে অন্যান্য প্রাপ্তি, সংযোগ বা লগ্নতার মতো কোন চাঞ্চল্য জাগায়নি। তোলেনি বিশেষ সাড়া, যুক্ত হয়নি আবেগ।

আমরা জানি জ্ঞানজীবনের সূচনাকাল থেকেই তিনি আমাদের দেশের প্রায়প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়ে কাজ করেছেন। কেবলই কাজ করেছেন বল্লে খানিকটা অবলা থেকে যায়, তিনি ঐ সাহিত্যে মগ্নতার সাথে নিয়োজিত ছিলেন। এই বিবেচনায় অনুমান করাটা নিশ্চয়ই অসঙ্গত হবে না যে আমাদের প্রায়প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য অভ্যন্তর থেকেই নিরীশ্বরতা তথা ইহলৌকিকতার দিকে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল। এটি সম্ভব। কারণ...।

আমাদের প্রায়প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্য তার বস্তুময়তার দিক থেকে এক চমৎকার বাস্তবতা ধারণ করে আছে। ধর্মীয় আখ্যান, প্রেরণা, ঘটনাময়তায় পরিপূর্ণ নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও আমরা দেখি ওইসব সাহিত্য কাব্য আখ্যান চূড়ান্ত বিচারে ইহলৌকিকতার দিকেই নিষ্পন্ন হয়েছে।

একেবারেই মানবিক সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, বেদনা-পুলক, আবেগ-উৎকণ্ঠা, স্থিতি-বিস্ময়, স্থৈর্য-চাঞ্চল্য, প্রেম-অপ্রেম, মিলন-বিরহ ঈশ্বরলোক তথা পারলৌকিক

আকর্ষণের বিপরীতে ইহলৌকিক আবেদনকেই প্রগাঢ় সত্যতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। বস্তু থেকে উৎপন্ন অনুপুঙ্খের প্রাণপ্রাবল্য মূলত সামাজিক, রাষ্ট্রিক, বৈশ্বিক, শারীরিক তথা ইহলৌকিক ধারণার বিষয়টিকে অধীত জ্ঞানের চালিকাশক্তিতে পরিণত করে। জ্ঞানশক্তির দ্বারা পরিচালিত মানুষ তখন ইহলৌকিক-এ রূপান্তরিত হন। বিশেষ কোনো বা কোনো বিশেষ কালের সাহিত্যের অন্তর্ভেদী চর্চা একজন জ্ঞানোপাসককে কীভাবে সত্য ও বাস্তবতার আলোতে নিয়ে দাঁড় করায় তা আমরা প্রত্যক্ষ করি আহমদ শরীফ-এর বেলায়। অলীক-অনিশ্চয়তার মোহ থেকে মুক্ত একজন মানুষ কী কী থেকে কী কী খাদ্যপ্রাণ গ্রহণ করেন এবং তার ফল হিসেবে কীভাবে আলোকবিন্দু থেকে আলোকবর্তিকায় পরিণত হন তার প্রমাণ আহমদ শরীফ। শিক্ষক আহমদ শরীফ।

আমার ভাবনায় আহমদ শরীফ

আব্দুল মান্নান

হিসেব মত অধ্যাপক আহমদ শরীফ আমার চেয়ে বয়সে মাত্র ৮ বছরের বড় ছিলেন; কিন্তু বাকি সব বিষয়ে আমার কাছ থেকে বহু দূরে তাঁর অবস্থান। ১৯৯০-দশকের গোড়া থেকে তিনি নিজেই সব দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে কাছে টেনে নিয়ে। কোনো প্রশংসার লোভ কিংবা নিন্দার ভয় এই সাহসী মনীষীর মধ্যে দেখিনি—মানবতার উৎকর্ষ, বিকাশ, সামাজিকভাবে মানুষের সার্বিক কল্যাণ এবং মানসিক রূপান্তরের লক্ষ্যেই তিনি নিজেকে রূপান্তরিত করে অন্যদেরকেও সেভাবে টেনে তুলতে একান্ত প্রচেষ্টা ও সাধনায় লিপ্ত ছিলেন। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মৌলিক বিকাশ তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন এবং তাই আত্মবিশ্বাসে বলে গেছেন যে, এই বিজ্ঞান সম্মত মতবাদের বিকল্প নেই। সমাজতন্ত্রের অনুশীলনেই যে বর্তমান বিলুপ্ত প্রায় ধন-সাম্রাজ্যবাদ এবং তার শিখণ্ডী স্বৈরাচার ও মৌলবাদের পতন অনিবার্য হবে তা তিনি দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন।

আজ বিংশ শতাব্দীর সাথে সাথে তিনিও আমাদের মধ্য থেকে গত হয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল এ মুহূর্তে আমাদের জরুরি আর্থ-রাজনৈতিক ও সমাজ-সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রয়োজনে এ-যুগের এই বাঙালি সক্রেটিসের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে বলেই কি কোনো প্লেটো এসে তাঁকে যথার্থরূপে জনগণের সামনে তুলে ধরবেন না?

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে যাদুমন্ত্রে চলে না বরং নৈসর্গিক কার্যকারণ সম্পর্কে চলে সে বিশ্বাস নিয়ে এবং প্রমাণ করতে গিয়ে ইউরোপের ইতিহাসে বহু মনীষী নির্যাতিত হয়েছেন, প্রাণও দিয়েছেন। তথাপি ইউরোপই মানবতাবাদের পথে এগিয়ে চলতে শিখিয়েছে সারা দুনিয়ার মানব সমাজকে। সেই মানবতার এশীয় প্রবক্তা আহমদ শরীফ প্রাচ্যের অনন্য ব্যক্তিত্ব এবং বাংলাদেশের গর্ব। তিনি আমাদের বাঙালি সমাজকে একবিংশ শতাব্দীর নেতৃত্ব গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবার একান্ত চেষ্টা করে গেছেন। বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী একই সময়ে ইউরোপের জার্মানিকে এবং এশিয়ার বঙ্গদেশকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকলেও, বর্তমান একচেটিয়া ধন-সাম্রাজ্যবাদ ইতোমধ্যেই বিপ্লবোত্তর পূর্ব-জার্মানীকে টেনে নিয়ে গেছে বুর্জোয়া পশ্চিম জার্মানির দিকে। অধ্যাপক আহমদ শরীফের মৌলবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সর্বশেষ আহ্বান কি শীঘ্রই বিপ্লবের সংশোধনবাদী পশ্চিমবঙ্গকে বিপ্লব-প্রবণ পূর্ববঙ্গের দিকে টেনে নিয়ে আসবে না?

বিগত অর্ধশতক ধরে অধ্যাপক আহমদ শরীফের উত্তরণ ছিল বিশেষভাবে লক্ষনীয়। লক্ষণীয় ছিল মধ্যযুগীয় এক পুথিসাহিত্য বিশ্লেষকের ক্রমেই এমন আধুনিক মনীষীরূপে আবির্ভূত হতে থাকা। বিগত দুই শতকে লোকায়ত বঙ্গদেশ বহু খ্যাতিমান গবেষক ও সাধকের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু জ্ঞানতাপস আহমদ শরীফের মত মানবতার পক্ষে দাঁড়িয়ে এমন স্পষ্ট নিরীশ্বরবাদী সাহসী ও সফল সৈনিকের ভূমিকা শোষণ শাসন জর্জরিত প্রাচ্য পৃথিবীতে আর কোথাও দেখা গেছে কি? ভুঁইফোড় মৌলবাদের ভয়ে ভীত ও নির্বাসিত বাংলাদেশী তসলিমা নাসরিন এবং ভারতীয় সালমান রুশদীর বিপরীতে একই সময়ে বাঙালি অধ্যাপক আহমদ শরীফের নির্ভীক অবস্থান ও দিক নির্দেশনা কি আমাদের প্রগতিবাদী গণমানবের বাংলাদেশকে আধুনিক পৃথিবীর পথ প্রদর্শক রূপে রূপান্তরিত করবে না?

আমার ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনে নিঃসন্দেহেই তিনটি সৌভাগ্য লাভ ঘটেছে- এক. মূলত cosmopolitan বাংলাদেশে আমার জন্মলাভ, দুই. আমার অখ্যাত আস্তিক পিতা প্রয়াত আলিম উদ্দিনের জ্ঞানান্ধ সততা এবং তিন. এদেশের প্রখ্যাত নাস্তিক প্রয়াত মনীষী আহমদ শরীফের জ্ঞানদীপ্ত সাহসের ছোঁয়া লাভ। আমার জন্মস্থান কুমিল্লা জিলার ফতেহাবাদ গ্রামের সেকেলে মুন্সি খেতাবধারী পরিবার থেকে বিগত বিশ/ত্রিশের দশকে তালপাতার পুথি সংগ্রহ করেছিলেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। তারই ভ্রাতুস্পুত্র অধ্যাপক আহমদ শরীফ সমগ্র মধ্যযুগ জরীপ করে আমাদের বাংলাদেশে এক আধুনিক successful, towering cosmopolite personality রূপে বিংশ শতাব্দীর প্রান্তিক দশকে দাঁড়িয়ে সমগ্র এশিয়াব্যাপী এক অনন্য যুগোপযোগী রেনেসাঁর ঝড় তুলে দিয়ে সদর্পে Came into his transformed being and passed away. চমৎকার! এ দ্বারা আমাদের ব্যর্থ জীবন অনেকটা সার্থকতা লাভ করল।

এশিয়া মহাদেশের পাশেই ইউরোপ বিকশিত হয়ে মূলত আজও সারা বিশ্বের নেতৃত্ব দিচ্ছে। কিন্তু ইতিহাস বলে যে সে বিকাশের জন্যে আহমদ শরীফের মত বহু নাস্তিক মুরতাদ-এর অবদান এবং জীবন দান কারণ হিসেবে কাজ করেছে। শান্তির ধর্মের নামে ড. শরীফের জীবননাশের জন্যে যে অশান্তির বিষবাষ্প নব্বই-এর দশকে আমাদের বাংলাদেশ থেকে আসামের বরাক অঞ্চল পর্যন্ত ছড়ানো হয়েছিল, সেখানে স্লোগান উঠেছিল "মুরতাদ শরীফের কল্লা চাই"। সহজেই বোঝা যায় যে কে সেই মুরতাদ এবং কি তার অপরাধ। ওই স্লোগানধারীদের তাঁর স্বরূপ জানা ছিল না। সভ্যতার মানদন্ডে আহমদ শরীফের বিপ্লবের মূল্যায়ন কারা করবেন? এই মুরতাদকে তো বাংলাদেশের কমিউনিস্টরা জানতেন। তাঁরা কি এখনও কিছু মাত্র মুরতাদ নন? সেই উত্তেজনার সময়ে তাঁরা কি তার পাশে দাঁড়ানোর প্রয়োজন বোধ করেছিলেন? তবে দেখা গেছে যে সেই মুরতাদই মানব মঙ্গলে জ্ঞানানুশীলন ও ঐক্যবদ্ধতার প্রয়োজন বোধে শেষবারের মত তাদেরকে আহ্বান করে এবং মানুষেরই জন্যে সর্বস্বদান করে নীরবে চলে গেলেন।

যিনি কখনো কলম ও কণ্ঠ ভাড়া দেননি

গাজী আজিজুর রহমান

প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ এই দু'ভাবেই আমরা মানুষকে দেখি। দু'টিই দেখা। কিন্তু বিস্তর ব্যবধান। সরাসরি বনের বাঘ দেখা এবং ছবির বাঘ দেখার উপলব্ধির ভিন্নতা যেমন, তেমনি। বিষয়টি দূর ও কাছ থেকে দেখা বিরোধালংকারজাত। একটি খণ্ডিত, অপরটি অখণ্ড সত্যে ভাস্বর। প্রত্যক্ষে কল্পনার দৃষ্টি অচল। পরোক্ষে চলে কবি বা শিল্পীর কল্পনার স্বাধীনতা। সেখানে মানুষ দেবতা হয়ে উঠতে পারে, দেবতা মানুষ। কিন্তু প্রত্যক্ষকারীর বেলায় সেটি নৈব নৈব চ। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. আহমদ শরীফ সম্পর্কে কিছু বলতে যেয়ে তাই উপলব্ধি করছি আমার হাত পা বাঁধা, আমার দিব্যজ্ঞান অন্ধ। পাহাড়ের পাদদেশে বসে পাহাড়ের বিশাল মহিমা বর্ণনা করা যায় না। করলে পাহাড় হয়ে ওঠে নিছক একটা নুড়িপাথরের স্তূপ। টলস্টয়ের নেপোলিয়ান বর্ণনার অনবদ্যতার কারণ তাই সময় ও না দেখার দূরত্বের শৈল্পিক সংশ্লেষণ।

আমি তাঁকে একটা দেবদারু বৃক্ষের মতো দেখেছি। যে উন্নত, অটল, ঋজু এবং দৃঢ়। স্বতন্ত্র সৌন্দর্য্য, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে যার। আহমদ শরীফ তেমনি এক স্বতন্ত্র মানব বৃক্ষ। সূর্যরশ্মিতে যার বিকাশ ও ব্যাপ্তি। রূপে-রঙে, আচারে আচরণে, বাগ্মিতায় ভাষণে, বিশ্বাসে-নিঃশ্বাসে, আত্মবান আদর্শে যিনি অনির্বাণ উজ্জ্বল। বাইরে পাথর পুরুষ ভেতরে শীতাংশু মানুষ। মনে হতো রামমোহন, বিদ্যাসাগরকে দেখছি। কি এক বহ্নিতেজে, দ্রোহে, দাহে নিরন্তর জ্বলছেন। যেনো অগ্নিস্রাবী লাভার মতো রক্ত সঙ্কাশি। সেই আমার ভয়ংকর সুন্দরের প্রথম অভিজ্ঞান।

তিনি ক্লাসে বলতেন, এই স্টেজে আমিই রাজা আর সবাই প্রজা। রাজাই বটে। রাজার মতই তিনি বক্তৃতা করতেন। যেনো সেই রোমান রাজা মার্ক এ্যান্টনি বক্তৃতা করছেন। অবশ্য তিনি ছিলেন জ্ঞানের রাজা। একজন প্রতিবাদী রাজা। প্রথাবিরোধী রাজা। কথা বলতেন বুক কাঁপানো, হাড় কাঁপানো। তাতে বহুদিনের লালিত ঐতিহ্য সংস্কারগুলো আমাদের ভেঙে যেতো। উড়ে যেতো অধিত বিশ্বাসের পাতাগুলো। দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতো বিশ্বস্ত জীবনবোধে। পাল্টে যেতো জীবনের ছক, জ্ঞান চেতনার ছক। আমাদের প্রচলিত শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, ধর্মপ্রাণ ধারণাগুলোর ওপর তিনি চুন টেনে দিয়েছিলেন। তাতে যে সবাই বদলে যেতো এমন নয়, তবে কেউ কেউ বদলাতো। ফলে

তার পক্ষ অপেক্ষা প্রতিপক্ষের সংখ্যাই ছিল বেশি। অন্য সব শিক্ষকের ক্ষেত্রে ছিল বিপরীত অবস্থান। সে কারণেই শরীফ স্যার ছিলেন ব্যতিক্রম একজন। এক সংশপ্তক যোদ্ধা। হাইনের মতো আত্মবিশ্বাসী এক তলোয়ার এবং অগ্নিশিখা। যে অস্ত্র দু'টি তিনি প্রয়োগ করতেন কুসংস্কার আর অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে।

বাঙালি মুসলমান সমাজের আলোক স্তম্ভ শিখাপন্থীদের পর ড. শরীফই মনে হয় একমাত্র ব্যক্তি শিখা গোষ্ঠীর শিখাকে আরো এক ধাপ শীর্ষে প্রজ্জ্বলিত করতে চেয়েছিলেন। চিন্তা-চেতনায়-কর্মে তার নজির রয়েছে। এতোটা বিদ্রোহ সহ্য করতে পারে নি তার আশ-পাশের কেউ। তাই তার চারপাশে আমৃত্যু ভিড় ছিলো বন্ধু অপেক্ষা শত্রুর। এসবে তিনি মোটেও পরোয়া করতেন না। আপস বুঝতেন না। হারতো নয়ই। তিনি বাঙালির মনোভুবনে কালান্তর ঘটাতে চেয়েছিলেন। অনমনীয়তা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন চাঁদ বণিকের প্রত্যয়ে। নারীর আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটাতে চেয়েছিলেন বেহুলার প্রতীকে। ঘৃণা জন্মাতে চেয়েছিলেন রাম, শ্রীকান্তের মতো নপুংশক মানুষদের প্রতি। আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন ওসমান (দুর্গেশনন্দিনী), নজরুল ইত্যাদি শক্তিমান শার্দুলদের প্রতি। স্বজাতি, স্বধর্মনিষ্ঠ পুরুষাকার বঙ্কিমচন্দ্র তার মানস পুরুষ। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে স্বীকার করতেন অকপটে। জয়গান গেয়ে বলেছেন 'জয়তু রবীন্দ্রনাথ'। ভালোবাসতেন আলী থেকে আরজ আলী মাতুব্বর পর্যন্ত নির্ভীক মানুষদের।

জাতপাতহীন সাম্য ও প্রেমের বাণীবাহক লালন তার প্রিয়তা পেয়েছিলো অনায়াসে। পরিবর্তনে বিশ্বাসী, বিপ্লবে আস্থাশীল মানুষকে তিনি আত্মীয়জ্ঞান করতেন। প্রচলিত কোনো ধর্মে তার আস্থা ছিল না, ঈশ্বরেও না। বিশ্বাস করতেন মানুষের সমস্ত শক্তি ও সম্ভাবনাকে বিকশিত করে তুলতে পারে একমাত্র কমিউনিস্ট সমাজ। যা বলতেন তাই লিখতেন। কলম ও কণ্ঠে তিনি কখনো ফাঁক রাখেন নি। এমন বিরল ও দুর্লভ মানুষ ছিলেন তিনি।

সক্রেটিস, ব্রুনো, আরজ আলী তার প্রিয় চরিত্র ছিল। তাই স্বভাবতই যুক্তিবাদী ছিলেন। যুক্তি ছিল তার চেতনা-সূর্য। সহ্য করতে পারতেন না ভড়ংধারী, মুখোশধারী মানুষদের। একদম পছন্দ করতেন না স্ববিরোধিতা। সত্য উচ্চারণ করতেন নির্দ্বিধায়। যা বলতেন স্পষ্ট করেই বলতেন। হেসে হেসেই চাবুক মারতেন পরম শত্রুকেও। মনটেইন, বার্নার্ড শ', প্রমথ চৌধুরীর স্টাইলে বিদ্রূপ করতেন সামাজিক ও শাস্ত্রিক প্রথাগুলোকে। অপ্রিয় হলেও সত্য বলতেন যে কোনো পরিবেশে। দেশ, জাতি, রাষ্ট্র, ধর্ম, রাজনীতি সম্পর্কে যখন যে কথাটি বলা প্রয়োজন মনে করতেন সবার আগে বলতেন। সংশয়ের কোনো দর্শন মানতেন না। গণমানুষের মুক্তির কথা ভাবতেন, শ্রদ্ধা করতেন শ্রমজীবী প্রতিটি মানুষকে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই মানবতার বাণী উচ্চস্বরে প্রচার করতেন। গোপনের ধার ধারতেন না। হেসে বলতেন, তুমি যা গোপন করতে পারোনা তা অপরকে গোপন করার পরামর্শ দাও কোন কাণ্ডজ্ঞানে! এরকম ছিল আহমদ শরীফের জীবন-সংস্কৃতি। রাষ্ট্র, সরকার, সমাজ, ধর্মান্ধ মানুষ বরাবর তার বিপক্ষে ছিল। তারপরও তারা তাকে ভয় করেছে। তার উত্থানকে প্রতিরোধ করতে আশ্রয় নিয়েছে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে, অপপ্রচারে কূটকৌশলে। তারা ভয় পেয়েছে তাঁর

অসম্ভব দৃঢ়তার, যুক্তি শরে বিদ্ধ হবার। তাঁর কোনো হারবার ভয় ছিল না। কারণ হারবার মতো অজ্ঞতা তার ছিল না। মাঝে মধ্যে দু'একজন আহমদ ছফাকে দেখেছি স্যারের সঙ্গে তর্কে অবতীর্ণ হতে। আর সবাই তাকে প্রশ্ন করতেন জানবার জন্যে। এখানে সক্রেটিসের বিপরীত মেরুতে তার অবস্থান ছিল।

একান্ত আত্মবিশ্বাসী, প্রখর যুক্তিবাদী, ইতিহাস সচেতন, সমকালের জাগ্রত বিবেক, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী কালের ভাবুক ও চিন্তক, সময়ের সাহসী সিন্দাবাদ, আমাদের চেতনার হিরন্ময় হেমকুট আদর্শ শিক্ষাগুরু ড. আহমদ শরীফ ছিলেন এদেশের প্রগতিশীল প্রতিটি মানুষের প্রেরণার উৎস। মানুষের বিকশিত হয়ে ওঠার দায়ে যা কিছু অন্তরায় তার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সদাসোচ্চার এবং আপসহীন সংগ্রামী। তার চিন্তা, বিশ্বাস, আদর্শ, কর্মযোগ ঝলসে উঠেছে বার বার সাহসী কলমে। যা আমাদের প্রাণিত করেছে, উদ্দীপিত করেছে, শুভ উদ্বোধন ঘটিয়েছে শারদ সকাশে। সে-ই প্রকৃত সৈনিক যে চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রেও সৈনিকের ভূমিকা পালন করে। আহমদ শরীফ জীবনে সে ভূমিকা পালন করেছিলেন বলেই প্রতিপক্ষরা দাঁড়াতে পারেনি। যারা জোর করে দাঁড়িয়েছিল, এরা কোনো যুক্তি-তর্ক-কৃতি ক্যারিশমা ছাড়াই দাঁড়িয়েছিল। আর তিনি দাঁড়িয়েছিলেন এসব ক্যারিশমা সহযোগে। তার এই প্রভাকে এড়িয়ে চলেছে পাকিস্তান আমল থেকে শুরু করে তার মৃত্যু পর্যন্ত অর্থাৎ বাংলাদেশ আমলের প্রতিটি সরকার। তাই কোনোদিন তিনি কোনো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পাননি। পাননি পুরস্কার প্রচার, গণমাধ্যমের সহযোগিতা এবং সরকারি সম্মাননা। অথচ তার চেয়ে অনেক মেধাহীন বুদ্ধিজীবী, নষ্ট সাহিত্যিক, নোংরা পণ্ডিত ভূষিত হয়েছেন রাষ্ট্রীয় খেতাবে স্রেফ ভাড়া খাটার কারণে। আহমদ শরীফ তা করেন নি বলেই নোবেল না পাওয়া টলস্টয়ের মতো তিনি আমাদের কাছে আরো বেশি শ্রদ্ধার এবং সম্মানের পাত্র।

যে সমাজে সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষের নিতান্ত অভাব, যে দেশে যৌক্তিক ও আদর্শনিষ্ঠ মানুষের প্রবল আকাল, যে জাতির মুকুরে বীর ও সাহসী মানুষের চিহ্ন মেলেনা-সেখানে আহমদ শরীফের মতো মানুষের বড় প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নিষ্ঠুর সময় তা মানতে নারাজ। তিনি চলে গেলেন একবুক জ্বালা আর ক্ষোভ নিয়ে, যুগযন্ত্রণার গরল পান করে। তার লেখায় সে সবও আঁকা হয়েছে। আমাদের উত্তর প্রজন্ম কী তা ধারণ ও লালন করতে পারবে? নাকি তার কর্ষিত ক্ষেত্র ফসল বোনার অভাবে নিষ্ফলা মাঠ হয়ে যাবে? অথবা সম্পূর্ণরূপে অখণ্ডরূপে প্রতিভাসিত হবে তার সংগ্রাম জীবন ও কর্ম? যদি হয় তাহলে এই হতদরিদ্র জাতির মনোজীবন আলোকিত হবে, মুক্ত হবে ভয়। তখনও মানুষ বলবে সেই এক মানুষ ছিল। যিনি কখনো দেশ জাতি ও সমাজের সঙ্গে প্রতারণা করেন নি। এই সেই মানুষ যিনি জনস্বার্থ ক্ষুণ্ন করে কাউকে খুশি করার জন্য নিজেকে পরিচালনা করেননি। এই সেই মানুষ যিনি কখনো কণ্ঠ ভাড়া খাটানোর বায়না নেন নি। সেই মানুষ যিনি কখনো ব্যক্তি গোষ্ঠীর স্বার্থে তার বিশ্বাসের ভূমি থেকে এক ইঞ্চিও নড়েন নি। তিনি নিঃসন্দেহে আমাদের সমাজের শ্রেষ্ঠ 'স্পোকসম্যান' ছিলেন। কিন্তু সে কখনো নির্দিষ্ট দলের বা পক্ষের নয়। তার স্বনির্মিত বিশ্বাস থেকে তিনি যা কিছু উচ্চারণ করে গেছেন তা সব সময়ই সঠিক ছিল এমন নয়, সকলের জন্য ছিল এমন নয়। সক্রেটিস, সার্ত্রে, রাসেল, রবীন্দ্রনাথ কি সকলের ছিলেন? তবু বিরল বিশ্ব মনীষার

অভিধায় তারা আখ্যায়িত। কারণ তাদের কৃতি কর্ম ক্যারিশমা ছিল জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নিরপেক্ষ। সব ছাড়িয়ে মানুষের জয়গানে মুখর ছিল তাদের লেখা ও আঁকা। আহমদ শরীফের কলম ও কণ্ঠ তাদের কলম ও কণ্ঠের মতই তোষামোদের সমাজ, লোভ-লালসায় নিমজ্জিত সমাজ, নীতি-নৈতিকতা ক্ষয়মান সমাজ, এবং কুৎসিত ও কুকর্মের সমাজের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ও স্বার্বভৌমত্ব লাভ করেছিল। আহমদ শরীফের ব্যক্তিত্বের অহঙ্কার এখানেই। একজন লেখকের যে সামাজিক দায় আছে হিউম রিচার্ডসনের মতো মনস্বী লেখকরা সে সত্য স্বীকার করে গেছেন। মার্কসবাদী প্লেখানভ, কডওয়েল তাকে আরও সম্প্রসারিত করে শিল্প, সাহিত্যের সঙ্গে অর্থনীতি, রাজনীতি, উৎপাদন প্রক্রিয়া পর্যন্ত সমীকরণ করেছেন। আহমদ শরীফের লেখায়ও ঐ দায়বদ্ধতা ছিল। তিনি বলতেন যে লেখা দেশ ও মানুষকে বাঁচায় না, মানব-মুক্তির বাধা স্বরূপ শৃঙ্খলা ভাঙেনা, মানুষকে সাহসী সংগ্রামী ও সুন্দর করে না, সে লেখার প্রয়োজন নেই। তাই তার কলম ও কণ্ঠ জীবনের শত ঝুঁকি নিয়ে তাক করা ছিল ক্ষুদ্রতা, গোঁড়ামি, কুসংস্কার, অলৌকিকতা এবং অন্ধবিশ্বাসের দিকে। যেখানেই অত্যাচার-অবিচার, লাঞ্ছনা-লুম্পেনি, ঠগগিরি-জোচ্চুরি, মানবতার অপমান সেখানেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বাঘের মতো। ক্ষমা করেননি পাপী, শয়তান, শোষক, মুখোশধারী মানুষকে। ভাষণ দিলে আসন পেতেন। মর্জিমাফিক লিখলে মর্যাদা পেতেন। কিন্তু না, এতো সহজলভ্য, সস্তা, লেখক ও কথক তিনি ছিলেন না। যা লিখতেন ও বলতেন, জেনে শুনে প্রস্তুতি নিয়েই করতেন। ঝড়ের ভয়ে তিনি মাটির তলায় বাসা বাঁধেননি। ঝড়ের মোকাবিলা করেছেন। ডাঙ্গায় দাড়িয়ে মাথা উঁচু করে। এমন মানুষদের আমরা ভালবাসতে কিংবা শ্রদ্ধা করতে পারিনি বলেই বাঙালি মুসলমানের দুর্দশা ঘোচেনি। শ' শ' আহমদ শরীফের জন্ম ছাড়া তাই বাঙালির প্রগতি নেই, পুনরুদ্ধার নেই। জয়তু আহমদ শরীফ।

যুগপ্রবর্তক আহমদ শরীফ

রতনতনু ঘোষ

ড. আহমদ শরীফ (১৯২১-৯৯) একজন জ্ঞানঋদ্ধ সাধক, মনুষ্যত্ববাদী পণ্ডিত, যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষক ও সত্যপন্থী লেখক ছিলেন। তিনি শাস্ত্রাচারের অন্ধ ভক্তি ও আত্মসমর্পণে অবিশ্বাসী ছিলেন। দীর্ঘদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে শিক্ষকতা করে আর মননশীল রচনাবলি প্রকাশ করে তিনি প্রকৃত অর্থে একজন যুগপ্রবর্তক হয়ে উঠেছিলেন। তার মুক্তচিন্তায় ও প্রগতিশীল বক্তব্যে প্রথাপীড়িত ও ধর্মান্ধরা প্রবলভাবে ঝাঁকুনি খেয়েছে কিন্তু সমাজ পেয়েছে আলোকময় নির্দেশনা। দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রসর অবস্থানে রয়েছেন, এমন অনেকেই তাঁর ছাত্র হিসেবে আলোড়িত হয়েছেন। অনেক দুর্ধর্ষ পণ্ডিতও আত্মস্বার্থে ও সামাজিক নিন্দার ভয়ে উচিত, ন্যায়, সত্য ও প্রতিবাদ এড়িয়ে চলেন। উপযুক্ত সংগ্রামের সময় তারা নগদ সুবিধার কথা ভেবে লুকোচুরি ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু ড. আহমদ শরীফ বিবেক বন্ধক রেখে মত প্রকাশ করেননি। স্বীয় বিশ্বাস, আদর্শ, যুক্তি, কল্যাণবোধ, মুক্তচিন্তা, মৌলবাদবিরোধিতা প্রকাশ করেছেন সম্পূর্ণ নির্ভয়ে, ডানে-বামে না তাকিয়ে। স্বৈরশাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেও তিনি জনসভায়, আড্ডায়, লেখনিতে প্রকাশ করেছেন গণপক্ষের আবেদন। দেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটে স্বীয় প্রজ্ঞার স্ফুরণে তিনি বার বার জ্বলে উঠেছেন, গর্জে উঠেছেন দুঃসাহস নিয়ে। নির্মোহ এ পণ্ডিত ছিলেন মার্কসবাদী, আন্তর্জাতিকতাবাদী, মানববাদী, গণকল্যাণপন্থী। তার মধ্যে সক্রিয় তারুণ্যের প্রকাশ ঘটেছে আলাপ-আলোচনার হাস্য বিদ্রূপ আর লেখনির সক্রিয়-সতেজ বক্তব্যে। তিনি বিপরীত স্রোতের চিন্তায় এগিয়েছেন একক সংগ্রামীর সুতীব্র সাহস, তারুণ্য আর ধীশক্তি নিয়ে। অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। একাধারে স্বদেশপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী ও আন্তর্জাতিকবাদী মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে তার রচনায়, বক্তব্যে। তিনি বিনা বিবেচনায়, বিনা যুক্তিতে ও বিনা বিশ্লেষণে কোনো মতবাদ গ্রহণ করেননি। এক মতবাদের মধ্যেই সকল সত্যের উৎস, সমস্যার মীমাংসা ও শেষ কথা খুঁজে পাননি। মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অতন্দ্র কলমযোদ্ধা হিসেবে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মঞ্চনেতার বক্তব্যও রেখেছেন। ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠীর নিকট তিনি ছিলেন আতঙ্কের বিষয়, আপোসহীন যোদ্ধা আর দ্রোহী বক্তা। এ জন্যে সাম্প্রদায়িক

পত্রিকা, মৌলবাদীগোষ্ঠী, ধর্মব্যবসায়ী রাজনীতিক তাকে উপর্যুপরি আক্রমণ করেছে। ইহজাগতিক কল্যাণ, পরলোকের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস তিনি অকপটে প্রকাশ করেছেন। কথা ও কাজে তার মিল ছিলো। যে কোনো সরকারের বিরুদ্ধে তিনি স্বীয় মত প্রকাশ করেছেন স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে। এজন্যে তিনি প্রয়াশই জনতার মুখপাত্র হয়ে উঠতেন।

ড. আহমদ শরীফ স্বঘোষিত নাস্তিক ছিলেন কিন্তু অঘোষিত নেতা ছিলেন। উদার মানবতাবাদে তার আস্থা ছিলো। গণতন্ত্র, প্রয়োজনবাদ, ন্যায় ও কল্যাণধর্মে তার ভরসা ছিলো। মানবমুক্তির পথ প্রদর্শনে তার সুচিন্তিত অভিমত আছে বিভিন্ন রচনায়। স্বদেশ-স্বকাল-স্বসমাজের পাশাপাশি তিনি বিরূপ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, বিষময় ও দুর্গন্ধময় রাজনীতির প্রতিও জনগণকে সচেতন করেছেন। তিনি মানবাধিকারপন্থী ও প্রগতিশীল জনগণকে সচেতন করেছেন। তিনি মানবাধিকারপন্থী ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যাতা, আচ্ছন্ন মন নিয়ে মত প্রকাশ করেন নি। আধুনিকমনস্ক ও বাস্তববাদী পণ্ডিত হিসেবে তার মধ্যে গ্রহণ-বর্জনের নিজস্ব ধারা গড়ে উঠেছিলো। এ জন্যে জরুরি বিষয়ে ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তিনি স্পষ্ট মত প্রকাশ না করে পারেননি। তার মনোলোক ছিলো একজন বিবেকবান ও আদর্শপন্থীর। ব্যক্তি জীবনের উদারতা আর মুক্ত আলাপচারিতার মাঝে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন জনগণের মধ্যে। তার কলাম ও প্রবন্ধে স্বকীয় ভাষা ও বক্তব্যের ভার ছিলো, স্পষ্টতা আর যুক্তির মেরুদণ্ড ছিলো। তিনি বাস্তবের বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন আবার ধর্মীয় কল্পলোক ও পরকালের প্রতি নিজস্ব অভিমতও প্রকাশ করেছেন। স্বৈরশাসকের ভয়, সুযোগ সুবিধার প্রলোভন আর তোয়াজ-তোষণের ফন্দি তাঁকে গ্রাস করতে পারে নি। তাঁর নির্ভীক বক্তব্য ও স্পষ্টকণ্ঠ বিপক্ষের নিকট অসহ্য ছিলো কিন্তু যুক্তির মানদণ্ডে তারা তাকে নাকচ করতে পারেনি। নাস্তিক্যবাদী এ পণ্ডিত মৃত্যুর পূর্বেই নিজ দেহ উইল করে গিয়েছেন মেডিকেল কলেজের গবেষণার জন্যে। আর চোখ দিয়েছেন অন্ধের জন্যে। এতোটা বাস্তবতাবোধ এবং চিন্তা ও কাজের মিল তাঁর মধ্যে ছিলো। তিনি গণমুক্তির কামনা করেছেন মুক্তপ্রজ্ঞার প্রসূনে, মানবতাবাদীদের সুসংগঠিত প্রচেষ্টায়। সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তিনি লিখেছেন। শাস্ত্রীয় সাম্প্রদায়িকতা আর সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তিনি সাহসী বক্তব্য রেখেছেন বার বার। সরকারি সহায়তা আর প্রচার মাধ্যমের আনুকূল্য তাঁর জোটেনি। *দৈনিক আজকের কাগজে* নিয়মিত কলাম লিখে পাঠকশ্রেণীর চেতনালোকে সাড়া জাগিয়েছেন। *ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির* সদস্যরূপে স্বাধিকার, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। ধর্মান্ধদের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসে তিনি আঘাত করেছেন কল্যাণ ও প্রগতির লক্ষ্য নিয়ে। কারো ক্ষতি তিনি কামনা করেন নি। স্বৈরশাসক আর স্বাধীনতা বিরোধীদের ক্ষমতা ভোগ নিয়ে তিনি কটাক্ষ ও নিন্দা প্রকাশ করেছেন। স্বৈরবিধি ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তিনি বাঙালি, বাংলাভাষা ও বাঙালিত্ব নিয়ে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বাঙালির ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ শেষে ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় বাঙালির স্বরূপও উন্মোচন করেছেন। মানুষের বাক স্বাধীনতায়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতায়, মুক্তচিন্তায় তাঁর অগাধ আস্থা ছিলো। কালের দাবি উপেক্ষা করে যারা রাজনৈতিক

অপসংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছে তিনি তাদের প্রতি ধিক্কার দিয়েছেন। বাঙালি সংস্কৃতির উৎস, বিকাশ ও বিস্তার নিয়ে তিনি লিখেছেন। আগ্রাসী বিদেশি সংস্কৃতির কবলে বাঙালি সংস্কৃতির বিলুপ্তি তিনি চান নি। তিনি যুক্তি, প্রয়োজন ও কল্যাণের মানদণ্ডে বিদেশি ভালো দিকগুলো গ্রহণেরও পক্ষে ছিলেন। মানুষের নিয়ন্তা মানুষ—এ বিশ্বাসে তিনি সমৃদ্ধ ছিলেন। তিনি দুরাচারী, অধিপত্যবাদী, অন্ধবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে বলে সমাজকে অগ্রসর করতে চেয়েছিলেন। জাগতিক কল্যাণ আর অগ্রসর মুক্তবুদ্ধির আলোকে তিনি মানুষের উন্নয়ন কামনা করেছেন। কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার সামাজিক প্রভাব থেকে তিনি সাধারণ মানুষের মুক্তি কামনা করেছেন। দাসত্ব, অন্ধ আনুগত্য, বিবেচনাহীনতা তাকে পীড়িত ও উদ্বেগাক্রান্ত করেছে। যুগযন্ত্রণা তিনি অনুভব করেছেন যুগপ্রবর্তকের দায় নিয়ে। তিনি স্রষ্টা আর শাস্ত্রকে জিজ্ঞাসা ও সংশয়ের দৃষ্টি নিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও আবদুল ওদুদকে তিনি গ্রহণ করেছেন নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও যুক্তির নিরিখে। বঙ্কিমচন্দ্রের মানবতাবাদী চিন্তাধারা তিনি ছেঁকে তুলে ধরেছেন। অন্যায় ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে নজরুলের সক্রিয় সাহস ও দ্রোহে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদার মানবতাবাদ, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বদৃষ্টি আর কাজী আবদুল ওদুদের যুক্তিনিষ্ঠার তিনি প্রশংসা করেছেন। পীড়নবাদী শক্তিমত্তাকে তিনি ঘৃণা করেছেন আর দুর্বল ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর পক্ষ নিয়েছেন। নির্বিশেষ মানববাদই তার কাম্য ছিলো। তিনি ধার্মিক চান নি, সংস্কারমুক্ত ও প্রগতিপন্থী মানুষ চেয়েছিলেন। গণমুক্তির লক্ষ্যেই তিনি পশ্চাৎপদ ও দরিদ্র স্বদেশবাসীর মৌলিক, মানবিক চাহিদার পূরণ কামনা করেছেন। নিরক্ষরমুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত, সাম্প্রদায়িকতামুক্ত, মৌলবাদমুক্ত ও দুঃশাসনমুক্ত বাংলাদেশ কামনা করেছেন তিনি। আহমদ শরীফ নারীমুক্তি চেয়েছেন নারীর আর্থিক স্বনির্ভরতা ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে। শাস্ত্রাচারজনিত নারীর বন্দিত্বের তিনি মুক্তি চেয়েছেন। বলাবাহুল্য নারীমুক্তি সামাজিক মুক্তিরও পথ। সৌজন্যবোধ ও সুরুচিকে তিনি মনে করেছেন সংস্কৃতি, মুক্তচিন্তাকে গণ্য করেছেন প্রগতির পন্থা, মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠাকে বলেছেন মানব মুক্তির সনদ। তাঁর মতে অজ্ঞতা, কল্পনা, ভয় ও ত্রাস থেকে ধর্মভক্তি ও ধর্মবোধ গড়ে ওঠে। এজন্যে তিনি ধর্মবাদী পণ্ডিতদের অন্ধত্ব ও অযুক্তিকে বরাবর কটাক্ষ করেছেন। দর্শনে-বিজ্ঞানে-সাহিত্যে তাঁর আগ্রহ ও অধিকার ছিলো। তিনি ধর্মীয় বিষয়েও বেশ জানতেন কিন্তু যুক্তিহীন ভক্তির অন্ধত্বকে সমর্থন ও গ্রহণ করতে পারেন নি। গতিশীল ও সন্ধিৎসু মানুষের আবিষ্কার নেশা ও অদম্য কৌতূহল তিনি তুলে ধরেছেন বিভিন্ন রচনায়। অপসংস্কৃতি ও সংস্কৃতিকে তিনি দেশ-কাল-পাত্রের বিবেচনায় গ্রহণ করলেও মনুষ্যত্ব ও মানবতার উত্তরণকেই বলেছেন সংস্কৃতি। উৎকর্ষপ্রাপ্ত, বিকশিত ও গুণসমন্বিত মানুষকেই তিনি বলেছেন মানবতাবাদী। নতুন চিন্তায়, নতুন নির্মাণে, নতুন যুক্তিতে ও নতুন আবিষ্কারের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিলো। সংস্কারমুক্ত মন ও মনীষার এ এক বড়ো লক্ষণ। ধর্মের নামে আস্তিকদের অপরাধ ও দুরাচার তিনি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেন নি বলেই নাস্তিক মানবতাবাদিদেরকে আস্তিক অপেক্ষা শ্রেয় বলে বিবেচনা করেছিলেন। বিজ্ঞানমনস্ক এ পণ্ডিতের মতে, স্রষ্টা-সৃষ্টিতত্ত্বের উদ্ভবের মূলে আছে কার্য-কারণ আবিষ্কারের অসামর্থ্য। মানুষের প্রাণীসুলভ বাঁচার চেয়ে বিকশিত জীবন এবং অগ্রসর ও

যুক্তিভিত্তিক তৎপরতাকে অতি গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করেছেন। তার যৌক্তিক চিন্তার পরিণতিতে সমাজে যে সচেতনতা ও বিবেকবোধ সৃষ্টি হবে, তার মনুষ্যত্ববাদী আকাঙ্ক্ষার উজ্জীবনে যে সমাজ গঠিত হবে, তার সন্ধিৎসু ও মননঋদ্ধ বক্তব্যে মানুষের ও সমাজের যে নবজাগরণ ঘটবে তাতেই নিহিত তার যুগপ্রবর্তনা ও মননবিশ্ব। সক্রিয় দুঃশাসন, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদী আক্রোশ, আধিপত্যবাদী রাজনীতিকে তিনি মনুষ্যত্বের বিরোধী শক্তিরূপে চিহ্নিত করেছেন। তিনি এসব থেকে মানুষের মুক্তি প্রত্যাশা করেছেন। কালের দর্পণে তিনি দেখেছেন সমগ্র স্বদেশ ও জনতাকে আর মনুষ্যত্ববোধ ও গণমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ছিলেন উজ্জীবিত। ধর্মনিরপেক্ষতা, পরিবর্তনবাদিতা, শান্তিপূর্ণ সম্মিলিত সহাবস্থান ও সহযোগিতাকে তিনি কল্যাণের ভরসা বলে চিহ্নিত করেছিলেন একজন যুগপ্রবর্তকের মতো। মানবতার সংকটে ও ক্ষয়িষ্ণুতায়, চিন্তা ও মননের সংকটে, পুঁজিবাদের ছোবলে ও দুর্বৃত্তের পীড়নে তিনি কষ্টবোধ করেছেন। রক্ষণশীল, অনুদার ও গ্রহণবিমুখদের প্রতি তার ঘৃণা ছিলো আর প্রগতিপন্থীর প্রতি ছিলো ভালোবাসা ও সহমর্মিতা।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ : আমাদের ভলতেয়ার

তরুণ চক্রবর্তী

একটি সমাজের বা রাষ্ট্রের উন্নয়ন নির্ভর করে মূলত সেখানকার অধিবাসীরা কোন দর্শনে বিশ্বাস করেন তার ওপর। জগত ও জীবন সম্পর্কিত দর্শনে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পৃথিবীর মানুষ প্রধানত দুই শিবিরে বিভক্ত—আস্তিক ও নাস্তিক। অজ্ঞেয়বাদে ও সংশয়বাদে বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা অতি অল্প। আস্তিক্যবাদে ও নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী মানুষেরাই সমাজ নির্মাণে ও জাতিগঠনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অতএব আস্তিক্যবাদ-নাস্তিক্যবাদ প্রসঙ্গটি রাষ্ট্রীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মানব প্রজাতির সৃষ্টি ও তার ক্রমবিকাশ পূর্বসংস্কারমুক্ত হয়ে মুক্তিবাদী দৃষ্টি নিয়ে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, মানুষের দুর্বল অসহায় মনই ঈশ্বর নামক কনসেপ্টের উৎসভূমি। অর্থাৎ 'ঈশ্বর' মানবমনের অসংখ্য বিচিত্র কল্পনার একটি কল্পনা মাত্র। 'ঈশ্বর'-এর ধারণা থেকে জন্ম হয়েছে অসংখ্য ধর্মের। আর প্রতিটি ধর্ম আত্মার অস্তিত্বে ও অমরত্বে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ পরকালে বা পরলোকে তথা স্বর্গ-নরক বিশ্বাস ধর্মের বা ঈশ্বরবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অতএব যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তাঁরা সবাই পরকালে বিশ্বাস করেন। ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ পরলোকের কল্পিত অনন্তকালীন সুখের তুলনায় ইহজাগতিক জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করেন। ইহজাগতিক উন্নতি তাঁর কাছে অপ্রধান। আর পরলোকের স্বর্গের লোভে ও নরকের ভয়ে লক্ষ্য স্থির রেখে ধর্মগ্রন্থসমূহে যেসব বিধিবিধান রচিত হয়েছে তা মানুষের চিন্তাধারাকে, দৃষ্টিভঙ্গিকে, জীবনাচরণকে অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক ও স্ববিরোধী করে। কারণ ধর্মগ্রন্থে ধর্মবিরোধী কাজের জন্য যেমন শাস্তির উল্লেখ আছে, তেমনি 'একবার রাম নামে যত পাপ হরে, জীবের মধ্যে নাই তত পাপ করে'-এর মতো সমস্ত পাপ থেকে ক্ষমা পাওয়ার উপায়ও আছে। ফলে মানুষ ধর্মকর্ম ও পাপকর্ম একই সঙ্গে করে যাচ্ছে। ধর্মগ্রন্থের বিধান অনুসারে তথা বাইরের নির্দেশে জীবনচালনার প্রবণতা সৃষ্টি হওয়ায় যৌক্তিক মানবিকবোধ ও বিবেক জাগ্রত হয় না। মানুষ হয়ে ওঠে অদৃষ্টবাদী, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে, এমনকি সে নিজে যা কিছু করে তাও ঈশ্বর দ্বারা কৃত ও পূর্বনির্ধারিত বলে সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। স্বশাসিত,সম্পূর্ণ সার্বভৌম প্রাণীর পরিবর্তে সে হয়ে ওঠে একটি যন্ত্র। যন্ত্রের মতো তার মধ্যেও নিজস্ব শ্রেয়বোধ, কল্যাণচেতনা, সমন্বিত জীবনচেতনা, তার নিজের ও সমষ্টির

যুগপৎ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা অনুপস্থিত। এ জাতীয় মানুষ অধ্যুষিত সমাজে আশানুরূপ উন্নয়ন ঘটতে পারে না। পক্ষান্তরে যাঁরা পরকালে বিশ্বাস করেন না, তাঁরা এ জীবনকেই বড় করে দেখেন। এই জগতেই তাঁরা তাঁদের সুখ সর্বাধিক করার চেষ্টা করেন। কারণ তাঁরা অদৃষ্টবাদী হওয়ার পরিবর্তে "Men is the architect of his own fate" তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। একজন নাস্তিক মানুষকে অবশ্যই ইহজাগতিক, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে সংস্কৃতিমান হতে হবে। বস্তুত সংস্কৃতিমান হওয়া অর্থ সমন্বিত জীবনচেতনাসহ সর্বপ্রকার মানবীয় গুণাবলীসম্পন্ন হওয়া। ইহজাগতিক, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থে সংস্কৃতিমান মানুষ অধ্যুষিত সমাজের পক্ষেই কেবল উন্নতির পরাকাষ্ঠায় পৌঁছনো সম্ভব।

ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে পারলৌকিকতার বিপরীতে ইহজাগতিকতার, যাজকতন্ত্রের বিপরীতে গণতন্ত্রের, ধর্মের বিপরীতে বিজ্ঞানের পক্ষে যে সকল আন্দোলন সঙ্ঘটিত হয়েছিল সেই আন্দোলনই ইউরোপের অন্ধকার যুগের অবসান ঘটিয়ে আজকের এই আধুনিক পৃথিবীর জন্ম দিয়েছে। ফ্রান্সের দার্শনিক, লেখক ও ইতিহাসবিদ্ Jean Francois Arouet Valtaire (১৬৯৯-১৭৭৮) অষ্টাদশ শতকে চিন্তার জগতে সবচে প্রভাবশালী ব্যক্তি, যিনি ফরাসি বিপ্লবের ভিত্তি রচনাকারীদের একজন এবং ইউরোপসহ পৃথিবীর দেশে দেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণের নীরব বিপ্লবে ইন্ধন যোগান। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে এবং বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের পক্ষে ভলতেয়ারের পরিষ্কার ও অকাট্য ক্ষুরধার বক্তব্য পৃথিবীর মানুষকে প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করে। ভলতেয়ার নিজেকে কখনও নাস্তিক বলে ঘোষণা করেননি। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ও বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ধর্মবিরোধী ছিল : God does not intervene in the course of events. There is no providence, no miracle, no divine revelation. তাঁর চিন্তাধারা ছিল সম্পূর্ণ বাস্তবধর্মী ও প্রয়োগধর্মী। তিনি ধর্ম শব্দটিকে নৈতিকতার প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করতেন। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মীয় শিক্ষার ইতিবাচক প্রভাব অর্থাৎ ধর্মের শুধু বাস্তবমুখী শিক্ষার অংশটুকু তিনি গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। সত্য, ন্যায়বিচার, সততা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি শব্দগুলোর সমন্বিত স্বয়ংসিদ্ধ শব্দ হিসেবেই ধর্ম শব্দটিকে ব্যবহার করতে রাজী ছিলেন, এর বেশি কিছু নয়।

ভল্‌তেয়ারের মতো আরও অনেক মহাপুরুষ যেমন কার্ল মার্কস, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্, ভি. আই. লেনিন, মাও সে তুং ধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে পৃথিবীকে অনেক এগিয়ে দিয়ে গেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের মতো একটি দেশে যেখানে শিক্ষার হার প্রকৃতপক্ষে ১০-এর কাছাকাছি, অধিকাংশ মানুষ ধর্মীয়ভাবে গোঁড়া, সেখানে একক ব্যক্তির পক্ষে ধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া ও প্রকাশ্যে বক্তব্য রাখা একটি দুরূহ ব্যাপার। প্রয়াত ড. আহমদ শরীফ এই দুরূহ কাজটি সম্পাদন করেছিলেন। ধর্মের বিরুদ্ধে তাঁর প্রকাশ্যে বক্তব্য দেয়াকে মার্কসিস্ট হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে পরিচিত এমন অনেকেই অসমীচীন বলে মন্তব্য করেছেন। ব্যাপারটিকে তারা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রবণতা বলে মন্তব্য করেছেন। আহমদ শরীফের মতো একজন মহান ব্যক্তি সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য অত্যন্ত দুঃখজনক। যাঁরা এধরনের মন্তব্য করেন তাঁদের অনেকেই মার্কসবাদের

প্রবক্তা হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে পরিচিত, কিন্তু ধর্মের বিরুদ্ধে ঘরোয়া পরিবেশেও তাঁরা কখনও কথা বলেন না, বরং তাঁরা কোরবানীর ঈদে গরু 'জবাই' করার মতো পরিবেশ, সমাজ ও অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকারক ধর্মীয় প্রথাও মেনে চলেন। কেউবা প্রয়াত স্ত্রীর মৃত্যুবার্ষিকীতে মিলাদ দেয়ার মতো পারলৌকিক অনুষ্ঠানও করে থাকেন। তাঁরা দৈনন্দিন জীবনে শিষ্টাচার পালনের ক্ষেত্রেও স্বাগত সম্ভাষণে বা বিদায় সম্ভাষণে ধর্মনির্দেশিত শব্দাবলি উচ্চারণ করেন, যা শুধু ইহজাগতিক সংস্কৃতিবিরোধীই নয়, এমনকি বাঙালি সংস্কৃতিরও পরিপন্থী। অর্থাৎ জীবনাচরণে তাঁরা এদেশের ধর্মবিশ্বাসী সাধারণ মানুষের মতোই। গড্ডলিকা প্রবাহের বিপরীতে দাঁড়াবার শক্তি ও সাহস এঁদের নেই। আমার এই লেখা দ্বারা এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষদের আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার কোনো যুক্তি নেই। কারণ এখানে আমি এদেশে যাঁরা বামপন্থী বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত তাঁদের জীবনের স্ববিরোধিতার ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করতে চেয়েছি মাত্র। যাঁরা আন্তরিকভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন এবং ধর্মগ্রন্থের বাণীকে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলে বিশ্বাস করেন তাঁদের পক্ষে ধর্মনির্দেশিতভাবে জীবন যাপন করাই আমি যৌক্তিক বলে মনে করি। ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না বলে আমার নাস্তিক্যবাদী দর্শন অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়ার জবরদস্তি নীতির ঘোর বিরোধী আমি। তবে শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মপ্রচারের যেমন সুযোগ আছে, তেমনি নাস্তিক্যবাদী দর্শনের পক্ষে মত প্রকাশ করার, এমনকি প্রচার চালানোর অবাধ স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা থাঁকা একান্ত জরুরি, অন্যথায় জাতি একটি বদ্ধ ডোবায় পরিণত হবে এবং প্রগতির পথ রুদ্ধ হবে।

এদেশে স্ববিরোধিতামুক্ত একজন মাত্র মানুষের হদিস আমরা জানি, তিনি হচ্ছেন, ড. আহমদ শরীফ–যিনি যা বিশ্বাস করতেন ঠিক তাই লিখতেন ও বলতেন। এই ভূখণ্ডে ড. আহমদ শরীফ একমাত্র ব্যক্তি যিনি ব্যক্তিগত দর্শনকে জলাঞ্জলি দিয়ে সমাজের অন্য দশজনের সঙ্গে কৃত্রিমভাবে একাত্ম হওয়ার ধার ধারেননি, যিনি একঘরে হওয়ার ভয়কে উপেক্ষা করে তাঁর পরিবারের সবাইকে ধর্মীয় আচার পালন না করার নির্দেশ দিতেন। নাস্তিক্যবাদী দর্শনে নিজের বিশ্বাসের কথা ও ধর্মের অসারতার কথা প্রকাশ্যে যে কোনো লোকের সামনে বলতে দ্বিধা করতেন না। তাঁর পক্ষে এটা সম্ভব ছিল কারণ রাষ্ট্রের বা সমাজের, সরকারের, সংগঠনের, প্রচার মাধ্যমের বা প্রেসের, এমনকি কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে কোনোরূপ সুযোগ গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে ছিল না। রেডিও-টেলিভিশনে কোনো সাক্ষাৎকার বা বক্তব্য দিতে তাঁকে কখনও দেখা যায় নি। আমার মনে আছে, '৮৭ বা '৮৮ সালের দিকে বিজয় দিবস উপলক্ষে খ্রিস্টিয় যুব সংগঠনের উদ্যোগে তেজগাঁও কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তৃতা দেয়ার আমন্ত্রণ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কারণ এটি ছিল একটি ধর্মীয় সংগঠনের উদ্যোগ। যাঁরা প্রকাশ্যে তাঁর ধর্মবিরোধী বক্তব্য প্রদানকে অসমীচীন মনে করতেন তাঁরা এর কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেন নি। আমি তাঁর সাথে বেশ কয়েকবার একান্তে কথা বলেছি, গভীর মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনেছি এবং আবিষ্কার করেছি যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যে নির্মম অমানবিকতা বিদ্যমান তা অনুধাবন করে তিনি গভীর বেদনা অনুভব করতেন। যেহেতু ধর্মের আশ্রয়ে পুঁজিবাদ বেড়ে ওঠে, তাই ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলার এক তীব্র প্রেরণা তাঁর মধ্যে নিরন্তর কাজ করতো। তিনি পুঁজিবাদী

সমাজকে সূক্ষ্মভাবে বোঝার জন্য গভীর আগ্রহ নিয়ে সর্বস্তরের জনগণের সাথে মিশতেন এবং কথা বলতেন। তিনি একবার রমনা পার্ক থেকে বাড়ি ফেরার পথে এক রিক্সাচালকের কাছে তাঁর অবস্থা জানতে চেয়ে এক করুণ কাহিনী আবিষ্কার করেছিলেন। সেই রিক্সাচালক রিক্সা চালিয়ে টাকা রোজগার করে তাঁর ছোট ভাইকে ম্যাজিস্ট্রেট বানিয়েছেন, যে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে ঢাকা শহরে বাড়ি করেছে এবং 'সম্মানহানি হবে' এইজন্য রিক্সাচালক বড় ভাইকে তার বাড়ির আশেপাশে না আসতে অনুরোধ করেছে। বৃদ্ধ রিক্সাচালক তাঁর ছোট ভাইয়ের সম্মানহানি ঘটাতে চান না। তাই নিজেকে তাঁর ভাই বলে কখনও পরিচয় দেন না।

ড. আহমদ শরীফ একদিন আমাকে এই সমাজের আরেকটি মারাত্মক বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছিলেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে যে প্রতিযোগিতামুখী সর্বগ্রাসী চারিত্র্য প্রোথিত করে তা তাঁর দেখা কিছু ঘটনার উল্লেখ করে আমার কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমি ঢাকায় বিভিন্ন সময়ে মধ্যবিত্ত-উচ্চমধ্যবিত্তের বিয়ে বাড়িতে বা পিকনিকে অংশগ্রহণ করেছি এবং বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেছি যে, খাবার সময় হলে মাংসভর্তি পাত্র খাবার টেবিলে রাখার সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে মাংসের ভালো টুকরাটি অন্যের আগে নিজের প্লেটে তুলে নেয়া যায়—সবার মধ্যে এরকম একটি নীরব প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়।" তারপর তিনি বললেন, " যারা এই শহরে বাস করে, মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত যা-ই হোক, সবাই তো প্রায়শই মাংস-পোলাও খেয়ে থাকে, তারপরও তাদের মধ্যে এই যে প্রতিযোগিতা ও লোভ এটি ধনতান্ত্রিক সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ধর্ম এখানে মানুষকে ত্যাগের শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।"

আমি আরেক দিন স্যারের সঙ্গে সংস্কৃতি প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলাম যে, "বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতির ফলে, অবাধ তথ্যপ্রবাহের ফলে, যুক্তিবাদের বিকাশের ফলে এখন আর কোনো জাতির বা ভূখণ্ডের বা জনগোষ্ঠীর স্বকীয় সংস্কৃতি বলে কিছু থাকবে না। আর থাকার দরকারও নেই; বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে একটি অখণ্ড বিশ্বসংস্কৃতি।" তিনি সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে আমার কথায় সায় দিয়ে বলে উঠলেন, "এই কথাটিই তো আমি বহুদিন ধরে বলে আসছি। কে কার কথা শোনে! আমি বহুবার বলেছি যে, আধুনিক ইংরেজ সংস্কৃতিই বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত হবে। আমাদেরকেও আমাদের সংস্কৃতির অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক ও ধর্মীয় উপাদানগুলি পরিহার করতে হবে।"

তাঁর সান্নিধ্যে গিয়ে আবিষ্কার করেছি যে, সর্বক্ষণ তাঁর মননে থাকতো স্বদেশ ও পৃথিবীর সব শোষিত মানুষের মুক্তির চিন্তা। তিনি আন্তরিকভাবে ও জোরালোভাবে ধর্মকে মানুষের মুক্তির পথে সবচেয়ে বড় বাধা বলে বিশ্বাস করতেন বলেই সবসময় ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলতেন। রাজনীতির কৌশলগত দিকের বিবেচনায় ধর্মভীরু মানুষের এই দেশে তাঁর এই প্রকাশ্য ধর্মবিরোধী বক্তব্য প্রদান ভুল হতে পারে; কিন্তু তিনি যেহেতু রাজনীতি করতেন না এবং তাঁর যেহেতু ভোটের দরকার ছিল না, তাঁর পক্ষে এই দুঃসাহসিক কাজ অবশ্যই জনকল্যাণমূলক। অতএব প্রশংসার যোগ্য। জনকল্যাণমূলক এই কারণে যে, যারা জন্ম থেকে অন্ধভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তাদের কাছে 'পৃথিবীতে এমন লোক আছে যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না এবং তাদের যেমন

একটি ধর্ম আছে, এই অবিশ্বাসীদেরও তেমনি একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে'—এই তথ্যটি পৌঁছনো একটি বড় কাজ। কারণ এই তথ্যটি তাদের মনের একটি জানালা খুলে দিতে পারে, যে পথ দিয়ে হয়তো কোনো দিন ধর্মের অসংগতি ও স্ববিরোধিতার কারণে ধর্মবিশ্বাস উবে যেতেও পারে। কিন্তু মনের অন্তত একটি জানালা খোলা না থাকলে ধর্মীয় গাঢ় অন্ধকার পরিবেশে মানুষের মুক্তি ঘটবে কোন পথে? আর জনগণের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসকে অটুট রেখে একটি উন্নত প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণ সম্ভব নয়। প্রকৃত গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের কোনো সংঘাত নেই। অতএব ড. আহমদ শরীফ তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে এদেশের ভবিষ্যত সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রভূত উপকার সাধন করে গেছেন। ভল্‌তেয়ার যেমন স্কুলজীবন থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত ধর্মের বিরুদ্ধে, ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুখে ও কলমে সর্বদা সোচ্চার ছিলেন এবং একটি আধুনিক পৃথিবী নির্মাণের ভিত্তি গড়ে গিয়েছিলেন, তেমনি ড. আহমদ শরীফও একটি উন্নত আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার ভিত্তি নির্মাণ করে গেছেন। ভল্‌তেয়ার বা আহমদ শরীফের মতো মানুষের জন্ম যে কোনো জাতির জন্য চরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। এরকম মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে যত বেশি হয় ততই মঙ্গল।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সাহস ও দ্রোহের প্রতীক

মহসিন শস্ত্রপাণি

ড. আহমদ শরীফ ষাটের দশকের শেষার্ধ থেকে মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনে সাহস ও দ্রোহের প্রতীক হিসেবে তাঁর ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ক্রমে জেগে উঠেছিলেন ঘটনাধারার মধ্য দিয়ে। সত্য-সন্ধানী ও নিষ্ঠাবান জ্ঞানান্বেষী গবেষক হিসেবে ভূমিকা পালনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংস্কার আবদ্ধতা থেকে নিজের চৈতন্যকে মুক্ত করে উদারনৈতিক মানবতাবাদীর পরিচয় অর্জন করেছিলেন। যার তুলনা আমাদের কালে বিরল। তিনি সমাজের অন্যায়-অনাচার, মূর্খতা-নিচতা, কূপমণ্ডূকতা, কুসংস্কার, কুআচার এবং সাম্প্রদায়িকতা-ধর্মান্ধতা-মতান্ধতা ও ধর্মীয় ফ্যাসিস্ট আচার-আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিকারাকাঙ্ক্ষী বিদ্রোহের এক বিবেকবান অকুতোভয় জাগ্রত চেতনার প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন।

তিনি কখনই কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেননি বা অনুসরণ করেননি। কোনো দলের বা দলীয় শৃঙ্খলার সাথে লগ্নও হননি। তবু তিনি নিজের কাল ও ইতিহাস-চেতনা এবং বিচারবুদ্ধি ও বিবেকের তাড়না দ্বারা চালিত হয়ে সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং সামন্ততান্ত্রিক পশ্চাৎপদতা ও লুটেরা ধনিক শ্রেণীর শোষণ-লুণ্ঠন ও দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার, ঘুষ-দুর্নীতি, নৈরাজ্য-বিশৃঙ্খলা ও দুর্বৃত্তায়ন-দুঃশাসনের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক ব্যক্তির সফল আন্দোলনে উদ্দীপ্ত বোধ করতেন এবং স্বপ্রণোদিত হয়ে এসব আন্দোলনের সাথে থেকেছেন, কখনো বা পুরোভাগে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

তাঁর সঠিক নৈকট্য ছিলো মার্কসবাদী বিপ্লবী কিম্বা কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রায় সকল ধারার সাথে। সমাজতন্ত্রের পক্ষে যাঁরাই কথা বলেছেন তিনি তাঁদের সাথে একাত্ম বোধ করতেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা এবং এসব ধারার সাথে যুক্ত গণসংগঠন ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো সব সময় তাঁর সমর্থন ও উৎসাহ পেয়েছে। ছোট-বড়ো যে কোনো সাংস্কৃতিক সংগঠন-সংকলনে লেখার জন্যে কিংবা আলোচনা সভায় বক্তা, প্রধান অতিথি বা সভাপতি হিসেবে যোগ দেবার অনুরোধ জানালে তিনি সাড়া দেবার জন্যে সব সময় প্রায় প্রস্তুতই থাকতেন। যেদিন যে সময়ে তিনি লেখা দেবেন বলে কথা দিতেন সেই দিন সে সময়েই লেখাটি পাওয়া যেতো (অন্য রকম অভিজ্ঞতা

অন্তত আমার নেই)। লেখকদের ক্ষেত্রে এমনটা প্রায় দেখা যায় না। অবশ্য কেউ ইচ্ছে করে লেখা দেবার কথা বলে ঘোরান না—অবস্থার চাপে বাধ্য হলেই সে ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। কিন্তু ড. আহমদ শরীফের ক্ষেত্রে তেমন ঘটনার অভিজ্ঞতা কারো যদি থাকে, তাকে ব্যতিক্রম হিসেবেই দেখতে হবে। তেমনি কোনো আলোচনা সভায় তিনি যোগ দিতেন নির্ধারিত সময়েই।

মার্কসবাদকে তিনি জীবনাদর্শ বা বিশ্বদৃষ্টি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি সমাজতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে। পূর্ব ইউরোপে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রী নামে পরিচিত রাষ্ট্রগুলো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে পুঁজিবাদের পথে যাত্রা শুরু করায় সারা দুনিয়াব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত প্রচারমাধ্যম ও তাদের পোষ্য বুদ্ধিজীবীরা সমাজতন্ত্রের অসারতা ও অমানবিকতা প্রমাণিত হয়েছে বলে উদ্বাহু নৃত্য করছে। সেই সাথে শতকণ্ঠে গুণগান গাইছে ধনবাদের পক্ষে। তা দেখে বিশেষ করে আমাদের দেশে বহু 'দৃঢ়চিত্ত' ও 'উচ্চকণ্ঠ' বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী ডিগবাজি খেয়ে পক্ষ পরিবর্তন করে ধনবাদের পদতলে আশ্রয় নিয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও লুটেরা ধনিক-বণিক শ্রেণীর সেবায় নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের প্রতিযোগিতায় শামিল হয়েছে। আর যারা নিজেদের এতোটা অধঃপতিত করতে পারেনি তারা হাতাশার পাঁকে হাবুডুবু খাচ্ছে। কিন্তু ড. আহমদ শরীফ এতটুকু বিচলিত হননি। সমাজতন্ত্র যে শেষ পর্যন্ত সারা দুনিয়াব্যাপী বিজয়ী হবে এবং সমগ্র মানবজাতির মুক্তির আর কোনো বিকল্প নেই—সে বিষয়ে তাঁর এতটুকু সংশয় ছিলো না। 'সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী সঙ্ঘ' গঠনে তাঁর উৎসাহী ও অগ্রণী ভূমিকা তার এক অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সঙ্ঘ শক্তির প্রতি তাঁর ছিলো প্রগাঢ় আস্থা। তিনি আন্তরিকতার সাথেই কমিউনিস্ট শক্তির ঐক্য চাইতেন। তাই তিনি কখনই একলা চলার পন্থা অবলম্বন করেননি। সব সময় তিনি কোনো না কোনো সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকেছেন কিংবা স্ব-উদ্যোগে তাঁর গুণগ্রাহীদের নিয়ে সঙ্ঘ তৈরি করেছেন।

শাসক ও শোষক শ্রেণীর কাছে বুদ্ধিজীবীদের আত্মবিক্রয়কে তিনি তীব্রভাবে ঘৃণা করতেন। তাই কখনই তাঁকে শাসক ও শোষক শ্রেণীর উমেদারি করতে দেখা যায়নি। পদ ও পদক লালসা তাঁর চেতনাকে কখনো কলুষিত করতে পারেনি।

তিনি সাধ্যমতো মানুষের সংগ্রামী চেতনাকে জাগ্রত করতে চেষ্টা করেছেন লিখে এবং বক্তৃতা দিয়ে। তার ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁকে 'মুরতাদ' হিসেবে 'অভিযুক্ত' হতে হয়েছে। কিন্তু তাতেও তিনি ভয় পেয়ে আত্মসমর্পণ করেননি, কিংবা সরে দাঁড়াননি। কখনো কখনো তাঁকে কিছুটা নিঃসঙ্গতার বেদনা সইতে হয়েছে বটে, কিন্তু তাতেও তিনি হতাশ হননি ও সাহস হারাননি।

আমাদের কালে এমন বিবেকী মানবপ্রেমী ও দ্রোহী পণ্ডিত সত্য সত্যই বিরল। তাঁর গবেষণামূলক ও মননশীল রচনাবলি এবং সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনে তাঁর সাহসী ভূমিকা আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বহুদিন প্রেরণা যোগাবে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। ড. আহমদ শরীফের স্মৃতি অক্ষয় হোক।

অধ্যাপক আহমদ শরীফের সামাজিক দায়িত্ববোধ

নেহাল করিম

বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অধ্যাপক আহমদ শরীফ ছিলেন একজন প্রধান আলোচিত ও সমালোচিত ব্যক্তিত্ব। আলোচিত, শ্রদ্ধেয় ও আকর্ষিত ছিলেন সাধারণ শিক্ষিত, বোধশক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী ও সংস্কারমুক্ত বা মুক্তমনাদের কাছে। অপরদিকে কঠোরভাবে সমালোচিত, বিতর্কিত ছিলেন সংস্কারবদ্ধ বিজ্ঞানবিমুখ, ধর্মান্ধ, ভীরু, সরকারের লালিত জাতীয় বুদ্ধিজীবী ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের কাছে। এ কথা সত্যি যে, পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে অদ্যাবধি এমন কেউ নেই যিনি পুরোমাত্রায় শুদ্ধ, মার্জিত, শিক্ষিত, জ্ঞানী, কিংবা সমালোচনার উর্ধে। তাই ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যাবে এমন কেউ নেই যার গ্রহণযোগ্যতা সব শ্রেণীর কাছে ছিল বা আছে। অধ্যাপক আহমদ শরীফও এর ব্যতিক্রম নন, তাঁরও গ্রহণযোগ্যতা সমাজের অনেকের কাছে ছিল না। তাঁকে যারা জানতেন বা চিনতেন তাদেরও অনেকে তাঁকে পছন্দ করতেন না। কেননা তিনি কোনো রকমের ভূমিকা না দিয়ে, মন না যুগিয়ে অকপটে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতেন। এতে তাঁর সামনে যাঁরা থাকতেন বা কোনো স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে কথা বলার জন্য আসতেন, তাঁরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হতেন।

সব সমাজেই দেখা গেছে যে, মানুষ মাত্রই সচেতন। এই সচেতনতা থেকেই তার মধ্যে স্বার্থচেতনা প্রকাশ পেয়ে থাকে এবং এরই বশবর্তী হয়ে মানুষ মনুষ্যত্বকে দমিত করে নিজের সুবিধের জন্য স্ব-স্ব স্বার্থ হাসিল করে থাকে। আমাদের সমাজে প্রায়ই দেখা যায়, মানুষ শুধু নিজের জন্য সুবিধে পেতে চায়, অন্যের অসুবিধেকে বিচেনায় আনে না। কিন্তু এ জাতীয় মনোভাব ধারণ করলে এক সাথে সহাবস্থান করা যায় না। সহাবস্থানের পূর্বশর্ত হচ্ছে নিজের কিছু স্বার্থ বা সুবিধে ছাড় দিয়ে অন্যকে কিছু সুবিধে দেয়া। অধ্যাপক আহমদ শরীফ কোনো সময় নিজের জন্য এমন কোনো ধরনের সুবিধে নেন নি, নিতে চাইলে হয়তো পারতেন। আজীবন তিনি গণমানুষের আর্থ-সামাজিক মুক্তি চেয়েছেন এবং এ লক্ষ্যে বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে চেষ্টা করে গেছেন। সুবিধে নেয়ার দৌড়ে কোনো অবস্থাতেই তিনি জাতীয় বুদ্ধিজীবীদের (!) সাথে পাল্লা দেননি, কেননা তারা নগদে বিশ্বাসী, তাই 'নগদজীবী' (!)।

জীবিতকালে তো বটেই এমনকি মৃত্যুর পরেও তিনি ভীষণভাবে সমালোচিত হয়েছেন, সমালোচিত হয়েছেন দেশ-কাল-সমাজ তথা সাধারণ মানুষের কল্যাণার্থে তাঁর চিন্তা, ভাব ও কর্মের জন্য। প্রথাগত বা প্রাতিষ্ঠানিক অনেক বিষয়ের কার্যকারিতা সম্পর্কে তার আস্থা বা উৎসাহ ছিল না। কেননা, বাংলাদেশের সমাজ মূলত রক্ষণশীল এবং এ গোষ্ঠীই মূলত এ সমাজের চালিকাশক্তি এবং এই গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য আদিম ও মধ্যযুগীয় সব সামাজিক মূল্যবোধকে ধারণ করে সেগুলোকে জিইয়ে রাখার চেষ্টায় প্রতিনিয়ত তৎপর। এই প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাত থেকে সমাজকে সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে হাতে গোনা যে ক'জন মুক্তমনা ব্যক্তি অবিরাম সংগ্রাম করে গেছেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক আহমদ শরীফ নিঃসন্দেহে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। অধ্যাপক আহমদ শরীফের জীবন ঘটনাবহুল এবং বর্ণাঢ্যময়, দেশের যে কোনো ক্রান্তিলগ্নে যখন কোনো রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তি বিশেষ কোনোরূপ মন্তব্য করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, তখন আর কেউ না হলেও অন্তত অধ্যাপক আহমদ শরীফ তাঁর লেখনী বা বক্তৃতার মাধ্যমে অবলীলায় দেশ ও মানুষের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর ঘটনাবহুল জীবন থেকে কিছু সংবাদ প্রতিবেদন ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকার পাঠ করলে এ বিষয়ে একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে।*

ড. তাজুল ইসলাম হাশমী তাঁর এক রচনায় লিখেছেন, "ড. আহমদ শরীফ জীবদ্দশায় বাংলাদেশের শিক্ষিত ও বোধশক্তিসম্পন্ন লোকের কাছে বিতর্কিত ও ভ্রান্ত ধারণায় আচ্ছাদিত একজন আবেগপ্রবণ ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। শরীফ স্যারের পাণ্ডিত্য ও চারিত্রিক দৃঢ়তার কারণে বাংলাদেশের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রফেসর এমিরিটাস, জাতীয় অধ্যাপক, জনকর্ম কমিশন বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়াটা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু কোনো সরকারই তাঁকে যথাযথ সম্মান করে নি। উপরন্তু তিনি যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনর্নিয়োগ বা প্রফেসর এমিরেটাস বা জাতীয় অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্তি না পান, এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগের অধ্যাপকরা সবসময়েই সচেষ্ট ছিলেন (সাপ্তাহিক হলিডে, ৩ মার্চ, ১৯৯৯।" অধ্যাপক আহমদ শরীফ বিষয়ে এই ধরনের অবমূল্যায়ন তথা কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া থেকে আমরা বুঝতে পারি তিনি কেন এদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে দিতে দ্বিধা করতেন না।

তিনি কোনো সরকারী মন্ত্রী, আমলা বা গণমাধ্যম কিংবা অভিজাত প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ততা রাখেন নি। তাঁর বিশাল গ্রন্থরাজির সাথে অনেকের পরিচয় ঘটেনি, অনেকের নিকটই অপঠিত রয়েছে। আজ শারীরিকভাবে তিনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকতে না পারলেও তাঁর রচিত ও প্রকাশিত সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ইতিহাস ও দর্শন সম্বন্ধে মোট ১৩৮৪৪ পৃষ্ঠা ছাপাকৃত, যা তাঁর ১০০টি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, সেগুলো আগামীতে মুক্তচিন্তা বিকাশের ক্ষেত্রে আমাদের বিবেককে উজ্জীবিত ও চালিত করতে সহায়ক হবে বলে আমরা আশা করতে পারি।

[* এ ধরনের ঘটনার কিছু বিবরণ জীবনপঞ্জি অংশে বর্ণিত আছে।—সম্পাদক]

অধ্যাপক আহমদ শরীফ : সুদীর্ঘ মনোলগ

মামুনুর রশীদ

পৃথিবীর সকল মননশীল লেখকই নিজেকে প্রকাশ করার জন্যে একটা ভাষা নির্মাণ করেন। নাটকের ক্ষেত্রে আমরা বলি নাট্যভাষা। নাট্যভাষা নির্মাণ করেই চরিত্রের মুখে মুখে সংলাপের বুনন সৃষ্টি করেন নাট্যকার। এরকম লেখক-পণ্ডিত খুবই বিরল যাঁর মুখের কথা, লেখার ভাষা, চিন্তার ভাষা একই লক্ষে, একই কর্মে এবং বলিষ্ঠতায় অনন্য। আমরা যদি অধ্যাপক আহমদ শরীফের ক্লাসের লেকচার, লেখা, আড্ডায় তাঁর আলাপচারিতাকে এক জায়গায় আনতে পারি তাহলে তা এক দীর্ঘ মনোলগে দাঁড়িয়ে যাবে। জীবনের প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ মনোলগ আমাদের মতো ক্ষুদ্রবুদ্ধির লোকের পক্ষে অনুধাবন করা, আত্মস্থ করা বা সে-সম্পর্কে আলোচনা করা প্রায় অসম্ভব। কারণ তার ভাবনার সীমা এবং মনোলগের পরিসর মধ্যযুগ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনার কাজকে ছাড়িয়ে তাঁর পরিক্রম বিজ্ঞান, রাজনীতি, নৃতত্ত্ব, ইতিহাসসহ জীবনপ্রবাহের গুরুতর দিকগুলো পর্যন্ত প্রসারিত। পরিশ্রমী, অক্লান্ত এই কথক জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে বিক্ষুব্ধ, বঞ্চিত, আহত হয়েও তাঁর মনোলগ থেকে থেমে থাকেননি।

সেই মনোলগ কখনো নিজেকে আবিষ্কারের, আত্মসমালোচনার। তিনি অকপটে বলতে পারেন, "আমরা চিরকাল আশায় আশায় জেগেছি, চিরকাল অভাবে অভাবে পোড় খেয়ে শিখেছি। সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাংলাদেশে নতুন চিন্তা-চেতনার উদ্ভব ঘটেছে পরাজয়ের, উপদ্রুতের গ্লানি ও ক্ষোভ থেকেই, বিদেশী বিজাতি বিভাষী বিধর্মীর আকস্মিক আবির্ভাবজাত উপদ্রব থেকেই, শোষণের-শাসনের পেষণ-পীড়নের অভিঘাত থেকেই। গোড়া থেকেই আমাদের জাগরণ, আমাদের নতুন চেতনার উন্মেষ, নতুন চিন্তার উদ্ভব। নতুন অঙ্গীকারের, নতুন উদ্যমের, নতুন উদ্যোগের মূলে উঠতি উরালীর উদ্যম-প্রয়োগ নয়, আমাদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের উৎস ও ভিত্তি হচ্ছে আত্মরক্ষার সচেতন-অবচেতন প্রয়াস ও প্রযত্ন। এর সঙ্গে মধ্যরাতের সুখস্বপ্ন থেকে অভাবিত অনভিপ্রেত অভিঘাতে, আর্তচিৎকারে ত্রস্ত মানুষের কাঁচামুখে আকস্মিক জাগরণের তুলনা করা চলে।"

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় আবার বলেছেন, "বাঙালির বৃত্তি যথার্থ বৈতসী, যে আদর্শ যে ভাবস্রোতের আলোড়ন ঘটনার যে তরঙ্গ যখন লাগিয়াছে, বাংলাদেশ তখন বেতস লতার মত নুইয়া পড়িয়া অনিবার্যবোধে তাহাকে মানিয়া লাইয়াছে এবং ক্রমে নিজের মতো করিয়া তাহাকে গড়িয়া লইয়া নিজের ভাব ও রূপ দেহের মধ্যে তাহাকে সমন্বিত ও সমীকৃত করিয়া লইয়া আবার বেতস লতার মতই সোজা হইয়া স্বরূপে দাঁড়াইয়াছে। সে দুর্মর অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তিই বাঙালিকে বাঁচাইয়াছে।"

দুই পণ্ডিতই বাঙালির এই সঙ্কটকে উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু আহমদ শরীফ বেতস লতার অনিবার্যতাকে অস্বীকার করে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর মনোলগকে প্রকাশ করেছেন প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে।

পণ্ডিতেরা সাধারণত স্থিতধী, আত্মমনস্ক, নির্বিরোধ হতে ভালোবাসেন। শাস্ত্রচিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। কদাচিৎ কোনো ঘটনায় উদ্বিগ্ন হন। সে উদ্বেগের কারণও কখনো একান্ত ব্যক্তিগত। আহমদ শরীফ সেক্ষেত্রে উপমহাদেশের এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম যিনি জীবনের প্রতিমুহূর্তে উদ্বিগ্ন থেকেছেন। যখন দেখা যায় সিরাজ শিকদার বিনা বিচারে নিহত হন, অথবা কর্নেল তাহেরকে প্রহসনমূলক বিচারে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে হয়, তখন আহমদ শরীফই এগিয়ে আসেন। নির্ভয়ে তিনি প্রতিবাদ জানান প্রকাশ্যে। তাসলিমা যখন আক্রান্ত হন মৌলবাদীদের দ্বারা তখনও তিনি প্রশ্ন তোলেন, এগিয়ে আসেন সামনে।

নাস্তিক্য দর্শনে বিশ্বাসী আহমদ শরীফ প্রকাশ্যেই তাঁর ঘোষণা দিতেন। যখন কমিউনিস্ট নামধারীদেরও ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন করতে হয় তখন আহমদ শরীফের এই ভূমিকা বিস্ময়কর। কিন্তু তিনি নিজের বিষয়টি মৃত্যুর আগেই চুকিয়ে দিয়ে গেছেন।

আহমদ শরীফ নিয়মিত হাঁটতেন। হাঁটতেন উদ্ধত ভঙ্গিতে, কথাও বলতেন উদ্ধতভাবে। আড্ডায়ও ছিলেন তিনি ব্যতিক্রমী কণ্ঠ।

বুদ্ধিজীবীরা যেমন সাধারণত ফোরাম বুঝে কথা বলেন, আহমদ শরীফ জীবনেও এই 'বুঝ' বুঝতেন না। সেজন্যে তাঁর মতামতের প্রতি ছিল সবার ভয়। ভয়ে বুদ্ধিজীবীরা এমন সব কাজ করে ফেলতো যে নিজেরাই মানুষের কাছে ছোট হয়ে যেতো। বাংলা একাডেমীর অনুষ্ঠানে ভাষণ দেবার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ১৪০০ সালে। তিনি প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন। কিন্তু সকাল বেলায় তাকে নিষেধ করে দেয়া হয়েছিল। এত ভয়! ভাষণটিতে তিনি ঠিক করেছিলেন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করবেন : ক. চৌদ্দ শতকের রাজনৈতিক ঘটনাবলির রূপরেখা। খ. পনের শতকে অবশ্য-সমাধ্য সঙ্কট ও সমস্যা। গ. স্বাগতম পনের শতক। ঘ. সংস্কৃতির বিকাশ বিস্তার ইত্যাদি।

এই আলোচনাসভা হলে কি সরকার পতন হয়ে যেতো? অবশ্যই নয়। তাহলে ভয়টা কাদের? ভয় ছিল অনুপযুক্ত পণ্ডিতদের। এদেশে বহুবার প্রমাণিত হয়েছে উপযুক্ত লোকদের, নির্ভীক বুদ্ধিজীবীদের কোণঠাসা করার জন্যে ঐ অপটু, অদক্ষ লোকরা একটা মরণপণ লড়াইয়ে নিযুক্ত থাকে। রাষ্ট্রীয় ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় দলবাজিতে ওস্তাদ এইসব লোক পদ, সম্মান, অর্থ নানাভাবে নিজেদের কবজায় নিতে ভীষণ দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকে। সে হীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে আহমদ শরীফ সরে এসেছেন। ক্লাসরুম বা লাউঞ্জ থেকে বিতর্কিত

হয়েও তিনি তার ড্রইংরুম, রাজপথ, পার্কের কোণটায় সক্রেটিসের কাজটি করে গেছেন। অনর্গল মনোলগ রচনা করে গেছেন।

মেরুদণ্ডবান, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ তৈরি হল না বলে সারাজীবন তিনি আক্ষেপ করেছেন। শিক্ষাব্যবস্থাকে সমালোচনা করেছেন। যুক্তিতর্ক ও পাণ্ডিত্য দিয়ে তিনি প্রতিক্রিয়াশীলদের বেতস লতার মতো শুইয়ে দিয়েছেন। কিন্তু পরে আবার তারা উঠে দাঁড়িয়েছে। দুর্বলতাকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ঢেকে শক্রতায় লিপ্ত হয়েছে।

এই প্রক্রিয়ায় তৈরি হওয়া মানুষরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সামনে বেতস লতা, আড়ালে সিংহ। সামনে স্তাবকতা, পেছনে শক্রতায় লিপ্ত হওয়া একটা জাতিগত চরিত্রে পরিণত হয়েছে। তিনি কালো পিঁপড়ে এবং লাল পিঁপড়ের কথা বহুবার আলোচনা করেছেন। আজ আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিটাই পচে গেছে। কেউ আর দৃঢ়চেতা হতে পারছে না। ত্যাগী মানুষের বদলে ভোগী উচ্চবিত্তের হাতে দেশ আর শাসনের বদলে লুণ্ঠনের ভার পড়েছে তাদের উপর। আর তাকে জায়েজ করার জন্যে একদল বুদ্ধিজীবী সদাই প্রস্তুত থাকে।

মধ্যযুগের সাহিত্যে গবেষণা কাজে নিয়োজিত মনোযোগী একজন ছাত্র সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন নিরীহ শিক্ষক হিসেবে অথবা উচ্চকণ্ঠে দরকষাকষি করে উপাচার্য, মন্ত্রী বা আমলার বিলাসবহুল জায়গাটি দখল করতে মোটেই বেগ পেতে হতো না তাঁর। কিন্তু আজকের সক্রেটিসের কাজটি তাহলে কে করতো? আহমদ শরীফ যে পথে সারাজীবন পরিভ্রমণ করলেন সেটাই যে একজন শিক্ষিত লোকের পথ তা কি করে বোঝানো যাবে? শিক্ষাকে ক্ষমতায় ও অর্থে রূপান্তরিত করাই যেখানে আজ প্রধান প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আহমদ শরীফের অনেক অনুরক্ত ছাত্র আছেন সারা দেশে। একবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের বিদায় উপলক্ষে আয়োজিত বক্তৃতায় তিনি উচ্চকণ্ঠে বলেছিলেন, তোমরা শুধু শিক্ষার বাহন নও, তোমরা প্রগতিশীল ভাবনার বাহন, তোমরা প্রচারক, পথপ্রদর্শক। তোমরা তোমাদের কর্মক্ষেত্রে আমাদের নতুন দিনের ভাবনাকে ছড়িয়ে দেবে। কতজন ছাত্র সে ভাবনাকে ছড়িয়ে দিয়েছে? হয়তো কেউ কেউ নিশ্চয়ই আমরণ এ কাজ করে যাচ্ছেন। আপোসহীনভাবে। অধিকাংশই জীবনের মোহের কাছে পরাজিত হয়েছেন।

সত্যভাষণ ও সাহস থাকলে কি হয় আহমদ শরীফ তা প্রমাণ করেছেন বহুবার। একবার সংসদ সদস্যদের তিনি আক্রমণ করেছিলেন, শোনা গিয়েছিল একটা ভীষণ ঝড় উঠবে। কিন্তু পরদিনই একজন সাংসদ খুনের অভিযোগে গ্রেফতার হয়ে যায়। ধর্মব্যবসায়ীরা একবার শুক্রবারে তার বাড়ি আক্রমণ করার ঘোষণা দেয়। তিনি সশরীরে বাড়িতে অপেক্ষা করেছেন। কিন্তু ধর্মীয় উন্মাদনার প্ররোচকরা সে সাহস পায়নি। তবে বাসায় তারা বোমা নিক্ষেপ করেছে।

তাই মাঝে মাঝে ভাবতে শিহরন জাগে, লক্ষ লক্ষ লোক যদি অকপটে নিজেদের প্রকাশ করার সাহস পেতো তাহলে জাতির ইতিহাসটাই পাল্টে যেতো।

তিনি যতো লিখেছেন তার চাইতে অনেক বেশি বলেছেন এবং সশরীরে ভূমিকা পালন করেছেন। এই ভূমিকাটাই সবার আগে। তার লেখা আমাদের জাতির এবং পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। যদি তিনি শুধু নিভৃতচারী প্রতিবাদী পণ্ডিত হতেন তাহলে সত্যভাষণের সাহসকে প্রেরণা জোগাতে পারতেন না।

আজকে সমাজে অন্তত কিছু মানুষ আছেন যারা প্রতিবাদ করে কিছুটা ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছেন। তাদের কাছে আহমদ শরীফের প্রয়োজন যে কতো তীব্র তা প্রকাশ করা যাবে না। এমন কোনো পণ্ডিতকে আজ হয়তো খুঁজেই পাওয়া যাবে না যার গৃহে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত থেকে শুরু করে শ্রমিক আন্দোলনের তরুণ কর্মীটির যাতায়াত ছিল নির্বিঘ্ন। তাই তার স্মরণসভায় যখন সময়াভাবে শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীদের বলতে দেয়া হয়নি তখন তারা ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন এবং বলেছিলেন আহমদ শরীফ তাদেরই সম্পদ। তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। এ খুবই সত্য কথা। তিনি নিজে কখনও করুণা ভিক্ষা করেননি। এগুলো তিনি পরোয়াও করেননি। তাই মৌলবাদীদের বিক্ষোভের মুখে আবদুল মান্নানকে সাথে করে গোপালগঞ্জ আদালতে উপস্থিত হয়েছিলেন। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত কোনো পুলিশ অফিসার বা সেনাবাহিনীর আত্মীয়কেও অনুরোধ জানাননি।

এসব লোকের পাশে প্রতিষ্ঠিত লোকরা এসে দাঁড়ায় না। একটা টেলিফোন করতেও ভয় পায়। ভয়াবহ অনিশ্চয়তায় ভোগে তারা। কিন্তু আহমদ শরীফের কোনো অনিশ্চয়তা বোধ ছিলো না। অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তাহীনতাকে অতিক্রম করা যে সম্ভব তা তিনি প্রমাণ করেছেন নিজের জীবন দিয়ে। তিনি যে অবলীলায় নিঃসংকোচে উইল করে দিয়েছিলেন তার মৃহদেহটি দান করার জন্যে তা কার্যে রূপান্তরিত করতেও তার স্বজনদের অনেক বেশি সাহসের পরিচয় দিতে হয়েছে। সংকটকে অতিক্রম করতে হয়েছে। নিজের সাহসের, কুসংস্কারহীনতার সাথী করে গেছেন অন্যদেরও। অনেক প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীদেরও দ্বিধান্বিত দেখেছি, অবাক হতে দেখেছি সে সময়ে।

আজ সেই অভিনেতার মনোলগ নেই। তিনি মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছেন বটে। হয়তো তার সহঅভিনেতা উইংসের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে না। কিন্তু শেক্সপীয়ারের সংলাপকে তিনি ভ্রান্তও প্রমাণ করেছেন। একথা তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যে,

It is a tale told by an idiot
Full of sound and fury signifying nothing.

উল্টো কাজটি করে গেছেন আহমদ শরীফ। তাঁর কথায় শব্দের জোর ছিলো। একটি শব্দকে যথাশব্দ দিয়ে শক্তিশালী করতেন এবং সবটা মিলিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতেন এবং শ্রোতাকে ভাবতে বাধ্য করতেন। যারা তার মনোলগের শ্রোতা বা ডায়ালগের অংশীদার তারা কতটা তার অনুসারী? একথা বলা যায় না কেউ তার অনুসারী নন বা সবাই তার অনুসারী। তবে তাদের অনুভবে আহমদ শরীফের জায়গাটি যে ভীষণ দৃঢ় তা আমরা যারা তাঁর সরাসরি ছাত্র নই তারাও বুঝতে পারি। তাঁর উপস্থিতি এক প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে উপস্থিত হতে বাধ্য।

তিনি স্তাবকতা পছন্দ করতেন না। স্তাবকতা করে তাকে ছোট করার কোনো প্রয়োজনও নেই। তবে আজ মনে হয় সমাজে তার অনেক বেশি অনুসারী প্রয়োজন। কিন্তু হয়েছি কি?

আহমদ শরীফ

রফিকুল ইসলাম

অধ্যাপক আহমদ শরীফের প্রয়াণে দেশ ও জাতি এমন একজন মানুষকে হারালো যাকে নিয়ে আমরা গৌরব করতে পারতাম। গৌরব করার মতো মানুষও এ দেশে খুব কম আর থেকে থাকলেও গুণীর কদর আমাদের দেশে বিশেষ নেই। প্রয়াণের পর স্বনামধন্য কৃতী মানুষকে নিয়ে আবেগ-উচ্ছ্বাসে আমরা মেতে উঠতে পারি কিন্তু জীবদ্দশায় তার প্রাপ্য সম্মানটুকু দিতে আমাদের কার্পণ্যের সীমা নেই। এহেন দেশেও যে আহমদ শরীফের মতো ব্যতিক্রমধর্মী, গুণী পুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেটাই আশ্চর্যের বিষয়। আহমদ শরীফের কর্মজীবনের শুরু কলেজে বাংলার শিক্ষকতা দিয়ে। তারপর আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত বিশাল পুথির ভাণ্ডার নিয়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগদান করেছিলেন। বাংলা বিভাগে কর্মজীবনের প্রথম এক যুগ তাঁর অতিক্রান্ত হয়েছিলো মধ্যযুগে রচিত গুরুত্বপূর্ণ পুথি সম্পদনা ও প্রকাশনায়, যার ফলে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বেশ কিছু শূন্যস্থান পূরণ হয়েছিলো। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের আরব্ধ কার্য শেষ করে তিনি এক জাতীয় কর্তব্য সম্পাদনা করেছিলেন, অন্যথায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস একপেশে ও অসম্পূর্ণ থেকে যেতো।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ মধ্যযুগের একজন পুথি বিশারদ হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্যেই জন্মগ্রহণ করেননি। তাই আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের উত্তরাধিকারের দায়িত্ব পালন করতে করতে তিনি তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতির আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসবেত্তাও হয়ে ওঠেন। আহমদ শরীফ যে দেশে যে কালে যে সমাজে জন্মগ্রহণ ও জীবন-যাপন করেছেন সে দেশের মানুষের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে এক মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন। এ দেশের মানুষের বাঁচার সংগ্রাম আর বার বার বঞ্চনার শিকার হওয়ার ইতিহাস তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিলো। তাই আমৃত্যু তিনি তাঁর পরিচিত শোষিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের কথাই লিখে ও বলে গেছেন। মানুষের কথা বলতে বা লিখতে গিয়ে তিনি প্রথাগত চিন্তাচেতনা ও ধ্যান-ধারণা দ্বারা তেমন প্রভাবিত হননি বা গৎবাঁধা বুলি উচ্চারণ করেননি। মানুষ ও সমাজকে বোঝার জন্যে তাঁর মৌলিক ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো আর সেই ভাবনা ও দৃষ্টি দিয়ে তিনি সমাজ ও মানুষকে যেভাবে দেখেছেন, বুঝেছেন

সেভাবেই তা বলে গেছেন। তার সব চিন্তা ও উচ্চারণের সঙ্গে সকলে একমত হবেন এমনটা কেউ আশা করেন না। কিন্তু তাঁর চিন্তা-চেতনা ও প্রকাশভঙ্গির মৌলিকতা সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন তুলবেন না।

মধ্যযুগের পুথি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আহমদ শরীফ পণ্ডিত হয়েছিলেন আর সমকালীন মানুষের মুক্তির জন্যে মুক্তচিন্তা তাঁকে দার্শনিকে পরিণত করেছে। সমকালীন বাংলাদেশে আরজ আলী মাতুব্বর প্রমুখ দু'একজন মৌলিক চিন্তাশীল ব্যক্তি ছাড়া শিক্ষিত সমাজে আহমদ শরীফের মতো মুক্তবুদ্ধি, সংস্কারমুক্ত, ভিন্নমতাবলম্বী মানুষ খুব কমই রয়েছেন। সে জন্যে যারাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, তিনি শিক্ষার্থী বা জ্ঞানতাপস যেই হোন না কেনো, আহমদ শরীফ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারেননি। আহমদ শরীফের মনন, চিন্তা, চেতনার অতি অল্পই তাঁর লেখায় প্রকাশিত হয়েছে, যারা তাঁর ক্লাস করেছেন বা অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে দীর্ঘকাল তাঁর কথা শুনেছেন তারা আহমদ শরীফের মৌলিক চিন্তাশীল প্রতিভার সম্যক পরিচয় পেয়েছেন। আহমদ শরীফের মনন যতোটা পুথিলব্ধ তার চেয়ে অধিক তাঁর নিজস্ব মেধা ও চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রাপ্ত, সে কারণেই তাঁর চিন্তা সমকাল থেকে অনেক অগ্রসরমাণ ছিলো আর সে জন্যেই তিনি বিতর্কিত মনীষী ছিলেন। যিনি স্বসমাজে সমকালে বিতর্কিত নন তিনি মনীষী বা দার্শনিক নন। যিনি ভিন্নমতাবলম্বী নন তিনি চলতি হাওয়ার পন্থী, আহমদ শরীফ চলতি হাওয়ার পন্থী ছিলেন না, কিন্তু চেতনায় যুক্তিবাদী ও অগ্রসরমাণ হওয়ার কারণেই তিনি সংস্কারমুক্ত ও মুক্তবুদ্ধির চর্চায় অনড় অটল ও আপোসহীন থাকতে পেরেছিলেন।

আহমদ শরীফ দেশের বাইরে বিশেষ যাননি, তার প্রয়োজনও ছিলো না। দেশে থেকেও বিশ্বের অগ্রসরমাণ ভাবনা-চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার সঙ্গে তাঁর মানস ও দৃষ্টিভঙ্গির সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। মেধা ও মননের জগতে আহমদ শরীফের দ্বিধাহীন অভিযাত্রা ও গ্রহণক্ষমতা ছিলো অসাধারণ কিন্তু কোনো বিষয়ের চর্বিত চর্বন নয় বরং নিজস্ব বিচারে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং নিজের মতো করে তাকে প্রকাশ করার ক্ষমতা ছিলো তাঁর অপরিসীম। তাই এই ক্ষণজন্মা পুরুষ নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার একটি বিশিষ্ট ভুবন গড়ে তুলতে পেরেছিলেন, যা ছিলো একান্তভাবে তাঁর মৌলিক উদ্ভাবনী, আহমদ শরীফের ওই ভুবন নিবেদিত ছিলো মানুষের মুক্তি কামনায়। বিশ শতকের জটিল আবর্তে বঞ্চিত মানুষের মুক্তির পথ যখন সংস্কার ও বিভ্রান্তির আবর্তে লুপ্তপ্রায় তখন আহমদ শরীফ সে মানুষকে মুক্তির নতুন পথের সন্ধান দানে উৎসর্গীকৃত ছিলেন। মানুষের কল্যাণ কামনায় তার বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, মনন ও মেধা নিয়োজিত ছিলো বলেই সতীর্থ বুদ্ধিজীবীদের মতো তা বিত্তশালী ও ক্ষমতাসীনদের মনোরঞ্জন ও স্তাবকতার পরিবর্তে তাদের প্রতি তির্যক ছিলো। মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধে উচ্চারণে তিনি ছিলেন আপোসহীন তাই জীবদ্দশায় দেশ ও সমাজ থেকে তিনি প্রাপ্য স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করেননি।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ তার জীবদ্দশায় যে সব সম্মাননা পেয়েছেন তার সবগুলো একত্র করলেও তাঁর প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন করা সম্ভবপর নয়। কারণ সভ্যতার ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কোনো মনীষী জীবদ্দশায় তাঁর সমাজ থেকে যথার্থ স্বীকৃতি পাননি বরং পেয়েছেন চরম পীড়ন, আহমদ শরীফও ব্যতিক্রম নন। তাঁর দেশ-কাল-সমাজ তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে বুঝতে পারেনি, তাঁর প্রয়াণের পরে যেনো তাঁর মাহাত্ম্য অনুধাবন করে দেশের মানুষ প্রগতির পথে এগিয়ে যায় সে কামনাই করি।

অপূর্ব সংসদ-এর কথা

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

১৯৪৭-এর অবিভক্ত বাংলায় অতি স্বল্পস্থায়ী দোলাচল দাবির কথা ওঠে। সেই কথা বাদ দিলে বলতে গেলে বাংলার স্বাধীনতার কথা কেউ আগে উচ্চারণ করেনি। বাংলা ভাষায় স্বাধীনতার কথা লেখা হলেও সে স্বাধীনতা বাংলার স্বাধীনতা নয়। ১৯৪৭ সালের আগে যারা মুসলমান বা হিন্দু, যারাই স্বাধীনতার কথা বলেছেন, তারা নিখিল ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে তা বলেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রভুভক্ত ব্রিটিশপ্রজার স্বাধীনতা-বন্দনা বা 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিয়ে চায় হে কে বাঁচিয়ে চায়' সে তা মুঘলের বিরুদ্ধে রাজপুতের কণ্ঠে এক সুললিত আর্তনাদ।

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র থেকে কোনো ভূখণ্ডের অধিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির ভিত্তিতে স্বাধীনতা ঘোষণা করা রাষ্ট্রীয় আইন বা আন্তর্জাতিক আইনে বড় জটিল ব্যাপার। প্রেসিডেন্ট উইলসনের চৌদ্দ দফার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব ইউরোপে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্য ভেঙে বহু রাষ্ট্রের জন্ম হয়। অবশ্য ১৯২০ সালে আলণ্ড দ্বীপপুঞ্জের বিরোধের ব্যাপারে কমিটি অব জুরিস্টস এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, একটি রাষ্ট্র থেকে সেই রষ্ট্রের কোনো ভুখণ্ডের বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। জাতিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার পর উপনিবেশ বিমুক্তির আন্দোলন ক্রমবর্ধমানভাবে শক্তি ও সাফল্য অর্জন করে। তবে এশিয়া ও আফ্রিকার সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো দেশের অভ্যন্তরে কোনো ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে ভালো চোখে দেখেনি এবং জোরোশোরে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার কথা প্রকাশ করে এসেছে।

পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধিবাসীরা মুসলমান হিসেবে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিতে পাকিস্তান অর্জন করে। বাঙালি হিসেবে কি তারা আবার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি তুলে পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে? আন্তর্জাতিক আইনি জগতে এর সহজ উত্তর ছিল না। তাই পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আসসালামু আলাইকুম' জনানোর পর লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী নিয়মানুগত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হলেও পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলা সম্ভব ছিল না। মণি সিংকে শেখ মুজিব, 'দাদা কী কন?' বললেও দাদা তাকে দেশ স্বাধীন করার জন্যে উৎসাহ দেননি। ডঃ হবীবুল্লাহ যখন কথা প্রসঙ্গে অন্নদা শঙ্কর রায়কে বলেন, 'আমরা

স্বাধিকার দাবি করছি বটে, কিন্তু আমাদের আসল লক্ষ্য স্বাধীনতা।' তখন আইনি ঝামেলা ও বাস্তবতার জটিলতার কথা ভেবেই অভিজ্ঞ আইসিএস রায় বলেন, 'খবরদার ও কথা মুখে আনবেন না। পাকিস্তানীরা ভীষণ অত্যাচর করবে। তেমনি করে লন্ডনের ইস্ট পাকিস্তান হাউসে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার কথা ইঙ্গিতে বলা মাত্র তিনি শিউরে উঠে আতঙ্কিত হয়ে বলেন, 'রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে, এমন কথা মুখে উচ্চারণ করবেন না।'

১৯৬০-এর দশকের কথা বলতে গিয়ে ১৯৮৫ সালে আমি *গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ*-এ লিখেছিলাম : 'ইতোমধ্যে লোকায়ত য়ুরোপীয় ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত নতুন প্রজন্ম প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের কথা বাদ দিয়ে সার্বভৌম স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতে শুরু করেছে। স্বাধীন পূর্ববাংলা কি স্বাধীন থাকতে পারবে? এমন সংশয় মনে থাকলেও স্বাধীনতাকামী সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারা ক্রমে দেশে দ্রুত ব্যাপ্তি লাভ করে। বিদেশে, বিশেষ করে লন্ডনের ইস্ট পাকিস্তান হাউসে স্বাধীনতার কথা প্রকাশ্যে আলোচিত হতো। সামরিক বাহিনীতে কিছু কিছু বাঙালি অফিসারও পাকিস্তান নামীয় বিষবৃত্ত থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজছিলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের সাথে এই গ্রন্থকারের যে আলোচনা হয়, তা থেকে মনে হয় না পাকিস্তান সরকারের অভিযোগ সম্পূর্ণ বানোয়াট ছিল। সার্জেন্ট জহুরুল হক তো পাকিস্তান-দ্রোহিতার অভিযোগের উত্তরে কসুর-কবুল করতে চেয়েছিলেন। দেশের লোক অবশ্য এই ষড়যন্ত্রকে বিশ্বাস করেনি, যদিও অনেকে ভেবেছিলেন, এমন ষড়যন্ত্র হয়ে থাকলে ভালোই হয়েছে।

তখন আমি অপূর্ব সংসদ-এর কথা কিছুই জানতাম না। মাত্র মাস খানেক আগে আমি বাগমার সাহেবের লেখা থেকে এ সম্পর্কে কিছু জানতে পারলাম। অপূর্ব সংসদের তৎপরতার গোপনীয়তা অতিসংগোপনে রক্ষা করা হতো। অপূর্ব সংসদের উদ্যোক্তারা স্বাধীনতার কথা বলতে চেয়েছিলেন এমন সময় যখন তা উচ্চারণ করা শুধু বেআইনি নয়, বিপজ্জনকও ছিল।

হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের জন্যে ১৯৬২ সালে যে সর্বদলীয় ছাত্র সংস্থা গঠন করা হয় তার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন আবদুল আজিজ বাগমার। অপূর্ব সংসদ গঠিত হওয়ার পর বাগমার সাহেব ছিলেন তার প্রাণপুরুষ, প্রধান সমন্বয়কারী। রাজনীতির জন্যে তাকে দশ দশবার জেলে যেতে হয়েছে। ২৫শে মার্চ ১৯৭১ তাজউদ্দিন আহমদ সাহেবের বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় নয় মাস ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের বন্দি শিবিরে আটক ছিলেন।

বিশ শতকে বাঙালি গ্রন্থে ডঃ আহমদ শরীফ বলেন, ভাষার দাবিতে প্রগতিশীলদের আন্দোলন ক্ষোভ-ক্রোধ ক্রমেই শিক্ষার প্রসারের সাথে তাল রেখে তীব্র হতে থাকল। এ সময়ে ১৯৬৫ সনে আবদুল আজিজ বাগমার নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এক ছাত্র স্বাধীনতার স্বপ্ন ও সাধ বাস্তবায়নের জন্যে ছাত্রনেতা হিসেবে পন্থা আবিষ্কারে ও উপায় উদ্ভানে সক্রিয়ভাবে গোপনে কাজ শুরু করলেন, ঢাকার কিছু শিক্ষককে করলেন উপদেষ্টা।'

১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২ সর্বদলীয় ছাত্রদের উদ্যোগে দেশব্যাপী যে হরতাল অনুষ্ঠিত

হয় তার ফলে হামুদুর রহমান শিক্ষা রিপোর্ট বাতিল হয়। রিপোর্টে শিক্ষাবিষয়ক কিছু ভালো সুপারিশ থাকলেও কমিশনের উদ্যোক্তা যেহেতু স্বৈরশাসক ছিলেন সেহেতু ছাত্রদের অভিযোগ ছিল সরকারের শিক্ষাসঙ্কোচনী নীতিকে সমর্থন করাই ছিল রিপোর্টটির একমাত্র উদ্দেশ্য।

১৯৬২ সালে হামুদুর রহমান রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন সফল হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফোরামের নেতৃবৃন্দ ইডেন কলেজের সাধারণ সম্পাদিকা নাজমা রহমানের পিতৃগৃহে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন। ভবিষ্যতে জাতীয় প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনার জন্যে জগন্নাথ কলেজ, ইডেন কলেজ ও তোলারাম কলেজের ছাত্রছাত্রী উদ্যোগী হয়ে এক শপথনামায় রক্তস্বাক্ষর প্রদান করেন। এরপর গঠিত হয় অপূর্ব সংসদ। অপূর্ব সংসদ এই সাংস্কৃতিক নামটি একটি সংক্ষেপিত সাংকেতিক অক্ষরসমষ্টি। সংসদ-এর 'অ', 'পূ' 'ব', 'স' শব্দগুলো অস্থায়ী পূর্ববঙ্গ সরকার-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। সংক্ষিপ্ততর নাম ছিল "অপূ' যার নামে সংসদের ইশতেহার ও পুস্তিকা প্রকাশিত হতো। সংসদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নামের আদ্যক্ষর ক্রমে সংসদের সভাপতি নির্বাচিত হতো। প্রথম সভাপতি ছিলেন বাংলা বিভাগের ছাত্র এবং পরবর্তীকালের সরকারি কলেজের অধ্যাপক প্রয়াত অবনী বর্মণ।

অপূর্ব সংসদের তরুণেরা দেশে-বিদেশে তাদের বক্তব্য প্রচারের চেষ্টা করে। তাদের ক্ষমতা ছিল সীমিত; কিন্তু ঘরে বাতি জ্বালানোর উৎসাহে অতি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় সংসদের সদস্যগণ ও সহায়ক প্রতিষ্ঠান তরুণ ব্রিগেডের কাজ করেন। East Pakistan forever বলে তারা দেশপ্রেমের কথা বলেছেন। ষাটের দশকে শেষার্ধে লন্ডনে থাকার সময় আবদুল আজিজ বাগমার খোলাখুলিভাবে স্বাধীনতার কথা বলতেন। তিনি East Pakistan for East Pakistanis, withdraw occupation troops from East Pakistan অথবা For East Pakistan full autonomy or freedom : freedom-এ ধরনের ব্যানার হাতে করে শোভাযাত্রা করেছিলেন। ৭ই এপ্রিল ১৯৬৯ সালে লন্ডনের দৈনিক টাইমসে সেই ব্যানারের ছবিসহ শোভাযাত্রার ফটো প্রকাশিত হয়।

১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে আমূল পরিবর্তনবাদী র‍্যাডিক্যাল বাংলার যুবকেরা যে রণধ্বনি তুলেছিল–'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর' সে এক অভিনব ব্যাপার। ভুট্টো বুঝতে ভুল করেননি যখন ২৫ শে মার্চ ১৯৭১ তিনি বলেন, 'ওদের দাবি তো স্বাধীনতার চেয়ে বেশি, প্রায় সার্বভৌমত্বের কাছাকাছি। 'সামরিক জান্তাও ভুল করেনি। তাই তারা স্বাধীনতার কথা যেখানে উচ্চারিত হতো সেই একুশে মিনার গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ২৬শে মার্চের রাত্রে।

আইনি সমাধানের সীমাবদ্ধতা আছে। তাই যখন আইন মোতাবেক পাকিস্তানের নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ গণপরিষদের সদস্যদের সংবিধান প্রণয়নের অধিকার ব্যাহত হলো তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চ ১৯৭১ ঘোষণা দিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

শিল্পী প্রাণেশ কুমার মন্ডল সংসদের মনোগ্রাম তৈরি করেন। মনোগ্রামের মাঝে ছিল

পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র। অনুরূপ মানচিত্র ছিল পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের গাড়ি বারান্দার ঝরোকার জালির ওপর। অপূর্ব সংসদের মনোগ্রামটি ছিল শান্তি, শক্তি, জ্ঞান, সমৃদ্ধি ও সার্বভৌমত্বের সাথে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রতীক। ২রা মার্চ ১৯৭১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে ছাত্রসভায় প্রথম স্বাধীন বাংলার যে পতাকা উত্তোলিত হয় তার মধ্যেও পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র ছিল। শিবনারায়ণ দাশ কর্তৃক পরিকল্পিত ও অঙ্কিত পতাকাটি অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের পতাকা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পরে ৪ঠা জানুয়ারি ১৯৭২ জাতীয় পতাকা থেকে মানচিত্র বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

পাকস্তানের জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে ডঃ আহমদ শরীফ অপূ'র তৃতীয় ইশতেহার *ইতিহাসের ধারায় বাঙালিতে* বলেন, জাতীয় সঙ্গীত হচ্ছে বল, বীর্য, প্রেরণা ও আদর্শের উৎস। আমাদের এই জাতীয় সঙ্গীত রচিত হয়েছে জনগণের অবোধ্য ফারসি ভাষায়। অধিকাংশ পাকিস্তানিদের প্রাণের যোগ নেই সে কওমী সঙ্গীতের সঙ্গে। ইশতেহারের শেষাংশে ছিল "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাচায় বাঁশি।" অপূর্ব সংসদের প্রচেষ্টায় গানটির প্রচারে ব্যপ্তি ঘটে। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ গানই আমাদের প্রাণে বাঁশি বাজাতো। স্বাধীনতার পর সংবিধানে এই গানটি জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২১শে ডিসেম্বর ১৯৬৩ অপুর প্রথম ইশতেহার *বাঙালি কি চায়?*—স্বাধীনতা প্রকাশিত হয়। ১ লা জানুয়ারি ১৯৬৪ অপূর দ্বিতীয় ইশতেহার আজিজ বাগমারের লেখা *শকুন শৃগালের আবার বাংলা আক্রমণ* প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক ডঃ আহমদ শরীফ ও অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ইশতেহারটি সম্পাদনা করেন। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপর হামলার প্রতিবাদে বাঙালিকে জেগে ওঠার এবং প্রতিরোধ করার জন্যে প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানানো হয়। ১লা অক্টোবর ১৯৬৫ ডঃ আহমদ শরীফ রচিত অপূর তৃতীয় ইশতেহার *ইতিহাসের ধারায় বাঙালি* প্রকাশিত হয়। কি কি ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কারণে বাঙালি স্বাধীনতা চায় তার কথা সংক্ষেপে ইশতেহারে লিখিত হয়েছিল। ইশতেহারটি সম্পাদনা করেন বেগম সুফিয়া কামাল, অধ্যাপক আব্দুল হাই, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ও শওকত ওসমান। ডঃ আহমদ শরীফ বলেন, আমরা এ দেশেরই জলবায়ু ও মাটির সন্তান। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই এ দেশের মাটির পোষণে, প্রকৃতির লালনে এবং মানুষের ঐতিহ্যধারায় আমাদের দেহ-মন গঠিত ও পুষ্ট। আমরা আর্য নই, আরবি, ইরানি কিংবা তুর্কীস্তানিও আমরা নই। আমরা এদেশেরই অস্ট্রিক গোষ্ঠীর বংশধর। আমাদের জাত আলাদা, আমাদের মনন স্বতন্ত্র, আমাদের ঐতিহ্য ভিন্ন, আমাদের সংস্কৃত অনন্য। আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ। ভাষার নাম বাংলা। তাই আমরা বাঙালি।'

উপসংহারে বরা হয়, 'যে অর্থনৈতিক কারণে হিন্দুবিদ্বেষ জেগেছিল এবং ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের জিকির তুলে আর্থিক সুবিধার জন্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত, আজ আবার সেই অর্থনৈতিক কারণে অর্থাৎ শোষণের ফলেই বাঙালি স্থানিক, ভাষিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে স্বাধীনতা দাবি করবে। এই তো স্বাভাবিক। অন্তত ইতিহাস তো তাই বলে।'

আজিজ বাগমারের সুহৃদ অধ্যাপক ডঃ খন্দকার বজলুল হক লিখেছেন, আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাগমার বড় বেশি অভিমানী হয়ে ওঠে। দেশের মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারবে কিনা? স্বাধীনতা অর্জনের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায় কিনা? এমনি অজস্র প্রশ্ন তাকে শঙ্কিত করে তোলে। অভিমান বশে অনেকদিন সে দেশের বাইরেও ছিল।'

স্বাধীনতার আন্দোলনে যারা প্রথমদিকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন তাদের অনেক সময় স্বীকৃতি মেলে না। অনেকের মনে অভিমান জমে ওঠে। তবে এই অভিমান চরিত্রভ্রষ্টদের ডিগবাজির চেয়ে অনেক বেশী শ্রেয় এবং শ্রদ্ধার্ঘ্য। ষাটের দশকের অনেকের প্রশংসনীয় ভূমিকার সাথে তাদের পরবর্তীকালের কর্মকাণ্ডের আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখে মন ভারাক্রান্ত, মনে হয় অভিমান করে তারা নিশ্চুপ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলেই তা পারতেন।

স্বাধীনতার স্বপ্ন : উন্মেষ ও অর্জন-এর ভূমিকায় বাগমার সাহেব বলেছেন, 'বইটি আমার লেখার কথা ছিল না। ৩৮ বছর পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছিল আমাদের ভূমিকা গোপন রাখা হবো। কেউ কখনো বিনিময় গ্রহণ করবে না। বাঙালির স্বাধীনতার দাবি পৃথিবীকে জানাব। বাঙালিকে প্রস্তুত করব। ৩৭ বছর পর জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে সবাই (যারা জীবিত) সিদ্ধান্ত নিলেন ইতিহাসের প্রয়োজনে স্বাধীনতার স্বপ্নের উন্মেষ কাহিনী জাতিকে জানাতে হবে, অন্যথায় জাতীয় ইতিহাস অপূর্ণ থাকবে। সিদ্ধান্তটি জাতীয় সংবাদপত্রকে অব্যাহত করা হয়েছিল। গ্রন্থকার আরো বলেছেন, গত ২১শে জানুয়ারি ১৯৯৯ বেগম সুফিয়া কামাল ও ডঃ আহমদ শরীফ অপূর্ব সংসদ সম্পর্কে তার রিপোর্ট অনুমোদন করেন।

বর্তমানে ডেস্ক-টপ কম্পিউটার মুদ্রণের বদৌলতে পুস্তক প্রকাশনা বেশ সহজ হয়েছে। কম্পিউটারের দ্রুতগতির প্রভাবে এই প্রকাশনার ক্ষেত্রে আজকাল প্রকাশ করা তেমন সাবধানতা অবলম্বন করেন না। যেখানে লেখক ও প্রকাশক একই ব্যক্তি সেখানে লেখকের বাৎসল্যজনিত দুর্বলতায় অনেক অতিরিক্ত বর্জিতব্য বা পরিহারযোগ্য বস্তু গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকে। স্বাধীনতার বিশ বছর পর মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের ঔৎসুক্য ও সরকারের আনুকূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ সম্পর্কে প্রচুর বই লেখা হচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশত বেনে বুদ্ধির প্রভাবে বইয়ের গ্রন্থনায় অপূর্ণতা রয়ে যাচ্ছে। আলোচ্য গ্রন্থটিতে বহু ব্যক্তিগত দলিলাদি ও তথ্যাদি রয়েছে, যা না থাকলেও গ্রন্থটির কোনো অঙ্গহানি হতো না বরং গ্রন্থটির মুখবন্ধে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান যে মন্তব্য করেছেন তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। তিনি যথার্থ বলেছেন, এটি স্মৃতিকথা ধরনের বই, একই সঙ্গে বাংলাদেশর ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণের আধার। ষাটের দশকের রাজনীতির ধারা সম্পর্ক এ বই থেকে অনেক কিছু জানা যাবে। কারা, কখন, কোথায় কি ধরনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন, সে কাহিনী চিত্তাকর্ষক। আর গভীর প্রত্যয় নিয়ে কন্টকাকীর্ণ পথে বিচরণ এবং শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার সহ্য করার কাহিনী বেদনাদায়কও বটে।

স্বাধীনতা শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো, তা জানতে হলে এ বইটি পড়তে হবে।

বেগম সুফিয়া কামাল, ডঃ আহমদ শরীফ, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মুহাম্মদ আব্দুল হাই, শওকত ওসমান প্রমুখ অধ্যাপকবৃন্দ অপূর্ব সংসদের পরামর্শক ও উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতেন। অন্য অধ্যাপকদের মধ্যে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডঃ রফিকুল ইসলাম, ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান প্রমুখ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীসহ কেউ কেউ অপূর্ব সংসদের কাজকর্ম অবহিত ছিলেন এবং এ ব্যাপারে সকলেই গোপনীয়তা রক্ষা করার চেষ্টা করতেন।

স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে বেশকিছু নতুন মূল্যবান তথ্য আবদুল আজিজ বাগমার সাহেব তার গ্রন্থে সংকলিত করেছেন। অভিমান ভেঙে তিনি যে এই কাজটি করেছেন তার জন্যে আমি তাকে অভিনন্দন জানাই। আমি তার মঙ্গল কামনা করি।

[*স্বাধীনতার স্বপ্ন : উন্মেষ ও অর্জন* গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণ]

পর্যালোচনা

আহমদ শরীফ : একলা চলার অভীক

আহমদ কবির

বয়স বেড়েছিল, শরীর জীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল এবং ইদানীং এক অচিরস্থায়ী অসুখের শিকার হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সহসা মারা যাবেন কেউ ভাবেন নি। অন্তত আরো পাঁচ সাত বছর দশ বছর বাঁচবেন বলে মনে হয়েছিল। এইতো সেদিন মাত্র তাঁর উনাশিতম জন্মদিন গেল, কেউ কেউ শতায়ু কামনাও করেছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর যেন তর সইছিল না; অতি দ্রুত এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেল একালের বাংলাদেশের জ্ঞানচর্চার ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রের, সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতের সবচাইতে সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিটিকে। ইদানীং নানা কারণে বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী শব্দটি মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এই শব্দটির যথাযথ সম্মানীয় অভিধার দাবিদার যদি কেউ থাকেন তো তা ডক্টর আহমদ শরীফ নিজেই। হয়তো এ মুহূর্তে বাংলাদেশে তাঁর মতো আরো কেউ কেউ আছেন, কিন্তু তাদের সংখ্যা যে একেবারে হাতে গোনা তা বলা বাহুল্য। ডক্টর শরীফ কখনো সুবিধাবাদের পথে পা বাড়াননি, আপস করেননি, আজ এখানে তো কাল সেখানে এ রকম কখনোই করেননি, হামলে পড়েননি রজতমুদ্রার জন্য কোথাও, পদলোভে সুবিনীত হয়ে যাননি, কোনো সরকারের পদলেহন করেননি। সব সময় সর্বত্র বজায় রেখেছেন স্বচ্ছ কাণ্ডজ্ঞান, তীক্ষ্ণ বিবেকবুদ্ধি, গরীয়ান আত্মমর্যাদা ও সবল সমুন্নত একক চরিত্র। উন্নতশির আহমদ শরীফ স্পষ্ট ভাষায় কথা বলেছেন এবং সদম্ভে পদচারণা করেছেন প্রায় ৮০ বছরের এক সফল কর্মময় পূর্ণবৃত্ত জীবনে।

ডক্টর আহমদ শরীফ দীর্ঘদেহী কিংবা বলশালী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব দৃঢ় সুগঠিত ও সমুন্নত, কণ্ঠস্বর দীপ্ত পুরুষালি এবং নেতৃত্বব্যঞ্জক। তাঁর কর্মের ফসল বিপুল বিশাল ও ব্যাপক। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন সক্রিয়, অসংখ্য প্রগতিপন্থী, মানবতাবাদী, অসাম্প্রদায়িক ও দেশহিতৈষী সংঘ ও সভ্য-সমিতির সঙ্গে যুক্ত এবং জাতির সঙ্কটমুহূর্তগুলোতে বিবেকী প্রতিবাদী সাহসী কণ্ঠ। লেখালেখিও করেছেন আমরণ। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ তিনি, মুসলমান-রচিত একাধিক পুথির কৃতী সম্পাদক, বাংলা সাহিত্যের যথার্থ ইতিহাসগ্রন্থের প্রণেতা, বহু প্রশংসাধন্য গ্রন্থের লেখক ডক্টর আহমদ শরীফের কৃতী ও কীর্তি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। অসংখ্য গবেষণাধর্মী গভীর তাত্ত্বিক জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভের রচয়িতা তিনি। লিখেছেন সংখ্যাহীন

প্রবন্ধ। সাহিত্য, ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, দর্শন, শিক্ষা, নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, জীবনযাত্রার সঙ্কট, সমকালীন চালচিত্র ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে ঋদ্ধ সে প্রবন্ধগুলো। তিনি আমাদের দেশের অন্যতম প্রভাবশালী লিখিয়ে ও চিন্তাবিদ। তাঁর লেখার সামাজিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাঁর গদ্যশৈলীর স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই রয়েছে। মৃত্যুর কিছুদিন আগে হয়তো বয়সের কারণে কখনো কখনো সে শৈলী কিছুটা অতিকথনপ্রবণ, কিংবা একাধিক সমার্থক শব্দকীর্ণ। কেউ তাঁর শৈলী সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললে বলতেন, তিনি আর্ট সৃষ্টি বা সাহিত্য করার জন্য লেখেন না, তিনি লেখেন কাজের কথা বলার জন্য; অর্থাৎ লেখার ক্ষেত্রে তিনি উপযোগিতাবাদী। উপযোগ তাঁর কাছে গুরুত্ব পেয়েছে বলেই কি তিনি বঙ্গিমচন্দ্রের এতো প্রবল অনুরাগী! অবশ্য বঙ্কিমের অনুপম আর্টেরও সমঝদার ছিলেন তিনি, যেমন সমঝদার তিনি মধুসুদন ও রবীন্দ্রনাথের কবিতার। ডক্টর শরীফের প্রিয় গান হলো রবীন্দ্রনাথের এই গানটি—"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে।"

এক সময় রবীন্দ্রনাথ নিয়ে যখন কেউ লিখতেন না, সেই পাকিস্তানী আমলে, তখন তিনি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখার জন্য সাগ্রহে এগিয়ে এলেন এবং চরম উক্তি করলেন এই কথা বলে যে, বাংলাদেশে দুইবার রেনেসাঁ এসেছিল, একবার চৈতন্যদেহে, আরেকবার রবীন্দ্র শরীরে। সাহিত্যের কলারূপের আলোচনায় ডক্টর শরীফের আনন্দ কম ছিল বলা যাবে না, তবে তিনি কলারূপের চেয়ে বিষয়গত বা ভাবগত তাৎপর্যের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতেন এবং সামাজিক উপযোগিতার সন্ধান করতেন। কেজো কথায় তৃপ্ত হতেন তিনি এবং চাইতেন তাঁর লেখা কম শিক্ষিত লোকেরাও বুঝুক। এজন্য আমজনতার বোঝার জন্য সচেতনভাবে একেবারে মুখের ভাষার শব্দ ব্যবহার করতে চাইতেন। তবু হয়তো সত্য যে তাঁর শৈলীর মধ্যে একটি বক্ররূপ আছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বলা যাবে, ডক্টর শরীফের বক্তব্য পাঠকের কাছে ঠিক ঠিক পৌঁছে যায় সহজে। মনে হয়, ডক্টর শরীফের চিন্তাচেতনায় উনিশ শতকী বাঙালি হিতবাদী লেখকদের প্রভাব আছে। তবে ডক্টর শরীফ কালের মানুষ। উনিশ শতক থেকে আমরা বহুদূর এগিয়ে এসেছি। এ কালের সমস্যা ও সংকটের রূপও ভিন্ন। উনিশ শতকী দেশচেতনা ও মানবিক হিতৈষণা এখন ভিন্ন মাত্রা ও মাত্রিকতা পেয়েছে।

মানুষের সামাজিক শ্রেণীগত অবস্থান ও মানবাধিকারের লড়াই নিয়ে এখন শিক্ষিত সচেতন মানুষ মাত্রই সোচ্চার। গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী বিশ্বের সঙ্গে সমাজতন্ত্রী বিশ্বের দ্বন্দ্বে মনে হয় আপাতত সমাজতন্ত্রের পরাজয় ঘটেছে বটে, কিন্তু সমাজতন্ত্র যে এখন পর্যন্ত গণমানুষের হিতকর মুক্তিমন্ত্র তাতে ডক্টর শরীফের আশা-ভরসায় কখনো চির ধরে নি। অবশ্য ডক্টর শরীফ কখনোই মন্ত্রপড়া দীক্ষিত সমাজতন্ত্রী নন, তিনি শ্রেয়োবাদী; সমাজতন্ত্রে গণমানুষের জন্য শ্রেয় আছে বলেই তিনি এ মতবাদকে পছন্দ করেন। সমাজতন্ত্রের চেয়ে আরো কল্যাণকামী কোন ব্যবস্থা থাকলে তিনি তাই পছন্দ করতেন। তাঁর আদর্শনিষ্ঠা, শ্রেয়োবোধ ও গণকল্যাণকামিতা তাঁকে দেশের বামঘেঁষা সংস্কৃতিকর্মী ও রাজনীতিবিদদের শ্রদ্ধেয় মানুষের সম্মান দিয়েছে।

ডক্টর আহমদ শরীফ যুক্তিপথের অনুগামী; শাস্ত্রাচার প্রথা ও প্রচলনে কোনোদিন তিনি আঁকড়ে থাকতে চাননি, বরং এসবের বিরুদ্ধে সারা জীবন কথা বলেছেন।

সবকিছুকে যুক্তিবুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক মন দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করার আদর্শে তিনি বিশ্বাসী। ডিরোজিয়ান ঘরানার শিক্ষকদের এখন আর তেমন দেখা যায় না। কিন্তু ডক্টর শরীফের ছাত্রদের সৌভাগ্য এই যে, তেমন একজন শিক্ষককে তারা পেয়েছিল।

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের ভাইপো তিনি। সে পরিচয় তো আছেই, কিন্তু আহমদ শরীফ নিজের সাধনায় নিজের পরিচয়ে প্রমূর্ত হলেন। চট্টগ্রামের পটিয়া থানার সুচক্রদণ্ডী গ্রামে যেদিন (১৯২১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি) আহমদ শরীফের জন্ম হয়েছিল সেদিন ছিল পয়লা ফাল্গুন। ফাগুনে জন্ম, ফাগুনে মৃত্যু। জন্ম-মৃত্যুর বিশেষ হিসাবে কোনো অলৌকিক যোগসূত্র নেই, এটি ঘটনাচক্র মাত্র, কিন্তু এ কথা তো মানতেই হবে যে, ডক্টর শরীফের স্বভাব ও চরিত্র ফাগুনের আগুন দিয়ে মণ্ডিত যৌবনময়, দীপ্তিক্ষরা, তারুণ্যভরা, পুষ্পগন্ধ, উষ্ণ। বৈশাখের খরদীপ্তির সঙ্গেও তাঁর তুলনা হতে পারতো। কিন্তু বৈশাখের মতো শুষ্ক নিরস কঠোর কঠিন তিনি ছিলেন না। ডক্টর শরীফের স্বভাবের গোঁ ও জেদকে অনেকে ভুল বুঝতো, আসলে তিনি ছিলেন একেবারে অসূয়ামুক্ত সরলচিত্ত মানুষ, রসময় স্নেহময় মানুষ। তারুণ্যমণ্ডিত উষ্ণ হৃদয়বৃত্তির অধিকারী ছিলেন ডক্টর শরীফ এবং সারা জীবন এই তারুণ্যকে বজায় রাখতে পেরেছিলেন। সেটি তাঁর কথায়, কাজে, আচরণে, পোশাকে-আশাকে, লেখায়, বক্তৃতায় এবং আড্ডায় প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর মানসিক যৌবনের অনুরাগে সিক্ত হয়েছে অসংখ্য তরুণমন। নতুবা ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গোলচক্করে কিংবা তাঁর বৈঠকখানায় এক ঝাঁক তরুণ তাঁকে ঘিরে তাঁর কথা শুনতে এতোখানি আকর্ষণ বোধ করতো না। শুধু তরুণেরা তো নয়, অসংখ্য প্রবীণ ও বয়সী মানুষও তাঁর আড্ডায় শামিল হতেন। বাঙালি সংস্কৃতিচর্চার একটি দোষশূন্য নির্মল মাত্রিকতা হচ্ছে আড্ডা। এই আড্ডাকেই বহু বছর ধরে জমজমাট করে রেখেছিলেন ডক্টর শরীফ। মাঠে-ময়দানে, সভা-সমিতিতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের লাউঞ্জে, ড্রয়িংরুমে আড্ডাপ্রিয় আহমদ শরীফ সপ্রাণ, সতেজ ও বাঙ্ময়। এসব জায়গাতে প্রধানত কথা বলতেন তিনি, অনেক নতুন কথা, কিংবা পুরোনো কথার যুগোপযোগী ব্যাখ্যা। অন্যেরা শুনতো, কখনো কখনো প্রশ্ন করতো, বিতর্ক করতো, মতামতেও অংশগ্রহণ করতো—কিন্তু সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন ডক্টর শরীফ।

এমনিতে তাঁর জ্ঞানবিদ্যা ও মনন উন্নত, তাছাড়া তাঁর কথা বলার মধ্যেও একটা আকর্ষণীয় শৈলী ছিল যা সবাইকে মুগ্ধ করতো। প্রজ্ঞাবান মানুষের কথা শোনার মজাই আলাদা। তাছাড়া ডক্টর শরীফ নিজেই তো জীবিত প্রতিষ্ঠান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়েছেন সেই কবে। এক সময় তিনি ছিলেন ছাত্রপ্রিয় সুখ্যাত অধ্যাপক, ৩৩ বছর অতি সুনামের সঙ্গে চাকরি করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগে। পণ্ডিত ও গবেষক হিসেবে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছেন। কতো কথা বলেছেন ছাত্রদের—জ্ঞানের কথা, তত্ত্বের কথা, দর্শনবিজ্ঞানের সূত্র, দেশ জাতি ভাষা ও ইতিহাসের নানা প্রসঙ্গ, রাজনীতির কূটকচাল এবং সবার উপরে মানুষের কথা, বিশেষ করে নির্জিত গণমানুষের কথা। এখন এসব কথা কাকে শোনাবেন। বিশবিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ নেই যে ছাত্রদের শোনাবেন। সেজন্য তরুণের সংঘ ও সাহচর্য সব সময় কাঙ্ক্ষিত ছিল।

চাকরি থেকে অবসর নিলেও ডক্টর শরীফের শরীরে চির ধরে নি কিংবা মগজও বিগড়ায়নি। দেহে ও মনে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। তবু তাঁর মতো একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরবর্তী সময়ে কেন জ্ঞানচর্চার কাজে লাগালো না, সে প্রশ্নের সদুত্তর কেউ দেবেন বলে মনে হয় না। এখন অবশ্য এ উত্তরেরও কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা ডক্টর শরীফ তো আর ফিরে আসবেন না। কিন্তু কাজটি অতি মন্দ হয়েছে। তবু ভালো যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগ তাঁকে দুবছরের জন্য 'নজরুল অধ্যাপক' করেছিল। বাঙলা একাডেমী ও এশিয়াটিক সোসাইটিও তাঁর দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাজ করিয়ে নিতে পারত। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের দুই মহাপণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা আমরা যেভাবে উপকৃত হয়েছিলাম, ডক্টর শরীফের মতো প্রাজ্ঞ পণ্ডিতের কাছ থেকে আমরা সেভাবে উপকার পেতে পারতাম। কিন্তু কোথাও যে তিনি জায়গা পেলেন না সেটি তো আমাদের চরম সংকীর্ণতার ও অতি মন্দবুদ্ধির পরিচয়। শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের দলাদলি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিদের সরকার তোষণ আমাদের জ্ঞানবিদ্যার ও মুক্তবুদ্ধিচর্চার ক্ষেত্রে সাংঘাতিক প্রতিবন্ধক। অথচ আমরা প্রতিনিয়ত গাল ফুলিয়ে বলে থাকি, বিশ্ববিদ্যালয়ই মুক্তবুদ্ধি চর্চার কেন্দ্র। নিন্তু কাজে কর্মে আমরা এর কোনো প্রতিফলন ঘটাই না, ঘটাতে চাই না। আইনকানুনের ফ্যাকড়া তুলতে আমরা যতো উন্মুখ, জ্ঞানসাধনার পথ করে দিতে আমরা ততোই পরাঙ্মুখ। কিন্তু এভাবে বিশ্ববিদ্যালয় সচেতন মানুষসৃষ্টি করতে পারবে না। ডক্টর শরীফ সচেতন মানুষ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। এই মন্তব্য হয়তো অসমীচীন হবে না যে, সম্ভবত প্রতিক্রিয়াশীলেরা তাঁর শিক্ষাদান প্রশ্নে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাঁকে দ্বিতীয় বারের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে দেয়নি। এতে ডক্টর শরীফের কোনো ক্ষতি হয়নি, ক্ষতি হয়েছে আমাদের, ক্ষতি হয়েছে আমাদের জ্ঞান-অন্বেষার ও গবেষণার ক্ষেত্রে। ডক্টর শরীফের সাধারণ কথার মধ্যেও মাঝে মাঝে অসাধারণ কিছু পাওয়া যেত। তাঁর প্রাজ্ঞতা সমুন্নত স্তরে উঠেছিল। সেজন্যই তিনি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানব্রতীদের এবং প্রশ্নবিদ্ধ তরুণদের বিমুগ্ধ বিস্ময়ের পাত্র। শাস্ত্র নয়, আচার নয়, মানবতাবাদই যে তাঁর জীবনের মর্মমূলের শিক্ষা। সেটি তিনি আবার প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেলেন অসিয়ৎনামা করে মরণোত্তর চক্ষু ও দেহদানে। এই কাজ করার মানসিক শক্তি সকলের থাকে না। আহমদ শরীফের ছিল; সে জন্য তিনি স্বতন্ত্র, একক—একলা চলার নির্ভীক পথিক।

আহমদ শরীফের নজরুল-বিবেচনা প্রসঙ্গে

সৌমিত্র শেখর

অধ্যাপক, গবেষক, রাজনীতিমনস্ক চিন্তাবিদ হিসেবে আহমদ শরীফের পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠায় নিঃসন্দেহ হয়েও বলা চলে, প্রবন্ধসাহিত্যে তিনি বিশেষ মাত্রা যোগ করেছেন। সে-দিক থেকে তিনি একজন প্রধান প্রবন্ধকার। বাংলাদেশের বাংলা প্রবন্ধের ধারা তাঁর সানুরাগ-পরিচর্যায় আজ পরিণতিপ্রাপ্ত। আহমদ শরীফের প্রবন্ধ প্রায়শ স্বল্পাবয়ব, যৌক্তিক-যুক্তির পারম্পর্যনিবিষ্ট, বৈজ্ঞানিকতা-তাপিত, অতিকথনমুক্ত, নিরাবেগ স্বচ্ছতাধারী এবং বিষয়-বিচিত্রতায় বহু-বর্ণিল। সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য যদিও আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে; সংস্কৃতি, অর্থনীতিসহ জীবনস্থাপনের অচ্ছেদ্য উপাদান-বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু মোটেও উপেক্ষিত নয় তাঁর বিবেচনায়। মনের লঘু অনুভবগুলোর মধ্যেও তিনি কার্যকারণ আবিষ্কারে সচেষ্ট, শ্রেণীচেতনার নিরিখে এর সূত্রসন্ধান।

ক.

শ্রেষ্ঠ বাঙালি লেখকদের সম্পর্কে আহমদ শরীফের বক্তব্য গতানুগতিকতা বিবর্জিত। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'আমাদের প্রেরণার উৎস সুকান্ত'। জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রণসঙ্গীত রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম যে-সময় শিক্ষিত বাঙালির সমস্ত আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে, তখন সুকান্তকে জাতীয় 'প্রেরণার উৎস' বলে বক্তব্য উত্থাপন শুধু স্রোতবিরুদ্ধই নয়, অসীম আত্মপ্রত্যয়জাতও বটে। অথচ পাকিস্তান শাসিত বাংলাদেশে যখন রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করার সরকারি উন্মাদনা চলছিলো, তখন তিনি এর বিরোধিতা করার জন্যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংগঠিত করেন। একই সময় নজরুলকে লেবাস দেয়া হয় ইসলামি তমদ্দুনের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে। আহমদ শরীফ অগ্রবর্তী হন এর বিরুদ্ধে—তাঁর লেখায়, চিন্তাসঞ্চালনে। পাকিস্তান শাসিত বাংলাদেশে বাঙালি সংস্কৃতি রক্ষার মানসে রবীন্দ্র-নজরুলকে যেভাবে দরকার, স্বাধীন বাংলাদেশে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার জন্যে এঁদের ঠিক সেভাবেই এড়িয়ে চলা প্রয়োজন—এই ছিলো আহমদ শরীফের বক্তব্য। তিনি এঁদের 'ঐতিহ্য' হিসেবে মানতে রাজি, কিন্তু 'সম্পদ' বলতে চান না। স্বাধীন বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক বিতর্কে তিনি ১৯৭২

সালেই জড়িয়ে পড়েছিলেন। আশির দশকে রচিত তাঁর 'রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র মূল্যায়ন' প্রবন্ধ পূর্বোক্ত বক্তব্যকে বেগবান ও প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস। এই রচনাটিও ব্যাপক বিতর্কিত হয়। তার পরও নব্বই দশকের শেষপাদে প্রকাশিত *নির্বাচিত প্রবন্ধ* গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ হিসেবে একে স্থান দেয়া হয়। কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে উচ্ছ্বাস সেই পাকিস্তান আমল থেকে। এর পেছনে কার্যকর স্বার্থ ও মোহই অধিক। আহমদ শরীফ এ দুরভিসন্ধি উপলব্ধি করতে পেরে অতি-উৎসাহীদের আয়োজনে বিঘ্ন ঘটান নিরাবেগ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নজরুলসাহিত্য বিচার করে। তাঁর এই নজরুল-বিচারে রসবিঘ্ন যাঁদের ঘটেছে, তাঁদের একজন শ্লেষ ব্যক্ত করেছেন আহমদ শরীফের উদ্দেশে, জীবনানন্দ দাশের পঙ্‌ক্তি ধার করে এভাবে : বরং নিজেই তুমি লেখো নাকো .... একটি কবিতা'। এর পরও তিনি মত পরিবর্তনের কথা ভাবেননি। আহমদ শরীফ জানতেন কোথায় থামতে হবে, কতটুকু প্রকাশ করা দরকার। পরিমিতিবোধ ছিলো তাঁর সর্বোচ্চ পরিমাণে—যুক্তিপ্রবণ, ইহজাগতিক, বিষয়ী-মানুষ হিসেবে এটাই তাঁর প্রধান গুণ।

কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে তিনি একটি জায়গায় এসে থেমেছিলেন। নজরুলের জন্মশতবর্ষে চারদিকে যে নজরুলযজ্ঞ চলছিলো, অন্য সবার মতো তাতে ঘৃতাহুতি তিনি দিতে পারতেন; কিন্তু এই সহজ যশলাভের চেষ্টা থেকে বিরত থাকার সংযম ছিলো তাঁর।

খ.

কাজী নজরুল ইসলাম ও তাঁর সাহিত্যকে অবলম্বন করে রচিত আহমদ শরীফের গ্রন্থের সংখ্যা একটি : *একালে নজরুল* (১৯৯০)। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কাজী নজরুল ইসলাম অধ্যাপক' হিসেবে ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সালে প্রদত্ত ছয়টি বক্তৃতা নিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশিত। তবে তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে নজরুল-বিষয়ক বেশ কিছু প্রবন্ধ। এগুলো নিয়ে নিশ্চয়ই একটি পৃথক গ্রন্থ বের হতে পারতো। কিন্তু গ্রন্থ মুখ্য নয়, বিচার-বিশ্লেষণ এবং আলোচকের দৃষ্টিভঙ্গিই প্রধান বিষয়। কাজী আবদুল ওদুদের 'নজরুল প্রতিভা'য় যে আলোচনা আছে কিংবা বুদ্ধদেব বসু বা জীবনানন্দ দাশের 'নজরুল ইসলাম' বিষয়ক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যে বক্তব্য স্থান পেয়েছে—আকারে যতো ছোট হোকনা কেন, রচয়িতাদের দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই সেগুলো উচ্চমূল্য দাবি করে। আহমদ শরীফের নজরুল-বিষয়ক প্রবন্ধগুলোও এ-কারণে বিশেষত্ববহ।

১৯৬৯ সালে একটি সংকলন গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হয় আহমদ শরীফের 'নজরুল সমীক্ষা : অন্য নিরিখে' প্রবন্ধটি। পরে তাঁর *জীবনে-সমাজে-সাহিত্যে* গ্রন্থে সেটি স্থান পায়। প্রবন্ধটি দীর্ঘ হলেও সুবিন্যস্ত। শুধু অবয়বগত দীর্ঘতাই নয়, চিন্তা ও বিশ্লেষণের অনন্যতায়ও রচনাটি ঋদ্ধ। এখানে আবেগহীনভাবে নজরুলের তীক্ষ্ণ সমালোচনা আছে। আধুনিক শিক্ষা ও যুগচেতনার ক্ষীণতার কারণে নজরুল ধর্মীয় মানবতার বাইরে বের হতে কিভাবে ব্যর্থ হলেন সে অন্বেষণ প্রবন্ধটিতে দেখা যায়। একটা কাল্পনিক সাম্যবাদী সমাজ তিনি চেয়েছেন, সেখানে শ্রেণীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত নয়। তবে গুরুত্বপূর্ণ, আহমদ শরীফ আবিষ্কার করেছেন, কিভাবে নজরুল-মানসে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মিথষ্ক্রিয়া সাধিত হলো। দৈশিক ও ভাষিক পরিচয়ে বাঙালি নজরুল হিন্দু পুরাণ সম্পর্কে অবগত

হয়েছেন, ধর্মীয় কারণে তাঁর পক্ষে মুসলিম ঐতিহ্য সম্পর্কে জানাও হয়েছে সহজ। সমকালীন হিন্দু লেখকদের পক্ষে যা সম্ভব ছিলো না, নজরুলের পক্ষে সম্ভব হয়েছে উভয় ধর্মীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য জানা ও তা রচনায় ব্যবহার করা। তবে এই উপাদান অতিব্যবহারে তাঁর কাব্যে শিথিলতাও যে আসেনি তা নয়। 'নজরুল মানস' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ লক্ষ করেছেন যে, 'বিদ্রোহে' নয়, 'প্রেমময়তা'য় নজরুলের পরিচয়। তাঁর মানস গড়ে উঠেছিলো প্রেম, দয়া, হৃদয়তাড়নার সম্মিলনে। অথচ বিরূপ পরিবেশে নজরুলের এই স্পর্শকাতরতা বিদ্রোহের রূঢ়তায় রূপ পেলো। আহমদ শরীফের বিবেচনায়, নজরুলের কাম্য ছিলো : পারস্পরিক প্রীতি, সাম্য, স্বস্তিপূর্ণ সমাজ। এ-কারণে তিনি অত্যাচার, অন্যায় ও বন্ধ্যা সমাজকে আঘাত করেছেন, কখনো ভেঙেছেনও। কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট মতবাদ ও লক্ষ্য-তাড়িত ছিলেন না নজরুল; মার্ক্সবাদীতো ননই। এ-জন্যে তাঁর রচনায় সৃষ্টির নির্দিষ্টতা নেই—'ভাঙ্গার গান আছে, গড়ার পরিকল্পনা নেই।' নজরুল-কাব্য সাময়িকতার দোষে দুষ্ট, কালোত্তীর্ণ হবার গুণ সেখানে নেই—এহেন অভিযোগের বিরুদ্ধে যুক্তি উত্থাপিত হয়েছে 'যুগন্ধর কবি নজরুল' প্রবন্ধে। জনপ্রিয়তাই নজরুলের যোগ্যতা ও সার্থকতার বড় প্রমাণ, তিনি রবীন্দ্রনাথের পরিপূরকও। আহমদ শরীফের বক্তব্য : 'রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় আর নজরুলের কর্মে বাঙালীর রেনেসাঁস পূর্ণতা পেল।' প্রেমই নজরুলের কবিসত্তার মূলে। মানুষকে ভালোবেসে সমাজে সাম্যের প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন তিনি। 'নজরুল কাব্য প্রেরণার উৎস' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ লিখেছেন যে, মানুষের প্রতি ভালোবাসাই নজরুলকে সাম্যবাদী করেছে, করেছে বিদ্রোহী, বিপ্লবী। কিন্তু এই সাম্যবাদ যে মার্কসীয় সাম্যবাদ নয় এবং কেন নয়—সে কথা উল্লেখ আছে প্রবন্ধে। 'নজরুলের কাব্য সাধনার লক্ষ্য' প্রবন্ধেও বলা হয়েছে, জীবনধর্মী মানবতাবাদী কবি নজরুল। নির্যাতিত মানবতার যুক্তির লক্ষ্যে তাঁর কাব্যরচনা। 'নজরুল ইসলামের ধর্ম' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ বলেছেন যে, কোনো বিশেষ ধর্মের অনুরাগী ছিলেন না নজরুল। তবে ইসলামের প্রতি আনুগত্য ছিলো তাঁর। কারণ সামাজিক যে অসাম্যের বিরুদ্ধে তিনি, ইসলাম সে অসাম্য অনুমোদন করে না। ধর্মে এই আস্থা মোক্ষ লাভের জন্যে নয়, ধর্মপ্রাণতাও নয়; এ আদর্শানুগত্য, ইহজাগতিকতার পাথেয় মাত্র।

একালে নজরুল গ্রন্থেই বোধ করি আহমদ শরীফের নজরুল-বিবেচনার সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে। নজরুলের মনোজগৎ থেকে তাঁর কাব্যরচনার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণ আছে এখানে। পূর্বে রচিত প্রবন্ধগুলোর বক্তব্য থেকে এখানে আমূল কোনো ভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয় না। প্রেমিক কবির ব্যথাহত হৃদয়ের আবেগতাড়িত কথকথা কিভাবে বিদ্রোহাত্মক ভঙ্গিতে প্রকাশ হয়েছে সে উল্লেখ এখানে পাওয়া যাবে। আহমদ শরীফ অনুসন্ধান করেছেন নজরুলের রাজনৈতিক মতাদর্শ। তিনি এও খুঁজেছেন—কতটুকু শক্তির আরাধনা নজরুলে ছিলো, প্রেম-পুরাণ-প্রকৃতিতে কিভাবে অন্তঃপুষ্ট হয়েছিলো তাঁর কাব্যধারা। এ-ছাড়া সমালোচকদের বিচারে নজরুল কিভাবে উঠে এসেছেন তাঁদের রচিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থে-এর-ও একটি বিচার আছে 'নজরুল' গ্রন্থে। এখানে নজরুলমানসে ও রচনায় প্রগতিশীলতার পাশাপাশি দ্বৈততা, আপাত স্ববিরোধিতা, ধর্মনিষ্ঠা শনাক্ত করা হয়েছে। কাব্য-পঙক্তি তুলে ধরে আহমদ শরীফ প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন নজরুলের

বিদ্রোহ বা বিপ্লবী মনোভঙ্গির পেছনে ধর্মীয় আদর্শ কম কার্যকর ছিলো না। তবে এ গ্রন্থেই তিনি প্রথম উল্লেখ করেন যে, সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বিপ্লববাদে 'পথ দেখানো'র গৌরব নজরুলের প্রাপ্য। শরৎচন্দ্র, সতীনাথ, মনোজ বসু যেখানে অসফল, সেখানে 'কুহেলিকা'য় নজরুলের সাফল্য প্রায় চূড়ান্ত। আহমদ শরীফ নজরুল-কাব্যের আঙ্গিক বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছেন, পুরাণ ও প্রকৃতি বহুমাত্রিকতায় ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে। প্রেমের বিচিত্রতা নজরুল-কাব্যকে প্রায়শ অনুরাগ সঞ্চারের আস্পদ করে তুলেছে।

গ.

আহমদ শরীফের নজরুল-বিবেচনায় আবেগের প্রশ্রয় নেই এবং তা যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য এই যুক্তির উত্থান শ্রেণী-বিচারের নিরিখে। তিনি যে 'বিদ্রোহে'র চেয়ে 'প্রেমময়তা'য় নজরুলের প্রকৃত পরিচয়ের কথা বলেছেন -এমতের সঙ্গে আজ বোধকরি কেউ আর অমত বা দ্বিমত পোষণ করেন না। কাজী আবদুল ওদুদও নজরুলকে 'বিদ্রোহী'র চেয়ে 'যুগমানব' হিসেবে বলার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' বা 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় নজরুলের চেয়ে কম বিদ্রোহের বাণী নেই। তিনি নজরুলের গানকে উচ্চমূল্য দিয়েছেন। সেখানে নজরুল মূলত প্রেমিক। এ-দিক থেকে আহমদ শরীফের আবিষ্কার নতুন নয়। তবে মোহ, মুগ্ধতা আর অন্ধ-শ্রদ্ধার স্রোতের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের একজন তিনি। উল্লেখ্য যে, তাঁর হাতেই প্রথম ব্যাখ্যা পেলো কেন এবং কিভাবে নজরুলের প্রেমময়তার স্পর্শকাতরতা বিদ্রোহাত্মক মনোভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে। আহমদ শরীফের কয়েকটি প্রবন্ধে যে বাক্যটির বহু-ব্যবহার লক্ষ করা যায়, তা হলো : 'নজরুলের কবিতায় ভাঙ্গার গান আছে, গড়ার পরিকল্পনা নেই।' তাঁর এই সমীক্ষণ মিথ্যে নয়। নজরুল প্রলয়োল্লাসে অনেক কিছু ভেঙেছেন, ভাঙার কথা বলেছেন—আবার সৃষ্টিসুখে মেতেও উঠেছেন। তবে, সত্য, পরিকল্পনা তাঁর ছিলো না। এতে বড় কোনো দোষ হয়ে যায় নি। কেননা নজরুল কবি, স্থপতি নন। যেখানে অসুন্দর সেখানেই তাঁর বিদ্রোহ, সেখানেই আঘাত হানা। রবীন্দ্রনাথও 'ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর' বলেছেন; গড়ার পরিকল্পনা সেখানেও নেই। কথা এসে ভিড় করলে সুর যেমন বাঁধা পড়ে যায়, ওর অনন্ততা ক্ষুণ্ন হয়—তেমনি বোধকরি, পরিকল্পনা করে ভাঙতে গেলে কবির সঙ্গে দিনমজুরের আর তফাৎ থাকে না।

ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন এবং এর কর্মপ্রক্রিয়া প্রকাশ্যে চালু হবার আগেই কাজী নজরুল ইসলাম সাম্যবাদের কথা বলেছেন তাঁর কবিতায়। আহমদ শরীফের এই মূল্যায়ন যথার্থ বলেই মনে করা যায় যে, রাশিয়ার সাম্যবাদের বাণী ভারতে যখন পৌঁছেনি, তখন হয়তো গোটা এশিয়ায় নজরুলই প্রথম জনগণের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিকার দাবি করলেন। এ জন্যে আহমদ শরীফ তাঁকে জীবনবাদী মানবতার কবি বলে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এই 'প্রতিকার দাবি' মার্কসীয় তত্ত্ব অনুসারে করা হয়নি। কেন করা হবে? নজরুল তো মার্কসবাদী ছিলেন না। নিজে 'শ্রমিক প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়' নামে রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক

হয়েছিলেন। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টিতে নাম লিখাননি। অথচ তাঁর দলের মেনোফেস্ট, যার রচয়িতা তিনি নিজেই—এর সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির চেতনাগত বিরোধ নেই। বিশেষ করে তিনি যখন শ্রমিক, কৃষক মেহনতী মানুষকে এক কাতারে দাঁড় করান এবং আরও লিখেন : 'ভদ্র এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে কোনো ব্যক্তি নিজের হাত পা বা মাথা খাটাইয়া নিজের জীবিকা অর্জন করে, তাহাকে শ্রমিক বলিয়া গণ্য করা হইবে।' (দ্রষ্টব্য : শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের গঠণ প্রণালী)—তখন মার্কসীয় তত্ত্বের শ্রেণিচ্যুত হয়ে সর্বহারার কাতারভুক্ত হওয়ার কথা মনে আসে। আহমদ শরীফ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের তুলনা করে লিখেছেন যে, "প্রাকৃতজনের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, বেদনা আটপৌরে ভাষায় নজরুলই যথাযথভাবে সাহিত্যে তুলে ধরেছেন এবং এ-কারণেই যোগ্যতা ও সার্থকতার প্রমাণ স্বরূপ নজরুল জনপ্রিয়।—এই বক্তব্য অযথার্থ নয়। তার পরও শেষ বিচারে নজরুলকে মার্কসবাদী বলা যাবে না। নজরুল মার্কসবাদে দীক্ষিত হলেই বোধ হয় আহমদ শরীফ বেশি খুশি হতেন। কেননা, তিনি বার বার অন্যায়, শোষণ, অনাচার থেকে মুক্তির জন্যে নজরুলের সংগ্রামী চেতনার কথা উল্লেখ করেছেন, আর লিখেছেন, শেষ পর্যন্ত পথ নির্দেশ নেই, 'নজরুল ইসলামের ধর্ম' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন : 'শুধু সমস্যাই তিনি দেখেছেন, সমস্যার সমাধানও তিনি চেয়েছেন আন্তরিকভাবে, কিন্তু পথের সন্ধান তিনি বাতলিয়ে দেননি।' 'যুগন্ধর কবি নজরুল' প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য এ-রকম : 'তাই তাঁর কাব্যে মহাভাবের মহৎ কথা নেই, ব্যবহারিক জীবনের অনুভূত সত্যের বেদনাময়—গনগনে অভিব্যক্তি আছে, এই জ্বালাময়ী বেদনার অগ্নিক্ষরা বাণীর পেছনে একটি সুস্থ সমাজ দর্শন কিংবা রাষ্ট্রাদর্শ আশা করেছিল পাঠক-মন।' বলা বাহুল্য, আহমদ শরীফ এখানে মার্কসীয় দর্শনকেই বোঝাতে চাইছেন। কিন্তু কথা হলো, যে-কবি প্রাকৃতজনের এতো কাছের, সমাজবাদীরা কেন তাঁকে নিজেদের মতো করে বরণ করে নেবে না? বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় মতবাদী হয়েও যদি আম-জনতার অবোধ্য হয়ে থাকেন, তাহলে সে মতবাদের উপযোগিতা কোথায়? এদিক থেকে নজরুল যদি-বা অদীক্ষিতভাবেই প্রবেশ করলেন পরিবর্তনের যজ্ঞঘরে—উচিত তো মতবাদী পুরোহিতদেরই; তাঁকে কাতারে শামিল করা। কিন্তু তা হয়নি। কেন হয়নি, এর ব্যাখ্যা আহমদ শরীফের প্রবন্ধে পাওয়া যায় না। নজরুলকে এক সময় 'ইসলামি কবি' বলে প্রতিষ্ঠা করার যে হুজুগ উঠেছিলো তা আজকে থেমে গেছে এমন কথা বলা যায় না। আহমদ শরীফ সার্থকভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন যে, নজরুলের ইসলাম নির্ভরতা ধর্মমোহ নয়, মানবতার পক্ষাবলম্বন মাত্র। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধে যখন লেখা হয় : 'তিনি [কবি] ইসলামের প্রতি তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছেন।'-তখন এ বক্তব্যে বোধ হয় নজরুলের উপর একটি ধর্মাদর্শ আরোপ করা হয় পরোক্ষভাবে। তিনি *একালে নজরুল* গ্রন্থে মুসলিম জাগরণের সপক্ষে নজরুলের ১৬টি রচনার নাম উল্লেখ করেছেন (দ্রষ্টব্যঃ পৃ. ১১৭-১৮)। কিন্তু এগুলোর সমন্বয় না থাকায় নজরুলের ধর্মপ্রীতিই মুখ্য হয়ে ওঠে। উদ্দেশ্যবাদীরা এ-কারণে নজরুলকে ধর্মমোহগ্রস্ত বা ধর্মবাদী বলে প্রচারের সুযোগ নিতে পারে। আমাদের মনে হয়, আহমদ শরীফের বক্তব্যটি একটু অন্যভাবে নজরুলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। বলা চলে : তিনি [কবি] ইসলামের প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করেননি।' এ-কথা এজন্যে বলা যে, নজরুল ধর্মচর্চায় আসক্ত ছিলেন না

যেমন, তেমনি আবার ঘোষণা দিয়ে ধর্মত্যাগ করেন নি। একটি সমন্বয়পন্থী মন ছিলো তাঁর। ব্যক্তিগত জীবনেও এর চর্চা হতে দেখা যায়। 'নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়' (১৯৬৪) গ্রন্থে সূফী জুলফিকার হায়দারের দেয়া ও অন্যত্র প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, পারিবারিক জীবনে প্রায় হিন্দুদের আচার নিয়মে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। পুত্রের অন্নপ্রাশন দিয়েছিলেন, খৎনা করান নি তাদের, নিজে যোগসাধনা করতেন, জল-ভগবান ইত্যাদি বলতেন, রোজা রাখতেন না। ইসলামের প্রতি 'অনুগত' কোন মোমেন এ-ধরনের না-জায়েজ কর্মে লিপ্ত নিশ্চ'ই থাকবেন না। সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও কবি ইসলামের ইতিহাস থেকে সাম্যবাদী ভাবনার নির্যাসটুকু গ্রহণ করেছেন, ভারতীয় হিন্দুপুরাণ থেকে নিয়েছেন শোষণহীনতার উপাদান। 'পূজা-অভিনয়' কবিতা ও একটি রূপক নাটকের খসড়ায় তিনি 'রামায়ণের চরিত্রগুলোকে সমাজ-সংগঠনের রূপকল্পে স্থাপন করেছিলেন। সেখানে সীতা শস্য, রাম কৃষকের প্রতিনিধি; শ্রমিক-কৃষকের সাম্যবাদী সমাজই তাঁর বিচারে 'রামরাজ্য'। নজরুলই প্রথম উল্লেখযোগ্য আরবী নামধারী বাঙালি যিনি 'খোদার আসন আরশ' ছেদ করে উঠতে চাইলেন প্রকাশ্যে এবং বললেন, 'মানুষ এনেছে গ্রন্থ গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোন।' অবশ্য 'ভগবানের বুকে' পদচিহ্নও আঁকতে চাইলেন তিনি। অভিভাষণ, প্রবন্ধ বা 'শহিদী ঈদ', 'ঈদ মোবারক' ইত্যাদি কবিতায় ধর্মের প্রাসঙ্গিক উপস্থাপনার মধ্য থেকে সমবাদকে গুরুত্ব দিলেন। জীবনের একটি বড় সময় নজরুল ব্যক্তিগত জীবনচর্চায় ধর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকলেও সাহিত্যে ধর্মীয় উপাদানকে ব্যবহার করেছেন এর সমবাদের নির্যাসটুকুর জন্যে। এই ব্যবহার যে সব সময় সার্থক হয়েছে তেমন নয়। বিশেষ করে ইসলামি অনুষদ ব্যবহার করার সময় কোথাও তিনি অতি আবেগী হয়ে পড়েন এবং সেখানেই ধর্ম মুখ্য হয়ে উঠতে চায়। তাঁর জীবনের প্রথম ও শেষ অধ্যায় বিবেচনা করলে ধর্মের প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিলো না, এমন বলা মুশকিল। এই দুর্বলতা স্বীকার করে আহমদ শরীফের মন্তব্যই যথার্থ বলে মনে করা যায়। তিনি লিখেছেন : 'নজরুলের ধর্মবোধ স্বাতন্ত্রবুদ্ধি জাগায় না। এ ধর্ম কল্যাণ ও মিলনকামী।'—তাই এই ধর্মকে যে কোনো নামে অভিহিত করা চলে।

ঘ.

আহমদ শরীফ ছিলেন সর্বাংশে ইহজাগতিক চিন্তাধারী বিষয়ী মানুষ। 'জীবনের প্রান্তপর্বের ভাবনা' নামক নিবন্ধে তিনি লিখেছেন : 'আমি যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে বুঝি এবং হৃদয় দিয়ে অনুভব করি যে, মৃত্যুর পরে আর জীবন থাকতে পারে না, এ-ও জানি যে আত্মা বলে কিছুই নেই—কাজেই জন্মান্তর, অমরত্ব, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক বলেও কিছু থাকতে পারে না।' পরজগতের প্রশান্তি নয়, সুসাম্য প্রতিষ্ঠিত জগৎ ও সুন্দর জীবনধারণই তাঁর কাছে মুখ্য। এ দিক থেকে তিনি উপযোগিতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন সর্বক্ষেত্রে, তাঁর অধ্যয়নে, বিচারে। নজরুল-বিচারও এ থেকে বাইরে নয়। নজরুল সাহিত্য যে তিনি বিশেষভাবে পাঠ করেছেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রবন্ধে। বহু কবিতার পঙক্তি বা গদ্য-বাক্য স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করেছেন তিনি। ফলে প্রায়ই ছোট-খাটো বিভ্রম ঘটেছে সেখানে। গভীরভাবে পাঠ করা এই কবির এতো আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করেও ১৯৬৯ সালে 'নজরুল সমীক্ষা : অন্য নিরিখে' প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে

নজরুলকে তিনি যেন প্রায় বাতিল করে দিলেন। যদিও নজরুলের জয়ধ্বনি দিয়ে প্রবন্ধটি শেষ করেছেন, কিন্তু লিখেছেন : 'কাজেই মর্মান্তিক হলেও এ সত্য অস্বীকার করা চলবে না যে রবীন্দ্র-নজরুল সঙ্গীত আগামী পঞ্চাশ বছরও টিকবে না।' জ্যোতিষী-প্রায় এই মন্তব্যের প্রতিধ্বনিই যেন শোনা যায় "রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে একটি স্মৃতিচারণ" প্রবন্ধে : কাজেই বৈষয়িক রাষ্ট্রিক জীবনে রবীন্দ্র-নজরুলের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বিতর্ক দিনে দিনে বাড়বে। অদূর ভবিষ্যতে এক সময় এঁদের কালিক ও স্থানিক ভূমিকা নিঃশেষ হবে।' আহমদ শরীফ এই মন্তব্যগুলো করেছিলেন নজরুলের (সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও) সাহিত্যের সামাজিক উপযোগিতা বিচার করে। কিন্তু তাঁর এই বিবেচনা কখনো একদেশদর্শী বলে মনে হয়। তাই দীর্ঘ বিশ বছর পরও নজরুল সাহিত্যের কালিক ও স্থানিক ভূমিকা নিঃশেষ হবার যখন কোনো লক্ষণই স্পষ্ট নয়, তখন ১৯৯০ সালে প্রকাশিত তাঁর *একালে নজরুল* গ্রন্থে সময় ও সমাজের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা সাপেক্ষে আহমদ শরীফ নিজের মত পরিবর্তন করেন। নজরুলসাহিত্য মুল্যায়নে কোনো বিপ্লবী পালাবদল এতে ঘটাননি, কিন্তু উপযোগ বিচারে এর গুরুত্ব বৃদ্ধির কথা বলেছেন। গ্রন্থের সর্বশেষ অনুচ্ছেদটি এ প্রসঙ্গে তাই স্মরণ করা চলে : 'নিরক্ষর-আকীর্ণ দেশে এখনো পুরোনো রস-রুচির মানুষই অধিক। এখনো গণমানব শোষণ-শাসন-পীড়ন মুক্তি প্রতীক্ষ। কাজেই নজরুল সাহিত্যের উপযোগ ও ভূমিকা এখনো আগের মতই গুরুত্বপূর্ণ। নজরুলের সঙ্গীত সুরের সমাদারও অসংখ্য। অতএব আরো অনাগত অনেকদিন ধরে নজরুল এমনি নিত্য স্মরণীয় ও শরেণ্য হয়ে থাকবেন বাঙালাভাষী সমাজে।'—আহমদ শরীফ জীবনের শেষ পর্যায়ে নজরুল-বিবেচনায় তাঁর পূর্বমত থেকে এভাবেই সরে আসেন। তবে এখানেও উদ্ধৃতির প্রথম বাক্যে-স্বভাববশত তিনি একটি ঠেস উহ্য রেখে যান। নুতন রস-রুচির শিক্ষিত মানুষ নজরুল সাহিত্য কিভাবে গ্রহণ করবে, এ জন্যে শুধু ভবিষ্যতের দিকেই বাড়িয়ে ধরতে পারি আমাদের অমিত আগ্রহ।

অধ্যাপক আহমদ শরীফের সাহিত্য-গবেষণার এক দিক

বিশ্বজিৎ ঘোষ

বাংলাদেশের শিক্ষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে আহমদ শরীফ একটি উজ্জ্বল ও গৌরবদীপ্ত নাম। সাহিত্য-গবেষণায় তিনি রেখেছেন দীপ্র প্রজ্ঞার স্বাক্ষর। প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় সাহিত্য গবেষণায় তাঁর সাফল্য কিংবদন্তিতুল্য। এ ক্ষেত্রে বর্তমান কালে তাঁর তুল্য গবেষক প্রকৃত অর্থেই বিরল। সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনে আহমদ শরীফ মধ্যযুগীয় সাহিত্য আবিষ্কার ও বিশ্লেষণেই অধিক সময় ব্যয় করেছেন। মধ্যযুগীয় সাহিত্য-গবেষণায় তাঁর একটি প্রধান বিষয় হচ্ছে ওই সময়ের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার ও সম্পাদনা। সাহিত্য-গবেষণায় আহমদ শরীফের অবদানের এ-দিকটিই সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রান্ত। বর্তমান আলোচনায় মধ্যযুগের সাহিত্য-সম্পাদনায় আহমদ শরীফের অবদান-বিষয়েই আমরা আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

২.

মধ্যযুগীয় সাহিত্য সম্পাদনায় আহমদ শরীফের অবদানের স্বরূপ আলোচনার পূর্বে এক্ষেত্রে তাঁর পারিবারিক উত্তরাধিকারের প্রসঙ্গটি উপস্থাপন করা প্রয়োজনীয় বোধ করি। মধ্যযুগীয় সাহিত্যের প্রতি আহমদ শরীফ তাঁর সপ্রেম অনুরাগের সূত্রটি লাভ করেছেন পিতৃব্য আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের (১৮৭১-১৯৫৩) কাছ থেকে। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ দীর্ঘ ষাট বছরের নিরন্তর সাধনায় আবিষ্কার ও সংগ্রহ করেছেন মধ্যযুগের বহুসংখ্যক পুথি। তাঁর সংগৃহীত পুথির মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের অতীত ঐতিহ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, আমাদের সাহিত্যের একটি প্রধান শাখা বিস্মৃতির গর্ভ থেকে আলোর মুখ দেখেছে। আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত *বাংলা পুথির পরিচায়িকায়* চার শতাধিক পুথির বিস্তৃত পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর সেই *পুথি পরিচিতি* মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের বহু অপরিজ্ঞাত কবি, অজ্ঞাতপূর্ব কাব্য ও অজানা তথ্যের সংবাদ দিয়েছে, যে-তথ্য সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্য একান্তই অপরিহার্য। ঐতিহাসিক কারণেই এ তথ্য উল্লেখযোগ্য যে, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদই আমাদের দেশে সাহিত্য সম্পাদনার পথ প্রদর্শক। কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে আবদুল করিমের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় দশটি গ্রন্থ। সম্পাদিত

এ গ্রন্থগুলো হলো–নরোত্তম ঠাকুরের *রাধিকার মানভঞ্জ* (১৯০১), *বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ* (১৯১৪), কবি বনুডের *সত্য নারায়ণের পুথি* (১৯১৫), দ্বিজ রতিদেবের *মৃগলুব্ধ* (১৯১৫), রামরাজার *মৃগলুব্ধ সংবাদ* (১৯১৫), দ্বিজ মাধবের *গঙ্গামঙ্গল* (১৯১৬), আলি রজার *জ্ঞান সাগর* (১৮১৭), বাসুদেব ঘোষের *শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস* (১৯১৭), মুক্তারাম সেনের *সারদামঙ্গল* (১৯১৭) এবং শেখ ফয়জুল্লাহ্‌র *গোরক্ষবিজয়* (১৯১৭)।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতেই ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ-বিজয়ের ফলে বাংলাদেশের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি আর সাহিত্য ক্ষেত্রে এলো এক বিশেষ পালাবদল। তুর্কীদের একেশ্বরবাদের প্রেরণায় মধ্যযুগের একদল সাহিত্যসেবী গতানুগতিক কাব্যধারার পরিবর্তে বাংলা কাব্যে আর্বিভূত হলেন নতুন এক সাহিত্য-ঐতিহ্য নির্মাণে। ইসলাম ধর্মাবলম্বী এই সাহিত্য সেবীরা সুফি মতবাদের প্রেরণায় ফারসি-আরবি এবং আওয়াধি-হিন্দি কাব্যের রোম্যান্সমূলক প্রণয়োপাখ্যানের ধারা অনুসরণ-অনুকরণ করে বাংলা কাব্যে সংযোজন করলেন নতুন এক মাত্রা। কালের ব্যবধানে মুসলিম কবিদের রচিত এই সাহিত্যকর্ম লুপ্ত হতে বসেছিল, যা কঠোর পরিশ্রম এবং আন্তরিক প্রযত্নের মাধ্যমে উদ্ধার করেছেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। তিনি অধিকাংশ পুথি সংগ্রহ করেন চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা থেকেও কিছু পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের এই কর্মের মূল্যায়ন আহমদ শরীফ উপস্থাপন করেছেন এভাবে–

"তাঁরই (আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ) সাধনা ও গবেষণার ফলে বাঙালী জানল যে, বাংলা সাহিত্যের আদি কবি মুসলমান, বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য প্রদান করেন মুসলমান কবিগণ, প্রথম মৌলিক কাব্যরচনা করেন মুসলমান কবি মরদন ও জাগন ঠাকুর। বাংলা সাহিত্যের ভাষাকে প্রথম শালীনতা দান করেন মুসলমান কবি আলাওল। এক কথায়, তিনিই জানিয়ে ছিলেন যে, সৃষ্টি ও বৈচিত্র্য সাধনের মূলে রয়েছে প্রথমত প্রধানত মুসলমানদের সাধনা।... বাঙালী মুসলমানের মধ্যযুগীয় গৌরবময় শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ঐতিহ্য ইতিহাসের সন্ধান দিয়ে তিনি বাঙালী মুসলমানদের হীনমন্যতা ঘুচিয়েছেন–তিনিই বাংলার মুসলমানদের সাহিত্যের ঐতিহ্যসম্পদ সম্বন্ধে সচেতন ও উৎসুক করে তোলেন।"[১]

উত্তরকালে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের এই বিশেষ শাখার যে সব কাব্য আহমদ শরীফ সম্পাদনা করেন, তার পিছনে অবিরল অনুপ্রেরণায় ছিলেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। পিতৃব্যের পথ ধরেই আহমদ শরীফ মধ্যযুগের সাহিত্যের অর্ণব মন্থন করে তুলে এনেছেন এক একটি উজ্জ্বল সম্পদ। পিতৃব্য আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের কাছে এই ঋণের কথা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন এভাবে-"আপনার স্নেহে যত্নেই আমার এ দেহ-মন পুষ্ট। আপনার সাধনা-সুন্দর-জীবন থেকে প্রেরণা পাওয়ার ফলেই আপনার সংগৃহীত উপাদানে আমার জীবনের প্রথম কৃতি প্রকাশিত হল। জহুরী আপনি, কালের কবল থেকে এ রত্ন আপনিই উদ্ধার করেছিলেন। 'গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা' বলে হিন্দুদের মধ্যে একটি কথা আছে। আমার এ কৃতি নিয়ে আপনাকে স্মরণ করাও অবিকল তা-ই।"[২]

৩.

মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের পুথি-আবিষ্কার ও সম্পাদনাই আহমদ শরীফের সাহিত্য-গবেষণার অন্যতম প্রধান দিক। পারিবারিক অনুপ্রেরণায় ঐতিহ্য অন্বেষী আহমদ শরীফ পঁচিশের অধিক পাণ্ডুলিপি সম্পদনা করেন। এভাবে আপন ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার আবিষ্কারের সাধনায় মধ্যযুগের সাহিত্য গবেষণায় তিনি পরিণত হন একক ব্যক্তিত্বে। তাঁর কর্মের বিপুলতা উপলব্ধির জন্য মধ্যযুগের যে-সব পুথি তিনি সম্পাদনা করেছেন, তার পূর্ণাঙ্গ তালিকাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন। আহমদ শরীফ সম্পাদিত গ্রন্থগুলোর নাম নিম্নরূপ-আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সঙ্কলিত *পুথি-পরিচিতি* (১৯৫৮), দৌলত উজির বাহরাম খান বিরচিত *লায়লী-মজনু* (১৯৫৭), আলাওল বিরচিত *তোহফা* (১৯৫৮), মুহম্মদ কবীর বিরচিত *সত্যকলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ* (১৯৫৯), *মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা* যৌথ, (১৯৬১), *মধ্যযুগের কাব্য-সংগ্রহ* (১৯৬৩), জয়েন উদ্দীন বিরচিত *রসুল বিজয়* (১৯৬৪), মুজাম্মিল বিরচিত *নীতিশাস্ত্রবার্তা* (১৯৬৫), *পুথির ফসল* (১৯৬৬) *শা'বারিদ খান গ্রন্থাবলী* (১৯৬৬), কোরেশী মাগন ঠাকুর বিরচিত *চন্দ্রাবতী* (১৯৬৭), *মধ্যযুগের রাগতালনামা* (১৯৬৭), *বাঙলার সুফী সাহিত্য* (১৯৬৯), *নসিহতনামা* (১৯৬৯), *বাউলতত্ত্ব* (১৯৭৩), *হিন্দু-কবির পদসাহিত্য* (১৯৭৩), দোনা গাজী বিরচিত *সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল* (১৯৭৫), *সওয়াল সাহিত্য* (১৯৭৬), আলাওল বিরচিত *সিকান্দরনামা* (১৯৭৭), শেখ মুত্তালিব বিরচিত *কিফায়তুল মুসল্লিন* (১৯৭৮), সৈয়দ সুলতান বিরচিত *নবীবংশ* (১৯৭৮), সৈয়দ সুলতান বিরচিত *রসুল বিজয়* (১৯৭৮), *রসুল চরিত* (প্রথম খণ্ড ১৯৭৮, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৭৮), শেখ মুত্তালিব বিরচিত *কায়দানী কিতাব* (১৯৭৮) এবং বাউল কবি ফুলবাসউদ্দীন ও নসরুদ্দীনের *পদাবলী* (১৯৮৮)। এ-ছাড়াও তিনি বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেন, যেগুলো পত্রিকায় মুদ্রিত হলেও, এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

আহমদ শরীফের প্রথম সম্পাদিত গ্রন্থ দৌলত উজির বাহ্‌রাম খানের *লায়লী-মজনু*। আলোচ্য কাব্যটি সম্পাদনার ফলে মধ্যযুগের একটি শ্রেষ্ঠ কাব্য কালের গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে। *লায়লী-মজনুর* ভূমিকায় সন্নিবেশিত সম্পাদকের দীর্ঘ গবেষণামূলক নিবন্ধটি মধ্যযুগের এই বিশিষ্ট কাব্যটির বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরেছে। কাব্যের জনয়িতা দৌলত উজির বাহরাম খানের জীবন-ইতিহাসের বিস্তৃত তথ্যও সম্পাদক অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। ভূমিকাংশে সম্পাদক পাণ্ডুলিপি-পরিচিতি, কবির আত্ম পরিচয়, লায়লী-মজনুর প্রণয় কাহিনী, কাব্যের বৈশিষ্ট্য, বাহরাম খানের কবিত্ব ও বৈদগ্ধ্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন। কাব্যের পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে প্রয়োজনীয় শব্দের অর্থ ও টীকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগারে রক্ষিত সর্বমোট আটটি পাণ্ডুলিপি পর্যালোচনা করে আহমদ শরীফ গ্রহণ করেছেন তাঁর চূড়ান্ত পাঠ। আলোচ্য কাব্য সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে আহমদ শরীফ লিখেছেন–

"মধ্যযুগের সাহিত্য ক্ষেত্রে *লায়লী-মজনু* কাব্য নানা গুণে অনন্য। এ কাব্য বাল্যপ্রেমে অভিশপ্ত দুই বিরহী হৃদয়ের রক্তক্ষরা বেদনার জমাট অশ্রু। এর গীতোচ্ছ্বাস, এর কারুণ্য, এর নীতিনিষ্ঠ মানবিকতা অভিভূত করে পাঠককে।... ভাষার শালীনতায়

। বিশুদ্ধতায়, উপমা রূপকের সুপ্রয়োগে, ভাবের ঋজুতায়, বর্ণনভঙ্গির লাবণ্যে, শব্দ যোজনার পরিপাট্যে এবং রুচিসৌষ্ঠবে দৌলত উজীরের *লায়লী-মজনু* মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ াংলা কাব্যের অন্যতম।"[৩]

১৯৫৮ সালে আহমদ শরীফের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সঙ্কলিত পুথি-পরিচিতি*। এ-গ্রন্থে মধ্যযুগের বিভিন্ন মুসলিম কবির ৫৮৫টি থির বিস্তৃত পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে। মধ্যযুগের সাহিত্য-গবেষকদের কাছে এ-স্থটির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। *সাহিত্য-বিশারদের দিনের চিন্তা এবং রাতের স্বপ্ন রূপ* এই *পুথি পরিচিতি*-র সম্পাদনা বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পাদনার ইতিহাসে একটি ল্লেখযোগ্য প্রয়াস। সম্পাদক কঠোর পরিশ্রম করে সাহিত্য বিশারদ সঙ্কলিত থিসমূহের নানা জটিলতা দূর করেছেন।

আহমদ শরীফের সম্পাদনায় ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয় মুহম্মদ কবীর রচিত *ধুমালতী* কাব্য। মধ্যযুগের যে-সব রোম্যান্সমূলক প্রণয়োপাখ্যানে ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা । মানবতাবোধের প্রকাশ ঘটেছে, মুহম্মদ কবীরের *মধুমালতী* তার অন্যতম। আহমদ রীফ সম্পাদিত *মুসলিম কবির পদসাহিত্য* গ্রন্থে মধ্যযুগের মুসলিম পদকর্তাদের রাধা-ষ্ণের প্রেম বিষয়ক মোট চারশ' দুটি পদ সঙ্কলিত হয়েছে। রূপ, অনুরাগ, বংশী, াক্ষেপ, দান, নৌকা, অভিসার, মিলন, সম্ভোগ, মান, বিরহ, আত্মবোধন, আত্মনিবেদন, ার্থনা, বাৎসল্য প্রভৃতি পর্যায়ের পদ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এ গ্রন্থে। সঙ্কলনভুক্ত পদসমূহের ধান পদকর্তারা হচ্ছেন—আলি রজা, সৈয়দ মর্তুজা, সৈয়দ আইনুদ্দিন, নাসিরুদ্দীন, য়দ সুলতান, মীর ফয়জুল্লাহ, কমর আলী, আলাওল, চাঁদ কাজী, চম্পা গাজী, নাসির াহাম্মদ, শেখ কবীর প্রমুখ। পনের ষোল শতকে চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) ষ্ণব-মতবাদ বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অঙ্গনে যে প্রবল প্রভাব ফলেছিল, এ-সম্পাদনাকর্মের ফলে তার একটা বিশেষ দিক উন্মোচিত হয়েছে। ামাদের দেশে সাহিত্য-সম্পাদনার ইতিহাসে আলোচ্য সম্পাদনাকর্মটি একটি ল্লেখযোগ্য প্রয়াস।

আহমদ শরীফ সম্পাদিত *মধ্যযুগের রাগতালনামা* গ্রন্থে মধ্যযুগীয় আটজন ঙ্গীতশাস্ত্রকারের নির্বাচিত রাগমালা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ-গ্রন্থে যাঁদের রাগমালা ন্নিবেশিত হয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন—মীর ফয়জুল্লাহ, আলাওল, কাজী দানিশ, বখ্শ আলী, ালি রজা, ফাজিল নাসির মুহম্মদ, তাহের মাহমুদ এবং চামারু। মধ্যযুগের অন্যতম বি কোরেশী মাগন ঠাকুরের *চন্দ্রাবতী* কাব্য আহমদ শরীফের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ৯৬৭ সালে। *চন্দ্রাবতী* কাব্যের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি না-পাওয়ার কারণে খণ্ডিত পাণ্ডুলিপিই তনি সম্পাদনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে সম্পাদকের ভাষ্য-

"প্রায় বত্রিশ বছর আগে কোরেশী মাগন রচিত *চন্দ্রাবতী* উপাখ্যানের আদ্যে, মধ্যে । অন্ত্যে খণ্ডিত একখানা পাণ্ডুলিপি শ্রদ্ধেয় ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের হাতে পড়ে। রপর *চন্দ্রাবতী*র আর কোনো পাণ্ডুলিপি মেলেনি। অতএব, এই খণ্ডিত পাণ্ডুলিপিই গলের কবল থেকে মাগনের কবি-খ্যাতি এবং কাব্য কাহিনী আজ অবধি বাঁচিয়ে রখেছে। কাজেই আসন্ন অবলুপ্তি থেকে রক্ষা করে একে স্থায়িত্ব দান করার দায়িত্ব এবং র্তব্য আজ আমাদেরই। সে জন্যই কাব্যের পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি প্রাপ্তির ক্ষীণ আশায়

অপেক্ষা না করে যেটুকু হাতে আছে—তার মুদ্রণ ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয় মনে করি।"[৪]

বাংলা পাঁচালি কাব্যের ধারায় ষোল শতকের কবি শা'বারিদ খানের অবদান অনস্বীকার্য। শা'বারিদ খানের তিনটি প্রধান সাহিত্যকর্ম হচ্ছে *বিদ্যাসুন্দর, রসুল বিজয়* এবং *হানিফার দিগ্বিজয়*। এই তিনটি উপাখ্যান মিলেই আহমদ শরীফের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে *শা'বারিদ খান গ্রন্থাবলী*। আহমদ শরীফ সম্পাদিত অন্যান্য গ্রন্থের প্রকাশ মধ্যযুগীয় সাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে সঞ্চার করেছে নতুন মাত্রা। প্রতিটি সম্পাদনাকর্মই মধ্যযুগীয় সাহিত্য গবেষণার জন্য অত্যন্ত জরুরি বলে পাঠকমহলে স্বীকৃত হয়েছে।

মুহম্মদ আবদুল হাই এবং আহমদ শরীফের সম্পাদনায় ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয় *মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা*। ৩২০টি বৈষ্ণব পদ, ৫৭টি শাক্ত পদ এবং ৯৪টি বাউল পদ-এই নিয়ে *মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতার* এ-সঙ্কলন। ইতোপূর্বে, ১৯৫৪ সালে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল বিদ্যাপতির ১০০টি পদের সঙ্কলন *বিদ্যাপতি শতক*। এদেশে বৈষ্ণব পদাবলী সম্পাদনায় ওই গ্রন্থই প্রথম প্রয়াস। কিন্তু যেহেতু সে সঙ্কলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কেবল বিদ্যাপতির নির্বাচিত পদ, তাই সেখানে পাওয়া সম্ভব নয় বৈষ্ণব পদাবলীর একটা সামগ্রিক চিত্র। এ অভাব দূর করেছে *মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা*। চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম বাংলাদেশে ততটা প্রসার লাভ না করলেও, বৈষ্ণবসাহিত্য কিন্তু এক সময় জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মনে রসের সঞ্চার করেছিল। শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি আর মননে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব অপরিসীম। বর্তমান সম্পাদনাকর্ম মধ্যযুগের সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল শাখাকে সামগ্রিকভাবে পাঠকের সমীপবর্তী করেছে বরং সে সূত্রেই এ প্রয়াসের সাফল্য। এ গ্রন্থে সঙ্কলিত বাউল গানগুলোতে ধরা পড়েছে এদেশের সাধারণ মানুষের আনন্দ বেদনা আর আশা-নিরাশার কথা—স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টির আবেগ। এ-হিসেবেও সঙ্কলনটি নিঃসন্দেহে গুরুত্ববহ।

৪.

আহমদ শরীফ সম্পাদিত উপর্যুক্ত সম্পাদনাকর্মসমূহ বাংলাদেশে সাহিত্য সম্পাদনার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে সচেতন মহলে স্বীকৃত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসচর্চায়ও এ-সব সম্পাদনাকর্ম নতুন ভাবনা এবং উপাত্ত সরবরাহ করেছে। প্রতিটি সম্পদনাকর্মের ভূমিকায় সংযোজিত গবেষণামূলক নিবন্ধসমূহ মধ্যযুগের সাহিত্য, বিশেষত রোম্যান্সমূলক উপাখ্যান পঠন-পাঠন ও গবেষণার জন্য একান্তই অপরিহার্য। প্রতিটি ভূমিকায় সম্পাদকের পাণ্ডিত্য, নিষ্ঠা, পরিশ্রম এবং মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগের স্বাক্ষর বর্তমান। কাব্যসমূহ সম্পাদনা করতে গিয়ে সম্ভাব্য সব পাণ্ডুলিপি, সম্পাদক পরীক্ষা করেছেন, নানা ধরনের পাঠের সঙ্গে তুলনা করে গ্রহণ করেছেন চূড়ান্ত পাঠ। তাঁর পাঠই প্রামাণিক বলে গবেষক মহলে স্বীকৃত। প্রতিটি ভূমিকায় কবির ব্যক্তি পরিচয় এবং কাব্যের রচনাকাল নির্ণয় সম্পাদকের শ্রমনিষ্ঠার পরিচয়বাহী। মধ্যযুগের বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতির স্বরূপ-সন্ধানে সমাজতাত্ত্বিকের কাছে এ-সব গবেষণাকর্মের মূল্য অপরিসীম। সম্পাদক উক্ত বিষয়ে গভীরভাবে

মনোনিবেশ করেছেন। প্রতিটি ভূমিকাতেই তৎকালীন বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতির পরিচয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। মধ্যযুগের কবিদের নান্দনিক উৎকর্ষের কথাও প্রতিটি ভূমিকার উল্লেখযোগ্য দিক।

সম্পাদিত পাণ্ডুলিপির চূড়ান্ত পাঠ উল্লেখ করতে গিয়ে বিকল্প পাঠসমূহ সন্নিবেশ করে আহমদ শরীফ পাঠকের কৌতূহলকে আকর্ষণ করেছেন। পাঠক পরীক্ষা করে সম্পাদকের চূড়ান্ত পাঠ গ্রহণের কারণ অনুধাবন করতে পারবেন। প্রতিটি গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে সংযোজিত শব্দার্থ, টীকা-টিপ্পনীও সম্পাদকের শ্রমশীলতার স্বাক্ষরবাহী। পরিশিষ্ট অংশ মধ্যযুগীয় সাহিত্যপাঠে নবীন গবেষকের জন্য অবশ্যপাঠ্য একটি বিষয়। মধ্যযুগের এসব গ্রন্থ সম্পাদনার পূর্বে শিক্ষার্থীদের দেখার কোনো সুযোগ ছিল না। শিক্ষার্থীদের উপযোগিতার কথা বিবেচনা করলেও এ-সব সম্পাদনাকর্মের গুরুত্ব অনুধাবন করা সম্ভব। এ-সব পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ফলে আমাদের ঐতিহ্য অনুসন্ধানের কাজটিও অনেক সহজ হয়েছে। সেজন্যে আমাদের আত্মপরিচয়ের উৎস সন্ধানেও এ-সব সম্পাদনা কর্মের ভূমিকা অপরিসীম।

তথ্যনির্দেশ

১. আহমদ শরীফ, "সাহিত্য বিশারদ", *আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ স্মারকগ্রন্থ* (সম্পাদক : মুহম্মদ এনামুল হক এবং কবীর চৌধুরী), ঢাকা; বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯, পৃ. ৯২
২. আহমদ শরীফ (সম্পাদক), *লায়লী-মজনু,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৫৭, দ্রষ্টব্য-উৎসর্গপত্র
৩. আহমদ শরীফ (সম্পাদক), *লায়লী-মজনু,* পূর্বোক্ত, দ্রষ্টব্য-ভূমিকাংশ
৪. আহমদ শরীফ (সম্পাদক), *চন্দ্রাবতী,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৭, দ্রষ্টব্য-ভূমিকাংশ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতা আহমদ শরীফ

নূরুর রহমান খান

প্রথম খণ্ড

ডঃ আহমদ শরীফ সুদীর্ঘ অধ্যাপনা জীবনের 'সঞ্চিত জ্ঞান, উপলব্ধ তত্ত্ব, লব্ধ প্রজ্ঞা, অর্জিত বোধ এবং তজ্জাত প্রত্যয়গুলো লিপিবদ্ধ করার বাসনাবশে' 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' (পনেরো শতক অবধি) শীর্ষক গ্রন্থটি রচনা করেন এবং তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সাহিত্য' এবং 'ভাববিপ্লব ও বৈষ্ণব সাহিত্য'-এই মূল্যবান অধ্যায় দুটো সংযোজন ব্যতিরেকেই গ্রন্থটি ১৯৭৮-এর ডিসেম্বরে মুদ্রিত হয়ে আমাদের হাতে আসে। ৫২৮ পৃষ্ঠার গ্রন্থটির প্রকাশনায় ছিল 'বর্ণ মিছিল'। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড, ১১৩৪ পৃষ্ঠার বিরাট কলেবর নিয়ে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর, ১৯৮৩ সনে। ফলে চর্যাপদ থেকে দোভাষী সাহিত্য-কবিওয়ালা পর্যন্ত অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের একটা মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ের কিংবা গ্রন্থের দুটো খণ্ডে রয়েছে। আমরা পর্যায়ক্রমে উভয় খণ্ডের ওপর আলোকপাত এবং আহমদ শরীফের মানস প্রবণতা, সমাজ সচেতনতা, ইতিহাসনিষ্ঠা, সত্যানুসন্ধানে তাঁর ঐকান্তিক প্রয়াসের সুযৌক্তিক মূল্যায়নের চেষ্টা করবো।

বাংলাদেশের 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস' অভিধায় কিছু সংখ্যক গ্রন্থ প্রণীত হলেও তার অধিকাংশই বাংলা সাহিত্য কিংবা সাহিত্যের ইতিহাস সংক্রান্ত জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের সঙ্কলন মাত্র। কোন কোন পুস্তক ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রণীত 'ছাত্রবন্ধু' রচনাবিশেষ। আবার কেউ কেউ পূর্ববর্তী বিদ্বানদের গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন তথ্য, এমনকি অধ্যায় পর্যন্ত নিজেদের গ্রন্থে সংযোজিত করে বিপুলাকার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (!) রচনা করেছেন এবং বাহুল্য বিবেচনায় ব্যবহৃত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের উল্লেখ পর্যন্ত করেননি। কাজেই বাংলাদেশে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন দীর্ঘকাল উপেক্ষিতই ছিল। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ডঃ আহমদ শরীফের প্রচেষ্টা নিঃসংশয়ে পথিকৃতের মর্যাদা দাবি করতে পারে।

ডঃ শরীফ গ্রন্থের সূচনাতে অত্যন্ত সংক্ষেপে প্রাচীন বঙ্গ, বাংলা ভাষা এবং বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় দিয়াছেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন যে ভোগ, লিপ্সা ও কর্মকুণ্ঠাই বাঙালিকে মিথ্যাভাষণ, প্রবঞ্চনা, চৌর্যবৃত্তি, সুযোগ সন্ধানী, তোয়াজ ও তদ্বিরপ্রবণ

করেছে। একই কারণে বাঙালি চরিত্রে ঝাড়-ফুঁক বশীকরণ, কবচ-মাদুলি, যোগ-তন্ত্র ও ডাকিনী-যোগিনীর প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায়। তার সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছে দেবতার স্তুতি ও মাহাত্ম্যকীর্তন।

ডঃ আহমদ শরীফের গ্রন্থটির সর্বত্র তাঁর হিতবাদী চিন্তাধারার পরিচয় বিধৃত। তাঁর বিবেচনায় সাহিত্য-শিল্প প্রভৃতি সমাজের উচ্চ-বিত্তের ও উচ্চ বর্ণেরই অনুশীলনে ও প্রয়োজনে সৃষ্ট। শাস্ত্র শাসন সভ্যতা প্রভৃতি বিত্তবান মানুষই সৃষ্টি করেছে—গণমানব কেবল শ্রম দিয়েছে এবং শাসন মেনেছে। এ জন্যেই তার দৃঢ় প্রত্যয় শাসকশোষক শ্রেণীর কৃতি-কীর্তি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ আরামকে দেশ, জাতি ও মানুষের নামে চালিয়ে দেয়া শুধু অমানবিক ও নির্মমতা নয়, সত্যেরও অপলাপ।' (পৃ. ২৪)।

গ্রন্থকার মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে আঞ্চলিক সাহিত্য হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং প্রমাণস্বরূপ নির্দেশ করেছেন যে, ধর্মঠাকুর ধর্মমঙ্গল রাঢ় অঞ্চল কখনো অতিক্রম করতে পারেনি। চণ্ডীমঙ্গলও রাঢ় অঞ্চলের। মনসামঙ্গল মুখ্যত পূর্ববঙ্গে এবং বৈষ্ণব পদাবলী পশ্চিমবঙ্গেই সৃষ্ট। গাথার বিকাশ ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে। পীর-নারায়ণ সত্যের প্রভাব-প্রসার দক্ষিণবঙ্গে তথা সুন্দরবন সংলগ্ন নিম্নবঙ্গে ও দক্ষিণ রাঢ়ে।

গণ-মানসে ও সমাজ-জীবনে শাস্ত্র ও শাসকের প্রভাব খুবই ব্যাপক এবং বাংলাদেশ অতীতে বিজাতি-বিজিত দেশই ছিল। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর বা পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে ডঃ শরীফ তাঁর গ্রন্থে 'বাঙলার রাজনীতিক ইতিকথা' অধ্যায়টি বিস্তারিত করেছেন। রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যের মোটামুটি তিনটি পর্যায় তিনি নির্দেশ করেছেন। মৌর্যগুপ্ত-পাল-সেন আমল প্রাচীন যুগ, তুর্কী-আফগান-মুগল আমল মধ্যযুগের অন্তর্ভুক্ত এবং ব্রিটিশ বিজয়ে আধুনিক যুগের সুচনা। অবশ্য যুগ-বিভাগের আলোচনায় স্বাধীনতাউত্তর কালকে (?) বর্তমান যুগ হিসাবে চিহ্নিত করে গ্রন্থকার বাংলা সাহিত্যে চতুর্থ পর্যায় নির্দেশ করেছেন। বিভিন্ন যুগে বিজিতের ওপর বিজয়ীর ধর্ম-সংস্কার সংস্কৃতির প্রভাব এবং শাসিতদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়ার মূল্যায়ন প্রচেষ্টা অত্যন্ত মনোজ্ঞ হয়েছে। বিশেষ করে ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে বাংলাদেশে মুসলিম বিজয়ের সূচনা থেকে হোসেন শাহী আমল পর্যন্ত ৩৩৭ বৎসরের ক্ষমতাসীন বিভিন্ন রাজবংশের রাজন্যবর্গের কৃতি-কৃতিত্ব ও মানসিক প্রবণতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে বাংলা সাহিত্যের তথাকথিত 'অন্ধকার যুগ' বা 'বন্ধ্যাযুগ' তত্ত্বের অসারতা প্রতিপন্ন করে উক্ত সময়কে তিনি বাংলা সাহিত্যের 'সৃজ্যমানকাল' বা 'গঠনযুগ' বলে অভিহিত করেছেন। এ ছাড়া অধ্যায়টির অন্তে প্রাচীনকাল থেকে মুগল আমল পর্যন্ত ছকে বাংলার সুলতান-শাসক-সুবাদারদের শাসন কালসহ একটি পীঠিকা সংযোজন করে ডঃ শরীফ শুধু ইতিহাস প্রীতির পরিচয়ই দান করেননি, উৎসাহী পাঠকের ইতিহাস রসপিপাসা নিবৃত্তিতেও সহায়তা করেছেন। এ সঙ্গে জনপদের নাম সংবলিত প্রাচীন বঙ্গ বা বৃহৎ বঙ্গের একটি মানচিত্র এবং বিভিন্ন রাজবংশের অধীনে বাংলার ভৌগোলিক মানচিত্র সংযোজিত হওয়া অত্যাবশ্যক ছিল বলে আমরা মনে করি।

'বাঙলা সাহিত্যের তথাকথিত আঁধার যুগ' অধ্যায়ে ডঃ আহমদ শরীফ উল্লেখ

করেছেন যে, "চর্যাগীতি যে বাঙলা, এ বিশ্বাস থেকেই বাঙলা সাহিত্যের 'তামসযুগ' তত্ত্বের উদ্ভব। অথচ চর্যাগীতি যে বাঙলা তা আজো সর্বজন-স্বীকৃত সত্য নয়।' (পৃষ্ঠা ১৭৬) তাঁর বিবেচনায় যেহেতু সব সিদ্ধা বাঙালি ছিলেন না এবং চর্যা রচনাকালে বাংলা শালীন ও লেখ্য সাহিত্যের ভাষা ছিল না, আঞ্চলিক বুলি ছিল মাত্র—কাজেই উড়িষ্যা মিথিলা কিংবা আসামের লোকের পক্ষে তখন বাংলা পদ রচনা করার সাধ-সাধ্য থাকার কথা নয়। সে সময় আঞ্চলিক বিকৃতিজাত সামান্য প্রভেদ থাকলেও উড়িয়া-বিহারী-বাঙলা আসামী ভাষা মোটামুটি অভিন্ন ছিল। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখ বিদ্বজ্জনও একই অভিমত পোষণ করেন। তবে বৃহৎ বঙ্গে বহুল চর্চার ফলে চর্যাপদে বঙ্গ-গৌড়ীয় বিকৃতি এসেছে এবং চর্যার ওপর বাংলার জোরালো দাবির দৃঢ় রহস্য এখানেই নিহিত বলে ডঃ শরীফ মনে করেন। পণ্ডিতবর্গ প্রমাণ করেছেন যে, ভাষার এক সাধারণ স্তর থেকে বাংলা উড়িয়া মৈথিলী অসমিয়ার উদ্ভব। এই সাধারণ স্তর তাঁর বিবেচনায় অর্বাচীন অবহট্ঠ বা আধুনিক ভাষাগুলোর লক্ষণ স্ফুটনকালীন অবহট্ঠ (ডঃ সুকুমার সেন যাকে 'প্রত্ন-বাঙ্গালা অসমীয়া-উড়িয়া' বলেছেন)। এ ভাষাতেই চর্যাপদ রচিত। তিনি উল্লেখ করেছেন, 'চৌদ্দ শতক অবধি কোন নব্য ভারতীয় ভাষাতেই লিখিত সাহিত্য রচিত হয়েছে বলে প্রমাণ নেই।' (পৃষ্ঠা ২৫৫)

সুতরাং, চর্যাপদকে বাংলা কিংবা অসমিয়া, মৈথিলী ইত্যাদি ভাষায় রচিত বলার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। চর্যাপদাবলীতে বিধৃত সমাজ ও প্রাকৃতিক বর্ণনাও একান্তভাবে বিশেষ কোন ভাষা-ভাষী অঞ্চলের নয়. সমগ্র পূর্ব ভারতেরই। ডঃ শরীফ কিছু নতুন তথ্য দিয়েছেন। চর্যায় উল্লিখিত নেড়ে ব্রাহ্মণ-"ব্রাহ্মণ্যবাদী দ্বিজ নয়, মুণ্ডিত মস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষু বা শ্রমণ। বুদ্ধ স্বয়ং বলেছেন—বৈর ক্লেশ আসক্তিহীন শুদ্ধচিত্ত সদাচারীই ব্রাহ্মণ,—জন্মসূত্রে নয়। ব্রহ্মজ্ঞানীই ব্রাহ্মণ।" (পৃষ্ঠা ২৫১) 'পঁউয়া খাল'-পদ্মানদী নয়—চতুষ্পদ্মরূপ সাধন স্তরে পৌঁছবার জন্যে ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নারূপ খাল তথা দুই পদ্মের সংযোগ নাড়ী। সুতরাং, চর্যাপদে বাংলার প্রতিবেশ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে 'পঁউয়া খালকে পদ্মা নদীতে রূপান্তরিত করার কোন্ যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই বলে প্রাজ্ঞ গ্রন্থকারের অভিমত।

বাঙালির লোকায়ত বিশ্বাস, সংস্কার আচার-আচরণ এবং লৌকিক দেব-দেবীর কল্পনায় বৌদ্ধ প্রভাব প্রকট বলে চর্যাপদের আলোচনার পটভূমি হিসাবে ডঃ শরীফ বৌদ্ধ শাস্ত্রের কিঞ্চিৎ পরিচয় এবং চৌরাশী সিদ্ধা তত্ত্বের ওপর আলোকপাত করেছেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে 'চৌরাশী' সংখ্যাটি গভীর তাৎপর্যবহ এক বিস্মৃত সাংকেতিক সংখ্যা। অনেক গবেষক চৌরাশীর ব্যাপক ব্যবহার ও তাৎপর্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। যোগতান্ত্রিক সাধনপন্থায় যারা কায়াসাধনা করে দেহের নিয়ন্ত্রণে সাফল্য অর্জন করেন তারাই সিদ্ধ পুরুষ বা সিদ্ধ। 'চৌরাশীসিদ্ধ' বলতে অনেকে চৌরাশীজন সিদ্ধ পুরুষের নাম উল্লেখ করেছেন। অবশ্য সকলের তালিকা সম্পূর্ণ কিংবা অভিন্ন নয়। তবে এঁদের অনেকেই যে বাঙালি ছিলেন তা প্রতিষ্ঠিত সত্য। ডঃ শরীফ চৌরাশীর একটা ব্যাখ্যা পেয়েছেন ষোল শতকের কবি মীর সৈয়দ সুলতান প্রণীত 'জ্ঞান-প্রদীপ' গ্রন্থে। গ্রন্থের বর্ণনায় দেখা যায়, মানুষের দেহ নিজ নিজ আঙ্গুলের পরিমাপে চৌরাশী আঙ্গুল পরিমিত দেহ ও দেহজ মন নিয়ন্ত্রণে সিদ্ধ যে সাধক, তিনিই চৌরাশী সিদ্ধ বা সিদ্ধা।

অর্থাৎ কায়াসাধনে সিদ্ধিপ্রাপ্ত জন মাত্রই সিদ্ধা। সুতরাং, গ্রন্থকারের বিবেচনায় চৌরাশী সিদ্ধা সংখ্যাবাচক নয়, সিদ্ধি-জ্ঞাপক।' এবং জ্ঞাপন-প্রদীপে উল্লিখিত সৈয়দ সুলতানের এ ব্যাখ্যা যৌক্তিক বলেই তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ডঃ সুকুমার সেনও চৌরাশী সিদ্ধাকে রূপকাত্মক বলেছেন।

'মধ্যযুগে জাতিবৈর ও তার স্বরূপ' অধ্যায়ে লেখক যথার্থই নির্দেশ করেছেন যে, প্রবলমাত্রই কমবেশি পর-পীড়ক' শাসক মাত্রই সাধারণভাবে শোষক ও পীড়ক। দেশ-জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এরা একই শ্রেণীচরিত্রের এবং লেখক কালের প্রেক্ষাপটেই বিভিন্ন জিজ্ঞাসার সযৌক্তিক আলোচনা করেছেন।

'বাঙালীর ইতিহাস সন্ধানে' লেখক বলেছেন যে, আধুনিক বাঙলাভাষী অঞ্চল ব্রিটিশ শাসনপূর্বকালে কখনও একচ্ছত্র শাসনে ছিল না এবং অঞ্চলটি একক নামে পরিচিতও ছিল না। ফলে ভাষিক ঐক্য ব্যাহত হয়েছে। একচ্ছত্র শাসন এবং অঞ্চলসম্ভূত শাসক বংশের অধিকার থাকলে আসাম-বাঙলা-উড়িষ্যা-বিহারে এক অভিন্নভাষী মানুষ পাওয়া যেতো বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। লেখক আরও বলেন যে, ঘটনার সুবিন্যাস ইতিহাস নয়, চেতনার অনুসরণ ও চিত্রণই ইতিহাস। তাই "বাঙালীর ইতিহাস বাঙলার লোকধর্মের, লোকায়ত দর্শনের, লোকসাহিত্যের, লোকশিল্পের, লোকসঙ্গীতের ও লোকবিশ্বাস-সংস্কারের ইতিকথারই অন্য নাম।" (পৃঃ ১২৭)।

'ইতিহাসের ধারায় বাঙলা ও বাঙালী' অধ্যায়ে ডঃ শরীফ অনার্যের শ্রেষ্ঠত্বের যৌক্তিক তথ্য পরিবেশন করেছেন। নারী দেবতা এবং শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা একান্ত ভাবেই অনার্য। দেবকী, বাসুদেব, শিব, উমা প্রভৃতি অনার্য নাম। প্রতিমা পূজা, নারী দেবতার পূজা, অবতারবাদ, জন্মান্তরবাদ, যোগ, তন্ত্র ও সাংখ্য দর্শন ও ভূত, যক্ষ প্রভৃতি অপদেবতার পূজা অনার্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসূন। অনার্যের ওপর আর্যদের শাসন-শোষণ পীড়ন দীর্ঘকাল চলেছিল। "ব্যাস, বশিষ্ঠ, নারদ, সত্যকাম, শুকদেব প্রভৃতির জন্ম অনার্যার গর্ভে। আর্যেরা যে অনার্য সুন্দরীদের ধর্ষণ করত, এগুলো তার নজির।" (পৃঃ ১৩৬)। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আক্রমণে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির বিলুপ্তির কথাতো ঐতিহাসিক সত্য। মুসলমান শাসনকালে বাংলা সাহিত্যের প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানরা-ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এর কারণও অত্যন্ত সুস্পষ্ট। দেশজ মুসলমান মাত্রই হিন্দু অথবা বৌদ্ধ থেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। স্বাভাবিক কারণেই তারা মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চায় উৎসাহ বোধ করেছিল।

এ দেশে ইসলামের প্রসার প্রসঙ্গে লেখক উল্লেখ করেছেন যে, বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের প্রচারে ও প্রসারে রাজানুকূল্য তেমন সহায়ক হয়নি। ইসলাম প্রচারে প্রত্যক্ষ এবং ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করেছিলেন পীর ফকির এবং সুফী দরবেশরা। আর্তজনের প্রতি করুণা-ভালোবাসা ও অলৌকিক ক্ষমতাই ছিল তাঁদের মূলধন। বর্ণ বিন্যস্ত সমাজে অবাধে ধন-সম্পদ অর্জনে অধিকার-বঞ্চিত 'কামার-কুমার-তাঁতী-নাপিত-ধোপা-হাড়ি-ডোম-বাগদী-কৈবর্ত মুচি-মেথর প্রভৃতি' অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত জনগোষ্ঠী 'ইসলামী সাম্যের সমাজে-জন্ম সূত্রে নয়, কর্ম ও যোগ্যতাসূত্রে জীবন রচনা ও ব্যক্তির মানবিক মর্যাদা' প্রতিষ্ঠার জন্যে সহজে প্রলুব্ধ হয়েছিল।

ডঃ শরীফ *সেক শুভোদয়া* গ্রন্থের অকৃত্রিমতায় বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন বিজয়ী তুর্কী রাজশক্তির প্রসন্ন দৃষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রাজমন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্র পীর মাহাত্ম্যসূচক গ্রন্থটি রচনা করেন। গদ্যে-পদ্যে রচিত এই সংস্কৃত গ্রন্থে বিধৃত বাংলা ছড়া ও পদগুলো লেখক তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

পণ্ডিতবর্গ বিভিন্নভাবে বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ নির্দেশের প্রয়াস পেয়েছেন। এঁদের মধ্যে কেউ ধর্মীয় প্রভাব কিংবা ব্যক্তিবিশেষের প্রভাবকে বাংলা সাহিত্যের যুগান্তরের কারণ বলে মনে করেছেন। আবার অনেকে রাজনৈতিক পরিবর্তন বা রাজবংশের ক্ষমতা হস্তান্তরেও ভাষা ও সাহিত্যের কালান্তরের যোগসূত্রের সন্ধান পেয়েছেন। ভাষার বিবর্তন ও কালগত ব্যবধানকেও কোন কোন পণ্ডিত যুগবিভাগের মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহারে আগ্রহান্বিত। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ-গৌড়ীয় যুগ-চৈতন্যযুগ-সংস্কার যুগ-কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ নামে এ' বিভাগ করেছেন। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক প্রাক্-তুর্কী যুগ—তুর্কী আমল, স্বাধীন মুসলিম বাংলা, মুঘল আমল, ইংরেজ আমল, পাকিস্তান যুগ নামে বাংলা সাহিত্যের কালগত বিভাগ দেখিয়েছেন। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষায় বিবর্তন ভিত্তিক যুগ বিভাগ করেছেন। ডঃ সুকুমার সেন শতকের কাঠামোর বিষয়ানুগ আলোচনা করেছেন। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১০ম থেকে ১২শ শতককে আদি যুগ, ১২০১ থেকে ১৪৯৩ খ্রীঃ সময়কে প্রাক্ চৈতন্যযুগ, ১৪৯৩ থেকে ১৬০৫ খ্রীঃ পর্যন্ত চৈতন্যপর্ব এবং ১৬০৫ থেকে ১৮ শতকের শেষার্ধ ও ১৯ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়কালকে উত্তর-চৈতন্য পর্ব নামে চিহ্নিত করেছেন।

নতুন জাতির সঙ্গে রাজনৈতিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ফলে নতুন মনন ও সংস্কৃতির জন্ম অবধারিত। নতুনের সংস্পর্শে ব্যক্তি চেতনায় যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তারই প্রভাবে ব্যক্তিমানসে ও প্রাত্যহিক জীবনের অনিবার্য পরিবর্তনই যুগান্তরের জন্মদাত্রী। বিদেশী তুর্কী-মুগল-ইংরেজ শাসনে এ' দেশের জন-জীবনে সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্যে এ' যুগান্তর বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাই রাজ্য-রাজত্ব হাতবদল হওয়ার ফলে জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটে তার আলোকে বাংলা সাহিত্যের সমগ্র কাল-পরিসরকে ডঃ শরীফ চারটি যুগে বিন্যস্ত করার পক্ষপাতী।

১. মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন শাসন কাল—প্রাচীন যুগ। এযুগের একমাত্র লিখিত সাহিত্যিক নিদর্শন 'চর্যাপদাবলী'।
২. তুর্কী-আফগান-মুগল শাসনকাল—মধ্যযুগ। এ' যুগের দুটো পর্যায় নির্দেশ করা যেতে পারে।
   ক. আদি মধ্যযুগ-১৩-১৪ শতক।
   খ. মধ্যযুগ-১৫ থেকে১৮ শতক।
৩. ব্রিটিশ শাসনকাল-আধুনিক যুগ।
৪. স্বাধীনতা-উত্তরকাল-বর্তমানযুগ।

ডঃ শরীফের উল্লিখিত 'স্বাধীনতা-উত্তরকাল' সম্পর্কে আমাদের কিছু বক্তব্য রয়েছে। লেখক যদি '৪৭ সনের ইংরেজী সরকারের মাটি বন্টনকে স্বাধীনতা হিসাবে গ্রহণ করতে

আগ্রহী হন, তাহলে '৭১-এর পরিবর্তনকে কোন্ অভিধায় চিহ্নিত করবেন? আমাদের বিবেচনায় ৪৭-এর পরবর্তী সময়কে 'বিভাগোত্তরকাল' হিসাবে চিহ্নিত করাই সমীচীন।

গ্রন্থকার তাঁর ব্যাখ্যাত বৈশিষ্ট্যের আলোক সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নিম্নরূপ যুগানুগ নামকরণ করেছেন :

১ম যুগ : ১৩-১৪ শতক—সৃজ্যমান লোকায়ত সাহিত্যের কথকতার যুগ। সন্দেহাতীতভাবে এ সময়কার কোন লিখিত সাহিত্যিক নিদর্শন মেলেনি। এ যুগে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ তত্ত্বকথা-গোপীচাঁদ-ময়নামতী-মানিকচাঁদ কাহিনী, আদিনাথ-মীননাথ-হাড়িফা কানফা সংবাদ, যোগিপাল-ভোগিপাল-মহীপাল গীত, যক্ষের ব্রতকথা ধর্মঠাকুর ও তারার মাহাত্ম্য, ডাক-ডাকিনী, যোগী যোগিনীর কথা প্রভৃতি আসরে আসরে গীত হতো। রাম-কৃষ্ণ-শিব-মনসা-চণ্ডীর লৌকিক মাহাত্ম্য কথা প্রচলিত ছিল।

২য় যুগ : ১৫ শতক—লিখিত লৌকিক দেবসাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্যের যুগ। এ যুগের সাহিত্যিক নিদর্শন ক. শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন, শূন্যপুরাণ, মনসার ভাসান এবং খ. সংস্কৃত থেকে অনুবাদমূলক রামায়ণ ও ভাগবত।

৩য় যুগ : ১৬ শতক—ভাব বিপ্লব যুগ বা রেনেসাঁ যুগ। শ্রী চৈতন্যের জীবন চর্যার প্রভাবই বাঙালির চিন্তা-চেতনায় রেনেসাঁস আনে। এ শতকে পূর্ব ধারার অতিরিক্ত পাওয়া যাচ্ছে ক. বৈষ্ণব সাহিত্য, খ. অনুবাদমূলক প্রণয়োপাখ্যান, গ. মহাভারত ও নবীকাহিনী।

৪র্থ যুগ : ১৭ শতক—লোকায়ত পীর-দেবতার যুগ। এ শতক ক. পূর্ব বর্ণিত বিভিন্ন শাখার সৃষ্টি প্রবাহে স্ফীতির যুগ, খ. পীর-নারায়ণ সত্যের পাঁচালী ও অন্যান্য উপ-দেবতা ও পীরের পাঁচালীর প্রসারকাল। গ. লোকগাথার বিকাশকাল এবং ঘ. মুসলিম শাস্ত্রকথা ও নবী বীর কাহিনীর সৃজন কাল।

৫ম যুগ : ১৮ শতক—অবক্ষয় যুগ। নওয়াব ব্রিটিশ শাসন শোষণজনিত এ যুগে মঘ-হার্মাদের ও য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীদের ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি, সামন্ত স্বৈরাচার, দুর্নীতি-দুঃশাসন প্রভৃতি গণ-মানবের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে চরম অনিশ্চয়তা আনে। এ শতকে ক. শহুরে শায়ের ও কবিওয়ালাদের উদ্ভব। পূর্বোক্ত ধারার কবিরাতো ছিলেনই। নবাবী আমলের অবসান ও কোম্পানী শাসনের সূচনাকালীন নৈরাজ্য-নৈরাশ্যের ফসল হচ্ছে শায়েরদের মিশ্র ভাষারীতির কাব্য এবং কবিওয়ালাদের খেউড়-আখড়াই-টপ্পাগান ও অশ্লীল কথকতা। শতাব্দী ব্যাপী (১৭৬০-১৮৬০ খ্রীঃ) এই নৈরাজ্যের সময়কে 'যুগসন্ধি' হিসাবেও চিহ্নিত করা চলে।

বিদেশী-বিধর্মীর শাসন প্রবর্তিত হওয়ার ফলেই এই উপ-মহাদেশে ধর্ম-বিপ্লবের আবরণে সমাজ-বিপ্লব তথা নির্জিত গণমানবের শাস্ত্র সমাজের শাসন-পীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা সম্ভব হয়েছে। তুর্কী বিজয়ই বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার এবং বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্যের দ্বার উদঘাটন করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র পাঠান শাসনামলকে বাংলার ইতিহাসের গৌরাবোজ্জ্বল যুগ বলে অভিহিত করেছেন। ডঃ শরীফও উল্লেখ করেছেন "তুর্কী বিজয়ের ফলেই জনগণ মাতৃভাষায় তাদের বিশ্বাস-সংস্কারের, তাদের সুখ-দুঃখের, আনন্দ-যন্ত্রণার, সমস্যা-সম্পদের ও প্রাণের কথার অভিব্যক্তি স্বাধীনভাবে দিতে পারল। এর আগে বাঙলায় লেখ্য রচনা চালু ছিল না বলে তাদের গান, গাথা, ধামালী,

পাঁচালী, রূপকথা, ইতিকথা, ব্রতকথা, দেবকথা গায়েনের মুখে আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসবে-পার্বণে মেলায়-বৈঠকে মৌখিক রচনা হিসাবে কথকতায় চালু করেছিল, লিখিত পাঁচালীর শুরু সম্ভবত পনেরো শতক থেকেই।... বাঙলা রচনার শুরু লোকায়ত ধর্মকথা দিয়ে—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাথসাহিত্য, দেবমঙ্গল কাব্য প্রভৃতি তার প্রমাণ।" (পৃঃ ২৯৭)

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কৃত হওয়ার পর বিগত অর্ধশতাধিক বৎসর গ্রন্থনাম, কবি, লিপিকাল, রচনাকার, বিষয়বস্তু প্রভৃতি সম্বন্ধে বিদ্বজ্জনদের মধ্যে বহুবিধ বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। ডঃ শরীফ বিদ্বান ও গবেষকদের এতদসংক্রান্ত আবিষ্ক্রিয়া ও সিদ্ধান্তগুলো বিশ্বস্ততার সঙ্গে তুলে ধরেছেন এবং যুক্তিনিষ্ঠ অভিমতও প্রকাশ করেছেন।

বড়ু চণ্ডীদাসের পুথির আবিষ্কারক ও সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ খণ্ডিত পুথিটির নামকরণ করেছেন *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*। ধূর্ত কামুক কৃষ্ণের যে লাম্পট্য-স্পৃহা ও ইতর আচরণ পুথিটিতে বিধৃত হয়েছে, তাতে কোনক্রমেই *রতিসম্ভোগ* কাব্যটিতে দেবমহিমা আরোপ করা চলে না এবং এ কারণেই সম্পাদক প্রদত্ত গ্রন্থনাম সম্পর্কে বহুজনের প্রবল আপত্তি। পুথিতে সংরক্ষিত একখণ্ড টুকরো কাগজসূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও তাঁর অনুসারী গবেষকবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যথার্থ নাম 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে যে অভিমত ব্যক্তি করেছেন ডঃ শরীফ তাকে 'যুক্তিগ্রাহ্য' বলেছেন। অবশ্য সে সঙ্গে তিনি মনে করেন, "বিষয়ানুসারে যদি কাব্যের নতুন নাম রাখতেই হয়, তাহলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চেয়ে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' বা 'রাধা কৃষ্ণের ধামালী' নামই হবে বাঞ্ছনীয়।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল কিংবা বড়ুর সঠিক আবির্ভাবকাল আমাদের জানা নেই। ভাষার প্রাচীনত্ব, বৈষ্ণব প্রভাবমুক্ত লোকায়ত অপৌরাণিক কাহিনী, আদিরস-সর্বস্বতা, একাধিক পুথির অভাব ইত্যাদি থেকে ডঃ শরীফ গ্রন্থটির রচনাকাল সম্পর্কে বলেন, "বৈষ্ণবতত্ত্ব বিরোধী এ গ্রন্থ নিশ্চিতই চৈতন্য পুর্বকালের এবং আনুমানিক ১৪২৫ সনের রচিত।" (পৃঃ ৩১৬)

পুথিটির কাব্য রূপ নির্দেশ ও চরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পণ্ডিতজন রাধাকে কামাসক্তা ও সম্ভোগলিপ্সু এবং কৃষ্ণকে লম্পট, কপট, নির্মম, দায়িত্বজ্ঞানহীন, নির্লজ্জ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কাহিনী ও চরিত্রালোচনায় ডঃ শরীফের সমাজ-সচেতনতা বিশেষভাবে লক্ষণীয় এবং তাঁর বক্তব্যের নতুনত্বও কৌতূহল উদ্রিক্ত করে। তাঁর পর্যবেক্ষণে রাধারা হচ্ছে অভাবগ্রস্ত সরল গণ-মানব, দরিদ্র বলে যাদেরকে লাভ-লোভের মরীচিকার ফাঁদে ফেরা সহজ হয়। কুটনীরা হচ্ছে কনের ঘরে মাসী আর বরের ঘরে পিসী। এই কুটনীরূপ টাউটরাই শোষক-শাসকের হয়ে গণমানুষের হিতকর্মীর ভূমিকা করে আর এদের মাধ্যমেই কৃষ্ণরূপী শঠ-কপট শাসক-শোষকগণ দরদী লোকসেবকের ছদ্ম আবরণে শাসন-শোষণের নামে দুর্বল মানুষের যথা সর্বস্ব লুটে। অসহায় বলেই রাধারা কৃষ্ণনির্ভর, কৃষ্ণের কাছেই শোষণের জন্য ধর্ণা দেয়।"

একাধিক চণ্ডীদাস প্রসঙ্গে ডঃ শরীফের অভিমত হচ্ছে—১. অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস ১৪২৫ খ্রীঃ-এর পূর্বেই তাঁর, 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' রচনা করেন এবং অনন্তই প্রাচীনতম চণ্ডীদাস। ২. দ্বিতীয় চণ্ডীদাসের পদই চৈতন্যদেব আস্বাদন করতেন এবং তাঁর

আনুমানিক জীবনকাল ১৪৫০-১৫০০ খ্রীঃ। ৩. কৃষ্ণলীলার পালাগান রচয়িতা দীন চণ্ডীদাস অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন। আর ৪. দ্বিজ চণ্ডীদাস সহজিয়াদের সৃষ্ট জাল কবি। বাস্তবে এঁর কোন অস্তিত্ব ছিল না।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ আবিষ্কৃত রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান *ইউসুফ-জোলায়খার* প্রণেতা শাহ্ মুহম্মদ সগীরকে "আজ অবধি প্রাপ্ত প্রাচীনতম বাংলা কাব্যের কবি বলে" ডঃ আহমদ শরীফের দৃঢ় বিশ্বাস। গ্রন্থে গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ্ (১৩৮৯-১৪৯০খ্রঃ)-এর সপ্রশংস উল্লেখ রয়েছে। এবং কবি সম্ভবত রাজ কর্মচারী ছিলেন। গ্রন্থটিতে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাবও গ্রন্থটির প্রাচীনত্বের পরিচায়ক। কাব্যটি আক্ষরিক অনুবাদ নয়। কবি 'কিতাব-কোরান' থেকে কাব্যের উপাদান গ্রহণ করলেও যুগোপযোগী রস সৃষ্টির জন্যে গ্রন্থটিতে ইবনে আমিন এবং বিধুপ্রভার প্রণয়সংক্রান্ত একটি রূপকথা সংযোজন করেছেন এবং এ কাহিনীটি একান্তভাবেই সগীরের নিজস্ব সৃষ্টি। চরিত্র সৃষ্টি, রূপ ও প্রকৃতি বর্ণনায় কবি দৈশিক ঐতিহ্য ও স্বদেশের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করতে পারেননি। তাই "রাঙ্গী জোলেখা আর মিশর দেশ দুই কবির ধ্যানের চক্ষে বাঙলার বিরহিনী বধু আর বাঙলাদেশ রূপেই প্রতিভাত হয়েছে।" (পৃঃ ৩২)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কিছু পুর্বে কিংবা প্রায় সমসাময়িক কালে রচিত *ইউসুফ-জোলায়খার* সুললিত কবিভাষা ও পরিশীলত রচনাশৈলী নিঃসন্দেহে শাহ্ মুহম্মদ সগীরকে সমকালীন শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা দান করবে। ১৪-১৫শ শতাব্দীর খ্যাতিমান কবি বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার সঙ্গে সগীরের রচনার তুলনামূলক আলোচনা করলে আমাদের বক্তব্যের যথার্থতা নিরূপিত হবে। অপ্রকাশিত কাব্যটির প্রচুর উদ্ধৃতি সহযোগে বিস্তারিত আলোচনায় মধ্যযুগের প্রাচীনতম (?) কবি ও কাব্য সম্পর্কে কৌতুহলী পাঠকের বহু জিজ্ঞাসার সমাধান পাওয়া যাবে-নতুন কৌতূহলও সঞ্চার করবে।

কৃত্তিবাসের উল্লিখিত 'গৌড়েশ্বর' যে রুকনউদ্দীন বারবক শাহ্ (১৪৫৯-৭৬ খ্রীঃ), এ বিষয়ে অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের অভিমত ডঃ শরীফও সমর্থন করেন। কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে রাজা গণেশকে অগ্রাহ্য করে তিনি বলেন যে, অবতার কাহিনী *রামায়ণের* মতো পবিত্র গ্রন্থ দেশজ ভাষায় রচনা করার মতো অশাস্ত্রীয় পাপকর্মে কোন হিন্দুই আদি মধ্যযুগে অনুপ্রেরণা যোগাতে পারে না। কৃত্তিবাস ব্রাহ্মণ হয়েও পাপভয়ের আশঙ্কা হৃদয়ে স্থান না দিয়ে রামায়ণ-গান লৌকিক ভাষায় রচনা করেছিলেন। ডঃ শরীফ মনে করেন যে, লোকনিন্দা ও সমাজচ্যুতির আশঙ্কা মুক্ত হওয়ার জন্যেই তিনি রাজসম্মানরূপ ছত্রচ্ছায়ার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন এবং "কৃত্তিবাস স্বেচ্ছায় *রামায়ণ* রচনায় হাত দিয়েছিলেন গৌড় দরবারে উপস্থিত হবার আগেই।" (পৃঃ ৩৮৪)। কিন্তু পরবর্তী পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার উল্লেখ করেন যে, গৌড় দরবারে উপস্থিতির পূর্ব থেকেই কৃত্তিবাস *রামায়ণ* রচনা করেছেন—ধারণা করা অসঙ্গত।.... কবির 'আত্মকথা' অংশ পাঠে মনে হয়, কবি শিক্ষাপর্ব সমাপনের অনতিকাল পরেই গৌড়েশ্বরের দরবারে সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েছিলেন, ... এবং গৌড় থেকে বাড়ি ফিরে রামায়ণ রচনা শুরু করেন—তাঁর আদর্শ কবি বাল্মীকি যেমন বেদনা ও করুণা সঞ্জাত শ্লোক উচ্চারণ করেই—সুপ্ত শক্তির সন্ধান পেয়ে তাকে কাজে লাগানোর জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন এবং সেই ব্যাকুল বাসনার প্রসূন ঐ অমর কাব্য, তেমনি রাজদরবারে প্রশংসিত হয়ে আত্মপ্রত্যয়ে

ঋদ্ধ কৃত্তিবাসও আপন প্রতিভা চিরকালের জন্যে প্রমূর্ত করে রাখবার বাসনায় অচিরে লেখনী ধারণ করেছিলেন।" (পৃঃ ৩৮৬) বিষয়টি গৌণ হলেও গ্রন্থকারের ভাবনার বৈপরীত্যই সম্ভবতঃ তাঁকে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়তা করেনি।

মালাধর বসু প্রসঙ্গে ডঃ শরীফ উল্লেখ করেছেন যে, গৌড় দরবারের পদস্থ কর্মচারী হিসাবে দক্ষতা ও যোগ্যতার গুণে তিনি সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহের প্রীতিভাজন হয়েছিলেন এবং সুলতান তাঁকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। কিন্তু মালাধর বসু পরবর্তী সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-৮১ খ্রীঃ)-এর প্রতিপোষকতায় 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদকর্ম সম্পন্ন করেন।

ডঃ সুকুমার সেন বিজয়গুপ্তের প্রাচীনত্ব স্বীকার করেন না এবং তাঁর *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (পূর্বার্ধ) এ বিজয়গুপ্তের কাব্যের অর্বাচীনতা ও প্রক্ষেপের বহু নিদর্শন তুলে ধরেছেন। তিনি কবির উল্লিখিত হোসেন শাহকে সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রী) বলেই মনে করেন এবং কবির উল্লিখিত তারিখের (১৪৮৪ খ্রীঃ) দশ বৎসর পর হোসেন শাহ্ সিংহাসন লাভ করেন। সুতরাং ডঃ সেন এই তারিখটিও অগ্রাহ্য করেছেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯, ৫ম সংস্করণ)। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য (বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ৩২৪-২৫, ৫ম সংস্করণ) এবং ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (*বাংলা সাহিত্যের কথা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭০) বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গল সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহর আমলে ১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দে রচিত বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এ দু'জন বিদ্বানও কবির উল্লিখিত গ্রন্থ রচনার সনটি প্রামাণিক বলে গ্রহণ করেননি। ডঃ শরীফ বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গলের রচনাকাল ১৪৮৪-৮৫ খ্রীস্টাব্দই স্থির করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, কবির প্রশংসাধন্য 'সুলতান হোসেন শাহ নৃপতি তিলক'—বাঙলার বিদ্যোৎসাহী সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ নন, ইনি সম্ভবত ইলিয়াস শাহী বংশের জালালউদ্দীন ফতেহ শাহ্ (১৪৮১-৮৭ খ্রীঃ)। ইনি হোসেন শাহ্ নামেই জনসাধারণের মধ্যে সমধিক পরিচিত ছিলেন। যদি তাই হয়, তাহলে কবির উল্লিখিত সন-তারিখ ও নৃপতির নাম পরস্পরের সম্পূরক বলে গ্রাহ্য হতে পারে এবং কবি ও কাব্যের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধেও কোন প্রকার দ্বিধা-সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

কবি জয়েনউদ্দীন বিরচিত *রসুল বিজয়* কাব্যের একটিমাত্র খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন (মরহুম) আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। ডঃ শরীফ কাব্যটির রচনাকাল, কবি পরিচিতি, বিষয়বস্তু এবং জয়েনউদ্দীনের কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সমালোচকের মতে *রসুলবিজয়* মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ বরং 'এ গ্রন্থটি দিয়েই বাঙলা ভাষায় চোখে দেখা রক্ত-মাংসের মানুষের জীবন কথা বা চরিত কথা লেখারও শুরু।' (পৃ. ৪৩৭)। অবশ্য কাব্যটির ভাষায় ব্যাকরণগত কোন উল্লেখযোগ্য প্রাচীনত্ব নির্লক্ষ্য।

ডঃ শরীফ বিদ্যাপতির সময়কাল সম্পর্কে বিদ্বান ব্যক্তিদের মতামত পর্যালোচনা করে ১৩৬০-৬৫ খ্রীঃ বিদ্যাপতির জন্ম এবং ১৪৫৫ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি গ্রন্থ রচনা করেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। গ্রন্থকারের বিবেচনায় বিদ্যাপতি শৈব ছিলেন এবং তাঁর রচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ মানবিক প্রণয় সঙ্গীত। মৈথিল কবি বিদ্যাপতির বিবিধ

উপাধি যেমন, অভিনব জয়দেব, নব কবিশেখর বা কবিশেখর, কবিরঞ্জন, কবি কণ্ঠহার, পণ্ডিত ঠাকুর প্রভৃতি বিভিন্ন পদে ব্যবহৃত হয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। কারণ, উল্লিখিত ভণিতায় অন্যান্য পদকর্তাও পদাবলী রচনা করেছেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি বলে অনুমিত *গৌরীমঙ্গল* এর রচয়িতা কবিচন্দ্র মিশ্র এবং *শূন্যপুরাণের* রচয়িতা রামাই-পণ্ডিতের সময়কাল নিয়ে ডঃ শরীফ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে আদি *শূন্যপুরাণ* দ্বাদশ কিংবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের রচনা। অবশ্য *শূন্যপুরাণের* বিষয়বস্তুর ওপর লেখক দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য : দ্বিতীয় খণ্ড

অভিনিবিষ্ট হয়ে পাঠ করলে সহজেই অনুধাবন করা যায়, অধ্যাপক আহমদ শরীফ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় মনোনিবেশ করলেও তাঁর অন্বিষ্ট শুধু সাহিত্যের ইতিহাসই নয়, সাহিত্যের মধ্যে তিনি বাংলার ও বাঙালির হৃদস্পন্দন তথা জাতীয় সত্তার মর্মোদ্ঘাটনে সচেষ্ট ছিলেন। ফলে বারংবার তিনি ফিরে গেছেন বাঙালির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক মনন-চিন্তনের ক্ষেত্রে-বাঙালির চিৎপ্রকর্ষ এবং সীমাবদ্ধতাকেও তিনি শাণিত যুক্তির অঙ্কুশে সুচিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে ঐকমত্য না হলেও তিনি চিন্তার ক্ষেত্রে বার বার যে সমস্ত প্রশ্ন জাগিয়েছেন তার মূল্য ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সাহিত্যের ইতিহাস পাঠের প্রয়োজন ও উপযোগিতা সম্পর্কে দ্বিতীয় খণ্ডের 'নিবেদন'-এ ড. শরীফের ভাষ্য, "যেহেতু সাহিত্য জীবনের ও জীবনচেতনার উচ্চারিত, উদ্ভাসিত ও লিপীকৃত লঘু-গুরু রূপ, যেহেতু সাহিত্য জীবন থেকেই উৎসারিত, সেহেতু সাহিত্যে চিত্রিত জীবনের বাস্তব ও কাম্য রূপ থেকেই বিশেষ দেশের বিশেষ কালের বিশেষ শাস্ত্র-সমাজ-সরকার শাসিত জনগোষ্ঠীর জীবনালেখ্য পাওয়া সম্ভব হয়। এ কারণেই দেশের ও জাতির কিংবা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ভাষিক শাস্ত্রিক নৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক শৈক্ষিক আর্থিক অবস্থানের মানুষ ও তার জীবনাচার সম্বন্ধে যথাসম্ভব সুষ্ঠু ধারণা পাবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ।" (পৃ. সাত)। এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিচার বিশ্লেষণ করার ফলে *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*-এর উভয় খণ্ড বাঙালিরও জীবন দর্পণ হয়ে উঠেছে এবং সম্ভবত এটি ছিল অধ্যাপক আহমদ শরীফেরও অভীপ্সিত। এদিক থেকে তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সার্থক।

দ্বিতীয় খণ্ড সর্বসাকুল্যে আঠারোটি অধ্যায়ে সমাপ্ত। অদ্যাবধি প্রাপ্ত প্রাচীন যুগের সাহিত্যিক নিদর্শন এবং মধ্যযুগের সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অংশ বৌদ্ধ মত প্রভাবিত। নাথ সাহিত্য, ধর্ম মঙ্গল, সহজিয়া ও যোগতান্ত্রিক সাহিত্য ইত্যাদি হল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সাহিত্য। ড. শরীফ লোকায়ত দার্শনিক তত্ত্ব এবং বিভিন্ন মত ও পথ পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, যোগতান্ত্রিক সন্ন্যাসী ও বাঙলার সুফীরা বৌদ্ধ দেহতত্ত্ব ও বৌদ্ধ শূন্যতত্ত্ব দ্বারা কতোটা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। এ সঙ্গে রয়েছে বৌদ্ধ প্রভাবিত সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের বিস্তারিত পরিচয়। এ শ্রেণীর মূল গ্রন্থের স্বাদ গ্রহণ সাধারণ পাঠকের জন্যে আনন্দদায়ক না হওয়ারই কথা। অধ্যাপক শরীফের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে আমরা মধ্যযুগের এ ধরনের সাহিত্য সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সুদীর্ঘ পরিসরে 'ভাববিপ্লব : চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব সাহিত্য' আলোচিত। বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির জীবনে চৈতন্যের অবদান ও প্রভাব বহুল আলোচিত। এ অধ্যায়টি বিভিন্ন বিদ্বানের আলোচনার নির্যাসে ভরপুর--সে সঙ্গে রয়েছে লেখকের নিজস্ব উপলব্ধি ও অভিমত। বৃহৎ বঙ্গে ভক্তিবাদের উদ্ভব ও প্রসার--ইসলামের সঙ্গে এর সমন্বয়, সুফি ও বৈষ্ণব তত্ত্বে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য, সুফিতত্ত্বের স্থানীয় বিকাশ ইত্যাদি বিস্তৃত পটভূমিতে আলোচিত। প্রয়োজনানুসারে তুলনামূলক আলোচনা-সমালোচনার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। দেশজ মুসলমানদের ওপর ভক্তিবাদের প্রভাবের কারণ সম্পর্কে ড. আহমদ শরীফের উপলব্ধি, "একে ত সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানগণ ধর্মান্তরিত ভারতীয়দের বংশধর, তাদের রক্তসংস্কারে ভারতিক প্রভাব বিদ্যমান, তার উপর ইসলামের একটি বিশিষ্ট শাখা--সুফিমতবাদ ভারতে প্রাধান্য লাভ করে। সুতরাং মুসলমানদের মনের, ইন্দ্রিয়ের, আত্মার ও ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভারতিক ভক্তিবাদ তাদের সহজেই প্রভাবিত করতে পেরেছিল।" (পৃ. ১৬৩) ষোড়শ শতাব্দী যে বাংলা সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ--এটা সর্বজনস্বীকৃত এবং দেশজ সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষণায় মুসলমান সুলতান--সুবাদারদের অগ্রণী ভূমিকাও অজ্ঞাত নয়। ড. শরীফের বিবেচনায়, "এ রেনেসাঁস একান্তই বৈষ্ণবের। এ প্রাণ প্রাচুর্য চৈতন্যদেবেরই দান।" অকাট্য যুক্তিসহযোগে তিনি তাঁর বক্তব্য বিস্তারিত করেছেন। লেখক নির্মোহ গবেষক ও ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে চৈতন্যদেবকে একজন 'চিন্তানায়ক, সমাজনেতা, শাস্ত্র-সংস্কারক ও যুগপুরুষ' হিসেবেই দেখেছেন। বিভিন্ন চরিত্রগ্রন্থ অবলম্বনে রক্তমাংসের বাস্তব মানুষ চৈতন্যদেবের জীবন ও কৃতির রূপরেখা তিনি তুলে ধরেছেন। ষড়গোস্বামী ও চৈতন্য পার্ষদ-পরিকরদের কৃতি-কীর্তিও অভিন্ন গুরুত্বে উপস্থাপিত। চৈতন্যের উচ্চারিত বাণীর মধ্যে *শিক্ষাষ্টক* ব্যতীত শিষ্যদের জন্যে কোন লিখিত গ্রন্থ বা বিধিবদ্ধ বাণী মহাপ্রভু রেখে যাননি। ফলে চৈতন্যের তিরোধানের পরে তাঁর মত-পথ ও দর্শন অবিকৃত রেখে বৈষ্ণব মতবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা ছিল 'খোলাফায়ে রাশেদীনের মতো'। ভক্তদের নিকট চৈতন্যদেব ছিলেন রাধা-কৃষ্ণের যুগলাবতার। চৈতন্য পার্ষদদের মধ্যে 'নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-সীতা-জাহ্নবা-বীরভদ্র প্রভৃতি' তাঁদের দৃষ্টিতে 'বলরাম, শিব প্রমুখের অবতার। কাজেই চৈতন্য ও চৈতন্য-পার্ষদদের জীবনীগ্রন্থগুলো কালান্তরে ও রূপান্তরে এবং নামান্তরে নব মহাভারত, নব ভাগবত ও নব দেবপাঁচালী।' অতএব এঁদের নিয়ে রচিত গ্রন্থগুলোকে জীবনী সাহিত্য হিসেবে গ্রহণে অনেকে সঙ্গত কারণেই দ্বিধান্বিত হতে পারেন। ড. শরীফ এ বিষয়টি স্বীকার করেও 'চরিত সাহিত্যের' উপযোগিতা নিষ্কুণ্ঠচিত্তে সমর্থন করেছেন। তাঁর অভিমত, "কৃষ্ণলীলার আদলে নরনারায়ণের জীবনলীলা বর্ণনা করতে গিয়েও লেখকরা দেশ-কাল-পরিবেশ এড়াতে পারেননি। তাই নানা প্রসঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে এসেছে বাস্তব গাঁ, গঞ্জ, নগর, গিরি, নদী, কান্তার, ব্যক্তি, সমাজ, শাস্ত্র, শাসক, প্রশাসক এবং নৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনকথা ও ঘটনা। দাক্ষিণাত্য থেকে উত্তর ভারতের বৃন্দাবন অবধি গোটা এলাকার নানা সাময়িক সংবাদ নানা সূত্রে রয়েছে বর্ণিত। সেগুলো ষোল শতকের শাস্ত্রিক-সামাজিক-ভৌগোলিক, সাম্প্রদায়িক, প্রশাসনিক, নৈতিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ও অবস্থানের সংবাদচিত্র

বহন করছে। চরিতাখ্যানগুলোর সর্বাধিক গুরুত্ব এখানেই।" (পৃ. ২০৪) বস্তুতপক্ষে আহমদ শরীফও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এমনিভাবে বাংলা ও বাঙালির পরিচয় পেয়ে হয়েছেন আনন্দিত। বাঙালি অজ্ঞাত কুলশীল নয়, তাদেরও পরিচয় রয়েছে এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে তিনি দেখেছেন বাঙালির দর্পণ হিসেবে। ফলে এ সমস্ত গ্রন্থে বিধৃত সমাজচিত্রের প্রতি লেখক বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

অনুবাদ সাহিত্যের আলোচনায় ড. শরীফ বাঙালি সমাজে মহাভারতের তুলনায় রামায়ণের প্রাধান্য ও গ্রহণযোগ্যতার যৌক্তিকতা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন যে, মহাভারতের নায়ক-নায়িকাদের জন্মবৃত্তান্ত, বহুপতিকতা, কানীন মাতৃত্ব এবং 'কৃষ্ণের অন্যায় রাজনীতিক কূটকৌশল' বাঙালির জীবনাদর্শ ও রুচির অনুকূল ছিল না। পক্ষান্তরে নীতিশাস্ত্র, রুচি ও জীবনাদর্শের অনুকূল হওয়ায় "রাম উপাস্য না হয়েও বাঙালির কাছে আদর্শ মানুষ ও প্রমূর্ত মনুষ্যত্ব। রামায়ণ তার (বাঙালির) পারিবারিক-সামাজিক-বৈষয়িক জীবনে আদর্শের প্রতীক ও সৎ প্রেরণার উৎস। তাঁর শাস্ত্র-সংহিতার মর্যাদা পেয়েও মহাভারত তার (বাঙালির) অন্তরে মননে আশ্রয় পায়নি।"

প্রণয়োপাখ্যান মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সমৃদ্ধ শাখা। হিন্দুস্থানী, ফারসি ও আরবি সাহিত্যই এর উৎস। *লায়লী-মজনু* কাব্যে বর্ণিত কাহিনীর স্থান আরব এবং পাত্র-পাত্রীও আরবদেশীয়। কিন্তু আরবে এ কাহিনীর উৎস মেলেনি, এতদসংক্রান্ত কিংবদন্তিও সেখানে প্রচলিত নেই। এমন একটি কাল্পনিক কাহিনীকে ঐতিহাসিকতা দানের প্রচেষ্টা কৌতুককর। ড. শরীফের বিবেচনায় *ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, শিরি-ফরহাদ*-এ তিনটি প্রণয়কাহিনী বিশ্বমুসলিমের ঘরোয়া সম্পদ এবং এগুলো ইরানে উদ্ভূত ও সুফি কবিদের দ্বারা পরিপুষ্ট। কাহিনীগুলো অধ্যাত্মতত্ত্বের রূপক হলেও বাংলা অনুবাদে সেগুলো একান্ত মানবিক প্রেমকাব্যে পরিণতি লাভ করেছে। এটিকে বাঙালির 'পার্থিব জীবন রসিকতার' আরেক নির্দশন হিসেবে ড. শরীফ চিহ্নিত করেছেন। রোসাং নামের উৎপত্তি এবং রোসাঙ্গে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির রাজনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি সুলিখিত।

মর্সিয়া সাহিত্য মূলত কারবালার শোকাবহ কাহিনী অবলম্বনে রচিত। বিষয়টি পাঠক সাধারণের বোধগম্য করার জন্যে অতি সংক্ষেপে ঘটনাটির ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচিত হয়েছে। দাক্ষিণাত্যের শিয়াশাসিত রাজ্যসমূহ এবং আরব-ইরানী সওদাগরদের সঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দরে বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকার ফলে ইরানী সাহিত্য ও দাক্ষিণাত্যের ফারসি-উর্দু সাহিত্যের সঙ্গে আরাকান-ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষিত মানুষের পরিচয় ঘটে। এরই ফলে চট্টগ্রাম অঞ্চলে রচিত বাংলা সাহিত্যের ফারসি-উর্দু এবং উত্তরভারতীয় হিন্দি-আওধি সাহিত্যের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। চট্টগ্রাম-রোসাঙ্গে ইরানি ও উত্তর ভারতীয় কাহিনীর অনুবাদ অনুসৃতির এটাই অন্তর্নিহিত তত্ত্ব।

মুসলিম ধর্মসাহিত্য নিয়ে ইতোপূর্বে বাংলা সাহিত্যের কোন ইতিহাসবেত্তাই ড. আহমদ শরীফের ন্যায় ব্যাপকভিত্তিতে আলোচনা করেননি। সম্ভবত এসব পাণ্ডুলিপির সন্ধান অজ্ঞাত থাকায় অধিকাংশ গ্রন্থে এ শ্রেণীর রচনা ও রচয়িতারা অনুল্লিখিতই থেকে গেছেন। প্রণয়োপাখ্যানের ন্যায় এগুলোর অধিকাংশই অনুবাদমূলক রচনা। এগুলো

আদৌ 'ধর্ম সাহিত্য' কিনা এ বিতর্কও অমূলক নয়। তবে ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি সমুদ্ভূত রচনা হিসেবে অবশ্যই এগুলো আলোচনার দাবি রাখে। সপ্তম থেকে দশম অধ্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন শিরোনামে এ শ্রেণীর রচনা ও কবিদের পরিচয় বিধৃত।

প্রাচীন কাল থেকেই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞানান্বেষণের রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগের শেষপাদ পর্যন্ত বাংলা ভাষায়ও এ রীতিতে গূঢ় শাস্ত্রীয় আলোচনা ও তত্ত্বচিন্তা লিপিবদ্ধ হয়েছে। *"মুসার সওয়াল, আবদুল্লাহর সওয়াল, মালিকার হাজার সওয়াল, গদা-মালিকা সম্বাদ, সিরাজকুলব, হরগৌরীসম্বাদ, তালিবনামা, হায়রাতুল ফিকাহ্* প্রভৃতি উক্ত রীতিতে লিখিত বাঙলা গ্রন্থ।" (পৃ. ৬৫৮)- এ বৈশিষ্ট্যে গুরুত্বারোপ করে এগুলোকে ড. শরীফ 'সওয়াল সাহিত্য' নামে অভিহিত করেছেন।

যে উদ্দেশ্যে ও অনভূতি-তাড়িত হয়ে ভক্তবৃন্দ চৈতন্যদেব ও তাঁর পার্ষদদের চরিতাখ্যান রচনা করেছেন অনুরূপ বিশ্বাস ও ভাবাবেগে মুসলমান কবিরাও চরিতসাহিত্য রচনায় সমান আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। *নবীবংশ, রসুলবিজয়, জঙ্গনামা, মক্তুলহোসেন, হানিফার লড়াই, কাসাসুল আম্বিয়া, সিফতুল আম্বিয়া, হাতেমতাই, আমীর হামজা* প্রভৃতি গ্রন্থকে সাধারণভাবে আহমদ শরীফ জীবনী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। মুসলিম রচিত এসব গ্রন্থে অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক কাহিনীসমূহ নির্বিচারে গৃহীত হয়েছে। "অধিকন্তু যে কয়জন বাঙালি মুসলমান কবি রসুল চরিত রচনা করেছেন, তাঁদের আদর্শ দেশীয় রাম, কৃষ্ণ ও চৈতন্য। রসুলকে এদের চেয়ে শ্রেষ্ঠরূপে চিত্রিত করার প্রেরণাই ছিল মূলে। তাঁদের মানসপটে যে স্থান-কাল ও পরিবেশ ছিল, তাও একান্তভাবে ভারতবর্ষ তথা বাঙলাদেশ, কাফের বলতে তাঁরা হিন্দুকেই দেখেছেন, ফলে তাঁদের তুলিতে যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তাতে ভারতে হিন্দুশক্তির বিরুদ্ধে মুসলমান রাজন্যবর্গের বিগ্রহ-সন্ধির ও হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণের ছায়া পড়েছে।" (পৃ. ৬৭৮) সুতরাং, নিঃসঙ্কোচে এগুলোকে চৈতন্যচরিত শ্রেণীর রচনার অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশতম অধ্যায়ে যথাক্রমে *চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, কালিকামঙ্গল* এবং *শিবমঙ্গল* সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। তন্মধ্যে ত্রয়োদশতম অধ্যায়ে বিবিধ অপ্রধান দেবদেবীর পাঁচালী যথা, *শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, জাহ্নবীমঙ্গল* প্রভৃতির আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত। বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনাচারে উত্তরভারতীয় প্রভাব থাকলেও তার চেতনার গভীরে প্রোথিত "অস্ট্রিক-মোঙ্গলের সাংখ্যের, যোগের ও তন্ত্রের প্রভাব। তাই তার ধর্মীয় তথা শাস্ত্রীয় ও আধ্যাত্মিক ভাব-ভাবনা সর্বভারতীয় আদলে বিকাশ বিবর্তন পায়নি, স্বতন্ত্র পথে হয়েছে বিবর্তিত। একদিকে যেমন কায়াসাধন প্রাধান্য পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি পার্থিব জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা লক্ষ্যে অরি ও মিত্রদেবতার তোয়াজ-স্তুতিই হয়েছে মুখ্য। এটি অবশ্য বাঙালির ঐতিহ্য ও জীবন-প্রীতিরই প্রমাণ, তাই অস্ট্রিক-মোঙ্গল বাঙালি অনেক দেবতা সৃষ্টি করেছে ঐহিক জীবনের প্রয়োজনে। মনসা, চণ্ডী, বাসুলী, ধর্ম, যক্ষ, শীতলা, ওলা, শনি, পীর-নারায়ণ সত্য প্রভৃতি অনেক দেবতা উপদেবতা ও অপদেবতার তোয়াজ স্তুতি করেই আত্মপ্রত্যয়হীন বাঙালী সংসার সমুদ্রে জীবনের ভেলা ভাসিয়ে রাখে।" (পৃ. ৭২৬) এ বক্তব্য বৃহৎ বঙ্গে আঞ্চলিক দেবতা-উপদেবতার আধিক্যের হেতু প্রমাণিত।

মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে বিদ্বজ্জনদের রচনায় বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এতদসংক্রান্ত গবেষণাগ্রন্থও রয়েছে। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে মূল্যবান অভিসন্দর্ভও প্রকাশিত হয়েছে। সম্ভবত এজন্যেই ড. আহমদ শরীফের মঙ্গলকাব্য সম্পর্কিত অধ্যায়গুলো অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তনে বিরচিত--তবে তত্ত্বালোচনা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও শৈলীতে তিনি যথাসম্ভব বিস্তৃত ও প্রাণবন্ত করেছেন। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*-এর প্রথম খণ্ডে মনসামঙ্গলের তিন জন আদি কবির পরিচিতি প্রসঙ্গে চাঁদসদাগর-বেহুলা কাহিনীর অসাধারণত্বের আলোচনা রয়েছে। ড. শরীফ যথার্থই নির্দেশ করেছেন, "মনসামঙ্গলের কাহিনী কর্তৃত্বকামী পরাক্রান্ত দেবতার বিরুদ্ধে আত্মপ্রত্যয়ী স্বাধীনচেতা মানুষের দ্রোহের ও সংগ্রামের ইতিকথা। দেব-মানবের সেই সংগ্রামে মানুষ পরাজিত হয়েছে বটে, কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে মানবিকতার মর্যাদা, মহিমান্বিত হয়েছে মনুষ্যত্ব।" আমাদের বিবেচনায় এখানে মানুষ পরাজিত হয়নি, স্নেহ-বাৎসল্যের নিকট পরাভূত হয়েছে অনভিপ্রেত দম্ভ। চাঁদ আত্মসমর্পণ করেছে অভীষ্ট অর্জনে অনড় আত্মপ্রত্যয়ী এক নারী বেহুলার কাছে। মনসাও যেখানে ব্যর্থ, বেহুলা সেখানে সাফল্যে সমুজ্জ্বল। পুত্রবধূর অসাধারণ অর্জন ও সাফল্যকে স্বীকৃতিদানের জন্যেই চাঁদ সদাগর আত্যন্তিক ঘৃণায় বামহস্তে মনসার উদ্দেশ্যে পুষ্পার্ঘ্য নিক্ষেপ করেছে বটে কিন্তু তার সস্নেহ সজল দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল যথার্থ দেবীপ্রতিমা বেহুলার প্রতি। ড. আহমদ শরীফ বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেছেন, তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সর্বত্র। কিন্তু ভিন্ন মতকে অবজ্ঞা করেননি, অস্বীকার করেননি। তাঁর মতানৈক্য প্রকাশের ভঙ্গিটিও যথেষ্ট শোভন ও মনীষাদীপ্ত। যেমন, মনসামঙ্গলের কাহিনীর "মনসাকে বিদেশী বিজাতি শক্তির প্রতীক এবং চাঁদকে নিপীড়িত শাসিত হিন্দুসমাজের প্রতীকরূপে গ্রহণ করতে কোন কোন বিদ্বান আগ্রহী", -এ অভিমত অসার প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে ড. শরীফের বিনম্র মন্তব্য, "তাঁদের ব্যাখ্যাত তত্ত্ব যথার্থ হলে হাসান হোসেন পালা ও বেহুলার সাধনা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে।" (পৃ. ৭৬১)

শিবমঙ্গলে বিশেষ করে শিবের খ্যাতি-কুখ্যাতি এবং বাঙালির শিবপ্রীতি প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ যে সব তথ্য-তত্ত্বের অবতারণা করেছেন, সে সম্পর্কে মতানৈক্যের সমূহ আশঙ্কা সত্ত্বেও বলা যায়, যুক্তির সুদৃঢ় ভিত্তিতে তিনি নিজ বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সর্বভারতীয় দেবতা শিব বাংলায় লৌকিক ও পৌরাণিকরূপে মূর্তিমান। লৌকিক শিবের গার্হস্থ্যচিত্র জরাজীর্ণ, সংসারজীবনও তথৈবচ। পৌরাণিক দেবতার এহেন করুণ পরিণতি নির্দেশ করতে গিয়ে ড. শরীফের অনুধাবন, "বাঙলাদেশে হাভাতে দুস্থ বাঙালী পরিবারের কর্মকুণ্ঠ কামুক নিরুপায় বিমূঢ় গৃহপতির মতো করেই গৃহস্থ শিব পরিকল্পিত।" মঙ্গলকাব্যে বাংলাকে এতোটা নিবিড়ভাবে পাওয়ার কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে ড. শরীফ লিখেছেন, "মঙ্গল কাব্যে যে আমরা দেবকথার আবরণে আবহমান কালের বাঙলাকে ও বাঙালীকে পাই, তার কারণ বাঙালীর দেবতা বাঙালীরই আশা-আকাঙ্ক্ষার, মনন-চিন্তনের, চাওয়া-পাওয়ার প্রমূর্ত প্রতীক ও প্রতিভূ।" এবং এজন্যেই ড. আহমদ শরীফের সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত, "বাঙলার ও বাঙালীর এ লৌকিক শিব নামে দেবতা, ভাবে-চিন্তায়-কর্মে-আচরণে আবহমান বাঙালী, তাঁর দাম্পত্যে, তাঁর বৈষয়িক জীবনে, তাঁর সুখে-দুঃখে, হাসি-কান্নায়, লাভ-ক্ষতিতে তিনি অভাবক্লিষ্ট নিঃস্ব নিরন্ন ভ্রষ্ট চরিত্র বাঙালী

গৃহস্থ। তাই দেবতা থাকেননি তিনি, নিত্যদেখা, নিত্যজানা আত্মীয় বন্ধু পরিজন তিনি, সেজন্যেই তিনি এতো আপন, এতো প্রিয়। তাঁর সঙ্গে গ্রামীণ গৃহী বাঙালীর ধন-মান ও শ্রেণীগত কোন ব্যবধান নেই।" (পৃ. ৭৯০)

বাঙালি-সৃষ্ট সর্বশেষ লৌকিক দেবতা 'সত্য' মুসলমানের পীর, হিন্দুর নারায়ণ। রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিশেষ পরিবেশে 'সত্য নারায়ণে'র আবির্ভাব। এই লৌকিক পীরকে আশ্রয় করে মধ্যযুগের শেষার্ধে দেশজ হিন্দু মুসলমানের আপোসমুখী সাহিত্য 'পীর পাঁচালী' রচিত। 'সত্য'-এর উদ্ভব ষোল শতকের শেষার্ধে, বিকাশ সতেরো শতকে এবং সমৃদ্ধির কাল আঠারো শতক। ১৫৩৮ থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত দীর্ঘ কালপরিসরে বাংলায় ক্ষমতার হাতবদল এবং সামাজিক জীবনে তজ্জাত প্রভাব প্রতিক্রিয়ার বিচার-বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক শরীফ প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন যে, বাংলাদেশে বহিরাগত ধর্মমত বা জীবনাদর্শ স্থায়ী হয়নি। "বাঙালীরা সবসময়ে নিজেদের গরজ মতো ধর্মমত, ইষ্টদেবতা এবং জীবনাদর্শ তৈরি করে নিয়েছে।" উল্লিখিত সময়ে সামাজিক অস্থিরতা, জনজীবনে নিরাপত্তাহীনতা এবং অন্য বহুবিধ কারণে বিপর্যস্ত মানুষ প্রচলিত ধর্মীয় রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠানে আস্থা হারিয়ে "উদ্ভাবন করে নির্জিত দুস্থ মানুষের এক মিলনমন্ত্র-সে মন্ত্র হচ্ছে 'সত্য'। .... সত্য নির্ভেজাল অকৃত্রিম। তাই সত্য কাউকে কখনো প্রতারণা করে না। হিন্দুরা বহু দেবতার পূজারী। তাই সত্য হিন্দুর কাছে সহজেই ইষ্টদেবতার প্রতিভূ-প্রতীক নারায়ণ। মুসলিম মনে ছিল নিরাকার একেশ্বর তত্ত্বের প্রবল ধারণা, তাই সত্য তাদের কাছে 'পীর'।" (পৃ. ৮০৫-৬) এমনিভাবে হিন্দুর দেবতা ও মুসলমানের পীর লোকজচিত্তে হলো একই সূত্রে গ্রথিত। সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পাঁচালীতেও স্বীকৃত, "বিষ্ণু আর বিসমিল্লা কিছু ভিন্ন নয়"। দক্ষিণ রায় ও বড় খাঁ গাজীর উপাখ্যানেও হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় চেতনার সমন্বয়-সমঝোতা সম্প্রীতির নিদর্শন তাৎপর্যপূর্ণ। দক্ষিণ রায় ও বড়খাঁ গাজী যখন প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধে মত্ত, "ঈশ্বর অর্ধেক শ্রীকৃষ্ণ ও অর্ধেক পয়গম্বর রূপে আবির্ভূত হয়ে রায় ও গাজীর মধ্যে আপোস রফা" করে দেন। পঞ্চদশতম অধ্যায়ে লৌকিক পীর দেবতাদের তালিকায় রয়েছেন ঐতিহাসিক, কাল্পনিক, কিংবদন্তির পীর-ফকিরগণ। এঁরা নিজ নিজ এলাকায় ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলের পূজ্য ও মান্য। যেমন পীর গোরাচাঁদের প্রকৃত নাম সৈয়দ আব্বাস আলী। শ্রীচৈতন্য যে কারণে ভক্তের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ, অভিন্ন কারণে আব্বাস আলীও গৌরবর্ণের সুপুরুষ হিসেবে হিন্দু ভক্তদের নিকট 'গোরাচাঁদ' নামে পরিচিতি পেয়েছিলেন। প্রতিবছর ১২ই ফাল্গুনে বশিরহাটে তাঁর দরগায় "গোরাচাঁদের মেলা বসে। ওইদিন হিন্দু গোয়ালারা বারো মন দুধ দিয়ে পীরের পাকা কবর ধুইয়ে দেয়।" এ সমস্ত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদাহরণ নিদর্শন থেকে ইতিহাসের আলোকে ড. আহমদ শরীফের উপলব্ধি, "শাসক-শাসিত হিন্দু-মুসলিম গোড়ার দিককার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরে এমনিভাবে বাঙলাদেশে শাস্ত্র, সংস্কৃতি ও জীবিকাক্ষেত্রে আপোস রফায় শান্তিতে সৎ প্রতিবেশীরূপে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় সহাবস্থানের সুব্যবস্থা করেছিল মধ্যযুগে।" (পৃ. ৮৩৭)

ইতিহাসের আলোচনা-পর্যালোচনায় ড. শরীফের লেখনী স্ফূর্তি লাভ করে এবং তিনিও উৎসাহিত বোধ করেন। সাহিত্যকেও তিনি ইতিহাসের মানদণ্ডে পরখ করেছেন।

সাহিত্য দেশ-কালের পটভূমিতে মানুষের মনন-চিন্তন, আচার-আচরণ, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রাপ্তি-বঞ্চনা, বাসনা-দ্বেষণার লৈখিক দলিল। সুতরাং, সাহিত্যিক সৃষ্টি কোনক্রমেই ইতিহাসবিরহিত নয়। এ তত্ত্বে আহমদ শরীফের আস্থা অটল। তাই ইতিহাসের নিরিখেই সাহিত্যের মানুষ, সমাজ, জাতি তথা সমগ্র দেশকে অবলোকন করায়, দেশের মানুষের প্রাণস্পন্দন আবিষ্কারে তিনি প্রয়াসী ছিলেন। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক কিংবা ধর্মীয় সকল দিক থেকেই অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষাবধি পর্যন্ত বাংলায় অবক্ষয় যুগ তথা যুগসন্ধির কাল। সাহিত্যের আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও ইংরেজ আগমনের অব্যবহিত পরের চিত্রটি সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে ড. শরীফ আলোচনা বিস্তারিত করেছেন। এ পরিবেশেই আমরা সাক্ষাৎ পেয়েছি শায়ের ও কবিওয়ালাদের। বান ডেকেছিল দোভাষী পুথি ও কবিগানের। পলাশীর যুদ্ধে দেশের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটলে এবং সামন্তসমাজ ভেঙে পড়লে তাদের পৃষ্ঠপোষিত কবি-পণ্ডিত-গুণীজনও কক্ষচ্যুত হয়ে পড়লেন। নব্য ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতায় আরেকদল 'স্বল্পশিক্ষিত বিকৃতরুচির অকবির দল' আবির্ভূত হলেন। এ সময় তাদের সৃষ্ট অশ্লীল খেউড়, আখড়াই, টপ্পা, প্রণয়সঙ্গীত, পাঁচালী ইত্যাদিতে বিশেষ করে নগরাঞ্চল সয়লাব হয়ে গেল। এদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েক জন অবশ্যই মেধাসম্পন্ন ছিলেন। সমকালীন স্থূল রুচিসম্পন্ন সাধারণ মানুষের চিত্তবিনোদনে তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ড. শরীফের মূল্যায়নে এরাও অপাংক্তেয় নন—যদিও তিনি মনে করেন 'সাহিত্যকর্ম হিসেবে নিন্দা ছাড়া' এগুলো প্রশংসা পেতে পারে না। কিন্তু এগুলোর আবির্ভাব ছিল অবশ্যম্ভাবী। "দেশের মানুষের রাষ্ট্রিক আর্থিক শাস্ত্রিক নৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়কালে রচিত বলেই প্রাচীন সাহিত্যিক ঐতিহ্যচেতনায়, আঙ্গিকে, ভাষায়, ভঙ্গিতে, আদর্শে ও রুচিতে এ অপকর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।" (পৃ. ৯৪৩)

ভারতচন্দ্রের মৃত্যুতে বাংলাসাহিত্যে মধ্যযুগের সমাপ্তি এবং ইংরেজদের আগমনে আধুনিক যুগের সূচনা নির্দেশিত হলেও ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত কাল পরিসরে বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে মধ্যযুগের রেশ প্রবলভাবেই চলছিল—বিশেষভাবে কাব্যের ক্ষেত্রে। বাংলা গদ্য সবেমাত্র দৃঢ়ভিত্তি পেয়েছে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠি তখনো মধ্যযুগীয় পয়ারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এ সময়ের কিছু রচনার পরিচয় 'বিবিধ রচনা' হিসেবে সপ্তদশ অধ্যায়ে রয়েছে—সাহিত্যের মানদণ্ডে এগুলো অনুল্লেখ্য। তবে 'ইতিহাস-বিরল দেশে এরও মূল্য আছে বলে' ড. শরীফ মনে করেন। কবি গঙ্গারাম বিরচিত *মহারাষ্ট্রপুরাণ বা ভাস্কর পরাভব* এমনি একটি কাব্য। এটি "নামে পুরাণ হলেও স্বরূপে কবির স্বকালে স্বদেশের রাজনীতি সম্পৃক্ত এক টুকরো ইতিহাস এবং অমানবিক অত্যাচারের একটি বীভৎস চিত্র, একটি তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ আর একটি মূল্যবান দলিল।" (পৃ. ৯৪৯)

'খণ্ডলে কুকির হামলার কথা,' 'চৌধুরীর লড়াই' ইত্যাদিও ইতিহাসের উপকরণ সংবলিত রচনা। ওয়াহাবী-ফরায়েজী আন্দোলন ও এসব আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সম্বন্ধে ছড়া, কবিতা ইত্যাদি রচিত হয়েছে। বৈষ্ণব সাহিত্যের সন্ধানও পাওয়া গেছে। মুসলিম মহিলা কবি রহিমুননেসার পরিচিতি বিস্তৃত পরিসরে স্থান পেয়েছে। তামাকু পুরাণ,

নিকাহমঙ্গল, সঙ্গীতশাস্ত্র, ফালনামা ইত্যাদির পরিচয়দানের পর 'লোকসাহিত্য' নিয়ে ড. শরীফ আলোচনা করেছেন। লোক সাহিত্য কিংবা লোকসংস্কৃতি আমাদের ঐতিহ্য। অধ্যাপক শরীফের বিবেচনায় এ ঐতিহ্য আঁকড়ে থাকার মধ্যে কোন গৌরব নেই। এ সংস্কৃতি আমাদের দৃষ্টিকে পশ্চাৎমুখী করে মাত্র। 'ভব্যসমাজের সংস্কৃতি সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষের ব্যক্তিগত সাধনার ফল ও মনীষার অভিব্যক্তি বা প্রসূন।... কোন দেশের, কালের ও সমাজের প্রাকৃতজনের অর্জিত আচরণে, কৌশলে, নৈপুণ্যে এবং কর্মে ও আচরণে, বিশ্বাসে ও সংস্কারে প্রকাশিত প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাপদ্ধতির সামগ্রিক, সামূহিক ও সামষ্টিক রূপই বা জীবনাচারই হচ্ছে লোক সংস্কৃতি।' এ তাৎপর্যে ড. শরীফ লোক সংস্কৃতিকে 'অনুকৃত ও অনুসৃত রীতিনিয়মের আবর্তিত গণরূপ' হিসেবেই মূল্যায়ন করেছেন। তাই আমাদের কালের ডিরোজিও আহমদ শরীফের ঐকান্তিক কামনা : "লোকসাহিত্য, লোকশিল্প, লোক সংস্কৃতি নয়--এ যুগের কাম্যসাহিত্য হচ্ছে গণসাহিত্য, এ যুগের কাম্যসঙ্গীত গণসঙ্গীত, এ যুগের কাম্যসংস্কৃতি হচ্ছে গণসংস্কৃতি আর এ যুগের কল্যাণতত্ত্ব হচ্ছে গণকল্যাণ। তাই এ যুগের রাজনীতিও হচ্ছে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণআন্দোলন-গণবিপ্লব। লক্ষ্য হচ্ছে অবিশেষ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন আর আত্মার স্বাধীন বিকাশ।" (পৃ. ১০২৫-২৬)

সাহিত্য ও অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত 'সমাজ-সভ্যতা সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের' তথ্যগুলো বিবৃত করার লক্ষ্যে 'সাহিত্যে বিধৃত সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা' শিরোনামে অষ্টাদশ অধ্যায়টি বিরচিত। আমরা লক্ষ্য করেছি, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন উদ্দিষ্ট হলেও বাংলার জনপদ ও বাঙালির ইতিহাস বর্ণনার প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার আহমদ শরীফ করেছেন। তিনি বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালি ও বাংলার জনপদকে সমগুরুত্বে মূল্যায়ন করেছেন। ফলে অভিন্ন শিরোনামে ড. শরীফ রচনা করেছেন বাঙালি, বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত।

প্রাচীনকাল থেকেই দেয়া-নেয়ার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি গতিশীল রয়েছে। সংখ্যালঘু প্রবল বিজয়ী এবং সংখ্যাগুরু বিজিতের অপ্রতিরোধ্য পারস্পরিক প্রভাব সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশে বীজমন্ত্রের মতো কাজ করেছে। চৈতন্যদেব স্বয়ং সুফিতত্ত্বে প্রভাবিত ছিলেন এবং হিন্দুর ধর্মজীবনেও মুসলিম প্রভাব দৃঢ়মূল হতে থাকে। আবার বাংলার নওয়াব তথা বহিরাগত মুসলিম অভিজাত শ্রেণীও হিন্দু তথা দেশজ প্রভাব সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারেননি। 'সাহিত্যে মুসলমানেরা রামায়ণ-মহাভারতের ও মঙ্গলকাব্যের প্রভাবে হিন্দু পুরাণের বহুল ব্যবহার করেছেন-কাহিনী নির্মাণে ও উপমাদি প্রয়োগে। আর বৌদ্ধতন্ত্রের ও বেদান্তের প্রভাব পড়েছে সুফি বাউলের সাধনায়।' (পৃ. ১০৩২)। বৃত্তিগত শ্রেণীবিন্যাস মুসলমান সমাজেও ছিল। গোলা, জোলা, মুকেরি, পিঠারী, কাবারী, সাবাকার, হাজাম ইত্যাদি নিম্নশ্রেণীর মুসলমানের পরিচয় মঙ্গলকাব্যে রয়েছে। ধোপা-নাপিত কামার-কুমার হিন্দু সমাজভুক্ত হলেও পেশাগত কারণে অন্য ধর্মাবলম্বীর সঙ্গেও ছিল এদের নিবিড় যোগাযোগ। বরঞ্চ বলা যায়, এরা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ছিল। মধ্যযুগের শিক্ষা ও শিক্ষাসংক্রান্ত উপকরণ, চিকিৎসা, খাদ্য, পোশাক, অলঙ্কার, অস্ত্রশস্ত্র, বিবাহ, ইত্যাদির

চিত্র সাহিত্যে বিধৃত হয়েছে। এ ছাড়া লোকচরিত্র, গানবাজনা, ঘরবাড়ী, ব্যবসায়-বাণিজ্য, লোকাচার-কুসংস্কার, জনগণের আর্থিক অবস্থা, গ্রাম্যসমাজ প্রভৃতি সম্পর্কেও সাহিত্যের মাধ্যমে অবহিত হওয়া সম্ভব। বিভিন্ন উৎসব বা পার্বণ উপলক্ষে বাঙালির আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিও ড. শরীফ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

যে বিচারে আহমদ শরীফের নিজস্ব বক্তব্য নেই, সে-সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে অপরের গবেষণালব্ধ ফসল পরিবেশন করেছেন এবং সবিনয়ে এতদসংক্রান্ত ঋণ স্বীকার করেছেন।

প্রথম খণ্ডের পরিশেষে ড. আহমদ শরীফ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি গ্রন্থতালিকা প্রদান করেছেন—যা থেকে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের পক্ষে প্রথম থেকে অদ্যাবধি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত গবেষণা ও গবেষকদের সম্বন্ধেও অবহিত হওয়া সম্ভব।

বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য : বাঙলা সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস

সাঈদ-উর রহমান

বিশ্ববিদ্যালয়ের যখন ছাত্র ছিলাম ওই সময় বিশেষভাবে আকর্ষণীয় ছিল অধ্যাপক আহমদ শরীফের ক্লাস। তিনি পড়াতেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আধুনিক-পূর্ব কাল, অর্থাৎ তথাকথিত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য। ইতিহাসের সন-তারিখ, লেখকের নাম-গোত্রের পরিচয় প্রভৃতি জানা আমাদের কাছে মুখ্য ছিলনা, কারণ যে কোন প্রচলিত বইয়ে সেগুলো পাওয়া যেত। আমরা উপভোগ করতাম ওই কালের সমাজ-ইতিহাস-মানুষ, বাঙালীর সংগ্রাম সাফল্য বিফলতা, চলমান সমাজ-মানসের বঙ্কিম গতিশীলতা ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণা। তিনি বলতেন যুক্তির কথা, কুসংস্কারের প্রবল পরাক্রমের কাহিনী, বাঙালী লোকচেতনার জটিল রূপান্তরের ইতিহাস। এসব শুনতে শুনতে অজ্ঞাতসারে আমাদের চিন্তায় চমক লেগেছে, বহু গতানুগতিক সংস্কার অতিক্রম করতে আমরা সমর্থ হয়েছি। বস্তুত, ষাটের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের খ্যাতনামা শিক্ষকদের জ্যোতিষ্কমন্ডলীতে তিনি ছিলেন শিক্ষার্থীদের যথার্থ শিক্ষাগুরু ও অনেক কারণে ব্যতিক্রমী।

ছাত্রজীবনে আমরা বড় অভাব বোধ করতাম বাঙলা সাহিত্যের পুর্ণাঙ্গ ইতিহাসের। ড. সুকুমার সেনের পর এক্ষেত্রে যথার্থ মৌলিক গবেষণা আর একটিও হয়নি। তাঁর ইতিহাস অসাধারণ মনীষার স্বাক্ষর বহন করলেও মধ্যযুগের ইতিহাস রচনায় তিনি কোনো কোনো এলাকায় সীমাবদ্ধতা এড়াতে পারেননি। সেসব বিবেচনা করে আমরা সব সময় অধ্যাপক আহমদ শরীফকে অনুরোধ জানাতাম ওই কাল নিয়ে একটি বই রচনা করতে। আমাদের বিশ্বাস ছিল, এক্ষেত্রে তিনিই যোগ্যতম ব্যক্তি। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তিনি আমাদের নিরাশ করেননি। তিনি যখন শিক্ষকতা জীবনের উপান্তে দাঁড়িয়েছেন এবং আমরা শিক্ষকতায় প্রবেশ করেছি (তাঁর অবসর গ্রহণের পর বর্তমান লেখকের অক্ষম স্কন্ধে সে-ইতিহাস পড়াবার দায়িত্ব বর্তেছে) তখন প্রকাশিত হয়েছে দুই খণ্ডে তাঁর বিশাল গবেষণাগ্রন্থ *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*। মোট ১৬৬২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত দুই খণ্ডের এই গ্রন্থে তিনি বাংলা সাহিত্যের সূচনা থেকে শুরু করে ইংরেজ-অধিকারের সময়ে এসে থেমেছেন।

আমাদের বিবেচনায় *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* বাঙলা সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। লেখক সেকালের বাঙালীর সাহিত্য সাধনার একটা সামগ্রিক ইতিহাস তুলে ধরেছেন। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য হিন্দু-মুসলমান উভয়ের দানে সমৃদ্ধ। তবে এমন একটা এলাকা আছে যা নিয়ে স্বধর্মীপ্রেমী মুসলমান যথার্থই গৌরব করতে পারেন এবং পাকিস্তান আমলে সে কাজটা বহুল পরিমাণে করা হয়েছেও। আলোচ্য কালের বাঙলা সাহিত্যের নিদর্শনকে মোটামুটিভাবে দুভাগে ভাগ করলেও চলে--ধর্মমূলক রচনা ও ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক রচনা। প্রথম ধারায় হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ সকল বাঙালী অংশগ্রহণ করেছেন, কিন্তু দ্বিতীয় ধারাটি একান্তভাবে ইসলাম ধর্মাবলম্বী বাঙালীদের দ্বারা সৃষ্ট ও পুষ্ট। প্রচলিত সাহিত্যের ইতিহাসগুলো এই সত্যকে অস্বীকার করে; ফলে সেগুলো হয় খণ্ডিত– একদেশদর্শী। ড. সুকুমার সেন বাঙালী মুসলমানদের সাহিত্যসাধনাকে প্রয়োজনীয় মর্যাদা দিতে পারেননি; মুসলমানদের সাহিত্যসাধনার প্রথম ইতিহাসকার ড. মুহম্মদ এনামুল হকের নামটি তিনি পাদটীকায় দু-একবার উল্লেখ করেছেন--তাও ভুলভাবে। অপর একজন ইতিহাস রচয়িতা ড. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় বাঙালী মুসলমানদের সাহিত্যসাধনাকে যেন স্বীকৃতি দিতেই রাজি নন। *বাঙলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্তে* (৩য় সংস্করণ, কলিকাতা ১৩৭৮) তাঁর একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এরূপ : "আজকাল পূর্ব পাকিস্তানের গবেষকগণ অনেক নতুন পুঁথি আবিষ্কার করেছেন, সেগুলি নাকি অতি পুরাতন। এ বিষয়ে নিঃসংশয় হয়ে মত দিতে আমরা অক্ষম। ...আবদুল করিম সাহেব তখন থেকেই পুঁথি সংগ্রহ করছেন। অথচ তিনি তথাকথিত পুরাতন পুঁথি (মুসলমান কবি রচিত) সম্বন্ধে পাকিস্তান হবার আগে কোথাও কিছু বলেননি, আর পাকিস্তান হয়ে যাবার পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে যদি এত প্রাচীন মুসলমান কবির আবির্ভাব হয় তাহলে তো সন্দেহ জাগাই স্বাভাবিক।...সে যাই হোক, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত ও অধুনা পূর্ব বাংলার গবেষকগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত মুসলমান কবিদের প্রাচীন পুঁথির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে আমরা কোন দায়িত্ব নিতে চাইনা।"(পৃঃ ২৬২-৬৩) এ উক্তি আমাদের কাছে যতই হাস্যকর মনে হোক, এ-মনোভাব নিয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রন্থ-যে রচিত হয়েছে, সেটা অস্বীকার করা যায় না।

মধ্যযুগের বাঙালী সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্নচিত্ত ছিলেন কিনা নিঃসংশয়ে বলা যাবেনা, তবে সেকালের সাহিত্য নিয়ে একালে যাঁরা গবেষণা করেছেন, তাঁদের অনেকেই আচ্ছন্নদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, তা স্বীকৃত সত্য। এই শতাব্দীর গোড়া থেকে যখন পুরানো পুথি সংগ্রহ শুরু হল, তখন হিন্দু গবেষকগণ বেছে বেছে হিন্দু রচিত পুথিই যোগাড় করলেন, পাশের মুসলমান বাড়িতে পুথির জন্য উঁকি দিয়েও দেখলেন না। এভাবে সংগৃহীত পুথির অবলম্বনে পুনর্গঠিত বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস হল হিন্দু সাহিত্যিকদের কৃতি ও কীর্তির বয়ান। মুসলমানেরা সেখানে অনুপস্থিত বা উপেক্ষিত। এর প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানবাদী গবেষকগণ যে একটু বাড়াবাড়ি করবেন সেটাও ছিল স্বাভাবিক ।

এখানেই ড. আহমদ শরীফের অনন্যতা। সত্যসন্ধ ঐতিহাসিক হিসেবে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ নির্বিশেষে বাঙালীর সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে তিনি পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে অবলোকন ও মূল্যায়ন করেছেন। কাউকে বড় বা হেয় করার চিন্তা তাঁর নেই, যেমন

নেই কোন উন্নাসিক মনোভাব। মুসলমানদের ধর্ম ও সাহিত্য সম্পর্কে যেমন তিনি অভিজ্ঞ, তেমনি খবর রাখেন হিন্দু-বৌদ্ধের রচনার ও ধর্ম-দর্শনের। তাঁর মনোভাব সশ্রদ্ধ অনুসন্ধিৎসুর। "বাঙলাদেশে দুইবার একদেহে, অসামান্য রূপগুণের সমাবেশ হয়েছিল। একবার চৈতন্যদেহে অন্যবার রবীন্দ্র-শরীরে।" (পৃঃ ১৮২) একথা তিনি দ্বিধাহীনচিত্তে বলেছেন। এই অর্থেই এটা বাঙলা সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

সর্বাধুনিক তথ্যের ব্যবহারে বইটি অসামান্য সমৃদ্ধ। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কয়টি অধ্যায় : প্রথম অধ্যায় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধসাহিত্য ও বৌদ্ধমত প্রভাবিত সাহিত্য, ষষ্ট অধ্যায় প্রণয়োপাখ্যান, অষ্টম অধ্যায় মুসলিম ধর্মসাহিত্য, দশম অধ্যায় চরিতকথা, পঞ্চদশতম অধ্যায় আপোসমুখী সাহিত্য–পীর পাঁচালী ও ষোড়শতম অধ্যায়ের দোভাষী সাহিত্য। অধ্যায়সমূহে গ্রন্থকারের নিজস্ব গবেষণাজাত তথ্য ও চিন্তনজাত তত্ত্বের সমাবেশ ঘটেছে। ইতিহাস নতুন করে রচিত হয় মূলত দু-কারণে : নতুন আবিষ্কার জানাতে, বা নতুন ব্যাখ্যা হাজির করতে। অধ্যাপক আহমদ শরীফ দুয়েরই পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন আলোচ্য অংশসমূহে। বিশেষ করে এক নম্বর ও পনের নম্বর অধ্যায়ে তিনি যে ভাষ্য উপস্থাপিত করেছেন, তাতে মধ্যযুগের জনমানস নতুন আলোকে প্রকাশিত হয়েছে আমাদের সামনে। এখানে তিনি শুধু সাহিত্যের ইতিহাসবিদ নন, ধর্মপুষ্ট সমাজমানসেরও অসামান্য রূপকার। প্রথাগত সাহিত্যের বাইরে রচিত বিবিধ রচনার পরিচয় তিনি দিয়েছেন সতেরতম অধ্যায়ে আর পরবর্তী তথা সর্বশেষ অধ্যায়ে চেষ্টা করেছেন সেকালের বাঙালী সমাজের রূপ তুলে ধরতে। এভাবে তিনি যা বলেছেন, তা-ও প্রণিধানযোগ্য–"গত চৌত্রিশ বছর ধরে শিক্ষকতা করি। সাহিত্যের ইতিহাস পড়াচ্ছি প্রায় সাতাইশ বছর ধরে। এক্ষেত্রে আমার সঞ্চিত জ্ঞান, উপলব্ধ তত্ত্ব, লব্ধ প্রজ্ঞা, অর্জিত বোধি এবং তজ্জাত প্রত্যয়গুলো লিপিবদ্ধ করার বাসনাবশে এ গ্রন্থের সূত্রপাত। বাঙালীর রচনায় বাঙালীর চিত্ত-চরিত্রের যে প্রকাশ ঘটেছে, তা-ই মুখ্যত জানবার-বুঝবার প্রয়াস পেয়েছি এ গ্রন্থে। তাই গ্রন্থের নাম রেখেছি *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*।" লেখকের আকাঙ্ক্ষা ছিল অনেক বড়। তিনি বাঙালীকে বুঝতে চেয়েছিলেন। ইংরেজ আগমনের পূর্বেকার প্রায় দুহাজার বছরের বাঙালীর স্বপ্ন-সাধনা, মনন-আবেগ, সংগ্রাম-সন্ধি, পরিবর্তন-বিবর্তন, সমন্বয়-প্রত্যাখ্যান, প্রভৃতির বিচিত্র ইতিহাস জানবার আগ্রহ জেগেছিল তাঁর মনে। তিনি বেছে নিয়েছিলেন সাহিত্যের জগত। সম্ভবত তিনি ভালোই করেছিলেন কারণ মধ্যযুগের বাঙালীর গৌরব তার সাহিত্য এবং জাতির মর্মের খবর পাওয়া যায় তার সাহিত্য সাধনায়। এ পদ্ধতিতে তিনি পরোক্ষভাবে সাহিত্যের ইতিহাস রচনার নতুন দর্শন খাড়া করেছেন–সাহিত্যের মধ্যদিয়ে কালপরিক্রমায় ক্রম প্রস্ফুটিত জাতীয় চৈতন্যের স্বরূপ লোচন করা। সাহিত্যের ইতিহাস রচনার এই লক্ষ্য সবাই মেনে নেবেন কিনা জানিনা, তবে অধ্যাপক আহমদ শরীফ এই মত মান্য করেন।

দুই.

এই বইয়ের বড় দোষ সংগঠনগত। বিহারীলাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে-কথা বলেছিলেন, প্রচুর ভাব থাকলেও ভাবের গিন্নীপনা কবির ছিল না–সে কথা বর্তমান গ্রন্থকার সম্পর্কেও বলা চলে। এই বইয়ে প্রচুর তত্ত্ব, প্রচুরতর তথ্য পাওয়া যায়; কিন্তু সেগুলো সুসংবদ্ধভাবে

পরিকল্পিত উপায়ে হাজির করা হয়নি। ফলে বিভিন্ন অধ্যায় পরস্পর-বিচ্ছিন্ন তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধের আকার ধারণ করেছে, সব মিলে একটি সম্পূর্ণ এককরূপে গড়ে ওঠেনি। সম্ভবত লেখকের একটি অহেতুক ব্যক্তিগত ভীতি এই বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী। তাঁর আশংকা এই সুন্দর মর্তজীবন থেকে তিনি অচিরেই বিদায় নেবেন—চাকুরি থেকে অবসর নেয়াকে তিনি সমতুল্য ভেবেছেন জীবন থেকে অবসর নেওয়ার। এজন্যই তার বইয়ের উৎসর্গপত্রের ভাষা এরূপ : "জীবনের অন্তিম লগ্ন আসন্ন আশঙ্কায় এই বইয়ের বুকে অঙ্কিত রাখলাম এক সারি প্রিয়জনের নাম।' এই অহেতুক ভীতি তাঁকে তাড়া করে নিয়ে গেছে নতুন বই না লিখে ইতিপূর্বে প্রকাশিত তার বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক অংশসমূহ চয়ন করে একত্র করতে। বলাই বাহুল্য সেটা কাম্য ছিল না। পরিকল্পিত পদ্ধতিতে, তাড়াহুড়ো না করে, একটা নির্দিষ্ট কাঠামোকে মনে রেখে রচনা করলে বইয়ের মর্যাদা বৃদ্ধি পেত, উপযোগিতা বেড়ে যেত। সঙ্গতভাবেই আশা করা যায় যে, বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে সেসব ত্রুটি দূরীভূত হবে।

সাংগঠনিক ত্রুটি পুনরায় দেখা গেছে পুস্তকরচনার অভীষ্ট লক্ষ্য ও বাস্তবে অনুসৃত পদ্ধতির মধ্যে। বিবিধ সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে বাঙালীকে বুঝবার ইচ্ছা থাকলেও, লেখকের অনুসৃত রীতি সেটাকে বাস্তবায়িত করেনি। বিভিন্ন অধ্যায়ের ভূমিকায় লেখক তাঁর উপলব্ধ তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন, আর বৃহদাংশ ব্যয়িত হয়েছে লেখকের আবির্ভব কাল, জন্ম স্থান, রচনার সময়নির্দেশ ইত্যাদিতে। সামান্য উনিশ-বিশ থাকলেও মোটামুটি এই পন্থা বইয়ে অনুসৃত হয়েছে তার ফলে বাঙালীর পরিচয় চিহ্নিত হয়নি, সাহিত্য সমালোচনাও যে বিস্তারিত হয়েছে তেমন বলা যাবেনা। শেষ অধ্যায়ে সমাজ-সংস্কৃতির যে-পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তা পুরো বইয়ের সঙ্গে অসংলগ্নভাবে যুক্ত আছে মাত্র।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠক ও লেখকদের কাছে একটা জটিল সমস্যা যুগবিভাগকে নিয়ে। দীনেশ সেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখ পন্ডিত সাংস্কৃতিক, কালিক বা রাজনৈতিক সম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে যুগবিভাগ করার চেষ্টা করেছিলেন। বলা অনাবশ্যক, সেটা সর্বসম্মত হতে পারেনি, বরং পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় সরল বিষয়টি ক্রমশ জটিল হয়ে আসছে। সম্ভবত এতে বিরক্ত হয়ে ড. সুকুমার সেন শতাব্দীর ভিত্তিতে ইতিহাসের বিন্যাস করেছেন। অধ্যাপক আহমদ শরীফও যুগবিভাগে উদযোগী হয়েছেন। প্রথম খণ্ডে তার পরিকল্পিত যুগবিভাগ দেওয়া হয়েছে এভাবে : প্রথম যুগ : ১৩-১৪ শতক—সৃজ্যমান লোকায়ত সাহিত্যের কথকতার যুগ; দ্বিতীয় যুগ : ১৫ শতক—লিখিত লৌকিক দেবসাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্যের যুগ; তৃতীয় যুগ : ১৬ শতক—ভাববিপ্লব যুগ বা রেনেসাঁস যুগ; চতুর্থ যুগ : ১৭ শতক—লোকায়ত পীর দেবতাদের যুগ; পঞ্চম যুগ : ১৮ শতক—অবক্ষয় যুগ।এই বিভাগ মূলত ড. সেন নির্ভর,তবে ড. শরীফ বিভিন্ন শতকের বৈশিষ্ট্যসমূহকে চিহ্নিত করে নামকরণ করেছেন। কিন্তু নামকরণে নির্দিষ্ট মানদন্ড তিনি সর্বত্র প্রয়োগ করেননি। প্রথম দুটো নাম সাহিত্যবিষয়ক, তৃতীয়টি চিন্তাচেতনা কেন্দ্রিক, চতুর্থটি ধর্ম-দর্শনজাত আর সর্বশেষটি রাজনীতি-সংস্কৃতি-অর্থনীতি সবকিছু মিলিয়ে। তার চেয়েও বড় কথা, গ্রন্থকার এই বিভাগ সর্বত্র অনুসরণ করেননি, বিশেষ করে দ্বিতীয় খন্ডে। এখানে তিনি শতাব্দ

অনুসারে আলোচনা করেননি, নিজের বিষয়-বিভাগও মান্য করেননি। গতানুগতিক বিষয় ভিত্তিক আলোচনা রয়েছে তাই বইয়ে। এটাও ঘটেছে অপরিকল্পিতভাবে তাড়াহুড়ো করে লেখার কারণে।

গ্রন্থকারের ভাষা শুদ্ধ ও সরল। তিনি লোহার কলমে লেখেন। তাঁর ভঙ্গি ব্যাখ্যামূলক । কোনো তথ্য যাতে বাদ না-পড়ে সেদিকে তাঁর দৃষ্টি সদাসতর্ক। তাঁর লেখায় অনেক-কথার সাক্ষাত পাওয়া যায়; তবে সেটা সর্বত্র প্রশংসনীয় হবে তেমন কোনো কথা নেই। লেখা ইঙ্গিতধর্মী হওয়া অনেক কারণে দরকারী। পাঠক পড়তে পড়তে কল্পনাকে কাজে লাগাতে চায়। এবিষয়ে ড. আহমদ শরীফ আমাদের হতাশ করেন। তিনি পাঠককে সব জানিয়ে দিতে চান, তাঁদের কল্পনার জন্য কিছু রেখে দিতে চান না। মনে হয় পাঠকের ক্ষমতার প্রতি তাঁর ভরসা কম। তবে যাই হোক, এ-শৈলীতে গড়ে উঠেছে তাঁর নিজস্ব স্টাইল। দোষ-গুণ যতই থাকুক না-কেন, এ-রীতি থেকে তাঁকে চেনা যায়। তাঁর লেখার প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা হিসেবে এ-অংশকে বিবেচনা করা যায় : "চিরকাল বিদেশী-বিজাতি-বিভাষী শাসিত বলেই বাঙালীর মন-বুদ্ধি-আত্মার স্বাধীন ও স্বাভাবিক বিকাশ ঘটেনি। আত্মপ্রত্যয় অর্জন ঐ হীন পরিবেশে অসম্ভব ছিল বলেই সে প্রকাশ্য সদর রাস্তায় পা বাড়ায়নি জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে, খিড়কী দোর দিয়ে গুপ্তপথেই সন্ধান করেছে মন্ত্রশক্তি, প্রয়োগ করেছে তুক-তাক, দারু-টোনা, বান-উচাটান। তোয়াজ-স্তুতি হয়েছে অবলম্বন , ধূর্ততা-প্রতারণা হয়েছে স্বীকৃত কৌশল।" (পৃ. ৫)

তিন.

এবারে ওই যুগের সাহিত্যের ইতিহাস রচনার কাঠামো সম্পর্কে আমাদের ধারণাগুলো ব্যক্ত করা যেতে পারে। এটা স্বীকার্য যে, সাহিত্য, শিল্পকলা বা ধর্ম ইত্যাদির ইতিহাস আলোচনার সময় পটভূমিতে বিরাজিত সামাজকাঠামোকে সর্বদা স্মরণে রাখা আবশ্যক। সমাজকাঠামো রূপ-রস যোগান দেয় সাহিত্যশিল্পে। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সপ্তম-অষ্টম শতাব্দে বাঙলাদেশের সমাজে একটা বিপ্লবী রূপান্তর সাধিত হচ্ছিল—গড়ে উঠছিল সমাজের নতুন কাঠামো। ওই কাঠামোই সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা। বস্তুতপক্ষে ওই সময় থেকে ইংরেজ আগমন পর্যন্ত সামন্ত সমাজ ব্যবস্থাই পরাক্রমের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করেছে বাঙালী জীবনকে।

নতুন কাঠামো সৃষ্ট হওয়ায় সমাজের ওপরকঠামোও নব সাজে সজ্জিত হয়েছে। তার প্রমাণ রয়েছে বাঙলা ভাষার সৃষ্টিতে, সাহিত্যের গড়ে ওঠায় ও ধর্মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায়। সামন্তবাদী চেতনার সব বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে সেকালের সাহিত্যরচনায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য বলে যে-দুটি বিভাগ করা হয়, মূলত তার কোনো ভিত্তি নেই। তথাকথিত প্রাচীন যুগের (৭৫০-১২০০) বা মধ্যযুগের (১২০১-১৭৫৭) সাহিত্যের বিষয় একই প্রেরণাসঞ্জাত। দুয়ের ভাবাকাশ একই রঙে রঞ্জিত, একই অনুভব বিশিষ্ট। সেজন্য, প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের সবটাই একই পরিচয়ে চিহ্নিত—সেটা হল সামন্তযুগের বাঙলা সাহিত্য।

সামন্ত সমাজে থাকে একদিকে সামন্তশাসক অপরদিকে গণমানব। দুয়ের জীবনপদ্ধতি. ভাবনাচিন্তা দুই আলাদা জগতের। শাসকেরা একান্তভাবে ইহলোকবাদী।

যুদ্ধবিগ্রহ, ভোগবিলাস, কামকেন্দ্রিক প্রেমচিন্তা তাদের জীবনের উপকরণ। তাদের অনুগ্রহপুষ্ট কবিরা সেজন্য রচনা করে প্রেম-এড্‌ভেঞ্চারের বর্ণাঢ্য জগত। বাঙলা সাহিত্যে এধরনের রচনার নাম রোমান্সমূলক প্রণয়োপাখ্যান। এসবের রচয়িতারা মুসলমান, যেহেতু সামন্তরা ছিলেন ইসলাম ধর্মাবলম্বী।

অপরদিকে শাসিতের ভাবাকাশ আচ্ছন্ন থাকে জীবনপালানো আকাশচারিতায়—তথা ধর্মচিন্তায়। সেজন্যে সামন্তযুগের বাঙলা সাহিত্যের প্রধান অংশ ধর্মবিষয়ক। ধর্মসাহিত্যকে ভাগ করা যায় চার ভাগে। বৌদ্ধ-সাহিত্য (চর্যাপদ প্রভৃতি), হিন্দু সাহিত্য (রাম-কৃষ্ণ-পান্ডব-চণ্ডী-মনসা-ধর্মঠাকুর বিষয়ক), ইসলামী সাহিত্য (শরিয়ত কথা, চরিত কথা, সূফী সাহিত্য, জঙ্গনামা প্রভৃতি) এবং বিভিন্ন ধর্মের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ে রচিত সমন্বয় সাহিত্য। (প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-সাহিত্য, পীর-নারায়ণ পাঁচালী প্রভৃতি)।

হিন্দু ধর্ম-সাহিত্য রচনার পটভূমিও বেশ মজার। এদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের তাৎপর্যপূর্ণ দিক এখানে লুকিয়ে আছে। তের শতকে ইসলাম ধর্মাবলম্বী বহিরাগত তুর্কীরা বঙ্গদেশ দখল করলে এদেশের সমাজধর্মে উল্লেখযোগ্য ওলটপালট সাধিত হয়। চিরকালের শত্রু আর্য-অনার্যরা সাংস্কৃতিক ধর্মীয় ঐক্যফ্রন্টের মাধ্যমে ইসলামের সর্বগ্রাসী শক্তির মোকাবেলা করে। এই ঐক্যফ্রন্টের পরিণতি হিন্দু ধর্মে বা হিন্দু সমাজে আর্যচিন্তার তিন দেবতা (রাম-পাণ্ডব-কৃষ্ণ) ও অনার্যচিন্তার তিন দেবতা (চন্ডী-মনসা-ধর্মঠাকুর) মিলে হিন্দুধর্মের নবজাগরণ আনে।

এই ছয় দেবতার পরস্পর কাছে আসার ও ধর্মে আধিপত্য বিস্তারের ইতিহাসই সামন্তবাংলায় হিন্দুধর্মের ইতিহাস, এবং তাদের গৌরব গাথাই সেযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান অংশ।

তথাকথিত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এই কাঠামোতে রচনা করা যেতে পারে বলে আমরা বিবেচনা করি।

অধ্যাপক আহমদ শরীফের মধ্যযুগের সাহিত্য সম্পাদনা

আবদুল গফুর

অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী প্রখ্যাত গবেষক প্রফেসর ড. আহমদ শরীফের জীবনবীক্ষা এবং তাঁর বর্ণাঢ্য সাহিত্যিক জীবন আমাদের বিমুগ্ধ করে। তাঁর সাহিত্যকৃতি তাঁকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল উচ্চ আসনে সমাসীন রাখবে।

সমাজ, সংস্কৃতি ও প্রগতিশীল রাজনীতিকে তিনি জীবনাচরণ হিসেবে লালন করতেন। সমাজের কুৎসিত, পঙ্কিল, অসুন্দর এবং পূতিগন্ধময় আবর্জনার বিরুদ্ধে অন্যায়, নিপীড়ন, নির্যাতন এবং হিন্দু-মুসলিম বিরোধের বিরুদ্ধে দৃঢ়চিত্তের অধিকারী এ সব্যসাচী লেখক, গবেষক ও পণ্ডিত সর্বক্ষণ সোচ্চার ছিলেন। দেশপ্রেম তাঁর চরিত্রের অলঙ্কার ছিল। তিনি দেশ, দেশের মানুষ, প্রকৃতি এবং সাহিত্যকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসতেন।

সংগ্রামমুখর, সৃষ্টিশীল গবেষক ড. আহমদ শরীফ বিভিন্ন অভিধায় ৪১ খানা সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রবন্ধ ও ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেন। এসব মৌলিক গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি লাইন সুখপাঠ্য, সংবেদনশীল আবেদনে পরিপূর্ণ এবং শিক্ষণীয় আবহ নির্মাণে অসাধারণ। মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় ড. শরীফ বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। বাংলাদেশ এবং ভারত তাঁর এ গবেষণার জন্য তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

ড. আহমদ শরীফ আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসারী বিদগ্ধ গবেষক ছিলেন। মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি বা কলমী পুথি উদ্ধারে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের জুড়ি মেলা ভার। তিনি এককভাবে ৫৮৫ খানা মুসলিম রচিত পুথি এবং ৩৮১ খানা হিন্দু রচিত পুথি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে, বিশেষ করে নোয়াখালী, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে উদ্ধার করেছেন। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে তাঁর উদ্ধারকৃত মধ্যযুগের হারানো দিনের কবি এবং তাঁদের রচনা সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে এ পুথিগুলো বিরাট ভূমিকা রাখছে এবং রাখবে। সমসাময়িককালে কলমী পুথি উদ্ধারে অধ্যাপক আলী আহমদ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। তিনি মুসলিম, হিন্দু এবং সংস্কৃত পুথি এবং বহু মুদ্রিত পুথি কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম এবং বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে প্রথমে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড এবং পরে বাংলা একাডেমীতে যত্ন সহকারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এসব পুথিপত্রের

প্রতিটি পৃষ্ঠা স্বর্ণের চেয়েও মূল্যবান বলে বিবেচনা করে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, ড. আহমদ শরীফ, অধ্যাপক আলী আহমদ, অধ্যাপক সুলতান আহমদ, আবদুস সাত্তার প্রমুখ বিজ্ঞজন প্রাচীন কবির রচনা উদ্ধারে এবং পুথি সংগ্রহ ও সম্পাদনার কাজে এগিয়ে আসেন। এঁদের মধ্যে বাংলাদেশে ডক্টর আহমদ শরীফ সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি পুথি সম্পাদনা করেন এবং তাঁর সম্পাদনার গুণ ও মান সবচেয়ে উচ্চ।

মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় ড. শরীফ নিষ্ঠা সহকারে বহু পুথির যৌগিক পাঠ নির্মাণ করেন। একই কবির একাধিক লিপিকারের অনুলিখিত পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ পাঠ ও নিরীক্ষা করে তিনি যথাযথভাবে পাঠ শনাক্ত করে কবির লিখিত বিশুদ্ধ পাঠ বা প্রায় বিশুদ্ধ পাঠ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন এবং এভাবে পুথির যৌক্তিক পাঠ নির্মাণে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। পুথির পাঠ নির্মাণে তিনি প্রথমে পাণ্ডুলিপিসমূহের পূর্ণ পরিচয়, কবির আত্মপরিচয় (যদি থাকে), সমসাময়িক কালের ইতিহাস আলোচনা করে কবির কাল এবং পুথি লেখার সন-তারিখ অনুসন্ধান করেন। পুথির কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করে সম্পাদক ড. আহমদ শরীফ উক্ত কাব্যের বৈশিষ্ট্য এবং উক্ত কাব্যে বিধৃত সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, কবির কৃতিত্ব ও বৈদগ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। প্রায় প্রত্যেকটি পুথি সম্পাদনাকালে ড. শরীফ উক্ত পুথিতে কোথায় কোথায় রূপক, উপমা ও উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার রয়েছে তাও অনুসন্ধান করে ভূমিকা অংশে উল্লেখ করেছেন। কাব্যে ব্যবহৃত শব্দাবলির তালিকা বিনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে ড. শরীফ নিষ্ঠাবান গবেষকের ন্যায় আরবি, ফারসি, বিদেশি শব্দ, ক্রিয়া পদ, কারক, বিভক্তি, সর্বনাম পদ নির্ণয় করেন এবং ভাষার সার্বিক বিশ্লেষণ করেন।

ড. আহমদ শরীফের মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার প্রথম ফসল দৌলত উজির বাহরাম খাঁ বিরচিত *লাইলী মজনু* কাব্য। এটা সম্পাদনায় তাঁর মৌলিক গবেষণার বাঙ্ময় প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি। *লাইলী মজনু* বাংলা একাডেমী থেকে ১৯৫৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বইটি তিনি তাঁর পিতৃব্য আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদকে উৎসর্গ করেন। এটি বাংলা একাডেমীর প্রথম প্রকাশও বটে। উৎসর্গপত্রে তিনি পিতৃব্যের প্রতি নিম্নোক্ত নিবেদন রেখেছিলেন :

উৎসর্গ

মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ স্মরণে :

আপনার স্নেহে-যত্নেই আমার এ দেহ-মন পুষ্ট। আপনার সাধনা-সুন্দর জীবন থেকে প্রেরণা পাওয়ার ফলেই আপনার সংগৃহীত উপাদানে আমার জীবনের প্রথম কৃতি প্রকাশিত হলো। জহুরী আপনি, কালের কবল থেকে এ রত্ন আপনিই উদ্ধার করেছিলেন। 'গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা' বলে হিন্দুদের মধ্যে একটি কথা আছে। আমার এ কৃতি নিয়ে আপনাকে স্মরণ করাও অবিকল তা-ই।

আমার প্রথম কর্ম-ফলটি আপনার হাতে দেয়া গেল না—এ দুঃখ আমার আমরণ থাকবে। তবু আপনার পুণ্যনাম বুকে ধরে বইটি ধন্য হল—এ-ই আমার সান্তনা।

শরীফ

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ৪ খানা পুথি, বাংলা একাডেমীতে সংগৃহীত ৪ খানা পুথি এবং আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ কর্তৃক ১৮৯৫ সালে *লাইলী-মজনু* কাব্যের অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি বিশ্লেষণ করে সর্বমোট ৯টি পুথির সাহায্যে *লাইলী-মজনু* কাব্য সম্পাদনা করে ড. শরীফ দৌলত উজির বাহ্‌রাম খাঁকে বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী অমরাবতীতে স্থান করে দেন। পুথিটি সম্পাদনায় পাণ্ডুলিপি পরিচিতি অংশে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, ড. আনিসুজ্জামান, আবদুল করিম, অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় প্রমুখের আলোচনা ও তথ্যগুলো যাচাই করে এবং ৫১টি ইতিহাসগ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি থেকে ঐতিহাসিক যুক্তি-প্রমাণ বিশদভাবে উপস্থাপন করে ড. শরীফ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, দৌলত উজির বাহ্‌রাম খাঁ ১৫৪৩-১৫৫৩ সনের মধ্যে *লাইলী-মজনু* কাব্য রচনা করেন। পরিণত বয়সে তিনি কারবালা কাহিনী নিয়ে *জঙ্গনামা* বা *মক্তুল হোসেন* কাব্য রচনা করেন। কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *লাইলী-মজনু*। ভূমিকাংশে ড. শরীফ বলেন : *ইউসুফ-জোলেখা, লাইলী-মজনু, শিরি-ফরহাদ*—এ তিনটি প্রণয় কাহিনী বিশ্ব-মুসলিমের ঘরোয়া সম্পদ। এ তাঁদের কিতাব পড়ে পাওয়া বিদ্যা নয়, পুরুষানুক্রমে ধরে রাখা রিখত-ঐতিহ্যের সম্পদ। রূপকথার মতো এসব কিস্‌সা-কাহিনী শ্রেণী ও বয়স অবিশেষে সব নারী-পুরুষের মুখে মুখে আজও উচ্চারিত। লাইলী-মজনু ও শিরি-ফরহাদ-খসরুর প্রণয় কথা ইরানে উদ্ভূত এবং সুফী-কবিদের লালনে পুষ্ট। প্রেমোন্মত্ত অর্থে বাঙলায় 'মজনু' শব্দের বহুল ব্যবহারও এই লায়লী-মজনু কিস্‌সা শোনার ফল।'

লায়লী-মজনু কাব্যের কাহিনী নিছক মানবীয় প্রণয় কথা। এক ধনাঢ্য পিতা আমীরের একমাত্র পুত্র কএসকে পাঠশালায় অধ্যয়ন করতে পাঠানো হল। এ বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষার (ছেলে-মেয়ে একই সঙ্গে পড়ার) ব্যবস্থা ছিল। এক মালিক-কন্যা লায়লী সে বিদ্যালয়ের একই শ্রেণীর ছাত্রী ছিল। রূপে-গুণে সে জগৎ-দুর্লভ ছিল। তার রূপে 'মানবীর জ্ঞান হরে তপসীর ধ্যান'। তার-পূর্ণশশী জিনি মুখ জগৎ মোহিনী' :

সে সব সুন্দরী মধ্যে এক অকুমারী।
মর্ত্যেত নামিছেয়েন স্বর্গ বিদ্যাধরী ॥
লায়লী তাহান নাম মালিক নন্দিনী।
পূর্ণ শশী জিনি মুখ জগত মোহিনী ॥
জিনিয়া বান্ধুলি ফুল অধর রঙ্গিলা।
রতিপতি ধনু জিনি ভুরুর ভঙ্গিমা॥
নয়ান কট্যক্ষ বাণে হানিল তপসী
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি পর রূপসী॥
চাচর চামর জিনি মনোহর কেশ।
জাতিএ পদ্মিনী বালা সুচারু সুবেশ॥

—পাঠশালায় লায়লী, পৃষ্ঠা-৯৩

এ দুই কিশোর-কিশোরীর মনে প্রথম দর্শনে পারস্পরিক প্রেমের সঞ্চার হয়। পাঠশালার পথে তাদের মিলন হয়। কএস-এর ভাষায় :

বিধি পরসনে হৈল তোহ্মা দরশন।
মুঞি অতি শুভকর্মা সাফল্য জীবন ॥
জনমে জনমে দেব-ধর্ম আরাধিলুঁ।
সে সব পুণ্যের ফলে তোহ্মাকে পাইলু ॥
যথ ইতি দুঃখ তাপ হরিল সকল।
জনম জানিলুঁ সার্থক জীবন সফল ॥
তোহ্মার পিরীতি হৈল মোর প্রাণ-বৈরী।
দেখিলে আকুল চিত্ত না দেখিলে মরি ॥
... .
তুহ্মি বিনে অকারণ জীবন যৌবন।
তুহ্মি বিনে অকারণ এ তিন ভুবন ॥

—লায়লী ও মজনুর প্রেম বিনিময়, পৃষ্ঠায়-৯৭

কএস-এর প্রতি প্রেম নিবেদনে লায়লীও আন্তরিক :

ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়এ অকুমারী
বিনয় মধুর ভাষে করেন্ত গোহারী ॥
প্রসন্ন হইল মোর দেব পরমার্থে।
জগতেত জীবন হইল মোর স্বার্থে ॥
পুণ্যফলে ভাগ্য বলে বিধি পরসন।
শুভক্ষণে তোহ্মা সনে হইল দরশন ॥
জীবন যৌবন মোর তনু মন হিয়া।
প্রেমভাবে হারাইলুঁ তোহ্মাকে দেখিয়া ॥

—লায়লী ও মজনুর প্রেম বিনিময়, পৃষ্ঠা-৯৮

বিদ্যালয় থেকে দু'জন দু'জনের বিচ্ছেদে বিষাদ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করে দু'জন দু'জনকে স্মরণ করে আঁখি জলে ভাসে :

তিতিল দোহান তনু নয়ানের জলে।
তিতিল দোহান অঙ্গ বিরহ অনলে ॥
দংশিল প্রেমের নাগে দোহান হৃদয়।
রজনী জাগিয়া দোহে বিলাপ করএ ॥

—লায়লী ও মজনুর প্রেম বিনিময়, পৃষ্ঠা-৯৯

বিদ্যালয়ের বালকগণ লায়লী-মজনুর প্রেমের কথা লায়লীর মাকে জানালে লায়লীর মা লায়লীকে ভর্ৎসনা করে :

কুলের নন্দিনী হৈয়া নাহি কুললাজ।
কলঙ্ক রাখিলি তুই আরব সমাজ ॥

....
না করে তাহার সঙ্গে ভ্রমর সংযোগ ॥
আজি হন্তে তেজহ চৌআড়ি পাঠশাল।

লায়লী তার প্রেমের কথা মায়ের কাছে গোপন করলেও তার মা তার পাঠশালা যাওয়া বন্ধ করলো। সে তার কলম লুকিয়ে রাখলো, কালির দোয়াত ভেঙে ফেললো এবং চারপাশে সখিদের কড়া প্রহরা রাখলো; লায়লী যেন বাইরে না যেতে পারে সেজন্য তার মা তার পায়ে নুপুর লাগিয়ে রাখলো :

ঘরের বাহির হৈলে জানিতে কারণ
প্রখর নুপুর দিলা কন্যার চরণ ॥
—লায়লীর ছলনা, পৃষ্ঠা-১০৪

প্রেম বঞ্চিতা লায়লীর—

রাবণের চিতা সম জীবন দহএ।
শ্রাবণের ধারা জিনি নয়ান বহএ ॥
বিলাপ করএ কন্যা ভাবিয়া বিরস।
হাসিতে হারাইঁলু মুঞি অমূল্য পরশ ॥
—লায়লী বিরহ-বিলাপ, পৃষ্ঠা-১০৫

প্রেমবাণে জর্জরিত মজনুও ভিখারী সেজে একাধিকবার লায়লীদের বাড়িতে গেল। কিন্তু লায়লীর বাবা টের পেয়ে কএসকে মাররার জন্য গুণ্ডা নিয়োগ করলেন। গুণ্ডারা কএসকে মার দিলে ক্ষোভে-দুঃখে ও বিরহ যন্ত্রণায় পাগল-প্রায় হয়ে গেল কএস। লায়লীরও বিরহ যন্ত্রণা বেড়ে গেল। একমাত্র পুত্রের বিরহ দশা দেখে ব্যাকুল হলেন মজনুর বাবা আমীর। তিনি গেলেন লায়লী-মজনুর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে মালিকের কাছে। কিন্তু লায়লীর বাবা মালিক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। এরপর ইব্ন সালাম নামের এক বিত্তবান লোক লায়লীর সাথে তার পুত্রের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলে লায়লীর বাবা সে প্রস্তাবে রাজি হলে লায়লী সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললো :

কদাচিত যদি মোর সংহারে পরাণ।
এক প্রাণনাথ বিনে না করিমু আন ॥
এক নারী দুই পতি নাহিক সুপতি।
একদেশে দুই নৃপ কোথাত বসতি ॥
মজনু মোহর পতি প্রাণের দুর্লভ।
তান প্রেমে রোগ মোর পরম উচ্ছব ॥
কবেহ আনের সঙ্গে নাহি মোর ভাল।
আনলে ভুলাএ মেলা সহজে জঞ্জাল ॥
বিলাপ করিয়া কন্যা কান্দএ বিশেষ।
আউল করএ কেশ বাউলের বেশ ॥

এথ দেখি সহচরীগণ বিষাদিত।
কন্যার জননী তার জানাএ তুরিত ॥
—ইব্ন সালাম-পুত্রের সঙ্গে লায়লীর বিবাহ, পৃ-১৩৮

ষোড়শ শতাব্দীর মানব চরিত্রের দৃঢ় ভিত্তি লায়লীর চরিত্রে বিদ্যমান। সখি হেতুবতী লায়লীকে অনেক বোঝালো, তার মা অনেক বিলাপ করলো কিন্তু লায়লীর মন তাতে গললো না। এরপর জোর করে লায়লীকে ইব্ন সালামের পুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেয়া হলো। কিন্তু বাসর ঘরে দৃঢ়চেতা লায়লী বরকে বরণ করেনি।

ক্রুদ্ধ হৈল যুবতী আনল সমসর।
চরণ প্রহার দিয়া করিল অন্তর ॥
মন্দ-ছন্দ বিশেষ লাঘব নাহি সীমা।
তিল এক না রাখিল তাহার মহিমা ॥
বুলিতে লাগিল বালা বচন কুৎসিত।
শরীর না সহে হেন বোলে বিপরীত ॥
কুবুদ্ধি জন্মিল তোহ্মার হেন কর আশ।
বামন হইয়া চাহ ছুঁইতে আকাশ ॥
কাকের মুখেত যেন সিন্দুরিয়া আম।
কাঞ্চন সহিতে যেন কাচ এক ঠাম ॥
কুকুরের গলে যেন অপসর ভূষণ।
শিষের উপরে যেন নাসার রতন ॥
তোর ফান্দে বন্দী না হৈব মোর মন।
এ রাজ্যের অধিপতি আছে আন জন ॥
—বাসরঘরে লায়লী, পৃষ্ঠা-১৬২

বাসরঘরে লায়লীর এহেন আচরণ লক্ষ্য করে :

লজ্জা পাই যুবক হইলা ক্রুদ্ধ মন।
কুমারীকে পরিত্যাগ করিলা তখন ॥
—পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৩

নজদ বনে অবস্থানরত মজনু লায়লীর বিয়ের খবর এক বৃদ্ধার মুখে শুনে পাখি মারফত লায়লীর কাছে চিঠি লিখল। লায়লী পত্রের উত্তরে লিখলো :

শুন প্রভু শিরোমণি জীবের জীবন।
সহস্র প্রণাম করি তোহ্মার চরণ ॥
পত্রেত লিখিছ যথ বচন সংবাদ।
এক বাণী সত্য নহে সব পরিবাদ ॥
যেই সত্য প্রথমে করিছি তোহ্মা সঙ্গ।
যাবত জীবন মুঞি না করিব ভঙ্গ।

....
বিহঙ্গমা বন্দী নহে মর্কটের জালে।
সিংহের আহার কভু না পাএ শৃগালে ॥
ভেদ নাহি হএ মোর মুকুতা সুন্দর।
মক্ষী নাহি পড়ে মোর মধুর উপর ॥
মোহর যৌবন ফল না হৈছে উচ্ছিষ্ট।
গোপত রতন পরে না পড়িছে দৃষ্ট ॥
জগত ভরিয়া যদি বহএ পবন।
না নিভে সত্যের দীপ জ্বলে অনুক্ষণ ॥
-পত্রোত্তর, পৃষ্ঠা-১৬৭

এ পত্র পেয়ে আশার আলোয় জ্বলে উঠলো মজনুর মন। হতভাগ্য মজনুকে নজদ বনে গিয়ে তার বন্ধুরা ফিরিয়ে আনতে চাইল, কিন্তু সে তাদের অনুরোধ উপেক্ষা করলো। নয়ফলরাজ হরিণ শিকারে এসে নজদ বনে মজনুকে দেখতে পেয়ে তাকে তাঁর দেশে নিয়ে গেলেন। লায়লীর বাবা মালিকের কাছে লায়লী-মজনুর বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন তিনি। কিন্তু লায়লীর পিতা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে যুদ্ধ বাধলো। পরে লায়লীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে নয়ফলরাজ লায়লীকে নিজেই বিয়ে করতে চাইলেন। মজনুর জন্য বিষ এবং নয়ফলের জন্য মধুর কৌটা আনা হলো। ভুলে বিষ পান করে নয়ফল মারা গেলেন। লায়লী-মজনুর জীবন বিলাপ-সর্বস্ব হয়ে উঠলো। একদিন এ পৃথিবী বৃক্ষ থেকে লায়লীর জীবনপুষ্প ঝরে পড়ল। ব্যর্থ প্রেমে মজনু লায়লীর কবরের কাছে গিয়ে শোকে মুহ্যমান হয়ে বিলাপ করতে লাগলো। সেও-

লায়লীর নাম ধরি হাহাকার শব্দ করি
ততক্ষণে তেজিলা জীবন ॥
ভাবিয়া লায়লী নেহা মজনু তেজিল দেহা
উঝল হইল সেই ঠাম।
....

লায়লী মজনু পোথা সমাপ্ত গ্রন্থ কথা
রচিলেন্ত দৌলত উজির ॥
-মজনুর শোক, পৃষ্ঠা-২২৩

মধ্যযুগের দুষ্পাঠ্য পাণ্ডুলিপি থেকে লায়লী-মজনুর এ প্রণয় কাহিনী সযত্নে উদ্ধার করে ড. আহমদ শরীফ বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনের বিস্ময়কর প্রাণবন্ত ভূমিকা রেখেছেন। *লায়লী-মজনু* কাব্যটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে পাঠ্য হিসেবে স্থান পেয়েছে।

পুথি-পরিচিতি : আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সঙ্কলিত *পুথি পরিচিতি* সাহিত্য বিশারদ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বাংলা পুথির পরিচায়িকা। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন ড.

আহমদ শরীফ। ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই এটা প্রকাশ করেন। তিনি গ্রন্থটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ একটি নিবেদন রেখেছিলেন যা হুবহু তুলে ধরা হলো :

মুখবন্ধ

জনাব আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ দশ বৎসর পূর্বে প্রকাশের আশায় তাঁর *পুথি-পরিচিতি* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগকে দিয়ে যান। আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন এর পূর্বে *পুথি-পরিচিতি* কেন, এ বিভাগের কোনো গবেষণাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। জনাব জহিরুদ্দীন কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালে আমার অনুরোধক্রমে অগ্রণী হয়ে এ বিভাগের জন্য উল্লেখযোগ্য অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি এতে তাঁর অকুণ্ঠ অনুরাগ প্রকাশ পায়। তার ফলে সাহিত্য বিশারদের জীবনব্যাপী সাধনালব্ধ এ অমূল্য সম্পদ *পুথি-পরিচিতি* সাধারণ্যে প্রকাশ করা সম্ভব হলো।

উপাদানের অভাবে এ যাবৎ মধ্যযুগের বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজের যথার্থ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হয়নি। *পুথি-পরিচিতি* বহুল পরিমাণে আমাদের সে অভাব দূর করবে। সাহিত্য বিশারদ-রচিত এ আলোক-বর্তিকার সাহায্যে অনুসন্ধিৎসু পাঠক আমাদের অতীত ঐতিহ্যের দ্বারোদ্ঘাটন করতে পারবেন। এতকাল যা ছিল সাহিত্য বিশারদের একান্ত আপনার, আজ তা বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিদরদী দেশবাসী সকলের হাতে এমনি করে তুলে দিতে পারায় আমি একাধারে গৌরব ও আনন্দবোধ করছি।

মুহম্মদ আবদুল হাই
অধ্যক্ষ
বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১লা সেপ্টেম্বর
১৯৫৮

আবদুল সাহিত্য বিশারদ রচিত এবং ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত ৫০+৭০৪ = ৭৫৪ পৃষ্ঠার রয়্যাল সাইজের *পুথি-পরিচিতি* গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের অনন্যসাধারণ একটি আকর গ্রন্থ। এর পরিশিষ্ট 'ক' অংশে চতুর্দশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত মোট ৩৯৩ জন মুসলমান কবির ৫৩৯টি পুথির বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। এ গ্রন্থের পরিশিষ্ট 'খ' অংশে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ রচিত 'প্রবন্ধপঞ্জি' স্থান পেয়েছে। সাহিত্য বিশারদের প্রাচীন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ৪০৯টি প্রবন্ধের পূর্ণাঙ্গ তালিকা এ গ্রন্থের অঙ্গসজ্জা বৃদ্ধি ছাড়াও বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে এ প্রবন্ধগুলোর মূল্য যে অপরিসীম তা প্রকাশ করে। পরিশিষ্ট 'খ' অংশের শেষের দিকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত সাহিত্য বিশারদ কর্তৃক সম্পাদিত ৯টি পুথির নাম উল্লেখ রয়েছে:

১. রাধিকার মানভঙ্গ - নরোত্তম ঠাকুর, ১৯০১ খৃঃ।
২. সত্যনারায়ণের পুথি - কবিবল্লভ, ১৩২২ সন।
৩. মৃগলুব্ধ - দ্বিজ রতিদেব, ১৩২২ সন।
৪. মৃগলুব্ধ-সংবাদ - রামরাজা, ১৩২২ সন।

৫. গঙ্গামঙ্গল	-	দ্বিজ মাধব, ১৩২৩ সন।
৬. জ্ঞানসাগর	-	আলী রজা ওরফে কানু ফকির।
৭. শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস	-	বাসুদেব ঘোষ, ১৩২৪ সন।
৮. সারদামঙ্গল	-	মুকারাম সেন, ১৩২৪ সন।
৯. গোরক্ষ বিজয়	-	শেখ ফয়জুল্লাহ, ১৩২৪ সন।

ড. মুহম্মদ এনামুল হক এবং আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ যৌথভাবে *আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য* গ্রন্থটি ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন। এছাড়াও তাঁর *বাঙ্গালা পুথির বিবরণ* দু'খণ্ড সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক যে প্রকাশিত হয়েছিল সে সংবাদও আমরা এ অংশে পাই।

ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত *পুথি-পরিচিতি* 'গ' অংশে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা পুথির বিবরণ ও তালিকা গ্রন্থপঞ্জি উল্লেখিত হয়েছে।

*পুথি-পরিচিতি*র এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে কবিদের আত্মবিবরণী, সন-তারিখ, বংশ-লতিকা ইত্যাদি। প্রসঙ্গত, ক্রমি ৯৮ : পুথি ৪২৭, পুথি পরিচিতি পৃ. ১০৪-এ 'গুলে বকাউলি' পুথির রচয়িতা মোহাম্মদ নওয়াজিস খান সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। এ পুথি থেকে তাঁর বংশ-লতিকাসহ চট্টগ্রামের অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

পুথি-পরিচিতি গ্রন্থের পুথিগুলির এই পরিচিতি প্রকাশিত না হলে অদ্যাবধি সম্পাদিত ও প্রকাশিত মধ্যযুগের বহু কাব্য এবং কবি আমাদের সাহিত্যে স্থান করে নিতে পারতো না। ভূমিকা অংশে এ গ্রন্থের সম্পাদক ড. আহমদ শরীফ বলেন : 'এ পরিচায়িকা যে মধ্যযুগের মুসলিম-রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রবেশ-দ্বারের কুঞ্চিকা আর প্রবেশপথের প্রদীপ, তা বলাই বাহুল্য।'

এই *পুথি-পরিচিতি*র পাণ্ডুলিপি সম্বল করে শ্রদ্ধেয় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও শ্রদ্ধেয় ড. মুহম্মদ এনামুল হক যথাক্রমে *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কথা* (অপ্রকাশিত) ও *মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য* নামক ইতিহাস রচনা করেছেন। *পুথি-পরিচিতি* ভূমিকা, পৃ. ঈ

ড. আহমদ শরীফ এ পুথির বিবরণ আরম্ভ ও পুষ্পিকা (শেষ পঙ্‌ক্তি) অনেক অংশে উদ্ধার করে এর পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। তিনি বলেন : 'আমাকে নতুন করে প্রত্যেকটি পুথি মিলিয়ে মিলিয়ে বিবরণ তৈরি করতে হয়েছে।'

Charles Rien & Hermann Ithe-এর অনুসরণে *পুথি পরিচিতি*কে বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ধারার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তের রূপ দিতে চেষ্টা করেছি। কেবল কালানুক্রম রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন কবি ও কাব্য সম্বন্ধে নানা সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদি সমাবেশ করে *পুথি পরিচিতি*কে গবেষকদের কাছে উপাদেয় করে তুলতে যথাসাধ্য প্রয়াস পেয়েছি। ভূমিকা, পৃষ্ঠা-৬

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের পাঠক, ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক সবার জন্য পুথি-পরিচিতি গ্রন্থটি রচনা এবং সম্পাদনা করে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ড. আহমদ শরীফ বাঙালি সমাজে ও বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব দাবি করতে পারেন—এ আমার বিশ্বাস।

পুথির সংক্ষিপ্ত কাহিনী, কত পত্রাঙ্কের পুথি, পুথিতে কতগুলো পাতা বিদ্যমান, পত্রাঙ্কবিহীন কোনো পত্র পুথিতে রয়েছে কি না, পুথির কাগজের সাইজ, কত বছরের পুরানো পাণ্ডুলিপি, পুথির লেখক, পুথির লিপিকর, পুথির পুষ্পিকা, পুথির রচনা, সন-তারিখ নির্ণয় ইত্যাদি বিষয় পুথির বিবরণে বিশদভাবে লেখা হয়েছে। পুথির সন-তারিখ নির্ণয়ে সেকালের কবিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হেয়ালি ব্যবহার করতেন। যথা-পুথির ক্রমিক-১০৭, পুথি-৪২৪, *গোরক্ষ বিজয়* : পুথিতে *সত্যপীর পাঁচালী* রচনার কাল নিম্নোক্তভাবে নির্দেশ করা হয়েছে :

গোর্খবিজয় আদ্যে মুনি সিদ্ধা কত।
কহিলাম সবকথা শুনিলাম যত ॥
খোঁটা-দূরের পীর ইসমাইল গাজী।
গাজীর বিজয়ে সেই মোক হইল রাজী ॥
এবে কহি সত্যপীর অপূর্ব কথন।
ধন বাড়ে শুনিলে পাতক খণ্ডন।
মুনি রস বেদ শশী শকে রহে সন।
শেখ জয়জুল্লা ভণে ভাবি দেখ মন ॥

এ থেকে *সত্যপীর পাঁচালী* রচনার তারিখ ১৪৬৭ বা ১৪৯৭ (রস = ৬, ৯) শক অর্থাৎ ১৫৪৫ বা ১৫৭৫ সাল পাওয়া যায়।

মুন্সী আবদুল করিম এবং ড. আহমদ শরীফ বাংলা পুথির তালিকা সযত্নে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের তদানীন্তন বিভাগীয় প্রধান ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন তার ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করেন। সমগ্র ক্যাটালগে গ্রথিত ৫৮৪টি পাণ্ডুলিপি মুন্সী আবদুল করিমের একক সংগ্রহ। এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান তাদের ৩ নম্বর প্রকাশনা হিসেবে ১৯৬০ সালে বইটি প্রকাশ করে। সুললিত ইংরেজি বক্তব্যের সাথে মুন্সী আবদুল করিম এবং ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত বাংলা অংশ এ সম্পাদনায় রক্ষিত হয়েছে। ৫৮৪টি পাণ্ডুলিপির বিস্তারিত বর্ণনা এ গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি ছাত্র-শিক্ষক-গবেষক এবং ভাষাতত্ত্ববিদদের নিকট সমাদৃত হয়েছে এবং বিশ্বদরবারে বাংলা সাহিত্যকে পরিচিত করবার জন্য এ সম্পাদিত গ্রন্থটি বিরাট ভূমিকা রেখেছে। ২৮ পৃষ্ঠা ভূমিকাংশ + ৫৮৯ পৃষ্ঠা ক্যাটালগ এবং ২৯ পৃষ্ঠা গ্রন্থকার ও গ্রন্থপঞ্জি সর্ব মোট ৬৪৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত গ্রন্থটি মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি বিষয়ক মূল্যবান আকর গ্রন্থ।

ড. আহমদ শরীফ মধ্যযুগের ৪৩টি পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেছেন। অপরিচিত, স্বল্পপরিচিত অথচ বাংলা সাহিত্যের রত্নপ্রদীপ প্রজ্জ্বলনকারী কবিকুলকে তিনি সাহিত্য সমাজে এবং বাংলা ভাষা-ভাষী জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করেছেন। মধ্যযুগের বাংলা পাণ্ডুলিপি পঠন-পাঠনের যুগান্তকারী প্রবর্তক হিসেবেও ড. আহমদ শরীফের নাম চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাংলাদেশে হাতে গোনা যে কয়েকজন পাণ্ডুলিপি পাঠক রয়েছেন তাঁদের সবাই কমবেশি ড. আহমদ শরীফের কাছে ঋণী। তাঁর সম্পাদনা-রীতি অনুসরণ করে ড. আবদুল কাইউম, ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, ড. কল্পনা ভৌমিক,

ড. রাজিয়া সুলতানা, ড. মোজাম্মেল হক এবং আবদুল গফুর (বর্তমান প্রবন্ধকার) প্রমুখ মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় অবদান রেখেছেন। মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন এবং করবেন তাঁরা অনেকেই ড. আহমদ শরীফের প্রদর্শিত পথে পদচারণা করতে বাধ্য হচ্ছেন এবং হবেন। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের যে কোনো বিষয়ের উপর গবেষণা করতে গেলে অথবা অভিসন্দর্ভ রচনা করতে হলে ড. শরীফের সম্পাদিত গ্রন্থ এবং মূল্যবান ভূমিকাসমূহ আকর গ্রন্থ বা আকর প্রবন্ধ হিসেবে বিবেচিত হবে। মধ্যযুগের সমাজ-মানস তথা ধর্ম, জাতি, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদি বিশ্লেষণে ড. আহমদ শরীফ অনন্যসাধারণ এক বিস্ময়কর মননশীল প্রতিভা। তাঁর প্রায় ৪৫টি মৌলিক গ্রন্থ এবং ৪০টি সম্পাদিত গ্রন্থ যেমন সমকালে সুধী সমাজে পঠিত ও নন্দিত হচ্ছে তেমনি ভাবীকালেও এ গ্রন্থগুলো বাংলা সাহিত্যের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস বিনির্মাণে সহায়ক হবে। আর এ কারণেই ড. আহমদ শরীফ বাংলা সাহিত্যের বিশেষ করে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান গবেষক-সম্পাদক হিসেবে অমরত্ব লাভ করবেন।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ : তাঁর মানবতা ও গণমুক্তির দর্শন

বশীর আল্‌হেলাল

মান্যবর আহমদ শরীফের *মানবতা ও গণমুক্তি* বইটি সম্পর্কে দু-এক কথা বলতে বসে আনন্দ আর গৌরব বোধ করছি, যদিও কাজটা সহজ নয়। এমনিতে প্রবন্ধের বইয়ের সমালোচনা কঠিন আমার কাছে। কিছু বইয়ে শুধু তথ্য আর বিবরণ থাকে। কিন্তু যেসব বইয়ে তত্ত্ব আছে এবং তাকে জড়িয়ে লেখকের বিশ্বাস (কিংবা অবিশ্বাস) আছে সেখানে দু'রকমের ব্যাপার হয়। তত্ত্ব এবং বিশ্বাস যদি সমালোচকের পক্ষের না হয় তখন সংঘর্ষ হয়। আর যদি পক্ষের হয় তখন আরও কঠিন দায়িত্ব। নেতির কাজটা তবু সহজ। আমার বিশ্বাসের আগুন দিয়ে সেটাকে তাতিয়ে তোলা যায়, এমনকি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সেটাকে ছারখার করে দেয়া যায়। কিন্তু যে তত্ত্বে বিশ্বাস করি তার ব্যাখ্যা ও বিকাশসাধন করতে সূক্ষ্ম গভীর মুনশিয়ানার দরকার হয়। তার ভাষা আলাদা। মার্কস-এঙ্গেল্‌স খারিজ করেছেন যত সহজে, প্রতিষ্ঠা করতে তার চেয়ে কষ্ট হয়েছে বেশি। অবশ্য নেতির ক্ষেত্রেও নিজের বিশ্বাসটাকে শেষে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, গাছের ডাল ভেঙে আম পাড়ার মতো। আহমদ শরীফের তত্ত্ব ও বিশ্বাস মোটামুটি আমার তত্ত্ব ও বিশ্বাস। তাই এর উপরে কিছু বলার নেই। ব্যাখ্যা বা বিকাশসাধনেরই বা কী আছে। তাঁর নিজের বিশ্লেষণের পদ্ধতি দ্বন্দ্বমূলক। এবং ইতিহাসের ব্যাপক প্রেক্ষাপটে আর দেশ ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতের আলোকে এবং অন্ধকারে তাঁর বিশ্লেষণগুলি পথ কেটে কেটে অগ্রসর হয় এবং সিদ্ধান্ত টানে। বিশ্বাস ছাড়া যাঁদের আর কোনো সম্বল নেই, যাঁরা যুক্তি জানেন না, যুক্তি মানেন না, তাঁরা ছাড়া আর কে তাঁর বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত খণ্ডাবেন আমি জানি না। কিন্তু প্রশ্ন আছে মানবতার, শুভ ও কল্যাণের, হয়তো যুক্তির উপরে যার স্থান। তিনি কেমন মানবতাবাদী? সামান্য অর্থে বুর্জোয়া মানবতাবাদী তিনি নন। তবে কি কমিউনিস্ট মানবতাবাদী? তিনি কমিউনিস্ট-বিরোধী মানবতাবাদী নন। কিন্তু কমিউনিস্টরা বড্ড বেশি স্বপ্ন দেখে, হোক তা বিপ্লবী স্বপ্ন। মানুষের শুভ স্বরূপে ও সম্ভাবনায় তাদের বড্ড বিশ্বাস। এই ক্ষেত্রে, আমার মনে হয়েছে, আহমদ শরীফের ইতিহাসের বোধ চাঁছাছোলা, বাস্তবতার বোধ প্রাণখোলা, যা তাই। খুব ভালো তাঁর এই বৈশিষ্ট্য। তাঁর এই বৈশিষ্ট্যের একটু পরিচয় তুলে ধরা সম্ভব হয় কি না পরে দেখব।

আহমদ শরীফের জ্ঞানসাধনাকে দুটো স্থূল ভাগে ভাগ করা যায়। তিনি মোট শিক্ষকতা করেছেন ৪১ বছর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৩ বছর। শিক্ষক-জীবনকে তিনি সার্থক করেছেন পাণ্ডিত্য আর গবেষণা দিয়ে সাধারণত যা করা হয়। কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্য—তাঁর গবেষণার জগতটা যত বড় ততটা সচরাচর দেখা যায় না। মধ্যযুগের বাংলার মুসলমানদের কাব্যসাধনার ইতিহাস আর উপাদানগুলিকে যাঁরা উদ্‌ঘাটন আর উপস্থাপন করেছেন তাঁর কীর্তি তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। এ ক্ষেত্রে তিনি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের যোগ্য উত্তরপুরুষ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যা লেখা হয়েছে এখন পর্যন্ত তা অপূর্ণ রয়েছে, মধ্যযুগের মুসলিম সাহিত্যসাধনার পরিচয় তাতে সামান্যই পাওয়া যায়। এর জন্যে মুসলমানদের আপত্তি এবং অভিমান আছে। ইতিহাসে মুসলিম সাহিত্যসাধনার প্রতি যে উপেক্ষা এর দু'টি কারণ বা দিক রয়েছে। প্রথমত, এসব সাহিত্যকর্মের উদ্ধার ও প্রকাশ হয়নি, ইতিহাস রচয়িতারা জানতে পারেননি কোথায় কী আছে। এ ব্যাপারে হিন্দু ঐতিহাসিকদের অবহেলাও ছিল, মুসলমানদেরও উদ্যোগের অভাব ছিল। দ্বিতীয়ত, হিন্দু ঐতিহাসিকরা, সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, মধ্যযুগের মুসলমান রচিত এইসব সাহিত্যকর্মকে ওই যুগের বৈষ্ণব সাহিত্য, শাক্ত সাহিত্য, বিভিন্ন মঙ্গল সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য ইত্যাদির তুলনায় নিরেস বলে বিবেচনা করেছেন, এবং সাহিত্যের ইতিহাসে সেগুলোকে স্থান দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। এইরূপ মূল্যায়ন কতদূর গ্রহণযোগ্য সেই তর্কে প্রবেশ করার এখানে দরকার নেই। আমাদের ঐতিহাসিকরা প্রধানত প্রাচীনপন্থী। কিন্তু সাহিত্যের, বিশেষত পুরাতন সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এখন প্রভাব বিস্তার করতে লেগেছে। সাহিত্যমূল্যের বিচার করতে বসে বিপুল মানবের বিপুল মনের ফসলকে ইতিহাস থেকে বাদ দেয়া যায় না। সাহিত্যতত্ত্ব জিনিসটাও স্থান, কাল, আদর্শ ও ব্যক্তিভেদে আপেক্ষিক। তবু মধ্যযুগের মুসলিম-রচিত সাহিত্য তুলনামূলকভাবে যদি নিরেসও হয়, ইতিহাসের উপাদান রূপে সেই নিরেস মানেরই ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। কেন ও কোন দিক থেকে নিরেস, সেই তুলনামূলক সমীক্ষারও গুরুত্ব ও প্রয়োজন রয়েছে। যেমন মধ্যযুগের হিন্দু-রচিত বাঙলা সাহিত্যে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে জীবনের ও কালের নিবিড় চিত্রগুলি পাওয়া যায়, তা সে সাহিত্য যে বর্গের বা যতই ধর্মভিত্তিক হোক না কেন। আর মুসলমান-রচিত সাহিত্যে পাওয়া যায় জীবনের ঐতিহাসিক ও মানবিক বলিষ্ঠ চেতনা। মুসলিম-রচিত এমন বিপুল সাহিত্য কি ইতিহাসে উপেক্ষিত হতে পারে? এমনকি আমার মনে হয় মুসলিম শায়ের রচিত বিপুল পুথি বা দোভাষী সাহিত্যেরও ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। সাহিত্য কি শুধু রচয়িতার বা স্রষ্টার, না পাঠকের এবং উপভোক্তারও? সমকালের বা পরবর্তীকালের লেখকদের যদি পুথি সাহিত্য প্রভাবিত বা অনুপ্রাণিত করে থাকে, তাহলে সাহিত্যের ইতিহাসে কেন তার স্থান থাকবে না? তবে মুসলমান ঐতিহাসিকরা যখন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখবেন এই বঙ্গে, আমার ভয় হয়, পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় তাঁরাও না একই বিভ্রমের চক্করে পড়ে যান। আহমদ শরীফের মতো অনুসন্ধানী ও ঐতিহাসিকদের হাতে পড়লে সে আশঙ্কা নেই। জানি না ভবিষ্যত ইতিহাসের ভাগ্যে কী আছে। আজকের কাগজে আমার একটা লেখা, তার চেয়ে বেশি কলকাতা থেকে এসে

ড. ক্ষেত্র গুপ্তের দু-একটি বক্তৃতা বিভেদকামীদের হাতে মজার বাদ্য তুলে দিয়েছে, তাঁরা এই বঙ্গে আলাদা বাংলা ভাষা গড়ার কথা বলছেন। কিন্তু মুসলমান-রচিত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ছিল অখণ্ড বাংলা সাহিত্যেরই অংশ।

১৯৪৭-এর পর স্বাভাবিকভাবেই মধ্যযুগের মুসলমান রচিত সাহিত্যকে নিয়ে সাড়া জাগে পূর্ববঙ্গে। ১৯৫৫ সালে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হলে তার কর্মসূচীর মধ্যে এ একটা প্রধান স্থান দখল করে। পত্রিকার কথা বাদ দিলে, বাংলা একাডেমীর প্রথম বইটিই হচ্ছে ১৯৫৭ সালের জুন মাসে প্রকাশিত আহমদ শরীফ সম্পাদিত দৌলত উজির বাহরাম খানের *লায়লী মজনু*। মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি ঠিক কতগুলি তিনি সম্পাদনা করেছেন আমি জানি না। কিন্তু বাংলা একাডেমীই তাঁর সম্পাদিত অন্তত ১৪টি মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করেছে। এছাড়া পুরাতন সাহিত্য সংক্রান্ত তাঁর আরো কয়েকটি বই হচ্ছে *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, বাঙলা সুফীসাহিত্য, বাউলতত্ত্ব, সৈয়দ সুলতান তাঁর যুগ ও তাঁর গ্রন্থাবলী*।

ড. ক্ষেত্র গুপ্ত সেদিন, ১২ই নভেম্বর ১৯৯১ বাংলা একাডেমীতে বক্তৃতা করতে উঠে বলছিলেন, ড. আহমদ শরীফের ওই দু'খানা বই (*বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ১ম ও ২য় খণ্ড : ১৯৭৮ ও ১৯৮৩) যদি তাঁদের হাতে না আসত, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের অর্ধেক তাঁদের অজানা থেকে যেত : মোটামুটি এই ধরনের কথা।

সেই দুই স্থূলভাগের এ গেল একটা। দ্বিতীয় ভাগটা হচ্ছে তাঁর ওই গবেষণা ও একাডেমিক কাজের বাইরের যে মননচর্চা, যেখানে আধুনিক ও ক্রিটিকাল সমালোচক আহমদ শরীফ উদ্ভাসিত, যেখানে মানুষের, তার সমাজের, তার ভাগ্যের ও তার ইতিহাসের তীব্ররূপে-বাস্তবিক বিশ্লেষণগুলি পাওয়া যায়। তাঁর এই ক্ষেত্রের কয়েকটি বই: *বাঙালীর চিন্তাচেতনার বিবর্তনধারা, প্রত্যয় ও প্রত্যাশা, কালের দর্পণে স্বদেশ, ইদানীং আমরা, স্বদেশ অন্বেষা, কালিক ভাবনা, যুগযন্ত্রণা, জীবনে সমাজে সাহিত্যে, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচিন্তা, বিচিত চিন্তা* ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রেরই তাঁর আর একটি বই *মানবতা ও গণমুক্তি*, যেটিকে অবলম্বন করে বর্তমান আলোচনায় তাঁর এই মননচর্চার সামান্য পরিচয় দিতে বসেছি। তিনি পুরনো সাহিত্য ও তার ইতিহাস থেকে আধুনিক জীবন ও তার যন্ত্রণা পর্যন্ত অক্লান্ত বিচরণ করেছেন। দুই স্থূলভাগে এদের ভাগ করেছি বটে, কিন্তু এ যেন চিরায়ত বিশ্ব-পথিকের অতীত থেকে বর্তমানের, প্রাচীন থেকে আধুনিকের চিরযাত্রা। একজীবনে এরকম পুথি-ঘাঁটা পাণ্ডিত্য আর আধুনিক মননচর্চা বেশি দেখা যায় না।

আলোচ্য *মানবতা ও গণমুক্তি* বইটিতে তাঁর ২১টি ছোট-বড় প্রবন্ধ সঙ্কলিত হয়েছে। প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা পরিচয় দেয়া সম্ভব হবে না, তার দরকারও নেই। নামগুলি কেবল তুলে দিলেও তাঁর এ-বইয়ের সমগ্র বিষয় ও আলোচ্য সম্পর্কে ধারণা করা যাবে। সেগুলি হচ্ছে : 'মানবতা ও রূপান্তর', 'সংস্কৃতির রূপান্তর প্রসঙ্গে', 'ম্যাজিক ও লজিক', 'ভয় ও ভরসা', 'যাদু, যুক্তি ও আধিমুক্তি', 'এ আধিমুক্তির উপায় কি', 'শাস্ত্রিক সাম্প্রদায়িকতা', 'মানুষের বোধে বিরোধ ও অসঙ্গতি', 'ঐতিহ্য বনাম প্রগতিশীলতা', 'বিশ্ব যখন এগিয়ে চলে আমরা তখন—', 'বাঙলার সমাজে, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদান', 'বিকৃত ইতিহাস পাঠপ্রসূত জাতিদ্বেষণার পরিণাম',

'মহামানব নয় ভালো মানুষ চাই', 'ভালো হও-ভালোবাস এবং ভালো কর', 'জিগীষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা', 'গণমুক্তির পথ ও পদ্ধতি', 'রাজনীতির খেলা', 'ভাস্করমূর্তি ও বিকৃতচেতনা', 'পঞ্চ প্রসঙ্গ'। 'পঞ্চ প্রসঙ্গে' আবার পাঁচটি বিষয় আলাদা শিরোনামে আলোচিত, সেগুলি হচ্ছে : 'বুদ্ধিজীবী', 'সংস্কৃতি', 'মুসলিমদের উনিশ শতকী শিক্ষাতত্ত্ব', 'বাঙালী-বাঙলাদেশী', 'প্রাচীন ভারত ও হিন্দুত্ব'। বইয়ের এই প্রবন্ধসূচি থেকে যা দেখা যায়, আমাদের বর্তমান ও সাম্প্রতিক ইতিহাসের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেছেন তিনি। এ কাজ তিনি করেছেন অতীতের ইতিহাসের নির্মোহ ব্যবচ্ছেদ করে। করেছেন ভবিষ্যতের আশায়। খুব সংক্ষেপে যদি বলি, এ বইয়ে এবং অন্য অনেক বইয়েও তাঁর বিষয় হচ্ছে- মানুষ কেমন ছিল, কেমন আছে, কেমন থাকবে। কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে তাঁর কিছু-কিছু বক্তব্য তুলে ধরব।

মুখ্য প্রবন্ধ 'মানবতা ও গণমুক্তি' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৭ সালের গোবিন্দ দেব স্মারক বক্তৃতা। এতে আহমদ শরীফ বলেছেন : আজকের দুনিয়ায় মানবতাবাদ খুবই আলোচিত বিষয়, এই নিয়ে আমরা আমাদের দেশেও বড় বড় কথা বলি। কিন্তু আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত এই দেশে গণমানবের যেমন ভাত-কাপড় হয়নি, তেমনি আমাদের মানবতা বা মনুষ্যত্বের সম্যক বিকাশ ও বিস্তার হয়নি। কারণ মানবেরই সম-বিকাশ হয়নি। একদিকে যেমন ধনের আকাশ-পাতাল অসামঞ্জস্য, অন্যদিকে তেমনি মানুষে-মানুষে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার ভেদও ওই রকম। মানবতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় বা প্রমাণ সংস্কৃতি। শাস্ত্র বা ধর্ম মানুষের আচার-বিচার নিয়ন্ত্রণ করে সত্য, কিন্তু ধর্মকে মানুষ তার প্রয়োজনমতো গড়ে নেয় এবং এমন কোনো অপকর্ম নেই যা থেকে ধর্ম তাকে বিরত করতে পেরেছে। অতীত ও ঐতিহ্য তার স্বকাল ও স্বসমাজের কোনো সমস্যারই সমাধান করতে পারে না। আস্তিক মানুষ স্বকালে মানসবিহার করে না। চিন্তায় এরা সমকালীন নয়, দেড় থেকে আড়াই-তিন হাজার বছরের প্রাচীন। তাই এদের হাতে মানবিক সমস্যার সমাধানও নেই। কেবল ডাস্ ক্যাপিটাল-পন্থীরাই কাল-সচেতন।'

কিন্তু সভ্যতারও সঙ্কট রয়েছে। এই ব্যাপারটা দেখিয়েছেন 'আবর্তিত সমাজের আজকের সঙ্কট' প্রবন্ধে। মধ্য তথা সামন্তযুগে মানুষে-মানুষে নানারকমের পার্থক্য ও বৈষম্য এবং শ্রেণীদ্বন্দ্ব ছিল, তবু যেহেতু মনন ও ভাববিপ্লবের পরিধি ছিল সঙ্কীর্ণ, তাই বিভিন্ন রকমের মানুষের মধ্যে চেতনাগত পার্থক্য ছিল সামান্য, সমাজে শৃঙ্খলা ছিল, শ্রেয়োবোধের বন্ধনে সমাজ ছিল বাঁধা। ইংরেজদের আগমনে ইংরেজি আর গদ্য-সাহিত্য চালু হলে চিন্তার জগতে বিপ্লব হল, উন্নতি হল, কিন্তু সমাজ-সম্পর্ক পাল্টে গেল, শোষক-শোষিত, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সমেত নানা-রকমের বিভেদ ও বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে ঘটল ব্যক্তিতন্ত্রের বিকাশ। প্রাচীন শাস্ত্রীয় মানবতার স্থান নিল জ্ঞানদীপ্ত আধুনিক মানবতা। শিক্ষিত শহুরে বিত্তবান মানুষের স্বাতন্ত্র্যচেতনা ঘৃণ্য ও বিকৃতভাবে বৃদ্ধি পেল। তাই আজ দেশ, জাতি, মানবতা, রাষ্ট্র বলতে কেবল শিক্ষিতদের সমাজকেই বোঝায়, তাদের সুখের জন্যই যত আয়োজন। কিন্তু ধনতন্ত্রের এই নবজাগরণে কল-কারখানা হল। তাতে ভিড় জমাল শ্রমিক, মেহনতি জনতা। শহরের ভিড় আর বেকারত্ব উপদ্রব হয়ে উঠল ভদ্রলোকদের জন্য। শাসন

শোষণ ত্রাসন আর গণমানবের ক্ষুধার্ত চিৎকার ও সংগ্রাম মিলে মহা অনিশ্চিত ও শঙ্কিত পরিবেশ ভারি হয়ে উঠল। তবু শেষে লেখক আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন সমাজের যৌথ জীবনের মধ্যে এমন একটা অদৃশ্য ও অবচেতন শক্তি আছে যা আসন্ন বিনাশ-মুহূর্তে পথ দেখায়। বলেছেন দূর ভাবীকালের জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

'সংস্কৃতির রূপান্তর প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে সংস্কৃতির বিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে সামন্ত ও বুর্জোয়া সংস্কৃতির অন্তর্গত ত্রুটির কথা বলেছেন। তারপর কমিউনিস্টদের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের কথা বলেছেন। বলেছেন : কৃষক-শ্রমিক-প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সহায়ক হবে এ দর্শন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীরা যতটা তত্ত্বজ্ঞানী ততটা মননশীল নন। দেশকালের পার্থক্যজাত ব্যবধান ও সমস্যা তাঁদের চেতনায় বিশেষ গুরুত্ব পায় না। তাঁরা উনিশ শতকের ইউরোপীয় বাস্তব সমাজ ও সমস্যাজাত মননপুষ্ট মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন নির্দেশিত সমস্যাকে ও সমাধানপন্থাকেই চিরসত্য ও চিরপ্রযোজ্য বলে মনে করেন, ইত্যাদি। বলেছেন : কাম্য গণসাহিত্য, গণশিল্প, গণসঙ্গীত, এক কথায় গণসংস্কৃতি, যার বিকাশে বড় বাধা হচ্ছে সরকার-সমর্থিত বুর্জোয়াদের সংস্কৃতির সর্বগ্রাসী প্রভাব। এ প্রভাব বিনষ্ট করার জন্য কমিউনিস্ট সাহিত্যে নতুনতর যুক্তির ও চিন্তার, ভাষার ও ভঙ্গির মৌলিকতা প্রয়োজন।

'শাস্ত্রিক সাম্প্রদায়িকতা' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন সৃষ্টির ও ইতিহাসের পথ বেয়ে ধর্ম কিভাবে মানবগোষ্ঠীকে ঐক্যচেতনার বন্ধনে বেঁধেছে, আবার গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে অনৈক্য সৃষ্টি করেছে। আদিকালে অসহায় মানুষ নিজের গরজে নিজের নিরাপত্তার জন্যই স্রষ্টা ও জীবননিয়ামক প্রভুকে আবিষ্কার করেছে, স্রষ্টা আর শাস্ত্র বানিয়ে নিজেরাই তার অনুগত হয়েছে, যেমন আমরা শহিদ মিনার বানিয়েছি। সব ধর্মেরই উদ্ভব স্থানিক ও কালিক। তাকে সর্বজনীন করার প্রচারণার ফলে ধর্মমতের পার্থক্য গেছে বেড়ে, সহিষ্ণুতা-শ্রদ্ধা-সহাবস্থান দুর্লভ হয়ে উঠেছে, হানাহানি-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। বলেছেন : ঈশ্বর যদি অস্তিত্বে চিরন্তনও হন, শাস্ত্র কদাচ চিরন্তন নয়। ধর্মাচারকে যদি মানুষ ব্যক্তিগত বলে মনে করে এবং সেইভাবে তা আচরিত হয়, তাহলেই আর সামাজিক সমস্যা থাকে না, বিধর্মী-বিদ্বেষ বিলুপ্ত হয়। 'মানুষের বোধে বিরোধ ও অসঙ্গতি' প্রবন্ধে লেখক এই বিষয়টিই বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করেছেন।

'ঐতিহ্য বনাম প্রগতিশীলতা' মনে হয় আহমদ শরীফের প্রিয় বিষয়। এই সংক্রান্ত তাঁর বক্তব্যের উল্লেখ আগে করেছি। ওই নামের একটা প্রবন্ধই তিনি লিখেছেন আলোচ্য সঙ্কলনে। প্রবন্ধটি পড়ে কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ঐতিহ্য ও প্রগতির মধ্যে কেন এই কল্পিত দ্বন্দ্ব দাঁড় করানো? লেখক প্রশ্ন করেছেন, ঐতিহ্যের কী এমন মূল্য বা গুরুত্ব? ঐতিহ্যের যদি মূল্য বা গুরুত্ব না থাকে তাহলে এত মাটি খোঁড়া হয় কেন? আমাদের আলোচ্য পণ্ডিতই বা এত পুথি ঘেঁটেছেন কেন? তিনিই এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, বলেছেন, সে ঐতিহ্যকে বেচা-কেনার পণ্য করার জন্য। না হলে গতি বা ডাইনামিজ্‌মই হচ্ছে জীবন। ঐতিহ্য পেছনের টান। মানুষ ওতে মগ্ন হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু চলমানতাই, পুরোনোর বর্জনশীলতাই, নতুনের গ্রহণপ্রবণতাই প্রকৃত জীবনচর্যা ও জীবনের চর্চা।

'বিশ্ব যখন এগিয়ে চলে, আমরা তখন' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় মানবের উদ্বর্তন ও বিচিত্র প্রগতি প্রয়াসের বিবরণ ও বিশ্লেষণ প্রদান করে তার মধ্যে আমাদের অবস্থান কোথায় এবং কেমন সেটি দেখিয়েছেন। এই প্রবন্ধটিকে এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে যে, এখানে (এবং অন্যখানেও) ভাগ্যতাড়িত মানবের শত-শতাব্দীর পথপরিক্রমাকে তিনি কেবল শুকনো যুক্তিবাদ ও প্রখর ইতিহাস জিজ্ঞাসা দিয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করেননি, কান্না-হাসির দোল-দোলানো যে পৌষ-ফাগুনের পালা সেই মানুষ ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেছে তার রহস্যকে তিনি উপেক্ষা করেননি। মানবের জীবনপ্রয়াস সম্বন্ধে বলেছেন : আত্মপ্রীতিই জীবনপ্রেরণা। প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয়, কিন্তু প্রীতি না থাকলে জীবন চলে না। বেঁচে থাকাই জীবন। প্রাণের প্রতি, দেহের প্রতি প্রীতিই জীবনপ্রেরণা, প্রাণের স্থিতি দেহে, যে টিকে থাকে আহারে। জীবের সার্বক্ষণিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণই, তার সর্বপ্রকার ব্যক্ত ও অব্যক্ত চেতনাই জীবন। এই জীবনকে রক্ষা করার অর্থাৎ আত্মরক্ষার মৌলিক প্রয়াস রয়েছে মানুষের। আহমদ শরীফের একটা পদ্ধতি হচ্ছে মানুষের জীবন-প্রয়াসের ব্যাখ্যা করতে তিনি জগৎজোড়া মানবেতর প্রাণীর আচার-অনাচারের সঙ্গে তার তুলনা করেন। মানুষ যে গোত্রভুক্ত-সমাজবদ্ধ হয়েছে, অলৌকিক শক্তি বা ঈশ্বর বা ধর্মের অনুগত হয়েছে সে ওই নিরাপত্তার জন্য। মানুষ তারপর ক্রমে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ক্রমপরিশীলিত সংস্কৃতির প্রভাবে শিক্ষিত, শক্তিমান ও আধুনিক হয়েছে বটে, কিন্তু সেই অলৌকিকের সংস্কারগুলিকে ত্যাগ করার তার সাহস হয়নি। এই মানুষ ধার্মিক নয়, ধর্মভীরু। সে আর নিজেকে স্বাধীন করতে পারে না। এর মধ্যে রয়েছে আবেগ নামক একটা জিনিস। কেবল আবেগের ক্ষেত্রেই মানুষ স্বাধীনভাবে আচরণ করে। ভালো হোক, মন্দ হোক, অনুভূতির আবেগই মানুষের জীবনে খাঁটি। যাই হোক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই সেই সংস্কার আর সামাজিক লোকভয়ের মধ্যেই তার নিরাপদ কোটরটি বজায় রাখে। বর্তমান শতাব্দীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ব্যবহারিক থেকে নৈতিক সর্বক্ষেত্রে মানুষের চিন্তার ও মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়েছে। এই বাংলাদেশের আমাদের জীবনে সে পরিবর্তন কিছু হয়েছে, কিন্তু দারিদ্র্য, ধর্ম, সাম্রাজ্যবাদ চারদিক থেকে আমাদের ঘিরে ধরে আছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আমরা ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগাই বটে, কিন্তু আমাদের মনোজগতে, কল্পনায় বা বিশ্বাসে তার কোনো বুদ্ধিগত বা যৌক্তিক স্থান নেই। তাই পাশ্চাত্যের প্রাগ্রসর মানুষ যখন জ্ঞান আর যুক্তিকে সম্বল করেছে, আমরা তখন সচেতনভাবেই কল্পনা, বিশ্বাস আর অলৌকিক রহস্যের মধ্যে বন্দি থাকার প্রয়াস করি যাতে অজ্ঞ-রিক্ত গণমানুষের উপর সামন্ত-বুর্জোয়া শাসন-শোষণ চালানো সম্ভব হয়।

সঙ্কলনে একটা বড় আর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রয়েছে 'বাঙলার সমাজে সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদান'। এই প্রবন্ধে লেখকের একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত রয়েছে। বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে চর্যাপদ যখন আবিষ্কৃত হল, কত আনন্দ গর্ব পরীক্ষা গবেষণা-বিশ্লেষণ চলল, পরীক্ষার খাতায় উত্তর লিখতে হবে বলে কত রাত জাগলাম আমরা পড়ুয়ারা। বাংলা ভাষার আদি রূপ পাওয়া গেছে। কিন্তু ইদানীং আবার কেউ কেউ বলছেন, না, চর্যাপদের ভাষা বাংলা নয়, অর্বাচীন শৌরসেনী অবহট্‌ঠ। আহমদ শরীফও তাই বলেছেন। কিন্তু তিনি যে বলেছেন লিখিত বাংলা রচনার শুরু তুর্কি আমলে,

নতুন যুগে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনরাজত্বের অবসানে, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* আগে আর বাংলা রচিত হয়নি, এই ইতিহাস প্রমাণ করার জন্যই কেবল চর্যাপদ শৌরসেনী অবহট্‌ঠ হয়ে যাচ্ছে না তো? যাই হোক, তিনি দেখিয়েছেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার সূচনাকালে লৌকিক হিন্দু বিষয়ই যেমন ছিল তার উপজীব্য, এই বঙ্গে ওহাবি-ফরায়েজিদের পূর্ব পর্যন্ত লৌকিক ইসলামই তেমনি ছিল প্রচলিত। বলেছেন, পরে ইংরেজ আমলে যেমন ঘটে, তুর্কি প্রভাবেও দেশী মানুষের চিন্তায় তেমনি বিপ্লব ঘটেছিল। এবং সে মানবমুক্তি স্বাতন্ত্র্যগর্বী অভিজাত উচ্চবিত্তের মধ্যে যত না ঘটেছিল তার চেয়ে হাজারগুণ বেশি ঘটেছিল নিম্নবর্ণের লোকের মধ্যে। এই গণমানবই এই সময়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়। তাই আমাদের সাহিত্যে ভাস্কর্যে সঙ্গীতে গেঁয়ো গণমানবের প্রভাবই দেখতে পাই।

চিন্তার রাজ্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী আর একটি প্রবন্ধ 'মহামানব নয়—ভালো মানুষ চাই'। যে-কাজটা তিনি অন্য কোনো কোনো প্রবন্ধেও করেছেন, এই প্রবন্ধে করেছেন বিস্তৃতভাবে। সেটি মানুষের পরিচয় বিশ্লেষণ। অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের মিল-গরমিল দেখিয়ে তিনি কাজটাকে সহজ ও যুক্তিসিদ্ধ করেন। মানুষ বরং প্রবৃত্তিচালিত ও প্রতিযোগিতা-তাড়িত কম নয়। দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-মারামারি-হানাহানিতে তার নিষ্ঠুরতা, ক্ষুদ্রতা কম নয়। শাস্ত্র পারেনি তাকে সংযত রাখতে। তিনি বলেন পাপ মানবের অন্তর্নিহিত ব্যাধি। এক ধরনের মানুষ আছে অহং-সচেতন। আর এক ধরনের মানুষ আছে ভীরু, নিরুদ্যম কিন্তু সৎ। আর এক আছে যাকে বলি উদার বুর্জোয়া মানবতাবাদী। এদের বিত্ত আছে, এরা মান-যশের জন্য জনহিত করেন। বুর্জোয়ার এই দান-দাক্ষিণ্যকে লেখক বলেছেন পচনশীল বিষাক্ত ক্ষতের উপর দুর্গন্ধনিবারক প্রলেপ-পট্টি মাত্র। আর রয়েছেন, দুর্লভ হলেও, মহামানব মনীষী যাঁর 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। কিন্তু সবার উপরে প্রকৃত অবস্থাটা হচ্ছে দুনিয়ার শতকরা আশি ভাগ মানুষ মৌল মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। নারী তার মর্যাদা পায়নি। মেহনতি মানুষ প্রাপ্য মর্যাদা পায়নি। আজও মানুষের কাছে মানুষ অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য। লেখক বলেন, অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষও প্রবৃত্তিচালিত। তাই এরা যুক্তি বা ন্যায় মানবে না কখনও। জোর খাটাতে হবে। তাই আর মহাপুরুষের, মহৎ বাণীর দরকার নেই। চাই ঐহিক জীবনবাদী গণমানবদরদি কিছু ভালো মানুষ যারা দুনিয়ার শোষিত মানুষকে মৌলিক মানবাধিকার দেয়ার জন্য শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিরামহীন ও আপোসহীন সংগ্রাম করবে। এভাবেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে, এইভাবেই বিশ্বমানব প্রকৃত লিবার্টি ভোগ করতে পারবে। 'গণমুক্তির পথ ও পদ্ধতি' প্রবন্ধে অনুন্নত সমাজে সমাজবাদী আন্দোলনের সমস্যার কথা বলেছেন। বলেছেন, সমাজবাদীদের দায়িত্ব হচ্ছে আগের কালের সর্বপ্রকার নিয়ম-নীতি যে অকেজো ও অচল, তা গণমানবকে জানিয়ে দেয়া, বুঝিয়ে দেয়া। আর শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধিতে, কৃষকের খাজনা হ্রাসে গণমানবের মুক্তি নিহিত নয়। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে হবে। তা সম্ভব হলেই গণমুক্তি সম্ভব। সেই লক্ষ্যে কাজ করলে, সংগ্রাম চালালেই তার জন্য প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত কর্মী ও নেতা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

খুব সংক্ষেপে এই হচ্ছে আহমদ শরীফের বক্তব্য এবং এই তাঁর পরিচয় এবং খুবই সময়োপযোগী এ বইটি ও এর কেন্দ্রীয় বিষয়। সমাজতন্ত্রের নাকি পতন হয়েছে বিশ্ব

জুড়ে। কিন্তু পুরনো বস্তাপচা পশ্চিমী মানবতা দিয়ে কেমন করে মুক্তি হবে মানবের? সমস্যা মানবতার নয়, সমস্যা মানবতা ও গণমুক্তির। সার্থক এ বইয়ের নাম ও এর প্রতিপাদ্য।

বিশ্বের যে কোনো দেশের মতো বাংলাদেশের সমাজেও আজ বেশ কতকগুলো ধী-গোষ্ঠী আছে। যেমন বাঙালি জাতীয়তাবাদী, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী, দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট, মধ্যপন্থী কমিউনিস্ট, বামপন্থী কমিউনিস্ট, বুর্জোয়া গণতন্ত্রী মানবতাবাদী, র‍্যাডিকাল মানবতাবাদী, মওদুদীপন্থী ইসলামি মৌলবাদী, মওদুদী-বিরোধী ইসলামি মৌলবাদী। এগুলি খুবই স্থূল বিভাজন। এগুলোকে আরও অনেকগুলো ভাগে ভাগ করা যায় যার এখানে দরকার নেই। ইসলামি মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলোকে অনেকগুলো ভাগে ভাগ করা যায়। কমিউনিস্টদেরও মাত্র তিনটি ভাগে ভাগ করলে চলে না। ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপুল বিপর্যয়ের পর নব্য দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট গোষ্ঠী একটা সৃষ্টি হয়তো হয়েছে যাদের হয়তো বুর্জোয়া গণতন্ত্রী মানবতাবাদীদের মধ্যে ফেললেও চলে। আবার উলটো মেরুতে কঠোর বামপন্থী কমিউনিস্টরা রয়েছেন। অ-কমিউনিস্ট সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠীও থাকতে পারে যাঁদের হয়তো র‍্যাডিকাল মানবতাবাদীদের মধ্যে ফেললেও চলে। বাঙালি-জাতীয়তাবাদীরা প্রধানত আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির অনুসারী। মধ্যপন্থী কমিউনিস্টদের মধ্যেও এঁদের কিছু কিছু থাকতে পারে। আমাদের সমাজের বিভিন্ন ধী-গোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় অংশ এই গোষ্ঠীতে রয়েছেন। এঁরা সবচেয়ে সংস্কৃতিমনস্ক ও সংস্কৃতি-তৎপর, হয়তো সংস্কৃতি-সর্বস্বও বলা যায়। আবহমান বাংলা সংস্কৃতি এঁদের বিরাজমান সংস্কৃতির সমন্বয়ধর্মী রূপ হলেও তাতে স্বভাবতই হিন্দু ভাব ও প্রভাব কিছু বেশি। এই গোষ্ঠী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ সৃষ্টি, বরং অন্যভাবে বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এঁরাই নির্মাণ করেছেন। এই চেতনা যত না বস্তুনির্ভর তার চেয়ে বেশি ভাবাত্মক, যত না অর্থনৈতিক তার চেয়ে বেশি সাংস্কৃতিক, তাতে মানুষের চেয়ে মাটি, পতাকা, নিসর্গ ইত্যাদির চিন্তা বেশি। এঁরা ভারতপন্থী ও পাকিস্তানবিরোধী। তবে ভারতের বা পশ্চিমবঙ্গের বাম-প্রগতিবাদীদের নয়, দক্ষিণপন্থী আধা-দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পক্ষগুলির সঙ্গে একাত্ম। এই গোষ্ঠী যদিও কাগজে-কলমে সংবিধানে সমাজতন্ত্রের কথা বলে এসেছে, কিন্তু গণমানবের অর্থনৈতিক মুক্তি এদের কর্মসূচি নয়, অতিসম্প্রতি এই গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ফ্রন্ট আওয়ামী লীগ তাদের দলীয় মতাদর্শ থেকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রতিশ্রুতি আনুষ্ঠানিকভাবে বাদও দিয়েছে। সেদিক থেকে এখন সম্পূর্ণ আদল ও চরিত্র-প্রাপ্ত না হলেও বুর্জোয়া-গণতন্ত্রী মানবতাবাদী ধী-গোষ্ঠীর মধ্যে এঁদের ফেললেও চলত। কিন্তু এই গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ফ্রন্ট আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির পতাকাতলে এখন বিপুল গণমানবের সমাবেশ রয়েছে (অবশ্য অতিসম্প্রতি ক্ষেতমজুর পার্টি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, বিশেষ করে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৃহৎ অংশে হিন্দুদের ওই দুই পার্টির প্রতি সমর্থন রয়েছে যাদের অধিকাংশ বিত্তহীন ও নিম্নবিত্ত মানুষ)। স্বতন্ত্র হিন্দু মৌলবাদী ধী-গোষ্ঠী এখনও গড়ে ওঠেনি, কিন্তু গড়ে ওঠার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে।

বাঙালি-জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী বাংলাদেশের মানুষকে বলতে চায় বাঙালি, বিএনপি নামক নতুন রাজনৈতিক পার্টি বলে, না, বাংলাদেশী। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের এই গোষ্ঠী নতুন এবং আওয়ামী লীগ ও সামরিক বাহিনীর লোকসমেত নানা জায়গা থেকে আগত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হলেও এই গোষ্ঠী ইতিমধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে, কত ব্যাপক তা সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচন ও বিশ্বকাপে পাকিস্তানী ক্রিকেট দলের প্রতি বাংলাদেশের মুসলমানদের দিগ্‌বিদিক-জ্ঞানশূন্য সমর্থন থেকে বোঝা যায়। বাঙালি ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধী-গোষ্ঠী দু'টির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শনের মধ্যে পার্থক্য কী তা নির্দেশ করা শক্ত, হয়তো কিছুই পার্থক্য নেই। কিন্তু সাংস্কৃতিক পার্থক্যটি সহজ-নির্দেশ্য। বাঙালি না বাংলাদেশী এই নিয়ে অনেক তর্ক হয়েছে। কিন্তু নামে কী যায় আসে? আসল কথা হলো, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ সাম্প্রদায়িক। সংবিধান সংশোধনের মতো বিরাট কাণ্ড করে তাঁরা তা দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা মৌলবাদীদের মতো প্রাচীন সাম্প্রদায়িক নন। পাকিস্তান ও সউদি আরব তাঁদের খুব প্রিয়, ভারত প্রিয় নয়। মৌলবাদীদের মেয়েদের বোরকা, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী মেয়েদের শাড়ির উপরে একটা করে চাদর জড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। বুর্জোয়া বিপ্লবে সাধারণত সাম্প্রদায়িকতা থাকে না। বাংলাদেশে তাও থাকছে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদীরা মাঝখানে আছেন। এঁরা জাতীয়তাবাদের মাটির সুখ আর ধর্মের আসমানি নেয়ামত দুই-ই ভোগ করছেন। মুসলমান বাঙালির এই মধ্য-অবস্থান খুব প্রিয়।

প্রশ্ন হল, এত কথা বলা হল, কিন্তু আহমদ শরীফের অবস্থানটি কোথায়? হয়তো বলা সহজ নয়। আমি যে ধী-গোষ্ঠীগুলোর কথা বলেছি, এছাড়াও যেগুলোর কথা হয়তো বলা হয়নি, তার অধিকাংশ কোনো না কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বিত। আহমদ শরীফ কোনো রাজনৈতিক দলে নেই। সে রকম কোনো প্রশ্ন কি সঙ্কট দেখা দিলে হয়তো কোনো দলের দিকে হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি কমিউনিস্ট নন, কিন্তু কমিউনিস্টদের পছন্দ করেন। কিন্তু এই বইয়ে কমিউনিস্টদের সমালোচনা করেছেন। বলেছেন, কমিউনিস্টদের ধর্মহীনতার যে আদর্শ তারা নিজেরাই সবসময় তা মান্য করেনি, ধর্মকে প্রশ্রয় দিয়েছে। এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, আসলে কমিউনিস্টদের কাছে তিনি অতিরিক্ত প্রত্যাশা করেছেন। কমিউনিস্টরা সাধারণভাবে জাতীয়তাবাদেও বিশ্বাস করে না, জাতীয়তাবাদের উপরে আমাদের বিশ্ব-প্রলেতারিয়েতের সংহতির তত্ত্ব, জাতীয়তাবাদ, তদ্‌জাত জাত্যভিমান ও অন্যান্য উপসর্গ তো অনেক সময় ওই বিশ্ব-বিবেককে খাটো করেই থাকে। তবু জাতিসত্তার আবেগ ও তার সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং ধর্মবিশ্বাস মানবের মৌলিক অধিকার। বিশ্বমানবের বিপুল প্রগতির ঢেউয়ে ওগুলি একদিন ভেসে যেতে পারে, কিন্তু আপাতত ওই অধিকার খর্ব করা যায় না। তবে কি আহমদ শরীফ নাস্তিক অ্যানার্কিস্ট, নৈরাজ্যবাদী? নাস্তিকদের তিনি পছন্দ করেন, কারণ তারা যুক্তিবাদী। যুক্তিবাদী কি নৈরাজ্যবাদী হতে পারে? আল্লা যাঁদের মগজের ঘরে কুলুপ এঁটে দিয়েছেন কেবল সেই মৌলবাদীরা তাঁকে নৈরাজ্যবাদী মনে করতে পারে।

তবে কি তিনি শান্তিবাদী বা অহিংসাবাদী, যাকে বলে প্যাসিফিস্ট? প্যাসিফিজমের প্রবল অস্ত্রহীন শক্তি আমরা দেখেছি গান্ধীজীর মধ্যে, বার্ট্রান্ড রাসেলের মধ্যে। কিন্তু ওই দুই নাম থেকেই দেখতে পাচ্ছি প্যাসিফিজ্‌ম এক রকমের নয়। গান্ধীজী ছিলেন

ভগবদবিশ্বাসী, রাসেল নাস্তিক। তবে কি আহমদ শরীফ রাসেল ধরনের প্যাসিফিস্ট? কেউ ভালো করে মিলিয়ে দেখতে পারেন। রাসেল প্রথমে ছিলেন সমাজতন্ত্র-বিরোধী। আহমদ শরীফও হয়তো তাই ছিলেন। তাঁরা কেউই কমিউনিস্ট হয়ে যাননি, কোনো রাজনৈতিক দলের প্রবক্তা তাঁরা হননি। কিন্তু গণমানবের ভাগ্যের পরিবর্তন, মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁরা সমাজতন্ত্রের শক্তি ও ভূমিকাকে স্বীকার করেছিলেন এবং সাম্রাজ্যবাদের সমাজতন্ত্রবিরোধী নগ্ন আগ্রাসনকে খালি হাতে নৈতিক জোরে ও কলমের অস্ত্রে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিলেন। বার্ট্রান্ড রাসেল ছিলেন গণিতবিদ দার্শনিক। কিন্তু তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সাহিত্যে। অসম্ভব সুন্দর তাঁর ভাষা—সাহিত্যগুণান্বিত, অননুকরণযোগ্য, মাতৃভাষার নিজস্ব একটি মৌলিক শৈলী গড়েছিলেন, আপন এবং সহজ। কিন্তু অনুবাদ করতে গিয়ে দেখেছি, করা কঠিন। আহমদ শরীফেও সমন্বিত হয়েছে ইতিহাসের গবেষণা, দর্শন আর সাহিত্য, তার সঙ্গে জুটেছে রাসেলের মতো দলবন্ধনহীন রাজনীতি। আহমদ শরীফ বার্ট্রান্ড রাসেলের মতো যুক্তিবাদী। কিন্তু ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আলো আগে ফেলেন যুক্তির পথে, তারপর তাকে চালিত করেন। তাই সিদ্ধান্ত যা হয় সে অকাট্য। অর্ধশিক্ষিত বদ্ধ-বিশ্বাসী ছাড়া কে তাকে অমান্য করবে?

কিন্তু তিনি বাস্তবে অবিশ্বাসী নন। তিনি বিশ্বাস করেন গণমানবে, গণমানবের মুক্তিতে, তার সংগ্রামে। সেটাই তাঁর সাধনা। তিনি আশ্চর্য আধুনিক। বরং মজার কথা, প্রাচীন আর মধ্যযুগের সাহিত্য আর ইতিহাস যিনি ঘেঁটেছেন সারাজীবন, তিনি ক্লাসিক নন। বরং ওই পিছুটান আর মোহন দুর্বলতা কমিউনিস্টদের আছে, তাঁরা ক্লাসিসিজ্‌ম আর ঐতিহ্যের দিকে পিছু ফিরে তাকান, যদিও তাঁরা প্রধানত বিবর্তনে আর বিকাশের ঝুঁটি ধরে ইতিহাসের নব-নব ঝোড়ো পথে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে চান।

কিন্তু আহমদ শরীফের রয়েছে সেই অনন্য দোষ কিংবা গুণ : জেদি তিনি, একগুঁয়ে। বাঙালির ধর্ম, তার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আচার-বিচার, রীতি-রেওয়াজ সমন্বয়ধর্মী। এ ব্যাপারটা তিনি ভালো করে দেখিয়েছেন। কিন্তু এইকালে মানবের মুক্তির চিন্তা যখন করেন; সমন্বয় বা কোনো গোঁজামিলকে প্রশ্রয় তিনি দেন না (অন্য অনেকে যা করেন), তখন তিনি বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, প্রকৃত মুক্তবুদ্ধি। দুঃখের বিষয়, তাঁকে সবাই বুঝতে পারে না, বিশেষত তাঁর জেদ আর একগুঁয়েমিগুলোকে। বাঙালি আত্মসমালোচনা জানে না, তারা কেবল ভালো ভালো কথা শুনতে চায়, মাছ দিয়ে শাক ঢেকে রাখে, অতীতের বোকামি আর ভ্রান্তিগুলোকে নিয়েও ক্রমাগত বড়াই করে, এইভাবে আত্মপ্রবঞ্চনা করে। আহমদ শরীফ এইসব রঙিন বেলুনে সুঁচ ফোটাতে ভালোবাসেন। তিনি বরং অভিনবত্ব মেনে নেবেন, গড্ডলবৃত্ত সইতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলকে নিয়ে তর্ক বেধে গেল। তর্ক তো ভালো জিনিস। কিন্তু তর্ক যাঁরা করলেন তাঁরা মোটা মোটা কেতাবে যা-সব লেখা আছে তার বাইরে আর কী বললেন? যে-কথা বলে আহমদ শরীফ তর্ক বাধিয়ে দিলেন বরং তার মধ্যে ছিল নতুন কথা। যদি ভুলও হয়, তবু সে নতুন কথা। তাঁরা বুঝলেন না আহমদ শরীফের মতো লোক পুরো রবীন্দ্রবিরোধী হতে পারেন না, যাঁরা তর্ক করলেন তাঁরা তাঁদের রবীন্দ্রদেবতাকে, রবীন্দ্র-সম্পত্তিকে প্রাণপণে পেশল বুকে আঁকড়ে ধরে রইলেন।

ওইভাবে রবীন্দ্রনাথের দম বন্ধ করে দিয়ে লাভ কী? নকশালীরা রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেছে, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে ওই কাণ্ড পছন্দ করি না। ওই কাণ্ড যারা করেছিল তাদেরই কমরেডকে, লেনিনের মূর্তিকে আর একদল নামিয়ে ফেলেছে। ওতে রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, লেনিন কারোরই কিছু যায়-আসে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতি, বিদ্যাসাগরের প্রতি সত্য যদি কোনো মমতা থেকে থাকে, ওই নকশালীগুলোর মর্মজ্বালা বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

জাতীয়তাবাদীদের বিতর্কে আহমদ শরীফ যেসব কথা বলেছেন জাতীয়তাবাদীরাও তা বুঝতে পারেননি। তাঁরা মনে করেছেন একটা মুক্তিযুদ্ধ হয়ে গেছে, অতএব জাতীয়তাবাদের পোলাওয়ে স্বপ্নের ঘি একটু বেশি করে ঢাললে ক্ষতি কী? ঘি তো বাস্তব নয়, বাস্তব হচ্ছে পান্তাভাত। আমাদের শোষকরা সেই পান্তাভাতের মাটির সানকি পর্যন্ত ছিনিয়ে নিতে ব্যস্ত, জাতীয়তাবাদ করার তাদের সময় কোথায়! জাতীয়তাবাদের লড়াই কেবল জাতীয় সঙ্গীত আর জাতীয় পতাকার লড়াই নয়, বাঁচার লড়াই অন্তত কিছুটা তার মধ্যে থাকতে হবে।

আহমদ শরীফ বললেন, আমিই একমাত্র বাঙালি, কারণ আমি নাস্তিক। এই ধরনের একটা কথা। হ্যাঁ, একটু জেদের কথা তো বটেই। ধরুন, নজরুল যখন বলেন, তিনি মহাবিশ্বের মহাকাশ ফেড়ে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছেড়ে ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদ করে খোদার আসন 'আরশ' ছেদ করে উঠে গেছেন, মহা উচ্চে, তখন সেটা জেদের কথা তো বটেই। কিন্তু আহমদ শরীফের ওই কথাটার সহজ মানে কেন ধরতে কষ্ট হল? সবচেয়ে ভালো বাঙালি হচ্ছেন যিনি অসাম্প্রদায়িক বাঙালি। ক'জন বলতে পারেন! তিনি প্রকৃত অসাম্প্রদায়িক বাঙালি, যদি অসাম্প্রদায়িকতার প্রকৃত মাপকাঠিটি ঝুলিয়ে রাখা হয়? একজন নাস্তিকের চেয়ে কে সে স্পর্ধা করতে পারে? আহমদ শরীফের কোনো বাতিক নেই, প্রেজুডিস বা সংস্কার নেই। যাঁর নেই তিনিই মাথা উঁচু করে বলতে পারেন তিনি অসাম্প্রদায়িক। অন্যদের নাস্তিক হওয়ার ক্ষমতা নেই, অসাম্প্রদায়িক হওয়ার সাধ আছে।

তাহলে একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বলি। আমার কাছে একবার একটা ছেলে এল। তাজা তরুণ। বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য ভর্তি হয়েছে। একটা বইয়ের খোঁজে এসেছে। বইপত্র লেখাপড়া নিয়ে দু'চার কথা হতে হতে হঠাৎ ছেলেটা কোনো প্রসঙ্গ ছাড়াই একটা কথা বলে উঠল। ঠিক কথাগুলো মনে নেই। বলল, আহমদ শরীফ স্যার আমাদের ধর্ম সম্পর্কে, ইসলাম সম্পর্কে, মুসলমান সম্পর্কে যা-সব বলছেন, এখন কী হবে? কথাটা সে হঠাৎ বলল, আর এত কাতর তার গলা, তার যেন আর কিছুই রইল না, তার যা কিছু ছিল সব সেই মহাপরাক্রান্ত আহমদ শরীফ কেড়ে নিয়েছেন, আমি প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলাম, তারপর নিমেষে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা পচা ডোবা, আমার বাংলাদেশ, ওই ডোবা থেকে উঠে এসেছে এই ছেলে, আহমদ শরীফ স্যারের মুখে সে ঠিক কী শুনেছে বা তাঁর কী পড়েছে জানি না, তিনি তার ওই পচা ডোবায় হয়তো কয়েক ঝুড়ি মাটি ফেলে তাকে বন্ধ করে দিতে চেয়েছেন, তারপর হয়তো তাকে কোনো দিঘিতে, কোনো হাওরে, কোনো সমুদ্রে নিয়ে যেতেন, সে আমার কাছে এসে কাতর স্বরে বলছে, কী হবে? এ মুহূর্তে আমার মন চেয়েছিল রাগে জ্বলে উঠতে। কিন্তু ভেতরটা

আমার মোচড় দিয়ে উঠল। শুধু বললাম, আহমদ শরীফ স্যার তো ঠিকই বলছেন। ছেলেটা স্তব্ধ হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে তর্ক জানে না, ঝগড়া জানেন, তার রাগ নেই, যুক্তি নেই, কৌতূহল নেই। সে তার গ্রামের মসজিদ কি তার অশিক্ষিত বাবার কাছে যে অধিদৈবিক কথাগুলি শুনে এসেছে তাই আরো উন্নত গমগমে ভাষায় শুনতে পাবে বলে হয়তো ঢাকায় এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। ভিখিরি যখন বুঝতে পারে সে কিছু পাবে না, সে যেমন আর দাঁড়িয়ে থাকে না, ছেলেটা সেদিন সেইভাবে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম সে আমার কাছ থেকে কিছু কেড়ে নিয়ে যাক।

কিন্তু তাঁর ভাষা সম্পর্কে শেষে দু-এক কথা বলা না হলে কেমন করে চলে! আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে যাঁরা বিশিষ্ট গদ্যচর্চা করেছেন তাঁদের কথা এখানে বলব না, গদ্য-লেখকদের মধ্যে অভিনব ধারার গদ্য লিখেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে আহমদ শরীফকে ধরা যায়। তাঁর ভাষার সঙ্গে আর কারও ভাষার মিল নেই, আমি যতদূর জানি। যেমন ধরুন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সঙ্গে আর কারও ভাষার মিল নেই, কমল কুমার মজুমদারের সঙ্গে আর কারও ভাষার মিল নেই। তবে এই তিন জনেরই গদ্যের প্রভাব খুব বেশি না হলেও তা কারও কারও মধ্যে পড়েছে। সেটা ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে তার চেয়ে বড় প্রশ্ন, এই যে বিশিষ্ট বা অভিনব ঢঙের গদ্য এরই মূল্য বা গুরুত্ব কী সমগ্র সাহিত্যে? নিশ্চয় মূল্য আছে, কারণ তা অন্য রকম, অন্য তার স্বাদ, হয়তো অন্য জটিলতা। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার যেটা দেখা যায়, এইসব অন্য রকম গদ্য আধুনিক হয় না, অভিনবত্বের জিনিসটা বোধ হয় প্রচলিতের মাথায় চড়েই আসে, গাছের নবীন পাতার মতো, আবার ঝরে যায়, আবার আসে।

তাঁর ভাষা কঠিন নয়, কিন্তু বাক্যবন্ধ অনেক সময়ই দীর্ঘ ও জটিল। তাঁর বক্তব্য এতই জোরালো আর কথা এত বেশি যে একসঙ্গে বহু শব্দ ভিড় করে আসে। শব্দের মিছিল চলে, হাইফেন দিয়ে শব্দের মালা গাঁথেন। এইসব মালায় থাকে গুণবাচক যত শব্দ। একটা শব্দ ব্যবহার করে তাঁর তৃপ্তি হয় না, বুঝি মনে হয় ভাব অসম্পূর্ণ থেকে গেল, তাই যতগুলি প্রতিশব্দ আছে সব ব্যবহার করা চাই। হয়তো দরকার থাকে না তবু ব্যবহার করেন। এতে বক্তৃতার ঢং আসে কিন্তু ভাষা অনেক সময়ই জটিল হয়ে যায়, স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হয়। বাংলার মতো ভাষার এক-একটি শব্দ অনেক ভাব ধারণ করে, তবু অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করেন। এতে শব্দের অপচয় হয়। কিন্তু জোরালো ভাষায় তরতর করে স্বচ্ছন্দ বক্তব্য উপস্থাপন করাও একটি বৈশিষ্ট্য। যেমন, ধরুন, এই বাক্যটি : 'মানুষ, হায়রে মানুষ, শহুরে শিক্ষিত মানুষও কি আজো ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে যুক্তি-বুদ্ধি-রুচি-বিবেক-বিবেচনার আনুগত্য স্বীকারে নারাজ থাকবে?' তাঁর ভাষাকে তাঁর বক্তব্যের আবেগ খুবই তাড়িত করে।

তাঁর শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে আরও দু-একটি কথা। অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহারের ঝোঁক খুব বেশি। আগে মনে করতাম এ বুঝি কেবল আবদুল মান্নান সৈয়দের তারুণ্যের অভিনব কিছু করার নেশা। কিন্তু আসলে আহমদ শরীফ এর গুরু। অপ্রচলিত শব্দের নমুনা : লোকবন্দ্য, চিরস্মরেণ্য, অরিমিত্র, দ্রোহ, দ্রোহী, ঋদ্ধ, ঋদ্ধি, অনক্ষর, রচক, ভাবক-চিন্তক, ঊনজন, অধিজন, ইত্যাদি। শুদ্ধ লেখাও হয়তো কখনও কখনও এইসব

অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহারের প্রেরণা। কিন্তু ভাষায় আসলে প্রচলিতের মূল্য খুব বেশি, সেটাই স্বাভাবিক সহজ সুন্দর, তাকে পরিহার করে অভিনবের অকারণ প্রাদুর্ভাব ঘটালে অনেক সময়েই উদ্ভট ঠেকে। দ্রোহ, দ্রোহী, ঋদ্ধ, ঋদ্ধি, কাঙ্ক্ষা ইত্যাদি শব্দের উপসর্গবর্জিত ন্যাংটা রূপও ভালো লাগে না, সম্যক অর্থও যেন প্রকাশ পায় না। আর একটা শব্দও আজকাল খুব চালু হয়ে গেছে, আহমদ শরীফই তার জন্য দায়ী কি না জানি না। সেটি হচ্ছে 'চিন্তা-চেতনা'। কেউ আর একলা 'চিন্তা' শব্দ লিখছেন না, তার সঙ্গে অবশ্যই 'চেতনা' শব্দটিকে লাগিয়ে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু চিন্তা আর চেতনা তো একার্থক শব্দ নয়। চিন্তা সবাই করে, এবং চিন্তা ভালোও হতে পারে, মন্দও হতে পারে। কিন্তু চেতনা সবার বা সব ক্ষেত্রে না থাকতে পারে, কারণ চেতনা ভালো জিনিস, মন্দ চেতনা বলে কিছু হয় না, যেমন মুক্তিযুদ্ধের চিন্তা আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এই দুই প্রয়োগের মধ্যে অর্থের পার্থক্য অনেক। তাই চিন্তার সঙ্গে সবসময় চেতনা জুড়ে দেয়া উচিত নয়। শব্দকে বিশেষণে রূপ দিতে -ইক্ প্রত্যয়ান্ত করার তাঁর বিশেষ ঝোঁক রয়েছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও কখনও কখনও আমাদের ভাষার অভ্যাসকে আঘাত করে। তাতে উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। ভুলও যদি হয় তবু ভাষার বা শব্দের প্রচলিত ও বহুলব্যবহৃত রূপের পরিবর্তন ঘটাতে গেলেই কোনো না কোনো ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তাই নতুন কিছু করার লোভ সম্পর্কে খুবই সতর্ক থাকা উচিত।

কিন্তু আহমদ শরীফের ভাষায় জড়িয়ে থাকে তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব, যে-ব্যক্তিত্ব জড়িয়ে থাকে তাঁর চিন্তায়, মননে আর চেতনায়।

আশির দশকের ভাষার রাজনীতি ও অধ্যাপক আহমদ শরীফের চিন্তা

ইসরাইল খান

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ অধ্যাপক আহমদ শরীফের চেতনাকে গভীরভাবে আলোড়িত-আলোকিত করেছিল বলেই ভাষার প্রশ্নটি তাঁর কাছে বৃহত্তর জন-গোষ্ঠীর আর্থিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিক শোষণ মুক্তির সংকল্প ও সংগ্রামরূপে বিবেচিত হয়েছিল। তাঁর মতে, '...ভাষাই জীবন। ... মাতৃভাষা থেকে বিচ্যুত হওয়া মানে অনেকাংশে জীবনকেই খন্ডিত করা, ক্ষুদ্র করা, হয়তো-বা ব্যর্থ করা।' (ভাষার কথা/বিচিত চিন্তা)

১৯৮২ সনে ভাষার প্রশ্নেই তিনি এরশাদের সামরিক শাসনকে উপেক্ষা করে বলতে গেলে এককভাবেই, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

১৯৮২ সনে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখলের পর তাঁর পূর্ববর্তী জিয়া-সরকারের গণবিরোধী, মৌলবাদী, ধর্মব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতাকারী রাষ্ট্রনীতির অনুসারী হন এবং মুক্তিযুদ্ধের মৌলিক চেতনা বা বাঙালির 'একুশের' ও 'মুক্তিসংগ্রামের' প্রতিবাদী চেতনাকে গণমন থেকে সমূলে উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে তিনি সুদূরপ্রসারী কতিপয় প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন। লক্ষ্য ছিল : শাসন ক্ষমতায় সামরিক বাহিনীর প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব সৃষ্টির জন্যে সংবিধান সংশোধন এবং স্বকীয় শাসনকালকে দীর্ঘায়িত করার সহায়ক পরিবেশ গঠন। এজন্যে প্রথমেই আঘাত হানা হল বাঙলা ভাষা ও একুশের অনুষ্ঠানের ওপর। বাঙলা ভাষার মর্যাদা ক্ষুণ্ন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে বিনষ্ট করার জন্যে শিক্ষা-পদ্ধতি সংস্কারের মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ ও পদ্ধতিকে জটিল এবং ব্যয়বহুল করে তোলা হল। শিক্ষকতার প্রতি সকলকে অনাগ্রহী ও ভীত করে তোলার জন্য শিক্ষানীতি পরিবর্তন ও নয়া শিক্ষা-নীতি প্রবর্তনের ব্যবস্থা হল। আর এন.জি.ও. গড়ে তোলা হল অজস্র সংখ্যায়। পাশাপাশি রাষ্ট্রভাষা বাঙলাকে সর্বস্তরে প্রচলনের দাবির মতো স্পর্শকাতর বিষয় নিয়েও সৃষ্টি করা হল বিতর্কের। ভাষার রাজনীতি নিয়ে সৃষ্ট ধূম্রজালের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত রাজনৈতিক খেলার পরিণতিতে এক দশক পরে দেখা যায় তদানীন্তন সরকার জনগণকে পাকিস্তানী রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।

এরশাদ সরকার তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর আবদুল মজিদ খানকে প্রথমেই শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজাবার নির্দেশ দেয়। শিক্ষামন্ত্রী প্রায় ছয় মাসের মধ্যেই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে দুটি বিদেশী ভাষা বাধ্যতামূলকভাবে প্রবর্তনের সুপারিশসহ নতুন শিক্ষানীতির (১৯৮২) সুপারিশ করেন। অতঃপর সরকারিভাবে যেসব উদ্যোগ গৃহীত হয়, তাতে ধর্মব্যবসায়ীরা উল্লসিত হয়। কারণ সরকারি রাজনীতির স্বার্থে তাঁদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। সরকার ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণার অভিপ্রায়ও বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করতে থাকে। পত্রিকায় ঘোষণা দেয়া হয় : চিরাচরিত কায়দায় একুশে উদযাপিত হবে না। একুশের দিনে শহীদ মিনারে হবে কুরআন-তেলাওয়াত, ওয়াজ-নছিহত ইত্যাদি।

একুশের চেতনার ধারক-বাহকগণ কী করবেন তখন? সকলেই দিশাহারা। কারণ, ২৪ মার্চ ১৯৮২ থেকে বিরাজমান অব্যাহত সামরিক শাসনের ফলে বাক্, ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অপহৃত। সত্যকথা বলার অধিকার যেমন রইল না, পত্রপত্রিকায় এর বিরোধিতাকেও প্রশ্রয় দেয়া হল না। রাজনীতি করার, আত্মস্বার্থে বা গণস্বার্থে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের জন্য সভা-সমিতি, মিছিল, হরতাল ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মৌলিক অধিকারও দেশের মানুষের নেই। সামাজিক রাজনৈতিক সকল দিক দিয়ে অবক্ষয়কবলিত বাংলাদেশের সামাজিকগণ এক স্থবিরতার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। প্রচন্ড দাপটের সামরিক সরকারের অত্যাচারের ভয়ে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল বা নেতৃবৃন্দেরও কেউ অগ্রসর হয়ে দুকথা বলার সাহস পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন।

সকলেই সন্ত্রস্ত, দুর্নীতির দায়ে কে কখন সামরিক আইনে গ্রেফতার হয়। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় চিন্তাবিদ, অগণতান্ত্রিক সমাজ ও শাসনের বিরুদ্ধে আজীবন নিরাপোষ সংগ্রামী অধ্যাপক আহমদ শরীফের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত 'বাঙলাদেশ ভাষা সমিতি' প্রথম ঐ গণবিরোধী শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে এক বিবৃতি প্রদান করে দেশবাসীর মনে প্রতিবাদের সাহস সঞ্চার করে। ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেন সংগ্রামীদের। আশির দশকের রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহের নেতৃত্বদানে আহমদ শরীফ যে অবদান রাখেন তা অবিস্মরণীয় ইতিহাসের অন্তর্গত হয়ে রয়েছে। কারণ ঐ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায়ই স্বৈরাচারী এরশাদের পতন এবং নব্বইয়ের দশকের গণতান্ত্রিক পারিপার্শ্বিকতার পথ সুগম হয়। বিগত চল্লিশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি জাতীয় প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন সময়ে অনেক বিবৃতি দিয়েছেন কিংবা আন্দোলনের আহ্বান জানিয়েছেন।

৩.

অধ্যাপক আহমদ শরীফের স্বাক্ষরে মজিদ খানের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে দেয়া 'বাঙলাদেশ ভাষা সমিতি'র বিবৃতিটি প্রকাশিত হয় 'বাংলার বাণী' পত্রিকায়। অন্য কোনো পত্রিকায় সম্ভবত সরকারি ক্রোধের ভয়ে প্রকাশিত হয়নি। ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ তারিখের বাংলার বাণীতে "নয়া শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে ভাষা সমিতি—প্রাথমিক স্তরে বিদেশী ভাষা বর্জনের আবেদন" শীর্ষক খবরে বলা হয় :

"গতকাল বুধবার এক বিবৃতিতে বাঙলাদেশ ভাষা সমিতি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে দুটি বিদেশী ভাষা বাধ্যতামূলকভাবে প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের

কাছে আবেদন জানিয়েছেন। .... আমরা মনে করি, প্রথম শ্রেণীতে আরবি ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরেজি বাধ্যতামূলক করা অবৈজ্ঞানিক ও শিশু মনোবিজ্ঞানের নীতি-বিরোধী এবং সেজন্যেই ক্ষতিকর। ... দুটো বিদেশী ভাষা বাঙলাদেশের কোমলমতি শিশুদের মাথায় চাপিয়ে দিলে এদেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মৌলিক শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। ....”

এই বিবৃতিটি ১৯৮২ সনে ব্যাপক গণআন্দোলনের সূচনা করে। ১৯৬২'র শিক্ষানীতি বাতিলের গণদাবির পর সৃষ্ট বিরাট গণ-বিক্ষোভ রূপে একে চিহ্নিত করা যায়। শিক্ষানীতি বাতিলের লক্ষ্যে গোটা দেশের ছাত্র সমাজকে এবং দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনকে সামরিক আইনের বিধি নিষেধ ভেঙ্গে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। এই গোটা রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন ডক্টর আহমদ শরীফ। বিবিসির খবরে তখন এইরূপ মন্তব্য করা হয়।

অধ্যাপক আহমদ শরীফের অগ্রগমনে, প্রতিবাদ প্রতিরোধের আহ্বানে যে জনগণ সাড়া দেয়, গোটা দেশ সচকিত অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তৎকালীন পত্র-পত্রিকা ঘাটলেও। মজিদ খানের শিক্ষানীতি সম্পর্কে অন্য কোনো পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন বা প্রতিবাদ তখন কোথাও ছাপা হয়নি। আহমদ শরীফ এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ লিখে, শিক্ষানীতির গণবিরোধী চরিত্র ব্যাখ্যা করেছেন। তাতেই ধরা পড়েছে তাঁর ভাষা-চিন্তাও। সেই প্রবন্ধ দুটির পরিচয় প্রদানের পূর্বে সেকালের পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর অন্যান্য বিবৃতি এবং সাক্ষাৎকার এর মধ্য থেকে কয়েকটির সূত্র উল্লেখ করা হল :

১. 'দৈনিক দেশ' পত্রিকার ৫ অক্টোবর ১৯৮২ সংখ্যায় আহমদ শরীফ স্বাক্ষরিত একটি পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি প্রকাশিত হয়—শিরোনাম “শিক্ষা-ব্যবস্থা বিষয়ে গণদাবি ও কিছু সুপারিশ, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান শুরু”। নিবন্ধের শীর্ষে যোগকৃত এই টীকাটি লক্ষণীয় : 'শিক্ষাব্যবস্থা বিষয়ে গণদাবি' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে তা বিবেচনার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রদান করা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আহমদ শরীফের স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়েছে।

২. দু'দিন পরে, ৭ অক্টোবর ১৯৮২ সনের দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত 'নতুন শিক্ষানীতির ক্ষতিকর দিক শীর্ষক প্রবন্ধের টীকায় বলা হয় : “পত্রস্থ প্রবন্ধটিতে সম্প্রতি ঘোষিত শিক্ষানীতি প্রশ্নে নিজস্ব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ডক্টর আহমদ শরীফ”।

৩. দৈনিক ইত্তেফাকের ১০ অক্টোবর ১৯৮২ তারিখের সংখ্যায় অধ্যাপক আবুল ফজল, অধ্যাপক আহমদ শরীফ ও অধ্যাপক আনিসুজ্জামানসহ দেশের খ্যাতনামা ১৫ জন শিক্ষাবিদ ঐ শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রদান করেন।

৪. ১১ অক্টোবর ১৯৮২-তে 'গণকণ্ঠ' পত্রিকায় ডক্টর আহমদ শরীফের আরও একটি সচিত্র সাক্ষাৎকার ও বিবৃতি প্রকাশিত হয়। অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল :

“প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষা চাপালে শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণ কঠিন হয়ে পড়ে। কাজেই কেবল আরবি নয়, যে কোনো ভাষা চাপানোই অনুচিত। ... আরবি হল ইহুদি, খ্রিষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি আরববাসীর মাতৃভাষা। মানুষের সম্পর্ক তার শাস্ত্রের সঙ্গে, ভাষার সঙ্গে নয়। .... ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করা হলে জাতীয়

ভাষার প্রতি মনোযোগ ক্ষুণ্ন হবে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে ড. আহমদ শরীফ বলেন, জাতীয় ভাষার প্রতি মনোযোগ ক্ষুণ্ন হবার কথা ওঠে না, তবে ক্ষতি হবে অন্য কারণে। প্রথম কারণ প্রাথমিক স্তরে একাধিক ভাষা চাপানো শিক্ষাবিদদের মতে অবৈজ্ঞানিক। দ্বিতীয়ত, আমাদের গাঁয়ে-গঞ্জে প্রাথমিক স্কুলের অধিকাংশ ছাত্র নিরক্ষর গরিব ঘরের সন্তান। ঘরে এবং স্কুলে কারো সাহায্য ছাড়া ইংরেজি আয়ত্ত করা শিক্ষার্থীদের পক্ষে সম্ভব আগেও কখনও হয়নি, এখনও হবে না। ফলে ইংরেজির ভয়েই শিক্ষার্থীরা স্কুল পালাবে এবং এভাবে শিক্ষার প্রসার রুদ্ধ হবে।"

'নতুন শিক্ষানীতির ক্ষতিকর দিক' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লেখেন :

'আমাদের দেশে জরুরি হচ্ছে মাতৃভাষার মাধ্যমে বাধ্যতামূলক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা। এটি হবে পরীক্ষা ব্যবস্থাবিহীন পাঁচ বছরের পাঠসূচীভিত্তিক। স্বাধীন বাংলাদেশে রাষ্ট্রভাষা বাঙলা। বাঙলা জানাটাই কেবল নির্বিশেষে বাঙালির পক্ষে আবশ্যিক। অবশ্য ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের জন্যে বহির্বিশ্বের সঙ্গে রাজনীতিক-কূটনীতিক সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনে এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্য চালানোর গরজে আমাদের ইংরেজি অথবা রুশ, ফরাসি, জার্মান, স্প্যানিশ ভাষা জানা জরুরি। কিন্তু তা দেশের নয় কোটি লোকের জানার দরকার হবে না। স্কুলে পড়ুয়াদের তো নয়ই। মেধাবী-যারা উচ্চশিক্ষা অর্জন করবে, ধনী—যারা ব্যবসায়-বাণিজ্যে পুঁজি খাটাবে, বুদ্ধিমান ও বিত্তবান—যারা শিল্প কারখানা গড়ে তুলবে; বিদ্বান—যারা প্রশাসন চালাবে ও দূতাবাসে কাজ করবে আর যারা বাণিজ্য ও বন্দর এলাকায় কর্মচারী হিসেবে কাজ করবে কিংবা বিজ্ঞানী ও কৃৎকৌশলী হবে কেবল তাদেরই আরবি, ইংরেজি, রুশ, জার্মান, চীনা, ফরাসি প্রভৃতি পৃথিবীর নানা ভাষার একটা দুটো ভাষা শিখতে হবে। এজন্য দেশশুদ্ধ সব শিক্ষার্থীর উপর প্রাথমিক বিদ্যালয়েই একাধিক ভাষা চাপিয়ে দেয়া পৃথিবীর হালের শিক্ষাবিদদের মতে অবৈজ্ঞানিক, অবাঞ্ছিত ও অপ্রয়োজনীয় নয় কেবল, শিশুর সামর্থ্যের উপরও জুলুম মাত্র। মাতৃভাষা ব্যতীত এ স্তরে আরো দুটো ভাষা চাপিয়ে দেয়া মানেই শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির ও ধীশক্তির স্বাভাবিক বিকাশ পথ রুদ্ধ করা। যে কোনো ভাষা বলার ও লেখার সামর্থ্য অর্জন করতে একজন আগ্রহী লোকের দুতিন বছরের বেশি সময় লাগতেই পারে না। ... কাজেই ইংরেজি, আরবি প্রভৃতি যে কোনো ভাষা মাধ্যমিক স্তরে বা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়েও শেখানো যায়। অতএব এজন্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিভাষা আরবি ও ইংরেজি চালু করলে ক্ষতি হবে নানা প্রকার ...।"

শিক্ষানীতির প্রতিবাদে উপর্যুক্ত বক্তব্য বিবৃতি প্রবন্ধ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হলে নতুন শিক্ষানীতি তথা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ক্রমান্বয়ে জনমত গড়ে ওঠে এবং আন্দোলনের পটভূমি তৈরি হয়। ছাত্র বিক্ষোভ ঘনীভূত হয় এবং তা প্রকাশ্য বিস্ফোরণের সুযোগ ঘটায়। কায়েমী স্বার্থবাদীরা ছাত্র সমাজকে সামরিক আইন দ্বারা আরোপিত বিধি নিষেধে স্তব্ধ করে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকলেও, এই সূত্রে (শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে) বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি শুরু হয়ে যায়। দেশের ভেতরে এবং বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকা থেকে উস্কানিমূলক প্রচারণা দিয়ে এমন পরিবেশ গড়ে তোলা হয় যে, ছাত্ররা যথেষ্ট বিপ্লবী হয়ে ওঠে এবং সামরিক আইনের কড়াকড়ি তাঁদের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। আশির দশকের শুরুতে ছাত্র-

বুদ্ধিজীবীরাই রাজনৈতিক নেতাদেরকে রাজনীতির অধিকার ফিরে পেতে সহায়তা করে। বস্তুত এই দশকের রাজনীতি বলতে তাই অনেকাংশে ছাত্র রাজনীতি আর বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতিকে বোঝায়। এই সময়ে ছাত্রদের নির্দেশে আর বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতিতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পরিচালিত হয়েছেন মাত্র। কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষেই সম্ভব হয়নি ছাত্র সংগঠনগুলোকে উপেক্ষা করা। আর ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের বুকে পায়ে সাহস সঞ্চার করে দিক নির্দেশ দিয়ে, আর প্রতিবাদের যুক্তি, তর্ক ও ভাষা তুলে দিয়ে সাহায্য করেছিলেন চিন্তাবিদ, আমৃত্য বিদ্রোহী অধ্যাপক আহমদ শরীফ। কারণ তাঁর অন্তস্থিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চরিত্রের মূলে ছিল মাতৃভাষা প্রেম। আশি বছরের জীবনে তিনি মাতৃভাষায় লিপিবদ্ধ বাঙালির চিন্তা-চেতনার ফসল আহরণ অনুশীলন করেও ছিলেন অক্লান্ত; কারণ মাতৃভাষা, মাতৃজাতি ও মাতৃসাহিত্যপ্রেমে তিনি ছিলেন মোহিত। এজন্যেই কর্মে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ।

তাঁর স্মৃতি অক্ষয় হোক।

অগ্রসর চেতনার আলোকে অধ্যাপক আহমদ শরীফ

আইউব চৌধুরী

আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানের মতে মানুষই ইতিহাস সৃষ্টি করে। অপর কথায় সমাজের ব্যাপক সাধারণ মানুষ ইতিহাস সৃষ্টি করে। সমাজের ব্যাপক সাধারণ মানুষই ইতিহাসের নিয়ন্তা বা নিয়ামক শক্তি। এই অর্থে সমাজের কোনো একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ বা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বও ইতিহাস সৃষ্টি করেন। তবে মানুষ ইতিহাস সৃষ্টি করে ইতিহাসের সাহায্য নিয়ে। মানুষ ইতিহাস সৃষ্টি করে বহুলাংশে ইতিহাস থেকে পাওয়া নানা রকম অনুকূল পরিস্থিতি বা ঘটনার সাহায্য নিয়ে। এ কথা সামাজের ব্যাপক সাধারণ মানুষ এবং কোনো একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ বা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে মূলত সমভাবে প্রযোজ্য। আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানের মতে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কোনো একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ বা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে বা বিকাশ ঘটে মূলত ইতিহাসের প্রয়োজনে। তবে সমাজে কোনো একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ বা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবজেকটিভ কারণ এবং সাবজেকটিভ কারণ বিদ্যমান থাকে বা ক্রিয়াশীল থাকে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের কোনো একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ বা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের যথার্থ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা বিষয়ক বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বগত ধারণাগুলো বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

এ কথা সুবিদিত সত্য যে ব্যক্তির জীবনের বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তির পরিশ্রম ও সততা হল অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ মানবিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য। পারিবারিক জীবনে বা সমাজ জীবনে পরিশ্রম ও সততার কারণে একজন মানুষ ক্রমশ মেধাবী, সাহসী, বিবেকবান ও ন্যায়পরায়ণ হয়ে ওঠেন। প্রধানত নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম ও ঋজুবদ্ধ সততার কারণে বাঙলাদেশের সুশিক্ষিত সমাজে আহমদ শরীফ প্রিয় স্যারে পরিণত হন। মাত্র কয়েকজন যাকে সত্য বলে তাকে নয়, বিশজন যাকে সত্য বলে তাকে খুঁজেছেন বলেই বাঙলাদেশের সুশিক্ষিত সমাজে আহমদ শরীফ শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আহমদ শরীফে পরিণত হন।

সাধারণত সমাজে যারা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সুপরিচিত এবং তার দ্বার অনুপ্রাণিত তারাই হলেন আধুনিক মানুষ। এই অর্থে অধ্যাপক আহমদ শরীফ হলেন সাবেক পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব বাঙলার অন্যতম প্রথম আধুনিক মানুষ।

আরও সুনির্দিষ্ট করে বলা প্রয়োজন তিনি হলেন সাবেক পূর্ব বাঙলার মুসলিম সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণকারী অন্যতম প্রথম আধুনিক মানুষ।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন সাবেক পূর্ব বাঙলার মুসলিম সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণকারী আবুল মনসুর আহমদ, আবুল ফজল, জসিম উদ্‌দীন, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ ও বেগম সুফিয়া কামাল ছিলেন মোটামুটি তার সমসাময়িক আধুনিক মানুষ। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরিশচন্দ্র মুখার্জি, মীর মশাররফ হোসেন, সৈয়দ আহমদ খান, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ ছিলেন ভারতবর্ষের অন্যতম প্রথম আধুনিক মানুষ। যদিও ভারতবর্ষের এসকল প্রথম আধুনিক মানুষের ছিল নানারকম গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা।

বাঙালি জাতির (পূর্ব বাঙলা ও পশ্চিম বাঙলার ব্যাপক জনসাধারণের) ইতিহাসে অধ্যাপক আহমদ শরীফ একজন প্রগতিশীল বিবেকবান শ্রেষ্ঠ বাঙালি। অপর কথায় তিনি হলেন একজন প্রগতিশীল শ্রেষ্ঠ বাঙালি সাহিত্যিক লেখক বুদ্ধিজীবী। তবে এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন অধ্যাপক আহমদ শরীফ সাবেক পূর্ব বাঙলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গড়ে উঠেন মূলত অবহেলিত, পশ্চাদপদ ও নিপীড়িত পূর্ব বাঙলার ভৌগোলিক ভূখণ্ডে বা জনপদে।

অধ্যাপক আহমদ শরীফের জীবন বিকশিত হয়েছে বাঙলাদেশের শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বিরোধ ও ঐক্যের পরিমণ্ডলে। সাবেক পূর্ব বাঙলার শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিভিন্ন সময় সংগঠিত ও সংঘটিত ঐতিহাসিক সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সংগ্রামগুলোর প্রকৃতি বা চরিত্রের দ্বারা তার মৌলিক চিন্তাভাবনাগুলো বা ধ্যান ধারণাগুলো অনেকাংশে গঠিত, প্রভাবান্বিত ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তাই অধ্যাপক আহমদ শরীফ প্রধানত বাঙলাদেশের (সাবেক পূর্ব বাঙলা) বাঙালি জাতির ব্যাপক জনসাধারণের ইতিহাসে একজন প্রসিদ্ধ ও প্রজ্ঞাবান প্রগতিশীল চিন্তাবিদ ও চিন্তানায়ক।

অধ্যাপক আহমদ শরীফের সুদীর্ঘ জীবন ছিল ঘটনাবহুল, বৈচিত্র্যপূর্ণ, বর্ণাঢ্য ও চিত্তাকর্ষক। তিনি একই সঙ্গে ছিলেন বড় শিক্ষক, গবেষক, লেখক, চিন্তাবিদ ও সংগঠক। তিনি ছিলেন একজন পরিশ্রমী, সাহসী, মেধাবী, স্পষ্টবাদী ও সত্যবাদী ব্যক্তিত্ব। অধ্যাপক আহমদ শরীফ ছিলেন সত্যকার অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ। অধ্যাপক আহমদ শরীফ ছিলেন মুক্তমন বা মুক্ত চিন্তাভাবনার অধিকারী। তিনি ছিলেন মুক্তবুদ্ধি চর্চার বলিষ্ঠ প্রবক্তা।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ ছিলেন একজন শক্তিশালী ও বিচক্ষণ সমালোচক। বাঙলা সাহিত্যে তার ভাষা ভঙ্গি অত্যন্ত সুবিন্যস্ত, সাবলীল ও বিচিত্রময় বলে সমাদৃত। ক্রমান্বয়ে বিকশিত তার ভাষা ভঙ্গি বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক লেখক বুদ্ধিজীবী বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্ট ভাষা ভঙ্গি বা বঙ্কিমধারার শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক বলে স্বীকৃত। অধ্যাপক আহমদ শরীফ ছিলেন দীর্ঘায়ু এবং তার সমগ্র জীবন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তার লেখনী ছিল অবিশ্রান্ত।

আমাদের সমাজে অনেক সময় দেখা যায় ছাত্রজীবনে যারা অসাধারণ ভাল রেজাল্ট করেন কিন্তু পরবর্তীকালে গভীর অধ্যয়ন ও অনুশীলনের অভাবে তারা অনেকে

অবিশ্বাস্যরকম আত্মকেন্দ্রিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। এদের এককালীন মেধাশক্তি প্রতিক্রিয়াশীল পথে নিয়োজিত হয় নতুবা ক্রমশ অনিবার্য কারণে নির্জীব হয়ে পড়ে। অধ্যাপক আহমদ শরীফ ছাত্রজীবনে অসাধারণ ভাল রেজাল্ট করেননি একথা সত্য। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি সুদীর্ঘকাল ও একটানা গভীর অধ্যয়ন ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে নিজের চিন্তাভাবনা ও ধ্যান ধারণাকে অত্যন্ত উঁচু মাত্রায় উন্নীত করতে সক্ষম হন। বাঙলাদেশের সমাজে এরকম ঘটনা সত্যই বিরল।

আমাদের মতে অধ্যাপক আহমদ শরীফের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ দিকটি হল তিনি ছিলেন একজন উন্নতমানের শিক্ষক। তিনি দীর্ঘদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের একজন বিশিষ্ট সফল সার্থক শিক্ষক ছিলেন। তিনি একই সঙ্গে আদর্শ শিক্ষক ছিলেন বাঙলাদেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, সমাজ জীবনে ও পারিবারিক জীবনে। অনেকটা প্রাচীন মহান গ্রীক দার্শনিক ও শিক্ষকগণের মতো অধ্যাপক আহমদ শরীফ তার নিজের গৃহকেও বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ মৃত্যুবরণ করার আগ পর্যন্ত প্রায় তিন দশক যাবৎ নিজ গৃহে একটানা নিয়মিত সাপ্তাহিক ঘরোয়া আলোচনা সভার (আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মত বিনিময় সভা) আয়োজন করেন। এই আলোচনা সভায় নিয়মিত দেশ বিদেশের সমকালীন অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির উপর আন্তরিক বিতর্ক, সংলাপ ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বাঙলাদেশের সমাজে এরকম আলোকোজ্জ্বল ঘটনা সত্যই বিরল।

একথা সত্য যে অধ্যাপক আহমদ শরীফ কর্তৃক নিজ গৃহে আয়োজিত ঘরোয়া মত বিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করে বাঙলাদেশের বহুসংখ্যক প্রবীণ ও নবীন কবি সাহিত্যিক লেখক বুদ্ধিজীবী গবেষক, সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মী ও রাজনৈতিক কর্মী বিশেষভাবে লাভবান হন। তবে একথাও সত্য যে তিন দশকের উপরোক্ত ঘরোয়া মত বিনিময় সভার মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি লাভবান হন অধ্যাপক আহমদ শরীফ নিজেই। অগ্রসর জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ঘরোয়া আলোচনা সভার এই ব্যতিক্রমধর্মী প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে তিনি একজন সর্বাঙ্গীণ শিক্ষকে পরিণত হন।

বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অধ্যাপক আহমদ শরীফের উল্লেখযোগ্য অবদান হলো বাঙলা সাহিত্য বিষয়ক তার বিশিষ্ট সৃজনশীল গবেষণামূলক রচনা। অধ্যাপক আহমদ শরীফ অক্লান্ত পরিশ্রম ও গভীর অভিনিবেশ সহকারে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস বিশেষত মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস গবেষণা করেন। এই গবেষণার মাধ্যমে তিনি বাঙলা সাহিত্যের প্রকৃত ইতিহাস বা বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করেন।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যে বিশিষ্ট সৃজনশীল মাত্রা সংযোজন করেন তা হল মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে, মুসলিম সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণকারী লেখকদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান সঠিকভাবে ও সার্থকভাবে চিহ্নিত করা। অধ্যাপক আহমদ শরীফ বাঙলা সাহিত্যের প্রগতিশীল গণসাহিত্যের অংশগুলো বিশেষত মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের প্রগতিশীল গণসাহিত্যের অংশগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি বিভিন্ন যুগের বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশগুলো বহুলাংশে চিহ্নিত করতে সক্ষম হন।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন অধ্যাপক আহমদ শরীফ বিরামহীন পরিশ্রম ও গভীর প্রত্যয় সহকারে বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্ন কালপর্বের প্রসিদ্ধ কবি সাহিত্যিক লেখক বুদ্ধিজীবীর জীবন ও রচনাবলির বিচারমূলক সমালোচনা করেন। এই অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ কাজটির মধ্য দিয়ে তিনি বিশেষত ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ বাঙালি কবি সাহিত্যিক লেখক বুদ্ধিজীবীগণের মৌলিক পরিচয় তুলে ধরতে বহুলাংশে সক্ষম হন।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ রবীন্দ্র সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক দিকগুলো (বিশেষত রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক আধুনিক বাঙলা ভাষার বিনির্মাণ ও পুনর্গঠন বিষয়ক অবদান এবং ভারতবর্ষের সমাজে বিদ্যমান ধর্মীয় কুসংস্কার বিরোধী সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রগতিশীল ধারা বিনির্মাণ ও পুনর্গঠন বিষয়ক অবদান) অতিশয় দক্ষতার সাথে তুলে ধরেন। তিনি একই সঙ্গে রবীন্দ্র সাহিত্যের অসম্পূর্ণতা বা সীমাবদ্ধতাগুলো দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরতে অনেকাংশে সক্ষম হন।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ অতুলনীয় স্পর্ধা, সাহস এবং প্রখর মেধা সহকারে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কবি সাহিত্যিক লেখক বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও রচনাবলির বিচারমূলক সমালোচনা করেন। যা কিনা আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের বিচারমূলক সমালোচনার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। প্রকৃতপক্ষে অধ্যাপক আহমদ শরীফ বাঙলা ভাষার সমালোচনা সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধশালী করেন।

এখানে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন অতীতে বাঙলাদেশের (পূর্ব বাঙলা) আরও কয়েকজন প্রগতিশীল সাহিত্যিক লেখক বুদ্ধিজীবী বিভিন্ন সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিচারমূলক সমালোচনা করার চেষ্টা করেন। এসকল প্রগতিশীল সাহিত্যিক লেখক বুদ্ধিজীবী কর্তৃক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিচারমূলক সমালোচনা যথেষ্ট গুরুত্ব পাওয়ার দাবি রাখে। কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন কারণে (গভীর অধ্যয়ন ও আন্তরিক অনুশীলনের অভাবের কারণে এবং নানারকম সুযোগ সুবিধা বা বৈষয়িক স্বার্থের কারণে) এদের মধ্যে অনেকে এক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান আমূল পরিবর্তন করেন।

এক সময়কার এসকল প্রগতিশীল সাহিত্যিক লেখক বুদ্ধিজীবী এক পর্যায়ে যান্ত্রিক বা অন্ধ রবীন্দ্র বন্দনার হাস্যকর ও লজ্জাকর কর্মে নিজেদের নিয়োজিত করেন। এক্ষেত্রে অধ্যাপক আহমদ শরীফের ভূমিকা সত্যই ব্যতিক্রম। অধ্যাপক আহমদ শরীফ আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কবি সাহিত্যিক লেখক বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন, রচনাবলি ও চিন্তাভাবনার বিচারমূলক সমালোচনা করার ক্ষেত্রে কোনো কারণে কখনও মূলত তার অবস্থান পরিবর্তন করেননি।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ একজন সচেতন প্রগতিশীল লেখক বুদ্ধিজীবী হিসেবে সমাজে বিদ্যমান সকল প্রকার শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিলেন সারা জীবন দ্রোহী ও প্রতিবাদী। সাবেক পূর্ব বাঙলার বাঙালি জাতির ব্যাপক জনসাধারণের উপর পাকিস্তানী স্বৈরাচারী বুর্জোয়া রাষ্ট্রের শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি জোরালো ভাষায় প্রতিবাদ করেন। পাকিস্তান আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সকল প্রকার শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদা ন্যায়সঙ্গত ও প্রগতিশীল অবস্থান গ্রহণ করেন।

্যাপক আহমদ শরীফ পূর্ব বাঙলার বাঙালি জাতির ব্যাপক জনসাধারণের বায়ান্নোর ষা আন্দোলন (অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙলা ভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন) এবং টের দশকে পূর্ব বাঙলার বাঙালি জনগণের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে াতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন) নানাভাবে সমর্থন করেন ও গঠিত করেন। পাকিস্তান আমলে তিনি পূর্ব বাঙলায় সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও ষড়যন্ত্র শেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার ছিলেন।

্যাপক আহমদ শরীফ সাবেক পূর্ব বাঙলায় প্রগতিশীল সামাজিক সাংস্কৃতিক ন্দোলনের ধারায় নতুন মাত্রা সংযোজন করতে সক্ষম হন। জাতি নিপীড়ক পাকিস্তান র্জোয়া রাষ্ট্র কর্তৃক বাঙলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর সকল ষড়যন্ত্র ও আক্রমণকে নি বলিষ্ঠভাবে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসেন। পাকিস্তান স্বৈরাচারী বুর্জোয়া রাষ্ট্র র্তৃক সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠতা ও সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিবাদ জানান এবং ঐক্যবদ্ধ তরোধ গড়ে তুলেন।

টের দশকে সামরিক ও আধা সামরিক বুর্জোয়া স্বৈরতন্ত্র এবং ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীল ম্র বৃত্তের মধ্যেও অধ্যাপক আহমদ শরীফ প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন পূর্ব বাঙলার াপক মেহনতী জনসাধারণের মুক্তির একমাত্র পথ সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম। সেই য় সাবেক পূর্ব বাঙলায় উচ্চতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত একজন শিক্ষকের পক্ষে াশ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও সমাজতন্ত্র-কমিউনিজমের নীতি ও আদর্শকে সমর্থন ার জন্য বড় রকম সাহসের প্রয়োজন ছিল।

ধীনতা যুদ্ধোত্তর বাঙলাদেশের সমাজে বিদ্যমান শোষণ নির্যাতন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ্যাপক আহমদ শরীফ অধিকতর পরিণত দ্রোহী ও প্রতিবাদী হয়ে উঠেন। তিনি ঙলাদেশের প্রত্যেকটি বুর্জোয়া স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের (শেখ মুজিবুর রহমান ও ওয়ামী লীগের বেসামরিক বুর্জোয়া স্বৈরতান্ত্রিক সরকার, খন্দকার মোস্তাকের সামরিক র্জোয়া স্বৈরতান্ত্রিক সরকার, জিয়াউর রহমান ও বিএনপির সামরিক আধা সামরিক র্জোয়া স্বৈরতান্ত্রিক সরকার, এরশাদ ও জাতীয় পার্টির সামরিক আধা সামরিক বুর্জোয়া রতান্ত্রিক সরকার, খালেদা জিয়া ও বিএনপির বুর্জোয়া পার্লামেন্টারী স্বৈরতান্ত্রিক াকার এবং শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের বুর্জোয়া পার্লামেন্টারী স্বৈরতান্ত্রিক াকার) শোষণ ও নির্বাচনের বিরুদ্ধে নানাভাবে সুদৃঢ় প্রতিবাদ করেন এবং প্রতিরোধ ড় তুলেন।

্যাপক আহমদ শরীফ স্বাধীনতা যুদ্ধোত্তর বাঙলাদেশে সত্তরের দশক, আশির দশক নব্বইয়ের দশকে সকল প্রকার সাম্রাজ্যবাদ (বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও রুশ শোধনবাদী সাম্রাজ্যবাদ) এবং সকল প্রকার আঞ্চলিক আধিপত্যবাদের (বিশেষত রত, পাকিস্তান ও সৌদি আরবের আধিপত্যবাদ) শোষণ, ষড়যন্ত্র ও প্রভাবের বিরুদ্ধে াচ্চার ছিলেন।

মাদের মতে অধ্যাপক আহমদ শরীফ আশির দশক ও নব্বইয়ের দশকে ঙলাদেশের প্রগতিশীল সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারায় আরও নতুন এবং ত্যয়সিদ্ধ মাত্রা সংযোজন করতে সক্ষম হন। তিনি সত্যকার ধর্মনিরপেক্ষতা ও াম্প্রদায়িকতার আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে, বাঙলাদেশের ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীল

রাজনৈতিক শক্তি ও সামাজিক সাংস্কৃতিক শক্তির ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে যুক্তিনিষ্ঠ ও ক্ষুরধার লেখা রচনা করেন।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রগতি ও মানবতা বিরোধী উপরোক্ত প্রতিক্রিয়াশীল কুৎসিত ধারার বিরুদ্ধে নানারকম প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তিনি বাঙলাদেশের ব্যাপক মেহনতী জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত দাবিদাওয়ার প্রতি আন্তরিক সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তিনি বাঙলাদেশের সমাজে নারী নির্যাতন বন্ধ এবং নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে বলিষ্ঠভাবে সমর্থন করেন। অধ্যাপক আহমদ শরীফ বাঙলাদেশের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন বা জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতি আস্থাবান ছিলেন।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন অধ্যাপক আহমদ শরীফ বাঙলাদেশের চিহ্নিত প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে এবং প্রগতিশীল নামধারী বুদ্ধিজীবীদের সুবিধাবাদী আপোসমূলক চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার ছিলেন।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ বাঙলাদেশে প্রগতিশীল বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনে সত্যকার প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী এবং প্রগতিশীল নামধারী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যকার পার্থক্যগুলোকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চিহ্নিত করেন। বাঙলাদেশের প্রগতিশীল নামধারী সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবীদের নিকট অধ্যাপক আহমদ শরীফ ছিলেন এক ধরনের ভয় ভীতির কারণ বা বাধা বিপত্তির কারণ। অধ্যাপক আহমদ শরীফ ছিলেন বাঙলাদেশের প্রগতিশীল সৃজনশীল বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের বলিষ্ঠ ও সংগ্রামী কণ্ঠস্বর।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ বাঙলাদেশের আশির দশক ও নব্বইয়ের দশকে অধিকতর বলিষ্ঠভাবে ও সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে বাঙলাদেশের ব্যাপক মেহনতী জনসাধারণের মুক্তির একমাত্র পথ সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম। অথচ এসময়ে অজ্ঞতা ও হতাশার কারণে এবং নানারকম সুযোগ সুবিধা বা বৈষয়িক স্বার্থের কারণে বাঙলাদেশের নামকরা প্রবীণ প্রগতিশীলরা বা নবীন কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীগণ সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের নীতি ও আদর্শ পরিত্যাগ করতে শুরু করেন।

এক সময়কার এসকল প্রগতিশীল বা কমিউনিষ্ট বুদ্ধিজীবীর বড় অংশটি ক্রমশ প্রধানত বাঙলাদেশের প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের একরকম ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীতে পরিণত হন। এদের মধ্যে ক্ষুদ্র অংশটি ক্রমশ বাঙলাদেশের প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীল বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল বিএনপির একরকম ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীতে পরিণত হন।

পাকিস্তান আমলে ও বাঙলাদেশ আমলে অধ্যাপক আহমদ শরীফ তার মৌলিক চিন্তাভাবনাগুলোর বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সময় তিনি বিভিন্ন রকম প্রগতিশীল সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনে (রাজনৈতিক চরিত্রবিশিষ্ট) নিজেকে সংযুক্ত করেন। তবে বাঙলাদেশ আমলে প্রগতিশীল সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারাকে (ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক ও ব্যাপক মেহনতী জনসাধারণের স্বার্থরক্ষক গণতান্ত্রিক চরিত্রবিশিষ্ট) বিকশিত করার লক্ষ্যে তিনি নিজেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলেন। এসময়ে তিনি বাঙলাদেশের (পূর্ব বাঙলা) কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিশেষত অগ্রসর কমিউনিস্ট আন্দোলনের শক্তিশালী মিত্র হয়ে ওঠেন।

উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক বিরোধ এবং অধ্যাপক আহমদ শরীফের প্রাসঙ্গিকতা

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মানব বিকাশের আন্তর্জাতিক মাপদণ্ডে ভারতীয় উপমহাদেশের তিনটি দেশের অবস্থানই নিচের দিকে। অর্থাৎ গড় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং মানবাধিকারের মান পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ–তিনটি অর্ধ শতাব্দীরও অধিক পূর্বে স্বাধীন হওয়া রাষ্ট্রে পৃথিবীর অধিকাংশ স্বাধীন রাষ্ট্রের তুলনায় কম তো বটেই, এমনকি আধুনিক মানদণ্ডে নিতান্তই অপর্যাপ্ত। অথচ তিনটি দেশেই প্রাকৃতিক সম্পদ মোটামুটি আছে। অধিকন্তু এর সব কয়টি দেশই বিদেশী ঋণে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। তবু এই অবস্থা! দেশ তিনটির মধ্যে এক্ষেত্রে উনিশ-বিশের তফাত থাকলেও জাগতিক বিচারে তারা প্রায় একই পর্যায়ে পড়ে।

যে কোনো জটিল সমস্যার মতো এই অবস্থার কারণও অনেক। কারণগুলিকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, দেশবাসীর বিশেষ করে এর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্কল্প-পরিকল্পনা-সংগঠনশক্তির অভাব। দ্বিতীয়ত, সম্পদের অনটন। বলা বাহুল্য এই বিভাগ একেবারে পরস্পর সম্বন্ধবিহীন জলপ্রতিরোধক প্রকোষ্ঠের মতো নয়। তাই যদিও পাকিস্তান-ভারত-বাংলাদেশের মানব বিকাশের নিম্নমানের কারণ অনুসন্ধানে আমরা মূলত সম্পদের অনটনের সমস্যার বিশ্লেষণের চেষ্টা করব, তবু স্বভাবতই অনুষঙ্গ হিসেবে মানবীয় সম্পদ বিকাশের প্রশ্ন অর্থাৎ দেশবাসীর সঙ্কল্প-পরিকল্পনা-সংগঠনশক্তির প্রসঙ্গও এসে যাবে।

পরিসংখ্যান উল্লেখ করার আবশ্যকতা নেই, তবে এ কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না যে তিনটি দেশেই মানব বিকাশের জন্য বিনিয়োগের তুলনায় অনুৎপাদক ব্যয়ের পরিমাণ বেশি। অনুৎপাদক ব্যয় বলতে এখানে সৈন্যবাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র, পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের মতো সামরিক ও বেসামরিক উভয় ধরনের ব্যয়ের কথাই বলা হচ্ছে। যে দেশে যে দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, বিগত অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল একইভাবে মানব সম্পদের বিকাশের তুলনায় প্রতিরক্ষা, পুলিশ ও আমলাবাহিনীর উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

স্বভাবতই এখানে শাসন ব্যবস্থা ও শাসককুলের শ্রেণীচরিত্রের কথা উঠবে। কিন্তু অতীব গুরুত্বপূর্ণ হলেও সে প্রসঙ্গ পরিহার করে আলোচনাকে সীমিত রাখার জন্য কেবল সম্পদের সীমাবদ্ধতার প্রতিই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। যদি এ কথা বলা যায় যে, সীমিত সম্পদের অনেকটাই তিনটি দেশেই সামরিক ও বেসামরিক খাতে খরচ হচ্ছে আর তার জন্য মানব বিকাশের বরাদ্দে টান ধরছে, তাহলে আশা করা যায় যে, সত্যের অপলাপ হবে না। অথচ ওই সব অনুৎপাদক খরচের অনেকটাই বাঁচানো সম্ভব। আর যেটুকু না করলেই নয় তা যদি তিনটি দেশ মিলেমিশে করত, তাহলে অনেক কম অপচয়ে এ কার্য সাধিত হতে পারত। এই রকম একটা ইচ্ছা বা আশা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত-বিভাজনের নায়ক বাস্তববাদী মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ স্বয়ং প্রকাশ করেছিলেন পৃথগন্ন হবার ছয় মাস না পুরতেই (মার্চ ১৯৪৮) সুইজারল্যান্ডের এক পত্রিকার জনৈক বিশেষ প্রতিনিধির কাছে।

অনেকেরই ভারত-বিভাজন না করার ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। জিন্নাহ্ এবং তাঁর মতো আরও অনেকের পক্ষে পৃথক বা সার্বভৌম হয়েও সাধারণ স্বার্থে দুটি (এখন তিনটি) দেশের মিলেমিশে চলাও সম্ভব হয়নি। এমনকি এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত 'সার্ক' প্রতিষ্ঠান বাইরে সক্রিয় থাকলেও তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে বাঞ্ছিত পারস্পরিক সহযোগিতার মানসিকতা গড়ে ওঠেনি। শেখ মুজিবের ও বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের কিছুটা উন্নতি ঘটলেও পারস্পরিক সম্পর্কে এখনও উন্নয়নের বহু অবকাশ আছে। আর পাকিস্তান-ভারত সম্পর্কের কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল। উভয় দেশের মধ্যে সুসম্পর্কের ক্ষণবসন্ত জাগতে না জাগতেই অদৃশ্য হয়ে যায়। বাহান্ন বছর যাবৎ বৈরিতার শীতকাল আর কাটছেই না। ঘোষিত ও অঘোষিত চারটি যুদ্ধ ও অসংখ্য সীমান্ত সংঘর্ষ, উগ্রপন্থীদের উপদ্রব ও নাশকতামূলক কাজ (আজকালকার সামরিক ভাষা অনুসারে low intensity war) সত্ত্বেও বিবাদের আর শেষ নেই। এই পন্থায় চললে চারের বদলে চল্লিশটি যুদ্ধ বা বাহান্ন বছরের বদলে দু'শ বছরেও সমস্যার কোনো সমাধান হবে না। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ বিংশ শতাব্দীর শেষে ১২৫ কোটি নর-নারীর উন্নয়ন তো দূর অস্ত, তাদের বাঁচা-মরার প্রশ্নটিই একটি ক্ষীণ সুতায় ঝুলছে।

যে ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত ভাগ হয়েছিল—মুসলমানেরা নিজেদের মতো করে বাঁচবেন ও নিজেদের উন্নতি করবেন, এবং ধর্মনির্বিশেষে ভারতের অবশিষ্ট অধিবাসীরা এক সঙ্গে থাকতে অনিচ্ছুক মুসলমানদের বাদ দিয়ে নিজেদের উন্নতি করবেন—তা সফল হয়নি, তিনটি দেশেরই সত্যনিষ্ঠ নর-নারীদের স্বীকার করতে লজ্জা করার কারণ থাকা উচিত নয়। সুতরাং ঘুরে ফিরে আবার সেই পুরাতন প্রশ্ন—কেন এমন হল?

বর্তমান পরিস্থিতির বড় একটা কারণ হল পারস্পরিক অবিশ্বাস, প্রধানত হিন্দু মুসলমানের এবং ব্যাপকার্থে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরাতন বিরোধ। কখনও কখনও মসজিদের সামনে দিয়ে বাজনা বাজিয়ে যাওয়া অথবা মন্দির অপবিত্রকরণ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সংঘর্ষের রূপে উপস্থাপিত হলেও মূল বিরোধটা কিন্তু আর্থ-রাজনৈতিক। ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি চাকুরি, জনপ্রতিনিধিত্বমূলক

প্রতিষ্ঠানসমূহে (গ্রাম পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি থেকে শুরু করে বিধানসভা ও সংসদ প্রভৃতি যেখান থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায় ও আর্থ-রাজনৈতিক অনুগ্রহ বণ্টন করা যায়) কে কতটা ভাগ পাবেন, তার বণ্টন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ঔপনিবেশিকতাবাদী বিদেশী শাসকেরা যখন নিজেদের শাসন-শোষণকে আরও দীর্ঘস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে এদেশবাসীকে ক্ষমতার ছিটেফোঁটা দিয়ে এ দেশের অভিজাত সমাজকে নিজেদের শাসন-শোষণকার্যের অঙ্গীভূত করার জন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহকে রাজনৈতিক গোষ্ঠীর রূপ দেয় তখন থেকে ভারতীয়দের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার যে বীজ বপন করা হয়, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারতবিভাজনে তার সমাপ্তি ঘটেনি।

ঘটতে পারেও না। কারণ সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতি কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ অর্থাৎ আর্থ-প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ধর্মের অপপ্রয়োগ করেই ক্ষান্ত থাকেনি। সুপরিকল্পিতভাবে মিথ্যা বা তার চেয়েও হানিকর অর্ধসত্য বিবরণ ও ভাষ্যে পূর্ব ভারতের প্রাচীন ইতিহাস রচনা করিয়ে এবং নিজেদের শিক্ষায়তনসমূহের সহায়তায় সেইসব ভুল ইতিহাস পড়িয়ে এ দেশের ইতিহাসের মূল শিক্ষা "দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে" ভুলিয়ে দিয়ে বহু প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের মনকে বিষিয়ে দিয়েছে। ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিদেশী শাসকদের এই ভেদনীতির খেলা সম্বন্ধে অন্যত্র সবিস্তার আলোচনা করেছি। আরও অনেকে করেছেন। তাই এই অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির প্রতি কেবল ইঙ্গিত করেই বর্তমান নিবন্ধের সীমিত আয়তনের জন্য ইতি করতে হবে।

হিন্দু-মুসলমান বিরোধের এই বিষবৃক্ষের অদৃশ্য শিকড় পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশের জনমানসে ভিতরে ভিতরে কাজ করে চলছে। এই সর্বনাশা আত্মঘাতী প্রবণতার যদি একটি মাত্র উদাহরণ দিতে হয় তবে তিনটি রাষ্ট্রেই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বর্তমান অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তো তার জন্মলগ্নেই হিন্দু ও শিখদের সে দেশ থেকে উচ্ছেদ করেছে। নামমাত্র যে খ্রিস্টান এখনও ওদেশে আছে, তারাও এমন বৈষম্যের শিকার যে 'ব্লাসফেমি'র অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত এক যুবকের কাহিনী আন্তর্জাতিক সংবাদের গুরুত্ব লাভ করে। (সঙ্গে তার প্রাণরক্ষার জন্য ওদেশে মানবাধিকারের ক্ষেত্রে কর্মরত মহিলা আইনজীবী আসমা জাহাঙ্গিরের অবদানও সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করতে হয়।) সুপ্রতিষ্ঠিত জনসেবক এক খ্রিস্টান পাদ্রিও ওদেশে আত্মহননের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক অবিচারের প্রতি বিশ্বজনমত আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের যে অপদেবতার আরাধনা এত নিষ্ঠা সহকারে ওই মুসলিম রাষ্ট্রে করা হয়েছে, কেবল নামমাত্র হিন্দু-শিখ-খ্রিস্টানদের রক্তে তার ক্ষুধা মেটেনি। অপদেবতা ওদেশের মুসলমানদেরও তার শিকার করেছে। এর দুটি বাহু শিয়া ও আহমদিয়াদের (এঁদের অমুসলমান ঘোষণা করে ইসলামি ঐক্য আপাতদৃষ্টিতে বজায় রাখার ব্যর্থ প্রয়াস চলছে) শ্বাসরোধেও উদ্যত। অপর এক বাহু সুন্নীদের একাংশ ভারত থেকে উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়া মুহাজির নামে আখ্যাত মুসলমানদের রক্তপানের ছিন্নমস্তাবৃত্তিতে নিরত। সাম্প্রদায়িকতা অর্থাৎ রাজনীতি-অর্থব্যবস্থায় নিজের (প্রায়ই

সংখ্যাগরিষ্ঠের) বিশেষ ধরনের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-আচরণ প্রয়োগ করে অপর সবাইকে জোর-জবরদস্তিতে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে বাধ্য করা রূপী বোতলের দৈত্যকে বাইরে ছাড়া সহজ, কিন্তু তার পর তাকে বোতলবন্দি করা কঠিন।

গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা গৃহীত হবার ফলে ভারতের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল—এই মন্তব্য করার জন্য বর্তমান লেখককে স্বদেশের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট আখ্যা দেওয়া হবে না আশা করি। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে ভারতেও সাম্প্রদায়িকতার আর এক রূপ রাজনৈতিক হিন্দুত্ব (যা হিন্দু ধর্ম ও সমাজের বহুত্ববাদী স্বরূপের একান্ত বিরোধী) ও হিন্দুরাষ্ট্রের বোলবালা শুরু হওয়ায় সংখ্যালঘুরা বিশেষ করে মুসলমান ও খ্রিস্টানরা ভিতরে ভিতরে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। পাঞ্জাবে শিখদের প্রায় দশ বছরের উগ্রবাদের ভিতর ভারতের শিখ সংখ্যালঘুদের আহত অস্মিতার উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেও ও-বিদ্রোহ প্রধানত বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতি সঞ্জাত বলে ও-প্রসঙ্গের উল্লেখ এখানে করা হচ্ছে না। ভারতের সমস্যা হল আজ বিশেষ এক রাজনৈতিক দল যার মূল হল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী নামে পরিচয়দানকারী এক আধাসামরিক সংগঠন। তারা রাজনৈতিক হিন্দুত্বের প্রবক্তা, তাঁদের বিশেষ ধরনের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্যাটার্ন তারা জোর করে আর সব ভারতবাসীর উপর চাপিয়ে দিতে চায়। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কাছে এরা যথার্থই উদ্বেগের কারণ। ভারতের ইতিহাস-সংস্কৃতির 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে' এই স্বরূপে তাদের আস্থা নেই। তাদের কাছে ভারত ও তাদের বিশেষ ধরনের হিন্দুত্ব সমার্থসূচক। তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ভারতীয়ত্ব বা হিন্দুত্ব তারা ভারতের অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর চাপিয়ে দিতে কুণ্ঠিত নয়। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে বাবরি মসজিদ ভাঙার শোচনীয় ঘটনা এই মানসিকতার জলবিভাজিকা রেখা। ইদানীং খ্রিস্টানদের উপরও, বিচ্ছিন্ন হলেও, সুপরিকল্পিত আক্রমণ এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের প্রকাশ।

শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশের আবির্ভাব এবং ও-দেশের প্রথম সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার স্বীকৃতি ও বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক মিলিত সংগ্রাম নতুন রাষ্ট্রের উষালগ্নে ও-দেশের সংখ্যালঘুদের নিঃসন্দেহে নির্ভয় করেছিল। কিন্তু শেখ মুজিবের শাসনকালের শেষ পর্বে সেই নিশ্চয়তার যে-ক্ষয় শুরু হয়, ক্রমে বাংলাদেশের ইসলামি চারিত্র্য গ্রহণে তা সম্পূর্ণ হয়। এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের বাধ্যতামূলক উদ্বাস্তু হওয়া অবস্থা থেকে তাদের স্বভূমিতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে বাংলাদেশ সংখ্যালঘুদের একাংশের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু ও-দেশের প্রধান বিরোধী দল চাকমাদের প্রতি অনুষ্ঠিত অন্যায়-অবিচারের সংশোধনের এই পদক্ষেপকে সুদৃষ্টিতে না নেওয়ায় সমস্যার বীজ ও-দেশের সমাজ দেহে রয়েই গেছে বলে আশঙ্কা হয়। ভারতে বাবরি মসজিদ ধ্বংস-উত্তর মুসলমান-বিরোধী দাঙ্গার প্রভাব স্বভাবতই পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপরও পড়েছিল। তবে সেই সঙ্গে একটি প্রশংসনীয় ঘটনা ঘটেছিল ও-দেশের অসাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহের ত্বরিত সংগঠিত হয়ে ভারতের কু-উদাহরণের অনুকরণ না করে স্বদেশের সংখ্যালঘুদের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনার সক্রিয় পদক্ষেপে। কিন্তু তবু অবস্থা যে স্বাভাবিক হয়নি, হিন্দুরা ভরসা না পেয়ে ধীর কিন্তু নিশ্চিত হারে তাঁদেরও স্বদেশ বাংলাদেশ ছেড়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র

ভারতের শরণ নিচ্ছে তার দুটি তথ্যপূর্ণ দলিল হল একালের চিন্তকদের দেওয়া কিছু বিবরণ। এর প্রথমটি নবীনা আইনজীবী সুলতানা নাহারের *সংখ্যালঘু সম্প্রদায়* এবং অপরটি সালাম আজাদের *দেশত্যাগ : সাম্প্রতিক ভাবনা*। দ্বিতীয়টি সঙ্কলনগ্রন্থ। তাই জনাব আজাদের দরদি প্রস্তাবনাটি ছাড়াও ওর অন্তর্ভুক্ত ও-দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির লেখাগুলিও এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক। ড. আনিসুজ্জামান (বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা), ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (মনস্তাত্ত্বিক নয়, রাজনৈতিক), বিচারপতি কে. এম. সোবহান (কেন সংখ্যালঘুরা দেশত্যাগ করে), ব্যারিস্টার আমির-উল ইসলাম (রাষ্ট্র, সংবিধান ও ধর্ম), সুচরিত হাসান (এ লজ্জা আমরা রাখব′কোথায়) ও জয়নুল আবেদিন (সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ : অভিজ্ঞতার আলোকে) তাঁদের প্রবন্ধে 'বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতা' সম্বন্ধে যেসব তথ্য ও যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করেছেন সেগুলো সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী প্রতিটি সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন নরনারীর অন্তরে সদাজাগ্রত থাকার মতো।

উপসংহার পর্বে বক্তব্যগুলোকে আর একবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক।

ধর্মসম্প্রদায়ের ভিত্তিতে সমন্বয় প্রক্রিয়ার পাশাপাশি বিবাদ-বিসংবাদ ভারতীয় ভূখণ্ডে দীর্ঘকাল ধরেই আছে। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে ধর্মের ব্যবহার—অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতা—সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের আশীর্বাদধন্য ভেদনীতির খেলা, যার জন্ম উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদে। ভারতবাসীর রাজনৈতিক প্রতিভা এ সমস্যার সমাধান করতে অপারগ হওয়ায় ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাজন হয়। ধর্ম জাতীয়তা ও রাজনীতির ভিত্তি—এই ভ্রান্ত দর্শনের ভিত্তিতে ভারত বিভাজন হলেও রোগের মূল কারণ সাম্প্রদায়িকবিদ্বেষের চিকিৎসা না হওয়ায় রোগজীবাণু এখনও উপমহাদেশের ১২৫ কোটি মানুষের জীবন ও ভবিষ্যৎকে বিষিয়ে চলেছে। ঘরোয়া হিন্দু-মুসলমান সমস্যা পাকিস্তানের সৃষ্টির পর আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করেছে। বাংলাদেশের জন্ম ধর্ম রাজনীতি, জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি—এই মিথ্যা দর্শনের মূলকে নস্যাৎ করলেও উপমহাদেশের অধিবাসীরা এখনও সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। ভারত ও পাকিস্তান তো বিবাদ বাড়াতে বাড়াতে দেশবাসীদের উপবাসী, বিবস্ত্র, শিক্ষার আলোকহীন ও অপুষ্টি-অচিকিৎসার শিকার করে রেখেও পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হয়ে আরও বিবাদের জন্য তাল ঠুকছে। সাম্প্রতিক কার্গিল যুদ্ধ উভয় দেশেই জনসাধারণের দুরবস্থা যথাবৎ রেখে সামরিক ব্যয় বাড়াচ্ছে। আরও অস্ত্রশস্ত্র ও ঋণের জন্য বিদেশের কাছে আত্মসম্মান বিক্রি করছে।

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বাইরে থেকে রাষ্ট্র তিনটির অস্তিত্বের পক্ষে সঙ্কট সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সকল সম্প্রদায়, বিশেষ করে ধর্মীয়সহ ভাষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের সমান মানবীয় অধিকার ও সম্মান না দেবার ফলে বহু সংখ্যক অসন্তুষ্ট নাগরিকের উপস্থিতির কারণ ভিতর থেকেও রাষ্ট্র তিনটিকে দুর্বল করছে। বহু শতাব্দীব্যাপী ইতিহাসের বিচিত্র উত্থান-পতনের ফলে এই উপমহাদেশে এক সম্প্রদায় (ধর্মীয়, ভাষাগত 'এথনিক' কিংবা উপজাতিগত) যদি কোথাও সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, তাহলে অন্যত্র অপর সম্প্রদায়। তাই কোথাও সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে সেখানে এক সম্প্রদায়ের উপর নিগ্রহ হলে অন্যত্র, সেই সম্প্রদায় যেখানে সংখ্যাগুরু, তাদের মধ্যে অত্যাচারকারী

সম্প্রদায়ের উপর (যেখানে তারা সংখ্যালঘু) পীড়ন করার সাম্প্রদায়িক মানসিকতা প্ররোচনা পাবে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের জবাব পাল্টা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নয়, তার জবাব হল অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা ও কর্মনীতি। অর্থাৎ সকল সম্প্রদায়ের এক সঙ্গে চলার, সম্মানসহকারে বেঁচে থাকার ও উন্নতি করার উপায় উদ্ভাবন ও তার অনুসরণ। ভারতীয় উপমহাদেশের ১২৫ কোটি নর-নারীর তিনটি রাষ্ট্র ঘরে-বাইরে যে অবক্ষয়ের শিকার তার একমেব নিদান সাম্প্রদায়িক মানসিকতার স্থলে অসাম্প্রদায়িক জনমানস তৈরি করা ও গণতান্ত্রিক-আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তোলা।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত অধ্যাপক আহমদ শরীফ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কেবল তাঁর জীবিতকালেই নয়, তাঁর মৃত্যুর পরেও বহুকাল। একবিংশ শতাব্দীতেও তিনি সমান প্রাসঙ্গিক। যত দিন না একদা এক, এবং বর্তমানেও ইতিহাসের দেবতার বিচিত্র বিধানে ভূগোল ও আর্থ-সাংস্কৃতিক কারণে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধিত, এই উপমহাদেশের ১২৫ কোটি নর-নারী সাম্প্রদায়িক মানসিকতা বর্জন করে অসাম্প্রদায়িক উদার মানসিকতাকে নিজেদের চিন্তন-মনন-কর্ম এবং ধ্যান-ধারণার অপরিহার্য অস্ত্র, এক কথায় নিজেদের সত্তার অপরিহার্য উপাদান রূপে গ্রহণ করার দীক্ষায় দীক্ষিত না হন, তত দিন অধ্যাপক আহমদ শরীফ ও তাঁর সহকর্মী ও সহমর্মীরা প্রাসঙ্গিক। উপমহাদেশের ১২৫ কোটি নর-নারী ও তাঁদের ভবিষ্যদ্বংশীয়দের বাঁচার সংগ্রামে ও সাধনায় তিনি প্রাসঙ্গিক।

আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক আহমদ শরীফের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন সমাপ্ত করব দুটি অর্ঘ্য দিয়ে। প্রথমটি স্বরচিত, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর সঙ্গে প্রথম ও শেষ সাক্ষাতের পর। উদ্ধৃতিটি কলকাতার মাসিক *কথাসাহিত্য* পত্রিকার পৌষ ১৪০৩ সনের সংখ্যা থেকে :

> ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলাভাষার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও বিখ্যাত লেখক ড. আহমদ শরীফের সঙ্গে তাঁর রচনা ও পত্রের মাধ্যমে ইতিপূর্বেই পরিচয় ছিল। এবারে সাক্ষাৎ পরিচয়ে দেখলাম যে, সরল, অনাড়ম্বর ও অতিথিবৎসল মানুষটিও তাঁর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রচনার চেয়ে কম আকর্ষণীয় নন। আহমদ শরীফ সাহেবের পাণ্ডিত্য তাঁর বিশালায়তন গ্রন্থ *বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য* ও *বাঙলার সুফি সাহিত্য থেকে* আরম্ভ করে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও বঙ্গভাষা সম্বন্ধে বহু গবেষণাগ্রন্থকে কেন্দ্র করে। আমি ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র নই বলে তাঁর এই ক্ষেত্রের অনন্যসাধারণ কৃতির খ্যাতি আমাকে ততটা আকর্ষণ করেনি, যতটা করেছে তাঁর বিজ্ঞাননিষ্ঠ খোলা মন ও সাহসী কলমের মাধ্যমে বাংলাদেশে এক নতুন ভাবান্দোলন বা রেনেসাঁস সৃষ্টির প্রয়াস। মার্কসবাদ ও ঈশ্বরবিশ্বাস নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার মতপার্থক্য থাকলেও এবং সেকথা খোলাখুলি আলোচনা করলেও আমাদের মনের মিল বা পারস্পরিক শ্রদ্ধা তার জন্য ব্যাহত হয়নি। মুসলমান সমাজে প্রাচীন ইসলামের যুগে ফিরে যাবার আকর্ষণ সব যুগেই কমবেশি বিদ্যমান। আহমদ শরীফ সাহেব এই প্রবণতাকে নস্যাৎ করে দিয়ে আধুনিক যুগ ও তার ধ্যান-ধারণা এবং অন্ধ ধর্মশাস্ত্রানুগত্যের বদলে যুক্তিবাদ, বিজ্ঞাননিষ্ঠা ও বিশ্বমানবতা প্রচার করে চলেছেন তাঁর শক্তিশালী কলমের সাহায্যে। বাংলাদেশের গোঁড়ারা এর জন্য একাধিকবার তাঁর গর্দান নেবার হুমকি দিয়েছে। সম্প্রতি তাঁর ধানমণ্ডির বাড়িতে বোমাও ফেলেছে। কিন্তু ৭৫ বছর

বয়স্ক এই 'তরুণ' নবযুগের নকিবের এসবের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁর অগ্নিবর্ষী লেখনী ও-দেশের কট্টরপন্থীদের জড়বুদ্ধির দুর্গে নিত্য আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। ...

আহমদ শরীফ সাহেব শতায়ু হয়ে কুসংস্কার, গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তাঁর বিজ্ঞাননিষ্ঠ যুক্তিবাদের বৌদ্ধিক লড়াই চালিয়ে যান এবং উভয় বঙ্গেই তাঁর পথে চলার চিন্তক, লেখক ও কর্মীর বংশবৃদ্ধি ঘটুক সর্বদা এই প্রার্থনা জানাই।

দ্বিতীয় নৈবেদ্যটি বাঙালির সকল অবস্থার কাণ্ডারি রবীন্দ্রনাথের ডালি থেকে। জীবনসায়াহ্নে তদানীন্তন জাগতিক পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ায় রচিত তাঁর এক বিখ্যাত কবিতায় :

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস–
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

পার্থক্যের স্রষ্টা অধ্যাপক আহমদ শরীফ

আফজালুল বাসার

আমাদের ইতিহাসের অবিনির্মাতা, কালের পরিভাষায় তুমি আন্তরবিদ্যক।
হয়েছ তাত্ত্বিক সংতত্ত্ব রচনাসফল, ভূভারতে আন্তর্জাতিক বিরল চিন্তক॥

মহত্ত্বের কাঙাল নও, ধনবাদের ব্যানারে যাওনি, সাধনা সতত কর্মধারা।
দশের মঙ্গল চিন্তায় আন্তরচনা ক্রিয়াশীল যদিও তা-ও পড়েনি সর্বহারা॥

শংসিত, আচার্য তুমি, দ্রোহী, নাস্তিক, চেতনাকারী, বাঙালির আত্মপরিচয়।
রীতি-নীতি নিষেধ নামতা তুলাদণ্ডে ভেঙে দিয়েছ জীবনযুদ্ধে অতুল কৃপাণ।
ফলদর্শী তাই তুমি, আমাদের সময়ের একটিমাত্র অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান॥

গুরুদীক্ষা আছে তবু পথ ভুল করি দিও প্রথকে চিনতে নয়নে অনুশীলন।
রুদ্ধ জীবনে আসুক কর্ম-চঞ্চলতা সতত স্পন্দন তেজদীপ্ত তোমার ঈক্ষণ॥

উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু সমাজের চিন্তার তিনটি ধারা ছিল। একটি ধারা প্রবলভাবে পাশ্চাত্য চিন্তার অনুসারী ও আত্মীকরণ সফল। এ ধারায় রয়েছেন বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত এবং ইয়ং বেঙ্গল গ্রুপ। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সমন্বয়বাদী সংস্কারপন্থী ধারার। অন্য ধারাটি ব্যাপক অর্থে মৌলবাদী। এরা গভীর আন্তরিকতা দিয়ে জীবন ও জগতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন রাধাকান্ত, ভবানীচরণ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, অরবিন্দ প্রমুখ। শেষোক্ত ধারাটির চিন্তা বাস্তবায়নে এদেশে প্রায় ৪০টি বিপ্লব প্রয়াসি ও স্বাধীনতাকামী দল গড়ে উঠেছিল। এই ধারারই মানুষ সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, এম.এন. রায়, সুভাষ বসু প্রমুখ। অধ্যাপক আহমদ শরীফ এই তৃতীয় ধারাই একজন। জীবনের প্রতি তিনি তাকিয়েছেন বিস্ময়বোধ নিয়ে, একে গভীরভাবে জানতে, বুঝতে এবং একে যতদূর সম্ভব যাপন করতে চেয়েছেন তিনি।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ তার জীবন উপলব্ধিতে অর্জিত প্রজ্ঞা, গবেষণায় অর্জিত জ্ঞান এবং অনবরত সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষা থেকেই তার মসি চালনা করেছিলেন। এই মসি চালনাতে তার সীমাবদ্ধতা তার যুগের ও তার নিজের সীমাবদ্ধতার প্রতিফলন; তেমনি এই মসি চালনাতে তার শক্তি ও সম্ভাবনা তার যুগের

ও তার নিজের শক্তি ও সম্ভাবনার দ্যোতক। যুগ আর সময় আহমদ শরীফকে রঞ্জিত করেছিল, সৃষ্টিও করেছিল। কিন্তু তিনি শুধুই যুগের সৃষ্টি নন, যুগের সৃষ্টাও বটে। ঢাকার বাঙালি সমাজে সত্যিকার মানববাদী-ধর্মনিরপেক্ষ জাগতিক চিন্তার যুগ তার হাতেই সূচিত এবং প্রণীত হয়েছে। বরং যুগের স্রষ্টা হিসেবেই তার কৃত্য ও কীর্তি বর্ণিত হবে বলে আশা করা যায়। আমাদের আজকের সময়ে ও সমাজে তো বটেই—আরো অনেক পিছিয়ে গেলেও অধ্যাপক আহমদ শরীফের সঙ্গে তুলনীয় মানুষ কমই পাওয়া যাবে। আমাদের মনে যেমন, আমাদের পরে অনেক কাল পর্যন্ত অনেক মানুষের মনে তেমনি এই প্রশ্ন উত্থাপিত হবে, অধ্যাপক আহমদ শরীফ কেন খুব বেশি পৃথক ছিলেন? এই পার্থক্য তিনি অর্জন করেছিলেন কিভাবে, কি ছিল সেই পার্থক্য?

কাজী নজরুল প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁকে লেখা পত্রে বলেছেন, তার সময়ের সমাজকে জাগাবার জন্যে তিনি শল্য-চিকিৎসার পক্ষপাতী, সাইকিক কিউরের হাত বুলিয়ে ঘা সারিয়ে দেওয়ায় তিনি বিশ্বাসী নন। নজরুল এও বিশ্বাস করতেন, মার সইবার মতো পিঠ, দারিদ্র্য সইবার মতো পেট আছে তরুণদের, তারাই তাজাবতাজার গান গেয়ে নতুন দিন আনবে।

অধ্যাপক আহমদ শরীফও শল্য চিকিৎসায় বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি বিশ্বাসের দুর্গে আঘাত হেনেছেন। আঘাত হানা, আঘাতবাদী হওয়ার মাধ্যমে আহমদ শরীফ তার সময়ের সমাজকে জাগিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু যুক্তির বোধে জারিত এবং যুক্তির জালে বিধৃত তার চিন্তারাশি সাইকিক শোধনেরও কাজ করেছে। প্রকৃত পক্ষে যুক্তিসমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টিতে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। চল্লিশের পঞ্চাশের ষাটের দশকে আমাদের দেশে মার্কসীয় চিন্তার ও আন্দোলনের বিকাশ ঘটে। কিন্তু তা ঘটে অত্যন্ত যান্ত্রিকভাবে। সামান্য ব্যতিক্রম ব্যতীত এই সময়ে কিছু সামরিক, অর্থনৈতিক ও দার্শনিক চিন্তার অনুবাদ, সংক্ষিপ্ত রূপ ইত্যাদি ছাড়া মার্কসীয় সাহিত্য অন্য কোনোভাবে বিকশিত হয়নি, আমাদের সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতিও মার্কসীয় ভাবনায় যথোপযুক্ত ব্যাখ্যাত বিশ্লেষিত হয়নি। অধ্যাপক আহমদ শরীফের সাহিত্যাদর্শ, সমাজচিন্তা, জীবনভাবনা ও গবেষণা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এদেশে সমাজবাদী মার্কসবাদী সাহিত্য চিন্তার দিশা তৈরি করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মার্কসীয় চিন্তার আলোকে সাহিত্য-সমাজ-ইতিহাস-ব্যক্তি-মন-ধর্ম-ঐতিহ্য-উত্তরাধিকার অর্থাৎ গোটা জীবন ব্যবস্থাটাকে তিনি আমাদের সামনে নিয়ে আসে। সারা জীবন জীবনের নানা ক্ষেত্রে অধ্যাপক আহমদ শরীফ এইভাবে পার্থক্য রচনার কাজটিই করেছেন।

বাঙালির হাজার বছরের জীবন বীক্ষণ করে তিনি দেখেছেন, বাঙালি ভাবপ্রবণ, কল্পনাপ্রিয়, তাই সে গীতিপ্রবণ। কালো পিঁপড়ের মতো অতিচালাক বাঙালি, সে ধূর্ত, কিন্তু বুদ্ধির সুপ্রয়োগে অক্ষম। সঙ্ঘশক্তি নেই, ব্যবহারিক জীবনের উন্নয়নে বুদ্ধির অবদান গ্রহণে সে অক্ষম। বাঙালি নীতিবিদের ভাষায় ভোগবাদী, গণভাষায় জীবনবাদী, অধ্যাত্ম ভাষায় বস্তুবাদী কিন্তু মুখে আদর্শবাদী, বৈরাগী। ঐহিক ভোগই বাঙালির নিকট অধিক কাম্য। কর্মকুণ্ঠ, মিথ্যুক, ভোগলিপ্সু বাঙালি তুকতাক শিখে খিড়কি দিয়ে জীবনের উপকরণ আহরণে ব্যস্ত। চণ্ডী (অন্নদা, দুর্গা), মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, শনি, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবতার পূজা দিয়ে সে জীবন ও জীবিকার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়। তার মহতের

ও বৃহতের সাধনা ছিল না। তার পৌরুষ নেই। রয়েছে ভীরুতা। তবু অল্প সময়ের জন্য কখনো কখনো সে তীব্র দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। বাঙালির তাই সামাজিক-সামষ্টিক অবদান নেই, রয়েছে ব্যক্তিক অবদান, যে ব্যক্তিক অবদান সমাজে বাস্তবায়িত হয়েছে অল্পই। অর্থাৎ এখানে নতুন চিন্তার জন্ম হয়েছে কিন্তু লালন হয়নি। বাঙালির অবদান হলো বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান, কায়াবাদ, নবন্যায়, নবস্মৃতি, নবপ্রেমবাদ, ওহাবি ফরাজি মতবাদ, ব্রাহ্মদর্শন। বাঙালির গর্ব হলো মীননাথ, গোরক্ষনাথ, দীপঙ্কর, শীলভদ্র, জীমূতবাহন, রামনাথ, রঘুনাথ, চৈতন্যদেব, রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, তিতুমীর, শরীয়তুল্লাহ, দুদু মিয়া, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল।

বাঙালি বহিরাগত কোনো ধর্মকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেনি। নিজের মতো করে নতুন করে নিয়েছে। এতে তার গ্রহণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেছে। আধুনিক সময়কালে বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ বহুল পরিমাণে বিদেশী তথা পাশ্চাত্য সাহিত্য আত্মীকরণ করে আমাদের নিকট বাঙালি রূপে উপস্থাপন করেছেন। অধ্যাপক আহমদ শরীফ বাঙালির জাত-জন্মের, কৃত্য-কীর্তির ইতিহাস খুঁড়ে তাকে আবিষ্কার ও নবনির্মাণ করে বাঙালির বংশানুসৃতি-ফিতায় বুনে দিয়েছেন উদ্যম, প্রত্যয়, কৌতূহল, জিজ্ঞাসা, অবিরাম প্রয়াস ও আত্মসামর্থ্যে আস্থার বীজ। বাঙালির নৃবৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে তিনি দেখিয়েছেন, বাঙালি সঙ্কর জাতি। এর চারটি প্রধান রক্তধারা এসেছে—আদি-অষ্ট্রাল, দ্রাবিড়, আলপীয় আর্য ও মোঙ্গল নৃগোষ্ঠী থেকে। এছাড়া তার রক্তে মিশেছে আরো বহু রক্ত ধারা। বাঙালির ধর্ম লোকায়ত। তার ধর্মতত্ত্বে পাপপুণ্যের কথা নেই রয়েছে জীবন রহস্য বুঝবার প্রচেষ্টা। বাঙালির চিন্তা হলো, দেহ নিরপেক্ষ চৈতন্য নেই। তাই সে দেহতত্ত্ব জানতে চায়, চায় সহজানন্দ, সে বাউল-বৈষ্ণব। তার মধ্যে হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম লৌকিক রূপ নিয়েছে মিলিতভাবে—যার প্রমাণ হলো সত্যপীর, সত্য নারায়ণ, কালুগাজী, কালুরায়। জীবনবাদী বাঙালির বৈশিষ্ট্যকে উন্মোচন করে অধ্যাপক আহমদ শরীফ প্রচুর সাফল্য লাভ করেছেন এবং খ্যাতিমান হয়ে উঠেছেন। কলমী পুথি খুঁড়ে তিনি এই ইতিহাস নির্মাণ করেছেন।

বাংলাদেশ বহুমাত্রিক এবং বহু জাতিভিত্তিক দেশ নয়। তাই এই দেশে বহুভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নেই। তাছাড়া শিশুকে তিন ভাষা শিক্ষা দেয়া শিশু মনস্তত্ত্ব বিরোধী। তার এই ভাষা চিন্তা অত্যন্ত কার্যকর হয়েছিল। স্বৈর শাসকের চাপিয়ে দেয়া প্রাথমিক পর্যায়ে তিন ভাষায় শিক্ষাদানের নীতিকে তিনি তীব্র প্রতিবাদে ভণ্ডুল করে দিয়েছেন। তার ছিল অত্যাধুনিক ভাষাচিন্তা। তিনি আমাদের এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন, 'জয়বাংলা' ধ্বনি কেন মুছে গেল, অথচ একদিন প্রায় সকল বাঙালিই এই ধ্বনিতে উজ্জীবিত হয়েছেন। তিনি একথাও লিখেছেন, ভাষার অভ্যাসের মধ্যে রয়েছে নারী নির্যাতনের চিহ্ন ও প্রতীক এবং পৃথিবীর যাবতীয় ভাষা পুরুষ প্রাধান্যের প্রতীক।

তার *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* নামক বিশাল গ্রন্থের মাধ্যমে ইতিহাসের প্রতি, জীবনের প্রতি এবং সাহিত্যের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট হয়েছে। এতে তিনি দ্বান্দ্বিক, সামাজিক এবং অর্থব্যবস্থা তথা শোষণ শাসন আশ্রয়ী বৈশিষ্ট্যখচিত বিশ্লেষণী চিন্তা নিয়ে এসেছেন। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে মুসলিম অবদান আবিষ্কার করে তিনি অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছেন। শুধু তাই নয়, তার ইতিহাসটি প্রথম পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস হিসেবে গোটা বাংলাভাষী অঞ্চলে স্বীকৃত হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রবল সমর্থক তিনি। তার শিক্ষাতত্ত্ব, মানববিদ্যাতত্ত্ব পৌঁছেছে তত্ত্বে। তিনি মনে করতেন শরীর, মন ও বিজ্ঞান—এই তিন বিষয় সমাজের সঙ্গে ক্ত করে শিক্ষানীতি প্রণীত হবে। প্রাথমিক স্তরে কৌতূহল জাগানো, মাধ্যমিক স্তরে , সৌন্দর্য ও শ্রেয়োবোধ সঞ্চার এবং উচ্চ শিক্ষায় বৃত্তিমূলক বিদ্যাচর্চা করা াজন। তাছাড়া মানববিদ্যা ও বৃত্তিমূলক বিদ্যার সামঞ্জস্যবিধান করতে হবে। নাজিরি ার মাধ্যমে গণশিক্ষার প্রসারে সহজে অগ্রসর হওয়া যায় বলে তিনি মনে করতেন। অধ্যাপক আহমদ শরীফ বঙ্কিমচন্দ্রের গুণমুগ্ধ ছিলেন। পাশ্চাত্য জীবনভাবনায়, জাতীয়তাবাদী জীবনসাধনায়, কল্যাণের এবং যুক্তির অনুশীলনের পথে বাঙালিকে দর করে নিয়েছেন বঙ্কিম। বঙ্কিম ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। যদিও বঙ্কিম মানসের হাস হচ্ছে মানবতাবাদী বঙ্কিমের হিন্দু বঙ্কিমে ক্রম পরিণতির ইতিহাস। তাঁর মতে ম সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি পান্ডিত। তবে বঙ্কিম যে পরজাতি পীড়নের অনুমোদক ছিলেন, জ বিপ্লবের অনুমোদক দিলেন না, সাম্যের প্রচার বন্ধ করে দিয়েছিলেন—এগুলো স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের বিরোধী। বঙ্কিমের অনুশীলন ধর্ম হলো সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। ন জিজ্ঞাসার ও বৃত্তিপ্রবৃত্তির তথা চিত্তশুদ্ধির ও সমাজ শুদ্ধির অনুশীলন। বিপ্লব এক ি সমাজশুদ্ধি। অন্যদিকে বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র হচ্ছে জ্ঞানী ও শ্রেয়োচেতনায় জাগরিত ষের চরিত্র (ধর্মীয় অংশ বাদে)। অধ্যাপক আহমদ শরীফ এই বঙ্কিমের গুণমুগ্ধ, এই ার উত্তরসূরী।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অধ্যাপক আহমদ শরীফের ব্যক্তিত্বের অতোটা বনিবনা হয়নি। কারণ রবীন্দ্রনাথ এবং আহমদ শরীফের ব্যক্তিত্বের মধ্যেও নিহিত আছে। দ্রনাথের রাজনৈতিক ব্যবহারের তিনি বিরোধী ছিলেন—কারণ এ ধরনের রাজনৈতিক হারের ফলে কবির ত্রুটির দিকগুলোকেও সমাজ আত্মীকরণ করে ফেলে। আচ্ছন্ন তে সাহিত্য বিচারের তিনি পক্ষপাতী নন। তাই তিন পুরুষ পরে মুক্ত দৃষ্টিতে বহুল রবীন্দ্র মূল্যায়ন উপস্থাপন করেছেন তিনি : রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব তার খিতায়। রবীন্দ্রনাথ মানবতার ধারক, বাহক ও প্রচারক, বুর্জোয়া মনের বিকাশের ্য তাই তিনি আবশ্যিক। 'রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাদের চিত্তদূত, মানবতার ারি, আমাদের সামনে এক আলোকবর্তিকা। আজকের সংস্কৃতিবান মানুষ মাত্রই দ্রনাথের মানস-সন্তান। রবীন্দ্রনাথ অনন্য অসামান্য, অতুল্য আশ্চর্য শক্তিধর ব্যক্তি। , রবীন্দ্রনাথ সত্য গোপনকারী ('জনগণমন' তিনি লিখেছেন আশুতোষ চৌধুরীর মর্শে, 'ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জে'র অভিষেক উপলক্ষে)। অ্যান্ডারসনের নিকট থেকে া নিয়ে *চার অধ্যায়* লিখেছেন। *গোরা* এবং *ঘরে বাইরে* উপন্যাস দুটি, দুটি ইংরেজি ্যাসের নকল। কবিতারও নকল রয়েছে। তিনি ছিলেন অসহিষ্ণু, মদ খেতেন, য়দের টিজ করতেন। তার ছিল পৌরহিত্যের লোভ, ছিলেন ব্রাহ্ম অথচ লিখেছেন বধর্ম। তিনি সুশাসন চাইতেন কিন্তু স্বশাসন চাননি। জাতীয়তা এবং স্বাধীনতার কথা রচনায় দুর্লক্ষ। সমাজতন্ত্রে তার আস্থা ছিল না এবং প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ননি। জমিদারি প্রথাকে শাশ্বত মনে করতেন। তিনি মুখ্যত উনিশ শতকের কবি। ন্ত জমিদার বেনে-বুর্জোয়া উনিশ শতকী মানসিকতা থেকে রবীন্দ্রনাথের মৌল বর্তন হয়নি জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই। তাই রবীন্দ্রনাথ ঐতিহ্য কিন্তু সম্পদ নয়।

নজরুলকেও রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের তিনি বিরোধিতা করেছেন। তার চিন্তা অনুযায়ী নজরুলের মনটি ছিলো চোখের কোনেই। তাই যা দেখেছেন তাই বলেছেন, ভাবেননি কিছুই। তার দ্রোহ সংগ্রাম তরল উচ্ছ্বাস, অন্তরের সম্পদ নয়। তিনি ধার্মিক ছিলেন কিন্তু মোক্ষজয়ের জন্য নয়, জীবনের অবলম্বন হিসেবে। নজরুল কমিউনিস্ট না হয়েও মার্কসবাদী সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন, ইসলামি না হয়েও ধর্মীয় জাতীয়তার জয়গান গেয়েছেন। তার ছিলো দ্বৈত সত্তা। নজরুল ফারসি সাহিত্য এবং হিন্দু পুরাণ জানলেও আধুনিক মানুষ হিসেবে ডারুইন, মার্কস ও ফ্রয়েডকে জানতেন না। তার প্রেমও সূক্ষ্ম নয়, নিতান্তই শারীর। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় আর নজরুলের কর্মে বাঙালির রেনেসাঁস পূর্ণতা পায়। নজরুল আসলে রবীন্দ্রনাথের পরিপূরক। নজরুলের সম্ভাবনা ছিল অফুরন্ত কিন্তু সম্পূর্ণতা কোথাও নেই, তিনি মুক্ত প্রাণ কিন্তু বদ্ধচিত্ত। তিনি প্রথম দর্শনেই জয় পান। তিনি গণকবি, তারুণ্যের কবি, চারণ কবি, শক্তির দিশারী। নজরুল সামাজিক-আর্থিক মুক্তি চেয়েছিলেন কিন্তু তা অর্জিত হয়নি বলে তার কাব্যে এই অংশ মানববাদীর নিকট প্রেরণাদায়ক।

অধ্যাপক আহমদ শরীফের সাহিত্যচিন্তা আন্তরবিদ্যক, আন্তররাচনিক, যুক্তিপন্থি, সমাজবাদী, শ্রেণি মঙ্গল প্রত্যাশী, গণমুখী, মার্কসীয়, মানববাদী। তার সাহিত্য চিন্তা শ্রেয়ো-বর্জিত এবং যুক্তি-বিরহী নয়। বিশ্লেষণ-সর্বস্বও নয়, কলাকৈবল্যবাদী তো নয়ই। বরং সেগুলি সুন্দর, কল্যাণ ও মানব বিকাশের অনুশীলনে আগ্রহী।

অধ্যাপক আহমদ শরীফের চিন্তা অনুযায়ী নির্দল না হলে দলীয় এবং নিধর্ম না হলে ধর্মীয় ভেদবুদ্ধি যায় না। কাজেই ধার্মিকের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ সে-ই যিনি নাস্তিক। তবে সহনশীল অন্যান্য রাস্তা এবং চিন্তাও আছে। যেমন আস্তিক হয়েও, ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েও শাস্ত্র না মেনে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া যায়। ধর্মবিশ্বাসীরা কিভাবে শান্তিপূর্ণভাবে পরস্পর সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে বসবাস করতে পারেন সে চিন্তাও তিনি করেছেন। অর্থাৎ অধ্যাপক আহমদ শরীফ সবকিছুর প্রতি নেতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন না। তার নাস্তিক্য তার জীবনবাদ-সমাজবাদের সহায়ক, নিখিল নাস্তি নয়। রাষ্ট্রের কোনো ধর্মীয় লেবেল থাকবে না অর্থাৎ সরকার কথায়, কাজে এবং আচরণে ধর্মবিষয়ক কোনো কিছু মন্তব্য বা কাজ করা থেকে বিরত থাকবে, ধার্মিকদের অনুষ্ঠান এবং পালা পার্বণে অংশগ্রহণ করবে না—তাহলে ধর্ম-জাত-পাত নির্বিশেষে সকলের প্রতি রাষ্ট্র ন্যায়ের দৃষ্টি গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মকে পুঁজি করে, ভোট কাড়ে, ধর্মের ব্যবসা চালায়। ধর্মীয় ভণ্ডামি এবং মাজারের সঙ্গে ভোটের সম্পর্কের মুখোশ তিনি উন্মোচন করেছেন। যারা জাতিসত্তার দল করেন, যারা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান দল করেন তাদের এই ধারণা ভুল তা বিশ্লেষণ করে তিনি ধর্ম, জাতিসত্তা নির্বিশেষে মিলিতভাবে রাজনৈতিক দলগঠনের পরামর্শ দিয়েছেন। হিন্দু-মুসলিম বিরোধ রোধ কল্পে তিনি দশটি প্রস্তাব দিয়েছেন। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে যথাযথ ইতিহাস রচনা ও পাঠ, সরকার কর্তৃক ধর্মভিত্তিক বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান বন্ধ করা, স্রষ্টা মানো শাস্ত্র ছাড়ো নীতি নীতি গ্রহণ করা, সমর্থকে কাজ অসমর্থকে ভাতা দেয়া ইত্যাদি।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ জোরের সঙ্গে বলেছেন, শাস্ত্র ত্যাগ না করলে নারীর পক্ষে

স্বাধীনতা পাওয়া সম্ভব হবে না। কারণ শাস্ত্র তাকে অধীন করে – বিভিন্ন ব্যক্তি এবং অনুশাসনের নিকট। তাই উৎখাত কর এমন সব সম্পর্ক যেখানে মানুষ হয়ে আছে হেয়, দাসে পরিণত–ইত্যাদি।

আস্তিক শেষ পর্যন্ত বিজাতি-বিভাষী-বিদেশী-বিধর্মী-বিদ্বেষী হয়। কারণ তার দলচেতনা থাকে। মনে ভয় এবং লোভ ঢুকিয়ে অন্যায় থেকে বিরত থাকা এবং কল্যাণমুলক কাজ করার পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়েছে। তারা হয় দুর্বল, অসহিষ্ণু, দৈব নির্ভর। ঈশ্বর মেনেই শেষ নয়–তাবিজ, কবজ, দোয়া দরুদ, মাদুলি ছাড়াও আরো বহু কিছু তাদের মানতে হয়। অন্যদিকে নিরীশ্বরের থাকে আত্মশক্তি, অনেক কিছুকে অস্বীকার করে বিধায় নিজের বিবেককে মানার জন্যে তার তাড়না থাকে বেশি। তার আত্মমর্যাদা প্রখর, ভ্রাতৃত্ববোধ নির্বাধ ইত্যাদি। কাজেই নাস্তিক-নিরীশ্বরই শ্রেয়োতর মানুষ। ভয় থেকে ভগবানের উৎপত্তি, অথচ অধ্যাপক আহমদ শরীফের ভীত হবার কিছু নেই, ভয় পাবার কিছু নেই–তাই এই ঈশ্বরকে মেনে নেয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আবু সয়ীদ আইয়ুবও সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের সৌন্দর্য সাধনায়। শতাব্দিকাল ব্যেপে মানুষ সাধনা করে করে যেসব অমূল্য মূল্যবোধ অর্জন করেছে যেমন সুন্দরের জন্যে অপেক্ষা করা ও বেদনা সইবার ক্ষমতা অর্জনের সাধনা; আনন্দভরা, অমৃতময় মুহূর্তের জন্যে আত্মদীপিত থাকা; আমিকে বড় আমি, বৃহৎ আমি ও মহৎ আমির দিকে এগিয়ে নেয়া; ব্যক্তিকে সমাজের দিকে এগিয়ে নেয়া ইত্যাদি মূল্যবোধে বিশ্বাস করেন তিনি। অধ্যাপক আহমদ শরীফও এরূপ মুল্যবোধে বিশ্বাস করেন। কাজেই আহমদ শরীফের নিরীশ্বর চেতনা ও নাস্তিক্য চেতনার মর্মবাণী হচ্ছে আত্মমর্যাদাপুর্ণ মানুষত্ব অর্জন করা। তিনি লিখেছেন, "নাস্তিক্য দর্শনের মূলকথা হলো জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি। সাহসী মানুষই নাস্তিক হয়। কাজেই সবকিছুর উপর শুধু যুক্তিকেই স্থান দেয়া এবং যুক্তিমানা মানুষ বিবেকবান হয়। সে কারণে নাস্তিক্যবাদীরা আত্মসম্মান সম্পন্ন হয়। সে আত্ম অবমাননা হবে বলে নিন্দনীয় বা শাস্তিযোগ্য কোনো কাজ করে না। এই কারণে সে ন্যায়নিষ্ঠ, আদর্শবান, তথা চরিত্রবান মানুষ হয়। সে দেখতে শুনতে করতে বলতে যা কিছু কুৎসিত, নিজের বা অন্যের পক্ষে ক্ষতিকর, তা পরিহার করে। যে ক্ষতি, যে অকল্যাণ, যে যন্ত্রণাকে সে নিজের জন্যে কামনা করে না, অন্যের জন্যে তা সে বাঞ্ছা করে না। এই জন্যে আদি কাল থেকে মার্কস, এঙ্গেলস, মাও সেতুঙ কিংবা বিশ শতকের রাসেল, বার্নার্ড শ, সার্ত্র প্রমুখ অবধি আমরা মানবদরদী মানুষের সন্ধান পাই।" বিজ্ঞান দর্শনের ছাত্ররা এখনো আস্তিক। তারা তাদের জ্ঞানে ও প্রজ্ঞায় নাস্তিক্য এখনো ধারণ করতে পারেনি। অথচ সারা দুনিয়ায় নাস্তিকের আত্মশক্তিই নতুন নতুন ভুবন রচনা করছে।

কাজেই অধ্যাপক আহমদ শরীফ অনিবার্যভাবে নাস্তিক-কমিউনিস্টদের দিকে ঝুঁকেছেন। তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন না, দলীয় ব্যক্তি ছিলেন না কিন্তু প্রবলভাবে এবং একাকি রাজনীতি করতেন। তার চিন্তা ও চরিত্র বৈশিষ্ট্যের একটি হচ্ছে এই–গড্ডল স্রোত বিরোধী তিনি, যুক্তিসঙ্গত কারণে। এরকম একটি বিশ্ব স্রোতের মুখে চিনে যখন সমাজতন্ত্র সংশোধিত হচ্ছে এবং রাশিয়া যখন ভেঙে যাচ্ছে, যখন এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা কায়েম হচ্ছে জোরদারভাবে, তখন, আশির দশক থেকে এই সমাজতন্ত্রের

পক্ষে প্রবলভাবে দাঁড়ালেন তিনি। শোষক-শোষিত শ্রেণি বলয় যতদিন থাকবে ততদিন সমাজতন্ত্রের আবশ্যিকতা শেষ হবে না, এর চেয়ে উন্নততর মতবাদ না আসা পর্যন্ত। এই হলো তার রাজনীতি-চিন্তার একটি বড় দিক। এই সময় জান্তা শাসনের বিরুদ্ধে প্রবল লড়াই দেন তিনি। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করা হলে তার বিরোধিতা করেন। সত্তরের দশকেও তিনি প্রবলভাবে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এই সময় হানা-মারা-কারার আওয়ামী শাসন আর ছাউনি শাসনের তিনি ছিলেন প্রবল প্রতিপক্ষ। চুয়াত্তর সালে চতুর্থ সংশোধনী পাস হলে এর বিরোধিতা করেছেন। তারা নাগরিক অধিকার রক্ষা ও আইন সাহায্য কমিটি গড়েছেন। ১৯৭১ সানের ৫ই মার্চ শহিদ মিনারে বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীনতার শপথ পাঠ করান তিনি। ষাটের দশকে যখন এদেশে স্বাধীনতার বীজ নানাভাবে বোনা হচ্ছে তখন তিনিও সেখানে ছিলেন বিশেষ ভূমিকায় সিরাজুল আলম খানদের নিউক্লিয়াসে এবং আবদুল আজিজ বাগমারদের অপূর্ব সংসদে। তারা দেশের জাতীয় সঙ্গীত নির্বাচন করেন এবং জাতীয় পতাকার রূপ দেন। চল্লিশের পঞ্চাশের দশকে অধ্যাপক আহমদ শরীফের গতানুগতিক রাজনৈতিক চিন্তা ছিল।

রাষ্ট্রের ভবিষ্যত হলো ফেডারেল বা কনফেডারেল হওয়া, Unitary শাসন ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। জাগতিক জীবনের চাহিদাপূরণই হবে সরকারের বা রাষ্ট্রের প্রধান ও একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই ছিল তার রাষ্ট্রচিন্তার মূল কথা। তৃতীয় বিশ্ব যে আধিগ্রস্থ বিভিন্ন অর্থে সেকথা বলেছেন তিনি। সে হিসেবে বাংলাদেশের মুক্তির জন্যেই চাই মুক্ত চিন্তার মানুষ, সেক্যুলার মানুষ, আর সমাজতন্ত্রের আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। সেজন্যে চাই নেতা, যার থাকবে 'রুচি বুদ্ধি জ্ঞান প্রজ্ঞা মহিমা আত্মপ্রত্যয়-আদর্শ নিষ্ঠা, সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্মসূচী–এক কথায় নেতার থাকবে দৃঢ় চরিত্র ও মনীষা Intellect ও Integrity.

ঐতিহ্যকে তিনি দেখেছেন নতুন রূপে। ঐতিহ্য ভালো হলে তার মূল্য আছে, মৃত এবং পশ্চাৎমুখী ঐতিহ্যকে বর্জন করা প্রয়োজন। দুষ্কর্ম ঐতিহ্য নয়। ঐতিহ্য প্রেরণার উৎস নয়। তার যুক্তি এই, ঐতিহ্য প্রেরণার উৎস হলে মিসরের, গ্রীসের, রোমের জাতিগুলোর পতন ঘটতো না। তার চিন্তা অনুযায়ী ঐতিহ্য হল সুবিধাবাদ। "পুরাতনে আস্থাহীনতা, অশ্রদ্ধা, সন্দেহ এবং উপযোগিতায় অনাস্থা, বিরক্তি ও পরিহার সামর্থ্য, নতুন জিজ্ঞাসা, কৌতূহল, উৎকর্ষ সাধনের কাঙ্ক্ষা ও পরিবর্তন প্রয়াস অগ্রগতির স্বাভাবিক সদুপায়।"

সংস্কৃতি মানসিক ব্যাপার, এ হল পরিশ্রুত জীবন চেতনা, সৌন্দর্যের প্রেরণাদাতা, ব্যক্তিচিত্তেই সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ, সাধারণ মানুষ সৃজনশীল নয়, তাদের উদ্ভাবনী শক্তি নেই, সংস্কৃতি কখনো সামগ্রিক বা সমবায় সৃষ্টি হতে পারে না। অন্যত্র সংস্কৃতি সম্পর্কে তার চিন্তা হলো এই, সংস্কৃতি অর্থনীতিকে সাহায্য করে। পরে আবার বলেছেন, সংস্কৃতিতে বিশ্ব উত্তরাধিকার সৃষ্টি হচ্ছে–এখন সংস্কৃতির অর্থ হলো বিশ্ব সংস্কৃতি।

যে পরিশ্রম এবং প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একজন চিন্তাশীল মানুষের চিন্তাকে জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত করা যায়, জাতীয় জীবনের স্রোতধারায় তার চিন্তা চেতনা উত্থানের জন্ম দেয় তা অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। সেরকম বাস্তবানুগ একটি পদ্ধতি হল তত্ত্ব বা চিন্তা থেকে শুরু না করে বাস্তবতা থেকে শুরু করা,

স্তবতাকে অধ্যয়ন করা। অধ্যাপক আহমদ শরীফ বাস্তবতাকে অধ্যয়ন করেছেন। তার ই বাস্তবতা হল মধ্যযুগের পুথি, গত দুশো বছরের বাংলা ও বিশ্ব সমাজ, বর্তমান লাদেশ-তার সমস্ত চিন্তা এইসব বাস্তবতার গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসেছে। বস্তুত ঙালির অতীতকে অবিনির্মাণ করেছেন আহমদ শরীফ; বাঙালির বর্তমান অবিনির্মিত য়ছে রবীন্দ্রসাহিত্যে।

রবীন্দ্রনাথে স্বাধিকার চেতনা ক্ষীণ যা নজরুল-সুকান্তের মধ্যে ছোট কণ্ঠস্বরে হলেও ল। রবীন্দ্রনাথের স্বাধীনতার ধারণা প্রায় ছিল না। কাজেই নজরুলের ভারত স্বাধীন ; গান্ধী-প্যাটেল-নেহেরু-জিন্নাহদের কায়দায়—নজরুল-সুকান্তের কায়দায় নয়। ন্দ্রনাথে রয়েছে ভাববাদের জড়। তার ভিন্ন রকম মতবাদী হতে না পারা সম্পর্কে ন্দ্রনাথ নিজেই আক্ষেপ করেছেন। অপরদিকে নজরুলেও ভাববাদের জড় রয়েছে ং রয়েছে বাস্তব থেকে উৎসারিত চিন্তা ও শিল্পকর্ম। মানবতাবাদের বিশাল পরিধিতে ন্দ্রনাথ প্রাসঙ্গিক। এদিকে সমাজ-সময় হল শ্রেণিবিভক্ত এবং বাস্তবতা হল ঐ ালতা থেকে নেমে এসে শ্রেণিমুক্তি আন্দোলন, শেষ পর্যন্ত এই বাস্তবতা পৃথক, াগ্রের তুলনায় ক্ষুদ্র এবং খন্ডিত কিন্তু বিশিষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ সামন্তচিন্তা থেকে শুরু করেছেন, মানবতাবাদ থেকে আর অগ্রসর হননি। ্যাপক আহমদ শরীফ মানবতাবাদ দিয়ে শুরু করেছেন, সমাজতন্ত্র পর্যন্ত অগ্রসর য়ছেন, মার্কসীয় ভাবরাজ্যের মানুষ তিনি। অবশ্য তিনিও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে াসর হননি—রাজনৈতিক দল করেননি। বঙ্কিম সাম্যের প্রচার বন্ধ করেছিলেন, দেশের কৃষকদের নিয়ে অগ্রসর না হয়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদ নিয়ে অগ্রসর য়ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তার সমসাময়িক মার্কসবাদকে নিয়ে অগ্রসর হননি, তার চিন্তায় ালিম সমাজও অনুপস্থিত। অথচ বঙ্কিম হিন্দু মুসলিম মিলে সাতকোটি বাঙালির জন্য া করেছিলেন। নজরুল রবীন্দ্রনাথের থেকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে একেবারেই আলাদা। মত তিনি চান সরাসরি স্বাধীনতা—অসহযোগ নয়, স্বরাজ নয়, সীমিত স্বায়ত্তশাসন । দ্বিতীয়ত তিনি চান কৃষক, শ্রমিক ও মজলুম মানুষের আর্থিক মুক্তি। তৃতীয়ত ইত্যকে অন্যান্য কর্মের চেয়ে প্রথম স্থানে গুরুত্ব দিতে চান। চতুর্থত তিনি ন্দ্রাতিগতা চান, চান নানা সুরবিহার—সৃষ্টিশীলতা ইত্যাদি। নজরুলের মত নয় কিন্তু ্যাপক আহমদ শরীফের সৃষ্টিশীলতা রয়েছে। উপরের বিষয়গুলিতে আহমদ শরীফের াস্থান বিবেচনা করা যায়। প্রথমত স্বাধীনতা তিনি দুটো দেখেছেন, এই স্বাধীনতাকে ংপর্যপূর্ণ করতে চান। দ্বিতীয়ত তিনিও কৃষক শ্রমিক মজলুম মানুষের মুক্তি চান, যদিও র জীবন ছিল মধ্যবিত্ত প্রধান। তৃতীয়ত তিনি মানুষকে প্রথম স্থান দিতে চান, বাদের উপরে। চতুর্থত তিনিও চান নানা সুরবিহার অর্থাৎ সমাজতন্ত্রে তার আস্থা স্থির য় থাকবে না, মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে প্রণীত উন্নততর মতবাদ এলে তাকে নিয়ে াসর হতে হবে। তিনি মতবাদের সৃজনশীলতা চান, হয়ত তা অমর্ত্য সেনদের মতো ব না। তবে নজরুল থেকে তিনি ভিন্ন—নজরুল কাফের হয়েও নাস্তিক হয়েও আস্তিক। ্যাপক আহমদ শরীফ নিরীশ্বরই, তিনি বাংলার ভল্টেয়ার নন, ডিইস্ট নন, ওমর য়াম নন, নিখিল নাস্তির নাস্তিক নন—তিনি নির্বিকল্প জাগতিক। রবীন্দ্রনাথের স্নিগ্ধতা ভাবচারিতা তাঁর মধ্যে নেই। তিনি যেন বঙ্কিম-বিদ্যাসাগরের আধুনিক সংস্করণ, রুল-সুকান্তের দীপ্তিভাত, বাংলাদেশের উত্থানে গণমানুষের সংগ্রামে প্রেরণা ও উৎস।

তিনি সহবস্থানে বিশ্বাসী। Live and let live এই হলো তাঁর সারা জীবনের চিন্তার মূলমন্ত্র। একদিকে তিনি ব্যক্তিকেন্দ্রিক অন্যদিকে সমাজকেন্দ্রিক। তিনি বিষয়ী-পন্থী, অনুশীলনপন্থী, উপযোগবাদী, বাস্তববাদী, বস্তুবাদী এবং প্রধানত মার্কসীয় ভাবরাজ্যের মানুষ।

তিনি উত্তেজিত করেছেন, আঘাত করছেন; কিন্তু সৃষ্টির পথও প্রদর্শন করেছেন, আবিষ্কার উদ্ভাবনে তার অমর কীর্তি আছে। সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখে তিনি প্রথম পার্থক্য রচনা করেন। বাঙালির বৈশিষ্ট্য নিরূপণ ও নির্ধারণ করে তিনি দ্বিতীয় পার্থক্য রচনা করেন। নাস্তিক্যের ও কল্যাণের পথে মানবজীবনের ভরসার কথা বলে তিনি তৃতীয় পার্থক্য রচনা করেন। বাঙালি মুসলমান সমাজকে তথা গোটা বাংলাদেশকে সাম্প্রত চিন্তায় এবং সমসাময়িক প্রণোদনায় উদ্বুদ্ধ করে তিনি চতুর্থ পার্থক্য রচনা করেছেন। আবু সয়ীদ আইয়ুবের মতো নতুন সাহিত্যচিন্তা সৃষ্টি করেছেন তবে তাঁর উপাদান নিস্তাবক, সমাজ-বিকাশমুখি। নারীমুক্তির একমাত্র উপায় নিরূপণ করেছেন, নেতৃত্বচিন্তায় উপাদান সরবরাহ করেছেন, ঐতিহ্য-সংস্কৃতি চিন্তায় নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। ব্যক্তি চিন্তায় ব্যক্তিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, লোভ ও লাভের পেছনে ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দেননি। বাঙালি মুসলমান সমাজে এবং গত দু'শত বৎসরের বাঙালি সমাজে তিনি একজন বিশিষ্ট এবং বিরল ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিহ্নিত হবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর জীবনের নির্যাস হলো লড়াই করে যাওয়া, অনবরত কেজো যুদ্ধ করে যাওয়া, তিনি এক যুদ্ধমান বাঙালি মহাপুরুষ। তার জীবনের এবং চিন্তার সীমাবদ্ধতা ও সীমানা চিহ্নিত করেও বলা যায়, অধ্যাপক আহমদ শরীফ এক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব, প্রতিষ্ঠান এবং সমাজ। তিনি একাই একটি সমাজের নিদর্শন।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ : তাঁর শিক্ষকতা এবং স্বাজাত্যবোধ ও স্বাদেশিকতা

আবুল কাসেম ফজলুল হক

অধ্যাপক আহমদ শরীফ (জন্ম : ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২১, মৃত্যু ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রথমে আমার শিক্ষক এবং পরে সহকর্মী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল এবং তাঁকে সব সময় আমি আমার শুভানুধ্যায়ীরূপে অনুভব করেছি। ১৯৬২ সনের শেষ দিক থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার এই সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। আমি অনেকের কাছে শুনেছি যে, আমার আগোচরে তিনি আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন। তাঁকে ঘিরে আমার স্মৃতিপটে আমাদের জাতীয় জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার আলেখ্য মুদ্রিত আছে। কিন্তু নিজের স্মৃতিকথার প্রশ্নে সব সময়েই আমি সঙ্কোচ বোধ করি। হয়তো স্মৃতিকথা লেখা আমার দ্বারা হবে না। এখানে খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমি আমার কিছু পর্যবেক্ষণের কথা স্মরণ করব। একজন সদ্যপ্রয়াত প্রিয়জনের স্মৃতির ভার এখন আমার মনে আছে। আমার এই লেখায় আর যাই থাক, কোনো চিন্তার পরিচয় নেই; ভেবেচিন্তে স্মৃতিকথা লিখতে পারলে আমি আনন্দিত হতে পারতাম। কিন্তু সে সামর্থ্য আমার নেই। আমার চেতনায় সব সময়েই আবেগ বিবেক ও বিচারপ্রবণতা এক সঙ্গে সক্রিয় থাকে—এটা আমি অনুভব করি।

অধ্যাপক আহমদ শরীফের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের আগেই তাঁর দু-একটি প্রবন্ধ পড়ে আমি তাঁর প্রতি আকর্ষণ বোধ করি। তাঁর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরবর্তী সময়ের লেখায় ক্রমেই যে ভাষাগত কাঠিন্য লক্ষ করি, তখনকার লেখায় তা ছিল না। তখন তাঁর মতামতও অনেক ভিন্ন ছিল আর মতামতের দৃঢ়তার মধ্যেও সংশয় কিছু না কিছু স্থান করে নিত। মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আবুল ফজল, আবদুল হক এবং বদরুদ্দীন উমরের লেখাও তখন আমাকে আকৃষ্ট করত। রণেশ দাশগুপ্তের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল, তাঁর ব্যবহার আমাকে আকৃষ্ট করেছে, তাঁর লেখার অনেক প্রশংসা শুনেছি। সত্যেন সেনের সঙ্গেও আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল, তাঁর ত্যাগের মনোভাব দেখে আমার মনে মায়া জাগত। যাঁদের নাম আমি এখানে উল্লেখ করলাম তাঁদের সকলের

লেখার ও ব্যক্তিত্বেরই প্রভাব পড়েছিল ষাটের দশকের প্রগতিপ্রবণ ছাত্র-তরুণদের মনে। লেখক হিসেবে তখন অধ্যাপক আহমদ শরীফ ছিলেন এঁদেরই একজন। *সমকাল*-সম্পাদক সিকান্দার আবু জাফরও লেখক-মহলে প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। কাজী মোতাহার হাসেন, আবুল মনসুর আহমদ, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া প্রমুখও সে সময়ে বাঙালি স্বার্থে সাহসের সঙ্গে লেখনি চালনা করেছেন।

১৯৬৪-৬৫ সনে যখন আমি তৃতীয় বর্ষ অনার্সে পড়ি তখন অধ্যাপক আহমদ শরীফ আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়াতেন। ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটের হিসেবমতো তাঁর বয়স তখন বিয়াল্লিশ কি তেতাল্লিশ বছর। তাঁর সঙ্গে আমাদের সপ্তাহে দুটি ক্লাস ছিল। ক্লাসে তাঁকে আমরা একেবারেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের শিক্ষকরূপে দেখেছি। সেটা ছিল, সেনাপতি আইয়ুব খানের শাসনকাল। তখন বাঙলা বিভাগের প্রধান ছিলেন মুহম্মদ আবদুল হাই। তিনি অত্যন্ত সম্মানিত এবং সাংগঠনিক সামর্থ্যসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তা ছাড়া তখন বাঙলা বিভাগের খ্যাতিমান শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। ডক্টর আনিসুজ্জামান তখন তরুণ শিক্ষকরূপে জনপ্রিয়। আর ছিলেন ড. নীলিমা ইব্রাহিম, কাজী দীন মুহম্মদ ও রফিকুল ইসলাম। পরে আসেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও আবু হেনা মোস্তফা কামাল। আবু হেনা মোস্তফা কামাল অল্প সময়ের মধ্যে ছাত্রদের মন জয় করেন। বাংলা বিভাগে তখন সংস্কৃত এবং পালিও পড়ানো হতো এবং তাতে অনার্স ও এমএ-র আলাদা ডিগ্রি দেয়া হত। এই দুই বিষয়েরও কয়েকজন শিক্ষক ছিলেন। আমার মতে, শিক্ষক হিসেবে এঁরা সকলেই ছিলেন গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গির। ব্যতিক্রম ছিলেন আহমদ শরীফ। অর্থনীতি বিভাগের ড. আবু মাহমুদও ছিলেন অসাধারণ ব্যতিক্রম। আর ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসাকেন্দ্রের চিকিৎসক ডা. মোহাম্মদ মোর্তজা : চিকিৎসক হলেও বহু ছাত্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আবু মাহমুদ, আহমদ শরীফ, মোহাম্মদ মোর্তজা– তিনজনই পেশাগত কাজের বাইরে দীক্ষাদাতার ভূমিকায় দাঁড়িয়ে তরুণদের নতুন আদর্শে দীক্ষিত করতে চাইতেন। আবু মাহমুদ এবং মোহাম্মদ মোর্তজা চাইতেন মার্কসবাদে দীক্ষা দিতে; আর আহমদ শরীফ চাইতেন মর্তপ্রীতি বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও জাগতিক আদর্শে দীক্ষা দিতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের এবং ঢাকার বাইরের কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনেক ছাত্র-শিক্ষক এই তিনজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। শিক্ষকদের মধ্যে কাজী মোতাহার হোসেন, আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ এবং আবদুর রাজ্জাকও খ্যাতিমান ও প্রভাবশালী ছিলেন। ইংরেজি বিভাগের ড. খান সারোয়ার মুরশিদ এবং অর্থনীতি বিভাগের রেহমান সোবহানের নামও তখন প্রগতিশীল মহলে আলোচিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন বিশেষ খ্যাতিমান ও শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক কয়েকজনকে দেখেছি এই কয়জনকে ছিলেন। ষাটের দশকের সময়টা ছিল আমাদের জাতীয় জীবনে ঘটনাবহুল এবং অত্যন্ত সম্ভাবনাময়।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ ক্লাসের ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক থাকতেন এবং ক্লাস নিয়ে খুব আনন্দ পেতেন। ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দ্রুতগতিতে হেঁটে ক্লাসে ঢুকতেন, দেরী করতেন না। কখনও কখনও বারান্দা দিয়ে হেঁটে ক্লাসে যাওয়ার সময়ে তাঁর হাতে

ান্ত সিগারেট দেখেছি—যদিও ক্লাসের ভেতরে কিংবা পরীক্ষার হলে তাঁকে কখনও ারেট টানতে দেখিনি। আজকের তুলনায় তখন লোকের ধূমপানের অভ্যাস অনেক শি ছিল। ধূমপানের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে তখন সচেতনতা ছিল না।

শিক্ষাবর্ষের শুরুতে দু-তিনটি ক্লাসে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কোনো কোনো কথার রুক্তি করে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন শিক্ষক হিসেবে ক্লাসে তাঁর নিজের দায়িত্ব ও র্তব্যের কথা এবং সেই সঙ্গে শিক্ষার্থী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথাও। র কোনো কোনো উক্তি স্মরণ করতে পারি।

অধ্যাপক আহমদ শরীফের বর্ষ-শুরুর প্রথম দু-তিনটি ক্লাসের বক্তব্যকে আমার তি থেকে তাঁর ভাষায় কিছুটা সংক্ষিপ্ত করে প্রকাশ করলে এরূপ দাঁড়ায় :

: বিশ্ববিদ্যালয় পুরাতন হলেও তোমাদের কাছে নতুন। কৌতূহল ও বিস্ময়বোধ নিয়ে সঙ্গে পরিচিত হও। সময় ও সুযোগ হেলায় হারাবে না। আমার ক্লাস সম্পর্কে সতর্ক বে। মনে রাখবে ক্লাসে শিক্ষক হিসেবে আমি চিফ মার্শাল ল' এ্যাডমিনিস্ট্রেটরের তা ক্ষমতাবান, আর শিক্ষার্থী হিসেবে আমার কথা শুনতে তোমরা বাধ্য। ক্লাসে ক্ষকদের কথা শোনার অঙ্গীকার নিয়ে তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছ। আমার কথা যে ামাদের ভালো লাগবে, তা না-ও হতে পারে। ক্লাস করা আমোদের ব্যাপার নয়। মি জানি, ক্লাসে শিক্ষকদের কথা সাধারণত ছাত্রদের ভালো লাগে না। আমার কথা াপ লাগলেও শুনতে হবে, টুঁ শব্দটি করা যাবে না, এলার্ট থেকে শুনতে হবে—এটা ামাদের কর্তব্য। ক্লাসে শিক্ষকদের কথা যতই বিরক্তিকর হোক, সব শিক্ষকের কথা দিয়ে শুনলে শিক্ষার্থীর উপকার হয়—খুব উপকার হয়। আমার কথা শুনতে খারাপ ালেও শুনতে হবে, অন্তত নীরব থেকে ক্লাসের শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। আমি ার আগে ক্লাসে এসে তোমাদের বসতে হবে, দেরী করে এসে কেউ ক্লাসে ঢুকতে বে না। দেরী করে এসে কেউ ক্লাসে ঢুকলে আমি বিরক্ত হব, সকলের মনোযোগ হবে, ক্লাসের ক্ষতি হবে। ক্লাস শেষ হওয়ার আগে কেউ বাইরে যাওয়ার কথা বলতে বে না। ঘণ্টা শেষ হলেই আমিও শেষ করব, এক মিনিটও দেরী করব না। ক্লাসের াই নিয়ম—অন্তত আমার ক্লাসের। আমি ক্লাস পছন্দ করি। প্রতি বছর ছাত্র-ছাত্রীদের ন নতুন মুখ দেখে আমি খুব আনন্দ পাই। কিছু সঙ্কল্প নিয়ে আমি শিক্ষক হিসেবে বিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছি। আর শিক্ষার্থী হিসেবে তোমরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের পেকটাসে বর্ণিত এবং তোমাদের ভর্তির ফরমে মুদ্রিত কতকগুলো শর্ত মেনে ছাত্র-ী হয়েছ। আমি আমার অঙ্গীকার ও সঙ্কল্প সম্পর্কে সতর্ক, এবং দায়িত্ব পালনে গ্রহী। ক্লাস নিতে আমি আলস্য কিংবা ক্লান্তি বোধ করি না। তোমাদেরকেও সাবধান তে হবে, ঢিল দিলে চলবে না, এবং অঙ্গীকার মেনে চলতে হবে। আমি একটু অন্য ম মানুষ। তোমরা অসুবিধায় না পড়, সেজন্য বছরের শুরুতেই একটা কথা বলে ওয়া কর্তব্য মনে করি। মনে রাখবে, শিক্ষক হিসেবে পরীক্ষা পাসের প্রস্তুতি দান মার কাজ নয়। পরীক্ষার প্রস্তুতি তোমরা নেবে এবং সে ব্যাপারে সাবধান থাকবে। বিদ্যালয়ে পড়লে রাত-দিন লাইব্রেরিতে পড়ে থাকতে হয়, প্রত্যেক বিষয়ের য়োজনীয় অনেক বই পড়তে হয়, কাজের কথাগুলো নোট করতে হয়—নতুন নতুন কথা

ও চিন্তা খুঁজে বের করতে হয়। গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখে রাখতে হয়, মনেও রাখতে হয়। পৃথিবীর উন্নত সব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এভাবে তৈরি হয়, তোমরাও হবে। আমার কাজ তোমাদের অন্তর্গত ঘুমন্ত সম্ভাবনাকে জাগিয়ে দেওয়া, তোমাদেরকে বিকশিত হতে সহায়তা করা। এর বেশি নয়। বিকশিত তোমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ চেষ্টায় হতে হবে। আমি যে বিষয় পড়াচ্ছি তার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো ক্লাসে অবশ্যই বলে দেব। সারা বছর ধরে বলব। আমি চাইব, তোমরা জানতে-বুঝতে আগ্রহী হও, প্রশ্ন কর, যুক্তি দেখাও, অনুসন্ধান কর, জান, বোঝ—তোমরা এক একজন জ্ঞানী মানুষ হয়ে ভালো জীবন যাপন কর। তা হলেই আমার পড়ানো সার্থক হবে। আমার কাজ তোমাদেরকে জ্ঞানে প্রবর্তনা দেওয়া, আমি কাউকে জ্ঞানী করে দিতে পারব না। নিজের নিজের চেষ্টায় তোমাদের প্রত্যেককে জ্ঞানী হতে হবে। ক্লাসে আমার কথা শোন, তারপর প্রয়োজনীয় বই সব পড়, আমাকে প্রশ্ন কর, আমার থেকে আদায় করে নাও। পড়ার বেলায় প্রত্যেক বিষয়ে খোঁজ নিয়ে তোমরা সবচেয়ে ভালো বইটা পড়বে। শিক্ষককে জিজ্ঞেস করে, যিনি যে বিষয় পড়ান সেই বিষয় সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করে, সবচেয়ে ভালো বইয়ের নাম জেনে নেবে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস জানতে হলে বাঙালির নৃততাত্ত্বিক পরিচয়, জীবনধারা, সমাজের গতি, চিন্তা-ভাবনা, ধর্মবিশ্বাস, অর্থনীতি, রাজনীতি—সবকিছু কার্য-কারণসমেত জানতে হবে—বাঙালিকে জানতে হবে। হাজার বছরের বাঙালি। কোন বই কোন লেখক কোন সময়ে কেন লিখেছেন, কোন বইতে কি আছে, সমাজে কোন বইয়ের প্রভাব কি হয়েছে এসব জানতে হবে। সব বই নয়, অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ বই। কালক্রম অনুসরণ করতে হবে। কালক্রম অনুসরণ না করলে ইতিহাস হয় না। ইতিহাস মানে মৃত অতীতের প্রাণহীন বিবরণ নয়, ইতিহাস হল জীবন্ত বর্তমানের প্রয়োজনে মানুষের অতীত অভিজ্ঞতাকে জানা এবং কাজে লাগানো। অতীতে মজে গেলে বুঝতে হবে তোমার ইতিহাস-চেতনা নষ্ট হয়ে গেছে। তোমার দৃষ্টি থাকবে সামনে—ভবিষ্যতের দিকে, পেছনের দিকে নয়। নতুন ভবিষ্যত সৃষ্টি করতে হবে। তার জন্যই ইতিহাসের চর্চা। আগে জান, জানবার চেষ্টা কর, তার পরে পরীক্ষার কথা চিন্তা কর। জানলে পরীক্ষার খাতায় লিখতে পারবে। ভালো লিখলে কার সাধ্য যে তোমাকে নম্বর কম দেয়? আমি মনে করি, পরীক্ষার ভয় শিক্ষার অন্তরায়। যে শিক্ষার্থী শিক্ষা বলতে কেবল পরীক্ষা পাসের প্রস্তুতি বোঝে, তার প্রতি আমার কৌতূহল কম। যে জানতে-বুঝতে আগ্রহী, তার প্রতি আমার কৌতূহল সীমাহীন। তবে পরীক্ষায় তোমাদের ভালো ফল করতে হবে, নইলে সমাজে টিকতে পারবে না। সমাজ বড় নির্দয়, বিশেষ করে আমাদের দেশে। তোমাকে সারা জীবন সার্টিফিকেটের জোরে চলতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেট। জ্ঞানী মানুষ হওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেই হবে—এমন কোনো কথা নেই। সার্টিফিকেট ছাড়াও, চেষ্টা করলে লোকে জ্ঞানী হতে পারে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নির্ভরশীল ছিলেন না। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তাঁদের মনোভাবও ভালো ছিল না। প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুন তাঁদের সহ্য হত না। জীবনী পড়ে দেখ। জীবনী পড়ে জীবনকে বুঝলে অনেক লাভ হয়—ভালো জীবনী, যাতে জীবনের ভালো এবং মন্দ দুই দিকের কথাই লেখা হয়। ভালো-মন্দ মিলিয়ে মানুষ। সেই মানুষকে জানতে হবে। মন্দটা লুকালে হবে না। মনে

রাখবে, কাউকে দেবতা বানিয়ে যে জীবনী লেখা হয়, তা জীবনী হয় না—ভূতপ্রেতের কাহিনী হয়। বড় মানুষদের জীবনেও ভালো যেমন আছে, তেমনি মন্দও আছে। শুধু ভালো কিংবা শুধু মন্দ নয়। রক্ত মাংস এবং কামনা বাসনা সমেত মানুষকে জানতে হবে। শক্তিমত্তার সঙ্গে দুর্বলতার কথাও জানতে হবে। তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছ ডিগ্রি নেওয়ার জন্য। আমি চাই, তোমরা প্রত্যেকে ভালো ডিগ্রি অর্জন করে নিজ নিজ অস্তিত্বের শর্ত নিশ্চিত কর। কিন্তু ডিগ্রি কোনো শেষ কথা নয়। বলতে পার—ডিগ্রি নিয়ে আরম্ভ। তোমাদের অস্তিত্বের মর্মে বিরাট সব সম্ভাবনার বীজ ঘুমন্ত আছে। সেগুলোকে জাগিয়ে দেওয়া আমার কাজ—শিক্ষকের কাজ। তোমরা ক্লাসে শৃংখলা রক্ষা করে চলবে। মনে রাখবে, ক্লাসে আমি চীফ মার্শাল ল' এ্যাডমিনিস্ট্রেটর। আমার পড়ানোর বিষয় নির্ধারিত আছে—বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস। এ বিষয়ে আমি ধাপে ধাপে অনেক কথা বলব। তোমাদের শুনবার মতো মন চাই। সাহিত্যের ইতিহাস তো আমাদের বিষয়, পড়তেই হবে। সেই সঙ্গে বাঙালির জীবন, সমাজ, মন-মানসিকতা, ধর্মবিশ্বাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, পরিবর্তনের ধারা, কার্যকারণ ইত্যাদি সকল বিষয়ই জানতে হবে। সাহিত্যের মধ্যে জীবনের কথা, পরিবেশের কথা যেমন পাওয়া যায় তেমন আর কোথাও পাওয়া যায় না। তোমাদের আবহমান কালের বাংলা ও বাঙালি-জীবনকে জানতে হবে। নাড়ি-নক্ষত্র জানতে হবে। জানি, আমার কথা তোমাদের খারাপ লাগতে পারে। খারাপ লাগলে তোমরা আমার নিন্দা করতে পার, কিন্তু ক্লাসে নয়, বাইরে গিয়ে, আমার সামনে নয়, অগোচরে। আমার সঙ্গে ইচ্ছা হলে তর্ক করতে পার—তর্কে জিতে যেতে পার। তর্কে হারলে আমার খারাপ লাগে না; আমি মনে করি; সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই বড় কথা—সত্যের সন্ধানে তর্ক করলে তর্কে কোনো হারজিত নেই। সত্যের সন্ধানে অগ্রগতি হলে যিনি তর্কে জেতেন তাঁর মতোই যিনি হারেন তিনিও আসলে জেতেন। কারণ যিনি হারেন তাঁর সঙ্গে তর্ক ছাড়া বিজয় সম্ভব হত না। ভেবে দেখ, এই দেশে মানুষের জীবন অনেক সুন্দর হতে পারে, দুঃখ-কষ্ট কমতে পারে। সকলেই সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে পারে। বাঙলা পড়ে তোমরা এটা আরও বেশি করে উপলব্ধি করবে। তবে ইংরেজি ভাষার জ্ঞানও তোমাদের দরকার। জ্ঞানের ভাণ্ডার ইউরোপ-আমেরিকা। জ্ঞান পেতে হলে ইংরেজি ভাষা জেনে ইংরেজি বই পড়ে খুঁজতে হবে। জ্ঞানকে তোমাদের বাস্তবে খুঁজতে হবে এবং বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে হবে। বাঙলা পড়ে কূপমণ্ডুক হবে না। ভেবে দেখ, সমাজের কাছে তোমরা প্রত্যেকে অসংখ্য কারণে অসংখ্যভাবে ঋণী। কেবল আজকের সমাজ নয়, অতীতের সমাজও। সমাজ না থাকলে, পূর্বপুরুষের আবিষ্কার-উদ্ভাবনের সুফল তোমাদের কাছে না পৌঁছলে তোমাদের জীবন কেমন হত, ভেবে দেখেছ? কাজেই শিক্ষা লাভ করে, জ্ঞানী হয়ে জ্ঞানকে সমাজের ও ভবিষ্যত জেনারেশনের কল্যাণে কাজে লাগাবে। ঋণ শোধ করবে।"

এসব উপদেশাত্মক ও নির্দেশমূলক কথা তিনি পরপর তিন-চারটা ক্লাসে চতুষ্পার্শ্বের বাস্তব ঘটনাবলি ও ইতিহাস থেকে নানা উদাহরণ দিয়ে হাস্য-কৌতুক ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে দিগ্বিজয়ী বীরের মতো বলতেন। তাঁর স্বভাবটাই ছিল এমন যে, প্রচলিত জনমত ও সংস্কার-বিশ্বাসে আঘাত দিয়ে তীব্রতার সঙ্গে অত্যন্ত

দ্রুতগতিতে তিনি কথা বলতেন। বক্তব্য প্রকাশে যৌক্তিক শৃঙ্খলার তোয়াক্কা করতেন না। তাঁর কথায় আবেগ থাকত। সারা বছর একইভাবে দ্রুততার সঙ্গে তিনি প্রতি ক্লাসে কথা বলতেন।

কি অতীতের বেলায়, কি বর্তমানের বেলায়—খারাপ দিকের এবং খারাপ ঘটনাবলির বর্ণনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেওয়াতে তাঁর উৎসাহ সব সময়েই বেশি দেখেছি। বাঙালি-চরিত্রের—কি অতীতের, কি বর্তমানের—খারাপ দিকগুলোর কথা তিনি অত্যন্ত তীব্রতার সঙ্গে বলতেন এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেন। এই প্রবণতার পরিচয় তাঁর লেখাতেও আছে। তাঁর এই প্রবণতার জন্য প্রবীণ ও তরুণ অনেককেই আহত হতে দেখেছি। আবার অনেকে এতে খুব উৎফুল্লও হয়েছেন। হয়তো তাঁর ধারণা ছিল যে, খারাপ সম্পর্ক জানলে এবং সতর্ক হলে মানুষ খারাপের দিকে না গিয়ে ভালোর সন্ধান করবে। হয়তো পুরস্কার দানের চেয়ে তিরস্কার করাকে তিনি বেশি সুফলদায়ক মনে করতেন। বাঙালির এবং বাঙালিচরিত্রের উন্নতির কথাই তিনি সব সময় চিন্তা করেছেন। কিন্তু কি বাস্তবে, কি ইতিহাসে, বাঙালিচরিত্রে ভালো কিছু তিনি খুঁজে পেতেন না। এ ব্যাপারে প্রশ্নের সম্মুখীন হলে ভালোর সন্ধানে তাঁকে অনেক খোঁজাখুঁজি করতে হত। এক্ষেত্রে তাঁর প্রবণতা ছিল স্বতঃস্ফূর্ততার দিকে। হয়তো স্বতঃস্ফূর্ততাকেই তিনি আন্তরিকতা মনে করতেন। তাঁর ওই প্রবণতাকে আমি ফুটিয়ে তুলতে পারলাম না। স্মৃতি থেকে কিছু ভালো কথাই উদ্ধৃত করতে চেষ্টা করলাম।

সব কথা কি কারো মনে থাকে? ফ্রয়েডে আছে, যে কথা, যে বিষয় মানুষ পছন্দ করে তা তার মনে থাকে, অপছন্দের বিষয়গুলো সহজে মন থেকে মুছে যায়—দুর্ঘটনার কথা আলাদা। জানি না, ফ্রয়েডের এই পর্যবেক্ষণ ঠিকও হতে পারে। অধ্যাপক আহমদ শরীফের সকল প্রবণতা অবশ্যই আমার মনে দাগ কাটেনি। অনেক কিছুকে মনে স্থানও দিতে চাইনি। তাঁর নেতিবাচক প্রবণতা প্রথমে ভালোই লাগত; কিন্তু অচিরেই আমি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে চেয়েছি।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর কথা খুব পছন্দ করত, আবার কেউ কেউ খুব অপছন্দ করত। অনেকে তাঁকে খুব ভয় করত। শিক্ষক হিসেবে তাঁর অস্তিত্ব সকলেই তীব্রভাবে অনুভব করত, তাঁর শক্তি-সামর্থ্য সকলে স্বীকার করত। ক্লাস শেষ করার আগে সাধারণত তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন করার সুযোগ দিতেন এবং প্রশ্নের উত্তর দিতেন। এক ক্লাসে সম্ভব না হলে একাধিক ক্লাসে তিনি প্রশ্নের উত্তর দিতেন। ছাত্রদের প্রশ্ন মনে রাখতেন।

ক্লাসে রোল কল করা থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ব্যাপারেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন মেনে চলতেন। ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্লাসে ঢুকতেন আবার ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যেতেন। এ দিক দিয়ে তিনি অত্যন্ত প্রথানিষ্ঠ ছিলেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন পরিবর্তন করার জন্যও তিনি চেষ্টা করেছেন এবং শেষ পর্যায়ে সে চেষ্টা বেশি করেছেন। বাংলা বিভাগে শিক্ষকদের মধ্যে তিনি নিঃসঙ্গ ছিলেন; তবে একা, একলা চলার শক্তি-সাহস তাঁর ছিল। রবীন্দ্রনাথের "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে ..." তাঁর একটি প্রিয় গান ছিল।

অধ্যাপক আহমদ শরীফের সঙ্গে আমি এক বছরই ক্লাস করেছি এবং তা ওই সাহিত্যের ইতিহাসের ক্লাস। শুনেছি অনুশীলনী ক্লাসেও তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও কঠোর

ন। ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা মনোযোগ দিয়ে পড়ে তিনি ভাষার ও তথ্যের ভুল ধরিয়ে ন এবং চিন্তার অস্পষ্টতা ও অসঙ্গতি নির্দেশ করতেন। বহু ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে তাঁর গত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সহজে গড়ে উঠত। তাঁর কাছে ঘেঁষতে ভয় করত ন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাই বেশি ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ষাটের দশকে প্রতি ক্লাসে াঁচ্চ চল্লিশজন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হত, উপস্থিতি কিছু কম হত। এমএ শেষ পর্বে সংখ্যা হত, আশি জনের মতো। অনার্স পাস এবং এমএ প্রথম পর্ব পাস ছাত্র-ছাত্রীরা এমএ । পর্বে একত্রে ক্লাস করত বলে সংখ্যা বড় হত। তখন কিছু ছাত্র-ছাত্রী কলেজ কও আসত। তখনকার পরিবেশ এখনকার চেয়ে গুণগতভাবে ভিন্ন ছিল।

অধ্যাপক আহমদ শরীফকে অনেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করেছেন, অনেকে মনে াছেন খুব সরল আবার অনেকে মনে করেছেন খুব গোঁয়ার। মানুষকে সহজভাবে াস করার এবং ষড়যন্ত্রকে ঘৃণা করার প্রবণতা ছিল তাঁর। নীতিতে অটল থেকে ক্ষতি র করে সাফল্যের জন্য অপেক্ষা করার শক্তিও ছিল প্রচুর। নীতির সঙ্গে নমনীয়তার তিনি অল্পই বিবেচনা করেছেন। কোনো কোনো অভাবগ্রস্ত ছাত্র-ছাত্রীকে তাঁর কাছ ক আর্থিক সাহায্য নিয়ে উপকৃত হতে দেখেছি।

আমি আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সংক্ষেপে শিক্ষক আহমদ শরীফের ব্যক্তিত্ব ও স-প্রবণতার কিছু বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করলাম। অবশ্যই সকলের কাছে ব্যক্তিত্ব এক রকম ঠেকেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি চৌত্রিশ বছর শিক্ষকতা াছেন। এই গোটা সময় ধরে তাঁর পড়ানোর বৈশিষ্ট্য এবং চিন্তা-ভাবনা এক রকম কনি। আর ছাত্র-ছাত্রীরাও নিজেদের মানস-প্রবণতা ও সময়ের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ন্নরূপে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মতামতকে অনুভব করেছে। বিভিন্ন জনের উপলব্ধিও শ্যই বিভিন্ন রকম হয়েছে। তবে মনে হয়, ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর শিক্ষকতা জীবনের া সময় ধরেই তাঁর ব্যক্তিত্বের অসাধারণ শক্তি এবং মতামতের তীব্রতা অনুভব াছে।

কদাচিত কখনও কারও ছুটিজনিত শূন্যতা পূরণের জন্য তিনি অন্য কোনো বিষয় য়ে থাকতে পারেন, কিন্তু গোটা সময় ধরেই তিনি তৃতীয় বর্ষ অনার্স ও এমএ প্রথম র্ব প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং এমএ শেষ পর্বে পাণ্ডুলিপি ও সমালোচনা পড়িয়েছেন। অবশ্য শেষে বারো বছরেরও বেশি সময় তিনি এমএ শেষ র্ব পাণ্ডুলিপির বদলে বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর পড়িয়েছেন। প্রথম জীবনে কোনো নো বছর সাবসিডিয়ারি বাংলার ক্লাসও নিয়েছেন। একই বিষয় পড়ালেও নতুনত্ব-সী ও উদ্ভাবন-প্রবণ শিক্ষক হিসেবে তাঁর পড়ানোতে প্রতি বছরই হয়তো কিছু না ; নতুনত্বের প্রকাশ ঘটেছে। বিষয়ের দাবিতেই তিনি যেসব কথা ক্লাসে তীব্রভাবে াছেন সেগুলোর মধ্যে, বাঙলাভাষী ভূভাগ ও বাঙলার জনপ্রবাহ, বাঙলা ভাষা ও ত্য এবং বাঙালির বৈশিষ্ট্য ও জাতীয় চরিত্র ইত্যাদির ক্রমবিকাশ সম্পর্কে তথ্য, , নিজের ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি ব্যক্ত করেছেন। প্রাচীন ও যুগ পড়ালেও আধুনিক যুগ অর্থাৎ ইংরেজ আমল ও পাকিস্তান আমল সম্পর্কেও তিনি মত ব্যক্ত করতেন। চতুষ্পার্শ্বের সমকালীন ঘটনাবলি থেকে উদাহরণ দিয়ে, াতের সঙ্গে বর্তমানের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখিয়ে, তিনি মৃত অতীতকে জীবন্ত

বর্তমানের মতো করে ফুটিয়ে তুলতে চাইতেন। তাঁর কথায় লোকে অসন্তুষ্ট হচ্ছে কি-না তা তিনি অল্পই বিবেচনা করতেন। স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের এক মূল বৈশিষ্ট্য।

অধ্যাপক আহমদ শরীফের চিন্তা ও মতামত তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সকলে যে তাঁর মত গ্রহণ করেছে তা নয়, তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তাঁর মতের বিরূপ ফলও দেখা গেছে।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ যেসব মত কথা ও লেখার মধ্য দিয়া অত্যন্ত তীব্রতার সঙ্গে প্রচার করতে চেয়েছেন, আমার আজকের স্মৃতি ও ক্ষণিক চিন্তা অনুযায়ী সেগুলো নিম্নরূপ :

১. বাংলাভাষী ভূভাগ ভারতের পূর্ব প্রান্তে ব্রহ্মাবর্ত ও আর্যাবর্ত থেকে দূরে অবস্থিত বলে বাঙালিদের মধ্যে আর্য-প্রভাব হয়েছে ক্ষীণ। প্রথম পর্যায়ে বাঙালিদের মধ্যে আর্য-প্রভাব এসেছে প্রধানত বৌদ্ধদের মাধ্যমে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাঙালি সভ্যতার ভিত্তিভূমিতে বৌদ্ধধর্মের উপর যে গুরুত্ব দিয়েছেন তা যথার্থ। বাঙালির বৌদ্ধ সভ্যতা সম্পর্কে গভীরতর অনুসন্ধান দরকার। কেবল চর্যাপদ দিয়ে হবে না, চর্যাপদের বাইরেও দৃষ্টিকে যতদূর সম্ভব প্রসারিত করতে হবে। মাটি খুঁড়ে পাথর খুঁজে দেশে-বিদেশে গিয়ে সত্যের নিদর্শন উদ্ধার করতে হবে।

২. নৃতাত্ত্বিক বিচারে বাঙলার হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান সকলেই একই উৎসজাত : প্রধানত নিষাদ বা আদি-অস্ট্রেলীয় এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কিরাত বা মঙ্গোলীয় নৃ-গোষ্ঠির মিলনে-মিশ্রণে উৎপন্ন। বাঙলাভাষী ভূভাগের জনপ্রবাহে ককেশীয় বৃহৎ মানবগোষ্ঠির কোনো কোনো শাখার অতি সামান্য মিলন-মিশ্রণ ঘটেছে। বাঙালি সঙ্কর জাত। সাঙ্কর্য এমনভাবে ঘটেছে যে, কারও মধ্যেই কোনো এক ধারার বিশুদ্ধতা বজায় নেই। বাঙলার ব্রাহ্মণরা এবং নমশূদ্ররা একই উৎসজাত। ইতিহাসের দিক দিয়ে বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায়ের মত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বর্ণসাঙ্কর্য এমনভাবে ঘটেছে যে, ব্রাহ্মণদের আলাদা ধর্মীয় এবং সমাজতাত্ত্বিক পরিচয় আছে, কিন্তু কোনো আলাদা নৃতাত্ত্বিক পরিচয় নেই। বাঙালি ব্রাহ্মণদের আর্যগৌরববোধ সম্পূর্ণ মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা ধূর্ত কৌশলে তারা ব্রাহ্মণ পরিচয় নিয়েছে। বাংলার তুর্কি, আফগান, ইরানি ও মোগলরা বিজয়ী কিংবা শাসক হিসেবে এদেশে এসেছে এবং কঠোর আভিজাত্যবাদী নীতি গ্রহণ করে তারা এদেশে সাত-আট শো বছর ধরে বিদেশী, বিজাতি, বিভাষী রূপে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে—বাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে তারা কোনো আত্মীয়তার সম্পর্কে, বৈবাহিক সম্পর্কে আসেনি। সমাজে ও রাষ্ট্রে এদের আধিপত্যের ফলে বাঙালি মুসলমানদের আত্মবিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইতিহাসের দিক দিয়ে দেখলে, বাঙালি হিন্দুদের জাতিভেদের চেয়ে বাঙালি মুসলমানদের আশরাফ-আতরাফ ভেদাভেদ একটুও কম ক্ষতিকর হয়নি। মুসলমানদের মধ্যকার জাতে ওঠার প্রবণতা হীনমন্যতাবোধ-জাত। বাংলার সৈয়দ, কোরেশি, গজনবি, খোরাসানি, ইসপাহানিদের বংশপরিচয়ে গলদ আছে। টাকা-পয়সা আর কিছু শিক্ষা লাভ করে হীনমন্যতা বশে জাতে ওঠার জন্য

নেকে নামের সঙ্গে এসব খেতাব ধারণ করেছে এবং নানা কৌশলে বংশানুক্রমিকভাবে া চালিয়ে যাচ্ছে।

ক্লাসে এবং অন্যত্র অনেক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে অধ্যাপক আহমদ শরীফ ছরের পর বছর ধরে বলেছেন : "হজরত মুহম্মদ থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর যত বংশধর াটা পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে তারা প্রত্যেকে যদি চৌদ্দটা করে বিয়ে করত এবং তাদের ত্যেক স্ত্রীর যদি পঞ্চাশটা করে সন্তান হত, তা হলেও এক বাংলাদেশে এখন যত য়দ আছে তত হত না। মিথ্যার বেশাত কত জঘন্য একবার বুঝে দেখ।"

মিথ্যার প্রতি ঘৃণাবশত অনেকে নাম থেকে সৈয়দ বাদ দিয়েছেন, যেমন ইসমাইল াসেন সিরাজী, আবুল হুসেন, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, ফর্‌রুখ আহমদ, সিকন্দার াবু জাফর, আরো অনেকে। জাতে ওঠার প্রবণতা, জাত পরিচয় বদলানোর প্রবণতা ও নমন্যতাবোধ বাঙালি মুসলমানদের উন্নতির পথে বড় অন্তরায়। নিজের বংশপরিচয় য় লুকায়, জাতপরিচয় বলতে গিয়ে মিথ্যা বলে, সে কখনও বড় হতে পারে না। বাংলার সলমানরা কুতুবুদ্দিন আইবেক কিংবা আওরঙ্গজেবের বংশধর নয়; বখতিয়ার খিলজি কিংবা সিরাজুদ্দৌলা কিংবা মিরজাফরের বংশধরও নয়। বাংলার মুসলমানরা প্রধানত বৌদ্ধ এবং কিছুটা নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছে। উন্নতি রতে হলে আত্মপরিচয়ের প্রকৃত তথ্যকে স্বীকার করে চলতে হবে। কৈবর্তের জাত লে, নমশূদ্রের জাত বলে হীনমন্যতায় ভুগলে চলবে না। আত্মপরিচয় বদলানোর বণতা নীচ মানসিকতার পরিচায়ক। জাত-পরিচয়ের সত্য স্বীকারে হীনমন্যতাবোধ ও াতে ওঠার প্রবণতা হিন্দুদের মধ্যেও আছে—হাজার হাজার বছর ধরে আছে। জন্ম হোক যথাতথা, কর্ম হোক ভালো—এই নীতি গ্রহণ করতে হবে।

৩. বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে এবং চর্যাপদের কাল সম্পর্কে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ত ভুল, অধিকাংশ পণ্ডিতের মতই ভুল। চর্যাপদ আদৌ বাংলা ভাষার কোনো নিদর্শন য়—তখনও বাঙলা ভাষার উদ্ভব হয়নি, বাঙলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণ ীর্তন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণও আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তের দিকে ঠলে দেয়—সুনীতিকুমার নিজে যাই সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকুক না কেন। চর্যাপদের উপর াসমীয়া, বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দি—সকল ভাষার লোকদেরই সমান দাবি। আসলে তখনও াসব ভাষার উদ্ভব হয়নি। এসব ভাষার উদ্ভব আরও পারে—চর্চাপদের পরে।

৪. চর্চাপদকে বাংলা বলে স্বীকার করার ফলে 'বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগের ত্ত্ব' দানা বেঁধেছে। এই তত্ত্বের পেছনে হিন্দু ইতিহাসবিদদের হিন্দু-মানসিকতা ও স্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ক্রিয়াশীল। 'বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগের তত্ত্ব' তথ্যভিত্তিক নয়, তরাং তা স্বীকার করা অনুচিত। ধর্মের উর্ধ্বে উঠে মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ইতিহাস াচার করতে হবে।

৫. নাথ সাহিত্য, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস ইত্যাদি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সাহিত্য। বাউল ধর্ম বৌদ্ধ উৎসজাত—বাউল সম্প্রদায় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায় রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং রে বৈষ্ণব ও সুফিদের প্রভাবে সহজিয়া রূপ নিয়ে বিকশিত হয়েছে। এক সময়ে াউলরা সংখ্যায় অনেক ছিল, পরে তারা হিন্দুতে ও মুসলমানে বিলীন হয়েছে। াউলদের 'মানুষ' কিংবা 'মনের মানুষ' আসলে আমাদের মতো রক্ত-মাংসের মানুষ নয়; াউল ধর্মে 'মানুষ' শব্দের অর্থ 'ঈশ্বর'।

৬. বাংলায় তুর্কি শাসন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের দ্বার উদঘাটনে সহায়ক হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বাঙলা ভাষাবিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেনের মত যথার্থ। বাংলা মঙ্গলকাব্যসমূহের উৎপত্তি তুর্কি শাসন ও মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাবজাত। পাঠান সুলতানদের শাসনকাল এবং তৎকালীন বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মত যথার্থ। বাঙলা ভাষার মাধ্যমে তখন বাঙালি মন চমৎকার স্ফূর্তি পেয়েছিল।

৭. চৈতন্যদেব এক অসাধারণ বাঙালি মনীষী এবং সমাজনেতা ছিলেন। তাঁর প্রচারিত গৌড়ীর বৈষ্ণব ধর্মের প্রেরণায় ষোড়শ শতাব্দিতে বাঙালি মন অসাধারণ স্ফূর্তি পেয়েছিল। এ সম্পর্কে হুমায়ুন কবিরের পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য অত্যন্ত মূল্যবান। বৈষ্ণব সাহিত্য প্রমাণ করে, ষোড়শ শতাব্দি বাঙালির এক রেনেসাঁসের কাল। বাঙালির ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যের মতো মানবকল্যাণকামী ও প্রভাবশালী নেতা আর পাওয়া যায় না। অবশ্য একালে বাঙালিচরিত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও ব্যাপক এবং গভীর। তবে এই দুই মনীয়ীর প্রভাবে বাঙালিচরিত্রে দৃঢ়তা দেখা দেয়নি—তাঁদের প্রভাবে শেষ পর্যন্ত বাঙালি সহজিয়া পন্থা অবলম্বন করে দুর্বলচরিত্র হয়েছে।

৮. বাঙলাভাষী ভূভাগের মুসলমান সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক প্রবণতা—যুক্তিবিরোধী মনোভাব, অনুন্নতির কারণ, উন্নতির উপায় এবং অভ্যন্তরীণ অনৈক্যের স্বরূপ বুঝতে হলে বাংলায় এবং ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার, তুর্কি-আফগান-মোগল শাসনের প্রকৃতি ইত্যাদি গভীরভাবে বুঝতে হবে। রাজনৈতিক ইতিহাসে বাংলায় ও ভারতে আগত মধ্যযুগের তুর্কি-আফগান-ইরানি-মোগলদের 'মুসলমান' বলে অভিহিত করা অনুচিত। তারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লক্ষে এদেশে এসেছে—যেমন পরবর্তীকালে ইংরেজরা এসেছে। ইংরেজ শাসনকে খ্রিস্টান শাসন বলা হয় না, অথচ তুর্কি-আফগান-মোগল শাসনকে মুসলিম শাসন বলা হয়। ইংরেজরা তাদের ঔপনিবেশিক শাসনের প্রয়োজনে ইতিহাসকে এভাবে রূপ দিয়েছে। বাঙালিরাও তা গ্রহণ করেছে। এটা অনুচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করতে হবে।

৯. বাঙলা সাহিত্যের ও বাঙালি জাতির ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে হিন্দু ইতিহাসবিদরা বাঙালি মুসলমানদের প্রায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেছেন। এর ফল খারাপ হয়েছে। বাঙালির ইতিহাসে এবং বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে মুসলমানদের প্রকৃত অবস্থান ও ভূমিকাকে সমুচিত স্থান দিতে হবে। এ ব্যাপারে মুসলমান লেখকদেরকে হিন্দু-মুসলমানের উর্ধে দাঁড়িয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিশ শতকের মাঝামাঝিতে বাঙলাভাষী অঞ্চলে মুসলমানরা মোট জনসংখ্যার ছাপ্পান্ন শতাংশ ছিল।

১০. পাল রাজারা বাঙালি ছিলেন না। পালদের সাম্রাজ্যও বিস্তৃত ছিল মগধ পার হয়ে আর্যাবর্তের অনেকটা জুড়ে। গোটা বাঙলাভাষী অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিমের মাত্র একটা অংশ পাল রাজাদের রাজ্যভুক্ত ছিল। পূর্ব বাঙলা, দক্ষিণ বাঙলা পালদের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল না। সুতরাং পাল-রাজত্বকাল নিয়ে বাঙালির গর্ববোধ অর্থহীন। চর্যাপদ বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন—একথাও বাঙালির অন্তঃসারশূন্য গর্ববোধেরই প্রকাশ মাত্র। আসার আস্ফালন অর্থহীন।

১১. বাংলা দিল্লির মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে বাঙালির স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়। শাহজাহানের প্রাসাদমালা এবং আওরঙ্গজেবের প্রায়

অর্ধশতাব্দিব্যাপী যুদ্ধ ইত্যাদির ব্যয়ভার অনেকটাই সুবে বাংলাকে শোষণ করে সংগ্রহ করা হয়েছে। মোগল শাসন বাঙালির ক্ষতি করেছে। এ ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্রের পর্যবেক্ষণের বাস্তব ভিত্তি পাওয়া যায়।

১২. বাঙালির জাতীয় চরিত্র অত্যন্ত নিকৃষ্ট। ইতিহাসে দেখা যায়, বাঙালি ইহপরায়ণ ও ভোগলিপ্সু বটে তবে, অলস, কর্মকুণ্ঠ, নিরীহ, ভীরু, ঈর্ষাপরায়ণ, আত্মকলহপরায়ণ, পরবশ্য, চৌর্যপ্রবণ, দাসমনোভাবাপন্ন। বাঙালির গোটা ইতিহাস বিদেশী, বিভাষী, বিজাতি দ্বারা শাসিত হওয়ার ইতিহাস, পরাধীনতার ইতিহাস। দীর্ঘ পরাধীনতার কারণে বাঙালির মানসিকতা ও আচরণ বিকারপ্রাপ্ত। যে ধারায় চিন্তা ও কাজ করলে বাঙালি উন্নতি করতে পারবে বাঙালি, চিন্তা ও কাজ করে ঠিক তার বিপরীত ধারায়।

১৩. বাঙালির ইতিহাসে গৌরব করার মতো কিছু পাওয়া যায় না। তবে সম্ভাবনা আছে—উন্নতির সম্ভাবনা। এটা মনে রেখে বাঙালির উন্নতির উপায় খুঁজতে হবে।

১৪. বাঙালির উন্নতির জন্য বাঙালি চরিত্রের পরিবর্তন অপরিহার্য। বাঙালিকে ইউরোপীয় চরিত্রের গুণাবলি ও ইউরোপ-আমেরিকার দর্শন-বিজ্ঞান আয়ত্ত করে উন্নতির পথ আবিষ্কার করতে হবে। কেবল কবিতা, নাটক ও গানের চর্চা বাঙালি চরিত্রের উন্নতির জন্য নিতান্তই অপ্রতুল। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদির চর্চার সঙ্গে কবিতা-নাটক-গানের চর্চা কল্যাণকর হতে পারে।

আমার যেটুকু স্মরণ হচ্ছে তাতে মনে হয়, এই ধরনের কতগুলো বিষয়ে ওপর কেন্দ্রীয় গুরুত্ব দিয়ে অধ্যাপক আহমদ শরীফ বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস পড়িয়েছেন। তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন সাহিত্যের অন্তর্গত বিষয়বস্তু ও সামাজিক পটভূমির উপর; রস ও সৌন্দর্যও বিচার করেছেন, তবে আলঙ্কারিক বিচারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। মধ্যযুগের কথা বলতে বলতে প্রসঙ্গক্রমে তিনি চলে এসেছেন আধুনিক যুগে—রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-রবীন্দ্র প্রসঙ্গে, এমনকি একেবারে সমকালীন বিষয়ে। অতীতচারিতা তিনি পছন্দ করতেন না, তিনি ছিলেন সম্মুখদৃষ্টির মানুষ। জ্ঞানকে তিনি কেতাবি বিষয় হিসেবে না দেখে একেবারে বাস্তব জীবনের অঙ্গীভূত ক্রিয়াশীল বিষয় রূপে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণ তিনি স্বীকার করতেন না—মার্কসবাদীদের দ্বারা উপস্থাপিত যুক্তিসমূহকে তিনি নিজের মতো করে ব্যক্ত করতেন। তবে একথা তিনি সব সময়েই নিঃসংশয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন যে, চরিত্রবলের দিক দিয়ে বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অদ্বিতীয়। বিদ্যাসাগরের গুণপনা বর্ণনা করতে গিয়ে সব সময়েই তিনি উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। তিনি একথাও বলতেন যে, রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগারের অজেয় পৌরুষের কথা যেভাবে বলেছেন তাতে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব সবচেয়ে সুন্দর ভাষারূপ পেয়েছে। তাঁর মতে বিদ্যাসাগরই হওয়া উচিত সকল বাঙালির অনুকরণীয় চরিত্র। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, বঙ্কিমকে মুসলমান বাঙালিরা সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছে—মুসলিম লীগ অনুসারীরা নিজেদের হীন স্বার্থে ভুল বুঝিয়েছে। হিন্দুরাও বঙ্কিমকে বুঝতে চায়নি। যারা বঙ্কিমকে ঋষি রূপে গ্রহণ করেছে তারা তাঁর নাম ব্যবহার করেছে, বিচার-বিবেচনা করে বুঝতে চায়নি, তাঁর স্পিরিটকে ধরতে পারেনি। তাঁর মতে, বিবেক, বুদ্ধি ও আবেগের

সংশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বও বাঙালির ইতিহাসে অতুলনীয়। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের পার্থক্যও তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে বাঙলাদেশের এবং পশিচম বাঙলার বাঙালিরা যদি বিদ্যাসগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষা ও বক্তিত্বকে বুঝতে চেষ্টা করে, বুঝতে পারে, তাহলে নিজেদের উন্নতির পথ সন্ধান তাদের জন্য সহজ হয়ে উঠবে।

মধ্যযুগের বাংলা, বাঙালি, বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালির ধর্ম ও জীবনধারা সম্পর্কে আগেও কোনো কোনো পণ্ডিত এ ধরনের মত প্রকাশ করেছেন। তবে অধ্যাপক আহমদ শরীফের প্রকাশভঙ্গিতে স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য আছে। তিনি মত প্রকাশ করেছেন তীব্রতার সঙ্গে আর অনেক হারিয়ে যাওয়া ও বিস্মৃত তথ্য তিনি সামনে এনেছেন এবং সেগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন। বাঙলা ভাষার সকল যুগের প্রধান লেখকদের এবং প্রধান গ্রন্থসমূহের গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা তিনি করতেন। অলৌকিক, অজাগতিক, অপার্থিব, অবাস্তর, উদ্ভট, অলীক বিষয়াদির প্রতি শিক্ষার্থীদের কোনো প্রকার বিশ্বাস যাতে অবশিষ্ট না থাকে, সারা জীবন তিনি পরোক্ষ উপায়ে অঘোষিত অবস্থানে থেকে তার জন্য চেষ্টা করেছেন। শিক্ষকতা-জীবনের শেষ দিকে, বিশেষ করে আবসর গ্রহণের পরে তিনি নাস্তিকতার পক্ষে প্রকাশ্যে কথা বলেছেন এবং মৃত্যুর বছর দশেক আগে থেকে তিনি অত্যন্ত প্রবলভাবে নাস্তিক বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন এবং আস্তিক মানুষের সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন। বিশ্বাসীদের উদ্দেশে আক্রমণাত্মক কথাও তিনি বলেছেন এবং তার ফলে তিনি নিজেও পাল্টা আক্রমণের শিকার হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তবে তা দ্বারা কিছু সময়ের জন্য হলেও গোটা জাতির মনোযোগ তিনি নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন। বাঙালির ইহপরায়ণতার প্রশংসা করেছেন তিনি। তিনি তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের এবং আড্ডার আসরের ও সভা-সমিতির শ্রোতাদের মন থেকে অলৌকিক বিশ্বাস ও অজাগতিক ধারণা সম্পূর্ণরূপে মুছে দিতে চেয়েছেন এবং চেয়েছেন তাদের মনে নির্ভেজাল জাগতিক চেতনার ও মর্তপ্রীতির বিকাশ ঘটাতে। তাঁর এই জীবন-জগতদৃষ্টির বাস্তবায়নের জন্য তিনি তাঁর নিজের জীবনের পেশাগত সুযোগকে এবং বাঙালির ইতিহাস নিয়ে তাঁর সাধনাকে যথাসম্ভব কাজে লাগিয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসের, বিশেষ করে হজরত মুহম্মদ থেকে কারবালার যুদ্ধ ও উমাইয়াদের উত্থান পর্যন্ত সময়ের মানবিক ও জাগতিক দিকসমূহের, সমাজ-সংস্কারের, ক্ষমতার লড়াইয়ের ও রাজনৈতিক ইতিহাসের গভীর জ্ঞান তিনি অর্জন করেছিলেন। এই জ্ঞানকেও তিনি তাঁর মত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে চেয়েছেন। অনেক সময়েই তিনি কথা বলেছেন missionary zeal নিয়ে। তবে তিনি কৌতুকপ্রবণ ছিলেন এবং হাস্যরস উপভোগে উৎসুক থাকতেন। তাঁর মুখে শুনেছি, কৈশোরান্তে ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি নিরীশ্বর জীবন-জগতদৃষ্টিতে উত্তীর্ণ হন, ক্রমে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁর সেই জীবন-জগতদৃষ্টি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়। তবে ১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝিতে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিজের নাস্তিক অবস্থানের কথা লিখিতভাবে কিংবা মৌখিকভাবে জনসমক্ষে প্রকাশ করেননি। তখন পর্যন্ত এ বিষয়ে নিজের অবস্থানের কথা তিনি এড়িয়ে যেতেন। স্মর্তব্য যে, বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকা তখন প্রবলভাবে 'মৌলবাদ'-বিরোধী প্রচার

লাচ্ছে এবং আমাদের দেশে বিপ্লবী চেহারার সরকারি সাপ্তাহিক পত্রিকা *বিচিত্রা* তখন ই প্রচারকার্যে অত্যন্ত তৎপর।

বাঙালি মুসলমানরা আরব-ইরান থেকে এদেশে এসে বসত করেছে ও বংশবৃদ্ধি রেছে, বাঙালি মুসলমানদের সংস্কৃতি আরব-ইরান থেকে উৎসারিত—এ ধারার ভাবুক, র্মী ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাকে অধ্যাপক আহমদ শরীফ বহু যুক্তি দিয়ে প্রবলভাবে ন্ডন করেছেন। তাঁদের প্রতি কখনও কখনও তিনি কঠোর ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও ঘৃণা প্রকাশ রেছেন। তাদেরকে তিনি মুসলমানিত্ব বর্জন করে বাঙালিত্ব গ্রহণ করার পরামর্শ য়েছেন।

বাঙালির কল্যাণচিন্তায়ই তিনি তাঁর চিন্তাশক্তি ও শ্রমশক্তি ব্যয় করেছেন। কিন্তু তাঁর ষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক, নঞর্থক, না-বাচক, ঋণাত্মক, নেগেটিভ হওয়ার ফলে তাঁর চিন্তা াস্তবে যেভাবে কার্যকর হয়েছে ও হচ্ছে, তা তাঁর অভিপ্রেত ও বাঞ্ছিত কার্যকারিতার রিপন্থী। এই নেতিবাচক ঋণাত্মক নেগেটিভ মানসপ্রবণতা, মনে হয়, বাঙালি-রিত্রেরই ঐতিহাসিকভাবে অর্জিত এক মৌলিক বৈশিষ্ট্য। আমি যতটা বুঝতে পারি, ারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কোনো অপরিবর্তনীয় ব্যাপার নয়। সজ্ঞান, সচেতন, সতর্ক, দ্দেশ্যনিষ্ঠ সাধনা ও সগ্রাম দ্বারা—কি ব্যক্তিগত জীবনে কি জাতীয় জীবনে, চারিত্রিক বশিষ্ট্য পরিবর্তন করা যায়। অধ্যাপক আহমদ শরীফও হয়তো এমনটাই ভাবতেন। বে তাঁর প্রবল নেতিবাচক প্রবণতার কারণে তিনি তা গুছিয়ে প্রকাশ করতে পারতেন া। Negation of Negation বা নেতির নেতি পর্যন্ত অগ্রসর হয়নি তাঁর চিন্তা ও াষা। প্রায়শ তাঁর চিন্তা Anti-thesis হয়ে থেকেছে, Thesis কিংবা Synthesis-ার প্রতি তাঁর আগ্রহ খুব কম দেখা গেছে। অধ্যাপক আহমদ শরীফের মারাত্মক ীমাবদ্ধতা এখানেই। অবশ্য সমাজে তিনি জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন তাঁর এই তীব্র নতিবাচক ভূমিকার জন্যই। সুচিন্তিত ইতিবাচক কথা বললে এই বাংলাদেশে কে তার তি আকৃষ্ট হত?

অধ্যাপক আহমদ শরীফ আড্ডাপ্রিয় এবং কৌতুকপ্রবণ মানুষ ছিলেন। ার্মানিটোলায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসের ১৮ নম্বর কিংবা ৩৭ নম্বর বিল্ডিংয়ে, স্কাটনে, ধানমন্ডিতে—যখন যেখানে থেকেছেন সর্বত্রই তাঁর বাসভবনে নিয়মিত াপ্তাহিক আড্ডা হয়েছে। অতিথিদের খাইয়েও তিনি খুব আনন্দ পেয়েছেন। লাভবনের লাউঞ্জে, বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ার বিখ্যাত গুঁড়িতে, শেষে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে াকে মধ্যমণি করে একই সঙ্গে প্রবীণ ও তরুণদের আড্ডা বসেছে। এগুলোতে বেচেয়ে বেশি কথা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে অধ্যাপক আহমদ শরীফ একাই বলেছেন। র-নারী সম্পর্কের কৌতুককর দিক, রাজা-উজির মারা, প্রতিদিনের উত্তেজনার সংবাদ র্যালোচনা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ থেকে আরম্ভ করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় পর্যন্ত ব কিছুই আড্ডায় আলোচনার বিষয় হয়েছে। তবে মাঝে মাঝেই গুরুতর বিষয় নিয়ে ীর্ঘ আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, যা হয়তো সকলের জ্ঞানের ও অনুভূতির াণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। আড্ডাতেও অধ্যাপক আহমদ শরীফ দীক্ষাদাতার ভূমিকা ালন করতে চেয়েছেন। স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ নিয়ে তীব্রতার সঙ্গে কথা বললেও তিনি ন্যদের বোঝাতেই চেয়েছেন, নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাননি। সেজন্যই তাঁকে নিয়ে

আড্ডা আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় হয়েছে। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, আড্ডার কেন্দ্রীয় বিষয়ও, শেষ বিশ্লেষণে, বাংলা, বাঙালি, বাঙালিত্ব, বাঙালির ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতি। তিনি চিন্তা করতে চেয়েছেন অনেককে সঙ্গে নিয়ে, তর্ক-বিতর্ক থেকে তিনি চিন্তার খোরাক সংগ্রহ করেছেন। আড্ডায় যাঁরা থাকতেন তাঁদের কেউ আড্ডা সম্পর্কে লিখলে তা একালের জাতীয় ইতিাসের তথ্যের এক উৎস রূপে গণ্য হতে পারে।

তাল পাতায় কিংবা তুলট কাগজে হাতে লেখা পুরোনো বাঙলা পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার, সম্পাদনা, টীকা-ভাষ্য প্রণয়ন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদির মাধ্যমে বাঙালির লুপ্ত জ্ঞানসম্পদ উদ্ধার আর ইতিহাসের পুনর্গঠনে অধ্যাপক আহমদ শরীফের কর্ম অক্ষয় হয়ে থাকবে। মধ্যযুগের গোটা পঞ্চাশেক পুথি সম্পাদনা করে তিনি প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে অধিকাংশই প্রকাশিত হয়েছে গ্রন্থাকারে, ঊনাংশ মুদ্রিত আছে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণাপত্রে। এ এক দুঃসাধ্য কাজ। তাঁর সম্পাদনাকর্ম আলোচনা-সমালোচনার দাবি রাখে। আমি যতটা লক্ষ করেছি তাতে মনে হয়, তাঁর সম্পাদনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি পাওয়া যাবে, তবে ত্রুটি-বিচ্যুতি এ বিষয়ে মোটেই বড় কথা নয়। এগুলোতে পণ্ডিতরা মনোনিবেশ করলেই বাঙালির ইতিহাসকে বিরাটভাবে পুনর্গঠিত করার এবং অনেক নতুন অনুসন্ধানে হাত দেওয়ার তাগিদ অনুভব করবেন। বাঙালি জাতি যদি উন্নতি করতে চায়, তাহলে অন্যান্য কাজের সঙ্গে ইতিহাসের চর্চাও তাকে করতে হবে। অধ্যাপক আহমদ শরীফ সম্পাদিত প্রায় সব পুথি মধ্যযুগের বাঙলার মুসলমান লেখকদের দ্বারা রচিত। তাঁর সম্পাদনাকর্ম এবং রচনাবলি বাদ দিলে বাঙলার মধ্যযুগের গোটা ইতিহাসের বৃহত্তর অংশই যেন মুছে যায়। বাঙালির ইতিহাসের অন্তত কিছু জটিল গ্রন্থি তিনি উন্মোচন করেছেন। মধ্যযুগের বাঙলার সকল বিষয়কে তিনি বিচার করেছেন মধ্যযুগীয় মন নিয়ে নয়—আধুনিক মন নিয়ে। পেছনের জিনিসকে সামনে এনে সম্মুখদৃষ্টিতে—সামনে চলার লক্ষ নিয়ে—বিচার করেছেন।

তাঁর রচিত মৌলিক গবেষণাগ্রন্থ এবং প্রবন্ধগ্রন্থের সংখ্যাও গোটা পঁচিশেক। গবেষণার বিষয়ও বাঙালির জীবনধারা, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের নানা সমস্যা। ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, নীতিবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি নানা জ্ঞানশাখার মধ্য দিয়ে তিনি জীবন-জগতের সমস্যাবলি ও সমকালীন ঘটনাবলি বিচার করেছেন। তাঁর এইসব বিচার-বিবেচনা ভাষারূপ লাভ করেছে তাঁর প্রবন্ধসমূহে। অনেক সময়ে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদে অনায়াসে লিখেছেন এবং প্রকাশ করেছেন, পরিমার্জন-পরিশীলনের কথা ভাবেননি। ধর্ম, নর-নারী সম্পর্কে, আইন ও নীতি বিষয়ে তাঁর মতামত প্রচলিত মতামত থেকে ভিন্ন। সাহিত্য-বিচার ও সাহিত্য-সমালোচনায় তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির ও সহজ সাহিত্যবোধের পরিচয় আছে। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, কাজী আবদুল ওদুদ ও নজরুল সম্পর্ক তাঁর মতামত প্রচলিত ধারণাকে আঘাত করে। তাঁর মতামতও গুরুতর বিচার-বিবেচনার দাবি রাখে।

দুই খণ্ডে প্রকাশিত *বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য* নামক বিশাল গ্রন্থে মধ্যযুগের বাংলা, বাঙালি, বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তৃত পরিসরে তাঁর মতামত বিবৃত

হয়েছে। ড. প্রথমা রায়মণ্ডলের উদ্যোগে কলকাতা থেকে প্রকাশিত *বাঙলা বাঙালী ও বাঙালিত্ব* নামাঙ্কিত গ্রন্থটিতে সঙ্কলিত হয়েছে এ বিষয়ে রচিত অনেকগুলো উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন আগে প্রকাশিত *নির্বাচিত প্রবন্ধ* শীর্ষক গ্রন্থেও স্বদেশ, স্বজাতি, স্বভাষা, স্বদেশী সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ও মতামত এবং তাঁর জীনবদর্শনগত অবস্থান বিষয়ে বক্তব্য স্থান পেয়েছে। দশ-বারো বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে তিনি সংস্কৃতি বিষয়ে তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় *সংস্কৃতি* নামে সেটি প্রকাশ করেছে। তাতে তাঁর ধর্মবিষয়ক ধারণার পরিচয় বিবৃত আছে। অধ্যাপক আহমদ শরীফের গ্রন্থতালিকা প্রণয়নও সময়সাপেক্ষ ও পরিশ্রম-সাপেক্ষ ব্যাপার। কোনো পাঠক উৎসাহী হলে উল্লিখিত গ্রন্থগুলো সংগ্রহ করে পড়তে পারেন—পড়তে পারেন তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থসমূহও। গ্রহিষ্ণু মন নিয়ে পড়লে মূল্যবান অনেক কিছু পাওয়া যাবে।

অধ্যাপক আহমদ শরীফের কর্মের ও চিন্তার মূল্যবিচার কঠিন কাজ; কিন্তু আমাদের জাতির জন্য তা খুব প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমাদের জাতীয় উত্থানের প্রয়োজনে পরিপূর্ণ গুরুত্বের সঙ্গে তাঁর রচনাবলি প্রকাশ ও পাঠ করা দরকার। অন্তত কিছু সময়ের জন্য বাংলাদেশের বিদ্বৎসমাজের মনোযোগ তাঁর কর্ম ও চিন্তাধারার প্রতি কেন্দ্রীভূত করা দরকার। গতানুগতিক মানসিকতার আচ্ছন্নতা ও গড্ডলপ্রবাহে ভেসে চলার অভ্যাস কাটিয়ে ওঠার জন্যই তা দরকার।

১৯৬৮ সনে অধ্যাপক আহমদ শরীফের প্রথম গ্রন্থ *বিচিত চিন্তা* প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রবল আগ্রহ নিয়ে বাজার থেকে তার এক কপি কিনে আনি এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়ি। প্রবল উৎসাহ ও আন্তরিক তাগিদ বশে আমি ওই গ্রন্থের একটি সমালোচনা লিখে তা হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *পরিক্রম* পত্রিকায় প্রকাশ করি। তাতে কোনো কোনো বিষয়ে তাঁর মত আমি খন্ডন করার তাগিদ বোধ করেছিলাম। বিশেষ করে তাঁর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করেছিলাম। *পরিক্রমে* সমালোচনাটি পড়ে তিনি আমাকে খবর দিয়ে তাঁর বাসায় নিয়ে বলেছিলেন : "আমার বইয়ের সমালোচনা লিখেছ, সেজন্য আমি খুশি হয়েছি। কিন্তু তোমার মত আমি একটিও গ্রহণযোগ্য মনে করি না।" আমিও আমার মতে অটল ছিলাম। গত বছর প্রকাশিত আমার অবক্ষয় ও উত্তরণ বইটি অধ্যাপক আহমদ শরীফের নামে উৎসর্গ করতে গিয়ে উৎসর্গপত্রে লিখি : "আমার শিক্ষক ও হিতৈষী/বাঙলাদেশের অন্যতম শক্তিমান সক্রিয় ও প্রভাবশালী ভাবুক/অধ্যাপক আহমদ শরীফ/যাঁর সঙ্গে আমার মতের মিল হয় না, অথচ যাঁর লেখা ও কথা সব সময়ে আমাকে নতুন করে চিন্তা করতে উদ্রিক্ত করে ...।" তাঁর সঙ্গে আমার মতপার্থক্য সব সময়েই ছিল, তা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক সব সময়েই অত্যন্ত মধুর ছিল। তাঁর সান্নিধ্যে প্রায় সকল সময়ে আমি প্রীতির উত্তাপ অনুভব করেছি।

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সময় থেকে অধ্যাপক আহমদ শরীফ মার্কসীয় আদর্শের কোনো কোনো সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়েছেন। তিনি মার্কসবাদী না-হয়েও মার্কসবাদীদের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন এবং নিজেকে মুক্ত চিন্তার অধিকারী মানববাদী বলে পরিচয় দিয়েছেন। সিপিবি-র ধারা থেকে কখনও

কোনো সংগঠন তাঁকে কোনো সভায় কথা বলতে আমন্ত্রণ জানায়নি। আমার ধারণা আমন্ত্রণ জানালে তিনি যেতেন এবং কথা বলতেন। আওয়ামী লীগের ধারা থেকেও কোনো সংগঠন কখনও তাঁকে কোনো সভায় কথা বলতে আমন্ত্রণ জানায়নি। আমার ধারণা, সে ধারা থেকে আমন্ত্রণ পেলেও তিনি যেতেন। এসব ধারা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা, সঙ্কলন কিংবা গ্রন্থে লেখার আমন্ত্রণ পেলেও তিনি লিখতেন বলে ধারণা করি। হয়তো এসব ধারার লোকেরা তাঁর বক্তব্যকে বিপজ্জনক ভেবেছেন। ধর্মীয় কোনো ধারা থেকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি যেতেন না। আমি দেখেছি, রামকৃষ্ণ মিশনের কিংবা খ্রিস্টান চার্চ পরিষদের আমন্ত্রণে কখনও তিনি সাড়া দেননি। রাজনীতি-নিরপেক্ষ কোনো কোনো মুসলিম সংগঠনের আমন্ত্রণও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন।। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভায় তিনি গিয়েছেন। আমিও সমাজতান্ত্রিক ধারার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম—ছাত্রজীবনে সক্রিয়ভাবে ছাত্র ইউনিয়ন করেছি এবং তার পরেও কয়েক বছর ছাত্র ইউনিয়নের বাইরে সমাজতান্ত্রিক ধারার কোনো কোনো সংগঠনের সঙ্গে আমার রাজনৈতিক সংযোগ ছিল। নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে ১৯৬৯ সনের গণঅভ্যুত্থানের সময়ে আমি রাজনীতি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিই। ১৯৭১ সনের যুদ্ধের সময়ে আমাদের সাংগঠনিক সংযোগ ছিন্ন হয়ে যায় এবং ১৯৭২ সনে আমি সচেতনভাবেই সেই সংযোগ পুনরুদ্ধার করতে চাইনি। তবু রাজনৈতিক আদর্শের ও সমস্যার চিন্তা এক দিনের জন্যও আমি বাদ দিইনি—সাংগঠনিক সংযোগের বাইরে থেকে লিখে এবং কথা বলে নানাভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করি। এক্ষেত্রে অধ্যাপক আহমদ শরীফের সঙ্গে ১৯৬৯ সনের গণঅভ্যুত্থানের পর থেকেই এক ধারায় কাজ করেছি। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এই দলের মঞ্চ থেকে আমিও কখনও কখনও কথা বলেছি। কিন্তু ১৯৮১ সনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময়ে, হঠাৎ 'নাগরিক কমিটি' নামে দল গঠন করে, জেনারেল ওসমানীকে আওয়ামী লীগের ফ্রন্ট থেকে সরিয়ে এনে, নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী করার প্রক্রিয়ায় যখন অধ্যাপক আহমদ শরীফ, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ যুক্ত হলেন, তখন আমি যথাসম্ভব যুক্তি দেখিয়ে তার বিরোধিতা করেছি। তারও আগে থেকে *বিচিত্রা* পত্রিকায় অধ্যাপক আহমদ শরীফ, বদরুদ্দীন উমর প্রমুখ যখন সাক্ষাৎকার কিংবা লেখা প্রকাশ করেন তখন আমি এর বিরোধিতা করেছি এই বলে যে, *বিচিত্রার* ভূমিকা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, এই পত্রিকাটি পরিকল্পিতভাবে দেশের প্রগতিশীল শক্তিকে শেষ করে দেওয়ার জন্য প্রগতিশীল শক্তিকে কোলে টেনে নিচ্ছে। *বিচিত্রা* পত্রিকাকে কখনও আমি বিপ্লবী, কিংবা মার্কসবাদী, কিংবা সমাজতান্ত্রিক, কিংবা প্রগতিশীল ভাবতে পারিনি; এই পত্রিকার সর্বোচ্চ জনপ্রিয়তার কালেও আমার মনে হয়েছে এই পত্রিকা কার্যকরভাবে প্রগতিবিরোধী। 'মৌলবাদ'-বিরোধী সংগ্রাম, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির কার্যক্রম ইত্যাদিকেও আমি শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত জনগণের জন্য এবং বাঙলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য ক্ষতিকর মনে করেছি। অনেক কিছুকেই আমার কাছে মনে হয়েছে, প্রগতির পক্ষে 'আপাতমধুর' কিন্তু 'পরিণামভয়াবহ'। অধ্যাপক আহমদ শরীফ এসব কার্যক্রমে আন্তরিক আগ্রহ ও শুভ আশা নিয়ে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ক্রমেই বেশি করে সক্রিয় হয়েছেন। মতবিরোধ বিভিন্ন মাত্রায় সব সময়েই তাঁর সঙ্গে আমার ছিল। তবে মতবিরোধের সকল পর্যায়েই

তাঁর সঙ্গে আমার এবং আমার পরিবারের সকলের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্ক অব্যাহত থেকেছে। আমি আমার মতামত বিনয়ের সঙ্গে নমনীয় ভাষায় লিখে প্রকাশ করেছি। আমার মতামত *আশা-আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা, অবক্ষয় ও উত্তরণ* প্রভৃতি গ্রন্থে এবং *লোকায়ত* পত্রিকার কোনো কোনো লেখায় বিধৃত আছে। আমাদের দেশে উন্নততর নতুন ভবিষ্যত সৃষ্টির প্রয়োজনে এসব বিষয় গুরুতর বিবেচনা দাবি করে।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের উল্লেখ এখানে আমি সজ্ঞানেই করছি না। ভবিষ্যতে করার আশা রাখি।

বাংলাদেশে ইঙ্গ-মার্কিন আধিপত্য এখন যেভাবে বিস্তৃত হয়েছে তাতে বাংলাদেশকে আর স্বাধীন রাষ্ট্র বলে মনে হয় না। এই সংশয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতেও এখন ব্যক্ত হচ্ছে। এই অবস্থা কেন কেমন করে হল তা বোঝার জন্য ১৯৮০-র ও ১৯৯০-য়ের দশকের জনপ্রিয় ঘটনাগুলোর নির্মোহ, নিরাসক্ত, নিষ্কাম, অকপট, সত্যসন্ধ, প্রগতিসন্ধ পুনর্বিচার বাঞ্ছনীয়। হুজুগ, হিড়িক, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ইত্যাদি জনপ্রিয় হলেও পরিহার্য। মনে রাখতে হবে যে, 'প্রগতি' ও 'পরিবর্তন' সমার্থক নয়। পরিবর্তন আপনিতেই ঘটে; কিন্তু প্রগতি সাধনসাপেক্ষ, অর্জনসাপেক্ষ, প্রয়াসসাপেক্ষ, চিন্তা ও কর্মসাপেক্ষ ব্যাপার। সমাজে, রাষ্ট্রে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রগতিকে প্রতিহত করার জন্যও প্রকাশ্যে ও গোপনে নানা প্রকার মানবীয় শক্তি সক্রিয় থাকে। অধ্যাপক আহমদ শরীফ অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর চিন্তাধারা বিবেচনার সময়ে ঐতিহাসিক পটভূমি, তাঁর সাংগঠনিক সংযোগ, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা এবং বক্তৃতা-বিবৃতিকেও বিবেচনায় ধরতে হবে। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল বিচার করতে হবে। সমকালীন প্রচারমাধ্যমের ভূমিকাকেও বিচারের মুখোমুখি করতে হবে। প্রচারমাধ্যম অধ্যাপক আহমদ শরীফকে যেভাবে উপস্থাপন করেছে, তাঁকে দিয়ে যেসব কথা বলিয়ে নিয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সৃষ্টিশীল আহমদ শরীফের পরিচয় কিভাবে কতটা রূপায়িত কিংবা বিকৃত হয়েছে তা বুঝতে হবে। তাঁকে যতই আমরা জানতে চেষ্টা করব ততই দেখব, তাঁর সম্পর্কে আমরা যা ধারণা করি, সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভ্রম সত্ত্বেও তিনি তার চেয়ে অনেক বড়। তাঁর লেখা আমাদের মনে চিন্তার উদ্রেক করে, আমাদেরকে জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু করে, নৈতিক বিবেচনাকে আমাদের জন্য অপরিহার্য করে তোলে। এটা খুব বড় ব্যাপার। কালের ক্ষয় অতিক্রম করেও যেটুকু টিকে থাকবে তাকে উদ্ধার করা ও রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।*

* এই প্রবন্ধ অধ্যাপক আহমদ শরীফের মৃত্যুর পরে তাঁর স্মরণে জাতীয় যাদুঘর কর্তৃক উক্ত প্রতিষ্ঠানের শিশু মিলনায়তনে ২৮. ৪. ৯৯ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পঠিত। এখানে কিছুটা পরিশীলিত ও পরিবর্ধিত রূপে প্রকাশিত।

সাক্ষাৎকার ও সংলাপ

আলাপচারী ডক্টর আহমদ শরীফ : একটি অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার

[প্রথম পর্ব]

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : আবুল আহসান চৌধুরী

আমার জীবনের বিরল গৌরবময় স্মরণীয় ঘটনাসমূহের একটি—ডক্টর আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯)-এর সঙ্গে পরিচয় ও তাঁর সান্নিধ্য লাভ। তিনি ছিলেন আমার শিক্ষক। সেই সূত্রে ১৯৭২ সালে তাঁর সঙ্গে যে-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা অবিচ্ছিন্ন ছিল তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত। অনেকের মতোই আমার মনেও তাঁর স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে। এমন মেধাবী পণ্ডিত, হৃদয়বান মানুষ, বিবেকশাসিত পুরুষ, আদর্শনিষ্ঠ মনীষী আমার কালের চেনা-জানা মানুষের মধ্যে খুব বেশি চোখে পড়েনি। আল মাহমুদ রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে নিবেদিত তাঁর এক কবিতায় বলেছিলেন, "এ কেমন অন্ধকার বঙ্গদেশ উত্থান রহিত/নৈঃশব্দের মন্ত্রে যেন ডালে আর পাখিও বসে না।/নদীগুলো দুঃখময়, নির্পতগ মাটিতে জন্মায়/কেবল ব্যাঙের ছাতা, অন্য কোন শ্যামলতা নেই।" অনুর্বর বঙ্গদেশে বৃক্ষ-জন্ম-প্রত্যাশা কষ্টকল্পনাই বটে,—"আপনার বাংলাদেশ এ রকম নিষ্ফলা, ঠাকুর।" সমকালের মানুষের সঙ্গে প্রতিতুলনায় আহমদ শরীফকে সামনে রেখে ভাবলে মনে হবে, এই কাব্যভাষ্য আক্ষরিক অর্থেই সত্য।

২.

ডক্টর আহমদ শরীফ ছিলেন আপাতকঠোর—মেজাজি একজন মানুষ। সংকল্পে অবিচল, ব্যক্তিত্বে দৃঢ়, মতে-আদর্শে নিষ্ঠ এই মানুষটির বাইরের আবরণ ছিল বড়ো শক্ত, সেটা ভাঙতে পারলে পাওয়া যেতো ভিন্ন এক মানুষকে, যিনি শিশুর মতো সরল—জননীর মতো মমতাপ্রবণ—প্রণয়ীর মতো আবেগী—সুহৃদ-স্বজনের মতো আন্তরিক। তাঁর বাইরের এই যে প্রস্তর-শক্ত কঠিন বর্ম, তা ভেদ করে তাঁর কোমল মনটি অনেকবারই আবিষ্কার করেছি। তাই তাঁর ধমক উপেক্ষা করে, ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে, তিরস্কার তুচ্ছ করে আদায় করে নিতে পেরেছিলাম দীর্ঘ সাক্ষাৎকার বাণীবদ্ধ করার অনুমোদন। আজ ভাবলেও শিহরিত হই—বিস্ময় জাগে মনে, যখন জানা যায় যন্ত্রে ধারণকৃত সেই আলাপচারিতার সময়সীমা সাড়ে দশ ঘণ্টা!

৩.

প্রথমে ভেবেছিলাম আমাদের এই আলাপ হয়তো এক-দেড় ঘণ্টাতেই শেষ হবে। কিন্তু কথার পিঠে কথা এমনভাবে এসে যেতে লাগলো যে দু'দিন ধরে সাড়ে দশ ঘণ্টায় সেই আলাপ শেষ হয়। না, শেষ হয় বলাটা বোধ হয় ঠিক হলো না, সৈয়দ মুজতবা আলীর 'শবনম'-কাহিনীর মতো এ ক্ষেত্রেও বলতে হয়—'তামাম ন'শুদ'।

. ডক্টর আহমদ শরীফ এমনিতেই কথা বলতে ভালোবাসেন। সেদিন যেন তাঁকে কথায় পেয়েছিল। কী এক আনন্দে—কী এক প্রেরণায়—কী এক উচ্ছ্বাসে তিনি দীর্ঘ সময় ধরে ক্লান্তিহীন একের পর এক কথার মালা গেঁথে চলেছিলেন। নানা প্রসঙ্গে কথা বলেছেন—সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি, পরিবার, ঘরোয়া জীবন, ব্যক্তি কিংবা পেশা। বলেছেন বোধ-বিশ্বাসের কথা, অর্জন-সাফল্যের কথা, ব্যর্থতা-বিরহের কথা, পূর্ণতা-অপূর্ণতার কথা, প্রীতি কিংবা ক্ষোভের কথা। বলতে বলতে কৌতুক করে কখনো জোরে হেসে উঠেছেন, কখনো হতে দেখেছি আন্‌মনা, আবার আবেগঘন কোনো মুহূর্তে কণ্ঠ ধরে এসেছে—সজল হয়েছে চোখ দুটো। 'হৃতজীবনের কান্না' যেনো ঝরে পড়েছে ক্বচিৎ কোনো ক্ষণে। 'স্মৃতি সততই সুখের', তাই শোক-বেদনা-বিচ্ছেদ-বিরহ—সবকিছুই দীর্ঘ ব্যবধানে স্মৃতি-চর্চায় ভিন্ন রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ নিয়ে উপস্থিত হয়।

৪.

১৯৯৪-এর ২২ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি—এই দু'দিনে আলাপ হয়েছে আমাদের। সকাল থেকে শুরু করেছি, হয়তো দুপুরে কিছু সময় বিরতি দিয়ে রাত পর্যন্ত চলেছে সেই আলাপচারিতা। এক-একটি ৯০ মিনিটের সাতটি ক্যাসেটে সাড়ে দশ ঘণ্টার আলাপ বাণীবদ্ধ হয়। কী এক আশ্চর্য মনোযোগ ও আগ্রহ ও প্রসন্নতা নিয়ে তিনি কথা বলেছেন। ধৈর্য হারাননি তিনি, বিরক্তও হননি,— বরং সাক্ষাৎকারের সময়-দৈর্ঘ্য নিয়ে রঙ্গ-মন্তব্য করেছেন। মাঝে-মধ্যে ফেরিঅলার ডাক, প্রিয় পৌত্রের আদর-কাড়ার প্রয়াস কিংবা পরিচারকের অসতর্ক উচ্চারণ আমাদের আলাপে সাময়িক ছেদ কিংবা বিঘ্ন ঘটালে তিনি ক্ষুণ্ন হয়েছেন, মৃদু তিরস্কার করেছেন।

এই আলাপ খুব আনুষ্ঠানিক কিংবা পরিকল্পিত ছিল না। তাৎক্ষণিকভাবেই প্রশ্ন করা আর জবাব পাওয়া। হয়তো জবাবের পিঠে প্রাসঙ্গিক কোনো বিষয় জানতে চাওয়া হয়েছে।

৫.

প্রকাশের জন্যে ধারণকৃত এই সাক্ষাৎকার যখন তৈরি করা হয়, তখন কোনো কোনো স্থানে খুবই সামান্য রদ-বদলের প্রয়োজন হয়েছে। কিছু পুনরুক্তি, তেমনি আবার কখনো অনুচ্চ কণ্ঠে অথবা খুব দ্রুত কথা বলায় উচ্চারিত শব্দাবলি বা বাক্য উদ্ধার করতে না পারায় তা বর্জিত হয়েছে। আবার কখনো বাক্য যেখানে অসম্পূর্ণ থেকেছে সেখানে বক্তব্যকে স্পষ্ট ও অর্থবহ করতে একটি-দুটি সম্ভাব্য শব্দ সংযোজিত হয়েছে। কখনো এমন হয়েছে, প্রশ্নের ধরন দেখে—অর্ধাংশ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জবাব দিতে শুরু করেছেন,—এ-সব ক্ষেত্রে মনস্থ পুরো প্রশ্নটিই এখানে সংযোজন করেছি। ডক্টর শরীফের

স্মৃতিশক্তি অসাধারণ, তাই কোনো ক্ষেত্রেই সাল-তারিখ, নাম-ধাম কিংবা তথ্যগত ভ্রান্তি এক রকম ঘটেনি বললেই চলে।

ক্যাসেট থেকে সাক্ষাৎকারটি লেখ-রূপান্তরের দুরূহ ও সময়সাপেক্ষ কাজটি এবং ধৈর্য ধরে–শ্রম স্বীকার করে প্রেস্-কপি তৈরি করেছে আমার দুই স্নেহভাজন প্রাক্তন ছাত্র, যথাক্রমে–মাসুদ রহমান (সিলেটের জকিগঞ্জ সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক) ও শেখ রেজাউল করিম (মাদারিপুরের কালকিনি সৈয়দ আবুল হোসেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক)। এখানে সাক্ষাৎকারের প্রথম ক্যাসেটটি সম্পূর্ণ এবং দ্বিতীয় ক্যাসেটের সামান্য কিছু অংশ পরিবেশিত হলো–যাকে আমরা বলেছি–প্রথম পর্ব। সুধী পাঠককে ডক্টর আহমদ শরীফের আলাপচারিতার ভুবনে আমন্ত্রণ জানাই।

আবুল আহসান চৌধুরী : স্যার, আমরা আলাপটা শুরু করতে চাচ্ছি আপনার পারিবারিক কথা দিয়ে। একটি ঐতিহ্যবাহী পরিবারে আপনার জন্ম। সেই পরিবারের অতীত চালচিত্রের খবর আপনার কাছ থেকে আমরা একটু বিস্তারিত জানতে চাই।

আহমদ শরীফ : আমার জন্ম হয় পটিয়া থানা সংলগ্ন সুচক্রদণ্ডী গ্রামে। আমার যথার্থ অর্থে, আক্ষরিক অর্থেই চৌদ্দপুরুষের পরিচয় জানা আছে। আমাদের আদি পূর্বপুরুষের নাম অভিলাষ মল্ল। সম্ভবত তিনি হিন্দু ছিলেন এবং পরে মুসলমান হয়েছেন। চট্টগ্রামের বিকৃতি অনুসারে অভিলাষ হাবিলাষ হয়েছে। আমরা হাবিলাষ মল্লের বংশধর। মল্ল উপাধিতেই প্রকাশ যে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত একটা কুলবাচি। তা হাবিলাষ মল্লের নাম অনুসারে সেখানে একটা চট্টগ্রামের বল্‌খানগরে (?) একটা গ্রামও আছে,–তাঁর আদি বাসস্থান। শোনা যায় যে তিনি সম্রাট শেরশাহের সেনাদলভুক্ত ছিলেন এবং আহত হওয়ার ফলে তাঁকে চট্টগ্রামে থেকে যেতে হয় এবং সরকারিভাবে তাঁকে কিছু কর্ণফুলী নদীর চরাঞ্চল দেওয়া হয়। সেখান থেকেই গ্রামের নামটা তাঁর নাম অনুসারে হাবিলাষপুর হয়। আমরা সেখানে থাকিনি, আমার থেকে ছয় পুরুষ আগে সুচক্রদণ্ডী গ্রামে এসে আমার পূর্বপুরুষ আবদুল কাদির বসতি স্থাপন করেন। শোনা যায় যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় চট্টগ্রামে এক সের চালের দাম সাত পয়সা হয়েছিল। তিনি ধনী লোক ছিলেন। আশেপাশের দুঃস্থ নিরন্ন মানুষকে লঙ্গরখানার মাধ্যমে কিছুদিন খাইয়েছিলেন দুর্ভিক্ষ চলাকালীন অবস্থায়। সেইজন্যে স্থানীয় লোকেরা তাঁকে 'রাজা' বলতো। এইভাবেই আমরা কাদির রাজার বংশধর এবং কাদির রাজা নিজে লেখাপড়া জানতেন, তার একটা প্রমাণ তাঁর সন্তানের জন্যে তিনি 'সতীময়না লোরচন্দ্রানী' কাব্যটির লিপিকর ছিলেন এবং সেই বই-সেই পুথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত আছে। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত। এতেই বোঝা যায় যে, লেখাপড়াটা অন্তত তখন থেকেই আমাদের পরিবারে চালু আছে। আমার পিতামহ চাকরি করতেন জজকোর্টে নকলনবিশ হিসাবে, ১৮৫৭ সন থেকে তিনি চাকরি করেন এবং ১৮৪০-এ তাঁর জন্ম হয়েছিল। মানে ১৭ বছর বয়স থেকে। তাঁর ছোটো ভাই পটিয়া হাইস্কুলে, নতুন হাইস্কুলে, ইংরেজি পড়া শুরু করেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে তিনি যখন এন্ট্রান্স ক্লাসে পড়েন, তাঁর নাম ছিল কায়েম উদ্দীন, তিনি তিন দিনের জ্বরে মারা যান। তাঁর সহপাঠী আমাদের গ্রামের উমাচরণ খাস্তগীর, এন্ট্র্যান্স পাশ করে

পরবর্তীকালে সাবজজ হয়ে অবসর গ্রহণ করেন। আমাদের বাপ-চাচারা সবাই ইংরেজি শিক্ষিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দুইজনই শুধু এন্ট্রান্স পাশ ছিলেন, অন্যেরা এন্ট্র্যান্স পর্যন্ত উঠে আর পড়তে পারেননি। সেই জন্যে তাঁরা কিছু শিক্ষকতা আর কিছু কেরানিগিরিও করেছেন। কেউ অফিসারের মর্যাদায় উন্নীত হননি। আমার পিতামহ আয়নুদ্দীন মুন্‌শী জজকোর্টে কপিস্ট বটে, সেরেস্তাদারের সঙ্গে কোনো কারণে অভদ্র আচরণ করার ফলে তাঁর চাকরি গিয়েছিল। তারপরে তিনি এসে যখন গ্রামে জমাজমির হাল ধরলেন, সে সময় তাঁর ঐ জেদ প্রভৃতির কারণে অসংখ্য মামলা-মোকদ্দমাতে-ফৌজদারি এবং আদালতি—মামলা-মোকদ্দমাতে জড়িয়ে পড়লেন। জমাজমি নিলাম হয়ে গেলো—আমাদের কিছু তালুক-মালুক ছিলো সেগুলোও গেলো। তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার টাকা—সেই যুগের, বার্ষিক আয় ছিলো শুনেছি , সব গেলো। কিছু খাসজমি ভূসম্পত্তি রইলো এবং ত্রিশ হাজার টাকার ঋণও হলো। এইজন্যে আমার বাপ-চাচারা একেবারে নিম্নমধ্যবিত্ত হয়ে গেলো এবং আমাদের মা-বাপেরা ধরতে গেলে এই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারেই জীবন কাটিয়েছেন,—আমরা সেই পরিবেশেই মানুষ হয়েছি। তারপরে আমাদের যে প্রজন্ম সে প্রজন্মের সবাই অফিস-আদালতে বিভিন্ন অফিসে অফিসারের মর্যাদায় কাজ করেছেন এবং আমাদের বংশধরেরা বিভিন্ন জায়গাতে বড়ো বড়ো ভালো ভালো চাকরি-বাকরি করছে। সেই জন্যেই থানাতে জেলাতে একটা ভদ্র পরিবার হিসাবে—প্রাচীন ভদ্র পরিবার হিসাবে—আমাদের একটা পরিচিতি আছে। আর এই পরিবারেই আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। এর আগে কাদির রাজার বাড়ি, তারপরে নবী চৌধুরীর বাড়ি, তারপরে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের বাড়ি—এ রকম করে পরিচিত হয়েছে আমাদের বাড়ি। এখন আমাদের বাড়িতে হাইকোর্টের জাস্টিসও আছে, হাইকোর্টের ব্যারিস্টারও আছে, এ্যাডভোকেটও এবং মিলিটারি থেকে শুরু করে অন্যান্য সব রকমের বড়ো এবং ভালো চাকরিতে কাজ করেন অনেকেই। আমাদের বাড়ির পরিচয় এখানেই শেষ।

আহসান : এবারে আপনার জন্ম, ছেলেবেলা—এসব কথা শুনবো। আপনার জন্ম কোন্ সালে—কতো তারিখে?

শরীফ : আমার জন্ম হয় ১৯২১ সালে এবং এটা আমার বাবা লিখে রেখেছিলেন। সেটা আর পাওয়া গেলো না। আমার মা দীর্ঘজীবী ছিলেন, ৯৪ বৎসর বয়সে মারা গেছেন ১৯৮৩ তে, তাঁর কাছ থেকেই আমি পরে সংগ্রহ করি। একটা কথা মনে আছে, আমরা চার ভাই—চার ভাইয়ের জন্মই রোববারে হয়। আমার জন্ম রোববারে হয় এবং তিনি একটা কথা স্মরণ রেখেছিলেন যে মাঘ মাসের শেষ রোববারে আমার জন্ম। তো মাঘ মাসের শেষ রোববার আমি বের করে নিয়েছি ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯২১ সাল।

আহসান : আপনারা ক'ভাইবোন?

শরীফ : আমরা চারভাই দু'বোন। ভাইয়ের মধ্যে আমি বেঁচে আছি। আমার আর দু'বোন বেঁচে আছে। একজন আমার বড়ো একজন ছোটো।

আহসান : মা-বাবার কথা কিছু বলুন।

শরীফ : আমার বাবা চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের করণিক ছিলেন—সরকারি কলেজিয়েট স্কুলের। আর আমার মা গৃহিনীই ছিলেন। আমি জন্মগ্রহণ করেছি মা-বাবার

ঘরে বটে, কিন্তু আমার একেবারে শৈশব থেকেই-বলতে গেলে জন্মমুহূর্ত থেকেই আমি লালিত হয়েছি আমার ফুফুর কাছে এবং আমার চাচা আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের কাছে। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ হচ্ছেন আমার বাবার আপন চাচাতো ভাই এবং আমার আপন ফুফুর সঙ্গে আমার প্রপিতামহ বিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। বাপের মৃত্যুর পরে আবদুল করিমের জন্ম হওয়ায় পিতামহের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন এ আশঙ্কায় তাঁর মেঝোছেলের মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন। এবং আমরা চিরকালই—১৯২২ সন পর্যন্ত একান্নবর্তী পরিবার ছিলাম। আমরা সেইজন্য আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদকে কখনো ফুপা ডাকিনি, আমরা জ্যাঠাই ডেকেছি আমাদের চট্টগ্রামের নিয়ম অনুসারে, বড়চাচা এই হিসাবে। সম্পর্কটা এ-রকমই ছিলো। তো আমার এই ফুফুর একটা কন্যা সন্তান ১৯০১-এ জন্মগ্রহণ করে এবং ১৯৭৭-এ মারা যায়। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের শিশুর প্রতি একটা আকর্ষণ ছিলো। একটা না একটা শিশু তিনি কোলে নিতেন এবং পাড়া প্রতিবেশীর শিশু হলেও – শিশু পেলেই আদর করতেন—কোলে নিতেন। আমার আগে আমার এই ফুফু এবং আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ আমার দুই চাচাতো বোন ও আমার এক খালাতো বোনকে মানুষ করেছিলেন। ওরা তো বিয়ে হয়ে গেলে চলে গেলো। আমি ছেলে হওয়াতে আমাকে আর বাড়ির বাইরে যেতে হয়নি, অন্য পরিবারে যেতে হয়নি, কাজেই আমি শেষ পর্যন্ত তাঁদের লালন পেয়েছি। কাজেই তাঁদের একজন সন্তান হিসাবেই আমি মানুষ হয়েছি। আমার লেখাপড়া খাওয়া-পরা সবগুলো—বিয়ে পর্যন্ত—সব আমার সব কিছুতেই এঁরা বহন করেছেন—আমার ফুফু আর সাহিত্যবিশারদ। এই ফুফুকেই আমি আমার প্রথম বই উৎসর্গ করেছি "জননী স্বরূপা' বলে।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ১৯৩৪-এ অবসর গ্রহণ করেন। আমি প্রথম থেকেই আমার ফুফুর কাছে এটা কখনো কখনো শহরে—আমাদের তিন পুরুষের বাসা ছিলো বটে কিন্তু ভাড়াটে বাসা—অসুখ-বিসুখে কোনো প্রয়োজনে আমার মা-চাচি ফুফু যেতেন বটে কিন্তু ওখানে বেশিদিন থাকতেন না, মাস-দুইমাস থেকেই আবার চলে আসতেন, এই রকম। সেই কারণেই আমি প্রাইমারি স্কুলটা পড়েছিলাম চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল প্রাইমারি স্কুলে। কিন্তু পরে পটিয়াতে এসে রাহাত আলি স্কুলের পেছন দিকে সোবহানিয়া মাদ্রাসাতে, সোবহানিয়া মক্তবে ভর্তি হই। সেইখানে ক্লাস থ্রি পাশ করে পটিয়া হাই স্কুলে ক্লাস ফোর-এ ভর্তি হই এবং সেইখান থেকেই ১৯৩৮-এ ম্যাট্রিক পাশ করে চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হই। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে আই.এ. এবং বি.এ. পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বাংলাতে দু'বছর পড়ে বাংলায় এম.এ. ডিগ্রি নেই। আমার লেখা পড়ার মধ্যে আমি ম্যাট্রিক ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করি, ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করি। সে সময় বি.এ.তে ডিভিশন ছিলো না—ছিলো ডিসটিঙ্কশান এবং পাশ—কাজেই পাশ ডিগ্রি। তারপরে এম.এ.-তে সেকেন্ড ক্লাস পাই। কাজেই আমি নিতান্তই মাঝারি ছাত্র। নাম করার মতো নয়।

আহসান : বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে আবার পরে কথা বলবো। আমরা আবার ফিরে যাই আপনার ছেলেবেলায়। আপনার শৈশব-কৈশোরের কথা কিছু জানতে চাই,—কোনো উল্লেখযোগ্য স্মৃতি বা আপনি কেমন ছিলেন, আপনার স্বভাব-বৈশিষ্ট্য-এইসব।

শরীফ : ছোটোবেলা থেকেই আমার একটা বৈশিষ্ট্য ছিলো – আমি অবিমৃষ্যকারী আবেগে চলি, আমি ঠিক বুঝতে পারি না। তবে আমার একটা ন্যায় অন্যায় চেতনাবোধ ছোটকাল থেকেই ছিলো, এখন অনুভব করছি–তখন এসব বুদ্ধি হয়নি। কোনোটা পছন্দ না হলে–অন্যায় বলে মনে করলে আমার পারিবারিক জীবনেও আমি তর্ক করতাম, অতি ছোটোকাল থেকেই। সেই জন্যেই আমাদের চাটগাঁর ভাষায় 'নাঠা'–'নাঠা' মানে যে কুতর্ক করে–যে ইনডোমিটেবল, এরকম একটা আমার নিন্দা ছিলো আমার পারিবারিক জীবনেও। খেলাধুলার প্রতি আকর্ষণ ছিলো, কিন্তু আমার পারদর্শিতা ছিলো না। সাইকেল চালানো শিখলাম, কিন্তু এই যে পা-টা ঘুরিয়ে যে উঠানো যায় সেটা আর শিখতে পারলাম না, সেই জন্যে সাইকেল চালানো আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। শুধু তা নয়, কলেজে যেতাম তিন মাইল হেঁটে। একটা সাইকেল আমার মেঝো ভাইয়ের ছিলো, তিনি ফেনি কলেজে চলে গেলেন, এই সাইকেলে চড়ে আমি কখনো কলেজ পর্যন্ত যেতে পারিনি। মোটর গাড়ি বেশি ছিলো না, ঘোড়ার গাড়ি ছিলো, আর জনসাধারণ ছিলো, একটা নার্ভাস টাইপ। পরবর্তীকালে আমি মোটর গাড়িও চড়তে পারিনি। সেই জন্যে খেলাধুলায় আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও খেলাধুলাতে কোনোদিন সুবিধা করতে পারিনি। তো প্রতিবাদ আমি করেছি। এবং হঠাৎ একটা ইমোশন কখনো কখনো জেগেছে। আমি যখন ক্লাস সিক্সে পড়ি আমার গ্রামে একটা সভা হচ্ছিল হিন্দু-মুসলমানে মিলে। কি বিষয়ে এখনো জানিনা। আমার চাচা আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সভাপতি ছিলেন। আমি নিতান্ত শিশু, হঠাৎ উঠে আমি একটা বক্তৃতা দিয়ে দিলাম। এই জীবনের প্রথম বক্তৃতা এবং দিতে গিয়ে গালাগাল করলাম সবগুলোকে, এখনো যেমন করে থাকি, আমাদের চাটগাঁর ভাষাতে টাউটেরে 'তন্যি' বলে, চাটগাঁর গ্রাম্যভাষাতে গ্রামের মানুষকে লক্ষ করে কী একটা বললাম। ওরা খুব ক্ষুব্ধ হলো, যে এই ছেলে এতো বড়ো বেয়াদব। কিন্তু আশ্চর্য যেটা–সাহিত্যবিশারদ, যিনি সভাপতি, তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন না, বাড়িতে যখন পৌছলাম তখন বলেছেন যে, "তুই বক্তৃতা দিবি এই কথা আগে বলিসনি ক্যান! হঠাৎ উঠলি ক্যান্?" ওদের গালাগাল করে যে বক্তৃতা দিলাম সেটার জন্যে কোনো তিরস্কার তিনি করলেন না। তারপরে স্কুলেও এই সেভেন থেকে আমাদের বিতর্ক সভা হতো পনেরো দিন অন্তর অন্তর, সেগুলোতেও আমি নিজে অংশগ্রহণ করেছি। এবং আমার স্কুলে ক্লাস ফোর থেকে টেন পর্যন্ত আমি আমার ক্লাসে একমাত্র মুসলমান ছেলে ছিলাম। কেননা আমাদের পাশাপাশি দুটো হাই স্কুল, একটা ১৯১৫-তে মুসলমানেরা দিয়েছে, আরেকটা ১৮৪৬-এ হিন্দুরা দিয়েছে। তো এটা হিন্দু স্কুল হয়ে গেলো– পটিয়া হাই স্কুল, এখনো আছে। আরেকটা আবদুস সোবাহন রাহাত আলী হাই স্কুল বলে পরিচিত। আশ্চর্য কথা যে আমি ঐ পটিয়া হাই স্কুলে পড়েছি, সেটা কমপ্যারেটিভলি ভালো বলে। হিন্দু মাস্টার, হিন্দু ছাত্র, এনভায়ারনমেন্ট ভালো ইত্যাদি। ঢাকা শহরে আমরা দেখি ঐ যে মিউনিসিপ্যাল প্রাইমারি হাই স্কুলে ভদ্রলোকের ছেলেরা কেউ পড়তে যায় না, সে রকম ব্যাপার। ঐখানে পড়েছি আমি একা। তৎসত্ত্বেও আমি নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে একজন ছিলাম ক্লাস টেন পর্যন্ত। চট্টগ্রাম কলেজে যখন পড়েছি তখনো আমি নেতৃস্থানীয় একজন। এমনকি মুসলমান ছাত্রদের একেবারে পুরো নেতা ছিলাম। অনেক কথা তো–এতো কথা কি বলা যায়! সেটা হচ্ছে আমরা যখন বি.এ. টেস্ট পরীক্ষা দেবো

তার আগেই জাপানি বোমা পড়লো। আমরা বেঁকে বসলাম যে আমরা প্যানিকি হয়েছি, কাজেই আমরা টেস্ট পরীক্ষা দেবো না। সে সময় ডিটেইন করতো টেস্ট পরীক্ষায় পাশ না করলে,—এই একটা সুযোগ নেওয়ার জন্যে। নেতৃত্ব দিলাম আমি। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, কোনো রকমে কমিশনার-ব্রিটিশ কমিশনার বলছেন যে এই রকম ভাবে যদি টেস্ট পরীক্ষা থেকে এক্সেম্পট্ করো তাহলে লোক প্যানিকি হয়ে যাবে। কাজে কাজেই সবটা নরমাল আছে এইটা বোঝানোর জন্যে এদের পরীক্ষা নেওয়া দরকার। কাজেই কমিটির গভর্নিং বডির মেম্বারদের সব রায় বাহাদুর-খান বাহাদুর তাঁদের কাছে তদবির করলাম, কোনো কাজ হলো না। তখন আমরা একেবারে সোজা ফজলুল হকের কাছে চলে গেলাম নোয়াখালিতে। তিনি তাঁর চার-পাঁচজন মন্ত্রি নিয়ে তখন সেখানে ট্যুরে গেছেন। সেইখানে গিয়েও তদ্‌বির করলাম, তদ্‌বির করে কোনো সুবিধা হলো না। তারপরে আমরা বললাম যে আমরা পরীক্ষা দেবোই না। তো অনেক সাধাসাধির পরে অবশেষে প্রিন্সিপ্যালের সাথে আমাদের আপোস হলো যে কোনো একটা পেপারে টোকেন পরীক্ষা দেবো—সবগুলোতে নয়। তারপরে সেটাতে রাজি হলাম যখন তারপরে আমার একটা আত্মীয় ছেলে, সম্পর্কে আমার কাজিনের শালা, আমার সঙ্গে পড়তো, সে কার কাছে শুনেছে যে প্রিন্সিপ্যাল আমার থেকে শোধ নেবে। সবাইকে এ্যালাউ করবে পরীক্ষা দিতে, আমাকে আটকাবে। সে সেই কথা শুনে রাত দুপুরে আমার কাছে আমার বাসায় চলে এলো প্রায় বারোটায়। আমি নিজে নেতা তো কাজেই নিজের দুর্বলতা দেখাতে নেই। তাকে বললাম, "তুমি ভুল শুনেছ, খেলা নাকি! কিছুই হবে না।" কিন্তু ও চলে যাওয়ার পরে ভয় পেয়ে গেলাম। তার পরদিন পরীক্ষা দশটায়। কি করি এই দুর্বলতার কথা তো নেতা হয়ে কাউকে বলতে পারিনা। তা আমি এক বুদ্ধি করে চলে গেলাম সাড়ে নয়টায়, গিয়ে প্রিন্সিপ্যালের যে চেম্বার বসবার তার সোজা সেখানে লিচু গাছ, আর একটা বেঞ্চ আছে পাতা বসবার জন্যে। সেখানে গিয়ে আমি বসে গেলাম। উদ্দেশ্য যে প্রিন্সিপ্যাল আসলেই একটা সালাম দেবো এবং কিছু কথা বলবো। তাঁর মন বুঝবো, সে সত্যি সত্যিই আমার বিরুদ্ধে কিছু করছে কিনা। তা না হলে তো আবার আমার আরেকটা আন্দোলন সৃষ্টি করতে হয়। দেখি যে আমাকে দেখেই প্রিন্সিপ্যাল আমার কাছে চলে এসে 'এসো, এসো বাবা'—ইনি হচ্ছেন রায় বাহাদুর প্রিন্সিপ্যাল পদ্মিনীভূষণ রুদ্র, বাড়ি বিক্রমপুর। পরে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সেক্রেটারি হয়েছিলেন। তো ইনি আমার কাছে গিয়ে বলেছেন যে, "এসো, এসো বাবা, পরীক্ষাটা দিয়ে দাও, দিয়ে দাও, না হলে হয় না। আজ কোনো বাধা দিয়ো না।" আমি গেছি তোয়াজ করতে—তিনি মনে করলেন আমি বুঝি পিকেটিং করবার জন্যেই এতো আগে গিয়ে বসেছি। আর কেউ নেই। তিনি আগে এসেছেন কোশ্চেন-টোশ্চেন দেওয়ার জন্যে, অবস্থাতো খারাপই। তিনি মনে করেছেন আমি পিকেটিং করতে গিয়েছি। আমি গিয়েছি ওঁকে তোয়াজ করতে, তিনি এগিয়ে গিয়ে আমার পিঠে হাত দিয়ে আমাকে টেনে তাঁর রুমে নিয়ে গেলেন। রুমে নিয়ে গিয়ে আমার হাতের উপর হাত চেপে ধরে-"এই যে বাবা, পরীক্ষাটা দিয়ে দাও। সবাইকে বলো যেন কোনো গোলমাল না হয়। তোমার কথা শুনবে সবাই।" এই করে আমি তো বললাম, "স্যার, আপনাকে কথা দিলাম, সবাইকে পরীক্ষা দেওয়াবো।" এই বাহাদুরি নিয়ে আমি স্বস্তিতে বের হলাম। প্রিন্সিপ্যাল কথা

রেখেছিলেন, সবাইকে টোকেন পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। পরীক্ষার সময় একদিন ইকনোমিক্স পরীক্ষার দিন বোমা পড়েছিল আমাদের কাস্টমস্ অফিসে পোর্ট ট্রাস্টের ওখানে। অনেকগুলো লোক মারা গিয়েছিল। সেগুলো আমাদের এ্যাফেক্ট করে নাই। আমরা কতক্ষণ লুকিয়েছিলাম আরকি খাতাপত্র রেখে, তারপর আবার উঠে পরীক্ষা দিলাম।

আহসান : আপনি তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তো সেকালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কিছু বলুন–পরিবেশ, লেখাপড়া, রাজনীতি, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক এইসব বিষয়ে।

শরীফ : সেকালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা–তখন মুসলিম লীগের প্রাবল্য সেইজন্যে ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়ে গেছে, কাজেই মুসলমান মাত্রই মুসলিম লীগার। ঢাকাতে তার আগে থেকেই–বহুকাল আগে থেকেই ঢাকাতে একটা আশ্চর্য রকমের সাম্প্রদায়িক মারামারি চালু ছিলো। সেটা আশ্চর্য রকমের বলছি এই জন্যে যে সেটার একটা বিশেষ সীমা ছিলো। নবাবপুরের যেখান থেকে শুরু সেখানে থেকে শুরু করে সদরঘাট পর্যন্ত। ফুলবাড়িয়া স্টেশনে কোনো মারামারি হতো না হিন্দু-মুসলমানের। ট্রেনের থেকে নামছে-উঠছে কোনো মারামারি হতো না। আবার সদরঘাটের লঞ্চে বা নৌকাতে উঠছে–নামছে সেখানেও কোনো মারামারি হতো না। মারামারি হতো ইসলামপুরের আর নবাবপুরের এই অঞ্চলটাতে–হিন্দু-মুসলমানের। আর এটা বারো মাস লেগেই ছিলো। আমরা যখন পড়ি তখনো ছিলো। ঢাকা হলের ছাত্রের সঙ্গে সলিমুল্লাহ হলের ছাত্রের প্রথম বা ফজলুল হক হলের প্রথম দ্বন্দ্ব। সেটা অন্য কথা। সেই সময়ে হলের যে ইলেক্শন ছিলো সেই ইলেকশনে কিন্তু পলিটিক্স ছিলো না। হিন্দু-মুসলমানের একটা পলিটিক্স ছিলো।

আহসান : নির্বাচনটা কি নির্দলীয়ভাবে হতো?

শরীফ : হ্যাঁ নির্দলীয়ভাবে হতো, কিন্তু ঐ ডিস্ট্রিক্টইজম ছিলো–জেলাওয়ারি। কোন্ জেলার সঙ্গে কোন্ জেলার সহযোগিতায়-আঁতাতে হবে সেটা। তা আমার একটা ব্যাপার ঘটেছিল, ঐ যে বললাম ফজলুল হক পর্যন্ত গিয়েছিলাম। জীবনে প্রথম একটা চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলেছি তাও আবার শেরে বাংলা ফজলুল হকের সঙ্গে কথা বলেছি–তর্ক করেছি। সেখানে আরো এক মন্ত্রি ছিলেন ঐ যে আবদুল করিম, তিনি উকিল ছিলেন, কুমিল্লার খান বাহাদুর আবদুল করিম, মেজাজি লোক ছিলেন। শামসুদ্দীন সাহেব কুষ্টিয়ার–তাঁর সঙ্গেও কথা বললাম। এই যে মন্ত্রির সঙ্গে কথা বলেছি আমি নেতা হিসাবে দুইজন হিন্দু ছেলে আর আমি একজন মুসলমান এই তিনজন গেছি, ছেলেদের চাঁদার পয়সা দিয়ে। কাজেই ভারি গৌরবের ব্যাপার হয়ে গেছে। যখন বাসায় ফিরলাম তখন আমার বাবা ঠিক কৌতূহল তিনি দেখাননি কিন্তু আমার বড়োভাই তিনি কৌতূহলী হয়েছিলেন। আমার বড়োভাই আমাদের শাসন করতেন এবং সোহাগও করতেন। আসলে আমাদের লেখাপড়াটা হয়েছিল তাঁর পিট্টি-টিট্টি খাওয়াতে। ইনি চাকরি করতেন, রোববারের দিনে সকাল বেলা পড়া ধরতেন আর ভয়ঙ্কর পিট্টি-টিট্টি দিতেন। শনিবারে যখন তিনি ট্রেনে পটিয়া স্টেশনে আসতেন, আমরা শুধু কদম গুনতাম এতোক্ষণে কদ্দুর এলো, কদ্দুর এলো, কদ্দুর এলো! একেবারে যমের মতো ছিলেন।

তখন কলেজে পড়ি কাজেই বাহাদুরি করে বলেছি যে মিনিস্টারের সঙ্গে এই রকম তর্ক করলাম, এই করলাম–সেই করলাম। তা আমার বড়োভাই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে শেষে একটা কমেন্ট করলেন, সেটা আমার জীবনের উপর ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেললো। সেটা হচ্ছে এই যে, দেখো, তোমার কথাবার্তা–সাহস করে এঁদের সঙ্গে কথা বলেছ তা শুনে খুব খুশি হয়েছি। তোমার সাহসের খুব তারিফ করি। দেখো, পলিটিক্সটা হলো বড় লোকের জন্যে। মতিলালের ছেলে জওহরলালদের এইটে মানায়। গরিবের ছেলে পলিটিক্স করলে শুধু টেবিল-চেয়ার এগুলো টানে, লোক জোগাড় করে ঢ্যাঙ্গা পেটে, কিন্তু কখনো নেতা হয় না। গরিবের এসব পোষায় না। এই যে একটা ডিস্‌কারেজিং কথা বললেন, এটা আমার মতের উপর ভারি একটা প্রভাব ফেল্‌লো। মিলিয়ে দেখলাম কথা ঠিকই, তখন তো কমিউনিজম হয় নাই। কাজেই আমি পলিটিক্স ছাড়লাম, কিন্তু ভেতরে একটা আর্জ আছে। সেজন্যেই করলাম কি ঢাকাতে ইউনিভারসিটিতে যখন পড়তে এলাম তখন পার্টি বস্ হলাম, কিন্তু দাঁড়ালাম না। সানাউল হক প্রভৃতিকে জিতিয়ে ছিলাম। সেটা একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল এই, ঢাকাওয়ালারা আর নোয়াখালিওয়ালারা মিশে গিয়েছিল। নোয়াখালির ছাত্রও বেশি, ঢাকার ছাত্রও বেশি। ওরা একটা মিটিং করছে। তবে আমার মানে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ধারণা হলো, দুটোই যখন প্রবল–ওদের ঐ ভাইস প্রেসিডেন্সি নিয়ে, সেক্রেটারিশীপ নিয়ে গোলমাল হবেই–ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে। কারণ কেউ কারোর কাছে আত্মসমর্পণ করবে না, আমার একটা ধারণা হলো। তা আমি এখন তো ভুলে গেছি, সানাউল হকের কথা মনে আছে, আরও কয়েকজন–তো এদের বল্লাম যে, অপেক্ষা করেন ওদের মিটিং না ভাঙ্গা পর্যন্ত আমরা ঘুমাবো না। কারণ যে দল ভাঙবে সে দল আমাদের সঙ্গে আসবে। রাত সাড়ে বারোটা বাজে। সানাউল হক বলছে যে, না ভাই, হবে না, ঘুম পাচ্ছে যাই। আমি বল্লাম, না একটু অপেক্ষা করেন, এদের মিল হতেই পারেনা আমি বলে দিচ্ছি।" সত্যি সত্যিই কতক্ষণ পরে দেখি ওদের মিটিং ভেঙ্গেছে, ওদের মধ্যে মিল হয়নি। সেই সুযোগে নিয়ে এই দুই দলকে বাদ দিয়ে তৃতীয় দল আমরা কুমিল্লা–ময়মনসিংহ-চট্টগ্রাম ইত্যাদি ছোটখাটো এগুলো নিয়ে আমরা জিতলাম। আমাদের এই নেতৃত্বটা নিয়েছি কিন্তু আমি নিজে দাঁড়ালাম না। ঐ যে আমার ভাইয়ের ঐ প্রভাবটা পড়েছে সেইটা।

আহসান : এটা তো হল-ইলেকশন!

শরীফ : হল-ইলেকশন।

আহসান : কোন্ হল?

শরীফ : ফজলুল হক হল। সে যুগে–ঐ যে বললাম, বাইরে আমরা সব মুসলিম লীগার। কিন্তু হলে তখনো পলিটিক্সটা ঢোকে নাই, ডিস্ট্রিক্টওয়ারি আঞ্চলিকতা দিয়ে দলটা গড়ে উঠতো, আর মারামারি হতো না। আর ঐ পোস্টার হাতে লেখা পোস্টার ছিলো, পয়সা খরচ-টরচ ইত্যাদি কিছুই ছিলো না। খুব স্মুথ্‌লি হতো–খুব ভদ্রভাবে হতো। আর সেই যুগের আদব-কায়দাও ছিলো আলাদা। ফলে এক বছর সিনিয়র হলেই যদি রুমে ঢোকে তাহলে তাকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হতো। সিনিয়র টিচার-বিশেষ করে ল-এর টিচার, এম.এ. ফাইনাল ক্লাসের টিচার–এই যে রোল কলের জন্যে এ্যাসিস্ট্যান্ট হাউস্ টিউটর হিসাবে কাজ করতেন। তাঁরা গেলেও ঐ রকম করে

একেবারে এটেনশনে দাঁড়িয়ে যেতে হতো মিলিটারি কায়দায়। আর পরস্পরকে মৌলবী সাহেব বলতেন সে যুগে। সে যুগে ডিসিপ্লিনটা ছিলো, ভদ্রতা ছিলো, মারামারি ছিলো না, ঝগড়া-বিবাদও ছিলো না।

আহসান : পড়াশুনার পরিবেশটা কেমন ছিলো?

শরীফ : পড়াশুনার পরিবেশ–যে পড়ছে তো পড়ছে, যে ঘুমোচ্ছে তো ঘুমোচ্ছে এই। আর সিনেমা দেখা ছাড়া অন্য কিছু ছিলো না। দু'চারটে ছেলে মদ-টদও খেতো। দশটায় তো গেট বন্ধ হয়ে যেতো। দারোয়ানকে কিছু ঘুষ দিলে দশটার পরে খুলে দিতো গেট ওদের জন্যে। তো আমাদের আগের ব্যাচে অনেক বেশি ছিলো। আমাদের সময় খুব কমই ছিলো মদ খাওয়া লোক।

আহসান : আপনাদের সময়ে ছাত্রীর সংখ্যা কেমন ছিলো?

শরীফ : আমাদের সময়ে ছাত্রী একজনই ছিলো– মুসলমান, সে আরবি পড়তো, যাকে আলী আশরাফ বিয়ে করেছে। সৈয়দ আলী আশরাফ আলী আহসানের ভাই। সে মহিলা সুন্দরীও ছিলেন না, কালো ছিলেন এবং বোরকা পরতেন। ইংরেজি সাহিত্য পড়ে প্রেম না করে অপরিচিতাকে শয্যাসঙ্গিনী করা যায় না সে জন্যে বোধ হয়। যেমন কবীর চৌধুরী একই রকমের কাজ করেছেন। এই যে মেহের কবীর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী রসায়ন বিভাগের, বোধ হয় ফার্স্ট ক্লাস। তিনি রিসার্চ করবেন, ওঁরা বললেন যে, এখানে তো বাবা ভীড়, ঢাকাতে যাও সেখানে কেউ রিসার্চ করে না, সেখানে যাও।' এখানে রিসার্চ করতে এলেন। পরবর্তীকালে দেখি যে কবীর চৌধুরীর সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে হলো–ইংরেজি ইংরেজি। মুসলমান মেয়ে আর ছিলো না, আর হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে আমাদের আলাপ করার কোনো উপায় ছিলো না। শিক্ষকের সঙ্গে আসতেন–শিক্ষকের সঙ্গে যেতেন। আমাদের চট্টগ্রাম কলেজে আমাদের সঙ্গে বারো-চৌদ্দজন হিন্দু মেয়ে পড়তেন। কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার যে অধিকার ছিলো না সেই জন্যেই আলাপ-পরিচয় অধিকার কোনোটাই হয়নি।

আহসান : এম.এ.-তে বাংলায় কি মেয়ে ছিলো আপনাদের সঙ্গে?

শরীফ : হ্যাঁ, মেয়ের সংখ্যাই বেশি ছিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পর থেকে আমাদের ব্যাচে ফাইনালে সে বছরেই দেখলাম যে সবচেয়ে বেশি ছাত্র-ছাত্রী–মোট তেরোজন। তেরোজনের মধ্যে সাত জনই মেয়ে, আর আমরা ছ'জনে ছেলে। তার মধ্যে হিন্দু ছেলে দু'জন, আমরা মুসলমানের ছেলে চারজন।

আহসান : মেয়েদের মধ্যে কোনো মুসলমান ছাত্রী ছিলো না?

শরীফ : না। মেয়েদের মধ্যে দু'জনে ফার্স্ট ক্লাস পেলো আমাদের সঙ্গে। একজন হচ্ছে ওখানকার এক টিচারের স্ত্রী, অসবর্ণ বিয়ে হয়েছিল, এক ব্রাহ্মণের মেয়ে। আর উমা মজুমদার বলে এক মেয়ে। ইনি পরবর্তীকালে রেডিওতে চাকরি করতেন।

আহসান : এই যে আপনার সহপাঠিনীদের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন না–আলাপ করতে পারতেন না, এর জন্যে একটা আফ্‌শোস কি মনের মধ্যে জাগতো না?

শরীফ : আফ্‌শোস তো না, হচ্ছে যে বয়ঃধর্মে পুরুষের নারীর প্রতি আকর্ষণ বা নারীর পুরুষের প্রতি আকর্ষণ সেটা তো সম্ভাব্যতা এবং অসম্ভাব্যতার উপরে নির্ভর করে। মানুষের সংযম তা আসে সম্ভব অসম্ভবের উপরে। যেমন আমি বলি, আমার নিজের

জীবনে ঘটেছে। নাম বলা উচিত হবে না। যাই হোক, তিনি মন্ত্রী ছিলেন এবং নবাব পরিবারের। আমি তারক দত্ত রোডে থাকতাম, তারক দত্ত রোডে তাঁরও বাসা ছিলো। আমি মেসে থাকতাম–আমরা তিন জনে। তাঁর একটা মেয়ে, তো ভারি চমৎকার মহিলা। সে মহিলাকে দেখবার জন্যে সময়ে অসময়ে বেরও হতাম আমি। চাকরির খোঁজ করি আর ঐ। কিন্তু এ কথাটাও মনে ছিলো, এর সঙ্গে আমার প্রেম হতে পারে না। চিঠি লিখলে জবাব পাওয়া যাবে না। কারণ এতো অসমানে হয় না। রূপবতী ধনীর কন্যার সঙ্গে প্রেম করা স্বাভাবিক নয়। সেই হিসাবে একটা সংযম ছিলো। হিন্দু মেয়ের প্রতি এটা সম্ভব না বা মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর সম্পর্ক সম্ভব না, সেইজন্যে এইসব হতে পারেনি–হয়নি। তা আমরা সেই হিসাবে সংযত আছি। মানসিকভাবে আকর্ষণবোধ করলে তো হবে না। মানসিকভাবে আকর্ষণবোধ করেছিলাম আমার নিজের জীবনে। তখন যুদ্ধের আমল ৪৩-এ আমার মেঝো ভাইয়ের বিয়ের সময়ে আমরা ট্রেনে করে ফটিকছড়ি বরযাত্রী যাচ্ছিলাম। এক সাব-রেজিস্ট্রারের মেয়ে, পরে খবর নিয়ে শুনলাম যে ইনি সাব-রেজিস্ট্রারের মেয়ে। ভারি সুন্দর লেগেছিল আমার কাছে। তারপরে আমি যখন এম.এ. পাশ করে কলকাতাতে চাকরির খোঁজ করছি, সেখানকার একটা লোক হজ্জ করতে যাবেন, তো ট্রানজিট প্যাসেঞ্জার হিসাবে তিনি আমাদের বাসায় ছিলেন। আমাদের কার সঙ্গে যেনো পরিচয় ছিলো। তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেলো, তিনি বললেন যে, "হ্যাঁ, সে সাব-রেজিস্ট্রারকে আমি চিনি।" এই কথা বলাতে আমি তাঁর মেয়ের বর্ণনা দিয়ে বললাম, "তার বিয়ে হয়েছে কিনা আপনি খবর নেবেন।" তিনি যাচ্ছেন হজ্জ করতে, ফিরে এসে আর কি! পরে সে লোক কথা রেখেছিলেন। জানালেন যে, "না, আপনি যে সাব-রেজিস্ট্রারের কথা বলেছেন যে-নাম বলেছেন, তাঁদের কোনো মেয়ে ছিলো না। কাজেই আপনার রং আইডেন্টিফিকেশন হয়েছে, আমি কিছু করতে পারলাম না।"

আহসান : এতে আপনার মনের প্রতিক্রিয়াটা কেমন হয়েছিল?

শরীফ : না, কিছু হয়নি। বিওল্ড রিচ হলে মনে প্রবোধ পায়। উইদিন রিচ্ হলে মুশ্‌কিল হয়।

আহসান : এছাড়া অন্য আর কারো সঙ্গে কি আপনার সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগ ঘটেছে?

শরীফ : না, হয়নি। মুসলমানের পরিবারে তো হয় না। আমাদের নিজেদের পরিবারে–একটা ব্যাপার ছিলো–আমরা জয়েন্ট ফ্যামিলিতে থাকার ফলে বোধ হয়, আমাদের মধ্যে কাজিন্ বিয়েটা হতে পারেনি। এ কথা জাগেওনি মনে। কেউ কেউ বেশ সুন্দরী ছিলো। এমনকি পরে একটা বদমাশ লোক জুটেছিল আমার এক চাচাতো বোনের ব্যাপারে। মানে কথাটা এই, তার বড়ো ভাই তার সঙ্গে বিয়ে দেবে বলে টাকা নিয়েছিল। সেটা বড়ো কথা নয়। এই কথাটা রটার পরে আমার পাশের বাড়ির আমাদেরই জ্ঞাতির এক ছেলে মেয়ের নামে চিঠি লিখে প্রেম করতো ওর সঙ্গে। শেষে প্রস্তাব দিতে থাকে। আমরা তো কেনো রকমেই সম্মত হতে পারিনে। আমাদের আত্মসম্মানে লাগে। ঐ রকম পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক হয় না কখনো। পরে শোনা গেলো এই, ও-ই রটিয়ে দিয়েছে যে, মেয়ের চিঠি আছে অসংখ্য। সে যুগে–কতোকাল আগের

কথা বলছি। কাজেই বাড়ির সবাই বিপদে পড়ে গেলো। বিপদে পড়ে যাওয়াতে আমার এক চাচা আরেক চাচার কাছে একটা চিঠি লিখলেন যে, "পরিবারে এই একটা বিপদের ব্যাপার হয়েছে, তুমি বিয়ে করো।" তিনি কিন্তু গ্রাজুয়েট ছেলে। তিনি চিঠিতে জবাবটা দিলেন, "এতে আমার অন্য রকমের আপত্তি ছিলো না সত্যি, এটাতো একটা পারিবারিক দায়িত্ব। কিন্তু আজকালকার মেডিক্যাল সায়েন্স বলে যে আত্মীয় বিয়ে করতে নেই। ফার্স্ট কাজিন বিয়ে করতে নেই। নানা রকম হাঙ্গামা হয়, এই জন্যে।"

আহসান : এবারে আপনার কর্মজীবনের কিছু কথা আমরা শুনি। এম.এ. পাশ করার পর জীবন-জীবিকার উপায় কিভাবে করলেন?

শরীফ : পাশ করার পর কলকাতায় গেলাম। কলকাতায় গিয়ে তারক দত্ত রোডে এক মেসে থাকলাম, থেকে একটা চাকরি হলো। একজন বললো এক জায়গায় দরখাস্ত করলাম ডিজিএমপিতে। দেখি যে চাকরি হয়েই গেলো। হয়ে যাওয়ার পরে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, "কাজটা কি?" বলে, "কেরানিগিরি।"

আহসান : ডিজিএমপি-টা কি?

শরীফ : যুদ্ধকালীন–ডিরেক্টর জেনারেল অব মিলিটারি প্রডাক্সন বা কিছু। চাকরি নিলাম না। তো অপেক্ষা করছিলাম, ঠিক সেই সময় আমি আর আমার মেঝো ভাই দু'জনেই আরেকটা চাকরি পেলাম–প্রিভেন্টিভ অফিসারের–এন্টিকরাপস্নের প্রিভেন্টিভ অফিসার। সবটা মিলে আড়াইশো টাকা মাইনে। তো আমার মেঝো ভাই তখন ওখানে ল' পড়ছেন। দু'জনেই একদিনে গেলাম। মিজানুর রহমান সাহেব ইন্টারভিউয়ের মধ্যে একজন ছিলেন, আরেক জন ছিলেন সাহেব–পুরো সাহেব। তিনি আমাকে একটা প্রশ্ন করলেন যে, সুরিয়া সেন মানে সূর্য সেনের কথা বলছে, চাটগাঁয়ের ছেলে বলে। আমি বুঝতে পারিনি। মিজানুর রহমান সাহেব আমাকে সাহায্য করলেন–সূর্যসেন–তখন বুঝতে পারলাম। যাই হোক, চাকরি হয়ে গেলো। আমার মেঝো ভাই চাকরি পেয়ে ময়মনসিংহ গেলেন। আমি এই চাকরি পাওয়ার পরে পরে, পশ্চিমগাঁও নওয়াব ফয়জুননেছা কলেজে আগে একটা দরখাস্ত করেছিলাম, সেটা পেয়ে ওরা এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠান। নব্বই টাকা মাইনা–দশ টাকা হচ্ছে ডি.এ., সরকার থেকে আবার পনেরো টাকা পাওয়া যাবে। মোট হলো একশো পনেরো টাকা। ঐ টাকা ছ'মাস অন্তর অন্তর, আর নব্বই টাকা হচ্ছে মাসে মাসে। আই প্রেফার্ড টিচিং–এটা না নিয়ে চলে গেলাম। শেষে আর আফশোস করিনি এই জন্যে যে, আমার মেঝো ভাই আবার দেড় মাসের মধ্যেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন। কারণ ওখানকার দোকানদারগুলো যে করাপসনের–ঐ যে ভেজাল–চিনির সঙ্গে নুন মেশানো, চালের সঙ্গে কঙ্কর মেশানো ইত্যাদি ব্যাপার। ওরা বলতো যে, "স্যার, আপনি বাড়িতে বসে থাকবেন, মাসে মাসে টাকা দেবো আমরা। এখানে এসে এসব ঝামেলা যদি করেন তাহলে একেবারে শেষ"–ঐ কথা শুনে এক-দেড় মাস পরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন। কাজেই আর আফশোস হয়নি। এটা দিয়েই অনেকদিন চালিয়েছি, তিন বছর-সাড়ে তিন বছর। তারপরে ফেনি কলেজে চাকরি পেলাম, ডিসেম্বর নাইন্টিন ফরটি এইট। ফেনি কলেজে ফরটি-এইটে চাকরি পেলাম, আবার একটা দরখাস্ত করলাম রেডিওতে, ফরটি নাইনের জুন মাসের ১৪ তারিখ এইখানে চাকরি পেলাম। রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা–এইখানে

জয়েন করে ফেললাম। ফেনী কলেজের ছুটিতে এখানে এসেছিলাম, চাকরি পেয়ে এখানে থেকে গেলাম। তা এখানে ঠিক দেড় বছর চাকরি করেছি ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৯৫০-এর। ১৮ ডিসেম্বর ১৯৫০-এ রিসার্চ এ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ঢুকলাম। সেটা ৫৭ পর্যন্ত চলেছে, মাঝখানে হরনাথ পালের এ্যাব্‌সেন্সে এক বছর লেকচারারশিপও করেছি। তদবির করিনি বলে আমার প্রায় সাত বছর, ছ'বছর তো বটেই—লেগেছে লেকচারার হতে। ৫৭-তে লেকচারার হই।

আহসান : আমরা শুনেছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার এই যোগদানের পেছনে পুথির কাহিনী আছে।

শরীফ : পুথির কাহিনীটা এরা ডিসটর্ট করে। পুথির কাহিনীটা হচ্ছে এই, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের কাছে চিঠি লিখলেন শহীদুল্লাহ সাহেব। তিনিই ছিলেন আগ্রহশীল। তিনি বললেন যে, "পুথি বিক্রি করেন।" তিনি (সাহিত্যবিশারদ) বললেন যে, "আমি পুথি নিজের পয়সা দিয়ে কিনেছি বটে, এমনিতেও অনেক পুথি পেয়েছি। আমি বিক্রি করবার জন্যে তো এগুলো সংগ্রহ করিনি। অন্যের থেকে যেগুলো পয়সা ছাড়া পেয়েছি সেগুলো আমার বিক্রি করার কোনো অধিকার নেই। আমি দান করবো। আমার বয়স হয়েছে, আমি দান করবো এবং যখনই আমার যা প্রয়োজন হবে সেই পুথি আবার আমাকে ফেরত দিতে হবে।" এতে ওঁরা রাজি হলেন। তখন আমি এখানে রেডিও অফিসে চাকরি করি, সেখানে আশরাফউজ্জামান খাঁ এঁরা নানাভাবে টর্চার করতেন। পুথি দিলে পুথি তো এখানে পড়ে থাকবে। শহীদুল্লাহ সাহেবও পুথি পড়তে পারতেন না—জানতেন না। সেই জন্যেই আমি একটা শর্ত জুড়ে দিলাম যে, এই পুথির সাথে আমাকেও একটা চাকরি দেওয়া হোক—লেকচারারশিপ দেওয়া হোক। তাহলে পুথির কাজ—পুথির চর্চাও আমি করতে পারবো—পড়তেও পারবো, বিবরণও লিখতে পারবো ইত্যাদি ইত্যাদি। এটা আমার চাচাকে জানানো হলো। তা আমার চাচা লিখলেন যে, "এই পুথি চর্চা করার জন্যে আমার ভাইপোকে এখানে চাকরি দেওয়া হোক।" তো এঁরা তখন বললেন যে, "আমাদের হাত নেই।" তখন নতুন পাকিস্তান হয়েছে। "গভর্নমেন্ট থেকে স্যাংশন আনতে হবে। এখন আমরা ডাইরেক্ট তাকে লেকচারার করে নিতে পারবো না, এখন রিসার্চ এ্যাসিসট্যান্ট করে আমরা নেই, আড়াইশো টাকা মাইনে দিয়ে।" আড়াইশো না দুইশো টাকা এ-রকম, ভুলে গেছি। "তারপরে ইনকোর্স অব টাইম লেকচারার হিসাবে নিয়ে নেবো।" তা সেটা ফুলফিল করেননি শহীদুল্লাহ সাহেব এবং সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন সাহেব। কারণ ঐ ফার্স্ট ক্লাস-টাস নাই বলে আমাকে আর দিতে পারলেন না। তাঁদের সেই কথা তাঁরা রক্ষা করতে পারেননি। কাজেই পুথি দেওয়ার শর্তে আমার চাকরি হয়েছে সেটা সত্যি নয়। পুথি এমনিতেই দান করেছেন উনি। পরে আমার চাকরির বিষয়টা যোগ করেছেন এবং তাঁদের পছন্দ হয়েছে। কারণ পুথি পড়াবার কোনো লোক তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলো না।

আহসান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে আরেকটু জিজ্ঞাসা করি, বাংলা বিভাগে শিক্ষক হিসাবে কাদের পেয়েছেন?

শরীফ : ১৯৫৩-এ বাংলা বিভাগ আলাদা হলো সংস্কৃত থেকে। শহীদুল্লাহ সাহেব রিডার এ্যান্ড হেড অব দা ডিপার্টমেন্ট ছিলেন, আর মোহিতলাল মজুমদার ছিলেন।

গণেশচরণ বসু ছিলেন–ইনি ফার্স্ট ক্লাস–এবং প্রথম ব্যাচের। তারপরে আশুতোষ ভট্টাচার্য ছিলেন, ইনিও ফার্স্ট ক্লাস। তারপরে জসীমউদ্দীন সাহেবকে মুসলমান হিসাবে নেওয়া হয়।

আহসান : পার্ট টাইমার হিসেবেও তো কেউ কেউ ছিলেন?

শরীফ : পার্ট টাইমার হিসেবে ছিলেন সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনি পুথিশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি আমাদের ক্যালিওগ্রাফি পড়াতেন।

আহসান : বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার শিক্ষকদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাকে মনে হয়েছে?

শরীফ : মোহিতলাল মজুমদারকে। যদিও তিনি শুধু বি.এ. পাশ। ইংরেজিত অনার্স ছিলো পরীক্ষা দেননি। স্কুল মাস্টার ছিলেন। অল্প কথাতে এমন চমৎকার করে পড়াতেন! সাহিত্যবোধ যাকে বলে এটা শুধু তাঁরই ছিলো।

আহসান : উনি কি পড়াতেন?

শরীফ : উনি সব কিছু পড়াতেন। মেঘনাদবধ কাব্য থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি।

আহসান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ সময়ে অন্য বিভাগের খুব নামকরা শিক্ষক যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে কার কার কথা আপনার মনে পড়ে?

শরীফ : মাহমুদ হাসান, ইংরেজি বিভাগের। হরিদাস ভট্টাচার্য, দর্শন বিভাগের। ইতিহাসের আর.সি. মজুমদারকে আমরা দেখিনি। ইতিহাসের দু-একজন ছিলেন, যেমন–কলিকারঞ্জন কানুনগো, পড়াতেন না ভালো। তখন তো বিভাগ আর বেশি ছিলো না। ইতিহাস, দর্শন, ইংরেজি, বাংলা। আর আরবি-ফারসিতে তেমন কেউ ছিলেন না। সিরাজুল হক সাহেবেরা ঠিক ভালো শিক্ষক ছিলেন না– নাম করেননি।

আহসান : ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কেমন পড়াতেন?

শরীফ : শহীদুল্লাহ্ সাহেব খুব সরল মানুষ। পড়াতেনও সহজ, ক্রিটিক্যালি পড়ানোর একটা যে ব্যাপার, হায়ার স্টাডিজের মধ্যে সেটা তিনি পারতেন না-করতেন না। এমন কি তিনি যখন কোশ্চেন করতেন সে কোশ্চেনও হতো সহজ। যেমন– 'কানুপার সময় নির্ণয় কর'–স্কুলছাত্রের মতো। এবং ইনি আমাদের উপন্যাসও পড়িয়েছেন। ঐ কদ্দূর পড়ে–'বুঝলে তো এই' এ-রকম। তবে ভাষাতত্ত্ব তাঁর একেবারে রক্তের সংস্কারে ছিলো। যে কোনো শব্দ তিনি তার উৎপত্তি-ব্যুৎপত্তি অতি সহজেই চট্ করে বলতে পারতেন। এদিক দিয়ে তিনি সুনীতি চাটুজ্জের থেকেও কিছুটা এগিয়ে ছিলেন। শহীদুল্লাহ সাহেব আবার ভাষাতত্ত্বের ক্লাসে যখন পড়াতেন তখন কিছু পড়াতে পড়াতে হঠাৎ করেই একটা অন্য রকম কথা বলে সেই প্রসঙ্গে চলে যেতেন।

আহসান : মানে প্রসঙ্গান্তরে চলে যেতেন।

শরীফ : হ্যাঁ। শহীদুল্লাহ সাহেবের ক্লাসে একটা সুখ ছিলো এই যে লেখাপড়া জানতেন, অনেক কিছু জানতেন কিনা, কাজেই তাঁর কথাগুলোর মধ্যে অনেক কিছু জানা যেতো। বিচিত্র রকমের জ্ঞানের উপকরণ পাওয়া যেতো। যেগুলো আমাদের বিস্মিত করতো। এইটেও জানেন–এইটেও জানেন–এইটেও জানেন। সব ইনফরমেটিভ ছিলো আর কি এক কথায়। শহীদুল্লাহ্ সাহেবের শিক্ষক হিসাবে ইউটিলিটিটা ছিলো সেইটাই।

আহসান : আপনি দীর্ঘকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাংলা

বিভাগের শিক্ষক হিসেবে, বিভাগীয় প্রধান হিসেবে, আর্টস ফ্যাকাল্টির ডিন হিসেবে, সিনেট-সিন্ডিকেট ও অন্যান্য বডির সদস্য হিসেবে আপনি কাজ করেছেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আপনার চাকরির শেষ পর্বে আপনার প্রতি সুবিচার বা সঙ্গত আচরণ করেছেন এ কথা বলা যায় না। আপনার দীর্ঘকালের শিক্ষা-সেবা, পাণ্ডিত্য বা বিদ্যাবত্তার স্বীকৃতি বা সম্মান-সমাদর তারা করেননি। তাঁরা আপনার চাকরির মেয়াদ বাড়াননি, প্রফেসর এমেরিটাস বা সুপারনিউমারারি প্রফেসর কিংবা ন্যাশনাল প্রফেসর পদে নিয়োগ দানের উদযোগ নেননি। এ সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

শরীফ : এই সম্পর্কে আমার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। আমার জীবনে—প্রাসঙ্গিকভাবে বলছি এইগুলো হচ্ছে আমার প্রতি মনগড়া জিনিস—মানুষের ব্যক্তিগত কতকগুলো লাইকিং ডিজলাইকিং থাকে, সেইরকম একটা। একটা জিনিস হচ্ছে যে, আমি তোমাকে গোড়াতেই বলেছি, আমি ছোটোকাল থেকেই যেটাকে ন্যায় মনে করতাম তার পক্ষ হয়ে তর্ক করতাম যে কোনো কারো সঙ্গে—পরিবারেও, যে এটা ঠিক হলো না, – এ রকম। যে জন্যে 'নাঠা' বা 'বেঁটা' এই কথা বলতো। আমার আরো কতকগুলো জিনিস ছিলো—আমি ঠিক করলাম যেদিন থেকে আমি চাকরি করছিলাম—রোজগার করছিলাম সেদিন থেকে আমি পৈতৃক সম্পত্তি এবং আমার এই চাচার দেওয়া যে সম্পত্তি কোনোটাই আমি ভোগ করবো না। আজ পর্যন্ত এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমি সেই দুটোর কোনোটাই ভোগ করিনি। অধিকার ছাড়িনি বটে। মানে আমি কাউকে দান ধর্ম করিনি, অন্যেরা খায়—মানে আমার ছোটো ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানেরা খায়। আমার এক বিধবা বোনও কিছু কিছু নেয়। কিন্তু নিজের রোজগার ছাড়া মা-বাপের সম্পত্তি—পৈতৃক সম্পত্তি কিছু খাবো না এ-রকম একটা মনের মধ্যে জেগেছিল এবং সেটা আমি এই মুহূর্ত পর্যন্ত মেনে চলেছি। ঠিক সে রকম আরেকটা জিনিস যে, কারো কাছে কারোর দয়ার দান গ্রহণ করবো না, তোয়াজ-তোষামোদ করবো না। এইজন্য আমার সাত বছর—তোমাকে বললাম—সাত বছর আমাকে রিসার্স এ্যাসিস্ট্যান্ট থাকতে হলো, আমি কখনো কাউকে বলিনি, এঁদের খোঁটা পর্যন্ত দেইনি যে, আপনারা যে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখলেন না। আজকালকার দিনে যেমন করে তদবির করে সে রকম আমি তদবির করিনি। হলে হলো না হলে নাই। আমি সেই একটা ধৈর্য ধরেছি। দ্বিতীয় হচ্ছে, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা নিতান্ত লেকচারার হিসাবেই ৫৮ সন থেকেই আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতি বলো বা শিক্ষক দল এইসব বিষয়ে আমি নিজে জড়িয়ে পড়ি। তারপরে ওসমান গনি সাহেব যখন পিটালেন ছাত্র গুন্ডা দিয়ে আবু মাহমুদকে, সেটা আমার খুব লেগেছিল। আমার নিজের বাড়িতে নিজের পয়সা খরচ করে এঁকে ওঁকে ডেকে ড. হবিবুল্লাহ পর্যন্ত সবাইকে ডেকে আমি নাস্তা খাইয়ে টাইয়ে মামলাটা চালু রেখেছিলাম। শেষে আবু মাহমুদই দেশ থেকে পালালো। সেই থেকে সব ভাইস-চ্যান্সেলর আমাকে শেষ পর্যন্ত অবহেলা করতে পারেননি। আমি লেকচারার ছিলাম বটে, কিন্তু কোনো ভাইস-চ্যান্সেলর আমাকে অবহেলা করতে পারে নাই। এইভাবে একটা নেতৃত্বে আমি এসে গেলাম। এমন কথাও হলো, শেষে 'মতিন চৌধুরীর দল', 'আহমদ শরীফের দল' এ-সব কথা শোনা যেতো। কিন্তু আমি কখনো কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তিকে টিল দিস মোমেন্ট বলিনি, 'তুমি আমার দলে থাকো—আমার দলে

এসো।' আর-একটা কাজ কখনো করিনি—ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমি একবারই শুধু পরাজিত হয়েছি, সিন্ডিকেট ইলেকশনে সিদ্দিক সাহেবের সাথে, ৩৭ ভোটে পরাজিত হই। কারণ তাঁরা সেবার কোমর বেঁধে লেগেছিল আমাকে বঞ্চিত করবে। কিন্তু আমি তখনো কাউকে বলিনি যে আমাকে ভোট দাও। সে-কথাটা আমি কখনো বলিনি। অথচ আমি সব ইলেকশনে দাঁড়িয়েছি। শুধু প্যানেলের কথা বলেছি। ইনডিভিজ্যুয়াল ভোট আমি কখনো নিজের জন্যে চাইনি। এমন কি আমার এক আত্মীয় সম্পর্কে ঐ যে ডক্টর লুৎফুর কবীর, ল-এর ডিন, এক হিসেবে তিনি আমার ভাগ্নি-জামাই, অথবা তাঁর ভাগ্নি-জামাই আমি এইরকম। তিনি বললেন, "জামাই, আপনি আত্মীয় আপনাকে একটা ভোট দেবো।" আমি বললাম, "না, আপনি দেবেন না। কারণ, আমি প্যানেল-ওয়াইজ ভোট চাই।" আমার নিজের জন্যে কারো কাছে ভোট চাইনে, আমি ছোট হয়ে যাবো এবং আমার বিবেকে বাধবে।" এই কথাই আমি ওঁকে বলেছি। কাজেই আমি যখন ডিন হয়েছি তখনো শত্রু-মিত্র আমি কোনো দিন পার্থক্য করিনি। এমন কথাও আমার দলের লোকে বলেছে, "তাহলে কি লাভ দল করে।" আমি বলেছি, "লাভের জন্যে তো দল করিনি। আমি আদর্শের জন্যে দল করেছি। কাজেই আমি ওসব পারবো না।" যাই হোক, আমি যখন চেয়ারম্যান হয়েছি তখনো কারো প্রতি কোনো অবিচার করেছি একথা কেউ বলতে পারবে না। তাঁদের চাকরির ব্যাপারে প্রমোশনের ব্যাপারে যা যা প্রিভিলেজ পায় আর কি, সে সব কোনো ব্যাপারে আমি কিছু করেছি বলে কেউ বলতে পারবে না। কাজেই ঠিক সেই কারণেই আমি যখনই যেটা ন্যায় মনে করেছি, করেছি। ওসমান গণি থেকে শুরু করে ফজলুল হালিম চৌধুরী পর্যন্ত ভাইস চ্যান্সেলরেরা আমাকে একটা উপসর্গ মনে করেছেন। যে কারণে ফজলুল হালিম চৌধুরীর যে সময় এক্সটেনশনের জন্যে লেখার কথা সে সময় না লিখে জুন মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন, আর ওখানে গিয়ে ওকে বলেছেন যে, দিলো না। সে সময় আমাকে বাদ দেওয়ার জন্যে একেবারে সারা দেশেই আইন তৈরি করে দিলো। কবীর চৌধুরীরাও সেই ফাঁদে পড়লেন। পরে অন্যেরা সবগুলো আপোস করেছে, আহমদ শরীফ সে আপোস করেনি। যাইনি, বরং আনিসের কাছে কৃতজ্ঞ এই জন্যে যে আনিস নিজের থেকে এসে একদিন আমাকে বললো যে, "স্যার, আপনি যদি বলেন আমি ওখানে প্রপোজ করে দেখতে পারি যে নজরুল প্রফেসরশিপ খালি আছে, ওরা যদি আবার রিভাইভ করে। আমি নজরুল প্রফেসরশিপের জন্যে আপনাকে বলছি। আমার তো হাত নেই, প্রস্তাব করা ছাড়া।" আমি বললাম, "করে দাও।" এবং সে করেছে, ইট ওয়াজ এ্যাকসেপ্টেড, এই। এখানে শেষে দীন মুহম্মদকে এ্যাকোমোডেট করার জন্যে, যাকে রাজাকার বলে তাড়াতে চেয়েছিল, আমাকে একটা চিঠি লিখে দিলো। আমি তখন জবাব দিই, একবার নাকি কোন শিক্ষক আমাকে সুপারনিউমারারি করার জন্যে প্রস্তাব করেছিল, অতি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আমার নাম বাদ দেওয়া হয় আলোচনার বিষয় নয় বলে। কাজেই এখন আমাকে সেই বিভাগ থেকেই আবার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে বটে, আমার আত্মসম্মানে বাধে সেই জন্যে আমি নিতে পারি না। আমার প্রয়োজন নেই। এই করে আমি প্রত্যাখ্যান করি। কাজেই আমি কারো কাছে তোয়াজ করিনি বলে আসলে আমার উপর অপ্রসন্ন। ছাত্র হিসেবে তুমিও জানো। সেগুলো তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তিন বছর

চেয়ারম্যান ছিলাম, আমার নিজের পয়সা দিয়ে আমি মিটিং করেছি। আমি ফান্ডের থেকে দিইনি। প্রথম মিটিং-এ আমাকে না বলে ১২/১৪ টাকা খরচ করে ফেলেছিল তালেব, ঐ যে আগের নিয়মে আর কি। আমি তাকে ধমক দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিলাম, আর হয়নি। আমি যখন ডীন ছিলাম তখনো ঐ রকম আমার নিজের পয়সা দিয়েই মিটিং-এর খরচ চালিয়েছি। কাজেই আমি কারো সঙ্গে আপোস করিনি কখনো। ঐ যে সিন্ডিকেটে বসেছি বহুবার, সিন্ডিকেটে একেবারে ভাইস্ চ্যান্সেলরকেও আমি অপোজ করেছি, সব ভাইস্-চ্যান্সেলরকে অপোজ করেছি, পছন্দ না হলে আমি ইল্ড্ করিনি। আমি বলেছি যে, "আই রিকোয়েস্ট ইউ টু রেকর্ড মাই নোট অব ডিসেন্ট।" এই করেছি। এই জন্যে আমাকে পছন্দ করা মুশকিল ছিলো। এবং ভালো ভালো চমৎকার চমৎকার ব্যাপার ঘটেছেও। কন্ট্রাক্টর বিরাট প্যান্ডেল করে সবাইকে খাওয়াবে, ইউনিভার্সিটির বাড়ি করছে। দুইটার সময় এসে দেখি যে, আমার বাড়ির সামনে প্যান্ডেল। এ দিকে বিল্ডিং হবে। "কি ব্যাপার।" বলে যে, "টি-পার্টি হবে ফাউন্ডেশনের সময়।" বললাম, "কে দেবে? বলে, "কন্ট্রাক্টর।' আমি ঘরে ঢুকেই তখন, তখন শামসুল হককে বললাম, "একি কথা হলো, কন্ট্রাক্টরে টি-পার্টি করে ফাউন্ডেশন দেবে কেনো। তার তো কাজ করার কথা। টি-পার্টি করে টাকা খরচ করার তো কথা নয়। ইট ইজ এ করাপসন এ্যাপেল, এটা তো উচিৎ না।" এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে শামসুল হক বন্ধ করে দিলেন। এগুলো আমার হয়েছে। কিছু কিছু হয়েছে। আমি তখন সিন্ডিকেটের নেতা আর কি টিচার হিসেবে আমার দলের, মতিন চৌধুরী আমাকে না বলেই—'দি ভাইস-চ্যান্সেলর এন্ড দ্য মেম্বরস্ অব দ্য সিন্ডিকেট রিকোয়েস্ট ইউ টু—ডিনারের ব্যবস্থা করে ফেলেছে। চিঠি হয়ে গেছে। আমি বললাম যে, "কি এটা আপনি পারেন না।" তিনটের সময় গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আড়াইটা বাজার পরে চিঠি পেয়েই। "আমাদের সম্মতি না নিয়ে আমাদের নাম শুদ্ধ ব্যবহার করে ডিনার দিচ্ছেন, এটা কি!" তো বলে, "ভাইস্-চ্যান্সেলর পারেন।" আমি বলি যে, "না পারেন না।" বলে, "আমি দেবো।" আমি বলি, দেন গিয়ে, সে অন্য কথা, আমরাও দেখে নেবো যে আমাদের নাম ইউজ করা যায় কি যায় না।" চলে এলাম বটে, দেখি যে আধঘণ্টা পরে ক্যান্সেলেশন লেটার এসে গেছে। এইসব কৃতিত্বের কথাও আছে। তো তোয়াজ-তোষামোদ না করলে যে জীবন বৃথা হয়, তা নয়। এমন লোক বাংলাদেশে তুমি খুঁজে পাবে না যে বলবে, আমার সন্তানের জন্যে আমি কারো কাছে তদবির করেছি। আমার সন্তানেরা লেখাপড়ায় তেমন ভালো নয়, তাদের চাকরির জন্যে তদবির করতে হয়েছে—অন্য লোকে করেছে—অন্য রকমে হয়েছে, সে সব অন্য কথা। কিন্তু আমি করিনি, আমার নিজের জন্যেও করিনি। দ্যাটস হোয়াই আই হ্যাড টু সাফার। কিন্তু আমি কোনোদিন করিনি। এটা আমার গ্রেট গ্রান্ড ফাদারের আমল থেকে আমাদের পরিবারে একটা কথা চালু শুনেছি—আমার বাপ-চাচার মধ্যে দেখেছি-পরাজিত শত্রুকে লাঞ্ছিত করতে নেই। ক্ষমা করতে হয়। এর পরে তো সে নিজের লজ্জায় নিজেই গেলো। তারপরে পীড়ন করাটা অমানবিক। আমি সেটা চিরকালই ধরে রেখেছি। আমি কখনো কারো প্রতি ভিকটিমাইজেশন যাকে বলে সেটা কখনো করিনি। কখ্খনো করিনি। আমি নিন্দা করে শেষ করে দেই, কথায় কথায় আমি অসংখ্য মানুষকে 'হারামজাদা' ডাকি, ওতেই আমার রাগ-গোস্বা চলে যায়।

আহসান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আপনার প্রতি যে অবিচার করেছে এ ব্যাপারে আপনার কোনো অভিযোগ নেই?

শরীফ : না। অভিযোগ তো করেই মানুষ যখন চরিত্রহীন, তখন করেই। আর না হলে আমার দাবি একটা ছিলো, এই জীবনে একটা দাবিই জোর করে আমি বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যদি প্রফেসর এমিরেটারসশিপ কেউ ডিজার্ভ করে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে, তাহলে ইট ইজ ওনলি আহমদ শরীফ এন্ড আহমদ শরীফ এন্ড আহমদ শরীফ, টিল দিস মোমেন্ট। এর থেকে বেশি কাজ–এর থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ–এর থেকে গুরুতর কাজ আর কেউ করেনি। আর তারা সেই প্রফেসর এমিরেটারসশিপ দিলো জাব্বার–যে লেখাপড়া জানে না, মফিজউদ্দীন–যে লেখাপড়া জানেনা এবং দু'জনেই কোলাবরেটর।

আহসান : আসলে আমরা অনেক অবাঞ্ছিত ঘটনা আর দুঃখজনক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে বাংলাদেশে অগ্রসর হচ্ছি। এবারে আমরা আপনার গবেষণা কাজ নিয়ে কিছু কথা শুনবো। আপনি তো মূলত মধ্যযুগ নিয়ে গবেষণা করেছেন। অন্য বিষয়ে কাজ করলেও মধ্যযুগই আপনার গবেষণার মূল বিষয়। আমরা জানি যে, যে সময়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পুনর্নির্মাণ-পুনর্গঠনের একটা প্রয়োজন ছিলো সেই সময়েই এই কাজটা আপনি হাতে নিয়েছিলেন। এই মধ্যযুগের সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণার প্রেরণা আপনি পেলেন কি করে?

শরীফ : আগেই তো বলেছি, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মুসলমানের মধ্যে পুথি সংগ্রহ শুরু করলেন। হিন্দুরা পুথি সংগ্রহ করেছে উনিশ শতক থেকে। কিন্তু মুসলমানের ঘরে যে কোনো পুথি থাকতে পারে–সেই ধারণাই তাদের কখনো ছিলো না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি, শেষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ অসংখ্য পুথি সংগ্রহ করেছে কিন্তু মুসলমানের বাড়িতে যে পুথি থাকতে পারে–মুসলমান যে পুথি লিখতে পারে এই ধারণা তাদের মধ্যে কখনো হয়নি। তারা এক দেখেছে দেশজ মুসলমান, অশিক্ষিত নিম্নবিত্ত–নিম্ন শ্রেণীর থেকে নমশূদ্র থেকে হয়েছে। নমশূদ্রের মধ্যে লেখাপড়া নেই, কাজেই এদের মধ্যেও লেখাপড়া নেই। আর যারা খানদানি মানুষ উর্দুওয়ালা তারা, বাংলা লেখেনি সে কারণে। একটা কথা চালু ছিলো, আমাদের জানাও ছিলো, শোনাও ছিলো যে, "মুসলমানেরা বাংলা লিখিতে পারে না।" এই কথাগুলো ঐখান থেকেই এসেছিল। তো আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের কৃতিত্ব হচ্ছে যে তিনি এই পুথি সংগ্রহ করে দেখালেন, মুসলমানেরা–এই যে দেশজ মুসলমানেরা পঞ্চদশ শতাব্দী, চতুর্দশ শতাব্দী, ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই বাংলা চর্চা করছে। বাংলা তাদের মাতৃভাষা,বাংলা তাদের জাতীয় ভাষা। ইনি ১৯০৩-এ এটা 'আল-ইসলাম'-এ বলে গেলেন, "বাংলা শুধু মুসলমানের মাতৃভাষা নয় জাতীয় ভাষা।" তো এই যে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের এই কথা প্রকাশ করা সত্ত্বেও মুসলমানদের মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটেনি ১৯৩০ পর্যন্ত। দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটেনি ৩০ পর্যন্ত মুসলমানের–বাঙালি মুসলমানের ভাষা উর্দু না বাংলা! কারণ বাঙালি মুসলমানের নেতৃত্ব দিয়েছে উর্দুওয়ালারই। মুশকিল হলো সেই। একেবারে ইংরেজ আমলের প্রথম থেকেই–মুর্শিদাবাদ থেকে আসা। যেমন নবাব আবদুল লতীফ বলেছেন যে, 'বাঙালি মুসলমানের ভাষা হচ্ছে উর্দু, ছোটলোক

মুসলানের ভাষা হচ্ছে বাংলা।' তো সেই ছোটলোক মুসলমানের ভাষা ক্রমশ দোভাষী ভাষার মাধ্যমে উর্দুতে উন্নীত করতে হবে। সে রকম অবস্থাতে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ যুক্তি দিয়ে দেখালেন যে, বাঙালি মুসলমান বাংলা চর্চা চিরদিন করেছে, বাংলাতে কথা বলেছে, উর্দু ভাষার সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এইটেতেও মুসলমানের মনে বুঝ মানে নাই। অবশেষে নজরুল ইসলাম যখন চমকপ্রদ কতকগুলো কবিতা লিখলেন, তখন বাঙালি মুসলমান দ্বিধাহীন চিত্তে আবদুল করিমের এই পুরনো দলিল আর কাজী নজরুল ইসলামের এই চমকপ্রদ কবিতা এই দুটোতেই বাঙালি মুসলমানের অধিকাংশকে দ্বিধাহীন চিত্তে বাংলাকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করার জন্যে অনুপ্রাণিত করে। তো সেই আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ—তোমাকে বলেছি—আমার পালন-লালন কর্তা আজন্মের। কাজেই সেই পরিস্থিতিতে আমি জন্মকাল থেকেই দেখে আস্‌ছি পুথি, আমার দেহের চারদিকে—ঘরের চারদিকে—মনের চারদিকে, এই দেখে এসেছি। আর মাস্টারির প্রতি যে আমার আকর্ষণ জাগলো সেটাও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ থেকেই পেলাম। সেটা হচ্ছে যে, ইনি এক বছর—দু'বছর ম্যাট্রিকের এক্সামিনার ছিলেন। আর নিজে এন্ট্রান্স পাশ হওয়া সত্ত্বেও সারা জীবন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ.-র এক্সামিনার ছিলেন এবং হি ওয়াজ দ্যা ওন্‌লি মুসলমান বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা প্রভৃতিতে। তখন বি.এ.-র এক্সামিনার হওয়া একটা মর্যাদার ব্যাপার ছিলো। উনি যখন উত্তরপত্র দেখতেন, মাস্টাররা যে রকম ফাঁকি দেয় সে রকম ফাঁকি দিতেন না, কারণ তিনি এক সময় এম.ই. স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। তিনি বিটুইন দ্যা লাইন্‌স এগুলি পড়তেন, দাগ দিতেন। অনেক সময় লাগতো তাঁর। সেইটে আমার খুব ভালো লাগতো। আমি পাশে বসে কি লিখেছে দেখতাম। আমি কিন্তু তখন বি.এ. পড়িনে। কিন্তু তবু প্রশ্ন তার প্রশ্নের উত্তর এগুলো আমার খুব ভালো লাগতো। মাস্টারির দিকে আমার ঝোঁকও সে কারণেই হয়েছিল। পুথি দেখে দেখে তখনই পুথি পাঠ আমার কিছুটা আয়ত্তে এসেছিল, এক নাম্বার। দুই নাম্বার হচ্ছে, যেটা সবচেয়ে বড়ো কথা—আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ পরিবেশ পাননি। একে তো মুসলমান সমাজের মধ্যে স্বীকৃতি ছিলো না। সেই জন্যে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শরণাপন্ন হলেন। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' যে সব বই তাঁর ছাপার জন্যে নিয়েছিলেন, মানে ছাপবেন বলেছিলেন, ছেপেছেন—সেটা লালগোলার মহারাজা রায় যতীন্দ্র নারায়ণ রায়ের অর্থ সাহায্যে। সেগুলোতে একটা প্রচ্ছন্ন—কারো দোষের কথা নয়, প্রচ্ছন্ন একটা আস্তিক মানুষের যা থাকে, সে আস্তিক মানুষের প্রবণতা ছিলো। যেমন-'গোরক্ষ বিজয়'-মুসলমান রচিত। 'গোরক্ষ বিজয়' কি 'জ্ঞানসাগর' মুসলমানের রচিত, বিষয়টা কিন্তু হিন্দুর। সেগুলো তারা ছেপেছে, আর হিন্দুর কয়েকটা ছেপেছে। যেগুলো দিয়ে মুসলমানের গৌবর গর্ব হতো; মুসলমানের সাহিত্যিক এবং ধর্মীয় শাস্ত্রীয় যেসব গৌরব-গর্বের সাহিত্যবস্তু সেইগুলো ওখানে ছাপানো গেলো না, যায়নি। কাজেই সেগুলো পড়েছিলো। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ যদি সে সময় বাংলা একাডেমীর মতো কিছু পেতেন তাহলে করে দিতে পারতেন। আমি সেই সুবিধাটা পেলাম। কাজেই মুসলমানের লেখা যথার্থ সাহিত্য কি, কি কি করেছে সেগুলোর মধ্যে তো দীনেশ সেনের বদৌলতে আলাওলের নাম শুনেছিল মাত্র। আর আমরা সেগুলো—ঐ যে 'লায়লী-মজনু' প্রভৃতি সম্পাদনা করে দেখাতে পার-

লাম। 'নবীবংশ' দেখাতে পারলাম। 'নবীবংশ' যদি একশো বছর 'আগে' বের হতো, এই বটতলার বাজার থেকেও যদি বের হতো, তাহলে মহাভারতের যে প্রভাব ব্রিটিশ আমলের বাঙালি হিন্দুর উপরে পড়েছিল—যে প্রভাবে হিন্দুয়ানী জাগলো, হিন্দুর ধর্মচেতনা জাগলো, সমাজ-চেতনা জাগলো এবং জাতীয় চেতনা জাগলো, সেই চেতনা 'নবীবংশ' দিয়ে মুসলমানের মধ্যেও জাগতে পারতো। সেগুলো তো হয় নাই। আমরা যখন করলাম তখন দিনকাল পার হয়ে গেছে, এখন এগুলো আর কে পড়বে! এই মুসলমানের সাহিত্যের পরিচয় আমি দিতে পারলাম। এক হিসাবে আবদুল করিম সাহত্যবিশারদের যে আকাঙ্ক্ষা ছিলো, সে আকাঙ্ক্ষাটাকেই আমি বাস্তবে অনুকূল পরিবেশে বাংলা একাডেমী হওয়াতে রূপায়িত করতে পারলাম। এই হলো কথা। বাংলা সাহিত্যের যে ইতিহাস মধ্যযুগের, সেটা লেখার আকাঙ্ক্ষা আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের মনেই ছিলো। কিন্তু 'পদ্মাবতী' পুথি ছাপবার জন্যে ইনি এ্যাপ্রোচ্ করেন নাই হেন প্রতিষ্ঠান ছিলো না। আর যে যেখানে বলেছে—সওদাগর থেকে শুরু করে ধনীলোক পর্যন্ত সবগুলোকেই বলে দেখেছেন। 'করছি' করবো বলেছে। শেষ পর্যন্ত বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম ছাপবে বলেছিল, ম্যানসক্রিপটাই হারিয়ে ফেললো। এইসব ট্রাজেডি গেছে। কাজেই আসলে আমি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের স্বপ্নের বাস্তবায়নেই আগ্রহী ছিলাম এবং আমি মনে করি আমি সার্থকভাবেই করে দিতে পেরেছি—বাঙালি মুসলমানের পূর্ব ঐতিহ্য সম্পর্কে একটা ফার্মফুটিং যাকে বলে সেটা এখন হয়েছে। এর থেকে হিন্দুরা বেশি কিছু লেখেনি। এদের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে—এদের লেখার মধ্যে, ওদের লেখার মধ্যে বৈচিত্র্য নেই। যেমন শুধু ধর্মমঙ্গলই লিখেছে ১১৪ জনে, বহুলোকে 'মনসামঙ্গল' লিখেছে, 'চন্ডীমঙ্গল' লিখেছে, 'রামায়ণ' লিখেছে, 'মহাভারত' লিখেছে। কিন্তু মুসলমানেরা বিচিত্র বিষয়ে লিখেছে। সেই কথাগুলো কলকাতার হিন্দুরা জানতো না। ওরা যেমন ধরো, ঐ ঐ অনুবাদ সাহিত্য-মুসলমানরাও জানতো না—কাজেই অনুবাদ সাহিত্য মানে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত—তিন কথা লিখলেই নম্বর পেয়ে যাবে। অনুবাদ যে আরো আছে তা জানা ছিলো না। কাজেই আমি *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* নামে বই লিখে যা দিয়েছি এই পুর্ণাঙ্গতাটা আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সংগ্রহেরই ফল এবং আজকের এই দুইবঙ্গে বাংলাভাষীকে আমি দেখাতে পারলাম যে, বাংলা সাহিত্যের পুর্ণাঙ্গ রূপরেখা এই– পুর্ণাঙ্গ রূপটা এই। আমার এই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ১৭০০ পৃষ্ঠা লেখা সেদিক দিয়ে সার্থক হয়েছে। এর আগে এই কাজ কেউ করে নি।

এখন কেউ করতে চাইলে অতি সহজেই করতে পারবে। কারণ মেটিরিয়ালগুলো একত্রিত হয়েছে।

আহসান : এ বিষয়ে আপনার আর কোনো পরিকল্পনা কি আছে?

শরীফ : না, এখন আর সে বয়স নেই। কারণ একটা পুথি সম্পাদনা করতে তিন-চার বার কপি করতে হয়, পাঠ মিলাতে হয় পাঁচটা-সাতটা-দশটা মিলিয়ে। সেই জন্যেই আমি ঢাকা বিশ্ববদ্যালয়ে শনিবার আমার অফ ডে করেছিলাম। শনি-রবি এই দুই দিন একটানা কাজ করেছি। শুধু তা নয়, অন্যদিনে আমি সকাল থেকে এই কাজ করেছি-ইউনিভার্সিটি গিয়েছি। ইউনিভার্সিটি থেকে এসে আবার বসেছি। আমার তো তখন এত

আড্ডা ছিলো না। কোনো লোক না এলে তার সাথে কথা বলা না হলে রাত বারোটা পর্যন্ত এইসব করা। এতগুলো পুথি মিলিয়ে একসঙ্গে একবার এখানে দেখা—একবার ঐখানে দেখা—খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আমার হাতের লেখা সুন্দর নয় বটে, কিন্তু আমি যত কপি করেছি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের কোনো কপিস্টও তা করে নাই, কোনো টাইপিস্টও সারাজীবনে অতো টাইপ করেনি, কোনো কম্পোজিটারও অত কম্পোজ করেনি। সেদিক দিয়ে আমার একটা স্যাটিসফ্যাকশন আছে যে, আমি তো তাস খেলতে জানি না—জুয়া খেলতে জানি না—আর কারো বাড়িতে গিয়ে আড্ডা দিতে জানি না—আমার বাড়িতে আসলে আড্ডা, আমি আবার কোথাও গিয়ে আড্ডা দিতে স্বস্তিবোধ করি না, কাজেই আমার সময় অপব্যয়িত হয়নি। এবং ১৯৭৮ এ আমার কাজ শেষ হয়েছে—শেষটা—সেটা হচ্ছে দোনাগাজীর 'সয়ফুল মুল্‌ক বদিউজ্জামাল'। তারপরে যে তিনটা করেছি সেগুলো আরো মূল্যবান। একটা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই একমাত্র কপি আছে আর কোথাও নেই, সেটা হচ্ছে 'চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ'। আরেকটা হচ্ছে 'গৌরী মঙ্গল', আবিষ্কৃত হয়েছিল বটে, সাহিত্যবিশারদ সাহেবের বইটাতে একটা শব্দ বাদ দেওয়া আছে—'হোসেন শাহ' পাওয়া যায়নি, এটাতে 'হোসেন শাহ' পাওয়া গেলো। আর সমস্ত বইটা এখানে ছিলো, কাজেই আমি এখানে খন্ডিত কয়েক পৃষ্ঠা সেটা এডিট করে নিয়ে পঞ্চদশ শতাব্দীতে 'গৌরী মঙ্গল' ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে রচিত, একটা বইয়ের পরিচয় দিতে পেরেছি। আর একটা সবচেয়ে বড়ো পরিচয় দিতে পেরেছি সেটা হচ্ছে এই, লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া প্রভৃতি আসামী কবি বানিয়ে ফেলেছিলেন 'মহাভারত'-এর কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে, আমি তাঁর পূর্ণ পরিচয় দিতে পেরেছি। এখন দেয়ার ইজ নো পাওয়ার অন আর্থ, নো বডি অন আর্থ টু ডিজঅ্যাপ্রুভ ইট।

আহসান : এটা নিঃসন্দেহে একটা বড়ো সাফল্য এ বিষয়ে। আপনি তো পিএইচ. ডি. গবেষণা করেছেন সৈয়দ সুলতান সম্পর্কে। জানতে ইচ্ছে করে, সৈয়দ সুলতান সম্পর্কে গবেষণায় আগ্রহী হলেন কেন?

শরীফ : সৈয়দ সুলতান সম্পর্কে গবেষণা করলাম এই জন্যে—ঐ যে তোমাকে বললাম যে 'নবীবংশ' বিরাট ব্যাপার। তো তখন এটা মুসলমানের মহাভারত। মারি তো গন্ডার লুটি তো ভান্ডার। যদি করিই তাহলে সৈয়দ সুলতানই করবো, যতোই খাটনি হোক। এতো বড়ো—চারবার লিখতে হয়েছে, কল্পনা করো। এই যে পাঁচটা-সাতটা পুথি মিলিয়ে, আর এমনিতে যেটা রিসার্চের অংশ সেটা আমার ছ'মাসও লাগেনি। আই কুড রাইট ফ্রি-হ্যান্ড। আমার তো কোনো গাইড ছিলো না। এখানে একটা কাহিনী বলি। আমি পিএইচ. ডি. ডিগ্রি আরো আর্লিয়ার করতে পারতাম— উইদিন ফিফ্‌টিজ করতে পারতাম। জুবেরী সাহেব ছিলেন আমাদের ডিন, শহীদুল্লাহ সাহেবের চাকরি যাচ্ছে। শহীদুল্লাহ সাহেব পরহেজগার লোক তো, কেমন বিবেকে বেধেছে, আমাকে নিয়ে গেছেন জুবেরী সাহেবের কাছে। "এ-কে তো আমরা রিসার্চ এ্যাসিস্‌ট্যান্ট হিসাবে এনেছিলাম, শ্রকটা কথাও দিয়েছিলাম যে ইন্ কোর্স অব্ টাইম তাকে লেক্‌চারার করে নেবো।" জুবেরী সাহেব এমনিতে শয়তান লোক, কিন্তু খুব ভদ্র। বলেছেন যে, "ইউ হ্যাভ গট সেকেন্ড ক্লাস ইন এম.এ.। পারহ্যাপস্ ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু কমপিট উইথ আদার্স। ট্রাই টু হ্যাভ এ পিএইচ.ডি.। আমি ভাবলাম, এটা কি কথা বললেন। "ইফ

আই ডু এ পিএইচ.ডি. ডিগ্রি, শুড আই কেয়ার ফর এ লেকচারশিপ এন্ড শুড আই কাম টু এনি বডি?" আমি চটে গেলাম। এই কথা বলাতে জুবেরী আর কিছু বললেন না। মনও খারাপ করলো না। বুঝলো যে এটা আমার অভিমান। "পিএইচ.ডি. করে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে লেকচারশিপ নেবো না—এটা বলে এলাম। পিএইচ.ডি. করার শর্তে—পিএইচ.ডি. করে ঢাকা ইউনিভর্সিটিতে আমি লেকচারশিপ নেবো না। কাজেই আমি করলাম না। সে কথা হচ্ছে এই—"আই শ্যাল রিমেইন রিসার্চ এ্যাসিস্ট্যান্ট অন টু গেট।" কারণ রিসার্চ এ্যাসিস্ট্যান্ট আবার সবাই। এটাকে ছোটো মনে করতাম না। কারণ এটা সুনীতি চ্যাটার্জি হয়েছেন, সুকুমার সেন হয়েছেন, শহীদুল্লাহ সাহেব হয়েছেন, কাজেই আহমদ শরীফ হয়েছে। আমি এই ৬৩-তে করিনি। আমার কাছে অতি সহজ ছিলো। কেনোনা আমি লেখাপড়া করেছি, অনেক বই ঘাটাঘাটি করেছি। ফ্রি-হ্যান্ড লিখতে পেরেছি। আমি যখন ১৯৬৩তে এখানে বাসা নিলাম, ঢাকা ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টারে, একদিন শুনি কি, আমার বড়ো ছেলেকে মেঝো ছেলে বলছে যে, "দাদা, জানো ওর বাপ পিএইচ.ডি.।" আমি শুনলাম। আমার কাছে ইট ওয়াজ এ গ্রেট শক্ টু মি। আমি ভাবলাম যে, আমার ছেলেরা তো ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স ভোগ করছে। এতো হয় না। বাপের পরিচয়ে তো মেয়ের বিয়ে হয় এখনো। মেয়ে ফার্স্ট ক্লাস পেলেও বাপের পরিচয় দরকার। ছেলে—কার ছেলে জিজ্ঞাসা করে না। বড় চাকরি করে সেই জন্যে বিয়ে দেয়। আমি ভাবলাম, দে আর সাফারিং ফ্রম ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স। আই মাস্ট ডু সামথিং। সেই দিনই আমি মনস্থির করলাম যে, আমি ছয় মাসের মধ্যে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির ব্যবস্থা করবো। এই হলো আমার কথা। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করলাম, বললাম, "ছেলেরা এই রকম বলছে।" তিনি বললেন, "আমি কোনোদিন তোমাকে বলিনি বটে, কিন্তু আমার কথাও তো তাই। তোমার ছাত্র আনিস, তোমার ছাত্র সাকলায়েন—এরা করলো, এরা বড়ো হয়ে যায়।" তা আমি তখন কাজ করলাম, করে রিসার্চের অংশটুকু ছ'মাসের মধ্যে সত্যি সত্যি শেষ করলাম। তারপর ঐটা ধরে—এই অংশটুকু সাবমিট করলেই হতো। ঐটা ধরে পুরো এক বছর লাগলো—দিবারাত্রি করেছি, তাতে আমার ডায়াবেটিস ধরেছে। ইট ওয়াজ এ গ্রেট শক টু মি, আমার সন্তান বাপের জন্যে লজ্জিত থাকবে, এটা আমার সহ্য হয়নি। এখন আমার ছেলে সেটা চমৎকারভাবে উশুল করেছে ঐখানে। ঐ যে ধমক দিয়ে দিয়ে আমার ছেলে বলে, "আমার তো দুই পুরুষ চলছে, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমার জন্ম হয়েছে। আপনারা আমারে কইবেন কি—বুঝাইবেন কি!" এই রকম করে কথা কয়।

আহসান : আপনি শুধু দেশ থেকে নয়, দেশের বাইরে থেকেও সম্মান-স্বীকৃতি পেয়েছেন। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আপনাকে সাম্মানিক ডি.লিট. উপাধি প্রদান করেছে। অবশ্য এই ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সম্মান নিজের দেশ থেকেই পাওয়ার কথা ছিলো। সেটা আপনি পাননি বলে আমাদের একটা দুঃখ একটা আক্ষেপ একটা ক্ষোভ আছে, রবীন্দ্রভারতী সেই ক্ষতি কিছুটা পূরণ করেছে বলে আমরা মনে করি। এই ডি.লিট.-প্রাপ্তিতে আপনার প্রতিক্রিয়া কি ছিলো?

শরীফ : ডি.লিট. প্রাপ্তিতে একটা প্রতিক্রিয়া হলো, আমার নিজের সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে গেলো। আমি ৩৬ বছর আর ওখানে যাইনি। তারপরে আমি ভারত

সরকার-বিরোধী বলে আমার একটা নিন্দাও আছে। সে রকম অবস্থাতে অবশ্য চিঠিপত্রে আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব হয়েছে, এখানে যারা আসতো তাদের সঙ্গে আমার পরিচয়, অনেক মেটিরিয়ালস্-বইপত্র দিয়েছে। আমাদের এখানে অনেকে চিঠির জবাব দেয় না সেইসব কমপ্লেনও শুনি। ওখানে দেখা হয়েছে—সাক্ষাত হয়েছে, দাদা-দিদি করেছে, কিন্তু চিঠির জবাবও দেয় না—বই পাঠাতে বললে তাও পাঠায় না। আমার কাছে যেই চেয়েছে—পরিচিত অপরিচিত আমি সব সময় দিয়ে থাকি আর চিঠির জবাব দিয়ে থাকি সাধারণত। আমি চিঠির জবাব দিই—আমি মনে করি যে এটা একটা কর্তব্য। একটা দায়িত্ব—মনুষ্যত্ব এ রকম মনে করি। যখন এই প্রস্তাব ওখান থেকে এলো, ৩৬ বছর যাইনি, আমার একটা প্রথম আনন্দের কথা হলো যে আমার লেখাটেখা বই পত্রের খবর ঐখানে পৌঁছেছে। না পৌঁছারই কথা। এগুলো তো পড়বার লোক থাকে না। আমি তো গল্প-উপন্যাস-কবিতা লিখি না : এই আশ্চর্য, ওখানকার কোনো পত্রিকাতে লিখিও না। এইটেই আমার প্রথম রিএ্যাকশন হচ্ছে যে আমি সেখানে পরিচিত আছি এই খবরটা আমার জানা ছিলো না। ডিগ্রির থেকে সেইটেই বড়ো কথা। তারপরে পবিত্র সরকার এখানে এলেন, আমাকে বলে গেলেন যে, "আমি প্রস্তাবটা বলার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে টেবিল চাপড়ে আমার সিন্ডিকেট মেম্বারেরা প্রস্তাবটা সমর্থন করেছে।" খুশি হলাম। তারপরে কলকাতাতে গিয়ে বাস্তবে দেখলাম যে, এরকম কাজ কল্পনা করিনি আমি। এই যে বিশ্বভারতী থেকে পার্সোন্যালি একজন এসেছিলেন, উনি সেখানকার হেড মিসট্রেস, এক প্রফেসরের ওয়াইফ—কালিকারঞ্জন কানুনগোর পুত্রবধূ—আমাদের চাঁটগাঁয়ের। তাঁর বাবার সঙ্গে আমার আলাপ ছিলো—সঞ্জীবপ্রসাদ সেন। ইনি এসেছিলেন ওখান থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে—আমাকে দেখতে। শান্তিনিকেতন থেকে আর কেউ আসেননি। আশা উচিত ছিলো, কিন্তু আসেননি। আমি চলে আসার পরদিন নাকি এসেছিলেন সুখময়। ইনি আমার পনেরো বছরের পরিচিতি। সে যাই হোক।

আহসান : ঢাকায় এসে আপনার এখানে থাকতেও দেখেছি।

শরীফ : একবার নয় বহুবার ছিলেন এবং পনেরো-বিশদিন ছিলেন, এ-রকম। তো সে-কথা নয়, যা হোক। মেদিনীপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, নদীয়ার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলার অধ্যাপকরা এসে হল ভাড়া করে আমাকে সংবর্ধনা দেন, ক্ষেত্রগুপ্তের নেতৃত্বে। প্রত্যেকে আমাকে বই উপহার দিয়েছেন। ফুলের তোড়া দিয়েছেন কেউ কেউ, অন্তত একটা ফুল দিয়েছেন। প্রত্যেক ইউনিভার্সিটি থেকে বক্তৃতা যাঁরা দিলেন একজন-দু'জন করে, দেখি যে আমার দু'চার-পাঁচটা বই পড়েছেন। হয় প্রবন্ধের বই, না হলে গবেষণার বই। এবং খবরও রাখে এটা আনথিংক্যাবল ছিলো আমার পক্ষে। আমার কল্পনাতীত যে এতো লোক আমার জন্যে এসেছেন। যাঁরা যায় তাঁদের চেনার কথা, আমি যাইনি, তারপরে আমার বই পৌঁছার কথা নয়, এখানে কোনো সমাদর পায় না। কোনো পাবলিশার আমার বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ করবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। কাজেই এটা কল্পনাতীত ছিলো। কলকাতাতে যে সমাদর আমি পেয়েছি সেটা পেয়ে আমার আনন্দের কোনো সীমা ছিলো না। এই একজন এখানে বলেছিলেন, "যান কলকাতায়, জয় করে আসুন।" তাঁকে এসে বলেছিলাম, "সত্যি সত্যি আপনার কথা লেগে যায়। আমি জয় করেই

এসেছি, যেটা আমি কল্পনা করিনি।" আমাকে হুগলীতে এক গার্লস্ কলেজে নিয়ে গিয়েছিল রবীন্দ্র-জন্মবার্ষিকীতে। বাংলা আকাদেমিতে আমাকে বক্তৃতা দেবার জন্যে নিয়ে গিয়েছিল।

আহসান : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি?

শরীফ : হ্যাঁ।

আহসান : অন্নদাশঙ্কর রায় সেখানে ছিলেন?

শরীফ : হ্যাঁ।

আহসান : এই যে আন্তরিক গুণগ্রাহিতা পশ্চিমবঙ্গে আপনি লক্ষ করেছেন তার সঙ্গে আমাদের দেশের বিদ্বান-পণ্ডিত-বুদ্ধিজীবী-লেখকদের গুণগ্রাহিতার তুলনা করলে কি মনে হয় আপনার?

শরীফ : মনে হয় যে, আমার বই পড়েনি এবং আমার নাম শুনলেই তাচ্ছিল্য করে উড়ায়—তেমন লোকের সংখ্যা বেশি। একটা প্রমাণ আমি তোমাকে দিই—নাম ধরেই দিই—জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, ঐ যে লুৎফর রহমান সরকার, রেডিও টক্ দিয়ে একটা বই বের করিয়েছিলেন এদের দ্বারা—যে 'বাংলাদেশের গল্প', 'বাংলাদেশের উপন্যাস', 'বাংলাদেশের প্রবন্ধ' ইত্যাদি ইত্যাদি। তো প্রবন্ধ সাহিত্য সম্পর্কে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর দায়িত্ব পড়েছিল। তিনি করেছেন কি, তাঁর বেয়াই ফজলুল করিম সরদার এবং তার আত্মীয়া হোসনে আরা শাহেদ এই দুইজনই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকারদের অন্যতম—অন্যতমা। আর আমার কথা এক সেনটেন্সে লিখেছেন যে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখেন।

আহসান : শুধু এইটুকু?

শরীফ : হুঁ, লিখেছেন এই রকম, একটা সেনটেন্সে। আমার থেকে প্রবন্ধ বেশি কে লিখেছে এবং রিফ্লেকটিভ এসেজ্ যাকে বলে—আর কে লিখেছে? এতোগুলো বই! তো কি রকম নেগলেকটেড সেই কথাটাই বলতে চাচ্ছি। এখানে আমার বইয়ের সমালোচনা দেখেছো কখনো? কারণ আমি কাউকে বলিনা, করে না। আর এক একজনের বই বের হয়—যেখানেই খোলো সেখানেই সেটার পরিচয়। এমনকি আমাদের সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীও তাঁর ছাত্রটাত্র আছে, দশ-বারো জনকে বলে দেয়, বই বেরোলেই তারা লিখে দেয়।

আহসান : পশ্চিমবঙ্গের বিদ্বৎসমাজ সম্পর্কে আপনার কি ধারণা হয়েছে?

শরীফ : পশ্চিমবঙ্গের বিদ্বৎসম্প্রদায় সম্পর্কে আমার ধারণা হয়েছে যে, ওঁদের লেখাপড়াটা বোধ হয় আমাদের থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছরের এগিয়ে ছিলো। বর্ণ-হিন্দুদের পুরুষানুক্রমিকে একটা পরিবেশ ছিলো তো লেখা পড়ার। তো সেই কারণেই অনুশীলন ছিলো বলেই সেই পরিবেশ তারা পেয়েছিল। ফলে সেইখানকার এ্যাভারেজ শিক্ষিত মানুষের জ্ঞানের পরিধি, চেতনার পরিধি আমাদের এ্যাভারেজ লোকের থেকে অনেক বেশি। আমরা অধিকাংশ এক পুরুষে শিক্ষিত বলে বাড়িতে কোনো বই—পাঠ্যবই ছাড়া কোনো বই দেখিনি। এটা একটা কারণ আর কি। ছোটকালে অভ্যাস না হলে তো বড়ো হলে আর পড়ার অভ্যাস হয় না। এখন আমি দেখি যে বাপে পড়ে না বটে, কিন্তু

ছেলের জন্যে শিশুপাঠ্য বই কেনে। মানে ছেলে বড়ো হোক এটা চায়। কিন্তু নিজের অভ্যাস নাই বলে আর পড়তে পারে না। কলকাতার এ্যাভারেজ লোক আমাদের থেকে বেশি ইনফর্মড্, এটা আমার মনে হয়েছে এবং বহুলোক ওয়েল-রেড্, সেটা তুমি 'দেশ' পত্রিকা থেকেও বের করতে পারো। অশুদ্ধ একটু পেলে, এক শব্দ পেলে, এক নাম পেলে প্রতিবাদ বের হয়। একজনে ছোটাছুটি করে সেটা খুঁজতে থাকে এবং তিন মাস পরে হলেও বের করে চিঠি লিখে জানিয়ে দেয়। আমাদের এখানে তুমি এটা কল্পনা করতে পারবে?

আহসান : আমাদের দেশে গবেষণার কাজ কেমন হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

শরীফ : আমাদের এখানে গবেষণার কাজ এক্কেবারে খুব নিম্নমানের হচ্ছে, এটা আমায় বলতে হবে। যতগুলো ডক্টরেট ডিগ্রির বই ছাপা হচ্ছে বাংলা একাডেমী থেকে তার মধ্যে দু'চারটে ছাড়া আর সবগুলো রাবিশ মনে হয়েছে আমার। ছাপার যোগ্য বলে আমার মনে হয়নি। কোনো কোনোটা আমার কাছে দিয়েছে, আমি সে রকম রিপোর্টও দিয়েছি। এমনকি সাজানোটা পর্যন্ত ঠিক হয়নি। আমাদের এখানে যে কোনো রকম—যে কোনো কিছু লিখলেই ডিগ্রি পাওয়া যাবে।

আহসান : আমাদের এখানে এই উপাধি লাভের গবেষণার বাইরে যে গবেষণা হচ্ছে সে সম্পর্কে আপনার মত কি?

শরীফ : সেই গবেষণা তো খুব কমই হচ্ছে। আগে যে পরিমাণে হতো, শুরু হয়েছিল—তাতো হচ্ছে না। যেমন আমাদের 'সাহিত্য পত্রিকাতে প্রথমদিকে যে গবেষণা যেই লিখুক যেভাবে করেছে এখন আর তা হয় না। এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় প্রতিটি বিষয়েই প্রতিটি বিভাগ থেকেই গবেষণা পত্রিকা বের হয়। এইগুলো হচ্ছে সো কল্ড গবেষণা,—'এ্যাকসেপ্টেড ফর পাবলিকেশন'—এই হলেই তার চাকরি হয়, প্রমোশন হয়। এশিয়াটিক সোসাইটিতেও ঠিক একই জিনিস হচ্ছে। অতি তুচ্ছ জিনিস নিয়ে গবেষণাপত্র হচ্ছে, সেটা ছাপা হচ্ছে, সেটার জন্যে তার ক্রেডিট, কি মার্কস পয়েন্ট হচ্ছে। সেই পয়েন্টে এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হচ্ছে, প্রফেসর হচ্ছে ইত্যাদি।

আহসান : আপনার বিবেচনায় খুব উল্লেখযোগ্য গবেষণা কাজ, আমাদের দেশে দু-এক দশকের মধ্যে কী কিছু হয়েছে?

শরীফ : মনে হয় না। দু-একটা নিশ্চয়ই এই ফাঁকে হয়েছে, সবগুলি তো আর আমি দেখিনি। তবে এ্যাভারেজ যে মান—সে মান কোনোটা মাঝারি, আর কোনোটা মাঝারির থেকেও নিচে।

আহসান : গবেষণা কাজ এখন যাঁরা করছেন, তার মধ্যে কার কার কথা আপনি বলতে চান, যে তাঁদের কাজগুলো খুবই উল্লেখযোগ্য ও উঁচু মানের?

শরীফ : বিলেতে বসে গবেষণা কাজ করছেন—স্ট্যান্ডার্ড গবেষণা কাজ করছেন ডক্টর গোলাম মুরশিদ, একথা বলা যায়। এইখানে শুনেছি ডক্টর আনিসুজ্জামান ঐ যে প্রাচীন গদ্য সম্পর্কে গবেষণা কাজ করছেন। আশা করি, যেহেতু ইনি একজন দায়িত্বশীল বুদ্ধিমান বিদ্বান-গবেষক, তাঁর কাজটা ভালো হবে। এ রকম আরো কিছু কিছু নিশ্চয় আছে।

আহসান : এবারে পশ্চিমবঙ্গের গবেষণা কাজ সম্পর্কে কিছু বলুন।

শরীফ : উঁচু মানের গবেষণার কাজ এখন কোথাও নেই দুই বাংলার মধ্যে, তাঁর প্রমাণ গবেষণা পত্রিকা একটাতেও কোনো ভালো লেখা সহজে পাওয়া যায় না। পত্রিকা নিয়মিত চালানোই যায় না,-সে শান্তি নিকেতনের পত্রিকা হোক, সে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা হোক, অথবা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পত্রিকা হোক। এখানকার এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা, এখানকার 'সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের পত্রিকা দেখলেই বোঝা যায় অধিকাংশ লেখা একেবারে এই সামান্য তথ্য নির্ভর আর কি! কিছু তথ্যের সংযোগ থাকে, কিন্তু তথ্যই তো গবেষণা নয়, তথ্যের সংগ্রহ আর সঙ্কলন গবেষণা নয়, তথ্যেরও বিচার দরকার হয়, না হলে হয় না। তার তাৎপর্য-চেতনা, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, সমাজ-প্রতিবেশে এবং সময়ের প্রতিবেশে প্রয়োজন, জীবনকে সমাজকে এবং সময়কে জানবার জন্যে। –সেটা কোথায়? সেটা যদি না থাকে তাহলে কিছু হয় না।

বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্র কাঠামোয় পশ্চিমবাংলার বাঙালির উন্নতি নেই, অবনতি আছে

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : কেশব মুখোপাধ্যায়

কেশব : বাঙালি মুসলমান একবার পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করলো, দ্বিতীয় বার পাকিস্তানকে বিদায় দিয়ে প্রতিষ্ঠা করলো স্বাধীন বাংলাদেশ। কিন্তু স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পরও এখানে (বাংলাদেশে) স্থিতি না আসার কারণ কি?

শরীফ : প্রশ্নটা অবশ্য করার মতো, তবে উত্তরটা জটিল। জটিল এই কারণে যে, '৪৭-এ যে আন্দোলন হয়, তার নেতৃত্ব বাঙালির হাতে ছিল না। ছিল উর্দুওয়ালাদের হাতে। বর্তমানে যা বিহার-উত্তর প্রদেশ, সেই উত্তর ভারতের উর্দুভাষী মুসলমানের হাতে। ঐ সব প্রদেশের মুসলিম নেতারাই মুসলিম লিগকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতেন। কারণ তাঁরা ছিলেন ধনে-মানে শিক্ষা-দীক্ষায় সব কিছুতেই উন্নত। যদিও তাঁরা ছিলেন জনসংখ্যায় বারো শতাংশ মাত্র। তাঁরাই মনে করলেন ব্রিটিশ বিতাড়নের পর তাঁরা হিন্দুর দ্বারা পীড়িত এবং অত্যাচারিত হবেন। কাজেই উর্দুভাষী মুসলমানের জন্যেই প্রয়োজন ছিল এক হোমল্যান্ডের । এটা ছিল কবি ইকবাল এবং আবদুর রহিমের স্বপ্ন। এই স্বপ্নই পরে পাকিস্তান আন্দোলনে পরিণত হয়। আর বাঙালি মুসলমান চিরকালই ছিলেন নির্জীব। কারণ হিন্দুদের মধ্যে যাঁদের তফসিলি বলা হয়, যাঁরা ছিলেন নিম্ন বর্ণের, নিম্ন বিত্তের এবং তুচ্ছ পেশার মানুষ, তাঁরাই বাঙলায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তুর্কি-মুঘল আমলেও তাঁদের নিজস্ব কোনো কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব রাষ্ট্রে অথবা সমাজে ছিল না। তাঁরা ছিলেন দেশি বর্ণ হিন্দুর শাসনে। ফলে তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষাও ছিল না। ব্রিটিশ বিদ্বেষের ফলে (বাংলায়) মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেননি বলে যে-কথা প্রচলিত আছে, সে আরবি-ফারসিতেও অশিক্ষিত ছিল। কারণ নিম্নবর্ণের স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বৌদ্ধ-হিন্দুজ মুসলিম বংশধর বলে শিক্ষার Tradition বাঙালি মুসলমানের ছিল না। এর ফলে আমরা দেখি তুর্কি-মুঘল আমলেও দেশি কোনো বাঙালি মুসলমান শুধু বাংলায় নয়; সারা ভারতবর্ষে বড় চাকরি পায়নি। অথচ সেই সময়ে বর্ণ হিন্দুরা তাঁদের দাবিটা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। তুর্কি-মুঘল আমলেও জেলা এবং গ্রামগুলি শাসিত হতো বর্ণ হিন্দুর দ্বারা এবং তখন হিন্দুর মতোই দীক্ষিত মুসলমানদের

বিকশিত হবার কোনো সুযোগ সমাজ বা রাষ্ট্র-কাঠামোয় তখন ছিল না। ধর্মান্তরে বাঙালি মুসলমানের পেশান্তর বা আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি, এটা অধিকাংশ বাঙালি মুসলানের ক্ষেত্রে সত্য। মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা শুরু হয় সিপাহী বিদ্রোহের অবসান এবং ওয়াহাবি আন্দোলনের পর ১৮৭০ থেকে। তখন হিন্দুরা ইংরেজের করুণা এবং কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়। সেই সময় থেকে ইংরেজরা মুসলমানের তোয়াজ শুরু করে। এবং স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে কর্তৃত্বে মুসলমানরা সংহত হয়ে ইংরেজের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করায় ব্রিটিশ সমর্থন পেতে শুরু করে। তখন বহু শিক্ষিত হিন্দুর, যারা কোম্পানী-রাজত্বে, কোম্পানীর কর্মচারীদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতো– ইংরেজের গোমস্তা কিংবা তাদের দেওয়ান হিসেবে, তাদের চাকরি চলে যায়। কারণ ভিক্টোরিয়ার আমলে কোম্পানীর কর্মচারীদের আর ব্যবসা করার অধিকার রইলনা। শুধু চাকুরে হয়ে গেল। এর ফলে শিক্ষিত হিন্দুরা গাঁয়েগঞ্জে গিয়ে স্কুল দেওয়া শুরু করলো। এটা আপনি খুব সহজেই ধরতে পারবেন, ১৮৯০ এর পর যাদের জন্ম হয়েছে, তারাই শুধু ইংরেজি শিক্ষিত হয়েছে মুসলমানদের মধ্যে। সেই সূত্রে আপনি যাদের নাম জানেন, যেমন, ইব্রাহিম খাঁ, বরকতুল্লাহ, এদের সবার জন্ম ১৮৯০-এর পর। দু'একজন তার আগে। তবে ১৮৮০ সালের আগে কোথাও বাঙালি মুসলমান ইংরেজি শিক্ষিত হয়নি।

কেশব : মীর মশাররফ হোসেন তো...

শরীফ : না না, বাঙালি নন। মীর মশাররফ হোসেনও ছিলেন উর্দুওয়ালা। আর তিনি বেশি শিক্ষিতও ছিলেন না, স্বল্প শিক্ষিত। ওয়ার্থ নেম যত আছে সব উর্দুওয়ালা। আমাদের সুফিয়া কামাল, বেগম রোকেয়া, বদরুদ্দিন উমর সবাই উর্দুভাষী। উমরের grand father থেকে বাংলা শিখেছেন, বাংলায় পলিটিক্স করা জন্য। তাঁরা ছিলেন বর্ধমান, কালনার জমিদার। মোমিন সাহেব তো বাংলা বলতেই পারতেন না। মীর মশাররফ হোসেনের নিজের লেখায় আছে, 'আমার পিতৃদেব বাংলা হরফ চিনতেন না।' উনি দিল দুয়ারের গোমস্তা ছিলেন। দিল দুয়ার পরিবার ছিল তাঁদের আত্মীয়। অখণ্ড বাঙলায় এক সময় গজ-চক্র মন্ত্রিত্ব ছিল। আবদুল হালিম গজনবী এবং আবদুল করিম গজনবী ছিলেন টাঙ্গাইলের দিল দুয়ারের জমিদার। এঁরা দুজনেই ছিলেন রোকেয়ার বড় বোনের ছেলে। এঁরাও ছিলেন উর্দুওয়ালা। বগুড়ার মুহম্মদ আলি, পন্নিরা এবং ঢাকার নবাবরা... সবাই ছিলেন উর্দুভাষী। কোনো বাঙালি মুসলমান জমিদার আপনি পাবেন না এবং ১৮৮৪ সালের আগে কোনো বাঙালি মুসলমান graduate হয় নাই। বাড়ির কাছে স্কুল পেয়ে মুসলমান কৃষকরা ছেলেদের স্কুলে পাঠালো। কাজেই ১৮৯০ থেকে বাঙালি মুসলমান শিক্ষার সুযোগ পেল। এবং ১৯১৫ থেকে ১৯২২/২৫ এর মধ্যে বেশ কিছু বাঙালি মুসলমান ডেপুটি মুন্সেফ হয়। তার আগে নবাব আবদুল লতিফ, জাস্টিস আমীর আলি, আমীর হোসেন এবং শেষ পর্যন্ত যাঁকে দেখলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী– সবাই ছিলেন উর্দুভাষী। বিভাষী-বিজাতি উর্দুওয়ালারাই বাঙালি মুসলমানকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাঙালি মুসলমানও অশিক্ষা, অজ্ঞতা এবং হিন্দু প্রতি ক্ষোভের কারণে উর্দুওয়ালাদের এই নেতৃত্ব গ্রহণ করছিল। বাঙালি মুসলমান মুসলিম লিগের সদস্য হয়ে উর্দুওয়ালাদের নির্দেশ এবং আদেশ পালন করেছেন মাত্র। এর পেছনে কারণ ছিল, বাঙালি মুসলমান কৃষকসন্তান মেট্রিক পাশ করে, কিংবা ফেল করে কেরানি, পিওন,

চাপরাশির চাকরি চায়, হিন্দু বাবুরা দেয় না। এই হিন্দু বাবুরাই বসে আছে সব অফিসে। বাঙালি মুসলমান ঘরের বার হলেই দ্যাখে দোকানি হিন্দু, উকিল হিন্দু, কেরানি হিন্দু, মাস্টার হিন্দু, জমিদার হিন্দু, ডাক্তার হিন্দু। হিন্দু লুট করছে সব কিছু। তাদের ধারণা হল সে নবাবের বংশধর, মুঘলের জ্ঞাতি। এবং হিন্দুরা তাদের সব কিছু কেড়ে নেওয়াতেই তারা আজ নিঃস্ব। তাদের অতীত এরকম ছিল না। ব্রিটিশই এই প্রপাগাণ্ডা চালিয়েছিল।

১৮৭৩ সনে W.W. Hunter লেখেন Indian Musalman বইটা। কথাটি বড় ভয়ংকর। হান্টার বলছেন, Hundred and fifty years ago it was impossible for a Musalman to be poor. এঁরা কোন মুসলমান? মতলববাজ বলেই স্পষ্ট করে সেকথা বললেন না। এঁরা বাঙালি মুসলমান নয়, মধ্য এশীয় তুর্কী মুঘল প্রশাসক গোষ্ঠী। কিন্তু এই প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে বাঙালি মুসলমানরাও মনে করেছেন, তাঁরা খুব ধনীটনি ছিলেন। হিন্দুরা তাদের সব কেড়ে নিয়েছেন। এবং এই ধারণার বশে ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক (Dr. A.R. Mullick) মুসলিম education সম্পর্কে যে থিসিস লিখলেন, সেখানে তিনিও বিষয়টি distinguish করলেন না। সেই কারণে হিন্দু কৈবর্ত থেকে দীক্ষিত মুসলমান এবং শাসক মুসলমানের মধ্যে তিনি কোনো পার্থক্য করেন নাই। তাঁর (Dr. A.R. Mullick) দৃষ্টিতে সব একাকার। ব্রিটিশ বলছে মুসলমানরা স্কুলে যাচ্ছে না কেন—না ওরা তো উর্দুওয়ালা, তাই ফার্সি এবং উর্দুতে না হলে ওরা বাংলা মাধ্যমে প্রাইমারি স্কুলে যাবে না। ব্রিটিশ আমলে হিন্দুর নেতৃত্ব দিয়েছে বাংলাভাষী হিন্দু। রামমোহন প্রভৃতিরা। কমিটি করে কাজ করেছেন। আর বাঙালি মুসলমানের নেতৃত্ব দিয়েছেন মুঘল মুসলমানেরা। যাদের সঙ্গে দেশি আর বাঙালি মুসলমানের কোনো সামাজিক, বৈবাহিক, ভাষিক, সাংস্কৃতিক কোনো দিক থেকেই কোনও সম্পর্ক নেই বা ছিল না। কিন্তু সেই অবাঙালি উর্দুভাষী মুসলমানরাই প্রতিনিধিত্ব করেছেন বাংলার মুসলমানের। They represented Muslims of Bengal। এই কারণেই ইংরেজ আমলে সব কমিটিগুলোতে মুসলিম সদস্য থাকলেও মুসলিমরা উপকৃত হয়নি। নারী শিক্ষা কমিটি থেকে সব কমিটিতেই মুসলমান ছিল। কিন্তু তারা বাঙালি ও বাংলার মুসলমানদের সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তাদের অজ্ঞতা ছিল পর্বত প্রমাণ, তার সঙ্গে ছিল বাঙালি মুসলমানের প্রতি তাদের অবজ্ঞা। তাই যা হবার তাই হয়েছে।

মুর্শিদাবাদের দেওয়ান খোন্দকার ফজলে রাব্বি, একটি বই লিখেছিলেন বাংলাদেশের (অখণ্ড বাংলার) মুসলমানের ইতিহাস বিষয়ে। সেই বইতে তিনি বলতে চাইলেন, সামান্য কিছু ছোটলোক দীক্ষিত বাঙালি মুসলমান বাদ দিয়ে, মুসলমান মাত্রই খানদানি, তারা দীক্ষিত নয়। এই একই কথা আমরা শুনেছি নবাব আবদুল লতিফের মুখে। তিনিও বললেন, বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা হচ্ছে উর্দু, তবে ছোটলোক যেগুলি আছে, তাদের ভাষা বাংলা। এদেরও আস্তে আস্তে উর্দুতে কনভার্ট করতে হবে। কাজেই বাঙালি মুসলমান মাত্রই উর্দুওয়ালাদের কাছে 'ছোটলোক' এবং 'ইতর' মুসলমান। এটা Recorded fact। একথার সত্যতা এখনো আপনি পশ্চিম বাংলা এবং কোলকাতায় পাবেন। সেখানে (পশ্চিমবাংলা এবং কোলকাতায়) উর্দুভাষী মুসলমান বাঙালি

মুসলমানকে জ্ঞাতি বা ভাই বলে মনে করে না। ঘৃণাই করে। এ কথাগুলো বুঝতে পারলে বাঙালি মুসলমানের উপর কিভাবে উর্দুওয়ালা মুসলমানের নিয়ন্ত্রণ এবং নেতৃত্ব চেপে বসেছিল তা স্পষ্ট হয়ে যায়। কাজেই পাকিস্তান আন্দোলনের সময়ে অবাঙালি মুসলমান নেতারাই বাঙালি মুসলমান জনসাধারণকে চালিত করেছে। আমাদের অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে, আমাদের দরিদ্রতার সুযোগ নিয়ে, আমাদের মূর্খতার সুযোগ নিয়ে। Jinnah represents Muslims of India' ঘোষণা দিয়ে ব্রিটিশ সরকার চালাকি করে জিন্নাহকে মুসলিম ভারতের প্রতিনিধি বানিয়ে দিলেন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতেই। কিন্তু সত্য হল, এখন যা পাকিস্তান সেখানে মুসলিম লিগের কোনো Hold ছিল না। তখন মুসলিম লিগের Hold ছিল উত্তর ভারতে, আর বাংলায়। বাংলায় মুসলিম লিগের Hold এর পিছেনে কারণ ছিল, হিন্দুর থেকে অর্থেবিত্তে বঞ্চিত মুসলিমদের চাকরি নেবার জন্য। এটা মনে রাখা দরকার। এর আগে মুসলমানরা যতগুলো আন্দোলন করেছে তা শুধু চাকরির জন্যই করেছে। ১৯০৬ সালের অক্টোবরে সিমলাতে লর্ড মিন্টোর কাছে মুসলিম প্রতিনিধিরা চাকরির কোটার জন্য দরবার করতে গেলে, মিন্টো তাদের পরমার্শ দেন, 'তোমরা কংগ্রেসের মতো একটা সংগঠন তৈরি করো, আমরা সমর্থন করবো। এবং সংগঠন মারফৎ দাবি পেশ করো, আমরা গ্রহণ করবো।' এটা মিন্টোর স্ত্রীর সূত্রে অন্য Document-এ পাওয়া গেল। মিন্টোর স্ত্রী তার বোনের কাছে চিঠি লিখলেন, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের স্থায়িত্ব দীর্ঘতর করে দিলাম আমরা। এর দু'মাসের মধ্যেই ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে, ঢাকার নবাবের উদ্যোগে মুসলিম লিগের জন্ম হল ঢাকায়। এসব ইতিহাস স্মরণে রাখলে বোঝা যায়, যে-ম্যাচুরিটি এবং আত্মোপলব্ধি দরকার ছিল, বাঙালি মুসলমানের তা ছিল না। আর্থিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক এবং ঐতিহাসিক কারণেই তা তখন পাওয়া সম্ভব ছিল না। পার্টিশন '৪৭-এ না হয়ে ৩৭-এ হলে বাঙালি মুসলমান কেরানি পাওয়া যেত না ঢাকা শহরে। কোলকাতা ইউনিভার্সিটির ক্যালেন্ডার দেখলে একথা বোঝা যাবে। আত্মোপলব্ধি বা আত্মসম্বিত তাদের ছিল না বলেই ৪৭-এ বাঙালি মুসলমান হুজুগে মেতেছে। দেখা গেল পাকিস্তান দিয়ে দেবার জন্য ইংরেজরা মোটামুটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এবং বোম্বে কনফারেন্স-এ রাজাগোপাল আচারীয়াও স্বীকার করে নিলেন যে, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ছাড়া মুসলমানদের আর বশে রাখা যাবে না। সাতান্ন বছর বয়সী জহরলাল নেহেরুও প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসার জন্য আর অপেক্ষা করতে রাজি নন। কমিউনিস্টরাও দ্বিজাতি তত্ত্বকে সমর্থন করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে যখন separate state হচ্ছে তখন মুসলমানদের দিল্লি কনফারেন্সে (১৯৪৬) লাহোর প্রস্তাবের Statesকে জিন্নাহ State করে দিয়ে দিলেন। এর প্রতিবাদে চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী দাঁড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু কোনো সমর্থন না পেয়ে জিন্নাহর সামনে বিষয়টি উপস্থিত করতে পারেননি। সোহরাওয়ার্দী একটি Stateকেই সমর্থন জানিয়ে ছিলেন। আর ফজলুল হক তো তখন expelled। যখন দেশ ভাগ চূড়ান্ত হবার মুখে, তখন মুসলিমরা came to their senses। পাঞ্জাবের ফিরোজ খান নুন প্রস্তাব দিলেন, আমরা পাঞ্জাবকে এক রাখতে চাই। বাংলার হিন্দু-মুসলমান মিলে যদি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র করে তাতে জিন্নাহর আপত্তি ছিল না। কিন্তু এতে গান্ধী রাজি হলেন না। শরৎ চন্দ্র বসুর সঙ্গে গান্ধীর চিঠিপত্রে এ তথ্য পাওয়া যায়।

[বাঙালি মুসলিমদের সমর্থনের জোরেই ব্রিটিশরাজ কংগ্রেসকে ঠেকানোর লক্ষ্যে মুসলিম লীগকেই ভারতীয় মুসলিমের রাজনীতিক প্রতিনিধিত্বের অধিকারী বলে স্বীকার করে নিল। পাকিস্তান এল এভাবেই যদিও পশ্চিম ভারতে (পাকিস্তানে) মুসলিম লীগ প্রবল ছিল না কোথাও।

এ শতকে আমাদের জীবনধারার রূপরেখা : আহমদ শরীফ]

কেশব : গান্ধীর আপত্তির কারণ কি ছিল?

শরীফ : কারণ ছিল মুসলমানরা বাঙলায় মেজরিটি। প্রথমে শর্ত দিলেন স্বরাষ্ট্র এবং অর্থ হিন্দুর হাতে থাকবে। এসব মানা হয়েছিলো। পরে বলা হয় এদের (মুসলমানদের) বিশ্বাস নেই। এই যে আসাম ভারতের সঙ্গে থাকলো, তা তো বড়দলৈকে দুষ্ট বুদ্ধি দেবার কারণেই। এই বুদ্ধিটা গান্ধীও পেলেন ফজলুল হকের কাছ থেকে। ন্যাশনালিস্ট মুসলমানদের নিয়ে ফজলুল হক লখনউতে একটি কনফারেন্স করলেন। এবং সেই কনফারেন্স থেকে কথাটা প্রচার করে দিলেন সারা ভারতবর্ষে। তিনি (ফজলুল হক) বললেন, এরা (মুসলিম লিগ) বাংলা এবং পাঞ্জাব নিয়ে পাকিস্তান করতে চায়। কিন্তু পশ্চিম বাঙলায় এবং পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমান মেজরিটি নয়। কাজেই সেখানে হবে কেন? This was a very catchy thought। দেশে ভাগের কারণে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত গোটা বাংলায় মুসলমানদের যে শাসন ছিল, তা হারালো বাংলার মুসলমানেরা। হত্যাকাণ্ড যেটা শুরু হয়েছিল সেটা পাঞ্জাবেই শুরু হয়েছিল। তারা পলিটিক্স করে না, কিন্তু হত্যাকাণ্ডটা সেখানেই হল। অন্যদিকে বাঙালিরা পলিটিক্স করে, কিন্তু হত্যাকাণ্ড ১৯৫০ সালের আগে করেনি। এগুলো খুব মূল্যবান তথ্য। শিক্ষা-দীক্ষা, রাজনৈতিক চেতনা বাঙালি মুসলমানের ছিল না। কাজেই একবার মাউন্ট-ব্যাটেনরা চাপিয়ে দিলেন, অন্যবার ইন্দিরা গান্ধী। ইন্দিরা গান্ধীর প্রয়োজন ছিলো পাকিস্তান ভাঙার, তাই এগিয়ে এলেন তিনি। পাশে দাঁড়ালো সোভিয়েত ইউনিয়ন। আর বাঙালির ক্ষোভ ছিল, পশ্চিমারা (পশ্চিম পাকিস্তান) তাদের শোষণ করে। এই হল মূল ব্যাপার। এরা পুরো স্বাধীনতা চেয়েছিল কিনা বলা যাবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল বাঙালি পুরো স্বাধীনতা চাইল, এবং পেল। পাইয়ে দিল। দুই দুইবার বাঙালি মুসলমান প্রায় বিনা প্রয়াসে স্বাধীনতা পেল।

কেশব : বিনা প্রয়াসে বলছেন কেন? তিরিশ লক্ষ মানুষের রক্ত .....

শরীফ : মিছা কথা, তিরিশ লক্ষ তো নয়, আড়াই লক্ষও নয়। Three hundred thousand. এটা মোহাইমানের বইতে আছে। যারা মারা গেছে তাদের সবাই কিন্তু বাঙালি নয়। নির্মল সেনের মুখে শুনেছিলাম আড়াই লাখের মতো মানুষ মারা গেছে। তার মধ্যে এক লাখ বাঙালি, দেড় লাখ বিহারি এবং পাকিস্তানী। এই সত্যকে চেপে যাওয়া হয়েছে রাজনৈতিক সুবিধা পাবার জন্য।

কেশব : যে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন–

শরীফ : (উত্তেজিত ভাবে) না না তিনি পাকিস্তান প্রস্তাব তোলেন নাই। তিনি ঐ প্রস্তাব পাঠ করেছিলেন মাত্র। এর বেশী কিছু মাত্র নয়। তিনি (ফজলুল হক) জানতেন না যে ঐ প্রস্তাবে কি আছে। যে কারণে তিনি 'শেরে বাংলা' হয়েছিলেন। শেরে বাংলা

উপাধিটা তাকে দেওয়া হয়েছিল লখনউ কনফারেন্সে।

কেশব : ফজলুল হকের সঙ্গে জিন্নাহর বিরোধ বা দ্বন্দ্বের কারণ কি ছিল?

শরীফ : যুদ্ধের সময়ে জিন্নাহ বলেছিলেন গভর্নমেন্টের সঙ্গে কো-অপারেট করা যাবে না। কংগ্রেসও সরকারের সঙ্গে কো-অপারেট করছে না। কংগ্রেসের নেতারা জেলে ছিলেন, আগা খাঁ প্যালেসে। সেই সময়ে governer general-এর Defence council-এর মেম্বার হবার জন্য ফজলুল হক গোপনে তদ্বির করছিলেন। জিন্নাহ যখন জানলেন যে, ফজলুল হক তাঁর কথা অমান্য করে Defence council-এর সদস্য হতে যাচ্ছেন, তখন তিনি ফজলুল হককে expell করলেন। জিন্নাহ expell করাতে ইংরেজরাও তাকে নিল না। কারণ He does not represent the majority Muslim of india.

কেশব : যে প্রশ্ন দিয়ে শুরু করেছিলাম, সেই প্রশ্নটাই আবার রাখছি—বাঙালি মুসলমান নিজেদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পাবার পঁচিশ বছর পর আজও কেন এখানে (বাংলাদেশে) স্থিতি এলো না?

শরীফ : এখনো তো স্থিত হয়নি। এরা (বাঙালি মুসলমান) ছিলেন গরীব ঘরের সন্তান। নাইন্টিথ সেঞ্চুরিতে আপনি দেখবেন শিক্ষা-দীক্ষায়, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে কলকাতায় কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব দিয়েছেন পশ্চিম বাংলার হিন্দুরা। কারণ, গ্রাম থেকে হাঁটা পথে তারা কোলকাতায় চলে যেতেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশব সেন, বিবেকানন্দ প্রভৃতি। ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ ভাগে পাচ্ছেন জগদীশচন্দ্র বসুদের। যারা এপার (পুর্ব বাংলা) থেকে গেছেন। যাক, যে-কথা বলছিলাম, বাঙালি মুসলমানের ছিল পাটখড়ির বেড়ার ঘর, নলখাগরার ঘর, বাঁশের বেড়ার ঘর, যেখানে মাটির ঘর হয় সেখানে মাটির। ক্বচিৎ কারো টিনের। building কারো ছিল না। শহরেও নিতান্ত লিমিটেড। এই গরীব অশিক্ষিত, অসহায় বাঙালি মুসলমান হিন্দুর প্রজা। জমিদার মাত্রই হিন্দু—

কেশব : মুসলমান জমিদারও তো ছিলেন—

শরীফ : খুব কম। ঢাকায় নবাবই ছিলেন সব চেয়ে বড় জমিদার। ঢাকার নবাবের কাছাকাছি জমিদার ছিল বিক্রমপুরের কুণ্ডুরা। এছাড়া অন্য মুসলমান জমিদাররা ছিলেন হিন্দুর তুলনায় খুবই ছোট। আগেই বলেছি, তারাও ছিলেন সব উর্দুওয়ালা। তাই মুসলমান জমিদার ছিল, এটা বলা নিরর্থক। উকিল হিন্দু, মামলা করে মুসলমান, জমিদার হিন্দু, প্রজা মুসলমান। সেই মুসলমান শহরে এল, পাকিস্তান হল, হিন্দুরা চলে গেল, খালি বাড়িগুলো পাওয়া গেল। হিন্দুরা অপসন না দিলে তো মুশকিল হয়ে যেত। ধীরেন দত্ত তো অপসন না দেবার জন্য চেষ্টাও করেছিলেন। অনেকের কাছে গোপনে চিঠিও দিয়েছিলেন, যাতে এদিকের (পূর্ববাংলার) লোকেরা এদিকেই থেকে যায়। তা হলে হিন্দুরা অন্তত security fell করতো। বর্ণ হিন্দুরা সব চলে গলে, তফশিলি হিন্দুরা অসহায় ভাবে এখানে রয়ে গেলেন। ওপারে তাঁদের কোনও জ্ঞাতি গোষ্ঠীও ছিল না। তাঁরা শিক্ষিতও ছিলেন না। ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চল ছিল Scheduled cast-বহুল অঞ্চল। মুসলমান সেখানে প্রবেশ করতে পারতো না। পাকিস্তান হবার পর,

পাকিস্তান সরকার তাদের বৃত্তি দিয়ে পড়ানো শুরু করল। দেশ ভাগের পর হিন্দুরা চলে যাবার কারণে যে জগন্নাথ হল খালি হয়ে গিয়েছিল, তা আবার ভরে উঠল। এই তফসিলিরাই এখান থেকে পাস করে কোলকাতায় গিয়ে পলিটিক্স করে। কোলকাতায় Scheduled cast যারা পলিটিকস্ করে তারা সব পূর্ববঙ্গের লোক এবং ঢাকা ইউনির্ভাসিটির পাশ।

এসব হচ্ছে বাস্তব কথা। এরা (বাঙালি মুসলমান) আস্তে আস্তে শিক্ষিত হচ্ছে আর ঢাকা শহরে আসছে। দেশে তার কিছুই ছিল না। বিয়ে করে উচ্চতর পরিবারে সম্বন্ধ করা দরকা, ঘুষ নিয়ে বাড়ি করা দরকার, গাড়ি করা দরকার। এই যে ঢাকা শহরটা গড়ে উঠেছে--নারায়ণগঞ্জ থেকে এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে উত্তরা পর্যন্ত। বাংলাদেশের আটাশখানা জেলায় আটাশখানা building ছিল না মুসলমানের। কোলকাতা শহর দিয়ে কল্পনা করুন। এখন দ্যাখেন তো ঢাকা শহরের মতো কোলকাতা লাগে? ঢাকার মতো এমন পরিচ্ছন্ন রাস্তা কোলকাতায় এখন পাবেন? আগেকার দিনে পার্ক সার্কাস থেকে পার্কস্ট্রীট কী চমৎকার ছিল। এখন কী নোংরা, ফুটপাথ দিয়ে হাঁটা যায় না। আমি নিজে দু'তিন বার হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছি। কল্পনা করতে পারিনি এই সব রাস্তা কী চমৎকার ছিল। Late 18th Century and early 19th century-তে হিন্দুর কথা ভাবুন। সবগুলো বাপ খ্যাদানো, মায়ে তাড়ানো বদমাইশ। কোলকাতা শহরে এসে টাকা পয়সা করেছে। দ্বারকানাথের কথা স্মরণ করুন। দ্বারকানাথ হচ্ছেন embodiment of corruption। আর তাঁর সন্তান মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সততার প্রতিমূর্তি। সে রকম রাজ নারায়ণ বসু কেশব সেনরা কাদের সন্তান? এঁদের বাবারা ইংরেজ কোম্পানীর সাথে নানা রকম corruption এ যুক্ত থেকে টাকা পয়সা করে তাঁদের সন্তানদের হিন্দু কলেজে পড়িয়েছেন। তাঁদের সন্তানরা জ্ঞানী-গুণী হয়েছেন। সব পেয়ে গেছে। কাজেই সে তো আর তার বাবার মতো ইতরামি করবে না। করাচির একটা উদাহরণ দিই। মমতাজ দৌলতানা, সে তার বাবার জমিদারি পেয়েছে, শ্বশুরের জমিদারি পেয়েছে, নানার জমিদারি পেয়েছে। তাকে আপনি দশ হাজার, বিশ হাজার, তিরিশ হাজার, চল্লিশ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে বশ করতে পারবেন? ভুট্টোর বহু দোষ ছিল। কিন্তু তাকে দশ-বিশ হাজার টাকা ঘুষ দিতে পারতেন? আমাদের সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে অন্য অনেক অভিযোগ থাকলেও নেপুটিজমের কোনও অভিযোগ নেই। কারণ সে জমিদার পরিবারের সন্তান, মেদিনীপুরে তাদের জমিদারি ছিল। কিন্তু ফজলুল হকের বিরুদ্ধে ঐ অভিযোগ আছে। তিনি ছিলেন সাধারণ গেরস্ত বাড়ির লোক। তাঁর বাবা সাধারণ উকিল ছিলেন, এ্যাডভোকেট নয়, এবং খুব ভালো প্র্যাকটিশও ছিল না। আমি মন্ত্রী হয়েছি, আমার অশিক্ষিত বোনের ছেলে, যে থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করেছে, তাকে চাকরি না দিয়ে পারি? এটা আমার ঘরোয়া অবলিগেশন নয়? কাজেই দুর্নীতি থেকে আমি কি করে মুক্তি পাই? এই যে আমাদের দেশে সার নিয়ে কেলেঙ্কারিতে তেইশজন মানুষ মারা গেলেন, এটা কেন হল? এই কারণেই গান্ধীর আহ্বানে বিয়ে না-করা, খদ্দর-পরা লাখ দুয়েক মানুষ পাওয়া গিয়েছিল। এঁরা ছিলেন জমিদার পরিবারে ছেলে, ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে, ডেপুটি মুনশেফ পরিবারের ছেলে। এসব পরিবারের একজন রোজগার করলেই যথেষ্ট। অন্যরা বেকার হয়ে দেশ সেবায় নামতে পারেন।

আমাদের এখানেও এখন এরকম কিছু কিছু হচ্ছে। আমার সন্তান আমার সঙ্গে গ্রো করেছে, সেও করাপটেড হয়ে গেছে। কিন্তু আমার grand son, যার ফ্যান আছে, ফোন আছে, গাড়ি আছে, বাড়ি আছে, তার সন্তান আমার মতো ইতর হবে না। কাজেই আমাদের যে ক্যায়োটিক কন্ডিশন তার জন্য আমাদের পরিবেশটাই দায়ী। আমরা কোন পরিবার থেকে এসেছি? এক কথায় বলতে গেলে আমরা ভূইফোঁড়, তার যথগুলো দোষ, তার সবগুলো এখনো আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি, ৪৮/৪৯ বছরে। আমরা এলিম্যান্ট হিসেবে যে খারাপ তা নয়। আমাদের (শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের) অতীত ছিল না, বর্তমান ক্যায়োটিক, কারণ গ্রোয়িং। একটা সিঁড়ির সঙ্গে তুলনা করুন। ভীড়ের চাপ, সবাই ঠেলাঠেলি করে উঠছে, কেউ কেউ পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এরপর আমাদের মধ্যে স্থিতধীলোক হবে, উদার মানুষ হবে, জনসেবক মানুষ হবে, তখন অন্যায়কে ঘৃণা করবে। আমাদের রাজনীতিতে জ্যোতি বসু পাওয়া যাবে। জওহর লাল পাওয়া যাবে।

খুব বড় ব্যবসায়ীদের মধ্যে এক ধরনের করাপশন আছে, সব জায়গাতেই আছে। ডালমিয়া, হিন্দুজা, গোয়েঙ্কা সবাই যা করে থাকে। এটা অন্য জিনিষ। কিন্তু মাঝারি মানুষের মধ্যে যে ধনী মানুষ থাকে, সেই মানুষের মধ্যে করাপশন কম। এঁদের রুচি আছে, standard আছে। যেটা আমরা ইনহেরিট করি। we could not afford to be honest. We could not afford to spare any opportunity. কাজেই আর ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে নতুন যে জেনারেশন আসছে তাদের মধ্যেই রয়েছে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।

কেশব : আপনার এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে চাইছি পশ্চিমবাংলা এবং বাংলাদেশের বাঙালির ভবিষ্যৎ এবং সম্ভাবনা বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা–

শরীফ : এখন যে অবস্থা রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের বাঙালির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, পশ্চিমবাংলার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়। কারণ পশ্চিমবাংলা ভারতের একটা অংশ। ইতিহাস ভিত্তিক আলোচনা করলে বিষয়টি সহজ হয়। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে জয়ী হয়ে ১৭৬৫ সালে ব্রিটিশ গোটা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে। সেদিন থেকেই ব্রিটিশ বাংল-বিহার-উড়িষ্যার মালিক হয়ে যায়। ১৮১৮-এ তো ইংরেজ পুরো ভারত নিয়েই নিল। এর আগের কয়েক বছরও ইংরেজই প্রকৃত মালিক হল দিল্লির সম্রাটের কাছে থেকে দেওয়ানি পেয়ে। কারণ রাজস্বই হল আসল কথা। তখন থেকে বাঙালি হিন্দুর সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে ইংরেজ ব্যবসা-বাণিজ্য সব কিছু করেছে। অফিস আদালত চালিয়েছে। বর্ণ হিন্দুকে নিয়ে শেয়ারে কাজ করেছে। ফলে বর্ণ হিন্দু থেকে খুব বড় বড় ব্যবসায়ী হল। যেমন, মল্লিকেরা। এদিকে শুধুমাত্র ইংরেজদের পরিপূর্ণ ভাবে ব্যবসায়ের সুযোগ দেয়ার জন্য লর্ড কর্নওয়ালিশ বুদ্ধি করে একটা কাণ্ড করলেন। তিনি যাদের টাকা হয়েছে সেই হিন্দু ব্যবসায়ীদের এনকারেজ করলেন, দ্যাখো বাপু ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা হয় বটে, কিন্তু সম্মান নেই, তোমাদের রাজা হতে হবে, জমিদার হও। ফলে কর্ণওয়ালিশের এনকারেজম্যান্ট পেয়ে তারা সব জমিদার হয়ে গেল। অবাঙালিরা একসেস পেয়ে কোলকাতায় এল। বাঙালির তো ব্যবসায়, মিলিটারিতে কোনও Tradition তৈরি হয়নি। বাংলা হচ্ছে চিরকাল বিভাষী, বিধর্মী, বিজাতি শাসিত। কাজেই বাঙালি পিছুহটা ছাড়া আর কিছু পারলো না। দেখুন ইংরেজ

আমলে বিহারি কুলি, বাঙালি কেরানি, ব্যবসা হচ্ছে ইংরেজের আর মাড়ওয়ারির। কাজেই ব্যবসা করছে ইংরেজ আর মাড়ওয়ারি, বাঙালি হচ্ছে তাদের কেরানি। তাতেই সে খুব খুশী—পাঞ্জাবী পরছে, পান চিবুচ্ছে, হাতে ঘড়ি দিচ্ছে—ঘুষ পাচ্ছে কিনা, এবং নিজেকে ভারি বাবু ভাবছে!

অন্যদিকে জমিদাররা প্রজা শোষণ করে কোলকাতা শহরে পায়রা উড়িয়ে, বাইজি নাচিয়ে টাকা ওড়াচ্ছে। এই ভাবেই ব্যবসা-বাণিজ্য বাঙালি হিন্দুর হাতের বাইরে চলে গেল। এবং রাজপুতনার ও মাড়োয়ারের জৈনরা সব দখল করে নিল। এখনও ঐ দখলের মধ্যেই আছে পশ্চিমবাংলার বাঙালি। এখন যদি পশ্চিমবাংলার বাঙালি ব্যবসা করতে যায়, সে প্রতিযোগিতায় পারবে না। প্রথম কথা তার পুঁজি নেই। ব্যবসা করার ধৈর্য নেই, ব্যবসার বুদ্ধি নেই। এবং রাষ্ট্রের সহযোগিতা নেই। আর ব্যবসা করার মানসিকতাও বাঙালির নেই। শোনেন না, 'মাড়ওয়ারির গাড়ী, বাঙালির বাড়ি।' মাড়ওয়ারি বাড়ি করে না, গাড়ী করে সময় বাঁচাবার জন্য। এই তো বাস্তব অবস্থা, ভারতীয় সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে এই অবস্থাটাকে আপনি পাল্টাবেন কি ভাবে? যাদের আপনি শোষক হিসেবে দেখছেন, ইউনাইটেটড ইন্ডিয়ায় আপনি তাদের তাড়াতে পারবেন না, মাড়ওয়ারির ব্যবসায় হাত দিতে পারবেন না। 'জাতীয় অখণ্ডতা' এবং ভারতীয় সংবিধান তার রক্ষাকবচ। To get ride of the Marwaries—যাদের exploiters হিসেবে দেখছেন, কোন উপায় নেই। কেরানিগিরি ছাড়া আপনি আর কোথাও excess পাচ্ছেন না। ভারত বর্ষের মধ্যে অবস্থান করে এদের বিতাড়ন করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। এর ওপর পশ্চিম বাংলা আঠারো আনা over populated। কাজেই দিল্লি নিয়ন্ত্রিত বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় পশ্চিম বাংলার বাঙালির উন্নতি নাই, অবনতি আছে।

এর মধ্যে বর্ণ হিন্দুদের আর একটা বিপদ আছে। অবর্ণহিন্দুরা তিন হাজার বছর ধরে অবহেলিত নির্যাতিত। মনু যাজ্ঞবল্ক বা রামায়ণ দেখুন। রামচন্দ্র হলেন, আদর্শ রাজা, তিনিও ছোটলোক, শম্বুক হত্যা করে 'আদর্শ' হয়েছেন। সেই থেক আজ পর্যন্ত তারা কোনও প্রিভিলেজ পায়নি। আজ তারা বিদ্রোহী। কিন্তু যেহেতু তারা আস্তিক, সেই কারণে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বটাকে তারা অস্বীকার করতে পারছে না। আস্তিক মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। কিন্তু বৈষয়িক বিষয়ে সে তার অধিকার চাইছে। হিন্দুধর্মকে সে চ্যালেঞ্জ করছে না, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বকে সে চ্যালেঞ্জ করছে না। কারণ ওটা কেতাবে আছে। সে ভাগ চাইছে, অধিকার চাইছে সম্পদের, এবং সে জন্যই তার আন্দোলন।।

কেশব : ভারতবর্ষের অন্যত্র দলিত আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবাংলায় ঐ আন্দোলনের ভবিষ্যত বিষয়ে—

শরীফ : বিহারে, উতর প্রদেশে দলিতরা রাজত্ব পর্যন্ত করে ফেললো। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় তা হবে না। এর পিছনে ঐতিহাসিক কারণ আছে, সেটা বুঝতে হবে। অখণ্ড বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম খুব প্রসার লাভ করেছিল। বল্লাল সেন যখন বৌদ্ধ ধর্মের বিলুপ্তি অন্তে সমাজে বর্ণ বিন্যাস চালু করলেন, তার মধ্যেও ফাঁকি ছিল। যেমন আপনাকে ধরে বলা যায়, মুখোপাধ্যায় : মুখ্য উপধ্যায় মানে ওঝা, মানে শিক্ষক। ভারতবর্ষের আর কোথায় ব্রাহ্মণের এই উপাধি আপনি পাবেন না। দিক্ষিত মুসলমানেরা শিক্ষিত হয়ে

হিন্দুদের থেকে অনুকরণ করে খোন্দকার হয়েছে। খোন্দকার, আখন্দ, আকুঞ্চি এই তিনটি শিক্ষক বাচক শব্দ। ভারতের অন্যত্র অস্পৃশ্যদের প্রতি যে ঘৃণা আছে, বাংলায় তা কোনও দিনই ছিল না। বাংলায় ছোঁয়াছুয়ির ব্যবধান ছিল বটে, কিন্তু অন্তরের গভীর থেকে যে ঘৃণা তফসিলিদের প্রতি ভারতের অন্যত্র আছে, তা বাংলায় নেই। যে-কারণে বাংলায় অসবর্ণ বিবাহ অতি সহজেই হতে পারে। সেই কারণেই ব্রাহ্মণের সন্তান হয়েও চণ্ডালের ঘরে খেতে আপনার বাধে না, মনে জাগেই না। এটা অন্যত্র নেই। সেই দিক দিয়ে বাংলার হিন্দুদের মধ্যে মানুষের প্রতি ঘৃণার ভাবটা কম। উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারতে কুয়োর পানি নিয়ে এখনো রায়ট হয়, কিন্তু বাংলায় তা কোনও দিন হবে না। আমার পৈত্রিক ভিটা যেখানে সেটা হিন্দুপ্রধান গ্রাম। মুসলমান পাঁচ সাত ঘর, আর সব হিন্দু। সেখানে বামনের বাড়ির পাশে নমঃশুদ্রের ঘর। আমি দেখেছি বামনের ছেলেরা নমঃশূদ্রের বউঝিদের কাকিমা বউদি বলছে, বাধছে না।

কেশব : সারা পৃথিবীতেই ভাষা চেতনা, জাতি চেতনা বাড়ছে, ভেঙে যাচ্ছে বহু দেশ–

শরীফ : এক দিকে যেমন জাতিচেতনা, ভাষাচেতনা বাড়ছে, অন্যদিকে ভাঙছেও বটে। একটু স্থূল ভাবে যদি ধরেন, পৃথিবীর লিংগোয়া ফ্রাঙ্কা এখন একটাই, ইংরেজি। পুরুষের পরিচ্ছদ স্যুট। সংস্কৃতি হচ্ছে স্যুট সংস্কৃতি। ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স গুলোতে খাদ্যের মেনু হয়েছে ফাইভস্টার হোটেলের মেনু, পায়ের জুতো থেকে মাথার চুল কাটার স্টাইলে কোনও পার্থক্য থাকছে না। আপনার সংস্কৃতির কি আছে? আপনার নখ কাটার জন্য নুরুন ছিল, দাড়ি কাটার জন্য ক্ষুর। এখন আপনি আর সেটাতে নেই। সব কিছুই আপনি ইউরোপের কাছ থেকে নিচ্ছেন। আপনার আচার আচরণও তাই হয়েছে। পার্টিশনের আগের দিন পর্যন্ত ছিল আসন পিঁড়িতে বসে খাওয়া। এখন ডাইনিং টেবিল। মাটির হাড়ি-সরাও নেই। আগে হিন্দুর বাড়িতে বিয়ালা পড়লে (প্রসূতির সন্তান হলে) হাড়ি পাতিল ফেলে দিত। ব্রাহ্মণ বলে আপনার ত্রিসন্ধ্যা স্নান করার কথা, এই যে মুসলমানের ছোঁয়া লাগলো, আপনার পবিত্রতা গেল, সব ছেড়েছেন না? কাজই সংস্কৃতি একটাতেই যাচ্ছে। মন্ত্রী বলে, আমাদের সংস্কৃতি রক্ষা করতে হবে। সংস্কৃতিটা কি সে নিজে ব্যখ্যা করতে পারছে না। তার পোশাকটা ব্যাখ্যা করতে পারছে না। এই যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে শাড়ি ছিল না, বাঙালির শাড়ি সবাই নিয়েছে। বাঙালির শাড়ি কাজের লোকেরা যে ভাবে পরে, সেই ভাবে পরা হত। কুচি দিয়ে শাড়ি পড়ার ফ্যাশনটা বোম্বে থেকে আনেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী। কাজেই সংস্কৃতি এক হয়ে যাচ্ছে। এবং সংস্কৃতি এক হতে বাধ্য, কারণ ধর্মটা যাচ্ছে। যখন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে হোমোসেক্সচুয়ালিটি পাশ হয়ে যায়, তখন আর খ্রিস্টানিটি থাকে? একজন যখন কমিউনিস্ট হয় He is no longer a christian, Hindu or Muslim.

কেশব : ভাষা বিষয়ে–

শরীফ : ভাষা চিরকাল থাকবে, আপনার জিহ্বা যতক্ষণ আছে, আপনার ভাষাও আছে। এই যে আমাদের এখনে উর্দুকে চাপাতে চেয়েছিল, পারেনি। আপনারা যে বলছেন পশ্চিমবঙ্গে হিন্দি আপনাদের গ্রাস করছে, তা কোনওদিন সম্ভব হবে না। আপনারা ভুলে যাচ্ছেন কেন, রবীন্দ্রনাথও ব্রিটিশ ইন্ডিয়াতে মানুষ। ১৮৪৭-এ বের হল,

দাঁড়ি, কমা, সেমিকলন-সহ standard বোধগম্য বাংলায় লেখা বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'। আর ১৮৮০-তে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পাচ্ছি। মানে ২২ বছরের মধ্যে আধুনিকতম ভাষা এবং সাহিত্যের মালিক হয়ে গেলাম আমরা। এই ভাষা নেবে কে? সেই সময় স্কুলে কিন্তু ইংরেজিই ছিল medium of Instruction—ক্লাস ওয়ান থেকে। ১৯৩০-এর থেকে বাংলা হল। সেই অবস্থায়ও তো বিদ্যাসাগর কিংবা রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবকে ঠেকানো যায়নি। একজন বাঙালিও যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন বাংলা ভাষা যাবে কোথায়? আপনার জিহ্বা কেটে না নিলে আপনার ভাষা যাবে না। কৃত্রিম উপায়ে বাঙালি বম্বে ফিল্ম করতে পারে, কিন্তু তার বাঙালিত্ব যাবে কোথায়? অশোক কুমার, উৎপল দত্ত এঁরা তো অনেক হিন্দি ছবি করেছেন, কিন্তু তাদের বাঙালিত্ব তো যায়নি। মাতৃভাষা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। লক্ষ করবেন, প্রতিটি দেশে মাতৃভাষার উন্নতি হচ্ছে। আমাদের বাংলাতে সত্তর শতাংশ সংস্কৃত শব্দ। স্বর্ণ সিং কে আপনি সরণ সিং বললেন। নরসিংহ রাও নরসীমা রাও হয়ে গেছে। বাঙালি ঐ রকম হয়নি। বাঙালি সংস্কৃত ধরে রেখেছে। আমাদের ঠেকাবে কে? আর বাংলাদেশ থাকতে বাংলাভাষাকে মারবে কে? কেউ পারবে না।

কেশব : বাংলাদেশে বাংলা ভাষাকে মারতে না পারলেও পশ্চিমবাংলায়—

শরীফ : আপনারা ভাষা হারাবেন? হারাবেন না। তার একটা প্রমাণ দেখুন যারা রোজগারের লোভে আমেরিকা গেছে, তারা দরিদ্র, ধনের লোভে গেছে। ধনের পরে আসে মান। মানের জন্য পদ-পদবী দরকার। প্রথম পুরুষ গেছে, ধন যখন হয়েছে, এখন মান রাখার, সংস্কৃতি রাখার তাদের দায় পড়ে গেছে। লন্ডন থেকে আমেরিকা পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় আপনি একটা আন্দোলন দেখবেন। আরবি ভাষীরা বলছে, আমাদের সন্তানদের আরবি পড়াতে হবে, শিখরা বলছে গুরমুখী পড়াতে হবে। শুধু তাই নয়, আলজারিয়ান-রা বলছে, আমাদের নিজেদের পোশাকে স্কুলে যেতে দিতে হবে। এটা সর্বত্র হচ্ছে। ভুটানের রাজাকে যদি খুব দামী একটা স্যুট উপহার দেওয়া হয়, তিনি কি পরবেন? কিংবা আপনাদের মতো গণদের যদি আমি একটা ব্রিফকেস উপহার দিই, আপনি ব্যবহার করবেন? স্বাতন্ত্র্য চেতনা এক রকমের থাকবে। কিন্তু উদার ভাবে গ্রহণ বরণ করার মধ্যে কোনও পাপ নেই। যেমন আমরা স্যুট নিয়ে নিয়েছি। এই যে পায়জামা পরে আছি, এটা ইংলিশ কাট। মুঘল, শিখ বা রাজপুতরা যেটা পরত এটা তা নয়। আমরা যে পাঞ্জাবি পরি, তার হাতা পাঞ্জা পর্যন্ত আসত বলে তাকে পাঞ্জাবি বলা হয়। কিন্তু পাঞ্জাবির হাতা এখন ছোট হতে হতে বাঙালি হয়ে গেছে। বাঙালির ধুতিটা এসেছে কৌপিন থেকে। ধুতি পরে বাসে উঠতে অসুবিধে, কারখানায় কাজ করতে অসুবিধে, দৌড়তে অসুবিধে, পানিতে নামতে অসুবিধা। তাই রাখা সম্ভব নয়। ব্রিটিশ আমলে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য ধুতি পরা শুরু হয়। ১৯৩৩ সালে সরকারি কলেজের মাস্টারদেরও স্যুট পরতে হত। ১৯৩৩-এ রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হয়ে গেছে, সেই সময়ে সরকারি কলেজের হিন্দু শিক্ষকরা সরকারের কাছে ধুতি পরার অনুমতি চাইলো। এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে, হিন্দু শিক্ষকরা ধুতি পরা শুরু করে দিলেন। অবশ্য অধ্যক্ষদের স্যুট পরতেই হত। পাকিস্তান হবার পর এখানে (পূর্ব বাংলায়) শেরোয়ানি পায়জামা পরা শুরু হয়ে গেল। কিন্তু ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে দেখা

গেল শেরোয়ানি পায়জামা যে পরে, সে নয়, চাকরি পায় স্যুটপরা প্রার্থীরাই। তারপর শেরোয়ানি পায়জামা উঠে যায়।

কেশব : কারো কারো ধারণা ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব কার্যকর হলে মুসলমান মধ্যশ্রেণীর বিকাশ ঘটতো এবং-

শরীফ : (উত্তেজিত ভাবে) না না, আর বলার দরকার নেই, বুঝেছি। একেবারে মিছে কথা। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব আনা হয়েছিল বিকাশমান বাঙালি হিন্দুকে জব্দ করার জন্য। বাঙালি হিন্দুরা শিক্ষিত হয়ে গেল, কোলকাতার হিন্দু কলেজ থেকে যার শুরু। তার মধ্যে দেশপ্রেম জাগলো। আগে তো ঈশ্বরগুপ্তরা ব্রিটিশের জয় ঘোষণা করেছেন। এবার ১৮৬০, ১৮৭০-এর পর ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতা লক্ষ করা গেল, যে-কারণে ১৮৯৫-এর মধ্যে অরবিন্দ ঘোষদের পাওয়া যাচ্ছে। ১৯০৫-এর মধ্যে তৈরি হচ্ছে 'যুগান্তর' প্রভৃতি। কী করম দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, সে স্বাধীনতা চায়। ইংরেজি এটা বুঝতে পেরে বাঙালি হিন্দুকে তিন ভাগে ভাগ করে সর্বত্র তাকে সংখ্যালঘু করে দিতে চায়। ওড়িষ্যার সঙ্গে, বিহারের সঙ্গে, আসামের সঙ্গে। ওটা কার্যকর হলে বাঙালি মুসলমানের উপকার হতো, এটাও বাজে কথা, আমার একটা প্রবন্ধ আছে এ বিষয়ে। বাঙালি মুসলমানের উন্নতি হবার কথাটা ভ্রান্ত এবং প্রতারণামূলক। পূর্ববাংলা আর আসাম নিয়ে যা হল, তাতে দেখা গেল বাঙালি মুসলমান মাত্র পঞ্চাশ হাজারে মেজরিটি। আসামের Non regulated areaগুলো যখন regulated হয়ে এর মধ্যে এসে যেত, তখন বাঙালি মুসলমানও মাইনোরিটি হয়ে যেত। প্রথমে নবাব সলিমুল্লাহ দুটো মিটিং বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে করলেন ঢাকা শহরে, তারপর কার্জন দশ লক্ষ টাকা ঋণের নামে ঘুষ দিয়ে সলিমুল্লাহকে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে নিয়ে এলেন। রাইটার্স বিল্ডিং-এ এখনো সেই ফাইল দেখতে পাবেন। বাঙালি মুসলমানের যে উন্নতি হত না, তার নমুনা আপনি পাবেন ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস দেখলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এক মুসলমান মাস্টার ডঃ শহীদুল্লাহকে পাওয়া গেল, উনি রিসার্চ এ্যাসিটেন্ট ছিলেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর ইংরেজির জন্য পাওয়া গেল উর্দুওয়ালা মুসলমান ফাস্ট ক্লাস এবং অক্সফোর্ডের ডিগ্রিধারী ডঃ মুহাম্মদ হাসানকে। আরবি-ফারসির জন্যও আনত হল বিহার থেকে, ইউ.পি থেকে। ফারসির জন্য ফিদা হোসন এলেন ইউ.পি থেকে। আরবির জন্য ফুক সাহেব এলেন জার্মানী থেকে। science-এ প্রথম মুসলমান যাকে পাওয়া গেল তিনি কোলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র, কাজী মোতাহার হোসেন। রেজাল্ট বের হবার আগেই তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারশিপ দিয়ে দেওয়া হয়। ভাবা হয়েছিল তিনি সেকেন্ড ক্লাস পাবেন। কিন্তু রেজাল্ট বের হবার পর দেখা গেল থার্ড ক্লাস পেয়েছেন। ফলে তাঁর ডিমোশন হয়। তা হলে মুসলমানদের কি উন্নতি হল? '৪৭ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান শিক্ষক পনেরজনও ছিলেন না।

[উনিশ শতকের প্রথম পাদ থেকেই কোলকাতায় রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন যখন অমূর্ত উপাস্যবাদ প্রচার করেন, কিংবা নিরীশ্বর ডেভিড হেয়ারের আর যুক্তিবাদী যুবক ডিরোজিওর প্রভাবে হিন্দু ধর্মে অবজ্ঞা প্রকাশ করছে ছাত্ররা অথবা ম্লেচ্ছ স্পর্শদোষে সমাজে পতিত কেউ কেউ খ্রিষ্টান হয়ে যাচ্ছে, অক্ষয় কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর,

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রমুখ স্বধর্মাচার ত্যাগী বলে, নাস্তিক বলে, স্বসংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ বলে সমাজে নিন্দিত ও ধিক্কৃত হলেও কেউ তাঁদের হত্যা করার জন্যে আন্দোলন করেনি, চায়নি তাঁদের ফাঁসি।

সহিষ্ণুতার সংস্কৃতি : আহমদ শরীফ]

কেশব : শিখা পত্রিকা এবং বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন বিষয়ে–

শরীফ : সৈয়দ আবুল হুসেন ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। তিনি মনে মনে নাস্তিক ছিলেন। তিনি ছিলেন অর্থনীতির শিক্ষক। মুসলমানদের মধ্যে আধুনিকতা জাগাবার জন্য ১৯২৪ সালে তিনি 'আল-মামুন তরুণ সঙ্ঘ' বলে একটা সংগঠন করেছিলেন। পরে করেন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, কাজী আনওয়ারুল কাদির এবং শহীদুল্লাহকে তিনি এর সঙ্গে যুক্ত করেন। এর মধ্যে ডঃ শহীদুল্লাহ ঐ মতের ছিলেন না। তাঁরা *শিখা* বলে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। যিনি এর মধ্যমণি ছিলেন, এবং আধুনিকতাকে গ্রহণ করার জন্য সব কিছু করলেন তিনি সৈয়দ আবুল হুসেন। তাঁর উপর মুতাজিলা মতের প্রভাব ছিল। কিন্তু তাঁর একটি ত্রুটি ছিল, তিনি বাঙলাটা ভালো লিখতেন না। তখনকার দিনের হিন্দু গদ্যকারদের সমকক্ষ পাকা হাতে বাংলা লিখতে পারতেন কাজী আবদুল ওদুদ। কিন্তু কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন যুক্তিবাদী রামমোহন ভক্ত মুসলমান। তিনি র‍্যাশনাল কথা বলতেন বটে, কিন্তু ঈমানটা ঠিক রাখতেন, তিনি ছিলেন Hero worshiper। তিনি গ্যাটে, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষ বসু, মুহম্মদ, রামমোহনের ভক্ত ছিলেন। বিশেষ করে রামমোহন ছিলেন তাঁর আদর্শ। রামমোহনের ধাচেই তিনি সংস্কারটা করতে চেয়েছিলেন। কাজী আবদুল ওদুদ শেষ পর্যন্ত মুসলমানিত্ব ছাড়েননি, ইসলাম ছাড়েননি, শেরওয়ানীও ছাড়েননি। আবুল হুসেন তিনজন ছাত্রকে এর মধ্য জুটিয়ে ছিলেন যাঁরা ছিলেন Born Musalman. একজন হলেন আবদুল কাদির; তাঁর প্রথম কবিতার বইতে প্রথম কবিতার নাম 'ফাতেহা দোয়াজদম'। তিনি মডার্ন ছিলেন না। আর একজন ছিলেন আবুল ফজল। তিনি কোরানের বাণী, হাদিসের বাণী সংকলন করেছেন,কায়েদে আজম, নজরুল ইসলাম সম্পর্কে মুসলমানী দৃষ্টিকোণে নাটক লিখেছেন। সর্বত্র তিনি ছিলেন মুসলমান। পরে student union-এর ডাকে বক্তৃতা দিতে এসে একজন উদার মনস্বী হয়ে গেলেন। Vernacular teacher থেকে became vice-chancellar and then minister। আসল কথা তাঁদের মনের কোনো মুক্তি ছিল না। ১৯৭৩ সালে ডঃ কুদরতে খোদার নেতৃত্বে education reformation committee হলে আবুল ফজল জবানবন্দি দিলেন যে, ধর্মকে ছাড়া যাবে না , ধর্ম শিক্ষা আবশ্যিক করতে হবে ইত্যাদি। এরাঁ আসলে পত্রিকার প্রুফ আনা-নেয়া করতেন। meeting arrange করতেন ক'জন ছাত্র। আবুল কাদির বি.এ. পাস করতে পারেননি। আবুল ফজল একবার ফেল করে পরে বি-এ পাশ করেন। আর শামসুল হুদা কাজী আবদুল ওদুদের বাড়িতে house tutor ছিলেন। সেখানে ওদুদের মেয়ের সঙ্গে তাঁর প্রেম হয়। শামসুল হুদা হলেন নাস্তিক। তিনি এক ঘরোয়া সভায় মহম্মদ এবং ইসলামকে নিন্দা করে বক্তৃতা দেওয়াতে ঢাকায় হইচই পড়ে যায়। নবাব বাড়ির কর্তা শিখা গোষ্ঠীর সবাইকে ডেকে

ধমকান। ডঃ শহীদুল্লাহ ছিলেন শিখা কমিটির মেম্বার। তিনি ঐ ঘরোয়া সভায় উপস্থিত ছিলেন না। অধ্যাপক এ. ডবলিউ. মাহমুদের কাছে শুনেছি, ডঃ শহীদুল্লাহকে ঢাকার নবাব বাড়িতে(আহসান মঞ্জিল) ডাকলে শহীদুল্লাহ বলেন, এমন কথা বলে থাকলে তো শামসুল হুদার মাথা কেটে নেওয়া উচিত। তবে সবাই ক্ষমা-টমা চেয়ে রক্ষা পেলেন। আবুল হুসেন (পরে সৈয়দ তিনি আর লিখতেন না) বিরক্ত হয়ে এখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে কোলকাতায় চলে গেলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে ৪৪/৪৫ বছর বয়সে কর্কটরোগে মারা গেলেন। কাজী আবদুল ওদুদ *শিখা* পত্রিকায় খুব কম লিখেছেন, কোনও রকমে গা বাঁচিয়ে innocent লেখাগুলো এখানে লিখেছেন। 'সম্মোহিত মুসলমান' বলে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন কিন্তু শিখায় ছাপেননি। অনেক পরে বইতে ছেপেছেন। তিনি খুব গা বাঁচিয়ে চলতে পারতেন। আর কাজী আবদুল ওদুদের লক্ষ্য ছিল প্রমোশন পাওয়া। তিনি ছিলেন vernacular teacher এতে Proffesorship ছিল না। এই জন্য তিনি অনেক তদবির করে Text Book Board-এর secretary হ'য়ে কোলকাতায় গিয়েছিলেন এবং Proffessorship পেয়েছিলেন । এই হচ্ছে কাজী আবদুল ওদুদ। অথচ all credits are given to Kazi Abdud Wadud. আর আবদুল কদির-রা কিছুই করেননি, তারা তো প্রথম থেকেই মোল্লা মুসলমান।

কেশব : ধর্মীয় মৌলবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে-

আহমদ শরীফ : যারা রাজনীতি করেন, ভোটের জন্যই তাদের দরকার সাম্প্রদায়িকতা। যেমন ইন্দিরা গান্ধী নাস্তিক ছিলেন, রাজীব গান্ধীও তাই। কিন্তু ভোটের প্রয়োজনেই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে তাঁরা ব্যবহার করতে চেয়েছেন, অপর দিকে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকেও। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ব্যালেন্স রাখতে পারলেন না। এতদিন তত প্রবল ছিল না। ব্রিটিশ আমলের শেষাশেষি যখন স্বাধীনতার কথা এল,তখনই devide and rule নীতি গুরুতরভাবে শুরু হল। পুরো মুঘল আমলে সাম্প্রদায়িকতা নেই। কারণ তুর্কী মুঘল আমলে শহরে শাসক হচ্ছে মুসলমান, আর গ্রামে শাসক হচ্ছে হিন্দু। গ্রামের শাসক হিন্দু এবং মুসলমান মাইনরিটি বলে দাঙ্গা হতে পারে নাই। আবার শহরে শাসক মাইনরিটি বটে কিন্তু বাদশাহর জাত বলে সেখানেও হয় নাই। হিন্দু-মুসলমানের মারামারির প্রথম রেকর্ড পাওয়া যাচ্ছে ১৭৮২ সালে গুজরাটে। তাও আজকের মতো দাঙ্গা নয়। এই যে এত ঘটনা ঘটলো, কিন্তু ১৯৫০ সালের আগে এখানে শহরেও দাঙ্গা হয়নি, বাংলাদেশের গাঁয়ে কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। ছোটলোক যাদের বলে মুচি, মেথর এদের নিয়েও কোথাও রায়ট হয় নাই।

কেশব : Direct action এবং ১৬ আগস্ট ১৯৪৬-এর great Calcutta killing সম্পর্কে–

শরীফ : ওটাও politically হল। সহজ কথা জিন্নাহ বললেন, ব্রিটিশের পলিসির বিরুদ্ধে direct action-এ যাবো। এখন দেখুন জিন্নাহ বা মুসলিম লিগের অধীনে সিন্ধু নেই, ফ্রন্টিয়ার নেই, পাঞ্জাব নেই। উত্তর ভারতে, ইউ-পি, বিহারে মুসলমান মুসলিম লিগ করে বটে, কিন্তু সেখানে মুসলমান মাইনরিটি, শতকরা বার জন মাত্র। এছাড়া দক্ষিণ ভারতে মুসলমান বিভিন্ন জায়গায় ১০%, ৯%, ৮% মাত্র। কাজেই direct action করতে হলে বাংলাতেই করতে হয়। এবং রাজধানীতেই করতে হয়।

সেই কারণেই তা কোলকাতায় শুরু হয়। সেই রায়ট-এও বেশি মার খেল মুসলমানরা। কোলকাতার রাস্তার ধারে দু'তিন তলা বাড়ি। পার্ক সার্কাস অঞ্চলের কয়েকটি বাড়ি ছাড়া সব বাড়ি হিন্দুর। হিন্দুরা গরম পানি, ইট রাখলো ছাদের ওপরে। বিহারি মুসলমান কুলি মজুরেরা, খিদিরপুরের খালাসীরা, এবং বাঙালি (মুসলমান) বাসার চাকরেরা এলো হিন্দুকে মারতে। তারা রাস্তার উপরে। হিন্দুরা ছাদের ওপর থেকে ইট আর গরম পানি ফেলছে, ফলে ওরাই মরেছে সবেচেয়ে বেশি। আর নোয়াখালীর রায়ট-এর কারণ অন্য। গোলাম সারওয়ার নির্বাচনে কংগ্রেসের নমিনেশন চেয়েছিল, রাজেন বাবু নমিনেশন দিলেন না। রাজেন বাবুর উপর রাগ। তাই রাজেন বাবুর বাড়ি আক্রমণ করার সুযোগ নিল গোলাম সাওয়ার। তারপর রায়ট মাত্রেই লুটের একটা সুযোগ থাকে। সেই কারণে রায়ট-এ গরীব লোক অংশ নেয়। রায়ট এর অর্ডারটা দেয় ভদ্রলোকেরা, গরীব লোকেরা কিছু পাওয়ার জন্য যায়, হত্যার উদ্দেশ্যে নয়। কিন্তু পেতে গেলে কিছু হত্যা করতে হয়, এই হল ব্যাপারটা। গরীব লোকেরা কিছু নিয়ে বাড়ি ফিরলে, যাদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা, তাদের বাড়ি, ভিটে, জমি, ব্যবসা দখল করে ভদ্রলোকেরা।

কেশব : উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে আপনি কার নাম করবেন?

আহমদ শরীফ : চরিত্র হিসেবে রামমোহনের কোনো চরিত্র ছিল না, কিন্তু তাঁর ব্রেন ছিল অসাধারণ। Highly intellectual এবং যুক্তিবাদী ছিলেন। কিন্তু বাস্তব জীবনে চরিত্রহীন এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর মা ভিক্ষে করেছেন, দাদা জেল খেটেছেন, বাবা জেল খেটেছেন। কিন্তু রামমোহন টাকা দিতে রাজি হন নাই। পরে এক হাজার টাকা দিলেন উচ্চ সুদে। চরিত্র না থাকলেও সে যুগে ইউরোপের যে-কোনো প্রথম সারির Highly intellectual-এর সমকক্ষ ছিলেন রামমোহন। তিনি ছিলেন সংস্কার মুক্ত মানুষ এবং প্রকৃত শিক্ষিত। আরবি ফারসি, সংস্কৃত, ইংরেজি পুরো শিখেছিলেন। খবর রাখতেন সারা পৃথিবীর। তিনি ধার্মিক ছিলেন না, এক মুহূর্তে পৌত্তলিকতাকে ছাড়তে পেরেছিলেন। *আত্মীয় সমাজে* মদ আর গরুর মাংসের শিককাবাব খাওয়া হত। কিন্তু যখন ইউরোপ গেলেন হিন্দুয়ানি দেখাবার জন্যে কিংবা জাহাজে দুধ পানের জন্যে সঙ্গে একটা গরুও নিয়েছিলেন। অথবা যেন লন্ডনের গরু খ্রিষ্টান গরু, তার দুধ খাওয়া যাবে না। রান্নার জন্য একজন ব্রাহ্মণ নিয়েছিলেন সঙ্গে। তার উপপত্নীর ঘরে একটি সন্তান ছিল। আর বিদ্যাসাগর সর্বসংস্কার মুক্ত নাস্তিক ছিলেন। এটা কোনো সোজা কথা নয়। জ্ঞান, সাহস, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, যুক্তিবাদ না থাকলে কেউ নাস্তিক না হলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হয়ে সর্বপ্রকার ধর্মাচার পরিহার করতে পারতেন না। সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর যে বিদ্যা অর্জন করেছেন, সে বিদ্যা হল এক হাজার বছর, দেড় হাজার বছর আগের। তার সমস্ত সিলেবাস ছিল এক হাজার বছর আগের। রঘুনাথ, রঘুনন্দন, বুনো রামনাথ, ন্যায় শাস্ত্র প্রভৃতি সামান্য কিছু পাঁচশ বছর আগের। বেদ, সংহিতা, মনুসংহিতা, কাব্যনাটক যা পড়েছেন সব হাজার-দেড় হাজার বছরের প্রাচীন। কাজেই একেবারে Backward লেখাপড়া। সেই মানুষ নিজে নিজে ইংরেজি শিখেছেন এবং সেই Backward মানুষ সবচেয়ে Forward হলেন। হিন্দু কলেজে ছাত্র জীবনে যারা উচ্ছৃঙ্খল হয়েছিলেন, তাঁরা চল্লিশোত্তর বয়সে নিষ্ঠাবান হিন্দু, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম, নিষ্ঠাবান খ্রিস্টান হয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগার জীবনে তা হন নাই। বিদ্যাসাগরের মধ্যে সব কিছু আছে, শুধু দেবতা

নাই। আত্ম সম্মানে নাস্তিকতায় সর্বসংসার মুক্ত একজন মানবতাবাদী ছিলেন তিনি। বিদ্যাসাগরের ত্রুটি হল, তাঁর আবেগ ছিল বড় বেশি। বিদ্যাসাগর যখন বিধবা বিবাহ চালু, এবং বহু বিবাহ-বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে চাইলেন, তখন সারা কোলকাতা শহরে এক ডজন graduate ছিল না। একটা মধ্য যুগীয় পরিবেশে তিনি এসব চালাচ্ছেন। কাঁঠাল matured হলে রোদে দিলে পাকে। আম matured হলে ছালাতে পুরলে পাকে। কিন্তু কাঁঠালের মুচি যদি আপনি রোদে দেন তা তো পাকবেনা। অকালে অসময়ে তিনি আরম্ভ করেছিলেন। সেই কারণে বহু বিবাহ এবং বাল্য বিবাহ নিরোধ তার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। বিধবা বিবাহ চালু করাও তার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে বহু বিবাহ নিরোধ হল। কারণ লজ্জা পেয়ে গেল। আমাদের দেশে (বাংলাদেশে) শিক্ষিত মুসলমান দুটো বউ থাকলে একেবারে লজ্জায় মরে যায়। একটাকে গ্রামে রাখে, এবং দুটো বউ যে আছে, তা স্বীকারই করতে চায় না। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই দুজনকে শহরে রাখে না।

কেশব : বাংলাদেশে তো দুটো বিয়ে নিষিদ্ধ–

শরীফ : নিষিদ্ধ হয়েছে আইয়ুব খানের সময়। দুটো বিয়ে করতে ওটা কোনো বাধা নয়। দ্বিতীয় বিয়েতে প্রথম বউয়ের সম্মতি লাগে। তো প্রথম বউকে একদিন পিট্টি দিলেই দ্বিতীয় বিয়ের সম্মতি সহজেই পাওয়া যায়। কিংবা তালাকের ভয় দেখালেই কাজ হয়ে যায়।

কেশব : এখনো কি তালাক সেই ভাবে দেওয়া যায়?

শরীফ : তালাকতো পুরুষের একচেটিয়া অধিকার। নারীর তো কোনো অধিকার নেই। এক পুরুষ বহু নারীতে উপগত হবে। মুসলমান, খ্রিস্টান, ইহুদিদের আরও একটি সুবিধা আছে–War Captives and slaves any number you can enjoy without marring। কি রকম মজা! কাজেই নারীর তো কোনো সত্তা এখনো স্বীকার করা হয় নাই।

যাক, যে কথা বলছিলাম। সব দিক বিবেচনা করলে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা ভূয়োদর্শন ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত নাস্তিক ছিলেন। বিদ্যাসাগর নাস্তিক–reformer হিসেবে বাঙালির উপকার করতে চেয়েছিলেন শিক্ষা-দীক্ষায়, বিশেষ করে নারীর। নারী সত্তার মর্যাদা প্রথম উপলব্ধি করলেন বিদ্যাসাগর। তার পরে যাঁর নাম করতে হয় তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শন, চিন্তা-চেতনা ছিল অত্যন্ত উন্নত মানের। বাংলা ও বাঙালি সম্পর্কে সামগ্রিক দৃষ্টি রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগরের ছিল না। এই সামগ্রিক দৃষ্টি ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের। তিনিই 'জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা' একথা বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চিন্তা-চেতনায় রবীন্দ্রনাথের থেকে অনেক উঁচু মানের এবং উঁচু দরের ছিলেন। Till this moment আমার নিজের ধারণা বঙ্কিমের মতো এমন সামগ্রিক, সামূহিক, সামষ্টিক জাতি চেতনা, কল্যাণ চেতনা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কখনো জাগেনি। রবীন্দ্রনাথ অনেক ব্যাপারে conservative হিন্দু ছিলেন, ৪৭ বছর বয়স পর্যন্ত conservative হিন্দু, ব্রাহ্মও নন। ৫৩ বছর বয়সে তিনি উদার হলেন নোবেল পুরস্কার পেয়ে। যেমন মন্ত্রী হয়ে মন্ত্রীরা এখানে সেখানে বক্তৃতা দিতে যান। বৌদ্ধরা ডাকলে 'ভগবান বুদ্ধের মতো বড় মানুষ আর নেই', আবার রামকৃষ্ণ ডাকলে, 'রামকৃষ্ণের থেকে বড় লোক

নেই', এমন বলে না? রবীন্দ্রনাথও সেই রকম international হলেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্রতা এবং সংকীর্ণতা শেষ পর্যন্ত ছিল। যা কখনো বঙ্কিমচন্দ্রকে স্পর্শ করে নাই। ডায়াবেটিস ও হাঁপানি রোগ, পুত্র সন্তানহীনতা, চাকরিতে গোলমাল ইত্যাদি কারণে জীবনের শেষ দশ/বারো বছর বঙ্কিম হিন্দুয়ানির চর্চা করেছিলেন। স্কটিশচার্চ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এক জমিদার বাড়ির শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে পরিহাস ছলে হিন্দুয়ানির নিন্দে করাতে তাঁর লেগেছিল। তারপর তিনি বেদ-পুরাণ ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করে দিলেন, *কৃষ্ণ চরিত্র* ইত্যাদি লিখলেন। এবং এতেই তিনি ভক্তিধর্মে আশ্রিত হলেন। মানে, যিনি সমুদ্র সাঁতারের ক্ষমতা রাখতেন, তিনি হিন্দুয়ানির বদ্ধকূপে আবদ্ধ হয়ে গেলেন, শেষ জীবনের দশ/বারো বছর। তার আগে বঙ্কিমের যে দৃষ্টি, যে উদারতা তার তুলনা হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম কৃষকের কথা বলেছেন। একটা sentence দিতে হয়েছে ডেপুটিগিরি করেন বলে– আমরা সমাজ বিপ্লব চাই না, কাজেই আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে কিছু বলিবো না। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পছন্দ করতেন। তাঁর মধ্যে দেশপ্রেম প্রথম থেকেই ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র আগাগোড়া ব্রিটিশ বিদ্বেষী ছিলেন। তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও করেছেন। এবং তাঁর বিরুদ্ধে মুসলমান বিদ্বেষের যে অভিযোগ আনা হয়, তাও ঠিক নয়। 'আনন্দমঠ'-এ তিনি হিন্দুয়ানিকেও পছন্দ করেন নাই। পত্রিকায় *আনন্দমঠের* শুরু ব্রিটিশ বিদ্বেষ দিয়ে, চাকরি হারাবার ভয়ে ইংরেজের জায়গায় মুসলমান বসান। এসব জানলে বুঝলে বঙ্কিমচন্দ্রকে মুসলমান বিদ্বেষী বলা যায় না। তিনিই প্রথম বলেন, যতদিন পর্যন্ত উর্দুওয়ালা মুসলমানেরা মানে ভদ্র মুসলমানেরা বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা রূপে গ্রহণ করবেন না, ততদিন উন্নতি নাই। তিনি প্রসন্ন চিত্তে বলেছেন, পাঠান যুগ ছিল বাংলার স্বর্ণ যুগ। তাঁর 'বন্দেমাতরম্' হচ্ছে বাংলা,বিহার, উড়িষ্যার সাতকোটি মানুষকে নিয়ে লেখা বাংলা, বিহার উড়িষ্যা এখন প্রভিন্স,তখন ছিল সুবে বাংলার অন্তর্গত। এই সুবে বাংলার একজন মুসলমানকেও তো তিনি তাঁর সংগীতে বাদ দেন নাই। তিনি প্রথম স্বদেশকে মাতৃরূপে চিহ্নিত করেছেন। তবে শেষ জীবনে তিনি Hindu code of life তৈরি করেন। এবং হিন্দু পুনর্জাগরণ কামনা করেছেন।

[আমাদের দেশে নারীর মধ্যে প্রথম স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার জন্যে দ্রোহাত্মক যুক্তি উচ্চারণ করেন সম্ভবত (মোতিচুর, অবরোধবাসিনী) বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩১) এ শতকের প্রথম দশক থেকেই। আর শেষ দশকে তসলিমা নাসরিন আর তাঁর প্রেরণা প্রবর্তনায় এখন মল্লিকা সেনগুপ্ত প্রমুখ অনেকেই। আফ্রো-এশিয়ার অসংখ্য মহিলা সমিতি স্বাধিকারের সংগ্রামে সদা নিরত রয়েছে। কিন্তু শাস্ত্রমানা আস্তিক নারী স্বাধীনতা পেতেই পারে না, সুযোগ-সুবিধে আদায় করতে পারে মাত্র। কারণ, কোনো শাস্ত্রই নারীর স্বাধীন সত্তা স্বীকার করে না। নারীকে স্বাধীন ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে নাস্তিক হতে হবে।

নারীবাদ-পুরুষবাদ নয় : বিশ্বমানববাদ আহামদ শরীফ]

কেশব : 'বন্দেমাতরম্' তো বাংলাকে বন্দনা করে লেখা, অথচ সেই সংগীতকেই পরে ভারত বন্দনা বলে চালানো হয়-

আহমদ শরীফ : 'বন্দেমাতরম্' হচ্ছে সম্পূর্ণ ভাবে বাংলাকে তথা সুবেহ্ বাঙলা বা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে বন্দনা করে লেখা। বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো ভারত-ধারণা ছিল না। কারণ, তাঁর ফরমেটিভ পিরিয়ডে ইংরেজ ভারবর্ষ জয় করেনি। সেটা এসেছে রবীন্দ্রনাথে, যে রবীন্দ্রনাথ সত্য গোপন করেছেন। *জনগণমন* তিনি লিখেছেন আশুতোষ চৌধুরীর পরামর্শে, 'ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ'-এর অভিষেক উপলক্ষে। আশুতোষ চৌধুরী ছিলেন তাঁর ভাইঝি জামাই, প্রমথ চৌধুরীর বড় ভাই। এই রবীন্দ্রনাথই ডঃ ডেভিটের মধ্যস্থতায় এ্যাডারসনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে *চার অধ্যায়* লেখেন। এটা এখন প্রমাণ হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, *ঘরে বাইরে*ও-তাঁকে টাকা দিয়ে লেখান হয়। অনেক অন্ধ রবীন্দ্রভক্ত বলেছেন যে, পঞ্চম জর্জকে বন্দনা করে নয়,'জনগণমন' আসলে ঈশ্বরকে বন্দনা করে লেখা। ঈশ্বর তো বিশ্বব্যাপী , রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর কেন শুধু ব্রিটিশ ভারতের উপনিবেশের ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ রইলেন? এ প্রশ্নের কী জবাব দেবেন তাঁরা !

কেশব : রবীন্দ্রনাথকে আপনি আলোর পুরুষ বলেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবর্ষে 'রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র মূল্যায়ন' লেখাটির জন্য দুবাংলাতেই আপনি চিহ্নিত হয়েছেন 'রবীন্দ্র-বিরোধী' মানুষ হিসেবে। আপনার ঐ লেখাটির বিরুদ্ধে কবি শামসুর রাহমান ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, শওকত ওসমান জানিয়েছিলেন প্রতিবাদ এবং সৈয়দ শামসুল হকের ভাষায় তা ছিল 'এক কলংকিত কাজ'। এই সব কারণেই রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাদের অষ্টাদশ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আপনাকে সাম্মানিক ডিলিট উপাধি প্রদান করায় (২৪ বৈশাখ ১৪০০, ৭ মে ১৯৯৩) 'লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ' এই অভিযোগ এনে কোলকাতার সংবাদপত্রে তার প্রতিবাদ করেন কেউ কেউ। এ বিষয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া–

শরীফ : প্রথম কথা রবীন্দ্র-বিরোধী আমি নই। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে কথাগুলো বললাম, তা তো প্রমাণিত হয়ে গেছে। আমি রবীন্দ্রাথের একটা true assessment করতে চেয়েছিলাম তিন পুরুষ পরে। এই কারণেই ঐ লেখার ঐ শিরোনাম। আমার ঐ লেখাটির বিরুদ্ধে রবীন্দ্র স্তুতিকাররা ক্ষ্যাপা। এর আগে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কয়েক হাজার বই লেখা হয়েছে। সবগুলো হচ্ছে স্তাবকতা। মহাকবিকে মহামানব বানানোর অপচেষ্টায় সবাই মহামানব রূপে দেখতে-দেখাতে চান। রক্ত মাংসের মানুষমাত্রই প্রবৃত্তিচালিত থাকে লঘু-গুরু ভাবে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাবে-চিন্তায় কর্মে-আচরণে মতধ্য মানব বা প্রাণীসুলভ কোনো প্রাবৃত্তিক দোষ বা অসংযত রূপ বা সাধারণ স্বাভাবিক কর্ম-আচরণ দেখতে পান না, সব তথ্য গোপন করেন, কোনও ভদ্রলোক লিখতে পারেন না। আগাগোড়া চাকটুকারিতা আর স্তাবকতা। নারায়ণ বিশ্বাস প্রথম ধরে দেন *গোরা* এবং *ঘরে-বাইরের* নকল। একথা অবশ্য আগে বলবার চেষ্টা করেছিলেন প্রিয়রঞ্জন সেন। তারপর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত একটি মেয়েও গোরা এবং *ঘরে-বাইরে* এর সঙ্গে দুটি ইংরেজি উপন্যাসের সাদৃশ্যের কথা বলেছিলেন। এর বেশি বলতে সাহস পাননি। কালীমোহন ধরে দিয়েছিলেন কিছু রবীন্দ্র কবিতার নকল। স্তাবকতা থেকে মুক্ত হয়ে নির্মোহ দৃষ্টিতে আমি রবীন্দ্র মূল্যায়ন করতে চাই। নজরুল সম্পর্কেও আমি একই ভাবে মূল্যায়ন করেছি ১৯৫৮ সালে লেখা *এক বিরূপ পাঠকের দৃষ্টিতে নজরুল* প্রবন্ধে।

আমি চেয়েছি As he is তুলে ধরতে। এবং আমার সমস্ত কিছু documented. আমরা হচ্ছি ভক্তিবাদী। ভক্তিবাদী মানুষ যুক্তিবাদী হতে পারে না, এবং সত্যকেও জানতে বা উপলব্ধি করতে পারেন না। আমি রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে এবং গ্রহণ করতে চাই ভক্তির দৃষ্টিতে নয়, যুক্তির এবং তথ্যের ভিত্তিতে। এতে রবীন্দ্রনাথ ছোট হন না। আমার যে প্রবন্ধের কথা আপনি উল্লেখ করলেন, সেই প্রবন্ধ আমি শেষ করেছি ভারতচন্দ্রের উদ্ধৃতি দিয়ে–

'কবিতা কমলে তুমি রবি মহাশয় নরলোকে সম নাহি দেবলোকে কয়।' আমি রবীন্দ্রনাথকে মানুষের মন-মগজ-মনন মনীষার সর্বোৎকৃষ্ট চরম ও পরম বিকাশরূপে দেখতে ও দেখাতে চেয়েছিলাম, মানবশক্তির চরম ও পরম প্রতীক-প্রতিম ও প্রতিভূ হিসাবে দোষে গুণে বাস্তব ও স্বাভাবিক মানুষটিকে জানতে, বুঝতে ও দেখতে আর দেখাতে। আমি বলেছি রবীন্দ্রনাথের থেকে বড় প্রতিভা গ্যাটে, শেক্সপিয়ার, টলস্টয়, ভিকতর য়্যুগো, দস্তয়ভস্কি প্রভৃতি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনন্যতা হচ্ছে সারা পৃথিবীতে এমন versatility আর কোনো প্রতিভাবান অন্য কারো মধ্যে পাওয়া যায় না। সব ক্ষেত্রে এমন দক্ষতা, এমন কী শেষ জীবনে রচিত নৃত্যনাট্যে বা গীতিনাট্যে এবং চিত্রকলায় পর্যন্ত। এর অপর একটি তুলনা পৃথিবীর আর কোনো গুণী সাহিত্য প্রতিভাবানে আপনি দেখাতে পারবেন না। এখানেই রবীন্দ্রনাথ অনন্য। গ্যায়টে, শেক্সপিয়ার, টলস্টয় সবারই মানস বিচরণ ক্ষেত্র সীমিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো এমন সর্বক্ষেত্রে অনায়াস আত্মবিস্তার এবং সমান পারদর্শিতা অলভ্য। এমন প্রতিভা য়ুরোপে জন্মায়নি। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে তাঁর versatility, তাঁর বহুমুখিতা, বিচিত্রগামিতা, সর্বশাখায় প্রায় সমান নৈপুণ্য ও দক্ষতা আর কারো মধ্যে ছিল না। তাই তিনি অনন্য, অসামান্য, অতুল্য আশ্চর্য শক্তিধর ব্যক্তি।

আমাদের প্রয়োজনেই রবীন্দ্রনাথের যথার্থ মূল্যায়ন প্রয়োজন। তাঁর সুদীর্ঘ আশি বছরের জীবনে কোনো ত্রুটি নেই, এটা কোনো কথা হল? অথচ পাওয়া যায়। অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন, শান্তিনিকেতনে একটা চাকরি পেয়ে তাঁর সরকারী চাকরি ছেড়ে দেবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হলেন জমিদার, মর্জির ঠিক নেই, কখন আবার চাকরি নট করে দিলে তাঁর খাবার অভাব হবে। রবীন্দ্রনাথ ইনটলারেন্ট ছিলেন, যে মাস্টার রবীন্দ্রনাথের কথার প্রতিবাদ করতেন, তাঁর চাকরি থাকতো না। তাঁর লেখার নিন্দাও সহ্য করতে পারতেন না, ছদ্মনামে প্রতিবাদ লিখেছেন কখনো কখনো। রবীন্দ্রনা মদ খেতেন একথা কেউ বলেছেন? সুন্দর সুপুরুষ জমিদার সন্তান শক্তিমান কবি লেখক কিশোর যুবক-প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথের প্রেমে পড়বে নারীরা সান্নিধ্যে এলেই, তাতে দোষের কি আছে? তাছাড়া কবিরা আবেগপ্রবণ ও সম্ভোগ প্রিয় হনই। তাঁর শেষ প্রেম ষাটোত্তর বয়সে হয় ওকাম্পোর সঙ্গে। তিনি যেখানে গেছেন মেয়েদের প্রেমে পড়েছেন, টিস করেছেন। জগদীশ ভট্টাচার্য ইনিয়ে বিনিয়ে বহু নারী সম্পর্কে বলবার চেষ্টা করেছেন, এমন ভাবে যেন গুরুদেবের নিন্দে না হয়। রবীন্দ্রনাথের আরো একটা লোভ ছিল পৌরহিত্যের লোভ। মুসলমানের ইমামতির মতো খুৎবা দেওয়া। শান্তিনিকেতন সিরিজ। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন, আর বক্তৃতা দেবার সময় মানবধর্ম করেছেন। বরং প্রবোধচন্দ্র সেন, অমিয় চক্রবর্তী এঁরা নাস্তিক ছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথের সেন্টিমেন্ট মেনে সবাই চলেছেন। জমিদারের আস্তারে চাকরি করতে হলে তা-ই বোধহয় করতে

হয়। আমি বলতে চাই, মানুষ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, রাগ, ক্ষোভ থাকবে না? আর বয়ান চাই?

কেশব : এ বছর ১৯৯৬ সনে কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের মৃত্যু শতবর্ষের বছর। সেই সূত্রে জানতে চাইছি ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর বিরোধের বিষয়ে–

আহমদ শরীফ : জমিদার হিসেবে ঠাকুর পরিবার ছিল অত্যাচারী। গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছিল। বুট পরে প্রজাকে লাথি মেরেছেন, পায়ে দলেছেন দেবেন ঠাকুর। সহোদর ভাই নগেন্দ্রনাথ ছোট ভাইয়ের সন্তানকে দত্তক নিতে চাইলে সম্পত্তি তিন ভাগ হবে দেখে ভাইকে ভিটে ছাড়া করেছেন। ব্রাহ্ম ধর্ম ধারণ করে ভাইদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। এটাই রেকর্ড করেছিলেন হরিনাথ মজুমদার। যিনি মহর্ষি বলে পরিচিত, তিনি এরকম ভাবে মানুষকে পদাঘাতে দলিত করেন। গ্রাম জ্বালাবার কথাও আছে। আবুল আহসান চৌধুরীর কাছে এর সমস্ত document আছে। সমগ্র ঠাকুর পরিবার কখনো প্রজার কোনো উপকার করেনি। স্কুল করা, দিঘি কাটানো এসব কখনো করেনি। নোবেল পুরস্কার পাবার পর রবীন্দ্রনাথ কিছু কাজ করেছিলেন। ব্যাঙ্ক, কৃষির উন্নতির জন্য শ্রীনিকেতন ইত্যাদি। রবীন্দ্রসাহিত্যের একটা বড় অংশ সৃষ্টি হয়েছে পদ্মা পারে। কিন্তু পদ্মার পার ভাঙার কারণে যে মানুষরা সর্বস্বান্ত হতো, তাদের কথা বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যের কোথাও নেই। জমিদার হয়ে প্রথম শিলাইদহে গিয়ে চার বছরের বকেয়া খাজনা তিনি উসুল করেছিলেন, খাজনা বাড়িয়ে ছিলেন। মুসলমান প্রজাদের ঢিট করার জন্য নমঃশুদ্র প্রজা এনে বসতি স্থাপনের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিও রবীন্দ্রনাথের মাথা থেকেই বের হয়েছিল। কাঙাল হরিনাথ মজুমদার তাঁর 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকায় ঠাকুর পরিবারের প্রজা পীড়নের কথা লিখে, ঠাকুর পরিবারের বিরাগ ভাজন হয়েছিলেন।

কেশব : ভবিষ্যতে দুবাংলা কি এক হবে?

শরীফ : দুবাংলা যদি কমিউনিস্ট হয় তবে হবে। আর হিন্দু যদি হিন্দু থাকে, মুসলমান যদি মুসলমান থাকে তবে মারামারি হবে।

কেশব : যদি এক হয়, তবে পশ্চিমবাংলা কি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হবে, নাকি বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে?

শরীফ : দুটো কারণে ভারতের মধ্যে থেকেই এটা হতে পারে, যদি বাংলাদেশের অবস্থা আরো খারাপ হয় এবং ভারত যদি কনফেডারেশনে ফেডারেল স্টেট হয়।

কেশব : ভারত রাষ্ট্রের বর্তমান ভৌগোলিক কাঠামো কি পরিবর্তন হতে পারে?

শরীফ : হ্যাঁ, সেই সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। তবে এখন বিচ্ছিন্ন হলেও ভবিষ্যতে আবার সব এক হবে, নিজেদের বাঁচার তাগিদেই। যে কারণে ইউরোপ সংহত হচ্ছে। ফরাসি জার্মানী ইত্যাদিরা আজ তাদের Pride and Prestige ত্যাগ করে, Tradition ত্যাগ করে, Independence ত্যাগ করে সবাই এক currency-তে এক Administration-এ আসার জন্য ছটফট করছে বাঁচার গরজে। কাজেই সেই রকম গরজ আমাদের এখানেও হবে। তবে একথা ঠিক যে ভারত প্রথমে বিচ্ছিন্ন হবে। ভারত আসাম রাখতে পারবে না, seven sister রাখতে পারবে না, কাশ্মীর রাখতে পারবে না। তবে পাঞ্জাব বিপদে পড়েছে। মুসলমানকেও সে বিশ্বাস করতে পারছে না, যারা তাদের encourage করছে। আবার হিন্দুদেরও বিশ্বাস করতে পারছে না, যারা তাদের accept করেও করছে না। সব সন্ত ধর্ম হিন্দু ধর্মে বিলুপ্ত হয়েছে। যেমন কবির,

রামানন্দ, রামদাস প্রমুখের। এরকম অন্য সমস্ত সন্ত সম্প্রদায়গুলো হিন্দু হিসেবে নিজেদের মার্জ করেছে। কেবল শিখরা করেনি। কাজেই শিখরা তাদের Identity রাখতে চায়। মুসলমানের ওপর ভরসা করে স্বাধীনতা নিলেও তারা (শিখরা) টিকতে পারবে না। মুসলমান আবার বিট্রে করবে। আবার হিন্দুর মধ্যে থাকলে তারাও শোষণ করবে। সেই কারণেই শিখরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে। কাজেই তারা স্বাধীন হবে কিনা বলতে পারি না। তবে কাশ্মীরকে রাখা যাবে না। আমার মতে লাদাকটা চায়নাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত। কাশ্মীরে যা রক্তপাত ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, এটা অমানবিক। You can`t ride a reluctant horse, why should you? কোন অধিকারে ভারত কাশ্মীর দখলে রাখবে? কাশ্মীর কখনো ভারতের অংশ ছিলো না। কাশ্মীর আলাদা রাষ্ট্রই ছিল। তাদের ভাষা আলাদা, ধর্ম আলাদা, অবস্থান আলাদা। এসব বুঝতে হবে, যেমন আসাম। মুঘলরা ব্রহ্মপুত্র পার হতে পারে নাই। ব্রিটিশরা গিয়ে দখল করেছে। কাজেই এখনই ভারতের উচিত India should declare a fedaration। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা থাকলে ভাতত তাই করবে, এবং এতেই ভারতের অস্তিত্ব রক্ষা পাবে। না হলে হিন্দি বিরোধী দাক্ষিণাত্যকেও ভারতের মধ্যে রাখা যাবে না। ইংল্যান্ড যেমন উত্তর আয়ারল্যান্ডকে দখলে রাখতে চায় গায়ের জোরে।

কেশব : কয়েক বছর আগে কোলকাতার একুশে উদযাপন কমিটির এক সভাতে আপনি বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়াকে অভিন্ন ভাষা বলে বর্ণনা করেছিলেন–

শরীফ : হ্যাঁ, মধ্যযুগে ওড়িয়া, অসমীয়া এবং বাংলা যদি এখানকার কোন ভূমিপুত্রের একক শাসনে থাকতো, তবে বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া–এ তিনটে ভাষার বদলে একটিই লেখ্য বা লিখিত ভাষা হত। এবং ভাষা সূত্রে সেই একক ভাষিক জাতি বিপুল শক্তিমান এক অভিন্ন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতো। সেই সুযোগটা আমরা এই তিন ভাষার মানুষরাই হারিয়েছি। তবে এখনো ইচ্ছে করলে এই তিনটে ভাষাকে অভিন্ন করে তোলা যায়। অবশ্য কেউ রাজি হবে না।

কেশব : রবীন্দ্রনাথ বাংলা এবং অসমীয়া ভাষাকে অভিন্ন বলায় ঠাকুর পরিবারের জামাই লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া তার প্রতিবাদ করেছিলেন–

শরীফ : হ্যাঁ, এর কারণ তিনি যখন শ্বশুর বাড়ি (ঠাকুর পরিবারে) যেতেন তখন তাঁর অসমীয়া উচ্চারণের জন্য তাঁর শ্যালকেরা তাঁকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতেন। এতেই তাঁর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, এবং অসমীয়া ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। অসমীয়া ভাষার উন্নতির এবং গড়ে ওঠার পিছনে লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়ার বিশেষ অবদান আছে।

কেশব : যে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সামনে রেখে মুক্তিযুদ্ধ, মুজিব হত্যার পর মেজর জিয়াউর রহমানের শাসনের সময় তা পাল্টে করা হল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। কোনটি আপনার কাছে যুক্তিগ্রাহ্য?

আহমদ শরীফ : বর্তমান রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের সূত্রে কেউ বাংলাদেশী বাঙালি, কেউ ভারতীয় বাঙালি হলেও, ভাষা-সংস্কৃতি, ভৌগোলিক অবস্থান, মানসিক গঠন এবং রক্তে ও জাতিগত ভাবে বাঙালি এক ও অভিন্ন। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ হচ্ছে–এপারের বাঙালির রাষ্ট্রীয় পরিচয়কে বড় করে তোলা। এবং সেই সূত্রে বাঙালির মধ্যে কৃত্রিম পার্থক্য সৃষ্টির ষড়যন্ত্র। বাংলাদেশের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হলেন এই

ষড়যন্ত্রের নায়ক। পাকিস্তান আমলেও এসব হয়েছে। কখনো বাংলা বর্ণমালার পরিবর্তে আরবি-ফারসি বর্ণ ও শব্দ চালু করা, বাংলা সংস্কৃতিকে ইসলামিকরণের জন্য রবীন্দ্রনাথকে বাতিল করা, নজরুলের গান কবিতা সংশোধন করা ইত্যাদি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই সব ষড়যন্ত্র সফল হয় নাই। তবে বাংলাদেশে উপজাতি আদিবাসী জনজাতির স্বাতন্ত্র্যে গুরুত্ব দিয়ে রাষ্ট্রিক জাতিচেতনা অবশ্য স্বীকার করা চলে।

অধ্যাপক আহমদ শরীফের সংলাপ

ইসা মোহাম্মদ

ঢাকা থেকে কলকাতা, লন্ডন থেকে ওয়াশিংটন–পৃথিবীর বাঙালি অধ্যুষিত বিভিন্ন জায়গায় এক গরিবতম দেশের শক্তিকেন্দ্র থেকে ধনীতম দেশের শক্তিকেন্দ্র পর্যন্ত নানা সংস্থায় অধ্যাপক আহমদ শরীফের আড্ডার উত্তাপ পৌঁছে গিয়েছিল। কি কথা কেমন করে তিনি বলতেন যার এত প্রাণশক্তি? এখানে আমরা অধ্যাপক আহমদ শরীফের আড্ডার মেজাজ বজায় রেখে কিছু সংলাপ পেশ করলাম। এগুলি অনেকের স্মৃতি উসকে দিতে সাহায্য করবে। একজন তেজী মানুষের হৃদয়ের উত্তাপও ছড়াবে।

আমরা গুঁড়ি থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করলাম। তিনি বলেছিলেন, তোমাদের সাথে আমি বসব না। আমার গুঁড়ি আছে। তবে তোমরা বসতে পার। আমরা জনা কয়েক তাঁর বৈঠকখানায় সপ্তাহের একটি বিকাল নিলাম–বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নিলাম। প্রথম প্রথম তার স্বভাবসুলভ কটুকাটব্য সইতে হল। দু'এক বৈঠক পর চা নাস্তাটা নিয়মিত হল। একটা ছোট মেয়ে ছিল। মেয়েটা ভাল। স্যার বাসায় না থাকলেও আমাদেরকে পানি ও চা-নাস্তা খাওয়াত। কয়েক সপ্তাহ পরে স্যার আমাদের সঙ্গে বসলেন। তোমাদেরকে অপমান করার ইচ্ছা আমার নেই। সপ্তাহে এক সন্ধ্যায় গুঁড়িতে যাব না। ফল খারাপ হল। গুঁড়ি তাকে ছাড়ল। তিনি হন্টন কর্ম শুরু করলেন। আগেও হাঁটতেন। এখন হাঁটার সময়টা বাড়ল। তার সেই বসা ও হাঁটার সময়ে আমরা পেছনবান্দারা যা শুনতাম, যা বলতাম তা থেকে তদানীন্তন সমাজ ও রাজনীতির তাজা চেহারা যেভাবে ফুটে উঠত তার সামান্য ভাববাচ্য নিচে পেশ করা হল।

–জিয়া মরবে, মরবেই তো। যারা মেরে আসে, তারা মরে। মেরেছ তো মরেছ।

–জিয়াই মেরেছে, এমন কথা বলেন কেন? প্রমাণ আছে?

–প্রমাণ লাগে না। বোঝাই যায়। বেনিফিসিয়ারি কে? সে রাজাকার-আলবদরদের পুনর্বাসিত করেছে। আমি জিয়াকে পছন্দ করিনে। শাহ আজিজকে চেন? তোমরা চেন না। সে কোলাবরেটর।

–আপনিও রাজাকার। কোথায় ছিলেন সেই সময়ে?

–পালিয়ে ছিলাম, জীবন রক্ষার্থে যা করতে হয় করেছি। রাজাকার-আলবদর হইনি। আওয়ামী লীগও করি নি। আমি আহমদ শরীফ, আমি আমিই। বাঁচলেও শরীফ,

মরলেও শরীফ। দালালি করার কথা কে বলে, কোন হারামজাদা বলে। আমাকে দিয়ে পাকিস্তানের সপক্ষে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে কেউ বক্তৃতা-বিবৃতি দেওয়াতে পারে নি।

–আপনি আওয়ামী লীগ না বলেন কেন, আপনি তো বাকশালে জয়েন করেছিলেন।

–মিছে কথা। আমি আর দুতিন জন ছাড়া আর সবাই করেছে। তোমরা করেছ। তোমাদের দোষ দেই না। অবস্থা এমন ছিল যে, বাকশালে যোগদান না করে বাঁচা দায় ছিল। সবাইকে মেরে ফেলতো। আওয়ামী লীগ বিশালাকার স্বৈরতন্ত্রী হয়ে যাচ্ছিল।

–সবাইকে মেরে ফেলত, একথাটা ঠিক না। আপনি তো বলছেন জয়েন করেননি। আপনাকে তো মেরে ফেলেনি।

ঠিকই বলছো আমাকে মারত না। আমি ভয়ের কথা, যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়েছিল তার কথা বললাম। সে সময় এ রকম আতঙ্ক সৃষ্টি করা–।

–কখনও বলেন বাকশাল ভালো ছিল, আবার বলেন বাকশাল স্বৈরতন্ত্রী?

–বলিই তো। আমার কথার মর্ম তোমরা বোঝ না। একটা কথা আছে, গণনা হক, করনেওয়ালা কাফের। বাকশাল–সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম হলে তো ভালই। আওয়ামী লীগ কমুনিস্ট হল কবে রে। এরা পুরোপুরি মোসলমান। কমিউনিস্ট হলে কাফের হয়ে যাবে না? এরা মূলত বুর্জোয়া। তোমরা বল না? বদরুদ্দীন উমর বলে, উঠতি বুর্জোয়া, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের এজেন্ট। আমিও তাই বলি। এজেন্টই তো। এদের স্বাধীন কোন পররাষ্ট্রনীতি আছে? পারবে চীন পাকিস্তানের সাথে সুসম্পর্ক করতে? পারবে না। করতে চায় না।

–ঘৃণা আছে না, সেই জন্য।

–না নেই। তোমরা পার। তোমাদের ঐতিহ্য নেই।

–ঐতিহ্য থাকে নাকি?

–থাকে। তোমরা জান না। রাজপুত রমণীরা সুন্দরী রানীরা রাজকন্যারা লজ্জা শরমের ঐতিহ্য ধারণ করে মর্যাদা রক্ষার জন্য আত্মহত্যা করত। তাদের আভিজাত্যের ঐতিহ্য আছে।

–আপনি মোসলমান নাকি?

–কথা বলো না। একটা উদাহরণ দিলাম। কথাটা কিন্তু সত্য। কখনো কখনো ঐতিহ্য মানুষকে পথ দেখায়।

–সম্পর্ক ভাল করার জন্য পাকিস্তানে গিয়েছিল। ঐ যে বললেন না, স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি। সে জন্যে।

–বাজে কথা বলো না। যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলো না। স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির বিষয় নয়। এটা হচ্ছে বেরাদারানে এছলাম। মুসলিম ভ্রাতৃত্ব। মোসলমানেরা একাত্রিত না হলে বাঁচবে না। বিশ্বব্যাপী মোসলমানদের উপর আক্রমণ আছে। কয়েকটা ক্রুসেড হয়েছে। সবই মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।

–মধ্যপ্রাচ্য দখলের লড়াই বলা যায় না?

–না যায় না। ভূমি দখলের লড়াই হলে, করতে চাইলে ভারতকে, চীন দখল করতে পারত। এ দিকে তারা আসেনি। মরুভূমিতে কোন সম্পদই ছিল না। তবু আক্রমণ। কেন? মুসলমানদের বিকাশ বল, আগ্রাসন বল, রোধকল্পে যুদ্ধ। পারলে সমূলে ধ্বংস

করা। এটাই ছিল ক্রুসেডের উদ্দেশ্য। ঘটনাও তাই। মুসলমানদের আগ্রাসী ভূমিকা থমকে দাঁড়ায়। ক্রুসেড না হলে ইউরোপ মুসলমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হত। সবটা না হলেও অন্তত অবৈধ বাসিন্দা জনসংখ্যা মুসলমান অর্ধেক। স্বেচ্ছায় হত না। জোর করে খতনা দিয়ে দিত।

—যা ইচ্ছা তাই বলেন না। জোর করে মুসলমান করার জন্য খতনা দেয়ার ঘটনা মোঘল আমলে আছে।

—না নেই। খতনা যে দিতেই হত না। তোমরা জান না। খ্রিস্টানরা আগে থেকেই খতনা দেয়। তাই জোর জবরদস্তি করে খতনা দেয়ার দরকার হত না। তোমাদের জন্যই জোর জবরদস্তি দরকার হয়। তোমরা মুসলমানরা খতনা দিতে না। তোমাদেরকেই জোর করে কাঠমোল্লারা খতনা দিয়ে দিত। দু'দিন আগেও বাঙালি হিন্দু মুসলমান একাকার ছিল। তা ছাড়া তোমরা কি এদেশে মুসলমান শাসন না হলে মুসলমান হতে?

—তার আগেই বাঙালিরা বৌদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। নাজমুল করিম বলেছেন, নিম্নবর্ণের হিন্দু নয়, বৌদ্ধ থেকে বাঙালিরা মুসলমান হয়েছে।

—নাজমুল করিম অথেন্টিক নন। কিছুটা ঠিক হলেও পুরোটা না। বৌদ্ধ সভ্যতা সারা বাংলায় ব্যাপ্ত ছিল না। মাত্র কয়েকটি স্থানে। বাকি সব হিন্দু।

পোদ চাড়াল এই সব হিন্দু। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মোসলমান হত না।

হত। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মোসলমান হলে খান সৈয়দ উপাধি পেত, মাওলানা আকরাম খাঁর পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিল। উচ্চবর্ণের, কথা সেটা না। কথা হচ্ছে, বাঙালিরা বেশির ভাগ বৌদ্ধ ছিল। ছিল, এটা এক অর্থে ঠিক। তবে ক্ষমতা রাখতে পারত না। পারেও নি। হিন্দুরা শক্তির উপাসনা করে। তারা যুদ্ধ শিখত। তোমরা বুদ্ধুরা ভিক্ষা করতে। ভিক্ষাং শরনং গচ্ছামী। ভিক্ষা করে রাজ্য রাখা যায় না। স্বাধীনতা রাখা যায় না। মুসলমান শাসকরা এদেশে বর্ণ হিন্দুদের হাত থেকে তোমাদের বাঁচিয়েছে। ক্ষতিও করেছে। যা নেই কোরানে তা নেই ভুবনে, আওয়াজ দিয়ে বিজ্ঞানবিচ্যুতি ঘটিয়েছে। তবু, বর্ণহিন্দুর অত্যাচার থেকে ত বাঁচিয়েছে। এখন যেমন তোমরা হিন্দুদের উপর অত্যাচার কর, তেমনি।

—মিছে কথা। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা নেই। ভারতের তুলনায় খুবই কম।

—সাম্প্রদায়িকতা কংগ্রেসের মুসলিম লীগের সৃষ্টি। এখন এগুলি অচল।

—পারসেন্টেজ ধরেন। কলকাতায় কতজন মুসলমান সরকারী চাকরী করে? বাংলাদেশে কতজন? শতকরা কত, হিসেব করেন? বাংলাদেশে সে অর্থে সাম্প্রদায়িকতা নেই। শুনেছেন কখনো, হিন্দুস্থানে মোসলমান সেক্রেটারী, বাংলাদেশে আছে।

—আছে তো কি হয়েছে? ভয়ে তোমরা তোয়াজ কর। তোমরা উপজাতীয়দের উপর অত্যাচার করছ। তাদের অধিকার বঞ্চিত করছ। এটাও সাম্প্রদায়িকতা।

—হাসিনা দুয়ার খুলছে। এবার মনে হয় কাজ হবে।

—রাখ তোমার হাসিনা। ভারত তোমার বন্ধু দেশ। চুক্তি আছে। তারপরও সেখানে বসে উপজাতীয়রা সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।

—কেন হাসিনা শান্তিচুক্তি করছে।

—করুক, কোন লাভ হবে না। তাদের অসন্তোষ থাকবেই। উপজাতীয়রা তোমাদের মত অধিকার কখনই ভোগ করতে পারবে না।

—চলে আসুক এখানে। সমতলে, পাহাড় ছেড়ে।

—কেন আসবে? তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ছেড়ে। সেটা তো বনপাহাড়ী, অসভ্যতা। তারা বোঝে না। রাষ্ট্রের দায়িত্ব আছে। শিশু যদি টিকা দিতে নাও চায়, মা বাবা জোর করে হলেও টিকা দেয়। প্রকৃত কল্যাণ সবাই সমানভাবে বুঝবে, তা কি হয়? সক্রেটিস বলেছেন, প্রকৃত কল্যাণ খালি চোখে দেখা যায় না।

—খুব যায়। বড় বড় বিল্ডিং উঠলে দেখা যায়। যমুনা ব্রীজ খালি চোখে দেখা যায়। কল্যাণ গোপন রাখে কালো বাজারিরা, মুনাফাখোরেরা। তোমরা সম্পত্তির সঠিক হিসাব দাও? দাও না। তোমাদের আপন কল্যাণ গোপন রাখ। যদি উপজাতীয়দের উন্নতি চাও, সেখানেই তাদের জন্য কিছু কর।

—খুবই ব্যয় বহুল হবে।

—হোক না ব্যয়বহুল। কল্যাণ করতে চাইলে সেখানেই করতে হবে। তোমরা, কৈবর্ত্যদের সাথে তারা মিশবে কেন?

—এভাবে ভেদজ্ঞান করলে মানুষের অবমাননা করা হয়।

—ভেদজ্ঞান হবেই। উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ভাগ করবা না? তোমরা তো জানো না। ব্যক্তি সমাজের সৃষ্টি এমনি সব কথা বল। আমি মানিনে। আমার লেখাতেও আছে। সমাজের কালের শ্রেণীর উর্ধে উঠতে পারে ব্যক্তি। সেই ব্যক্তিই সমাজকে পরিবর্তন করে। মার্কস লেনিন মাও সেতুং একজনই। হাজারটা নয়। পারলে স্বাধীন হতে? সেই তো শেখ মুজিবকে লাগল। উৎকৃষ্ট ব্যক্তিকে সম্মান করতে শেখ। তাকে মর্যাদা দাও। জাতি উন্নত হবে। মূলত তোমরা পরশ্রী কাতর। অন্যের উন্নতি দেখতে পারো না।

—এগুলি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অপব্যাখ্যা।

—না—অপব্যাখ্যা নয়।

তোমাদের বুলি কপচানো রাখ। ঐ সব শব্দগুলো পকেটে পুরে রাখ। ওগুলি দিয়ে আর কোন কাজ হবে না। পারলে তোমরা—কমিউনিস্টরা কি করেছ? লেজুড় বৃত্তি করেছ।

—প্রমাণ আছে?

—আছে।

যারা ভারতে গিয়েছিলে তারা স্বাধীন কোন কার্যক্রম হাতে নিতে পারে নি। আওয়ামী লীগের লেজুড় বৃত্তি করেছ। তারও আগে তোমরা সিপিবিরা আয়ুব খানের দালালি করেছ। দেশ আয়ুব খানের বিরুদ্ধে, তোমরা সমর্থন করেছ। তোমরা জিয়াউর রহমানকেও সমর্থন করেছ।

—শুধু খাল কাটার কাজে।

—খাল কাটানো, খাল চাঁচা। কোনো খালই কাটোনি। কাটলে দু'দিনে বুঁজে যেত না। কোথায় খাল আছে? আমাকে একটা দেখাও। তাহলে এত গম টাকা গেল কোথায়? খালে। খালেই গিয়েছে। বুঝতে পারছি। সেই গমেই খালগুলি বুঁজে গিয়েছে। তোমরা কিছুই বোঝো না। একেবারেই মুর্খ। জিয়া টাকা দিয়ে বামপন্থীদের কিনেছে। টাকা তার

জন্য কোনো সমস্যা ছিল না। টাকা দিয়ে প্রেসিডেন্ট ক্যান্ডিডেট যোগাড় করেছে। তোমাদের তোহা ভোটে দাঁড়িয়েছিল। আর দাঁড়িয়েছিল সবুর খান।

—সবুর খান নিজের ইচ্ছেতেও দাঁড়াতে পারত।

—না পারত না। সবুরের সে দিন আর নেই। তার মার্যাদা জ্ঞান আছে। নিশ্চিত পরাজয় জেনে সে ভোটে দাঁড়াবে না।

—এ টাকার খেলা। তোমরা বোঝো না। আচ্ছা দাঁড়াল সবুর খান। বামপন্থীরা কেন? জিয়াকে মদদ দেয়া ছাড়া তাদের কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? ভোটে জিতবে? তোমরা সর্বসাকুল্যে হাজার জন হবে কিনা দেখ। লক্ষ কোটির কাছে এ কিছুই না। ভোটে সমাজতন্ত্র হয় না। সমাজে কাঙ্খিত পরিবর্তন আসে না। বিপ্লবে হয়। সশস্ত্র বিপ্লবে হয়। তোমরা সে পথ ছেড়ে জিয়ার সাথে ভোট ভোট খেলা করেছ। কেন? তোমাদের উদ্দেশ্য কি? জনগণের সাথে চালাকি কোরো না। পরিণামে তোমরাই ঠকবে। ঠকবেই বা বলি কেন? তোমাদের আছেই বা কি, হারাবেই বা কি?

—আপনার অবস্থান কোথায় তা কি বুঝতে পারছেন। আপনি জিয়া বিরোধী, আবার বামপন্থী বিরোধী, জামাতেরও বিরোধিতা করছেন। তাহলে দাঁড়াচ্ছেন কোথায়? আওয়ামী লীগের কাতারে।

—না আমি তোমাদের মত সুবিধাবাদী নই। আওয়ামী-বাকশলীদের আমি কোনো দিন নির্বিচারে সমর্থন করি নি।

—আপনি ৭৩-এর সংবিধান পুনঃপ্রবর্তনের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। আওয়ামী লীগের সাথে আপনার এ বিষয়ে মিল আছে। ৭৩-এর সংবিধান শেখ মুজিবের সৃষ্টি।

—না, আমার অবস্থান ছিল খুবই স্পষ্ট। ৭৩-এর সংবিধান ছিল চার মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তোমরা পরে এছলামী করেছ। একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানকে তোমরা নষ্ট করেছ। প্রথমে শেখ মুজিব নিজেই নিজের সংবিধানকে প্রেসিডেন্সিয়াল করেছে। তারপর বাকশাল করেছে। তারপর জিয়া এসে ধর্মনিরপেক্ষতাকে আঘাত করেছে। ইসলামী সংবিধান বানানোর চেষ্টা করেছে। আমি এর বিরোধিতা করেছি। আমি মনে করি ৭৩-এর সংবিধান এর চেয়ে অনেক ভালো।

—বাকশালে সমাজতন্ত্র ছিল।

—ছিল না। কূটতর্ক কোরো না। বাকশাল একদলীয় আওয়ামী লীগ সরকার। সমাজতন্ত্রী নয়। আওয়ামী লীগের কমিউনিস্ট ক্যাডার নেই। এরা কেউই ক্যাডার না। ক্যাডার ছাড়া, আচ্ছা কমিউনিস্ট ছাড়া একদলীয় সমাজতন্ত্রী সরকার গণতন্ত্রী কল্যাণমুখী হয় না। শেখ মুজিবর তোমাদের বঙ্গবন্ধু নিজেও সমাজতন্ত্রী ছিল না। কোলকাতায় সমাজতন্ত্রী আন্দোলনে সে যোগদান করে নি। ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ছিল কারো কারো সাথে। কিন্তু পার্টিতে যোগদান করে নি। তার মুসলিম ছাত্র সংগঠন থেকে উত্থান। কোনো দিনই সে সমাজতন্ত্রীদের পক্ষে একটা কথাও বলে নি। হঠাৎ করে সমাজতন্ত্রী হলেই হল? এভাবে সমাজতন্ত্রী হওয়া যায় না। বাকশাল পুরোপুরি ফাঁকা বুলি। তোমরা যে কও বাকশালী স্বৈরতন্ত্র, আসলেই তাই। তোমরা বল, জামাতরাও বলে। জাসদেরাও বলে। সেই সময়েই বলেছে। ওসমানী পদত্যাগ পর্যন্ত করেছে।

বাপের বেটা একখান। ঐ ভেড়োটা আতাউর রহমান লেজ নাড়িয়ে নাড়িয়ে বাকশালে সেবা দিয়েছে। সে সারা জীবনই ঐ রকম।

—না সারা জীবন ঐ রকম নয়। এখন হয়েছে। দল নেই তো। একদম একা। করবেটা কি? তাই আওয়ামী লীগের সাথে দ্বন্দ্বে যাওয়া ঠিক মনে করে নি। দেখলে না, জিয়ার দালালি করল। শেষ ইজ্জতটাও ধুলায় মিশিয়ে দিল।

—বেতন পাবে তো, তাই।

—ওর বেতনের দরকার নেই। তার অভাব নেই। মন্ত্রী হওয়ার সখ। আগে থেকেই। গদীর লোভ বড় লোভ। তোমরাও বাকশালে যোগ দিয়েছিলে। কেন? গদীর লোভে। মন্ত্রী হওয়ার খায়েশ হয়েছিল তাই। ভোটে ওরা কখনই জিততে পারবে না। একজনও এম. পি. হয়ে আসতে পারত না। শেখ মুজিবের পিছু পিছু মন্ত্রী হওয়ার খায়েশ।

—না—মনে হয়। আদর্শ ভিত্তিক ঐক্য।

রাখ তোমার আদর্শ। কোথায় তোমাদের আদর্শ। সমাজতন্ত্র ছেড়ে এখন গণতান্ত্রিক টুপি মাথায় দিয়েছ। মসজিদে গিয়ে মাথা ঠোকাঠুকি করছ। মনিসিংহের বাড়ি ভাগাভাগি করে নিয়ে রাজনীতি করছ। তোমাদের আদর্শ আমাদের জানা আছে।

—সবাই তো না। কেউ কেউ।

—সবাই-ই। তোহা প্রকাশ্যে মাফ চেয়েছে। বলেছে, গলা কেটে ভুল করেছি। তারপর ভোটে দাঁড়িয়েছে। সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী কৌশল এটা নয়। এটা আদর্শ চ্যুতি। তোমরা সবাই না বুঝে সমাজতন্ত্র করতে গিয়েছিলে। এখন মার খেয়ে বাবা বাবা ডাক ছাড়ছ। কেউ আওয়ামী লীগে, কেউ বিএনপিতে, কেউ জাতীয় পার্টিতে, কেউ জামাতে যোগ দিয়েছ। তোমাদের কোনো আদর্শই নেই। আদর্শের বুলি কপচিয়ো না। তোমরা দারুণ সুবিধাবাদী।

—না-না সবাই নয়। ভালও আছে। আপনার সামনেও কতজন আছে দেখতে পাচ্ছেন না।

—একা একা কমিউনিস্ট হওয়া যায় না। তাহলে তো আমিই বড় কমিউনিস্ট। আসলে তা নয়। সমাজতন্ত্র একটি আদর্শ অর্থনৈতিক জীবন ব্যবস্থার অনুশীলন। একা একা নাস্তিক হওয়া যায়। কম্যুনিস্ট হওয়া যায় না। এ জন্য দল লাগে। আন্দোলন লাগে। সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া, পার্টি ছাড়া সমাজতন্ত্র কোথায় হয়েছে?

—এখন হচ্ছে। ইউরোপে সমাজতন্ত্রীরা ক্ষমতায় যাচ্ছে। জ্যোতি বসু ভোটে জিতেছে। সমাজতন্ত্রী সরকার গঠন করেছে।

—সমাজতন্ত্রী নয়। ধনতন্ত্রীদের ভিতরে আবার সমাজতন্ত্র কি রে? ভোটে জিতেছে, তা বলতে পারো। এন্টি কমিউনিস্টরা তাকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। সমাজতন্ত্রের কি করেছে?

—ভূমি সংস্কার করেছে।

—সমাজতন্ত্রের প্রথম শর্ত শ্রমিক মজদুর শোষিত হবে না। পশ্চিম বাংলায় শ্রমিক শোষিত হচ্ছে না? বিদেশীরা বাণিজ্য করছে। কতগুলি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী আছে জানো? শুনেছি কোলকাতায় ওষুধ কোম্পানী সবই বহুজাতিক। শুধু ওষুধ নয়। আরো আছে। এ সমাজতন্ত্র নয়। সমাজতন্ত্র ঠেকানোর কৌশল। জ্যোতিবসু সমাজতন্ত্রী হলে

কংগ্রেস ওকে সোজা করে দিত। দেয়নি চারু মজুমদারকে? সে ছিল সাচ্চা কমিউনিস্ট। তার ভয়ে তোমরা থরহরি কম্পমান ছিলে। তোমরা আদর্শহীন কমিউনিস্টরাই তাকে মেরেছ।

—আসলে আপনি কি বোঝা যায় না। মাঝে মাঝে বলেন, জ্যোতি বসু ভালই করছে। কংগ্রেসকে শিক্ষা দিচ্ছে। আবার বলেন, কংগ্রেসের দালালি করছে। আসলে আপনি সবারই কমবেশি সমালোচক। আপনি ডানপন্থী, বামপন্থী, মৌলবাদীদের সব সময়েই সমালোচনা করেন। দীর্ঘ সময় ধরে বিএনপি, জাতীয় দলের সমালোচনা করেছেন। প্রায় দু'যুগ ধরে। প্রকারান্তরে এই দীর্ঘ সময় ধরে আপনি আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেছেন। আবার এখন আওয়ামী লীগের দালাল ভাববে লোকে তাই আওয়ামী লীগকে সমালোচনা করছেন। এই তো সেদিনও আপনি খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে শেখ হাসিনাকে সমর্থন করেছেন। আপনি ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি করেছেন। আওয়ামী লীগের ছত্রছায়ায় হাইকোর্টে মামলা জেতার চেষ্টা করেছেন।

—না, কখনো নয়। এটা যে বড় মিথ্যেবাদী রে! আমি কখনো আওয়ামী লীগের কাছে যাইনি। আওয়ামী লীগই আমার কাছে এসেছে। খুনীদের বিচার কাজে স্বাধীনতার পক্ষের সকল শক্তিই এসেছে। আওয়ামী লীগও এসেছে। দল যত ভারী হয় ততই ভালো। আওয়ামী লীগ সেদিন আমাদেরকে সমর্থন দিয়েছে। এখন প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

—সেটা কৌশলগত কারণে। একজন নাস্তিককে নিয়ে মাতামাতি করলে আওয়ামী লীগের দলীয় স্বার্থের রাজনীতি দুর্বল করে দিতে পারে। সাধারণ মানুষ ধর্মভীরু। আওয়ামী লীগ তাদের সমর্থন চায়।

—আওয়ামী লীগ তো নাস্তিক নয়। তার ধর্ম সে পালন করলে দোষ কি? তাছাড়া মরলে কি করবেন। জানাজা হবে না?

—না—আমার জানাজা হবে না। বলে দিয়েছি। আমার ছেলে মেয়েরাও তাতে সম্মতি দিয়েছে। তোমাদের জানাজা হবে।

—সেটাইত বলছি। আওয়ামী লীগ নাস্তিক নয়। ধর্মনিরপেক্ষতা আর নাস্তিকতা এক জিনিস নয়। তাই হাসিনা ধর্মকর্ম করে। দোষ কি?

—দোষ আছে। এটা বাংলাদেশ।

—শেখ মুজিব ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বানিয়েছিল। এক মুজিবের এক ঘোষণায়। কারোর সাহস হয়নি মাথা তুলে কথা বলে। এখন জনমতের কথা বলা হচ্ছে। তখনত জনমত লাগেনি। বুকের পাটা লাগে। হাসিনার তো পারা উচিত। সে পারছে না কেন? বাংলাদেশ হিন্দুর, মুসলমানের, খ্রিস্টানের, উপজাতির কারোর একার নয়। সবারই । এই বোধ, বর্তমান সংবিধান দেখলে মনে হয় না। সে আওয়ামী লীগের মন বুঝে চলে। আওয়ামী লীগে প্রায় সবাই হাজী। নিয়মিত নামাজও পড়ে।

—হাসিনা একা করবেটা কি?

—তাই বলে মদদ দেবে? এটা ঠিক না। আর জানাজার কথা বলছ? আওয়ামী লীগের জানাজা এত তাড়াতাড়ি পড় না। এখনও বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ থাকবে। তোমরা তৃতীয় শক্তি আসতে পারবে না। মৌলবাদীদের ঠেকাতে এখনও আওয়ামী লীগের দরকার আছে।

—আওয়ামী লীগ নিজেই মৌলবাদকে মদদ দিচ্ছে। অনেকেই মনে করে মৌলবাদকে ঠেকানোর জন্য আওয়ামী লীগের প্রয়োজন বলেই আওয়ামী লীগ নিজের অস্তিত্বের জন্য মৌলবাদকে বাঁচিয়ে রাখে।

—না-সে অর্থে নয়। কোনো অর্থেই নয়। আওয়ামী লীগ মৌলবাদী নয়, মৌলবাদকে সমর্থনও করে না। তোমরা জোর করে বললে তো হবে না। মৌলবাদকে বিরোধীতা করেই আওয়ামী লীগের শুরু। মুসলীম আওয়ামী লীগ না কি আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ হয়েছে। তোমরা ইতিহাস জানো না।

—না জানলাম। আওয়ামী লীগ ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করে না? গোলাম আযমের সাথে আওয়ামী নেতা গোপনে দেখা করেছিল। তাদের সাথে একত্রে মিছিল করেছিল।

—ওগুলো করতে হয়। বড় বড় রাজনীতিতে এমন ঘটনা ঘটে। এক অর্থে আওয়ামী লীগও ধর্মকে ব্যবহার করে। তবে ধর্ম ব্যবসায়ী নয়। আওয়ামী লীগের ধর্ম কর্মের সাথে মৌলবাদীদের ধর্মকর্মের পার্থক্য আছে। দ্য প্রিন্স পড় নি। ঐ রকম আর কি?

—তোমরা, তুমি আওয়ামী লীগকে সমর্থন কর কেন? আমার কারণ আলাদা।

—তৃতীয় বিশ্বে জাতীয় বুর্জোয়ারা প্রগতিশীল হতে পারে। লুম্পেন বুর্জোয়ারা এক অর্থে দেশের শত্রু। সে দিক দিয়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে দেশপ্রেম কিছুটা আছে। এদের মধ্যে লুম্পেনিজম তুলনামূলকভাবে কম। প্রধানত পাতিসামন্ত ও ক্ষুদে বুর্জোয়ারা গ্রাম পর্যায়ের ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা দোকানদাররা, মধ্যস্বত্বভোগীরা আওয়ামী লীগার। শহরভিত্তিক বড় স্থাপনা এদের কম। সম্পদ লুণ্ঠন বা চুরি করলেও দেশেই থাকছে। দেশেই বিনিয়োগও করবে। জাতীয় বুর্জোয়ারা বিনিয়োগধর্মী এবং এটা ভাল। কোনো না কোনোভাবে সম্পদ দেশেই থাকছে। দেশেই বিনিয়োজিত হচ্ছে। হয় জমি কিনছে না হয় কারখানা করছে।

—কিছুই করছে না। এরা সবাই সমান লুম্পেন। দেশের সম্পদ পাচারে এরা সবাই এক। দেখো গিয়ে সবারই বিদেশে টাকা আছে। এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগ বিএনপি সবাই লুম্পেন। আর বিনিয়োগের কথা বলছ। এটা ঠিক নয়। ব্যাংক ঋণ নিয়ে এরা মেরে দেয়। ব্যক্তিগত ভোগে ব্যয় করে। কোনো শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠানে ব্যয় করে না। জনগণের টাকা তারা ভোগ করার কে?

—এদের মধ্যে আওয়ামীর চাইতে বিএনপি জাতীয় পার্টি বেশি।

—বেশি অন্য কারণে। অনেকদিন ক্ষমতায় না থাকায় তারা ঋণ পায়নি। ব্যাংকের টাকা বিএনপি জাতীয় পার্টিরাই নিয়েছে। সেই হিসাবে আওয়ামী লীগ কম ঋণখেলাপী। আর সবাই লুম্পেন। দেশ প্রেম বলছ? কারোরই দেশ প্রেম নেই।

—আওয়ামী লীগের তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠন আছে। তারা কারা। পেটি বুর্জোয়া, পাতি সামন্ত, উঠতি বুর্জোয়া-এরা সবাই আওয়ামী লীগ। না হলে আওয়ামী লীগ এত ভোট পেত না। আর পাকিস্তান ভাঙতো না। শ্রেণীগত দিক দিয়ে আওয়ামী লীগ জাতীয়তাবাদী। আর এরা সব লুম্পেন। আর্মি থেকে এদের উত্থান। রাজনীতির ঐতিহ্য বা শিক্ষা এদের নেই। আওয়ামী লীগ সে অর্থে একটু ভিন্ন।

–কোনো ভিন্নতা নেই। জিয়াউর রহমান কলকারকানা বিক্রি শুরু করে। এরশাদও সেই তালে তাল দিয়েছে। এখন আওয়ামী লীগও ন্যাশনালাইজড ইন্ডাস্ট্রি বিক্রি করছে। পার্থক্য কি? তোমরা চালাতে পার না। সেটা তোমাদের অদক্ষতা। কিন্তু বিক্রি কোনো সমাধান নয়। এগুলো বাজার অর্থনীতির কৌশল। কোনো অর্থনীতিই নয়। এ হচ্ছে অর্থনীতি ধ্বংস করার কৌশল। দেখো অচিরেই বাংলাদেশের কলকারখানা সব বন্ধ হয়ে যাবে। তোমরা অন্য জাতির দিকে হা করে চেয়ে থাকবে।

–তা হলেত শেখ মুজিবই ভাল। তিনি কলকারখানা বিক্রি করেননি।

–ভালই তো। তার এক ঘোষণায় সব ন্যাশনালাইজ হয়ে গেল। তোমরা পারতে না।

–আপনি অবশ্য শেখ মুজিবের ভক্ত। আপনি শ্রেষ্ঠ বাঙালির গল্প বলেছেন। এক রবীন্দ্রনাথ, দুই শেখ মুজিব।

–হ্যাঁ বলেছি। বলেছি এ জন্য যে, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপরিসরে বাঙালি জাতিকে পরিচিত করিয়েছেন। একটি মননশীল জাতি হিসেবে। কিন্তু পরাধীন। শেখ মুজিব স্বাধীন জাতি হিসেবে বাঙালিকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেছে। তোমরা কৈবর্ত্যের জাত এবারই প্রথম মাথা তুলে দাঁড়ালে। এজন্য আমি রবীন্দ্রনাথ আর শেখ মুজিবকে শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলেছি। অবদান সমগ্র জাতির। কৃতিত্ব সবারই। তবু অছিলা লাগে। তাই বলে আওয়ামী লীগকে নয়। আওয়ামী লীগের ভূমিকা আছে। নেতৃত্বে তারা ছিল। তবে সব ভূমিকাই তাদের নয়।

–আপনি গতকালও আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেছেন। খালেদা জিয়া আপনার বিরুদ্ধে কেস চালিয়েছে। আওয়ামী লীগ তো আর যাহোক কেস করেনি। তাছাড়া আওয়ামী লীগের প্রতি আপনার অন্যরকম দুর্বলতা আছে। শুনেছি ৭৫-এ সবাই বাকশালে জয়েন করলেও আপনার কাছে নাকি তারা যায়নি। বিশেষ সম্মান করে।

–বাজে কথা বলো না। আওয়ামী লীগ আমাকে কখনও সম্মান করে না। আসলে আমার সামনে তাদের আসার সাহস হয়নি। গামা আমার ছাত্র কি না। আমি স্বেচ্ছায় বাকশালে জয়েন করতে পারতাম। কিন্তু করিনি। তোমরা সবাই এখন বড় বড় কথা বল। সে সময় লেজ গুটিয়ে দস্তখত করেছিলে। ওসব কথা থাক। তোমরা কি মনে কর শেখ মুজিব ছাড়া স্বাধীনতা পেতে। শেখ মুজিবের নামেই হয়েছে। সারা দেশব্যাপী বুঝে হোক, না বুঝে হোক শেখ মুজিবকেই ভোট দিয়েছে। একটা কলাগাছকে দাঁড় করালেও জিতে যেত। তোমরাও তো ছিলে সেদিন। ন্যাপ তো ছিল। কয়জনের সমর্থন পেয়েছিলে। কামাল আতাতুর্ক যেমন হঠাৎ করে উঠে এল আনোয়ার পাশাকে ছাপিয়ে, শেখ মুজিবও তেমনি উঠে এল, ভাসানী বা অন্যদেরকে ছাড়িয়ে। এভাবেই ওঠে। যেমন নেপোলিয়ান অন্যান্য জেনারেলদেরকে ছাপিয়ে উঠে এসেছিল। ইতিহাসে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে। নেপোলিয়ান না আসলে ইউরোপে মধ্যযুগ আরো দীর্ঘস্থায়ী হত এবং এরাই কালের স্বাক্ষী হয়ে থাকে।

স্বরচিত

আমার কথা

আহমদ শরীফ

[ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১১ ফাল্গুন ১৩৯৪/২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ তারিখে অনুরাগীদের পক্ষ থেকে আয়োজিত গণসম্বর্ধনায় প্রদত্ত প্রতিভাষণ।—সম্পাদক]

আমি লিখি, আমার লেখা আছে, তাই আমি লেখক। কিন্তু সাহিত্যিক নই। আমি মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের ও সাহিত্যিকের পরিচায়ক। সে-তাৎপর্যে আমি সাহিত্যসেবী এবং সাহিত্যপাঠক। মধ্যযুগের বাঙলায় সব বিষয়ই পদ্যে রচিত। তাই লেখক মাত্রই কবি এবং লেখামাত্রই কাব্য। সে অর্থে কবি ও কাব্য ছিল আমার মুখ্য অনুশীলনের বিষয়।

জন্মাবধি কলমী পুথির [অমুদ্রিত অর্থে] ও বইপত্রের পরিবেষ্টনীর মধ্যে আমি লালিত। মধ্যযুগের পুথির প্রতি অনুরাগ উন্মেষিত হয়েছিল আমার অজ্ঞাতেই। চাকুরীগত প্রতিবেশও অনুকূল হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ পুথিগুলো সম্পাদিত করে প্রকাশনার ব্যবস্থা করে কৌতূহলী পাঠকের ও বিদ্বানদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এভাবে অবিচ্ছিন্ন সাহিত্যিক পরম্পরার সন্ধান পেয়ে দেশের মানুষ ঐতিহ্যগৌরবে গর্বিতও হয়েছে হয়তো। এ কাজে শ্রম ও সময় দিয়েছি বলে আমার নামও যে পুথির সঙ্গে জানা হয়ে যাবে স্বল্পসংখ্যক সমঝদারের, তা জানতাম। কিন্তু আপনাদের প্রিয়ও যে হব, তা ছিল অভাবিত।

সারা জীবন পিতৃব্য আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের অভীষ্টপূর্তি লক্ষ্যে পুথির কাজই করেছি। তার ফাঁকে ফাঁকে স্বদেশের মাটির ও মানুষের প্রতি নাগরিক হিসেবে নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে আগ্রহী হয়েছি। আমার ধারণা, মানুষকে তার আশৈশবলব্ধ শাস্ত্রিক, নৈতিক, পারিবারিক, সামাজিক, আচারিক আর ভৌতিক ও অলৌকিক বিশ্বাস সংস্কারের দুর্গ থেকে মুক্ত করা সম্ভব হলে এবং প্রলোভন অপ্রতিরোধ্য না হলে মানুষ সাধারণভাবে জ্ঞান-প্রজ্ঞা যুক্তি-বুদ্ধি বিবেকের অনুগত থাকবে তার ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে। এ বিশ্বাস বশেই মানুষের বিশ্বাস-সংস্কারের দুর্গে আমি ঘা দিই, আমার লেখায়। মানুষের নিত্যকার জীবনাচারের সব বিষয়েই জিজ্ঞাসা, সন্দেহ, সংশয় ও অবিশ্বাস জাগানোই আমার লক্ষ্য।

প্রচলিত নীতি-নিয়মে ও রীতি রেওয়াজে আস্থা ও নির্ভর রেখে যাঁরা নিরুপদ্রব ও নিস্তরঙ্গ মানস-জীবনে সুস্থ ও সুখী, তাঁরা আমার লেখাকে অকারণ মানস-উপদ্রব বলেই

জানেন। কেবল স্বল্পসংখ্যক জিজ্ঞাসু পাঠকই আমার লেখাগুলো উদারচিত্তে গ্রহণ করেন। অন্য অনেকের কাছে আমার লেখা অসহ্য। অন্যরা আমাকে সমর্থন না করলেও সহ্য করেন, কেউ কেউ উদাসীনও।

আজ আমাকে উপলক্ষ করে আপনাদের এ উপস্থিতি আমাকে নতুন করে আমার ও আমার লেখা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু করেছে। মানুষ কখনো ঘরে-বাইরে নিজের অবস্থান ও অবস্থা ঠিকভাবে বোঝে না। নিজের মনে নিজের ভাবচিন্তা কর্ম-আচরণের একটা মূল্যায়ন করে বটে, কিন্তু তা নির্বোধের স্বর্গরচনারই তুল্য। কেন না তা মানে মাপে-মাত্রায় কখনো লোকগ্রাহ্য হয় না।

আত্মীয়-বন্ধুর ও কাছের মানুষের, পড়শীর ও পরিচিতজনের চোখে আমি কি ও কেমন তাও জানতে পারিনি। কেননা তাদের কেউ কেউ ঘৃণায়-নিন্দায়-অবজ্ঞায়-বিদ্বেষে বিকৃত করে আমার পরিচয় বর্ণনা করে। আবার কেউ কেউ স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধা-সৌজন্যবশে মানে-মাপে-মাত্রায় আমার তিলসম গুণকে গুরু করে তুলে ধরেন অপরিচিতের সুমুখে। তাই আমি আমার পূর্ণাবয়বের যেমন, তেমনি মন মেজাজেরও স্বরূপ কখনো সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করতে পারি নি।

রোগ-শোক-দুঃখ-যন্ত্রণা-বিপদ-বেদনার মধ্যেও মানুষের যে বাঁচার এতো আগ্রহ, পৃথিবী যে তার এতো প্রিয়, সে তো তার ভালোবাসার জন আছে বলে, তার বিশ্বাস-ভরসা-নির্ভর করার মতো কিছু কাছের মানুষ রয়েছে বলে। নইলে সংসার মরুতে তার আশা-প্রত্যাশা পেত লোপ, বাঁচার আগ্রহ মিলাত শূন্যে। প্রীতি আনন্দ আকর্ষণরিক্ত নিরাশ্রয়ন আত্মবিনাশেই খুঁজত জীবনের অবসান।

জানতাম, আমারও কিছু আত্মীয় বন্ধু রয়েছেন এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কিন্তু আজ আপনাদের উদ্যোগে-আয়োজনে ও উপস্থিতিতে আমার সংবর্ধনার যে-সমারোহ দেখছি, তাতে আমি বুঝেছি যে আমারও আত্মীয়-বন্ধু-অনুরাগীর সংখ্যা কম নয়, যাঁরা আমার ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে তুষ্ট। এ-ও সত্য যে আমাদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আদর্শের সাযুজ্যই আমাদের মানস-ঐক্য সাধন করেছে; এবং সে-ঐক্যই আমাদের এখানে একত্র করেছে।

আমার প্রতি আপনাদের এ ভালোবাসার মূলে রয়েছে সেই নিঃস্ব নিপীড়িত শোষিত বঞ্চিত গণমানব, যাদের সংস্কারমুক্তির, আর্থিক মুক্তির, সামাজিক মর্যাদার ও রাষ্ট্রিক স্বাধিকারের কথা আমার লেখায় লঘু-গুরু-ভাবে পরিব্যক্ত হয়েছে। আমরা জানি ও মানি যে সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি সমাজবিপ্লবের জরুরি ও সহায়ক শক্তি। আমার বাকি জীবন ও আপনাদের চিন্তা-কর্ম আচরণ যেন দুস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকে, আমরা যেন অনক্ষরের, অবিদ্যার, নিঃস্বতার, বঞ্চনার, শোষণের, পীড়নের কবল থেকে গণমানবের মুক্তির সহায় হই। আমাদের চিন্তা-কর্ম-আদর্শ-আচরণ যেন মানুষের দেহ-মন-মননের সর্বপ্রকার শৃঙ্খলমুক্তির এবং আর্থিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিক জীবনে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতার, সহাবস্থানের ও সহযোগিতার অঙ্গীকারে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হবার প্রেরণা যোগায়। এক কথায়, আমাদের চিন্তা-কর্ম-আদর্শ সর্ব প্রকার মানবমুক্তির লক্ষ্যে নিয়োজিত থাকুক—এ মুহূর্তে এ কামনাই করি।

আমার সারাজীবনের চিন্তা-কর্ম যে বৃথা যায়নি, ব্যর্থ হয়নি, অনেকের যে নীরব সমর্থন ও অকপট সহযোগিতা ছিল, তার প্রমাণ আজ এখানে প্রত্যক্ষ করে আমি তৃপ্ত ও ধন্য।

আপনারা আমাকে ভালোবাসেন, আমার রচনার প্রতি আপনাদের অনুরাগ রয়েছে, আমার এ আনন্দের সীমা নেই। নেই আপনাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রাণের উষ্ণতা নিয়ে অনেকের হয়ে আগত শ্রী মনোরঞ্জন বিশ্বাস এ সংবর্ধনা সভার মূল্য-মর্যাদা বৃদ্ধি যে করেছেন, তাও কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করছি। আমি আপনাদের ভালোবাসায় ও সৌজন্যে মুগ্ধ ও ধন্য। আজকের আপনাদের এ অনুষ্ঠান আমার জীবনে প্রীতির পুঁজির স্মৃতির সঞ্চয়, প্রণোদনার উৎস এবং চলমান জীবনের পাথেয় হয়ে রইল।

পরিশেষে আমি আশা রাখব, আমি ভরসা রাখব, আজকের আপনাদের হৃদয়ের অনিঃশেষ দান। এই সংবর্ধনা, এই আয়োজন যেন সেই মূল্যই পায়, যাতে একটি মানুষও অনক্ষর না থাকে। একটি মানুষও আপন অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়। আমি সেই দিনের জন্যে অপেক্ষা করে থাকব, যেদিন একটি মানুষও কোনো মানুষের দাস হবে না। মানুষ যেন সকল রকম দহন পীড়ন দমন মালিন্যের মধ্যেও আপন মহিমায় অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে শেষদিন পর্যন্ত জাগ্রত থাকে।

এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার আগে আমি যেন চোখ মেলে চেয়ে দেখে যেতে পারি যে, এ দেশে, এ মাটিতে, এ রাষ্ট্রে স্বাধীনতা তার নিঃসংশয় সর্বশেষ সত্যমূল্য ফিরে পেয়েছে। এ বিশ্বাস রেখে সবাইকে আমার অভিনন্দন জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। জয় হোক গণমানবের।

জনসমাজের নীতি-নিয়মরিক্ততার কারণ

আহমদ শরীফ

[মৃত্যুর পূর্বে ২৩.২.৯৯ তারিখে দৈনিক আজকের কাগজে সর্বশেষ প্রকাশিত রচনা।—সম্পাদক]

ইতিহাসের সাক্ষ্যে বারবার দেখা গেছে যতোই মন্থরগতিতে হোক না কেনো সমাজজীবনে ও মননে ব্যক্তি-মগজপ্রসূত মনন-চিন্তনের অদৃশ্য প্রভাবে পরিবর্তন ঘটে। তা অবশ্য সহজে অনুভব করা যায় না। খুব সূক্ষ্মবুদ্ধির সচেতন মানুষের চোখে, মনে ও মর্মে ক্বচিৎ তা ধরা দেয় মাত্র। যেমন মাথায় আমাদের চুল বাড়ে, কিন্তু টের পাই না, হঠাৎ একদিন হাতে ও চোখে অনুভব করি যে, চুল বেড়ে গেছে। তখন আমরা ধৈর্য হারাই, সম্ভব হলে তখন তখনই নাপিতাশ্রিত হই। এও অনেকটা তেমনি অনুভব-উপলব্ধি। হঠাৎ যেনো অনেকের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচারে-আচরণে আমরা পরিবর্তন লক্ষ করি। তখন বুঝতে পারি এ হচ্ছে যুগান্ত লক্ষণ। দেশের, কালের ও প্রজন্মের নতুন চাহিদার প্রকাশ। একে ঠেকানো যায় না। এ কেবল বিকশিত হতে থাকে। কেবলই দেশময় ছড়াতে থাকে। এর কারণ বিভিন্ন। কখনো দারিদ্র্য, কখনো বিলাস-বিনোদনবাঞ্ছা। কখনো জীবন-জীবিকায় অধিকার চেতনা। কখনো সুখানন্দে আত্মরতি প্রেরণা। কখনো লোকহিতে লোকসেবায় আত্মোৎসর্গের তাগিদজাত হতে পারে। তবে যে কোনো অবস্থায় তা সমাজে উদ্ভূত সঙ্কট-সমস্যা-নতুন কাঁটা সম্পৃক্ত থাকে। মানুষ মাত্রই স্ব স্ব অবস্থায় ও অবস্থানে উচ্চাশী ও লিপ্সু। এর স্থূল রূপ হচ্ছে অর্থ-সম্পদ-ক্ষমতা ও সম্মানপ্রাপ্তি। এ জন্যে সাধ্যমতো করে না, করতে চায় না গা-পা বাঁচিয়ে হেন কর্ম-অপকর্ম নেই। কেউ কেউ শক্তি সাহস পুঁজি পাথেয় করে বিপদের ঝুঁকিও নেয়। কেউ কেউ ব্যক্তিগত সুখ-শান্তি-আনন্দ ভোগ উপভোগ সম্ভোগ বাঞ্ছা পরিহার করে প্রাণপণ করে পরার্থে গণমানবের স্বার্থে বিপন্ন জীবনের ঝুঁকি নেয়। কেউ মারতে গিয়ে মরেও। মরতে সদা প্রস্তুতও থাকে। এমনি স্বভাব-চরিত্রের ও শক্তি-সাহসের লোকরাই দেশের লোকের স্বাধীনতার জন্যে দরিদ্র সমাজের বিভিন্ন পেশার দীন-দুর্বল মানুষকে প্রবলের দমন-দলন-পীড়ন-শোষণ থেকে উদ্ধার করার জন্যে গেরিলা যুদ্ধ করে এবং সরকার দ্রোহী হয়ে সহ্য করে দেহে এবং প্রাণে-মনে নানা পীড়ন বঞ্চনার যন্ত্রণা।

আমাদের দেশে অন্তত আড়াই হাজার বছর ধরে সমাজে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা চালু রয়েছে, আজো তার পূর্ণ প্রতিকার হয়নি। কাজেই প্রবলমাত্রই প্রভুত্বকামী, দুর্বলের অনুরাগ, অনুগামিত্য ও আনুগত্য প্রত্যাশী। ফলে মানব সাক্ষ্যে অদৃশ্যভাবে প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিহিংসা, ঈর্ষা-অসূয়া-ঘৃণা-বিদ্বেষ চলছেই, চলবেই।

আগের কালে লোক অদৃষ্ট-নিয়তিবাদী ছিলো, ছিলো জন্মান্তরে ও কর্মফলে আস্থাবান। সে জন্যে ব্রাহ্মণ্যবাদিরা নিজেদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা ও তাদের প্রশ্রয় ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সহযোগীরা মানুষকে ঘরানা পেশায় অভেদ্য দুর্গে বন্দি রেখেছিলো বিগত আড়াই হাজার বছর ধরে। প্রজন্মক্রমে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ পেশায় নিবদ্ধ ছিলো বলে প্রজন্মক্রমে মানুষেরা জীবনে কখনো খাওয়া পরার সুখ-স্বাদ-মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতার উল্লাস অনুভব করতে পারে নি। কেবল গৃহপোষ্য প্রাণিদের স্তরেই রয়ে গেছে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ্যবাদিদের দাপটে শাসনে-দমনে দলনে পীড়নে শোষণে। মানুষের অধিকার পায় নি দেবতার কাছে, ঠাঁই পায় নি মন্দিরে, স্পর্শ করার অধিকার পায় নি উচ্চবর্ণের মানুষের পা-ও। ছায়াও তাদের ছিলো অপবিত্র। তারা ছিলো ম্লেচ্ছ পঞ্চাধম। এখন পৃথিবীর আকাশ অশেষ ও উন্মুক্ত হয়েছে তার বেতার যন্ত্রের প্রসাদে। এখন মানুষ মহাকাশের, মহাসমুদ্রের, মহাঅরণ্যের সন্ধান জানে, পৃথিবীর সবকিছু দেখে, শোনে, জানে ঘরে শুয়ে বসেই। তাই-এখন মুচি-মেথর-চাঁড়াল-চামার-কামার-কুমার-নাপিত-ধোপা-জেলে-জুলহা-হাড়ি-ডোম আর ঘরানায় পেশার দুর্গের দ্বার ভাঙছে। মানুষের জন্মগত শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করছে, প্রবলের দৌরাত্ম্যের প্রতিকার লক্ষ্যে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করছে। এখন গোটা দুনিয়ার সর্বত্র মানুষ গণমানব বাহ্যত ও কার্যত না হলেও মনে মনে অবশ্যই দ্রোহী। বঞ্চিত জীবনের সঞ্চিত ক্ষোভ-ক্রোধ এক সময়ে প্রলয়ংকর দ্রোহের আকারে গেরিলা যুদ্ধরূপে দেখা দেবেই। কেন না শীতকালীন ওষুধের মতো, এখন মার্কসবাদ দুনিয়ার সর্বত্র সুপ্ত ও গুপ্ত থাকলেও লুপ্ত হয় নি কোথাও। বাসন্তী হাওয়ায় আবার আকস্মিকভাবে জেগে উঠবে। কেন না মার্কসীয় তত্ত্বের আজো কোনো বিকল্প মেলেনি মানুষকে তাঁর জন্মগত অধিকার ভাতে-কাপড়ে সুপ্রতিষ্ঠ করার লক্ষ্যে। অনাহারে-অচিকিৎসায় অকালে মরবার জন্যে কেউ জন্মে না। অতএব যতোদিন সমাজে রাষ্ট্রে মানুষের আর্থিক বৈষম্য আসমান-জমিনের ব্যবধান ও বিচ্ছেদ জিইয়ে রাখবে, কেউ খাবে কেউ খাবে না অবস্থা বিরাজ করবে, মানুষের ন্যূনতম চাহিদা ভাতে-কাপড়ে-আবাসে-শিক্ষায়-স্বাস্থ্যে-চিকিৎসায় পূরণ না হবে, ততোদিন এখানে সেখানে অসন্তোষ বোমার মতো আকস্মিকভাবে বিস্ফোরিত হয়ে জনজীবনেও ঘটাবে বিপর্যয়। এ বিপর্যয় থেকে তৃতীয় বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রই মুক্ত থাকবে না। আগে থেকেই জনগণ হিতে ও জনগণ সেবায় সমাজ ও সরকার প্রয়োজনীয় ও ন্যায্য ব্যবস্থা, গ্রহণে যদি উদ্যোগী না হয়—নীতি আদর্শহীন প্রবলের, ধূর্তের, লিপ্সুর অনীতিজাত অন্যায় প্রতিরোধে জন্ম নেয়। Anomie (অ্যানোমি) তথা নিয়মশূন্যতা বা নীতি-নিয়ম রিক্ততা—কাড়াকাড়ি মারামারি হানাহানিই যার অবিকল্প পরিণাম। আজ আমাদের দেশে সমাজে ও রাষ্ট্রে এটাই চলছে।

কি? প্রয়োজনটা কি? ইংরেজি ভাষাই জানেনা, বাঙলাভাষাও জানে না। মন্ত্রীরা যখন এই যে রেডিও-টেলিভিশনে—মন্ত্রীরা আর আমলারা যখন বাঙলা ভাষাতে প্রশ্ন-উত্তর করে, কি কি করে? দেখি যে—উচ্চারণ তো নেই-ই, বাক্যও শুদ্ধ নেই [শ্রোতাদের হাসি]। কিন্তু কেউ তো লজ্জা বোধ করে না। বিদ্যা তো এরকমই। কাদের জন্য, ডিস্ এ্যান্টেনা দিয়ে পৃথিবীর কি? ভাষাতো—ইংরেজি জানেনা, উর্দু হিন্দি আর বাঙলা সিনেমা হলে বোঝে,—ভাসা-ভাসা, সবটা বোঝে না। কাদের জন্য? এই কয়জন? সারা দেশের মানুষ অশিক্ষিত, বারো কোটি মানুষের মধ্যে সাড়ে এগার কোটি মানুষ অশিক্ষিত। কিছু ধনীলোক শহরে বন্দরে আছে, তাদের জন্যে এই ব্যবস্থা সারা দেশের পক্ষ থেকে। যেন দেশ বলতে, জাত বলতে, মানুষ বলতে তারাই আছে—অন্যেরা কিছুই নেই। অন্যদের জানানোর, বোঝানোর, অন্যদের মতামত নেয়া, অন্যদের সুবিধে অসুবিধের কথা ভাবা কিছুই মনে করে না। এইটাকেই আমি বলেছিলাম—ওই যে একটা কথা আমাদের দেশে চালু আছে—গরিবের ঘোড়া রোগ। আরো একটা কথা আছে—যে, ভেতরে হচ্ছে ছুঁচোর কের্তন, বাইরে কোঁচার পত্তন। আমাদের সেই রকম দশা।

ভিক্ষাজীবী একটা দেশ, ভিক্ষাজীবী একটা জাতি, ভিক্ষাজীবী একটা সরকার—তার এই আস্ফালন কেন। তার আড়ম্বরের প্রয়োজন কেন? এই যে এই ডেকরেশন পিস—এর প্রয়োজন কি? তারা বাড়ি-ঘরে দুই একটা ম্যাগাজিন রাখে, দুই একটা বই রাখে—কোনোটা পড়ে না। কিন্তু ভাঁজ রাখে কথার। স্নব বলতে যা বোঝায়, স্নবারি বলতে যা বোঝা যায় তা হচ্ছে—আমাদের এই ঢাকা শহরের উঠতি বুর্জোয়া ঘরে, পুরো পাওয়া যায়। এটার জন্য আর অভিধান দেখতে হয় না।

তো কাজেই আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় রকমের হামলা তিন ভাষার। তিন রকমের শিক্ষাব্যবস্থা। এবং আমাদের এই যে রাজনৈতিক দলগুলো বাঙালি-বাঙালি করে। বাঙালি রাখবার জন্যে, বাঙালির গৌরব-গর্ব বোঝানোর জন্যে আমাদের সত্যি সত্যি বাঙলাদেশ এবং বাঙলা ভাষার প্রতি প্রীতি জাগানো, আর নিজেরা কিন্তু ইংরেজি ভাষাটা রেখে দিল। এত বড় অমানুষ না হলে স্বজাতিকে স্বদেশীকে জ্ঞাতিকে এই রকম প্রতারণা কেউ করে না। ফল দাঁড়িয়েছে কি? ক্লাস ওয়ান থেকে এম.এ. ক্লাস পর্যন্ত, এম.এসসি. ক্লাস পর্যন্ত সর্বত্র প্রশ্নোত্তরের ক্লাস—পরীক্ষা। কেউ, পুরো বই মাস্টারও পড়েন না, ছাত্রও পড়ে না। দেশে কোনো স্কলার নেই, বিদ্বান নেই। আমরা এরকম দুরবস্থার মধ্যে আছি। আমাদের মানসিক মনের, মননের, মনীষার কোনো ঠিকানা নেই। আমরা কতগুলো টবের গাছের মতো হয়েছি। টবের গাছের একটা দোষ হচ্ছে কি বা গুণই ধরতে পারেন—বেঁচে থাকে, বাড়ে না।

আমরাও—আমরাও পোশাকে-পরিচ্ছদে একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আত্মপরিচয় দিই। কিন্তু আমরা হলাম ভিক্ষাজীবী সমাজের লোক—আমরা হচ্ছি চৌর্যপ্রবণ লোকের জ্ঞাতি। আমাদের প্রতি দ্বিতীয় ব্যক্তিটি চোর, আমাদের সাংসদদের অধিকাংশ লোক দাগী, আমাদের মন্ত্রীর অধিকাংশ লোক দাগী [শ্রোতাদের তুমুল হাততালি]। কিন্তু আমরা কোনো লজ্জাও পাই না, লজ্জা দিইও না।

এই রকম অবস্থার মধ্যে, অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে আমরা বাস করছি জীবনের সর্বদিক দিয়ে। এই যে কিছুক্ষণ আগে আমাদের এই যে অধ্যাপিকা একটা ব্যাখ্যা করে

গেলেন, ব্যাখ্যাটি কিন্তু অপব্যাখ্যা—আমার বলতেই হচ্ছে, এইটা হলো ভারত আর বাঙলাদেশ, রাজনীতিকরা দুষ্টবুদ্ধি বশে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করবার জন্যে জানিয়েছিলেন।

সেক্যুলারিজম মানেই হচ্ছে সরকার, রাষ্ট্র এবং ভদ্রলোক—ধর্মের কোনো অস্তিত্ব স্বীকার করবে না। মানুষ ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম মানতে পারে—যেমন তাবিজ মানে, যেমন ঝাড়-ফুঁক মানে, যেমন পানি পড়া খায়—সেরকম করে যার যার ইচ্ছেমতো সে সে তার ভূত-প্রেত, দেও-দানো, আল্লাহ-ভগবান নিয়ে থাকবে, কিন্তু সামাজিকভাবে, রাষ্ট্রিকভাবে, সরকারিভাবে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোনো ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাবে না—তার নাম হচ্ছে সেক্যুলারিজম। সেক্যুলারিজম মানে সত্যি সত্যি ধর্মের অস্তিত্বহীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতাও নয়। এবং অন্যে যদি মানে তার উপরে ব্যক্তিগতভাবে মানবে, সে সামাজিকভাবে দাবি করলে সেটা স্বীকৃত হবে না। এই হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। এইটা বাহাত্তরে ভারত আর বাঙলাদেশ—মানুষকে বিভ্রান্ত করবার জন্যে—সরকারিভাবে অন্যরকম ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছিল। আমি আপনাদের বলছি, আপনারা এনসাইক্লোপিডিয়া দেখেন, অথবা—ইউরোপে তিন শো বছর লেগেছে সেক্যুলারিজমের কথা বলতে। অনেক মানুষ নিহত হয়েছে। অনেক মারামারি হয়েছে—সেখান থেকে—ডিভিনিটি থেকে হিউম্যানিটিস সাবজেক্ট-টাবজেক্ট এসেছে। এই হিউম্যানিটিস কথাটাই ডিভিনিটির against-এ এসেছে। এবং এখান থেকে সেক্যুলারিজমের শুরু। তিন শো বছর লেগেছে ইউরোপের ইতিহাসে। তার জন্যে অনেক মারামারিও হয়েছে।

আর একটা কথা, আমরা এখানে যেটা আলোচনা করতে চাচ্ছিলাম—নারী-স্বাধীনতা। নারী স্বাধীনতা দরকারই। আসলে নারী-স্বাধীনতা দিয়েই মনুষ্যজীবন শুরু হয়েছিল, যদি আপনারা ডারউইনের থিয়োরি মানেন। মানে নারীপ্রধান মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ছিল, যখন বিবাহ প্রথা ছিল না তখন নারীই প্রধান ছিলেন—এই মক্ষীরানীর মতোই ধরতে গেলে। কিন্তু সেটা টেকেনি। বেশিদিন টেকেনি। তার প্রমাণ পৃথিবীর যাবতীয় ভাষা পুরুষ বাচক। এবং পরবর্তীকালে নারীবাচক করেছে। নারী হচ্ছে মা, নারী হচ্ছে প্রিয়া, নারী হচ্ছে কন্যা। যে কোনো অবস্থাতে এই তিনটেই তো তার পরিচয়। এই তিনটের মধ্যে কোনোটাই নির্যাতনের কথা বলে না। কোনো সন্তান, সন্তানের কাছেই মার থেকে নির্ভরযোগ্য, মার থেকে প্রিয় আর কোনো নারী থাকতে পারে না। তেমনি একটা বিশেষ বয়সে অন্তত প্রিয়ার থেকে প্রিয়তর আর কিছু থাকতে পারে না। তেমনি কন্যা। কাজেই তারা পীড়নের সামগ্রী নয়, তারা নির্যাতনের প্রাণী নয়—তারা ভালবাসার, স্নেহের, মমতার, শ্রদ্ধার। সেইটে অন্য কারণে, একটা বিশেষ কারণ, সেই কারণ হচ্ছে—অনাদিকাল থেকে মানুষ এবং আমি দেখেছি, আশ্চর্য—কোরানে-বেদে-বাইবেলে সব জায়গাতেই আছে, নারীর যেন নিজের কোনো যৌনভোগ নেই, নারী হচ্ছে পুরুষভোগ্যা—এরকম একটা ধারণা থেকেই শুরু হয়েছে, সব কেতাবে একই রকম লেখা লেখে। এজন্যেই ঐ যে ভোগ্যবস্তু হিসেবে তাকে ধরে রাখা, পাহারা দেয়া, ধরে রাখা, যে কারণে হিন্দু সমাজে আট বছরের, নয় বছরের, বারো বছরের মধ্যে বিয়ে দিয়েই দেয়। যেন অনাঘ্রাতা-অস্পর্শিতা থাকে। এসব অনেক তর্ক-বিতর্কের ব্যাপার আছে।

কিন্তু সেইটা আমাদের নারীর মধ্যে সতীত্বের সংস্কারে হাজার বছর ধরে, দুহাজার বছর ধরে হয়ে গেছে। রামায়নের মূল কাহিনীই হচ্ছে যে রাবণ সীতাকে স্পর্শ করেছিল, কি করেনি–এই আঙুলের, কোন আঙুলের–এখানে করেছিল, এই পর্যন্ত কথাটা এসেছে, স্পর্শ করলেই সর্বনাশ হয়ে যায়।

এমন যে আমাদের শরৎচন্দ্র–এতগুলো উপন্যাস লিখলেন, তিনিও কোনো রকমে বুঝতেও পারলেন না, বুঝাতেও পারলেন না– নারীর সতীত্ব কোথায়? মনে না দেহে? তা আমাদের নারীরা নিজেরাই হীনমন্যতায় ভোগে। স্বামীরটা পাশে না বসালে, নামের পাশে না বসালে তার গৌরব হয় না নিজের নামের। স্বামীর নামে তিনি গরবিনী-গৌরবান্বিতা। এমনিতেই ঘরে সংসারে দেখা যায়, বুঝছ,–আমরা বদলি হয়েছি; আমার স্বামী বদলী হয়েছে বলে না। আমরা তো এখান থেকে চলে যাচ্ছি। আমরা বদলি হয়েছি চট্টগ্রাম [শ্রোতাদের হাসি]। আমি চল্লিশ বছর মাস্টারি করেছি, তার মধ্যে পঁয়ত্রিশ বছর নারী-পুরুষকে পড়িয়েছি। মানে কো-এডুকেশনে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়েছি। আগে সুবিধা পাইনি [শ্রোতাদের হাসি]। আমি প্রতি বছরে, সুযোগ পেলে প্রতিদিনই বলতে পারেন ক্লাসে এলেই আমি একটা কথা বলতাম যে, মুসলমানের মেয়েরা, কাবিননামা মানেই আত্মবিক্রয় করা, দেহ বিক্রয় করা। এটা ভারি অবমাননাকর। কাবিন নিতে নেই। কিন্তু কাউকে বোঝাতে পারি না। আমার সেই ছাত্রীই দেখেছি যে যত বড় লোকের মেয়ে সে তত লক্ষ টাকা তোলে [শ্রোতাদের হাসি], এখনও। তার আত্মসম্মানে লাগে না। স্বাধীনতা চায়, কাবিন নেয় [অনবরত হাসি শ্রোতাদের]। স্বাধীনতা চায়, স্বামীর নামে চলতে চায়, স্বাধীনতা চায়, সতীত্বে ওই যে– পুরুষ আরোপিত ধারা সেটা। পুরুষের যদি সততার দরকার না হয়, নারীরই বা সতীত্বের দরকার হবে কেন? সেই চ্যালেঞ্জ নারী এখনও দিতে সাহস পায় না। কাজেই তার মুক্তি নেই। মুক্তি তার ভেতর থেকে আসতে হবে। আর যে নির্যাতনের কথা বলে, সাধারণত নির্যাতন হয় না। আগে শাশুড়ী-ননদী করতো অল্প বয়সে বিয়ে হতো বলে। এখন, আগে একটা লজ্জার ব্যাপার ছিল। বড় লোকের খান্দান ঘরের, ধনী ঘরের সন্তান, অপদার্থ সন্তান ঐ আর একজনের কুল কিনতে হতো। সেই জন্যে তাকে ঐখানে–। সে নিজে রোজগার করে না, খাওয়া পরার ব্যবস্থা নেই, সে ঘরজামাই যেত। এই জন্যে ঘরজামাইয়ের একটা লজ্জা ছিল। রোজগার না করলে স্ত্রীর কাছে একটু ছোট থাকতে হয়। এখন দিন পরিবর্তন হয়েছে। এখন প্রতি পুরুষেই, বুদ্ধিমান পুরুষে, অবশ্য সে বুদ্ধি আমরা করতে পারিনি দুর্ভাগ্যবশত [শ্রোতাদের হাসি], প্রতি বুদ্ধিমান পুরুষই এখন ঘরজামাই যায়। আগে নারীরা রোজগার করতো না বলে শ্বশুরের টাকা দিয়ে খেত, এখন স্ত্রীর টাকা দিয়ে খায়। এবং স্ত্রীর টাকা না হলে কারো চলে না। কাজেই এখন ঘরজামাই যাওয়া হচ্ছে গৌরবের গর্বের, বুদ্ধিমত্তার। কাজেই–এবং সেই সূত্রে যে নারী রোজগার করে তার স্বামীর সাধ্য নেই তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। যে নারী শিক্ষিতা, রোজগার করে, তার সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করতে হয়। সংস্কৃতে একটা কথা আছে–ছেলে সন্তানের বয়স যখন ষোল বছর হয় তখন তার সঙ্গে মিত্রের মতো ব্যবহার করতে হয়। আমাদের দেশেও, নারী যদি যে কোনভাবে বড় লোকের ঘরে, ছোটলোকের ঘরে, শাশুড়ীর ঘরে ...[ক্যাসেট নেই]।

নারী স্বাধীনতা একটা বড় সমস্যা নয়। সমস্যাটা হচ্ছে সমাজ পরিবর্তন। সমাজ পরিবর্তন করলেই নারী স্বাধীনতা এসে যাবে। এবং যে নারী একবার স্বাধীন হয়, প্রবল, যে নারী, ধরেন, খালেদা জিয়ার মতো, যে নারী হাসিনার মতো, যে নারী আমাদের জাহানারা ইমামের মতো, বা রানী ভবানীর মতো, ইন্দিরা গান্ধীর মতো–সে নারীকে স্বামী কাবু করতে পারে? [শ্রোতাদের অট্টহাসি]। কাজেই নারী–আবুল কাসেম ফজলুল হক সাহেব যেটা বলতে চাচ্ছিলেন সেটা হচ্ছে–নারী স্বাধীনতার কথা নয়। নারীবাদের কথা। এটা এন.জি.ও.-রা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবার জন্যে ফরহাদ মযহার দিয়ে, হুমায়ুন আজাদ দিয়ে এবং এই যে তসলিমা নাসরিন দিয়ে উল্টোপাল্টা কথা লেখাচ্ছে; এটা একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টির কথা। এটা নারীর কোনো উপকারের জন্য বলছে না। এটা হচ্ছে আর এক রকমের–এই আমাদের সবরকমের 'স্নবারি' যেমন শুরু হয় ঠিক সেই রকম।

আমরা সংস্কৃতির কথা বলি। সংস্কৃতি কোনো জাতেরও নয় বেজাতেরও নয়। সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের। এবং সব কল্যাণকর সব কিছুতেই মানব উত্তরাধিকার আছে। আমরা দেখে শিখি, জেনে শিখি, অনুকরণে অনুসরণে শিখি। উদ্ভাবন, উদ্ভাবন বা আবিষ্কার সবার পক্ষে সম্ভব নয়। এই যেমন আমাদের গোটা ভারতবর্ষ–যেটাকে উপমহাদেশ বলা হয়–পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত অথবা পুরো এশিয়াই ধরেন–আমরা সেই নরুনকে এখনও 'নেইল কাটার'-এ পরিণত করতে পারিনি। আমাদের কোনো চিন্তা-চেতনা নেই, আমাদের কেতাবেও আমরা নতুন কথা বলতে পারি না ইউরোপে যা বলে না। এখনও সংস্কৃতির-বিদ্যার-বুদ্ধির, জ্ঞানের-বিজ্ঞানের-প্রযুক্তির উদ্ভবক্ষেত্র হচ্ছে ইউরোপ, ইউরোপের মানুষের মনীষা। কাজেই আমাদের ইউরোপীয় ভাষার সঙ্গে একটা সম্পর্ক দরকার। এইটা বাঙলা–ইংরেজি শিখলে বাঙালিত্ব যায়, এই ধারণা হচ্ছে, যারা আমাদের দিয়েছে, তারা কিন্তু তাদের সন্তানদের ইংরেজি পড়াচ্ছে। শুধু তা নয়, তারা কিন্তু–তাদের–তাদের দেশপ্রেমই নেই, তারা সবগুলো আমেরিকাতে, ক্যানাডাতে, লন্ডনে গিয়ে তাদের সন্তানের জন্য স্থায়ী বাড়ি ঘর করেছে–আমরা যেমন গেরস্তের সন্তানরা ঢাকা এসে শহরে বাড়িঘর করে গ্রাম ভুলেছি, তারা বাংলাদেশ ভুলেছে। তাদের আমরা নেতৃত্ব দেব, আমাদের এমনি দুর্ভাগ্য ... সেগুলোকে আমরা মন্ত্রী করে আমরা শাসিত হয়েছি। আমাদের কোনো লজ্জা নেই, কোনো আত্মসম্মানবোধ নেই। আমরা প্রতিদিনই নানাভাবে, রাজনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে, সাংস্কৃতিকভাবে, সাহিত্যিকভাবে–কি গান-বাজনা-নাচ সবগুলো সম্পর্কে আমরা কথা বলতে চাই। আমরা যারা সাফ কাপুড়ে, আমরা সবাই নিজেদের ভদ্র মনে করি, নিজেদের শিক্ষিত মনে করি অথচ আমরা যে কোনো নির্বোধের স্বর্গে, আমরা কি রকম অজ্ঞতার মধ্যে, আমরা কত কি রকম যে–কি রকম নিম্নস্তরের, নিম্নমানের, রুচির, সৌন্দর্যবুদ্ধির সংস্কৃতির স্তরে রয়েছি, আমরা নিজেরাও বুঝতে পারি না। সেজন্যেই আমরা লাটিমের মতো ঘুরি, আমরা সচল কিন্তু আমাদের অগ্রগতি নেই। আমাদের চলমানতা আছে কিন্তু সম্মুখগতি নেই। এরকম মানুষ বাঁচতে পারে না। এই রকম মানুষের রাজনীতিও চলে না।। সেজন্যেই আমরা খুনি চোর ডাকাত বদমাশ ডাকু জেনেও তাকে আবার ভোট দিই, তাকে আবার মন্ত্রী বানাই, তাকে নিয়ে আমাদের চৌদ্দপুরুষ ধন্য হয়। মেয়ে বিয়ে

দেব আমার আর সেই ব্যাটাকে এনে কয় যে অমুক অমুক মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন—তাতে আমার চৌদ্দপুরুষ ধন্য হয়ে গেল। [শ্রোতাদের উচ্চ হাসি]।

এই যে এই—কমপ্লেক্স! আজকে যদি একটা মন্ত্রী উপস্থিত থাকবে আমরা চিঠিতে দিতাম তাহলে এর তিনগুণ লোক হতো। মন্ত্রী নেই, সেখানে গিয়ে কি হবে! আমাদের চরিত্র, আমাদের রুচি কি রকম হয়েছে। আমরা আজকে এমন কি খারাপ কথাটা আলোচনা করতে আসছিলাম যে আমাদের লোক হলো না? [শ্রোতাদের জোর হাসি]। একটা ছোট ঘর ভাড়া করেছি, কেন লোক এলো না? এর থেকে ভাল কথা কারা বলে? যারা মন্ত্রী তারা কি আমাদের থেকে ভাল বক্তৃতা দেয়? [শ্রোতাদের অট্টহাসি]। যারা রাজনীতিক নেতা তারা আমাদের থেকে ভালো বেশি কি বোঝে? এরকম অবস্থাতে আমরা আছি।

আমরা, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি—আমাদের এখন আত্মদর্শন দরকার, আত্ম-সমালোচনা দরকার। আমরা এখন টবের গাছের মতো। আমরা বেঁচে আছি, আমাদের বৃদ্ধি নেই, আমাদের মন নেই, আমাদের মনন নেই, আমাদের মনীষার প্রকাশ নেই। আমরা এইভাবে মানুষ হিসেবে, জাতি হিসেবে বাড়ব না, বাঁচব না। আমরা সেজন্য ভিক্ষাজীবী হয়ে থাকব। এবং আমেরিকা আমাদের প্রভু হয়ে থাকবে। আজকে এই প্রভুর খপ্পরে বিএনপি-সরকার এমনভাবে পড়েছে—ওরা হুকুমে চালাচ্ছে, রায় 'পাট চাষ বন্ধ কর। পাটের কাজ বন্ধ কর।' এবং বন্ধ করেছে। আপনারা দেখেন আদমজি জুট মিল বলে একটা, লাভক্ষতির আমি হিসাব বুঝি না, তবে গেল একমাস দেড়মাস পর্যন্ত সরকার যায় না, সরকারের মন্ত্রী যায় না, সরকারের পুলিশ যায় না। মারামারি একটা লাগিয়ে দিয়েছে। শুনেছি সেখানে কাজ কর্ম হয় না। উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ মিল বন্ধ করে দেয়ার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি। প্রত্যেক দিন একজন দুজন লোক নিহত হয়, এক শো দেড় শো জন আহত হয়। আপনারা কাগজে দেখেন। সারা দেশের মানুষ নীরব।

এ দেশের তো এভাবে উন্নতি হতে পারে না, হয়ও না। এজন্যেই আমরা আজকে এই সেমিনারের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলাম। এই সেমিনারে আমাদের মূল কথা হচ্ছে—পাঠ্যবই যেটা—পাঠ্যবইতে ইতিহাসের বই কিভাবে রচিত হচ্ছে? সাহিত্যে কি পড়াচ্ছে? সেগুলো আপনারা খবর নেন না। এরা অশুদ্ধ বিশুদ্ধের কথা বলেছে। এ.কে. ফজলুল হক—অনেক দোষ। মানুষ হিসেবে এর থেকে খারাপ চরিত্রের লোক বাংলাদেশে হয়নি—আমরা সেসব কথা বলছি না। আপনারা সবাই জানেন এর থেকে মহাপুরুষ হয় না। তো মহাপুরুষ হয় না। তো মহাপুরুষের কথা বানিয়ে বানিয়ে বলেন! জিন্নাহর কথাও আগে বলতো—মার্বেল খেলা-টেলা ইত্যাদি। ফজলুল হক কয় ডজন কাঁঠাল খেত। কয় শো কইমাছ খেতো—সেগুলো স্কুলে ছাত্রদের কেন পড়ায়? এটা একটা মানুষের পরিচয়? [শ্রোতাদের অট্টহাসি ও মন্তব্য : 'রাক্ষস—জনগণের পক্ষেও খেতেন]। জনগণের পক্ষেও খেতেন। এই রকম আর কি? ভাবটা কি—আমাদের এখানে যাদের মহাপুরুষ হিসেবে যাদের সাহিত্যে পড়ানো হয়, ইতিহাসকে যে বিকৃত করে পড়ানো হয়, সেখানে তো কোনো মানুষ তৈরির কিছু হয় না। আপনি শিক্ষা দেবেন এই জন্যে যে, যাতে করে তার বিকাশ হয়, তাদের মনের বিকাশ হয়, তার অনুভূতির বিকাশ হয়। তার অনুভূতি শক্তির

বিকাশ হয়, তার চিন্তাশক্তির বিকাশ হয়। তার মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। আপনি বাঙালি রাখতে চান, মুসলমান রাখতে চান—মানুষ করত চান না—এ কি কথা? এবং এর বিরুদ্ধে আপনাদের কোনো আপত্তি নেই। পাঠ্য বইগুলো কোনো ভদ্রলোকের সন্তানকে পড়ানো যায় না, সেখানে কিছু পড়বার নেই। সেসব কথা শুনলে, যেসব মহৎ কথা শেখানো হলে মানুষ বড় হয়—সেগুলো নেই, বরং উল্টো কথা আছে। সেই উল্টো কথার দুটো একটা আমি আপনাদের উদাহরণ দিই—এগুলো দিয়ে হয় না। একটা—আপনারা এসব জানেন। এক. হযরত উমর উট নিয়ে চললেন প্যালেস্টাইনে। উট একটা, উট টানার লোক একটা। উটে চড়ার লোক একটা—তিনি হচ্ছেন খলিফা। তাঁর জীবনের মূল্য আর উটওয়ালার মূল্য এক? অনেক লোক নেয়া উচিত ছিল। তিনি বলছেন : কতক্ষণ আমি চড়ি, কতক্ষণ তুমি চড়ো। মহত্ত্বের কথা [শ্রোতাদের হাসি]। দুই. আরো একটা বলি। হযরত—হযরত বায়জীদ বোস্তামি, মা দুপুর রাত্রে, মার তৃষ্ণা লেগেছে। ছেলেকে বলছে যে পানি। ঘরে পানি নেই, ওটা তো মরুঅঞ্চল। পানি নেই। ছেলে পানি আনতে গেছে—এদিকে মা ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলের উচিত ছিল গ্লাসটা ঐখানে রাখা, গ্লাস সে সময়ে ছিল না, যাই হোক পাত্রটা। মা জেগে [illegible]খ—চোখ খুললেই দেখবে এরকম জায়গায় রেখে তার ঘুমানো উচিত। ঐ ছেলের [illegible]ই বুদ্ধি নেই। বসে রয়েছে। [শ্রোতাদের হাসি]। কি রকম মাতৃভক্তি! ঐ রকম নিয়ে [illegible]ছেলের ভবিষ্যত কি? [দীর্ঘ অট্টহাসি শ্রোতাদের]।

ইতিহাসের বই দেখেন গিয়ে—বিকৃত করে পড়ানো হয়। আপনারা দেখেছেন রেডিও-টেলিভিশনে 'জীবনের আলো'—একটা দেখেছেন। এক অদ্ভুত লোক কোত্থেকে বোকা বোকা কথা বলে : 'দেখেছেন কোরআনে যা আছে। এতকাল পরে এক ইংরেজ কবি সেও জানে [দীর্ঘ মাত্রায় উচ্চারণ]।' [শ্রোতাদের হাসি]। তাতে প্রমাণ হল যে কোরআন সত্য! কি রকম অদ্ভুত যুক্তি দিয়ে আপনাদের সকলের মগজ ধোলাই করা হচ্ছে। এর মধ্যে মানুষ তৈরি হবে বাংলাদেশে? এই রকমের মধ্যে? যে স্ট্যান্ডার্ডের ইংরেজি বই পড়ানো হতো সেগুলো এখন নেই। ইংরেজি পড়ানোই হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের মাস্টার ইংরেজি বই পড়ে—বোঝে না। এরকম অবস্থাতে নেমে এসেছে। আমাদের কোনো কিছু হবে? ইউরোপ হচ্ছে সোর্স অব নলেজ। সেই ইউরোপের সঙ্গে আমাদের একটা সম্পর্ক চালু রাখতে বাধা নেই। ইউরোপের সব লোকেই ল্যাটিন পড়ে, গ্রীক পড়ে, হিব্রু পড়ে না।

আমাদের এখানে অসংখ্য মাদ্রাসা হচ্ছে। কেন মাদ্রাসা হবে? ইসলাম বজায় রাখার জন্য মাদ্রাসার দরকার কি? এতদিন তো দরকার হয়নি। দেড় হাজার বছর তো মাদ্রাসা ছাড়াই ইসলাম চলেছে। দু-চার জন লোকের জ্ঞানী হওয়ার দরকার। অন্যদের তো দৈনন্দিন জীবনে আস্তিক থাকার কথা, ধার্মিক থাকার কথা, আচার আচরণ করার কথা।

এইসব নিয়ে আমাদের প্রতিবাদ করতে হবে, আমাদের রাস্তাতে নামতে হবে, আমাদের রাজনৈতিক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত অন্তর্গত হতে হবে। রাখ-রাখ, ঢাক-ঢাক করে মুসলমানে গোস্যা হবে, ভোট পাওয়া যাবে না—এই করে, এসবের প্রতিবাদ না হলে আমরা কখনো মানুষ হতে পারব না। আমাদের শক্তি সঞ্চয় করতে হবে, আমাদের কেউ

না কেউ উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করতে হবে : যদি suffer করতে হয় তো করতে হবে। এই দীক্ষায় এই এই কথাগুলো বলবার জন্যেই আমরা এরকম সেমিনারের আয়োজন করতে চেয়েছিলাম।

সংস্কৃতি যেইটা মানুষের কল্যাণ আনেনা, মানুষকে সম্মুখের দিকে চালায় না, যে সংস্কৃতি মানুষকে সমকালীনতা দেয় না, যে সংস্কৃতি প্রাত্যহিক জীবনে কাজে কর্মে চিন্তায় উপযোগরিক্ত সেটা সংস্কৃতি হতে পারে না। সেটা বাধা, সে বাধা অতিক্রম করে মানুষ আগাতে পারে না। যে সংস্কৃতি মানুষকে এগিয়ে দেয়, যে চিন্তা মানুষকে এগিয়ে দেয়, যে প্রযুক্তি মানুষকে এগিয়ে দেয়, যে যন্ত্র মানুষকে মানুষের গতি দ্রুততর করে, যে যন্ত্র মানুষের কাজে সৌকর্য বাড়ায়, সেইটাই হচ্ছে সংস্কৃতি—সে সংস্কৃতি মানুষের সৌন্দর্যবুদ্ধি জাগায়, পরার্থপরতা জাগায়– যা নিজের জন্য ক্ষতিকর বলে আমি কামনা করিনা, পরের জন্যেও অকারণে যেটা ক্ষতিকর বলে কামনা করব না—সেইটাই হচ্ছে সংস্কৃতি। সংস্কৃতির প্রথম কথা, শেষ কথা এবং মধ্যকথা হচ্ছে সংযম, সহিষ্ণুতা এবং সৌজন্য। সৌজন্যেই সংস্কৃতির শেষ কথা। বদরউদ্দীন উমর সাহেব সেই কথাটাই বলতে চেয়েছিলেন যে সৌজন্য যদি সর্বব্যাপিনী না হয়, মানুষ নির্বিশেষের প্রতি যদি না হয়, তাহলে সেটা কখনো সংস্কৃতি হতে পারে না। সংস্কৃতি মানুষকে—মানুষকে আঁধা-কানা-পাগল-অন্ধ-খঞ্জ-পাগল-নির্বোধ-অশিক্ষিত-শিক্ষিত-বুদ্ধিমান সব মানুষকে মানুষ হিসেবে মমতা—মমতা-অনুরাগ যদি না জাগায়—মমতা যদি না জাগায়, তার প্রতি দায়িত্ব এবং কর্তব্য বুদ্ধি যদি না জাগায় তাহলে সেটা সংস্কৃতি হতে পারে না। এবং মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ব এবং কর্তব্যবুদ্ধি যে চিত্তে জাগে না, যে চেতনায় জাগে না তাকে শিক্ষিত বলা যাবে না, তাকে সংস্কৃতিবান বলা যাবে না, তাকে নাগরিক বলা যাবে না। তাকে মনুষ্য অবয়ব প্রাপ্ত প্রাণী বলা যাবে– মানুষ বলা যাবে আমাদের বলতে হবে—আমি ইহুদি-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-মুসলমান শাস্ত্র মেনে চলি মানুষ হবার জন্যে। বৌদ্ধ হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান থাকার জন্য নয়। ওটা হচ্ছে Means to an end। আমার—আমার লক্ষ্য হচ্ছে মানুষ হওয়া। সেই ধারণাটা যতক্ষণ আমরা দিতে না পারছি কাউকে, আমার কাছে শধু মানুষ আছে, আর কিছুই নেই, জীবনটা হচ্ছে মানুষের জন্যে, সমাজটা হচ্ছে মানুষের জন্যে, রাষ্ট্রটা হচ্ছে মানুষের জন্যে, এবং রাষ্ট্রান্তর্গত মানুষের খাওয়ানো-পরানো-বাঁচানোর দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের। এই ধারণাটা, এই সাধনাটাই হচ্ছে আমার রাজনীতির কথা। এইটাই হচ্ছে আমার সংস্কৃতির কথা, এইটাই হচ্ছে আমার সাহিত্যের কথা। এইটাই হচ্ছে আমার দর্শনের কথা, এইটাই হচ্ছে আমার জীবনের কথা, এইটাই হচ্ছে আমার মানবতার কথা। এই কথাগুলো এখন প্রকাশ্যত বলতে হবে, বিদ্রোহ করতে হবে। এর জন্য দল করতে হবে। ভোটের রাজনীতিতে আমাদের চলবে না, আমাদের এই মানসিক সংস্কৃতির উপরে, আমাদের এই জীবনের উপরে, আমাদের আদর্শের উপরে, আমাদের লক্ষ্যের উপরে, আমাদের চেতনার উপরে সর্বপ্রকারে হামলা হচ্ছে। সে হামলা এমন ইতর পদ্ধতিতে হচ্ছে, এমন ইতরভাবে হচ্ছে যে বলার নেই।

যেটাকে আপনারা মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িকতা বলেন, যাকে আপনারা ধর্মদ্বেষণার কথা বলেন, যাকে আপনারা জাতি দ্বেষণার কথা বলেন—সবগুলো হচ্ছে ইতরতার কথা। মনুষ্যত্বের কথা নয়। আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ করতে হবে। মনুষ্যত্বটাই হচ্ছে

সংস্কৃতি, এবং সেই সংস্কৃতি—মনুষ্যত্ব এখন ইউরোপের মনীষীরা আমাদের শেখায়। সব মানুষ—ইউরোপের মানুষ সবগুলো ভালো নয়, কিন্তু যে মনীষী সে ভালো। এবং যে জ্ঞানী সে নাস্তিক। এই কথাটা ভাবতে হবে [শ্রোতাদের হালকা হাসি ও গুঞ্জন]। এই পর্যন্ত—এই পর্যন্ত পৃথিবীতে কোনো নাস্তিককে কোনো আস্তিকের চেয়ে চরিত্রে ভালো ছাড়া খারাপ দেখা যায় নাই। হেন অপরাধ নাই আস্তিকে করে না এবং গুণ নাই যা একজন নাস্তিকের নাই। যত নাস্তিকের নাম জানি তাদের নাই। [ক্যাসেটের পৃষ্ঠা ওল্টানোর জন্য অস্পষ্টতা]। এবং নাস্তিকেরা গড়ে আস্তিক মানুষের থেকে শ্রেষ্ঠ মানুষ। কারণ তাদের মধ্যে একজন নাস্তিক হওয়ার আগে একজন পরিপূর্ণ মনুষ হয়। নির্ভীক মানুষ হয়। আত্মপ্রত্যয়ী, তার পরে নাস্তিক হয়। কাজেই নাস্তিক বললেই খারাপ হয় না। যে কারণে কমিউনিজম আমাদের দেশে টিকলো না। কয় যে, তারা নাস্তিক [শ্রোতাদের হাসি]। অথচ কম্যুনিস্টরা মানুষের সেবা করতেই চেয়েছে। অন্য মানুষের মধ্যে চোর-ডাকাত-বদমাশ-খুনি-লম্পট যত পাওয়া গেছে, নাস্তিকের মধ্যে তত পাওয়া যায় নাই,—কমিউনিস্টের মধ্যে। তবু তারা গৃহীত হয়নি। এবং আমাদের দেশের মুসলমানরা ভারি খুশি—যেন কমিউনিজম গেছে আর ইসলামের জয় ঘোষিত হয়ে গেছে [শ্রোতাদের হাসি]। কিছুই বোঝেনা। না বোঝার জন্য তাদের দোষ দেয়া যায় না। যে শিক্ষা পেলে বোঝে, সে শিক্ষার ব্যবস্থা আমরা করিনি। এই সংস্কৃতির ওপরে যে আমাদের কত রকমের হামলা চলছে তার কথা বলে শেষ করা যায় না।

আমরা আজকে এই একটা করলাম। ভবিষ্যতে আপনাদের সহযোগিতা পেলে আমরা আরো কয়েকটা করব। আমাদের ভাষার উপরে হামলা চলছে, যেমন একটা বলি— কি নাম—এবাদুন্নামা না কি? কয় যে আমরা মুসলমান, বাঙলাদেশে বেশি মুসলমান কাজেই আমরা কিছুটা বেশি আরবি-ফারসি ব্যবহার করব। কথাটা—মুসলমান মাত্রেই অজ্ঞ,—আমাদের আবদুল্লাহ ফারুক বলে একজন—একজন অধ্যাপক আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রখ্যাত একরকম,—এমনিতে গোলমালে থাকেন না বটে কিন্তু মাঝে মাঝে ভালো কথা বলেন, উনি বলেছেন যে মুসলমান আর মূর্খ অভিন্নার্থক [শ্রোতাদের উচ্চহাসি]। আরবি হচ্ছে প্রথমে কাফেরের, তারপর ইহুদির—তারপরে জোরাস্ট্রিয়ানদের। তারপরে খ্রিশ্চানের তারপরে মুসলমানের। কাজেই আরবি ভাষাতে মুসলমানের দাবি সবচেয়ে কম। মুসলমানের দাবি হচ্ছে দেড় হাজার বছরের, তার আগে আরবি ভাষা অন্যের। এবং ইসলামে কবিতা-গল্প উপন্যাস লেখা নিষিদ্ধ। সেই জন্যে এইটথ সেঞ্চুরির আগে মিশরে প্রভৃতিতেও কোনো সাহিত্য চর্চা হয় নাই, দর্শন চর্চা হয় নাই। ফলে আরবি ভাষাতে মুসলমানের সৃষ্ট শব্দের সংখ্যাও কম। সেই আরবি মুসলমানের হইল ক্যামনে? আমাকে বলে মাঝে মাঝে। আহমদ শরীফ। আহমদ শরীফ নাস্তিক, মুসলমানি নাম রাখছে কেন? মুসলমানি নাম কেমনে হইল রে? মুহম্মদ তো কাফেরে রাখছিল, আবু তালিব তো কাফেরের দেওয়া নাম, আমিনা তো কাফেরের দেওয়া নাম, আবদুল্লাহ তো কাফেরের নাম, খাদিজা তো কাফেরের নাম—কাফের মা-বাপের দেওয়া। ও তো ওই ভাষারই, আহমদ শরীফ মুসলমানের কি? [শ্রোতাদের অট্টহাসি]। মুসলমানের কোন্ বাবার সম্পত্তি আহমদ শরীফ [অনর্গল হাসি শ্রোতাদের]। এটা আরবি। আমি মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি বলে ঐখান থেকে ধার করে

এনেছে। ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স। সবদেশে সবাই ওরকম ধর্মের সঙ্গে নামও নেয় না। এই কথাগুলো বোঝে না বলেই আরবি ফারসির প্রতি আলাদা--এই কালকেও আমাদের একটা আড্ডাতে--কয় যে আহা লায়েলী-মজনু, ইউসুফ-জোলেখা, শিরি-ফরহাদ। তারপরে এই যে হাতেম তাই। কর্নের নাম নেবে না--হিঁদু, কাফের। কিন্তু হাতেম তাই? হাতেম তাই তো কাফেরেরও কাফের। হাতেম তাই তো মুসলমান নয়, সোহরাব-রুস্তম তো মুসলমান নয়, লায়লী-মজনু মুসলমান নয়, ইউসুফ-জুলেখা মুসলমান নয়, শিরি-ফরহাদ মুসলমান নয়--সেগুলো মুসলমানের এমন আদরের হল কেমনে? জানেনা বলে। ঐ নাম নিলেই মনে করে যে মুসলমানের দেড় ইঞ্চি বুক ফুলে ওঠে। মনে করে যে আহা-আমাগো [শ্রোতাদের জোর হাসি]।

ফররুখ আহমদের দুটো কবিতা আমি পছন্দ করি। খুব চমৎকার কবিতা--একটা হচ্ছে 'লাশ' আর একটা হচ্ছে 'ডাহুক'। আর সবগুলো হচ্ছে মুসলমানি কবিতা। বাঙলাদেশের কোনো ফুলের নাম, গাছের নাম ফররুখ আহমদের কবিতাতে পাবেন না--সব নারাঙ্গি--হেরা-খেজুর গাছ ইত্যাদি। এরকম আত্মপ্রতারণা করে সুবিধাটা কি? আমরা কি হয়েছি? আমরা আওয়ারা হয়ে ঐ যে আজকে কি বলে ঐটাকে 'জীবনের আলো' আর 'উজ্জীবন'দেখবেন? আওয়ারা হয়ে মুসলমান হবেন! যেন ইব্‌নে সিনা মুসলমান বলেই এ রকম জ্ঞানী হয়েছিলেন--যেন ইবনে রুশ্‌দ মুসলমান বলেই হয়েছিলো, মানুষ বলে হয় নাই। মুসলমানই যদি জ্ঞানী হয় তাহলে ছয়শো বছরের পুরোনো মুসলমান আমরা,আমরাই মুর্খ রইলাম কেন? আমাগো কসিরুদ্দি-বশিরুদ্দিদের কিছুই হয় না কেন এখনো? [শ্রোতাদের হাসি] এই ও মুসলমান পেলেই আর কোনো কথা নাই। এই রকম ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স তো আর কোথাও দেখা যায় না। যে কোনো জায়গার যে কোনো একটা মুসলমান পেলেই খুশি। আরো একটা কথা । একজন আমাকে বলেছিল। শেষ কথা বলে যাই, আপনারা বিরক্ত হবেন না [শ্রোতাদের উচ্চারণ : না না, বলেন স্যার]। এক অধ্যাপক আমার কোলকাতাতে--ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক একটু বোকা-শোকা, বলছিলেন : উনি ভাইস চ্যান্সেলর বটে কিন্তু আমাদের পড়াতেন, আমাদের বাড়িতে জায়গির ছিলেন, আমাদের ভাত খেয়েই তো ইনি বড় হলেন। বলেন যে তোমাদের ভাতের যদি এত গুণ হয়, তোমরা বার বার ফেল করেছ আর ও পাশ করে ভাইচ চ্যান্সেলর [শ্রোতাদের জোর হাসি] হয়েছে?

ঐ যে শমসের আলি গোছের ঐ যে উন্মত্ত--উন্মুক্ত কি না জানি না, উন্মত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শমসের আলী ভাইচ চ্যাঞ্চেলর । সেও ঐখানে--তিনিও ঐখানে বক্তৃতা দেন--কোথায় কোন মুসলমান কি আবিষ্কার করেছিল! এখন, সব মুসলমানরা বলে--আহা এই যে খ্রিশ্চান ইউরোপীয়রা তো অসভ্য ছিল। আমাগো মুসলমান থেকেই সে বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে গেল, তো তোমরা হারালে কেন? সেই কথার আর জবাব নেই [শ্রোতাদের হাসি]

তো এইগুলো কোন কমপ্লেক্সের কথা? এগুলো ব্যাধি। এগুলোর নাম হচ্ছে আধি। এইগুলো হচ্ছে--যে যত হীন, যত নির্বোধ সে, তার তত আস্ফালন বেশি। ঐ বাপের নামে আধা হওয়ার চেষ্টা। সে মানুষ কখনো বড় হয় না। শুধু পতন হয়, শুধু পতন হয়, শুধু পতন হয়।

৩৯১ আমাদের সংস্কৃতির উপর সাম্প্রতিক হামলা

আমাদের উঠতে হবে–জাতি হিসেবে উঠতে হবে, মানুষ হিসেবে উঠতে হবে, ব্যক্তি হিসেবে উঠতে হবে। আমরা খুব দুর্দিনের মধ্যে আছি। শুধু আর্থিক ভাবে নয়, শুধু নৈতিক ভাবে নয়। শুধু–শুধু বিদ্যার অভাব নয়, আমাদের একেবারে আকাঙ্ক্ষার অভাব। সেই আকাঙ্ক্ষাটা আমাদের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে–যে আমরা মানুষের বংশধর। আমাদের মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হবে। সেই মনুষ্যত্বের জন্যে পৃথিবী–পৃথিবী অ-নে-ক বড়। মানুষ তার চেয়েও বড়। এবং মানুষের মেধা বা মনীষা হচ্ছে অসাধারণ–অসামান্য। তার তুলনা হয় না। আমরা যদ্দূর অগ্রসর হব–মানুষের মেধা,মানুষের মনীষা কত বড় কি যে সৃষ্টি করতে পারে, কত বিস্ময়কর শক্তি–সেইটা ক্রমে প্রকাশিত হচ্ছে। এখনও শেষ কথা নয়। সেই মানুষের সাধনা আমাদের করতে হবে। আমাদের শুধু মুসলমান থাকলে চলবে না, শুধু হিন্দু থাকলে চলবে না, শুধু বাঙালি থাকলে চলবে না, বাংলাদেশী হলে চলবে না, বাঙালি হলেও চলবে না। মানুষ হওয়ার জন্যে, জাতি হওয়ার জন্যে, ব্যক্তি হওয়ার জন্যে আমাদের চেষ্টা করতে হবে।

আপনাদের অনেক সময় নিলাম। আমাকে ক্ষমা করবেন। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। [বিপুল হাততালি]

শোক সম্পাদকীয়

THE ATHIEST

Prof. Ahmed Sharif dead : Prof. Ahmed Sharif, a known humanist and a retired professor of Bangla at Dhaka University, died on February 24. He was 79. He was a lifelong fighter for human freedom, secularism and fought against obscurantist beliefs and religious fundamentalism. He published more than 40 books and 100 publications. His two volume work of *Bangalee and Bangala Sahitya* received wide acclaim. Rabindra Bharati University of India conferred on him honorary doctorate in 1995 for his contribution to Bangla literature. He also won Daud literary award.

Uncompromising till the end, Sharif rose above all religions and parochial outlooks. He was a source of inspiration to the younger generation. True to his ideals, his eyes were donated which resulted in restoration of eye sight to two blind persons. His body was donated to Bangladesh Medical Collage. Dr. Nehal Karim is his son. Atheist Centre pays homage to Prof. A. Sharif.

আন্দোলন

অবিস্মরণীয়ভাবে বেঁচে থাকুন ড. আহমদ শরীফ : বিদ্রোহী বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিত্ব সুবিখ্যাত পণ্ডিত ড. আহমদ শরীফ হৃদযন্ত্রের অসুখে ২৪ ফেব্রুয়ারী '৯৯-এ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। ড. শরীফের মৃত্যুতে এদেশের শ্রমিক-কৃষকসহ ব্যাপক নিপীড়িত-নির্যাতিত জনগণ, প্রগতিশীল বিজ্ঞানমনস্ক বুদ্ধিজীবী, বামপন্থী ও কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা হারালো তাদের এক অকৃত্রিম দরদী বন্ধু।

ড. আহমদ শরীফ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট বিপ্লবী না হয়েও মনে প্রাণে ও আন্তরিকভাবে ছিলেন কমিউনিস্ট বিপ্লব ও মার্কসবাদের অনড় সমর্থক। মার্কসবাদী বিপ্লবের প্রতি ছিলেন আস্থাশীল। আর সর্বদাই আশাবাদ ব্যক্ত করতেন বিপ্লবী সাফল্যের।

ড. শরীফ শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তসহ ব্যাপক জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রতি বলিষ্ঠকণ্ঠে ছিলেন সক্রিয় এবং আপোসহীন সংগ্রামী। ড. শরীফ ছিলেন বস্তুনিষ্ঠ স্পষ্টভাষী লেখক, আলোচক-সমালোচক। তাঁর লেখায়-আলোচনায়-বক্তৃতায় এদেশের বুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের গণবিরোধী ভাঁওতাবাজি চরিত্রের খোলস টেনে খুলে উলঙ্গ

করেছেন। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সমস্ত অপকর্মকে নির্মমভাবে তুলে ধরেছেন। নগ্ন করে তুলেছেন গণতন্ত্রের নামে স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার চেহারাকে। তিনি বিশ্ব জনগণের শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঘোরতর সমালোচনা করেছেন, বিরোধিতা করেছেন, আজীবন তার বিরুদ্ধে লড়েছেন।

ড. আহমদ শরীফ ধর্ম বিষয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করেছেন। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির নাস্তিক্যবাদকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন লড়াই করেছেন।

ড. শরীফ, আজীবন লড়াই করেছেন গণবিরোধী রাজনীতি-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কারণে এবং ধর্ম বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্ঠিভঙ্গি ও নাস্তিকতাবাদ প্রচারের কারণে জামাত-শিবির প্রতিক্রিয়াশীল চক্রসহ ধর্মীয় মৌলবাদীদের দায়েরকৃত মামলা ও তাদের হত্যার হুমকিকে মাথায় নিয়ে, দেশ থেকে না পালিয়ে তার বিশ্বাসের প্রতি অবিচল থেকে বীরদর্পে এগিয়ে গেছেন এবং ন্যায়সঙ্গত বিদ্রোহ থেকে নীতিগতভাবে পিছপা হননি কখনো। এ এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী কাজ।

ড. শরীফ সিরাজ সিকদার-মনিরুজ্জামান তারাসহ অসংখ্য বিপ্লবী শহীদদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণে ছিলেন অগ্রণী। বিশেষ করে শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদারের বিপ্লবী পথের ছিলেন দৃঢ় সমর্থক। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে ২ জানুয়ারি '৯৯ কমরেড সিরাজ সিকদারের ২৪তম মৃত্যু বার্ষিকীতে আলোচনাসভায় এই বয়ঃবৃদ্ধ মানুষটি ব্যাঘ্রমূর্তিতে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বিপ্লব এবং বিপ্লবী অনুশীলনের প্রতি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তরুণদের প্রতি আহ্বান রাখেন শ্রমিক-কৃষকদের সাথে মিশে গ্রামে-শহরে বিপ্লবী জঙ্গী সংগ্রাম গড়ে তুলতে। এভাবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মকাণ্ড নির্যাতিত-নিপীড়িত শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তসহ ব্যাপক জনগণের জন্য ছিল নিবেদিত। এই বিদ্রোহী ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষটি জীবিতকালেও যেমন জনগণের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন-তেমনি তাঁর চিন্তা-আস্থা-বিশ্বাস থেকে তার মৃত্যুর পর তার দেহ যাতে মানুষের সেবায় এবং বিজ্ঞানের কাজে লাগে সেজন্য তাঁর চক্ষু ও দেহটি দান করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরপরই তাঁর চোখ থেকে একজন অন্ধ পৃথিবীর আলো-বাতাস-দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন। ধানমন্ডির বাংলাদেশ মেডিকেলের ছাত্ররা চিকিৎসা বিজ্ঞান হাতে-নাতে অনুশীলন করতে পারবেন ড. শরীফের মরদেহ থেকে অনেক বছর ধরে। এটা বিপুল মানুষের বিবেককে নাড়া দিয়ে গেছে। তাঁর মরদেহ হস্তান্তর (মেডিক্যালে) অনুষ্ঠানে (কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে) ব্যাপক মানুষের ঢল এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন প্রমাণ করেছে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির গণমুখীনতা। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বিপ্লবী সংগ্রামের মাধ্যমে ড. শরীফের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো সম্ভব। সে পথেই আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে।

ভ্যানগার্ড

ড. আহমদ শরীফের মৃত্যুতে বাসদের শোকপ্রকাশ : বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল—বাসদের আহ্বায়ক কমরেড খালেকুজ্জামান এক বিবৃতিতে বলেন, উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার অন্যতম বলিষ্ঠ পুরোধা ড. আহমদ শরীফের মৃত্যুতে

আমরা গভীরভাবে শোকাভিভূত। বুদ্ধিবৃত্তির বেচাকেনার বাজারে তিনি ছিলেন এক প্রতিবাদী মানুষ। দেশের বিভিন্ন দুর্যোগকালে তিনি বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠ সোচ্চার রেখেছিলেন। তাঁর সংগ্রহ সাধনা ও গবেষণা বাংলা কাব্য সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। ড. শরীফের মৃত্যুতে দেশ এমন এক বরেণ্য ব্যক্তিত্বকে হারালো যাতে করে মুক্ত চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির জগতে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হলো। আমরা তাঁর সংগ্রামী জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি জানাই আন্তরিক সমবেদনা।

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি দেশের বাম প্রগতিশীল চিন্তার অন্যতম পুরোধা ড. আহমদ শরীফ মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি ছিলেন মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্য সাহিত্যের অন্যতম গবেষক। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর চোখ সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতিকে এবং তাঁর দেহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানার্জনের জন্য বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজকে দান করার কথা মৃত্যুর পূর্বে তিনি উইলে উল্লেখ করে গেছেন।

দেশের বর্তমান বুর্জোয়া দ্বি-দলীয় রাজনৈতিক মেরুকরণের পটভূমিতে বাম প্রগতিশীল চিন্তার লেখক বুদ্ধিজীবীদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে বাম বিকল্প রাজনৈতিক স্রোতধারার পক্ষে মতামত গড়ে তোলার লক্ষ্যে মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে ড. আহমদ শরীফ গত ১৬ ফেব্রুয়ারি '৯৯ তাঁর ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দসহ অন্যান্য বাম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বাম প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের সাথে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করেন। সভায় তিনি তাঁর প্রস্তাব লিখিত আকারে পেশ করেন। যা ছিল সম্ভবত তাঁর শেষ লেখা।

মে দিবসের কাগজ

মহান বিদ্রোহীর জীবনাবসান : বাংলা সাহিত্যের অনন্যসাধারণ পণ্ডিত, মধ্যযুগের আবিষ্কর্তা, মুক্ত চিন্তার অগ্রণী সেনানী, নাস্তিক্যবাদী দার্শনিক ও কালের কণ্ঠ আধুনিক মানুষ ড. আহমদ শরীফের জীবনাবসানে আমরা অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছি।

সারা বিশ্বের মানুষ যখন বাজার অর্থনীতির ভয়াল আগ্রাসনে সন্ত্রস্ত, সুস্থ চিন্তা ও প্রাগ্রসর ভাবনা যখন নানাভাবে আক্রান্ত তখন এই মহান মানুষটির অনুপস্থিতিতে আমরা গভীর শূন্যতায় নিমগ্ন।

জাতীয় জীবনের প্রতিটি সঙ্কটময় মুহূর্তে তিনি শংকাহীন চিত্তে সত্য বলার যে সাহস দেখিয়েছেন তাতে মানুষ আশা ফিরে পেতো, নতুন ভাবনায় সমৃদ্ধ হতে পারতো। জাতির যে সকল বীর সন্তান নানা সময়ে নিগৃহীত হয়েছেন, মৃত্যুবরণ করেছেন তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে এগিয়ে এসেছেন। মৃত্যুর আগে তিনি দেশের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে একটি ফোরাম গঠন করতে চেয়েছিলেন। দেশের প্রতিটি প্রগতিশীল ভাবনার মানুষদের উচিত তাঁর সেই অসমাপ্ত কাজটি সম্পন্ন করতে এগিয়ে আসা।

আজ ১৯৯৯ সালের মহান মে দিবসে তাঁর প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই এবং তাঁর মুক্ত চিন্তার প্রগতিশীল পথে এগিয়ে আসার জন্য ডাক দিয়ে যাই।

আরণ্যক নাট্যদল।

চলতিপত্র

বিদায় ড. আহমদ শরীফ : বিগত ১৩ ফেব্রুয়ারি ৭৯তম জন্মদিবস পালনকারী ড. আহমদ শরীফ গত ২৩ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার মাঝরাতে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন চিরতরে। ৭৮ বছর আয়ুষ্কাল খুব কম না হলেও, তাঁর মৃত্যু আমাদের কাছে অকালমৃত্যু এবং আকস্মিক। আমরা গভীরভাবে শোকাহত।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গবেষক ও বিশেষজ্ঞ ড. আহমদ শরীফ বাংলা লোকায়ত ধর্ম ও তার কার্যকরণগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। নিজে পাণ্ডিত্য অর্জন করে সুখী হতে পারেননি। সাধারণ বাঙালিকে কুসংস্কারমুক্ত, যুক্তিবাদী ও মুক্তবুদ্ধির অনুসারী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শেষ দিন অবধি ব্যস্ত থেকেছেন তিনি। তাঁর রচিত গ্রন্থসংখ্যা ৪৫টি আর তাঁর লেখা প্রবন্ধ-নিবন্ধের সংখ্যা অগুণতি। একথা তাঁর শত্রুও স্বীকার করতে বাধ্য যে, তিনি কখনোই কোনোরকম উচ্চাভিলাষ নিয়ে রাজনৈতিক ছত্রছায়া লাভের চেষ্টা করেননি। সততা ও নিষ্ঠার দিক থেকে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের কাছে তিনি একটি বিরল দৃষ্টান্ত। ড. আহমদ শরীফ যেমন অন্ধবিশ্বাসী ছিলেন না কোনো কিছুর প্রতি, তেমনি কোনো কিছুর অন্ধবিরোধিতাও তিনি করেননি। তাই তাঁর জীবদ্দশায় তিনি মত পরিবর্তনও করেছেন কখনো; তবে তা ছিল যুক্তি ও বাস্তবতার নিরিখে।

সমালোচিত হওয়ার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও তিনি সত্য কথাটা বরাবরই স্পষ্টভাবে বলে গেছেন কোনো ব্যক্তি, দল, মতবাদ-আদর্শকে তোয়াক্কা না করেই। তাই তাঁকে কখনো ছুটে যেতে হয়নি পদক-পুরস্কারের কাছে। বাংলাদেশের প্রায় সব সম্মানজনক পদক ও পুরস্কার এসে ভিড় করেছে তাঁর পদপ্রান্তে।

পেশাগতভাবে ১৯৫০ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন এবং ১৯৮৩ সালে একই বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

জীবদ্দশায় যেমন তিনি তাঁর নীতিতে ছিলেন অটল ও অবিচল, মৃত্যুতেও তিনি ঠিক তেমনই থেকেছেন। নড়েননি এতোটুকু।

জীবিত থাকাকালীনই নিজের শেষকৃত্য অনুষ্ঠান এবং মরদেহের সদগতি সংক্রান্ত একটি উইল করে রেখেছিলেন তিনি। সেই অনুযায়ী তাঁর চোখ দুটি মাদারীপুর জেলার কালকিনি থাকার হাফেজ খায়রুল আলম খোকনের চোখে সংস্থাপন করা হয়েছে। তাঁর মরদেহটিও উইল অনুযায়ী বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক জ্ঞানার্জনের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে। তাঁর পুরো জীবনই তিনি ব্যয় করেছেন আমাদের আলোকিত করার পেছনে, মৃত্যুতেও তা থামাননি।

বিদায় ড. আহমদ শরীফ।

উই স্যালুট ইউ ম্যান।

লেখক সমাবেশ : উভয় বাঙলার লেখকদের মুখপত্র

নির্মোহ বুদ্ধিজীবী : বাংলাদেশের নির্মোহ, যুক্তিবাদী, উদারনৈতিক মুক্তবুদ্ধিচেতনা-সম্পন্ন বুদ্ধিজীবী বিবেকবান পণ্ডিত ড. আহমদ শরীফ মঙ্গলবার রাতে ঢাকায় হৃদরোগে

আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। বহুদিন থেকেই তিনি ডায়াবেটিস রোগে ভুগছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের প্রতিটি প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর মনন, চেতনা ও মেধার পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল তাঁর পিতৃতুল্য আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের দুর্লভ অমূল্য পুথি ভাণ্ডারের ঐশ্বর্যের মধ্যে। আহমদ শরীফ ১৯২১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন চট্টগ্রামের সুচক্রচণ্ডী গ্রামে। ১৯৩৮ সালে পটিয়া ইংলিশ হাই স্কুল থেকে তিনি প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, ১৯৪০ সালে পাস করেন ইন্টারমিডিয়েট এবং ১৯৪২ সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে পাস করেন স্নাতক ডিগ্রি। ১৯৪৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিলাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে ১৯৬৭ সালে সৈয়দ সুলতান, তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচ. ডি. পান। ১৯৯৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের 'বিবেক' নামে চিহ্নিত এই দ্রোহী পণ্ডিতকে সাম্মানিক ডি. লিট. দিয়ে সম্মানিত করেন। ১৯৯৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের বাংলা বিদ্যা সম্মিলনী তাঁকে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে সংবর্ধিত করেন। তিনি ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ফেলো। আহমদ শরীফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা ছাড়াও সাংবাদিকতা ও গ্রন্থাগার বিদ্যা বিভাগের সঙ্গেও মুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান। প্রফেসর শরীফ ১৯৮৩ সালের জুন মাসে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৮৪-৮৫ সালে তিনি নজরুল প্রফেসর হিসেবে কাজ করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের পরিমাণ প্রায় শতাধিক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *বিচিত চিন্তা, মানবতা ও গণমুক্তি, সাম্প্রদায়িকতার ও সময়ের নানা কথা, বাঙলা বাঙালী বাঙালিত্ব, প্রগতির বাধা ও পন্থা, সময় সমাজ মানুষ, স্বদেশ চিন্তা, সংস্কৃতি, শাস্ত্র সমাজ ও নারীমুক্তি* ইত্যাদি। মধ্যযুগের তাবৎ পুঁথি সাম্রাজ্য জরিপ করে তিনি সেকালের নিরন্ন মানুষের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও জীবনাচারের দর্পণ চিত্রিত করেছেন। তাঁর কাজের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি প্রচুর পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। বাংলা একাডেমী পুরস্কার ছাড়াও ১৯৯১ সালে তাঁকে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের শ্রেষ্ঠ জাতীয় পুরস্কার, 'একুশে পদক'। ওই সালেই তিনি পান ন্যাশনাল হিউমানিস্ট অ্যাওয়ার্ড।

পাক্ষিক চিন্তা

ড. আহমদ শরীফের জীবনাবসান : পাক্ষিক চিন্তার এই সংখ্যা ছাপাখানায় দেবার আগে আমরা খবর পেলাম ড. আহমদ শরীফ আর নেই। তিনি গত ২৪ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তাঁকে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

ড. আহমদ শরীফের দীর্ঘ জীবনে অনেক অর্জন আছে। বাংলা সাহিত্যের একজন গবেষক হিসেবে তিনি এ দেশে বিশেষভাবে পরিচিতি। পুরনো পুথি সংগ্রহ ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানই বিশেষভাবে স্মরণীয়। একজন শিক্ষক হিসেবে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের

কাছেও তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি অনেকের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পেয়েছেন। অনেক সময় বিতর্কও সৃষ্টি করেছেন। এই প্রাণবন্ত মানুষটির মৃত্যুতে আমরা শোকাহত।

দৈনিক পূর্বকোণ

ড. আহমদ শরীফ : প্রকৃত মানুষের প্রতিকৃতি : দেশ ও জাতির কৃতি সন্তান অধ্যাপক ড. আহমদ শরীফ আর আমাদের মাঝে নেই। দুঃখ-সুখের এই ধুলার পৃথিবী ছেড়ে স্পষ্টভাষী অকুতোভয় এই উজ্জ্বল মানুষটি গত মঙ্গলবার রাত ১টা ৪০ মিনিটে লোকান্তরে যাত্রা করেছেন। দীর্ঘ ৭৯ বছরের এই জীবনে তিনি পেছনে রেখে গেছেন তাঁর অক্ষয় সাহিত্য-কীর্তি ও অনুকরণীয় অসংখ্য কর্মের ফসল, যা তাঁর মুক্তচিন্তা, জীবনদর্শন ও প্রাগ্রসর আদর্শ ক্ষেত্র থেকে জাত।

আমাদের এই চট্টগ্রামের গৌরব অধ্যাপক ড. আহমদ শরীফ মূলত ছিলেন প্রাবন্ধিক ও গবেষক। তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি ও যুক্তির ক্ষুরধার ভাষাশৈলীর মধ্য দিয়ে তিনি এই বাঙালি জাতিকে আলোর সন্ধান দিয়ে গেছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিলো বাঙালির অন্ধত্ব মোচন। তার জন্যে তিনি বিভিন্ন সময়ে কঠোর সত্যকে নির্মমভাবে উচ্চারণ করতেও দ্বিধা করেননি। এভাবে তিনি কাটাতে চেয়েছেন এ জাতির দৃষ্টিপথ থেকে আবেগের কুয়াশা ও বিভ্রম। তাঁর এই স্পষ্টভাষিতা অনেক সময় অনেকের গাত্রদাহেরও কারণ হয়েছে। কিন্তু ড. আহমদ শরীফ কোনোদিনই নিজের পথ থেকে সরে দাঁড়াননি। যাকে তিনি সত্য বলে জেনেছেন তাই প্রকাশ করে গেছেন, উচ্চারণ করে গেছেন পরিষ্কার ভাষায়, কোনোরূপ কপটতার আশ্রয় না নিয়ে।

আমরা মনে করি, তাঁর স্পষ্টভাষণ, মননশীল রচনা সমুদয়, মুক্তচিন্তা, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টি, চেতনা ও দর্শন-ভাবনা আগামী দিনগুলোতে বাঙালি জাতিকে নিরন্তর প্রেরণা যোগাবে। তিনি ছিলেন একজন দ্রোহী বাঙালি। তাঁর প্রশ্নাতীত দেশপ্রেম এবং জাতির সঙ্কটময় মুহূর্তে সাহসী উচ্চারণের মধ্য দিয়ে তিনি যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তা প্রতিটি সচেতন বাঙালির জন্য অনুকরণীয় হবে, চলার পথে পাথেয় হয়ে উঠবে। তাঁর মৃত্যুতে এ জাতি একজন অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, মানবতাবাদী ও সমাজসচেতন পণ্ডিত গবেষককে হারাল। বাঙালি জাতির জন্যে এই ক্ষতি অপূরণীয়। আমরা আশা করবো, এই জাতি আগামী দিনগুলোতে মুক্তবুদ্ধি চর্চার এই অগ্রজ সৈনিকের কর্ম ও সাধনা থেকে প্রাণ-রসায়ন সংগ্রহ করে নিজেদের সুন্দর ভবিষ্যত নির্মাণ করতে পারবে।

বাঙালি জাতির এই বরেণ্য সন্তান অধ্যাপক ড. আহমদ শরীফ ১৯২১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার সুচক্রদণ্ডী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উনিশ শতকের তৎকালীন দক্ষিণ চট্টগ্রামের এই প্রত্যন্ত এলাকায় শিক্ষায়-দীক্ষা ও চিন্তা-চেতনায় প্রাগ্রসর কয়েকটি পরিবারের একটিতে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম আবদুল আজিজ ও মাতার নাম সিরাজ খাতুন।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ড. আহমদ শরীফ ছিলেন এই চট্টগ্রামেরই আরেকজন লোক-বিশ্রুত ও নন্দিত ব্যক্তিত্ব মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সার্থক

উত্তরসূরী। ছেলেবেলা থেকে তিনি তাঁর এই চাচার পরিবারেই লালিত-পালিত হন এবং বলা যায়, এই মহীরুহপ্রমাণ মানুষটির ছায়া ড. আহমদ শরীফের জীবনপথের পাথেয় হয়ে উঠেছে। বৃটিশ-শাসিত পরাধীনতার দিনগুলোতে এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানী শাসন-শোষণের দুঃসময়ের দিনকালে এবং বাঙলা ভাষাকে নিয়ে ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সাহসী ও নির্ভীক ভূমিকা নিয়ে নতুন করে কিছু বলবার নেই। তাঁরই ছায়ায় লালিত-পালিত ড. আহমদ শরীফও যে তেমনই নির্ভীক ও স্পষ্টভাষী হবেন এ অতি স্বতঃসিদ্ধ কথা।

ড. আহমদ শরীফ ১৯৩৮ সালে পটিয়া হাই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পাস করেন। ১৯৪০ সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে আই. এ. পাস করেন এবং ১৯৪২ সালে একই কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে বি. এ. পাস করেন। তিনি ১৯৪৪ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীতে চতুর্থ হয়ে এম. এ. পাস করেন। এরপর তিনি দুর্নীতি দমন বিভাগে প্রিভেনটিভ অফিসারের চাকরি পান। কিন্তু নীতির প্রশ্ন তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হওয়ায় সে চাকুরীতে তিনি যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। ১৯৪৯ সালে রেডিও পাকিস্তানের 'কর্মসূচী নিয়ামক' পদে যোগ দেন। ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে শিক্ষকতার দায়িত্বসহ গবেষণা সহকারী হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬৭ সালে 'সৈয়দ সুলতান : তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে তিনি পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্র ও শিক্ষক হিসেবে তিনি ৩৬ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত ছিলেন। সেখান থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি ১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত দু'বছর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নজরুল অধ্যাপক' হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

ড. আহমদ শরীফের সাহিত্যকর্ম বিশাল। তিনি ৭০টির বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং সম্পাদনা করেছেন। তার মধ্যে *বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য* (১ম ও ২য় খণ্ড), *বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালিত্ব, মানবতা ও গণমুক্তি, বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক চালচিত্র, বিচিত চিন্তা, সাম্প্রদায়িকতার নানা সময়ের নানা কথা, বাঙলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ড. আহমদ শরীফ আরও একটি বড়ো কাজ করে গেছেন। তিনি তাঁর চোখ দান করে আরেকজন দৃষ্টিহীনকে চক্ষুষ্মান করে গেছেন। তিনি তাঁর মরদেহ দান করে গেছেন বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য। ড. আহমদ শরীফের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মুক্তবুদ্ধির চর্চা, অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ এবং গণমানুষের স্বপক্ষে সোচ্চার একটি প্রতিষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটলো। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই এবং তাঁর আত্মার সদগতি কামনা করি।

দৈনিক আজাদী

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পুনর্গঠনকারী পরিশ্রমী ও মেধাবী ব্যক্তিত্ব ড. আহমদ শরীফ আর নেই : বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, গবেষক, চিন্তাবিদ, বাংলা সাহিত্যের উপর বহু মৌলিক গ্রন্থ প্রণেতা, সমাজ-চিন্তায় মৌলিক ও

নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী, মধ্যযুগীয় সাহিত্য বিশেষ করে পুথি সাহিত্যের কৃতি গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সফল অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম 'নজরুল অধ্যাপক' বিশাল সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ড. আহমদ শরীফ আর নেই। গত ২৪শে ফেব্রুয়ারি রাত ১-৪০ মিঃ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ৭৯ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটলেও এ মৃত্যুকে আমাদের কাছে অকালমৃত্যু মনে হচ্ছে এ কারণেই যে, সাহিত্য ও সমাজচিন্তার বিভিন্ন দিকে তিনি বিরামহীনভাবে যে নবতর ফসল ফলিয়ে যাচ্ছিলেন, তা একদিকে যেমন বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে যাচ্ছিল, তেমনি আধুনিক বাঙালির জাতীয়, রাজনৈতিক ও সমাজচিন্তার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে চলছিল। বয়সের বোঝা তাঁকে কাবু করতে পারেনি। চাকুরী জীবন থেকে অবসর নিলেও কর্মজীবন তাঁর স্তব্ধ হয়নি। এর পাশাপাশি চলমান রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনৈতিক হাল-চাল, গতি-প্রকৃতি, সমাজ-মানসের ক্রমপরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে স্বীয় স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গীজাত স্বাধীন মতামত প্রকাশ করে স্বদেশবাসীকে সদাসচেতন থাকার তাগিদ দিয়ে গেছেন। সমাজ-চিন্তাকে এক মুহূর্তের জন্যও তিনি এক জায়গায় স্তব্ধ হতে দিতে চাননি। সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে এ মুহূর্তের সমাজ-চিন্তা যে পরবর্তী মুহূর্তে অতীতের বিষয়ে পরিণত হয়ে যায়, সে সম্পর্কে তাঁর ছিল পরিচ্ছন্ন ধারণা। তাই মুখ্যত সাহিত্যের মানুষ হলেও সমাজ-চিন্তার মাঠে এসে কাজে নেমে যাওয়াকে তিনি তাঁর নৈতিক ও সামাজিক কর্তব্য মনে করতেন। এ দায়িত্ব পালনে তিনি পিছপা হননি। স্রেফ সাহিত্যের কারবারী হয়ে সমাজের চলমানতা থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে একেবারে সাহিত্যের হাবাগোবা রাজপুত্তুর হয়ে শ্রদ্ধা কিম্বা সুযোগ আত্মসাৎ করার মতো ক্ষুদ্রতার বেষ্টনীতে তিনি বন্দি ছিলেন না। সমাজের চাকা যখনি স্বৈরাচার, অপশাসন, কুসংস্কারের কাদা আবর্জনায় ঠেকে যেতে দেখেছেন, তখনি তিনি কোমর বেঁধে নেমে গেছেন এ চাকা ঠেলতে। এ কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় তাঁর হাতে ময়লা লেগেছে, কপালে বদনাম জুটেছে, ক্ষেপে গেছেন চারপাশের পরিবেশের উপর। শেষমেশ ক্ষেপে গেছেন নিজের উপর। অস্থির-উন্মত্ত অবস্থায় নিজেকেই নিজে কুরে কুরে খেয়েছেন, কিন্তু মাথা নত করেননি। তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতির মানুষ ছিলেন না, সে সময়ও তাঁর হয়নি। বরং তিনি গতানুগতিক রাজনীতির কাজকর্মের বাইরে আরো বৃহত্তর পরিসরে তেজী সৈনিকের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর প্রত্যাশা, তাঁর স্বপ্ন, তাঁর সমাজ-চিন্তা, তাঁর হতাশা, তাঁর বেদনা, তাঁর যন্ত্রণা-ক্ষোভ, বিক্ষোভ তিনি আগামী প্রজন্মের জন্য মজুদ রেখে গেছেন *বিচিত চিন্তা. কালিক ভাবনা, স্বদেশ অন্বেষা, জীবনে সমাজে সাহিত্যে, যুগ যন্ত্রণা* প্রভৃতি উন্নতমানের মননশীল গ্রন্থে। আমরা তাঁর মৃত্যুতে শোকাভিভূত। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য ও মননশীলতার ক্ষেত্রে সৃষ্ট শূন্যতা সহজে পূরণ হবার নয়।

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাগরের প্রথম সফল ডুবুরী দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের পর শ্রী সুকুমার সেন, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, গোপাল হালদার প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের বহুমুখী সম্ভার সংগ্রহ করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে ইমারত রচনা করেছিলেন, তাতে যে অসম্পূর্ণতা ছিল, তা পূরণ করতে যে পরিশ্রমী, মেধাবী, অনুসন্ধিৎসু সাহিত্যকর্মীরা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা হলেন জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, অধ্যাপক আবদুল হাই, আনোয়ার পাশা, আবদুল করিম

সাহিত্যবিশারদ। তাঁদের সুবিশাল সংগ্রহ, গবেষণা বাংলা সাহিত্যের বুনিয়াদকে করেছে প্রশস্ততর, ইমারতকে করেছে বর্ণাঢ্য ও উচ্চতর। কিন্তু তার পরেও ছিল অনেক কাজ। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সুবিশাল সাহিত্য সম্ভারের উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন তিনি পারিবারিক সূত্রে। পুত্রহীন সাহিত্যবিশারদ তাঁকে পুত্রবৎ পালন ও শিক্ষাদান করেই ক্ষান্ত হননি, নিজের সংগৃহীত সুবিশাল পুথিভাণ্ডার তাঁর হাতে অর্পণ করে গিয়েছিলেন। ড. আহমদ শরীফ সর্বজন শ্রদ্ধেয় পিতৃব্যের অর্পিত সম্পদের যথাযথ সদ্ব্যবহারে কার্পণ্য করেননি। অসাধারণ পরিশ্রম সহকারে তিনি বাংলা সাহিত্যের নতুন নতুন জগৎ আবিষ্কার করে তুলে দিয়েছেন বাংলা ভাষাভাষী তথা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে। বাংলা সাহিত্যকে করে গেছেন সমৃদ্ধতর। ড. শহীদুল্লাহ, ড. এনামুল হক, প্রফেসর আবদুল হাই, আনোয়ার পাশার পর প্রচণ্ড সাহসে বোঝা টানার সর্বশেষ মানুষটা চলে গেলেন।

অক্লান্ত পরিশ্রম ও মেধা বিনিয়োগ করে তিনি বাঙালি জাতি ও সাহিত্যের জন্যে যে ইমারত রচনা করে গেছেন, তার যথাযোগ্য মর্যাদা তিনি পেয়েছেন বিদ্বজ্জনের কাছ থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি. উপাধি ছাড়াও বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদক, রবীন্দ্র বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডি.লিট. ডিগ্রিসহ অসংখ্য পুরস্কার ও উপাধি তিনি পেয়েছেন। কিন্তু এর বিপরীতক্রমে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক বিভিন্ন মহলের বিরূপতা ও প্রতিকূলতা সর্বদা তাঁকে তাড়া করেছে। অপশাসন, দুর্নীতি, স্বৈরাচারী মানসিকতা, একনায়কত্ব, মিথ্যাচার, ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তিনি মুখে ও কলমে সর্বদা সোচ্চার ছিলেন বলে সাবেক পাকিস্তান আমল কিম্বা স্বাধীন বাংলাদেশে কোনো সরকারী প্রসন্নতা তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। তাঁর বিপুল সাহিত্য-কর্ম, মেধা ও কর্মচাঞ্চল্যই তাঁকে অবশ্যই কায়েমী মহলের রোষ থেকে রক্ষা করেছে।

ড. শরীফের মৌলিক গ্রন্থসংখ্যা ৪০টি। সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা ৪৫টি। প্রতিটা গ্রন্থই অনবদ্য। এসব গ্রন্থে বাঙালি জাতি, বাংলার ইতিহাস, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে গবেষণালব্ধ বিষয়াদি রয়েছে। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* নামের গ্রন্থটা একটা আকর গ্রন্থের মর্যাদালাভ করেছে। তাঁর গবেষণা ও আবিষ্কৃত তথ্যাবলী বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান উপাদান। প্রগতিবাদী সমাজচিন্তক ড. আহমদ শরীফকে অনুধাবনের সক্ষম প্রয়াস হয়নি। সমাজের যাতনা-বঞ্চনা-প্রতারণা দেখে প্রবল আক্রোশে তিনি যখন নিজেকেই আহত করে চলছিলেন তখনো কেউ তাঁকে বোঝার চেষ্টা করেনি। আজীবন যিনি গবেষণা করে গেছেন, তিনি নিজে এবং তাঁর বিপুল বর্ণাঢ্য সৃষ্টি আজ আমাদের মূল্যবান গবেষণার বিষয়বস্তু। তাঁকে গবেষণা করতে গেলে আমরা আমাদের মধ্যকার আলো, ভালো আর কালোগুলোকে চিনতে পারবো। এতে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে।

নতুন কথা

চিরদ্রোহী আহমদ শরীফ অম্লান রহে : আমাদের সমকালীন বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, চিন্তাবিদ, প্রাবন্ধিক, গদ্যশিল্পী, বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট গবেষক-অধ্যাপক, সর্বোপরি চিরদ্রোহী অধ্যাপক আহমদ শরীফ গত ২৪শে ফেব্রুয়ারি গভীর রাত

থেকে চিন্তা করা থেকে বিরত হয়ে গেলেন। তিনি রেখে গেছেন আমাদের জন্য চিন্তা করার, ভাববার, বুঝবার, জানবার, শিখবার ও অনুকরণ-অনুসরণ করবার এক বিশাল জগৎ।

অসাধারণ এক প্রতিভা ছিলেন অধ্যাপক আহমদ শরীফ। তিনি তাঁর মেধা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, মগজ খাটিয়ে যে সত্যে উপনীত হয়েছেন তা বলতেন, আচরণ করতেন অকুণ্ঠ চিত্তে, অভয়ে অবলীলায়। তিনি ছিলেন দুঃসাহসী, অকুতোভয় রাজসৈনিক। বাক্য ছিল তার প্রতিপক্ষকে আঘাত করার হাতিয়ার। তাই তিনি বাক্য নির্মাণে, উচ্চারণে, তির্যক, রুষ্ট, রূঢ় শব্দের আশ্রয় নিতেন। তাঁর প্রতিপক্ষ কোনো ব্যক্তি নয়। ব্যক্তির, গোষ্ঠীর, শ্রেণীর, রাষ্ট্রের, সমাজের ব্যবস্থা বিশ্বাস, প্রথা ছিল তার প্রতিপক্ষ। এ বিশ্বাসের প্রথার বিরুদ্ধেই তিনি আঘাত হেনেছিলেন প্রবলভাবে।

তিনি তাঁর অধীত, পঠিত বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থায় অর্থের, বিত্তের, সম্পদের পার্থক্য, ফারাক, ব্যবধান শ্রেণী বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে। এ শ্রেণী বৈষম্যই সকল অনিষ্টের, অন্যায়ের, অবিচারের কারণ। তাই তিনি শ্রেণী বৈষম্য বিলোপের জন্য স্বধর্মের, স্বজাতের, স্বরাষ্ট্রের, স্বসমাজের শোষক-শাসকদের বিরুদ্ধে বলতেন, লিখতেন অনেক বুঝাতেন। এই শোষক শ্রেণী জনগণকে অজ্ঞতায়, অজ্ঞানতায়, পশ্চাৎপদতায় ও কূপমণ্ডূকতায় রেখে শ্রেণী শোষণ অব্যাহত রাখতে চায় বলে তিনি অসাধারণ বাগ্মিতায় এদের বিরুদ্ধে জনগণকে বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ করতেন, অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি আস্থাশীল ছিলেন সমাজতন্ত্রে। সমাজতন্ত্রই কেবলমাত্র শ্রেণী বৈষম্যের অবসান ঘটাতে পারে। সমাজতন্ত্র সর্বশেষ ব্যবস্থা বলে শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা এতে তাঁর বিন্দুমাত্র অনাস্থা ছিল না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন গতর খাটিয়ে শ্রম বিক্রি করে যারা উৎপাদন করে তাদের বিদ্রোহ, বিপ্লব অনিবার্য। তাছাড়া তাদের বাঁচার কোনো পথ নেই।

ড. আহমদ শরীফ তুলনারহিত মানুষ। তিনি নিজেই নিজের তুলনা। অতুলনীয় এ মানুষটি মুক্তবুদ্ধির চর্চায়, আধুনিকতায়, বিজ্ঞান মনস্কতায় গণমানব দরদে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা মানুষ ছিলেন। তাই পরিণত বয়সেও তিনি অক্লান্ত ছিলেন। ক্লান্তি তাকে গ্রাস করেনি। ক্লান্তি, শ্রান্তিকে তিনি উপেক্ষা করে গেছেন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। তিনি বিশ্বাস করতেন সমবায়ী উদ্যোগে সম্মিলিত শক্তিতে, সঙ্ঘে। সে জন্যই মৃত্যুর আগ মুহূর্তে তিনি স্বমতের, স্বচিন্তার, স্বআদর্শের বুদ্ধিজীবীদের, রাজনীতিকদের ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেটাই ছিল তাঁর শেষ উদ্যোগ ও আকাঙ্ক্ষা। সে আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করার মধ্য দিয়ে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ রচনার মধ্য দিয়েই কেবল আমরা তাকে শ্রদ্ধা জানাতে পারি।

মৃত্যুত্তোর কালের জানাযার প্রয়োজন নেই বলে অন্তিম বাসনা উইলে উল্লেখ করে এবং মরদেহ চিকিৎসাশাস্ত্রের শিক্ষার্থীদের দান করে দিয়ে, অন্ধজনের জন্য চোখ দান করে আলোর ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি অমলিন আলো জ্বেলে দিয়ে গেলেন আমাদের জীবনেও এবং তিনি যে কত বড় সাহসী, দৃঢ়চিত্ত ও প্রকাণ্ড আত্মার সংস্কারমুক্ত মানুষ ছিলেন মরণেও তিনি তা প্রমাণ করে গেলেন। তার সাহসী পথনির্দেশ আমাদের জীবনের পাথেয় হউক। চিরদ্রোহী আহমদ শরীফ অম্লান রহে।

Independent

Ahmed Sharif : Ahmed Sharif, the rebel, passed away silently in the earlyhours of last Tuesday. His mortal remains will be at the Dhaka BIRDEM hospital for everyone to have a last look till tomorrow (Sunday). With his death the nation has lost an educationist and scholar of distinction whose words enriched Bangla literature profuly. According to his last wish, Ahmed Sharifs body will be handed over to the Dhaka Medical College Bangladesh. His eyes which were donated to a humanitarian organisation, Sandhani, have already been put to good use, reportedly, to restore the eyesight of two blind persons.

Ahmed Sharif retired from his career as a teacher of the Bangla department of Dhaka University in 1982. But he never retired as an active thinker. He earned many awards for his literary works which include Bangla Academy award, Ekushey Padak, Alakta Sahitya award etc.

Whatever he said or wrote during his lifetime caused a lot of furore in intellectual circles. Even till his last days he was living a secluded life to avoid the wrath of a section of the public who thought his views to be too dangerous for the established order.He was probably the most controversial and misunderstood person among his contemporaries in the country. Controversial as he was no one has ever questioned his intellectual honesty.

Ahmed Sharif was able to find a niche for himself among the small group of progressive literary thinkers of the country since the sixties through his research work on certain Muslim scholars during medieval Bangla. Working for some time as a researcher in the Dhaka university in the early fifties, he later devoted his entire life to teaching, literary research and writing. Born and brought up in a very enlightened family environment in Patya of South Chittagong in then British India, the deceased from his boyhood, was exposed to the latest socio-cultural movement of the post-colonial Bangla and as such was very quick to pick on the progressive and secular trend dominating the thoughts of the rebellious generation of the sixties in pre-independence Bangladesh. But unlike many among our glitterati, Ahmed Sharif never compromised and held no to whatever he thought right through to the end. As in life, in death, too, he did not bow down to the dictates of convention.

দৈনিক প্রাইম

শুদ্ধ মানব আহমদ শরীফ–শ্রদ্ধার্ঘ্য : মুক্ত চিন্তার বলিষ্ঠ প্রবক্তা, বাংলা সাহিত্যের অনন্যসাধারণ গবেষক, সফল শিক্ষক, আজন্ম দ্রোহী পুরুষ ড. আহমদ শরীফের মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে গেলো বাংলা সাহিত্যের একটি অধ্যায়। এ দ্রোহী পুরুষ নানাভাবে নানা কারণে এদেশের প্রগতিশীল মানুষ এবং মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী লোকজনের কাছে ছিলেন একটি আদর্শ পুরুষ এবং অনুকরণীয়। একজন বরেণ্য মনীষী হিসেবে দেশের মননশীলতার চর্চায় বর্তমান সমাজ ও জীবনকে তিনি যেভাবে প্রভাবিত করেছেন তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি ছিলেন অগ্রগামী চিন্তার পথিকৃৎ।

প্রজ্ঞার প্রতীক বাঙালির মননের বিকাশে তার অবদান অনস্বীকার্য। বস্তুত আহমদ শরীফের মৃত্যুতে মুক্তবুদ্ধির চর্চা, অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ এবং গণমানুষের অধিকারের স্বপক্ষে সোচ্চার একটি প্রতিষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটেছে। শিক্ষাজীবনে সফল এ আদর্শ পুরুষ অনেক লোভনীয় চাকরির হাতছানিকে উপেক্ষা করে বেছে নিয়েছিলেন শিক্ষাদানের মত মহান পেশাকে। আমৃত্যু তিনি এ পেশাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। জীবনে তিনি বিশ্বাস করতেন মানবধর্ম। অনগ্রসরতা, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে তিনি আমৃত্যু লড়াই করে গেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন মার্কসবাদ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কেবল এদেশের মেহনতি মানুষের মুক্তি আসতে পারে। তাঁর সমাজতন্ত্র কিংবা কমিউনিজম বিশ্বাসে কোনরকম রোমান্টিকতা ছিল না। মৃত্যুর আগে চোখ এবং দেহ দান করার প্রতিশ্রুতি দান এবং তা বাস্তবায়ন প্রমাণ করে তিনি যা বিশ্বাস করতেন, আমৃত্যু তা লালন করে গেছেন। এজন্য তাকে অবশ্য কম খেসারত দিতে হয়নি। মানুষকে ধর্মের ওপর স্থান দিতে গিয়ে তিনি যেমন মানবতাবাদী মানুষ হিসেবে পরিচিত হয়েছেন তেমনি দেশের একশ্রেণীর ধর্মীয় লেবাসধারী লোকজনের কাছে 'মুরতাদ' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। এদেশের মৌলবাদী গোষ্ঠী সুযোগ পেলেই আহমদ শরীফকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতেন, এমনকি তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টাচরিত্রও হয়েছে কয়েকবার।

আমাদের দুর্ভাগ্য দেশের প্রচলিত রাজনীতির ধারক-বাহক কিংবা তল্পিতল্পা বহন করতেন না বলে আহমদ শরীফের বিরুদ্ধে পরিচালিত ঐ সব গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে কিছু করা সম্ভব হয়নি। একথাও সত্য, প্রচলিত রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না বলে রাষ্ট্রীয় যন্ত্র তেমনভাবে মূল্যায়ন করেনি কোনো দিন। যদিও এ নিয়ে এ মহান ব্যক্তির কখনো হাহুতাশ ছিল না। তারপরেও তিনি যে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা কুড়িয়েছেন তা ছিল বড় প্রাপ্তি। যে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আহমদ শরীফ সংগ্রাম করে গেছেন এবং যে শ্রেণী বৈষম্য, অসাম্প্রদায়িকতা, অসাম্য, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শোষণের বিরুদ্ধে কলম নিয়ে লড়াই করে গেছেন–বর্তমান প্রেক্ষাপট তার বাইরে নয়। দেশ জাতির এ সংকট মুহূর্তে আহমদ শরীফের মৃত্যুতে দেশের প্রগতিশীল ও মুক্তচিন্তার মানুষদের জন্য একটি বড় ক্ষতি হয়ে গেলো।

যে জায়গা থেকে তিনি লড়াইটা শুরু করে দিয়েছিলেন–দেশ স্বাধীনের এত বছর পরও সে অবস্থার তেমন একটা উন্নতি এখনো সম্ভব হয়নি। আহমদ শরীফ লড়াই করেছেন ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে, অনগ্রসরতার বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতা, শোষণ এবং ভুল

শাসনের বিরুদ্ধে—এসব বিষয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার মাধ্যমেই কেবলমাত্র এ জ্ঞানতাপসের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো যেতে পারে। এ শুদ্ধ মহাপুরুষের মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। তার আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা।

আজকের কাগজ

একজন মহাপ্রাণের মহাপ্রয়াণ : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব, দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবী, মুক্তবুদ্ধিচর্চা ও যুক্তিনির্ভর বাস্তবতার আলোকে আলোকিত পথের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ড. আহমদ শরীফ গত মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যরাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৭৯ বছর, তবুও তার মৃত্যু আমাদের কাছে যেমন আকস্মিক তেমনি বেদনারও। ড. আহমদ শরীফের অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তার চক্ষু সন্ধানীকে দান করা হয়েছে এবং মরদেহ বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজকে। তার অগাধ পাণ্ডিত্য ও মানবিক গুণাবলী, সর্বোপরি তার সততা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা এবং সেই সঙ্গে কুসংস্কার-ধর্মান্ধতা-সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে স্পষ্ট উচ্চারণ তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলো এমন একটি জায়গায় যেখানে আহমদ শরীফ মানেই একজন দেশপ্রেমিক, একজন সত্যসন্ধ, একটি প্রতিষ্ঠান। একটি জাতির ইতিহাস উদঘাটন করতে হলে, জাতিকে জানতে হলে চাই তার মননশীলতার ইতিহাস অনুসন্ধান, তার লোকায়ত ও চিরায়ত ধর্ম, সংস্কৃতির আদ্যোপান্ত আবিষ্কার। ঠিক সে কারণেই ড. আহমদ শরীফ বাঙালি সংস্কৃতির বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাসকে তুলে আনার উদ্দেশ্যে এবং তাকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার প্রত্যয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে দৃশ্যালোকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের খুঁটিনাটি। তার আগে এই দুঃসাধ্য কাজটিতে কেউই হাত দিয়ে এমন সফলভাবে উপস্থাপন করতে পারেননি। বাউল ও সুফী ভাবধারায় সমুজ্জ্বল মধ্যযুগের বাঙালি মননশীলতার স্বাক্ষরসমূহকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন মানুষের ভেতরে-বাইরে। এখানেই তিনি তার কার্যকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। একজন মানুষের সামাজিক দায়বদ্ধতাকে প্রকাশের জন্যে তিনি চলমান রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সমান্তরালভাবে উপস্থাপন করেছিলেন বস্তুবাদী দর্শন এবং মুক্তবুদ্ধি চর্চার ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছিলেন একজন অনন্য ব্যক্তিত্ব। এ জন্যে তাকে সইতেও হয়েছে প্রচুর যন্ত্রণা। রাজপথে তার বিরুদ্ধে মিছিল হয়েছে, তাকে 'মুরতাদ' ঘোষণা করেছে ধর্মান্ধ মৌলবাদী গোষ্ঠী। তারপরও তিনি কারো ওপর নির্ভর না করে অটল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিয়েছেন আপোসহীন পথ। যে কোনো প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং শাসক-শোষক যে কারো বিরুদ্ধে তার বক্তব্য ও অবস্থান ছিলো দৃঢ়। মানবিকতার অবক্ষয়ের এই দুর্দিনে তার এই চলে যাওয়া ভীষণ কষ্টের রাষ্ট্রের ও মানুষের জন্যে। লোভ, লালসা, উচ্চাভিলাষের ঊর্ধ্বের এই মহৎ প্রাণ কখনোই রাষ্ট্রীয় অনুগ্রহ কিংবা যশের প্রতি মোহগ্রস্ত ছিলেন না। সে কারণেই তিনি ছিলেন প্রথাবিরোধী মৌলিক গুণবান একজন মহৎ মানুষ। তার শরীর ও চোখদান করার বিষয়টিও তার বিশ্বাস দর্শনেরই অঙ্গ। তিনি যা বিশ্বাস করতেন, যা বলতেন তা পালনও করতেন। 'সবার ওপরে মানুষ সত্য তাহার ওপরে নাই' ড. আহমদ শরীফ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই অমোঘ সত্যকে লালন করে গেছেন। তার মৃত্যুশোক একজন মহৎ মহান কিংবা দেশবরেণ্য [illegible]

মানুষকে হারানোর ক্ষতিজনিত শোকই শুধু নয়—এ শোক আমাদের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বিয়োগব্যথার মতোই শোকাবহ ও কষ্টের। আমরা 'আজকের কাগজ' পরিবার আমাদের এ ঘনিষ্ঠ স্বজনকে হারিয়ে শোকাহত।

মানবজমিন

পরলোকে আহমদ শরীফ : পৃথিবীতে এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম যারা প্রচলিত বিশ্বাসকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেন না। সেই মুষ্টিমেয় মানুষ মনে করেন, অন্ধবিশ্বাস মানুষকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক, মুক্তবুদ্ধি চর্চার নায়ক ড. আহমদ শরীফ ছিলেন সেই রকমেরই একজন মানুষ। চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে গেছেন সারা জীবন। গত মঙ্গলবার রাতে ড. আহমদ শরীফ ৭৮ বছর বয়সে চিরবিদায় নিলেন। তাঁর মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ দেশের অনেকেই শোক প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশে ড. আহমদ শরীফ একটি নাম। ইতিহাসও বলা চলে। তাঁর বিশ্বাস নিয়ে তিনি একই স্থানে অবস্থান করে গেছেন। তিনি ছিলেন ব্যক্তিসত্তা বিকাশের পক্ষে। একজন ব্যক্তি তার ইচ্ছানুযায়ী চলবে। সেখানে ধর্ম, সমাজ বা রাষ্ট্র কোনো প্রভাব ফেলবে না, এবং এ থেকেই তার মধ্যে বিকাশ লাভ করবে উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা-চেতনা। তিনি নিজেকে একজন 'নন-কনফরমিস্ট' হিসেবে দাবি করতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ ৩৩ বছর অধ্যাপনা করেছেন। শিক্ষাদান জীবনের মহান ব্রত ছিলো তাঁর কাছে। এতে তিনি আনন্দও পেয়েছেন। দীর্ঘ কর্মময় জীবনে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। একুশে পদক, বাংলা একাডেমী পুরস্কার থেকে শুরু করে অনেক পদক ও পুরস্কারই তিনি পেয়েছেন। কিন্তু পুরস্কার প্রাপ্তির প্রতি তাঁর কোনো মোহ ছিলো না। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন নির্বিকার ও নিরাসক্ত। চট্টগ্রামের এমন একটি পরিবারে ড. আহমদ শরীফের জন্ম যেখানে জন্মেই তিনি দেখেছেন অফুরন্ত পুথি সাহিত্যের ভাণ্ডার। পিতৃব্য মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদকে দেখেছেন পুথির পাহাড়ের মধ্যে ডুবে থাকতে। দেখেছেন মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিক-শিল্পীদের নিয়ে বায়ান্ন সালে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে। যে সম্মেলনে মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রগতিশীল সাহিত্যচর্চার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য রেখেছিলেন। আহমদ শরীফের মুক্তবুদ্ধি চর্চার হাতেখড়ি বোধহয় তখন থেকেই। তাছাড়া ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে বিদ্রোহী সত্তা কাজ করতো। মৃত্যুর আগে এক সাক্ষাৎকারে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, আপনি সংস্কারের কোন্ দুর্গে আঘাত করেছেন। জবাবে তিনি বলেছিলেন, বিশ্বাসের দুর্গে আঘাত করেছি। কেননা বিশ্বাস হচ্ছে যুক্তির অভাব। যেসব বিশ্বাস উন্নতির, আধুনিকতার, প্রগতির, সুষ্ঠু সমাজ গড়ে তোলার পক্ষে বাধা, সেগুলোকে আমি আঘাত করেছি। শাস্ত্রীয় আচার-আচরণ সবটাই কুসংস্কার। তার বিরুদ্ধে চিরকাল লিখেছি। বাংলাদেশের মতো শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর এবং কুশিক্ষা-কুসংস্কারে আচ্ছন্ন দেশের জন্য যেখানে প্রয়োজন অনেক আহমদ শরীফের সেখানে এমন মানুষের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। ড. আহমদ শরীফের মৃত্যুতে সংকটের সময়ে

সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাবার মানুষের অভাববোধটাই বেশি করে অনুভূত হবে। এমন একটা সময়ে তিনি চলে গেলেন যখন দেশটা রাজনৈতিক তৎপরতা, ভুলভ্রান্তি এবং স্বার্থপরতার চোরাবালিতে ডুবে যাচ্ছে। স্বাধীনতাবিরোধী ও মৌলবাদীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তিনি থাকলে প্রগতিশীলতার সপক্ষে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারতেন। একজন মানুষ হিসেবে মানুষকে ভালোবেসে মানুষের জন্য দান করে গেছেন তাঁর দুটো চোখ ও দেহ। সন্ধানীকে দেয়া দুটো চোখ ইতিমধ্যেই দু'জন অন্ধের চোখে সংযোজন করা হয়েছে এবং তাঁর দেহ চিকিৎসা বিকাশে গবেষণার কাজে লাগানো হবে। তাঁর এ দান তো ভুলবার নয়। তাঁর আত্মা শান্তি লাভ করুক।

মুক্তকণ্ঠ

আহমদ শরীফের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি : খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ ও গবেষক প্রফেসর আহমদ শরীফের জীবনাবসান ঘটেছে। মঙ্গলবার মধ্যরাতে তার হৃদস্পন্দন চিরদিনের মত থেমে যায়। তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। মুক্তচিন্তার অগ্রপথিক হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন। তার মৃত্যুতে সর্বমহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আমরাও তার অংশীদার। আমাদের শ্রদ্ধা তার স্মৃতির প্রতি। পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমরা গভীর সহানুভূতি ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর আহমদ শরীফ দীর্ঘকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৮৩ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ থেকে প্রফেসর হিসেবে তিনি অবসর নেন। ছাত্রছাত্রীদের কাছে তিনি ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। তার লেকচার শোনার জন্য শ্রেণীকক্ষে প্রচণ্ড ভিড় দেখা যেত।

গবেষক ও লেখক হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তার নিষ্ঠা ও একাগ্রতা ছিল অনুকরণযোগ্য। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিষয়ে তাকে বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও অগ্রগণ্য বলে অভিহিত করা হত। তবে এর বাইরেও নানা বিষয়ের ওপর তিনি কাজ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তিনি পিএইচ. ডি. করেন। বিষয় ছিল সৈয়দ সুলতান : তাঁর যুগ ও তাঁর গ্রন্থাবলী। সাহিত্য মান বিচারের পাশাপাশি তিনি সে সময়ের সমাজচিত্রও তুলে ধরেছেন নিপুণ দক্ষতায়। তার প্রবন্ধ গ্রন্থ অনেক। এর মধ্যে রয়েছে *পুথি পরিচিতি, পুথির ফসল, বিচিত চিন্তা, স্বদেশ অন্বেষা, জীবনে সমাজে সাহিত্যে, বাউল তত্ত্ব, যুগ যন্ত্রণা, সাহিত্য ও সমাজ চিন্তা* ইত্যাদি। গবেষক ও লেখক হিসেবে তিনি স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাকে সাহিত্যকর্মে অবদানের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। পরম মর্যাদা ও সম্মানের একুশে পদকও তিনি পেয়েছেন। তবে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বড় পাওনা হচ্ছে ছাত্রছাত্রী ও বিদ্যোৎসাহী মহলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

প্রফেসর আহমদ শরীফ ছিলেন কুসংস্কারমুক্ত ও অসাম্প্রদায়িক। নির্ভীকভাবে তিনি ব্যক্ত করতেন নিজের অভিমত। সত্য উচ্চারণে তিনি ছিলেন কুণ্ঠাহীন। এজন্য তার বিরুদ্ধে একশ্রেণীর সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী চক্র নানা কুৎসা রটিয়েছে। তাকে মুরতাদ ও নাস্তিক আখ্যা দেয়া হয়েছে। অশুভ শক্তি তার কোনো বক্তব্য নিয়ে যখন উস্কানিমূলক

আচরণ করেছে, তার মৃত্যু দাবি করে মাঠ গরম করার চেষ্টা করেছে, তখনও তাকে দেখা গেছে অসমসাহসে সেই একই বক্তব্যের পুনরুক্তি করতে। কারও ভয়ে তিনি নিজের বক্তব্য থেকে সরে যাননি কিংবা নিজের বক্তব্য অস্বীকার করেননি। মিথ্যাচারের জবাব দিয়েছেন সত্যের বলিষ্ঠ উচ্চারণের মাধ্যমে। আর এ কারণেই তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে থাকা আমাদের এই সমাজকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে যে নিরলস প্রচেষ্টা চলছে ও চলবে, তাতে তিনি প্রেরণার উৎস। তার স্মৃতিরক্ষার জন্য হয়ত বিশেষ আয়োজনের দরকার নেই। নিজ মহৎ ধর্মের গুণেই তাকে দেশবাসী স্মরণ করবে। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই জনপ্রিয় শিক্ষাবিদের প্রতি যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনে প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা গ্রহণ করবে বলে আশা করব।

ভোরের কাগজ

ভয়শূন্য, উচ্চ শির : অধ্যাপক আহমদ শরীফ চলে গেলেন। ৭৮ বছর বয়সের মৃত্যুকে আমাদের স্বল্প আয়ুর দেশে অকালমৃত্যু বলা যায় না। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে দীর্ঘ জীবনই পেয়েছিলেন তিনি। মৃত্যুর ভয় তাঁর ছিল না, তিনি জানতেন এবং বিশ্বাস করতেন জীবনের কোনো পূর্বাপর নেই, অনিবার্য সমাপ্তি হয়ে মৃত্যু আসবেই। হয়তো আত্মাতেও বিশ্বাস ছিল না তাঁর। তাই আত্মার শান্তির কথা না ভেবে নিজের নশ্বর দেহটিও তিনি পৃথিবীর মানুষকেই দিয়ে গিয়েছেন।

এমন জীবন কটি হয়, যার সমাপ্তি 'লোকান্তরে' নয়, 'পরলোকেও' নয়, শুধুই 'মৃত্যু'তে, শুধু 'জীবনাবসানে'?

তাই মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে, এই অনন্য জীবনপ্রদীপটি কখনো নির্বাপিত না হলেই বুঝি ভালো ছিল। অথবা কে জানে হয়তো এই সমাপ্তিই ঠিক হয়েছে, বৃত্ত পরিপূর্ণ হয়েছে, এখন তার সমগ্রতা, সম্পূর্ণতাটি আমরা দেখতে পাবো।

আহমদ শরীফকে অনেক অভিধায় ভূষিত করা হয়ে থাকে। শিক্ষক, পণ্ডিত, গবেষক, অসমসাহসী প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব। সবার ওপরে তিনি ছিলেন মুক্তবুদ্ধি, প্রগতিপন্থি ও সংস্কারমুক্ত আলোকিত চিন্তার সংগ্রামী প্রবক্তা। ভীরুতা, দ্বিধা, আপোসকামিতা ছিল না তাঁর মধ্যে এবং সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার যে, কোনো সঙ্ঘের আশ্রয় ছাড়াই তিনি একাকী তার বিশ্বাস-মতামত-বক্তব্য নির্ভীকভাবে প্রকাশ করতে পিছপা হতেন না। অসংকোচ, সাহস ও দৃঢ়তা তাঁর অনেক শত্রু সৃষ্টি করেছে। প্রতিপক্ষ তাঁকে 'মুরতাদ' খেতাব দিয়েছে, কিন্তু তিনি ভীত হননি। আজ পিছন ফিরে দেখলে তাঁকে মনে হয় এক মহীরুহের মতো প্রবল ব্যক্তিত্ব। স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও অনন্য। সুতীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই তাঁর সুউচ্চ ভাবমূর্তির নির্মাতা।

আহমদ শরীফের নির্ভীক বিবেককে আমরা আবারো শ্রদ্ধা জানাই। মুক্তবুদ্ধির এই সংকটকালে তাঁর মৃত্যু এক অপূরণীয় ক্ষতি।

খবরের কাগজ

একজন উৎসর্গীকৃত মানুষ : ড. আহমদ শরীফ আর নেই : একটি সমৃদ্ধ জীবনের অবসান ঘটেছে। এই ক্ষতি অপূরণীয়।

মেধায়, মননে, যুক্তিমনস্কতায় ড. আহমদ শরীফ ছিলেন একজন পূর্ণাঙ্গ আধুনিক মানুষ। নিরাপোসও। বেঁচে থাকতে তাঁর কলম উৎসর্গ করেছিলেন জ্ঞানের উৎকর্ষে, মরণের পর পুরো শরীর।

ড. আহমদ শরীফ খবরের কাগজ-এ লিখছেন দীর্ঘ সময়। নিয়মিত, সময়মতো। মারা যাবার আগেও শেষ লেখাটি যথারীতি পাঠিয়েছেন এ সংখ্যার জন্যে।

সাপ্তাহিক খবরের কাগজ এই মৃত্যুতে শোকাহত। এই মৃত্যু খবরের কাগজের জন্যেও অপূরণীয়।

ধ্রুবতারা

ড. আহমদ শরীফ স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি : 'প্রথমে নিজেকে যোগ্য কর, পরে অপরকে বিলিয়ে দাও'-যে মনীষী তার ঘটিষ্ঠ জনকে লক্ষ্য করে এ কথাটি প্রায় বলতেন, তিনিই ড. আহমদ শরীফ। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি তাঁর জীবনাবসান হয়েছে। শারীরিকভাবে তিনি আমাদের মাঝে আর নেই, কিন্তু করণীয় রেখে গেছেন অনেক কিছু।

১৯২১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানাধীন সুচক্রীদণ্ড গ্রামে এ মানুষটি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে আই. এ. ১৯৪২ সালে বি. এ. এবং ১৯৪৪ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীতে চতুর্থ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাস করেন। ১৯৬৭ সালে সৈয়দ সুলতান, তাঁর যুগ ও গ্রন্থাবলী শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য ডক্টরেট উপাধিপ্রাপ্ত হন।

শিক্ষাজীবন শেষে ১৯৪৫ সালে লাকসাম ফয়জুন্নেসা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে তিনি কর্মময় জীবনে প্রবেশ করেন। পরবর্তীতে ১৯৫০ সালের ডিসেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্ট হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫২ সালে ঐ একই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ বছরের জন্য অস্থায়ী লেকচারার পদে এবং ১৯৫৭ সালে স্থায়ী লেকচারার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ১৯৬৯ সালে রিডার এবং ১৯৭২ সালের শেষ দিকে প্রফেসর পদে উন্নীত হন। ১৯৮৩ সালে তিনি প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষকতার জীবন থেকে অবসর নেন।

ড. আহমদ শরীফ তাঁর কর্মময় জীবনের শুরুতে (১৯৫০ সালে), আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ যে ৫২৫টি বাংলা ও ১২টি উর্দু-পারসি পুথি বিনামূল্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেছিলেন, তার যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও তার উপর বিশেষ গবেষণা করেন। শুধু তাই নয়, তিনি মধ্যযুগীয় খ্যাতিমান সাহিত্য ও পুথি হিসেবে ১৯৫৮ সালে *লাইলী-মজনু, তোহফা, পুথি পরিচয়,* ১৯৫৯ সালে *সত্যকলি বিবাদ সংবাদ,* ১৯৬০ সালে *মধুমালতী,* ১৯৬১ সালে *মুসলিম কবির পদ সাহিত্য* ও ১৯৬২ সালে *মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ* রচনা ও সম্পাদনসহ প্রায় ৮০টি গ্রন্থ রচনা করেন। আর এটাই হলো তাঁর কর্মময় জীবনের একটি দিক। এর বাইরেও তাঁর বিশাল জগত ছিল। যে জগতে বিচরণ

করতে গিয়ে তিনি একটি শ্রেণীর কাছে যেমন প্রিয় পাত্র, তেমনি অপর শ্রেণীর কাছে নিন্দিত। আসলে কোন সেই জগত, সেদিকেও একটু নজর বোলানো যাক।

ড. আহমদ শরীফ ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন স্পষ্টভাষী ও অকপট পুরুষ। ফলে সমাজের অপরাপর দশজন বুদ্ধিজীবী থেকে পৃথক। রাজনীতি না করেও রাজনীতির মানুষ। তবে লড়েছেন একটি বিশেষ শ্রেণীর হয়ে। যে শ্রেণীটি সমাজে অবহেলিত এবং শ্রমজীবী জনগণ হিসেবে পরিচিত। এই লড়াই চালাতে গিয়ে তিনি বাংলাদেশ লেখক শিবিরসহ শতাধিক প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হন। দেশ-কালের সীমানা ছাড়িয়ে পৃথিবীর এক প্রান্তের লড়াকু জনগণকে সাহস জোগান। তাদের লড়াইয়ে অকুণ্ঠচিত্তে সমর্থন করেন। আজীবন তাদের স্বপক্ষেই কথা বলেন।

তিনি ছিলেন প্রথাবিরোধী। ফলে ব্যক্তিজীবনে রক্ষণশীলতা, গণ্ডীবদ্ধ চিন্তা-চেতনার বেড়াজালকে ছিন্ন করতে পেরেছিলেন। এই বৈশিষ্ট্যর কারণে প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও লড়েছেন। তিনি ছিলেন নাস্তিকতায় বিশ্বাসী, কিন্তু পরমতসহিষ্ণু ও গণতান্ত্রিক। এ কারণে তিনি অপরের মতামতকে শ্রদ্ধা করতেন। তবে তাদের কুসংস্কার ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে লড়তেন। এইসব অন্যতম চারিত্রিক কারণে কোনো মোহ তাঁর চারপাশে জমাট দেয়াল বাঁধতে পারেনি, যে বেড়াজালে আটকা পড়েছেন আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজ।

ড. আহমদ শরীফের এসব গুণাবলি ক্রমান্বয়ে অর্জিত হয়েছিল প্রগতির পাঠশালা থেকে, প্রকৃতির পাঠশালা থেকে। এই ধারাবাহিকতায় তিনি হয়ে ওঠেন বিজ্ঞানমনস্ক ও মার্কসবাদের দৃঢ় অনুসারী। কিন্তু কাঠামোগত রাজনৈতিক সংগঠনে যুক্ত না হয়েও মার্কসবাদীদের সমর্থনে অকপটে এগিয়ে আসেন। এমনকি বিশ্বরাজনীতি ও দেশীয় রাজনীতিতে আজ মার্কসবাদের বিরুদ্ধে যে জোর অপপ্রচার তাতে আর দশজন বুদ্ধিজীবীর মতো হাল ছেড়ে না দিয়ে, স্রোতে গা না ভাসিয়ে বরং সমাজে বিপ্লবের লক্ষ্যে ও মানসে এদেশের বিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার সকল প্রচেষ্টায় তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। আর এসব ঘটনা পরম্পরার কারণেই তিনি একশ্রেণীর কাছে হয়েছেন নিন্দিত। যারা সমাজে পরগাছা এবং প্রগতির পথে বাধা। এর বিপরীতে মুক্তচিন্তার মানুষদের কাছে, শ্রমজীবী জনতার কাছে, প্রগতিবাদী রাজনীতির কর্মীদের কাছে একজন মহতী মানুষ। তিনি শারীরিকভাবে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু রেখে গেছেন একটি দিকনির্দেশনা। যা বাস্তবায়ন হলে এ সমাজের খেটে খাওয়া মানুষের কল্যাণ হবে। তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে। ফলে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর করণীয় আজ অনেক বেশি। কেননা আমরা আমাদের একজন সাহসী বন্ধুকে হারিয়েছি। হারিয়েছি একজন শিক্ষককে। যে শূন্যস্থান আমাদেরই পূরণ করতে হবে। পাথেয় হিসেবে তাঁর দিকনির্দেশনা তো রয়েছেই। ফলে ভয় কি? তা আমাদের সাহস যোগাবে।

গণস্বাস্থ্য

ড. আহমদ শরীফ : মানবিকতাই যাঁর সংগ্রামী প্রেরণা : অধুনা বিবৃতিজীবী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন যেসব 'বুদ্ধিজীবী' তাদের দলভুক্ত তিনি ছিলেন না।

মুক্তবুদ্ধির চর্চা যাঁরা করেন তাঁদের মধ্যে আলাদা করে উচ্চারণ করার মত কয়েক জনের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন–ড. আহমদ শরীফ। সত্যকে সত্য বলার সৎ সাহস রাখতেন তিনিই। এজন্য কোনো রক্তচক্ষুর পরোয়া করেননি, ইসলামী লেবাসধারীদের 'মুরতাদ' ঘোষণাও তাঁকে তাঁর নীতি থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। ড. আহমদ শরীফ আজ প্রয়াত। গত ২৪শে ফেব্রুয়ারি '৯৯ তারিখ তিনি দেহ রেখেছেন। কিন্তু প্রয়াত কথাটা বলা বোধ হয় ঠিক হল না। কারণ তাঁর নিথর দেহ থেকে তুলে নেওয়া চোখের কর্ণিয়া সংযোজিত হয়েছে যাদের চোখে (জাকির হোসেন ও খায়রুল আলম খোকন) তারা তো আহমদ শরীফের চোখের আলোতেই নতুন এক পৃথিবীকে দেখছেন।

শুধু চোখের কর্ণিয়া নয়, চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণা কাজে ব্যবহারের জন্য তিনি তাঁর মরদেহ বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দান করে গিয়েছেন উইলের মাধ্যমে। এর মাধ্যমে তিনি মৌলবাদের থাবা জর্জরিত বাংলাদেশের জন্য রেখে গেছেন এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৯২১ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার সুচক্রচণ্ডী গ্রামে। মূলত চাচা আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের পরিবারেই লালিত-পালিত হয়েছিলেন। ১৯৩৮ সালে পটিয়া হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং ১৯৪০ ও ১৯৪২ সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে যথাক্রমে আই. এ. ও বি. এ. পাস করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. পাস করেন। ১৯৬৭ সালে ৪৬ বছর বয়সে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সৈয়দ সুলতান : তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ অভিসন্দর্ভের জন্য ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। এই ডিগ্রি প্রাপ্তিকে তিনি রসিকতা করে বলতেন-এটা হল বুড়ো বয়সে সন্তান লাভের মতো, আনন্দও আছে লজ্জাও আছে।

ড. আহমদ শরীফ গণবিশ্ববিদ্যালয়-এর ট্রাস্টি বোর্ডের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

দৃঢ়প্রত্যয়ী আহমদ শরীফ কখনও স্বমত প্রচারে কুণ্ঠাবোধ করেননি। বুদ্ধিজীবী হিসেবে তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমী। সরকার এবং প্রশাসন-যন্ত্রের নানা সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য তিনি কখনও নিজেকে বিকিয়ে দেননি। মানবতার দুর্দিনে, জুলুম ও নির্যাতন প্রতিরোধে তিনি ছিলেন সদা সোচ্চার। মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, বাংলা একাডেমী, বাংলাদেশ লেখক শিবির, স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ফ্রন্ট, সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদবিরোধী নাগরিক কমিটি ইত্যাদির সাথে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থেকে দেশকে মৌলবাদী ও ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন থেকে মুক্ত রাখার সংগ্রাম করে গেছেন। এজন্য তাঁকে দুর্ভোগও কম পোহাতে হয়নি। কিন্তু তিনি কখনও কোনো চাপের মুখে নতি স্বীকার করেননি।

তাঁর কাজ এবং কর্মের ক্ষেত্র সম্পর্কে তিনি ছিলেন সদা সচেতন। তাঁর সাহিত্য-কর্ম বিশাল। রসিকতা করে অনেক সময় বলতেন, "আমরা দুই চাচা-ভাতিজা তো মুসলমানদের চৌদ্দ-গুষ্ঠি উদ্ধার করে দিয়েছি।" রসিকতা করে বললেও বাংলা

সাহিত্যের ইতিহাসে এই কাজ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। গোটা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান উদ্ধার এবং তার স্বীকৃতি প্রাপ্তিতে তাঁদের অবদান সবচেয়ে বেশি।

ড. আহমদ শরীফ ৭০টির অধিক গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। তাঁর সম্পাদিত মধ্যযুগের কাব্যগ্রন্থগুলো ছাড়া *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), *বাঙলা, বাঙালি বাঙালিত্ব; মানবতা ও গণমুক্তি; বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি; বাঙলাদেশের সাম্প্রাতিক চালচিত্র; যুগ যন্ত্রণা, মধ্যযুগের সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ; মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা। তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার, রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ডি. লিট, উপাধি এবং আরও অনেক পুরস্কার পেয়েছেন।

সত্য কথা বলার মানুষের যেখানে আজ বড় বেশি অভাব, তেমন এক সময় ড. আহমদ শরীফের প্রয়াণে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি।

আজকের সূর্যোদয়

ড. আহমদ শরীফের ইন্তেকাল : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা গবেষক ও বুদ্ধিজীবী ড. আহমদ শরীফ (৭৯) গত ২৪ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার শেষ রাতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। তিনি স্ত্রী ও তিন পুত্র রেখে যান। মরহুমের লাশ ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বারডেমের মরচুয়ারিতে রাখা হয়েছে। ঐ দিন বিকেল সাড়ে তিনটায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে আনা হবে, এরপর মরহুমের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তার লাশ বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে। তিনি ১৯৯৫ সালে মরণোত্তর চক্ষুদানের অঙ্গীকার করেছিলেন। সে অনুযায়ী তার চোখ সন্ধানীকে দান করা হয়েছে। তিনি ১৯২১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের পটিয়ার সুচক্রদণ্ডী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের বাংলা বিভাগে গবেষণা সহকারী হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬৭ সালে সৈয়দ সুলতান : তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ শীর্ষক থিসিসের জন্য পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। দীর্ঘ ৩৩ বছর তিনি বাংলা বিভাগে শিক্ষকতা করেন। ১৯৮৩ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মানবতাবাদী, মুক্ত চিন্তার বলিষ্ঠ প্রবক্তা, সফল শিক্ষক, বাগ্মী। তিনি পণ্ডিত ও বয়স্ক বিদ্রোহী বলে খ্যাত ছিলেন। মৌলবাদীরা তাঁকে 'মুরতাদ' ঘোষণা করে তাঁর ফাঁসির দাবি করেছিল। ড. আহমদ শরীফ ১৯৬৮ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৬৯ সালে দাউদ সাহিত্য পুরস্কার এবং ১৯৯১ সালে একুশে পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯৩ সালের ৭ মে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি. লিট. প্রদান করে। তার মৌলিক গ্রন্থ সংখ্যা ৪০টি এবং সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা ৪৫টি। তাঁর প্রথম মৌলিক গ্রন্থের নাম *বিচিত চিন্তা* এবং শেষ গ্রন্থের নাম *বিশ শতকে বাঙালি*। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলিম নিদর্শন *লায়লী-মজনু* তাঁর সম্পাদনাকর্মের একটি অনন্য নিদর্শন।

Bangladesh Observer

The Passage of a Profound Teacher : Dr. Ahmed Sharif, 79, retired professor of medieval Bengali literature, and an avant garde cultural and political thinker, passed away in the early hours of Wednesday, succumbing to a massive seizure of the heart and leaving behind him a considerable vacuum in Bangladesh's progressive intellectual circuit.

The recipient of many honours, professor Ahmed Sharif would be remembered most for his fearless stand against oppressors of the mind, particularly obscurantism in the guise of irrefutable dogma, which he was known to criticise mercilessly in his somewhat artless ways. In this he often invited the ire of those who feared debate and failed to appreciate the challenges that an enquiring mind was bound to open up for the genuine believer, the truly spiritual and the practising intellect.

If humanism means transcending the dogma and dichotomies of varied faiths in the quest for Truth, Professor Ahmed Sharif had certainly exemplified it, in life as well as in death. He had bequeathed his body to Bangladesh Medical Collage and there it will lie to enlighten generations of students, after the secular niceties and last respects are over.

According to the professor's wishes his corneas were collected by Shandhani soon after he expired. It is perhaps a vindication of this remarkable teacher's ultimate oneness with all humanity-believers and non-believers alike-that his eyes have gone to lend sight to two fellow humans, one a Quran-e-Hafez, Khairul Alam Khokon of Madaripur and another Sakir Hossain of Dhaka.

Professor Ahmed Sharif certainly has a talent for provocative one-liners on virtually everything–imperialism, fascism, culture, religion, Marx and what-have-you-sometime verging, unabashedly, on the naivete. Nonetheless, he was one who towered above others with his simple courage of conviction, and he will be sorely missed.He was a teacher who taught his pupils to think. Honing of the intellect was his prime concern–not for its own sake, but in order to live life more meaningfully, for the good of all.

সংবাদ

ড. আহমদ শরীফ : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গবেষক ও বিশেষজ্ঞ ড. আহমদ শরীফ কিঁছুটা পরিণত বয়সেই আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। বেশ কিছুদিন যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন। ৭৯ বছর বয়সে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেও আমাদের কাছে তার

মৃত্যু আকস্মিক। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তার পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ।

বাঙালি মানসকে তার স্বরূপে চেনার তাগিদ আর প্রয়োজনেই আহমদ শরীফ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। একটি জাতির ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হলে তার সাহিত্যের মননশীলতার প্রবাহ আর একই সঙ্গে বাংলা লোকায়ত ধর্ম ও তার কার্যকারণসমূহের সঙ্গে গভীর পরিচয় প্রয়োজন; ড. আহমদ শরীফ তাই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দিকে চোখ ফিরিয়েছিলেন। সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তার আগে এমন নিষ্ঠা নিয়ে কেউ প্রায়বিস্মৃত এই সাহিত্যভাণ্ডারকে দেশের বিদ্বজ্জনসমাজে তুলে ধরেননি। বাউল ও সুফী ভাবধারায় অভিষিক্ত বাঙালি জনমানসের অতুলনীয় সম্পাদক আহমদ শরীফ তার তপস্যায় তাকে এনেছেন প্রকাশের আলোতে। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় ও অগ্রগণ্য।

ড. আহমদ শরীফ তার গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গবেষণার কারণে চিরকীর্তিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তিনি পাণ্ডিত্যের সুউচ্চ শিখরে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। সাধারণ বাঙালিকে সংকীর্ণতামুক্ত, মুক্তবুদ্ধির অনুসারী ও যুক্তিবাদী মানসিকতা অর্জনের জন্যও তিনি নিরলস নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন এবং সাধারণ মানুষের কাতারে নিজের স্থান করে নিয়েছেন। জ্ঞানের গরিমা নিয়ে নিজেকে কখনো আবদ্ধ রাখেননি তিনি গ্রন্থের জগতে।

বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির অসুস্থ বিকারে তিনি বিচলিত বোধ করতেন। তাই তিনি ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িক মন-মানসকিতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন বস্তুবাদী দর্শন অবলম্বন করে। এজন্য তাকে নিগ্রহ সইতে হয়েছে প্রচুর। অজ্ঞানতার শক্তি তার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়েছে। 'মুরতাদ' বলে তার বিরুদ্ধে রাজপথে মিছিল করেছে। কোনো মহলের সহানুভূতি কিংবা অনুকম্পা প্রদর্শনের উপর ভরসা না রেখে, আত্মপ্রত্যয় ও মানবতাবাদের উপর অটল বিশ্বাসে আস্থা রেখে তিনি এর মোকাবিলা করেছেন। নতুন প্রজন্মকে মানবতাবাদী ও যুক্তিবাদী করার মানসে ড. আহমদ শরীফ তার শ্রম ও মেধা ব্যয় করেছেন পাণ্ডিত্যের দুর্গম দুর্গে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে। জ্ঞানের সাধনা শুধু আনন্দ ও খ্যাতি লাভের জন্যই নয়, মনুষ্যত্বের বিকাশে সহায়তা করার লক্ষ্যেই ড. আহমদ শরীফ নিজেকে উৎসর্গিত করে গেছেন।

একজন জ্ঞানের সাধক ও মুক্তবুদ্ধির অধিকারী ড. আহমদ শরীফ কখনও স্ববিরোধিতার শিকার হননি, এমন কথা বলা চলে না, কিন্তু তার লক্ষণগুলো তো আমাদের মধ্যেও সমভাবে বিরাজ করছে। কিন্তু একথাটা স্বীকার করতেই হবে, কখনও কোনোরূপ উচ্চাভিলাষ নিয়ে রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়া লাভের মনোভাব বিন্দুমাত্রও তার মনে স্থান পেত না। সততা ও আন্তরিকতার ক্ষেত্রেও তিনি এক অদ্বিতীয় উদাহরণ রেখে গেছেন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কাছে। কোনোরূপ রাষ্ট্রানুগ্রহ লাভের লোভ করেননি তিনি কিংবা যশ লোভাতুর তিনি ছিলেন না।

ড. আহমদ শরীফ কখনও অন্ধ বিরোধিতা দ্বারা চালিত হতেন না। তাই তার মত পরিবর্তন যেসব ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি তা ছিল যুক্তিবাদ ও বাস্তবতার অনুসারী। তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই খণ্ড-বিচ্ছিন্নভাবে করা সম্ভব নয় বলে বিশ্বাস করতেন।

একটি সামাজিক-রাজনৈতিক অঙ্গীকার হিসেবে এই শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই দেশের শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠনের সহযোগিতা ব্যতীত সম্ভব নয়। বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে সমালোচনামুখর হওয়া সত্ত্বেও এরকম অভিমত তিনি পোষণ করেছেন এবং নির্দ্বিধায় তা লিখিতভাবেও তুলে ধরেছেন। জীবন ও মৃত্যুতে তিনি কখনই স্বীয় আদর্শ থেকে দূরে সরে থাকা পছন্দ করতেন না। মৃত্যু তার ইচ্ছাধীন নয় কিংবা অনায়ত্ত বলে স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি মৃত্যুর পরও যাতে বাস্তবতা লাভ করে তাই মৃত্যুর আগেভাগেই স্বীয় শেষকৃত্য অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে এবং মরদেহের সদ্‌গতি সংক্রান্ত একটি উইল করে যান। তদনুযায়ী তার মৃতদেহ মেডিক্যাল কলেজকে হস্তান্তর করা হবে। অনিশ্চিত মৃত্যুর ক্ষেত্রেও তিনি স্বীয় আদর্শ ও মনোভাবকে প্রথাগত সামাজিক অনুষ্ঠানের কাছে সমর্পণ করেননি।

ড. আহমদ শরীফের মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের একটি যুগ সম্পর্কিত জ্ঞানভাণ্ডারে তাঁর অবদানের ও সমৃদ্ধির ধারা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা আমরা মন থেকে মুছে ফেলতে পারি না। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের শোক ও বেদনা একজন মহৎ ব্যক্তিকে হারানোর ক্ষতিজনিত নয় শুধু, একজন আত্মীয় বিয়োগব্যথার মতোই তীব্র সকল লাভ-লোকসানের উর্ধ্বে। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন এই শোক বহন করার শক্তি যেন ধারণ করতে পারেন, এটাই আমাদের কাম্য। তার মৃত্যুতে জ্ঞানভাণ্ডার থেকে একটি অমূল্য রত্ন হারিয়ে যাওয়ার মতোই ক্ষতিগ্রস্ত হলাম আমরা। আমাদের দুঃখ-শোক সেখানে সমধিক।

জনকণ্ঠ

ড. আহমদ শরীফের জীবনাবসান : ড. আহমদ শরীফ আর নেই। তিনি ছিলেন একাধারে একজন মুক্তবুদ্ধির প্রবক্তা, বাংলা সাহিত্যের অনন্যসাধারণ গবেষক, ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সফল শিক্ষক, অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব এবং অসাধারণ বাগ্মী। গোঁড়ামি ও যুক্তিহীনতার কাছে তিনি কখনও মাথা নত করেননি। ৭৯ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হলেও সমাজের প্রগতিশীল ও মুক্তবুদ্ধির চর্চার মানুষের কাছে তাঁর মৃত্যু ছিল আকস্মিক। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নামে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে। গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যাঁরা অভিভাবকের মতো কথা বলেন আমাদের এই সমাজে, তাঁরা নিঃসন্দেহে তাঁকে হারিয়ে একজন অভিভাবক হারিয়েছেন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একজন গবেষক হিসাবে তাঁর খ্যাতি দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও পৌঁছেছিল। বাংলা সাহিত্যের ওপর তাঁর মৌলিক গ্রন্থসংখ্যা ৪০ এবং সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা ৪৩। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে তিনি তাঁর নিরলস শ্রমলব্ধ গবেষণার মাধ্যমে নিয়ে এসেছেন আধুনিক পাঠকের কাছে এবং সেই সঙ্গে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মূল ভাব গোঁড়ামি পরিত্যাগ, কুসংস্কার বর্জন এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন মানুষের মন ও মানস। যুক্তিহীনতা নয় বরং যুক্তির মাধ্যমেই শাশ্বত সত্যকে গ্রহণ করার অনুপ্রেরণা তিনি যুগিয়েছেন তাঁর লেখায় ও বক্তব্যে। তাঁর অভিমতের সঙ্গে আমাদের অনেকেরই অমিল থাকতে পারে,

কিন্তু তাঁর যুক্তিকে খণ্ডন করার মতো জ্ঞান ও মেধার দীনতা অনেককে স্বীকার করতেই হবে। কারণ তাঁর স্পষ্ট বক্তব্যে সর্বদাই থাকত দেশপ্রেম ও মানবতার কথা। একজন দেশহিতৈষী ও মানবতাবাদী হিসাবে তাঁর কর্মময় জীবন ভবিষ্যতেও মুক্তবুদ্ধির চর্চা যাঁরা করবেন, তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করবে।

ড. আহমদ শরীফ জীবদ্দশায় কখনও তাঁর যুক্তিনির্ভর বিশ্বাস থেকে একটুও বিচ্যুত হননি। রাজনৈতিক সংস্কৃতির অসুস্থ বিকারে বিচলিত বোধ করতেন বলেই তিনি বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর কঠোর সমালোচনা করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। কিন্তু তারপরও তিনি বিশ্বাস করতেন যে, অসাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হলে শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠনকেই এগিয়ে আসতে হবে। গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িক মন-মানসিকতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন বলেই তাঁকে অনেক নিগ্রহ সইতে হয়েছে। মানবতাবাদের বিজয়ের ওপর অটল বিশ্বাস ও আস্থা রেখেই তিনি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সকল নিগ্রহের মোকাবিলা করেছেন সুদৃঢ় প্রত্যয়ে। নতুন প্রজন্মকে মানবতাবাদী ও যুক্তিবাদী করার লক্ষ্যেই ছিল তাঁর সমস্ত জ্ঞান-সাধনা। তাই তাঁর মৃত্যুতে জাতি হারালো একজন প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মুক্তচিন্তার মানুষকে। অপূরণীয় ক্ষতি হলো গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজ প্রগতির ক্ষেত্রে। তাঁর মৃত্যুতে বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তা সহজে পূরণ হবার নয়। তাই তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ওপর তাঁর গবেষণাকর্মের জন্যে, একজন মুক্তবুদ্ধির প্রবক্তা হিসেবে এবং সর্বোপরি একজন মানবতাবাদী হিসেবে। তাঁর মৃত্যুতে আমরাও শোকাহত। আমরা তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি জানাই আন্তরিক সমবেদনা।

শোকবাণী শোকবার্তা

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮ ফাল্গুন ১৪০৫
০২ মার্চ ১৯৯৯

প্রিয়

আপনার স্বামী বিশিষ্ট অধ্যাপক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ডঃ আহমেদ শরীফের মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত।

ডঃ আহমেদ শরীফ ছিলেন মুক্তবুদ্ধি ও প্রগতিশীল চিন্তা চেতনার অধিকারী এক বিশাল হৃদয়ের মানুষ। তিনি ছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। তাঁর মৃত্যুতে ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজ প্রগতি ও বিশ্ব সাহিত্যের অঙ্গনে এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হলো।

আমি আপনার পরিবারের শোকসন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি। আমি মরহুমের নিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

বেগম সালেহা শরীফ
বাড়ি নং-২৫/বি
সড়ক নং-১
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
BANGLADESH PARLIAMENT

সংসদ ভবন, ঢাকা
PARLIAMENT HOUSE
DHAKA-1207

বিরোধীদলীয় নেতা

তারিখ ২৬/২/২০১৩

শোক বাণী

মহৎপ্রাণ শিক্ষক ও প্রগতিশীল চিন্তাবিদ অধ্যাপক আহমদ শরীফের মৃত্যু সংবাদে আমরা গভীরভাবে শোকাভিভূত। অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল তিনি বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য ও মুক্তিকামী জনগণের সেবায় লেখনী চালনা করে এবং সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে জাতিকে ঋণী করে গেছেন। তাঁর দুর্জয় সাহস, দুর্লভ কর্তব্যনিষ্ঠা, গভীর দেশাত্মবোধ ও জনগণের কল্যাণে তাঁর অদম্য প্রয়াস দেশবাসীর সামনে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। বাংলাভাষী ভূভাগের ও জনসাধারণের প্রাচীন ও মধ্যযুগের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিস্মৃত তথ্য উদ্ধার করে বিশেষ করে পরিপূর্ণ গুরুত্বে মুসলমান সমাজের ইতিহাস রচনা করে এবং ইতিহাসে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকলকে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দিয়ে তিনি যে কীর্তি রেখে গেছেন তা অবিস্মরণীয়।

আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর অবদান স্মরণ করছি।

আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে প্রয়াত অধ্যাপক আহমদ শরীফের পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

(খালেদা জিয়া)

কয়েকটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী মিলিতভাবে

ড.আহমদ শরীফ-যিনি ছিলেন সংস্কারমুক্ত উদারনৈতিক মানবতাবাদী এবং যিনি কেবল সত্য-সন্ধানী ও জ্ঞানান্বেষী গবেষকই ছিলেন না, একই সাথে ছিলেন অন্যায়-অনাচার, মূর্খতা-নিচতা-কূপমণ্ডুকতা, কুসংস্কার-কু-আচার-বিরোধী এবং সাম্প্রদায়িকতা-ধর্মান্ধতা-মতান্ধতা ও ধর্মীয় ফ্যাসিস্ট আচার-আচরণ এবং সেই সাথে শ্রেণী শোষণ, নির্যাতন ও দুঃশাসন-বিরোধী প্রতিবাদ ও প্রতিকারাকাঙ্ক্ষী বিদ্রোহের এক বিবেকবান অকুতোভয় জাগ্রত চেতনার প্রতীক;

এবং যিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে, কিম্বা কোনো দলীয় শৃংখলার সাথে, কখনো দৃঢ়ভাবে লগ্ন না থাকা সত্ত্বেও সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং সামন্ততান্ত্রিক পশ্চাদ্‌পদতা ও লুটেরা ধনিক শ্রেণী কর্তৃক দেশের সম্পদ লুটপাট ও পাচার এবং তাদের ঘুষ-দুর্নীতি, নৈরাজ্য-বিশৃংখলার দুঃশাসন-বিরোধী দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক শক্তির সকল আন্দোলনে উদ্দীপিত বোধ করতেন এবং স্বপ্রণোদিত হয়ে ওই আন্দোলনের সাথে লেখক হিসেবে, উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তা হিসেবে নিজেকে জড়িত করতেন;

এবং যিনি মার্কসবাদী বিপ্লবী কিম্বা কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার এবং সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রের পক্ষের সকল শক্তির আন্দোলনে উৎসাহ ও প্রণোদনা যুগিয়েছেন এবং ওইসব শক্তি বা সংগঠনের ডাকে উৎসাহের সাথে বিনা দ্বিধায় সাড়া দিয়েছেন, এই দৃঢ় ধারণা থেকে যে মানবসমাজের অগ্রগতিতে সমাজতন্ত্রের কোনো বিকল্প নেই এবং কেবলমাত্র মার্কসবাদী বিপ্লবীদের নেতৃত্বে সার্থক বিপ্লবের মধ্য দিয়েই সমাজের মৌলিক পরিবর্তন হতে পারে, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে মানুষ হিসেবে তাদের প্রকৃত মর্যাদা ও অধিকার, প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সুখী, স্বাচ্ছন্দ্যময়, সমৃদ্ধ, শক্তিশালী ও আপন মর্যাদায় মহিমান্বিত রাষ্ট্র ও সমাজ;

এবং যাঁর কাছ থেকে দীর্ঘদিন ধরে ঢাকার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের কর্মীরা পেয়েছে উৎসাহ ও প্রেরণা, পেয়েছে অকুণ্ঠ সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতা, ওইসব সংগঠনের ক্ষুদে প্রকাশনায় যিনি ছিলেন প্রধান লেখক এবং আলোচনাসভার প্রধান বক্তা, প্রধান অতিথি বা সভাপতির দায়িত্ব যাঁর জন্য ছিলো নির্ধারিত এবং যিনি সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের তরুণ কর্মীদের সবসময় যুগিয়েছেন উৎসাহ ও প্রেরণা;

এবং যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর দীর্ঘ শিক্ষকতার জীবনে জ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ কীর্তিই কেবল স্থাপন করেননি সেই সাথে একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের যান্ত্রিক মানসিকতার ঊর্ধ্বে উঠে সংস্কারমুক্ত ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার শিক্ষা দিয়ে যেমন তাদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন তেমনি তাঁর মতো শিক্ষকের নিকট থেকে সত্য সন্ধান ও জ্ঞানান্বেষণের প্রেরণা পেয়ে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরাও গর্ববোধ করে থাকে;

এবং যিনি শোষক শ্রেণীর নিকট—ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতা-বহির্ভূত উভয় অংশের নিকট-বুদ্ধিজীবী, কবি, লেখক, শিল্পী সাংবাদিক ও সংস্কৃতিকর্মীদের ব্যাপকহারে আত্মবিক্রয়ের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে ঘৃণা প্রকাশ করেছেন এবং ধিক্কার জানিয়েছেন; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদের কালের এই অসামান্য পণ্ডিতকে তাঁর যোগ্য মর্যাদায় অভিষিক্ত না করে নিজেকেই হেয় প্রতিপন্ন করেছে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই;

এবং মুখ্যত, অন্যায়-অনাচার-বিরোধী দ্রোহ সহ্য করতে না পেরে ধর্মীয় ফাসিস্ত শক্তি প্রাণনাশের হুমকি দিয়েও যাঁকে দমাতে পারেনি এবং দেশবাসীর কাছে যাঁকে হেয় করার অবিরাম চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়েছে, সেই ফাসিস্ত শক্তি অবশ্যই ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে;

এবং যিনি মৃত্যুর পূর্বে চোখ দান করার এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার জন্য মরদেহ দান করার ইচ্ছাপত্রে স্বাক্ষর দিয়ে এক অনুসরণীয় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন;

সেই অকুতোভয় নিরহংকারী পণ্ডিত ড. আহমদ শরীফ-এর আকস্মিক মৃত্যুতে (২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ বুধবার ভোর ১-৪০টা) আমরা—সংস্কৃতি আন্দোলনের কর্মীরা-গভীরভাবে মর্মাহত এবং মনে করি যে, তাঁর মৃত্যুর ফলে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা সহসা পূরণ হবার নয়। সেই শূন্যতা পূরণের যে কোনো চেষ্টাই হবে ড. আহমদ শরীফ-এর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন।

সত্য সন্ধান, জ্ঞানান্বেষণ এবং প্রতিবাদ ও দ্রোহের প্রতীক ড. আহমদ শরীফ-এর স্মৃতি অক্ষয় হোক।—সৃজন, সূচনা অধ্যয়ন চক্র, কবি সুকান্ত স্মৃতি সংসদ, সমাজ চেতনা, বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, আত্মপ্রতিকৃতি, মাতৃধারা, গণশিল্পী সংস্থা, শহীদ বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিক স্মৃতি সংসদ, শহীদ আসাদ পরিষদ, বাংলাদেশ লেখক শিবির, আপেক্ষিক, চারণ, প্রত্যয় সাংস্কৃতিক আন্দোলন, প্রগতি সংস্কৃতি সংসদ, গণছায়া, ধাবমান, লেলিহান সাহিত্য সংস্কৃতি গোষ্ঠী, গণ-সংস্কৃতি পরিষদ এবং উন্মেষ সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ড. আহমদ শরীফের আড্ডায় অংশগ্রহণকারী অনুসারীবৃন্দ

আজন্ম বিদ্রোহী প্রাজ্ঞ পণ্ডিত সাহিত্যিক ড. আহমদ শরীফ গত ২৪.২.৯৯ মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১.৪০ মিনিটে শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশ ও জাতি একজন কৃতি সন্তান হারাল। আমরা সোহরাওয়ার্দী

উদ্যানে ড. আহমদ শরীফের আড্ডায় অংশগ্রহণকারী অনুসারীবৃন্দ তাঁর মৃত্যুতে গভীরভাবে মর্মাহত ও শোকাহত। একই সাথে আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করছি।

ড. আহমদ শরীফ ছিলেন দেশহিতৈষী, মানবতাবাদী, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অন্ধবিশ্বাসমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল চিন্তাচেতনার ধারক ও অনলবর্ষী বক্তা। তিনি ছিলেন অন্যায়, অবিচার, শোষণ, জুলুম ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে আমৃত্যু সোচ্চার প্রতিবাদী।

ড. আহমদ শরীফ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর বিশ্বাস ও নীতিতে ছিলেন অটল। কোনো লোভ-লালসা ও ভয়ভীতির কাছে তিনি মাথা নত করেননি কখনো।

অসাম্প্রদায়িক উদারচেতা প্রাজ্ঞ মহান ব্যক্তিত্ব ড. আহমদ শরীফ ছিলেন বুদ্ধি বিকিকিনির বাজারে এক প্রতিবাদী কণ্ঠ। অর্থ-বিত্ত-ক্ষমতার কাছে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা যখন পদানত তখনো তিনি ছিলেন অন্ধকারে নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল। তিনি ছিলেন প্রগতির পাঞ্জেরী। কুসংস্কার ও পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন বিজ্ঞানমনস্কতার প্রতিভূ। প্রগতিশীল মুক্তচিন্তার মানুষ ড. আহমদ শরীফ পাণ্ডিত্য ও মৌলিক গবেষণার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে একজন সফল ব্যক্তিত্ব। তাঁর মৃত্যুতে দেশের গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ প্রগতির ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হলো।

দেশের সকল প্রগতিশীল আন্দোলন, বিশেষ করে ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ড. আহমদ শরীফের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ দেশবাসী ও আমাদের সকলের প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে।

তাঁর আদর্শ, বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা ও কর্মকাণ্ডের প্রতি আমাদের থাকবে গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা।

তিনি চিরদিন আমাদের স্মৃতিতে ও অন্তরে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন।

আমরা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের যে জায়গায় বসে সময় কাটাতাম, সে জায়গাটিকে শরীফ চত্বর হিসাবে লালন করব।—এ. এম. শামসুল হক, মনজুর মোর্শেদ, মোঃ মতিউর রহমান, আবু রফিক খান, মোঃ আলমগীর, সুভাষ ভট্টাচার্য, বিনয় ভূষণ রায়, রিপন কুমার দেবনাথ, আবদুস সালাম, মোঃ বশীর আহাম্মেদ, মোহাম্মদ ইউনুস, কাজী সৈকত, মোঃ মোস্তফা কামাল, আনিছুর রহমান, ফরহাদ খান, তপন কুমার দে, জাহাঙ্গীর কবীর, রেজাউল করিম রেজা, অরুণ কান্তি অধিকারী, মোঃ ইমরুল কায়েস খান, মঈন, ভজন সরকার, রতন, বৈদ্য বাবু, প্রকৌশলী ফরিদ, সুভাষ বড়ুয়া, মোহন সাহা, আজাদ, ভবরঞ্জন চক্রবর্তী, সুভংকর সরকার, ড. সমীরণ ভট্টাচার্য্য, মোঃ জহুরুল হক, অরবিন্দ কর।

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক আহমদ শরীফ : বাংলা বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রখ্যাত পণ্ডিত ও গবেষক, দেশবরেণ্য চিন্তাবিদ ও প্রাজ্ঞ মনীষী ডক্টর আহমদ শরীফের মৃত্যুতে দেশ তার সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজনকে হারাল। বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে ডক্টর আহমদ শরীফের সমতুল্য গবেষক এখন খুবই বিরল। বিশেষ করে মধ্যযুগের সাহিত্য

গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদান স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় তাঁর নামই সর্বাগ্রগণ্য। আমাদের মনন চর্চায়, জ্ঞান দর্শন ও মুক্তবুদ্ধির পরিচর্যায়, মানবতাবাদী অসাম্প্রদায়িক ধ্যানধারণায়, সর্ব প্রকার সামাজিক-রাজনৈতিক অন্যায়-অবিচার ও পীড়নের প্রবল বিরোধিতায়, গণমানুষের পক্ষে সাহসী ও সংগ্রামী ভূমিকায় এবং সর্বোপরি প্রগতিশীল ও প্রেরণামূলক চিন্তাচেতনায় ডক্টর আহমদ শরীফ দেশের অতি বরণীয় ও স্মরণীয় বুদ্ধিজীবী। আমাদের শিক্ষক ডক্টর আহমদ শরীফের আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর বেদনা ও শোক অনুভব করছি এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি বিশেষ করে তাঁর স্ত্রী ও তিন পুত্রের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। –ড. সাঈদ-উর রহমান, প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি, কেন্দ্রীয় কমিটি

বিপ্লবের অকৃত্রিম হিতাকাঙ্ক্ষী ড. আহমদ শরীফের জীবনাবসানে বিবৃতি : ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯ : স্বনামধন্য পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী ড. আহমদ শরীফ গতকাল (২৪ ফেব্রুয়ারি) ভোর রাতে ৭৯ বছর বয়সে হৃদযন্ত্রের অসুখে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেছেন। এদেশের নিপীড়িত জনগণের বিশ্বস্ত বন্ধু ড. শরীফের জীবনাবসানে আমাদের পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি গভীর শোক প্রকাশ করছে।

ড. শরীফ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট ছিলেন না। কিন্তু মার্কসবাদ ও মার্কসবাদী বিপ্লবের প্রতি তাঁর ছিল প্রকাশ্য ও দৃঢ় সমর্থন এবং আস্থা ও আশাবাদ। তিনি এদেশের নিপীড়িত জনগণের সংগ্রাম, বিশেষত বিপ্লবী সংগ্রামের পক্ষে ছিলেন উচ্চকণ্ঠ সমর্থক ও সক্রিয় সংগ্রামী। বিশেষত এদেশের বুর্জোয়া রাজনীতি ও রাষ্ট্রের ভণ্ডামি, কলুষতা, নীচুতা ও গণবিরোধিতাকে তিনি নির্মমভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেছেন তাঁর লেখনী, আলোচনা ও ভাষণে। অসীম সাহসিকতায় তিনি ধর্ম প্রশ্নে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নাস্তিক্যবাদকে প্রচার করেছেন। তিনি ছিলেন বিশ্ব-জনগণের দুশমন মার্কিন-সাম্রাজ্যবাদের এক কট্টর সমালোচক ও বিরুদ্ধাচরণকারী। বিদ্যমান গণবিরোধী ব্যবস্থা, রাজনীতি ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন এক সাহসী বিদ্রোহী—যা কিনা এদেশের প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীদের মাঝে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হিসেবে তাঁকে পরিচিত করেছিল। আমাদের পার্টি-প্রতিষ্ঠাতা শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদারের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনে সর্বদাই তিনি ছিলেন অগ্রণী।

পার্টি ড. শরীফের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছে এবং তাঁর শোকার্ত পরিবার ও ঘনিষ্ঠজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

পার্টি ড. শরীফের অসমাপ্ত সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়ার জন্য এদেশের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘ

আমাদের কথা : এক যুগেরও পূর্বে প্রতিষ্ঠিত স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মুক্তচিন্তার ধারক-বাহক দ্রোহের প্রতীক অধ্যাপক ড. আহমদ শরীফের প্রয়াণে আমরা শোকাহত।

সমাজ পরিবর্তনে কর্মরত সকল প্রগতিশীল রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মীদের সুহৃদ-দিশারী সাহসী ড. আহমদ শরীফ যেমন সদা খড়্গহস্ত ছিলেন সকল দেশী-বিদেশী শোষক-নির্যাতক ও ধর্মব্যবসায়ীদের প্রতি তেমনই প্রবল ঘৃণা পোষন করতেন ভণ্ড-মুখোশধারী তথাকথিত প্রগতিশীলদের প্রতি।

তাঁর আদর্শ ও কর্মের পতাকা বহনের দায়িত্ব আজ আমাদের সকলের। এ দায়িত্ব পালনে আমরা সাহসের সঙ্গে কাজ করে যাবো—এ আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

এভাবেই আমরা তাঁর প্রতি নিয়ত শ্রদ্ধা জানিয়ে যাবো।—আজিজ মেহের, সমন্বয়কারী।

বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ

বাংলাদেশের অন্যতম স্বনামধন্য পণ্ডিত অধ্যাপক আহমদ শরীফের মৃত্যুতে বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের শোক প্রস্তাব : আমরা বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের পক্ষ থেকে গভীর বেদনাবোধ ও শোকের সাথে স্বনামধন্য পণ্ডিত, অধ্যাপক ও বিরল গবেষণা প্রতিভার অধিকারী ও বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ড. আহমদ শরীফকে আন্তরিক শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করছি। তাঁর বিচিত্র কর্মমুখর জীবনে তিনি পেশাগত সাফল্যের যে চরমোৎকর্ষ অর্জন করেছিলেন তা যে কোনো জ্ঞানসেবী ব্যক্তির জন্য নিতান্ত ঈর্ষা ও শ্লাঘার বিষয়। আমাদের অনুন্নত এ সমাজের অবহেলিত ও শোষিত গণমানুষের প্রতি তিনি যে সহানুভূতি ও একাত্মতা পোষণ করতেন তার মধ্যে কোনো কপটতা ছিল না। তাঁর প্রাণের ছোঁয়া বিদগ্ধ পাঠককে সহজেই আকর্ষণ করে। বিবেকতাড়িত আত্মানুসন্ধানের যে পরাকাষ্ঠা তিনি প্রদর্শন করেছেন তাতে কল্যাণ দর্শনের অগ্রগতিতে একটি অত্যুজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে বলে বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ মনে করে। কর্মমুখর বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী এ জ্ঞানতাপসের তিরোধানে বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ গভীরভাবে শোকাহত। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।—প্রফেসর ইনাম-উল হক, সভাপতি, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ।

সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতি

বরাবর, বেগম ড. আহমদ শরীফ, বাসা নং ২৫ বি, রোড নং ১, ধানমণ্ডি, ঢাকা : জনাব, সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতি ও সন্ধানী আন্তর্জাতিক চক্ষুব্যাংক-এর কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা নেবেন।

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি '৯৯ ভোরে এদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, গবেষক এবং সংকীর্ণতা, আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদবিরোধী চেতনার অকুতোভয় সৈনিক ড. আহমদ শরীফ-এর মৃত্যুতে আমাদের সমিতির সকল সদস্যবৃন্দ গভীরভাবে মর্মাহত ও শোকাভিভূত।

মরহুম ড. আহমদ শরীফ এদেশের লক্ষাধিক হতভাগ্য দৃষ্টিহীনদের কথা বিবেচনা করে মরণোত্তর চক্ষুদানের মাধ্যমে যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন; আমরা আশা করব তাঁর পদাংক অনুসরণ করে এদেশের সর্বস্তরের মানুষ দৃষ্টিহীনদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে।

আমরা তাঁর বিদেহী রূহের মাগফেরাত কামনা করছি ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। এই বিপর্যয় সহ্য করার মত ধৈর্য্য ও সাহসদান করার জন্য পরম করুণাময় আল্লাহপাকের নিকট মোনাজাত করছি।—ডাঃ মনিরুল ইসলাম খান, মহাসচিব; রুহুল আমীন মজুমদার, সভাপতি।

অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী

শোক প্রস্তাব : বাংলাদেশের বিবেক হিসাবে খ্যাত অকুতোভয় সংস্কৃতিসেবী বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ড. আহমদ শরীফ গত ২৪ফেব্রুয়ারি '৯৯ লোকান্তরিত হওয়ায় আমরা গভীরভাবে শোকাভিভূত। তাঁর পরিবারের শোকসন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

সত্যসন্ধ এই মহাপুরুষ নিরলসভাবে মানবতা, মনুষ্যত্ব, শোষণমুক্তি ও ইহজাগতিকতার পক্ষে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। চিন্তাধারার স্বচ্ছতা, অকপটতা, আপোসহীনতা এবং সর্বোপরি আম-জনতার পক্ষে অনড় অবস্থান তাঁকে বিশিষ্ট ভূমিকায় আসীন করেছে।

অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ২৭ ফেব্রুয়ারি '৯৯ তারিখে বাংলাদেশ বুড্ডিষ্ট ফাউন্ডেশন হলে অনুষ্ঠিত 'অমর একুশে স্মরণে' আলোচনা সভায় এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালনের মাধ্যমে ড. শরীফের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

উল্লেখ্য, উক্ত অনুষ্ঠানমালা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদন করা হয়।—এডভোকেট প্রেমাংকুর বড়ুয়া, সভাপতি, অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী।

বিপ্লবী জাতীয় শ্রমিক আন্দোলন (দ্বিতীয় জাতীয় কমিটি)

অন্তিম শয়ানে শায়িত বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী ও বিপ্লবী জাতীয় বীর ড. আহমদ শরীফ-এর প্রতি : এদেশের ব্যাপক শ্রমিক, কৃষক, যুবক ও নারীসহ ব্যাপক জনগণ এবং সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন-এর অন্তিম শ্রদ্ধা ও বিপ্লবী অভিবাদন। ড. আহমদ শরীফ-বিপ্লবী লাল সালাম! এদেশে প্রগতিশীল মুক্তচিন্তা ও যুক্তিনিষ্ঠ বস্তুবাদী দর্শনকে জনগণের মাঝে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান পুরোধা, গবেষক ও জ্ঞানতাপস, শিক্ষকদের শিক্ষক, সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলা-মুৎসুদ্দি দালাল পুঁজিবাদের শাসন-শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে আজীবন সোচ্চার কণ্ঠ, বিরুদ্ধ স্রোতে সাহসী সাঁতারু, দুঃসময়ের সাহসী বিবেক ড. আহমদ শরীফ গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ভোর রাতের প্রথম প্রহরে মৃত্যুবরণ করেছেন। বেদনাসিক্ত হৃদয়ে আমরা অনুভব করছি যে অত্যন্ত পরিণত বয়স সত্ত্বেও ড. আহমদ শরীফ-এর এই মৃত্যু জনগণের মুক্তির

বিপ্লবী সংগ্রামের সম্মুখ সারির বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের কাতারে যে বিশাল শূন্যতার সৃষ্টি করলো তা সহজে পূরণ হবার নয়। ড. আহমদ শরীফ-এর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাভিভূত। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জনগণের স্বার্থে জ্ঞান সাধনার এবং অর্জিত জ্ঞানকে জনগণের সেবায় নিবেদন করার নিরলস সেনানী, এই আমৃত্যু বিদ্রোহী মহান চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও ক্লান্তিহীন লেখকের প্রতি আমরা জ্ঞাপন করছি আমাদের হৃদয়ের তলদেশ থেকে উৎসারিত গভীর শ্রদ্ধা ও সুউচ্চ সম্মান।

ড. আহমদ শরীফ,

সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, সামন্তবাদ, আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ, প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় মৌলবাদ, সামরিক-বেসামরিক বা তথাকথিত সংসদীয় ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরতন্ত্র এবং সকল প্রকার প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে আপনি আজীবন আপোসহীন সংগ্রাম করেছিলেন, সংগ্রাম করেছিলেন নারীর উপর পুরুষতান্ত্রিক শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে, উগ্র ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে। এদেশের জনগণের বিপ্লবী পূর্বসূরীদেরকে আপনি সুউচ্চ মর্যাদায় ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন; তাদের থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য বারবার জনগণকে আহ্বান জানিয়েছেন। আর নিজের জীবনের দীর্ঘ অনুশীলনেও ক্রমবর্ধিতভাবে আপনি জনগণের ন্যায্য সংগ্রামগুলোর পক্ষাবলম্বন করেছেন। এজন্য প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা হত্যার হুমকি বা জীবনের ঝুঁকিকেও তুচ্ছ করেছেন। সর্বোপরি এদেশের জনগণের শ্রেষ্ঠ সন্তান ও মাওবাদী বিপ্লবী নেতা কমরেড সিরাজ সিকদারকে সকল দুঃসময়ে ও সকল প্রতিকূলতার মধ্যেও নিঃশর্তভাবে ও দৃঢ়ভাবে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার ও অনুসরণ করার বীরত্বপূর্ণ ও মহান বিপ্লবী সংগ্রামে এদেশের জনগণ সর্বদাই আপনাকে সামনের সারিতে অবস্থান করতে দেখেছে। পেরুর গণযুদ্ধকে সমর্থন করার আন্দোলনে, গনজালোর জীবন রক্ষার জন্য রিম-এর আহ্বানে স্বর্গ-মর্ত্য কাঁপানোর বিশ্বব্যাপী গণআন্দোলনে, মাও সেতুঙের জন্মশতবার্ষিকীর বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও উৎসবে, নারী ও শিশুদের অধিকারের আন্দোলনে, পরিবেশ রক্ষার ও জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষার আন্দোলনে, আর সর্বোপরি এ দেশের জনগণের প্রতিটি ন্যায্য সংগ্রামে ও বিদ্রোহে জনগণ আপনাকে সাথে পেয়েছে।

সুস্পষ্টভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমগ্র দেশের মধ্যে বিরল ব্যতিক্রম হিসেবে একদলীয় ফ্যাসিস্ট বাকশালে যোগদানে আপনার সাহসী ও একগুঁয়ে অস্বীকৃতি, জিয়া ও এরশাদ স্বৈরতন্ত্রদের সাথে আপোসের সংশোধনবাদী আত্মসমর্পণবাদী-পরাজয়বাদী-সুবিধাবাদী পথকে হেলায়-ঘৃণায় আপনার প্রত্যাখ্যান, ফ্যাসিস্ট এরশাদের চরম বর্বর পুলিশী নিপীড়নের মুখে বিপ্লবী স্পর্ধা ও দুঃসাহসের সাথে গ্রামাঞ্চলের শ্রমিক-কৃষক-জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামকে সমর্থন, মওলানা ভাসানীর মত করে "সিরাজ সিকদারের সন্তান"দেরকে সাহস, সমর্থন, অনুপ্রেরণা ও অভিবাদন প্রদান-ইত্যাদি সবকিছুকেই এদেশের ব্যাপক মুক্তিকামী শ্রমিক-কৃষক-জনগণ কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও গর্বের সাথে চিরকাল স্মরণ রাখবে।

আপনার মত প্রকাশকে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদ ও শাসকশ্রেণীগুলোর মদদে প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদীরা যখন আপনাকে 'মুরতাদ' বা 'কাফের' বলে ঘোষণা করলো আর হত্যার প্রচেষ্টাও চালালো, তখন কেউ কেউ আপনাকেই বরং 'বাড়াবাড়ির'

অভিযোগে অভিযুক্ত করে ক্ষমা চাওয়ার আত্মসমর্পণবাদী-পরাজয়বাদী উপদেশ দিয়েছিল। কিন্তু কি বিস্ময়কর সাহস ও অকুতোভয় দৃঢ়তায় ঘৃণার সাথে আপনি বরাবরের মতই মাথা উঁচু করে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং প্রায় এককভাবে সংগ্রাম করেছিলেন। আর সবশেষে নিজ মৃতদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও গবেষণার জন্য দান করার মধ্য দিয়ে আপনি আপনার মৃত্যুকেও জনগণের সেবায় উৎসর্গ করে এ যুগের আরেক সাহসী পুরুষ ও বস্তুবাদী দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বরের মতই এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন।

নিজের সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন—আপনি কমিউনিস্ট ছিলেন না। নিজের দার্শনিক সচেতনতা ও বিশ্বাসের সাথে নিজের মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তব কর্ম বা অনুশীলনের পার্থক্য এবং নিজের শ্রেণীগত অবস্থান-এর সীমাবদ্ধতাগুলোকে আপনি সততা ও সাহসিকতার সাথে খোলামেলাভাবে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু একজন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী হয়েও আপনি শ্রমিক ও কৃষকদেরকে ইতিহাস সৃষ্টির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে উপলব্ধি ও স্বীকার করেছিলেন। মাও সেতুঙ থেকে শিক্ষা নিয়ে শ্রেণী সংগ্রামকে ইতিহাসের চাকা ঘোরানোর চাবিকাঠি বলে প্রচার করেছিলেন; প্রচলিত সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছিলেন আর সেজন্য বিদ্রোহ ও বিপ্লবের আহ্বান জানিয়েছিলেন। ঠিক এখানেই ছিল মালেমাবাদী কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সাথে আপনার ঐক্য ও নৈকট্যের যোগসূত্র। একজন কমিউনিস্ট না হয়েও নয়া গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের লক্ষ্যে শ্রমিক শ্রেণী ও জনগণের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক লড়াইকে আপনি অত্যন্ত সচেতনভাবে ও দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছিলেন। শ্রমিকশ্রেণীকে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকে ও বিপ্লবী কমিউনিস্টদেরকে সমাজ বদলের বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগ্রামে সর্বোচ্চ সম্মান ও নেতৃত্বের মর্যাদায় আপনি সঠিকভাবেই অভিষিক্ত করেছিলেন এবং তাদের নেতৃত্বকে মেনে নেওয়ার কথা প্রকাশ্যে ঘোষিণা করেছিলেন—যা এদেশের বুদ্ধিজীবী আন্দোলনে বিরল।

জীবন সায়াহ্নে এসে এদেশের বিপ্লবী আন্দোলনের সর্বগ্রাসী সংকট দেখতে পেয়ে আপনি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, বিপ্লবীদেরকে দিশারীসুলভ সমালোচনা ও ভর্ৎসনা করেছিলেন এবং সিরাজ সিকদারকে অবিচলভাবে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য ও সিরাজ সিকদারের শিক্ষাকে অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। আপনার এই একগুঁয়ে এবং সঠিক দাবিকে আমরা সর্বদা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ ও অনুসরণ করবো। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদকে উৎখাত করে এদেশের সত্যিকার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র তথা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে এবং সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম তথা সমগ্র মানবতার মুক্তির সুদীর্ঘ আঁকাবাঁকা সংগ্রামে আপনার আজীবনের আপোসহীন সংগ্রাম ও দুঃসময়ে প্রদর্শিত আপনার দৃষ্টান্তমূলক সাহস থেকে আমরা বারবার শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা লাভ করবো।

একজন পেশাদার শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও দর্শনের সুকঠিন ক্ষেত্রে কর্ম ও কৃতিসমূহের মাধ্যমে সমাজ ও জনগণের জন্য আপনি বিরাট মৌলিক অবদান রেখেছেন। কিন্তু তাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে সকল প্রতিক্রিয়াশলীতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সংগ্রাম, বিদ্রোহ ও বিপ্লবের প্রতি ও ব্যাপকভাবে জনগণের

প্রতি আপনার পক্ষাবলম্বন। এগুলো আপনাকে পরিণত করেছে "জনগণের নিজেদের লোক"-এ।

কিন্তু আপনার সুমহান কীর্তিকে নস্যাৎ করার হীন লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী মহল আপনাকে কাট-ছাঁট করে নিজেদের সুবিধামতো চিত্রিত করার ও নিজ নিজ স্বার্থে আপনার জীবন, কীর্তি ও এমনকি মৃত্যুকেও কাজে লাগাবার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। আমরা এগুলো দৃঢ়ভাবে উন্মোচন ও বিরোধিতা করবো।

ড. আহমদ শরীফ,

আপনাকে অন্তিম শয়ানে শায়িত রেখে আমরা ঘোষণা করতে চাই যে আপনাকে বিপ্লবী জাতীয় বীর-এর সুউচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করে আমরা নিজেরাই গৌরবান্বিত বোধ করছি।

এদেশের শ্রমিক, কৃষক, যুবক, নারী, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী ও দেশপ্রেমিক ব্যাপক জনগণের জীবনে, সংগ্রামে ও হৃদয়ে আপনি যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবেন।

বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু পরিষদ

ড. আহমদ শরীফের জীবনাবসানে শোকসভা : বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে ড. আহমদ শরীফের জীবনাবসানে এক শোকসভা অদ্য ২৬.২.৯৯ ইং তারিখে সকাল ১০টায় সংগঠনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই শোকসভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু পরিষদের সভাপতি শ্রী প্রেমরঞ্জন দেব। আলোচনায় অংশ নেন সর্বশ্রী সুধীন রায় নারায়ণ, সাধারণ সম্পাদক ছত্রনারায়ণ দাস, প্রচার সম্পাদক অধ্যাপক এম. এল. চৌধুরী, ছাত্র ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট গৌতম দাস, ধর্মবিষয়ক সম্পাদক শ্রীমৎ শান্তি রঞ্জনদাস মহারাজ, কেন্দ্রীয় নেতা শৈলেন সিংহ রায়, সুনীল বর্মণ ও শৈলেন্দ্র নারায়ণ পুরকায়স্থ।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত : আমাদের বাংলাদেশে এই শতাব্দীতে আন্তর্জাতিকমানের যে দু'একজন পণ্ডিতব্যক্তি ছিলেন তার মধ্যে ড. আহমদ শরীফ অন্যতম। তিনি বিংশ শতাব্দীর মানুষ হলেও তাঁর দার্শনিক চিন্তাসমূহ কাল থেকে কালে, শতাব্দী পরম্পরায় নিবেদিত। সক্রেটিস, প্লেটো, ডারউইন, মার্কস এবং এই উপমহাদেশের বৈশেষিক দর্শন বা সাংখ্যদর্শনের দার্শনিকদের মত মেধা, বিশ্বাস, মত, বক্তব্য ও জীবনযাপন পদ্ধতিতে পরিপূর্ণ একজন সুস্পষ্ট মানুষ তিনি। তিনি শুধু বর্তমানের নন, ভবিষ্যতেরও। এককথায় আহমদ শরীফ একটা চলমান নক্ষত্র। সমগ্র মানবজাতির এক অনন্য ঋষি। মানবিক গুণাবলীর সর্বক্ষেত্রে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর মতো অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি খুব বেশী দেখা যায় না। আমরা একজন প্রকৃত অভিভাবককে হারালাম। তাঁর স্মৃতির প্রতি রইলো আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা।–অধ্যাপক এম.এল. চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু পরিষদ।

বস্তি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি

বস্তিবাসী নিপীড়িত জনগণের ঘনিষ্ঠবন্ধু ড. আহমদ শরীফের মৃত্যুতে শোক: গত মঙ্গলবার ২৪ ফেব্রুয়ারি ভোররাত ১টা ৪০ মিনিটে মৃত্যুবরণ করেন এদেশের বস্তিবাসী জনগণের বুদ্ধিজীবী বন্ধু ড. আহমদ শরীফ।

বস্তিবাসী জনগণকে যখনই রাষ্ট্র-সরকার নির্মমভাবে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে তখনই তিনি বস্তিবাসী জনগণের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন।

তিনি ছিলেন সকল সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদ-সামন্তবাদ-ধর্মীয় মৌলবাদ বিরোধী আপোসহীন যোদ্ধা।

আমরা এমন একজন বন্ধুকে হারিয়ে গভীরভাবে শোকাহত এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি জানাই সমবেদনা।—জাফর হোসেন, সভাপতি, শামসুদ্দিন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক, বস্তি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি।

বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন : জাতীয় কমিটি

বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী ড. আহমদ শরীফের মৃত্যুতে শোক : গত মঙ্গলবার ২৪ ফেব্রুয়ারি '৯৯ ভোররাত ১টা ৪০ মিনিটে মৃত্যুবরণ করেছেন এদেশের খ্যাতিমান ভাষাপণ্ডিত, সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদ-ধর্মীয় মৌলবাদ-সামন্তবাদবিরোধী অমিততেজ, আপোসহীন লড়াকু বুদ্ধিজীবী ড. আহমদ শরীফ।

তিনি গত ২রা জানুয়ারিতে শত প্রতিকূলতা, শারীরিক অসুস্থতা থাকা সত্ত্বেও কমরেড সিরাজ সিকদারসহ ৩০ হাজার বামপন্থী বিপ্লবী শহীদের স্মরণে 'জাতীয় শহীদ দিবস'-এ প্রতিবারের ন্যায় বিশিষ্ট বক্তার ভূমিকা রেখেছেন।

আমরা বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন এমন একজন মাথা উঁচু সমাজতন্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাসী বিপ্লবী বুদ্ধিজীবিকে হারিয়ে গভীরভাবে শোকাহত এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি জানাই সমবেদনা।—বিধু সরকার, সভাপতি, জাতীয় কমিটি, বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন।

বিপ্লবী নারী মুক্তি

ড. আহমদ শরীফের মৃত্যুতে শোক : গত মঙ্গলবার ২৪ ফেব্রুয়ারি ভোররাত ১টা ৪০মিনিটে মৃত্যুবরণ করেন এদেশের খ্যাতিমান প্রগতিশীল বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী ড. আহমদ শরীফ।

তিনি ছিলেন সকল সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদ-সামন্তবাদ-ধর্মীয় মৌলবাদবিরোধী আপোসহীন যোদ্ধা।

তিনি শোষিত-নিপীড়িত শ্রমিক-কৃষকসহ নারীমুক্তি সংগ্রামের একজন দৃঢ় শুভাকাঙ্ক্ষী। তিনি সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী আজীবন বিদ্রোহী।

আমরা তাঁর মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।—ইসরাত সুলতানা, আহ্বায়িকা, বিপ্লবী নারী মুক্তি।

গণ বিশ্ববিদ্যালয়

গণ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ আজ ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ ইং তারিখ দুপুর ১২টায় ৪১২ নম্বর কক্ষে প্রফেসর আহমদ শরীফের আকস্মিক মৃত্যুতে এক শোকসভার আয়োজন করে। প্রয়াত অধ্যাপকের সংস্কৃতি অনুরাগের প্রশংসা করে শিক্ষাক্ষেত্রেও তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, তিনি প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম সদস্য।

গাকসুর এই সভা মুক্তচিন্তার সাহসী প্রবক্তা প্রফেসর আহমদ শরীফের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মাহমুদ শাহ কোরেশীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় ছাত্রদের মধ্যে বক্তৃতা করেন গোকুল চন্দ্র কুন্ডু, শাহীন বিন আব্দুল হাই, মামুনুর রহমান জাহাঙ্গীর, হাদিউজ্জামান এবং শিক্ষকদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব আজহারুল ইসলাম ও জাহিদ আক্তার। সভায় প্রয়াত অধ্যাপকের শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।—অধ্যাপক মাহমুদ শাহ্ কোরেশী, সভাপতি, ছাত্র সংসদ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নেহাল করিম, সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রিয় ড. করিম, শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আপনার পিতা, আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের চূড়ামণি, অধ্যাপক আহমদ শরীফ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন জেনে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছি এবং আপনাকে গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। পিতামাতা যতই বয়ঃপ্রাপ্ত হন না কেন সন্তানের কাছে তাঁরা আল্লাহ পাকের খাশ নিয়ামত হিসাবে বেঁচে থাকেন। কাজেই পিতা হারানোর শোক বহন করা সন্তানের কাছে অত্যন্ত দুরূহ হয়। আল্লাহ পাক আপনার পিতার আত্মার প্রতি শান্তিবর্ষণ করুন এবং এ শোক সহ্য করার শক্তি আপনাকে দান করুক।

আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন কামনা করছি।—অধ্যাপক ড. মোঃ শাহাদত আলী, প্রো-উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক আহমদ শরীফের জীবনপঞ্জি

অধ্যাপক আহমদ শরীফের জীবনপঞ্জি

রচনা ও গবেষণা : আফজালুল বাসার
গবেষণায় সহযোগিতা করেছেন : যাহেদ করিম স্বপন, ইসমত আরা চৌধুরী কাজল, স্বপন কুমার শিকদার, আবু তাহের কাজল, এম. এম. অনুপম, ওয়াহিদ জাবেদ।

(নোট : পুস্তক-পুস্তিকা, খবরের কাগজ, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য, বিষয়, বিবৃতি, আলোচনা, অধ্যাপক আহমদ শরীফ সম্পর্কিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ ইত্যাদি থেকে এই পঞ্জিতে ব্যবহৃত তথ্যাবলি স্বাধীনভাবে আহরণ ও গ্রহণ করা হয়েছে। কোথাও কোথাও সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। অনেক জায়গাতে ভাষা পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অধ্যাপক আহমদ শরীফের ঘটনাবহুল জীবনের পঞ্জি প্রণয়ন অত্যন্ত ব্যাপক ও দুরূহ কাজ। তার পূর্ণাঙ্গ জীবনপঞ্জি রচনার জন্য দীর্ঘ সময় প্রয়োজন।)

১৮৪০

পিতামহ মুন্সী আইনউদ্দীনের জন্ম। তিনি ছিলেন সরকারী জজ কোর্টের নকলনবিস।

১৮৬৯

১২৭৭ বঙ্গাব্দ, ১২৩৩ মঘী, ২৫শে আশ্বিন (সেপ্টেম্বর) আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের জন্ম। তিনি অধ্যাপক আহমদ শরীফের পিতৃব্য এবং পিতৃতুল্য। তার মানস অঙ্কে আহমদ শরীফের বৃদ্ধি। তিনি ছয় শতাধিক পুথির পরিচয়মূলক বিষয়, সাহিত্য এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন ৪০৬টি এবং গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন ১৬টি। তিনি ২৫০০ পুথি সংগ্রহকারী।

১৮৭৩

বদিউন্নেসার জন্ম। তিনি আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের স্ত্রী এবং অধ্যাপক আহমদ শরীফের ফুফু ও মাতৃতুল্য। তাঁর নিকটে অধ্যাপক আহমদ শরীফ শৈশবে মাতৃস্নেহে লালিত হন।

১৮৮০

অধ্যাপক আহমদ শরীফের বাবা আবদুল আজিজের জন্ম। তিনি ছিলেন চট্টগ্রামের সরকারী কলেজিয়েট স্কুলের করণিক।

১৮৮৮

অধ্যাপক আহমদ শরীফের মাতা সিরাজ খাতুনের জন্ম। ১৬ বছর বয়সে ১৯০৪ সনে তাঁর বিবাহ হয়।

১৯০৮

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আহমদ কবিরের জন্ম। তিনি সরকারী চাকরি করতেন। মৃত্যু ১৯৭২।

১৯১৮

ভগ্নি সাজেদ আরার জন্ম। গৃহিণী। মৃত্যু ১৯৯৮।

১৯১৯

অধ্যাপক আহমদ শরীফের ভ্রাতা আহমদ সোবহানের জন্ম। তিনি আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। মৃত্যু ১৯৮৪।

১৯২১

১৩ ফেব্রুয়ারি, মাঘ, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ; মাঘ মাসের শেষ রবিবার সকাল ৯-১০টার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন অধ্যাপক আহমদ শরীফ। গ্রাম সুচক্রদণ্ডী, থানা পটিয়া, জেলা চট্টগ্রাম। বংশলতিকা নিম্নরূপ :

হাবিলাশ মল্ল > পাহাড়খান মল্ল > দরিয়াখান মল্ল > সিফত মল্ল > দোস্ত মুহম্মদ, পরান, রুস্তম। দোস্ত মুহম্মদ > কাদির রাজা > মুহম্মদ লোদী, লাল মিয়া, সামাদ আলী। মুহম্মদ লোদী > মুহম্মদ নবী (১৮০১-১৮৯৯), মুন্সী আইনউদ্দীন (১৮৪০-১৯৩৭), কাইমউদ্দীন। মুহম্মদ নবী > মুন্সী নূর উদ্দীন (১৮৩৮-৭১), স্ত্রী মিশ্রিজান > আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ > আলতাফুন নিসা > (১৯০১-৭৭)। মুন্সী আইনউদ্দীন, স্ত্রী বদিউন্নেসা > আবদুল মজিদ, আবদুল আজিজ, আবদুল গনি, আবদুল সোবহান। আবদুল আজিজ, স্ত্রী সিরাজ খাতুন > আহমদ কবির, সাজেদ আরা বেগম, আহমদ সোবহান, আহমদ শরীফ, আহমদ জহীর, চেমন আরা।

১৯২২

২২ ডিসেম্বর শুক্রবার বিকাল ৩টায় চাচা আবদুল গণি মুনসি টাইফয়েড রোগে মৃত্যুবরণ করেন।

১৯২৩

ভ্রাতা আহমদ জহীরের জন্ম। তিনি চিকিৎসক ছিলেন। মৃত্যু ১৯৮৪।

১৯২৮

স্ত্রী সালেহা মাহমুদের জন্ম। গৃহিণী।

১৯৩৮

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পটিয়া হাই ইংলিশ স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাস।

১৯৪০

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট উত্তীর্ণ হন।

১৯৪২

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ থেকে বি. এ. উত্তীর্ণ হন। উল্লেখ্য, সে সময়ে দুটি বিভাগ চালু ছিল—পাস (উইথ ডিস্‌টিংশান) এবং পাস। তিনি পাস বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

১৯৪৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (সংক্ষেপে ঢাবি) বাংলা বিভাগ থেকে এম. এ. ডিগ্রি লাভ।
দুর্নীতি দমন বিভাগে ২৫০ টাকা বেতনে প্রিভেন্টিভ অফিসার হিসেবে চাকুরি পান কিন্তু যোগ দেননি।

১৯৪৫

আগস্ট, লাকসাম পশ্চিমগাঁও নওয়াব ফয়জুন্নেছা কলেজে ১১৫ টাকা বেতনে অধ্যাপনার কাজে যোগদান। ডিসেম্বর ১৯৪৮ পর্যন্ত কর্মরত।

১৯৪৬

১১ জানুয়ারি সকাল ৯টায় টাইফয়েড রোগে বাবা আবদুল আজিজের মৃত্যু।

১৯৪৭

৭ নভেম্বর নোয়াখালি জেলার ফেনি অঞ্চলের বিখ্যাত মাহমুদ পরিবারে খান সাহেব শাহাবুদ্দিন মাহমুদের দ্বিতীয় কন্যা সালেহা মাহমুদের সঙ্গে পরিণয়।

১৯৪৮

ডিসেম্বর মাসে লাকসাম পশ্চিমগাঁও নওয়াব ফয়জুন্নেছা কলেজের চাকরিতে পদত্যাগ এবং ফেনী ডিগ্রি কলেজে যোগদান।

১৯৪৯

জুন মাস পর্যন্ত ফেনী ডিগ্রি কলেজে অধ্যাপনা। জুন মাসে রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রের প্রোগ্রাম অ্যাসিস্টেন্ট হিসেবে যোগদান। ১৭ ডিসেম্বর ১৯৫০ পর্যন্ত রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রের প্রোগ্রাম অ্যাসিস্টেন্ট রূপে কর্মরত।

১৯৫০

১৮ মার্চ : শনিবার সকাল ৯-৩০ মিনিটে জ্যেষ্ঠ পুত্র মাহমুদ করিম রেজভীর জন্ম। তিনি স্বায়ত্তশাসিত একটি প্রতিষ্ঠানে নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত। পুত্রবধু ইসমত আরা চৌধুরী কাজল (জ. ১৯৬১), শিক্ষকতা। পৌত্র মাহফুজ করিম অভি (জ. ১৯৮৭) এবং আসিফ করিম অর্চি (জ. ১৯৯০)।
১৮ ডিসেম্বর : গবেষণা সহকারী ও শিক্ষক হিসেবে ঢাবি বাংলা বিভাগে যোগদান। ১৯৫২ পর্যন্ত।

১৯৫১

২১ নভেম্বর : বুধবার বিকেল ৪-৩০ মধ্যম পুত্র ড. নেহাল করিম ফৈজীর জন্ম। বর্তমানে ঢাবি সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক। পুত্রবধু রহিমা খাতুন (জ. ১৯৫৮), গৃহিণী। পৌত্র নাফিস করিম কান্ত (জ. ১৯৮০) এবং নাহিদ করিম পান্থ (জ. ১৯৯২)।

১৯৫২

অস্থায়ী লেকচারার পদে ঢাবি বাংলা বিভাগে যোগদান।
সংগঠন : পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ।
২৩ আগস্ট : কুমিল্লা শহরে 'কুমিল্লা প্রগতি মজলিশ' নামক প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালায় ২৩ তারিখের অধিবেশনে তিনি 'তন্ত্রসংকট' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি পাকিস্তানের

তরুণদের মনে ইসলামী আদর্শ ও সাম্যবাদী আদর্শের যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব বিরাজ করছে সে বিষয়ের আনুপূর্বিক আলোচনা করেন। এর যথাযোগ্য সমাধানের ওপর দেশের ভবিষ্যত নির্ভর করছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

১৯৫৩

২৫ মার্চ : বুধবার সকাল ৭টায় প্যারালাইসিস রোগে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের স্ত্রী বদিউন্নিসার মৃত্যু। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

৩০ সেপ্টেম্বর : ১৩ আশ্বিন ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, বুধবার ১০-৪৪ মিনিটে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮২ বৎসর।

১৯৫৪

গবেষণা সহকারী হিসেবে পদাবনতি। কারণ পদের অভাব। ১৯৫৭ সন পর্যন্ত গবেষণা সহকারী হিসেবে কর্মরত।

৯ মে : রবিবার, রাত ১০-৩০ মিনিটে কনিষ্ঠ পুত্র যাহেদ করিম স্বপনের জন্ম। সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট।পুত্রবধু নাসিমা রহমান (জ. ১৯৬০), অধ্যাপনা।

১৯৫৫

১৯ ফেব্রুয়ারি : ঢাবি বাঙলা বিভাগে গবেষণা সহকারী পদে স্থায়ী হন।

১৯৫৭

১৭ সেপ্টেম্বর : অস্থায়ী লেকচারার হিসেবে যোগদান। শিক্ষা সফরে দু'সপ্তাহের জন্যে পশ্চিম পাকিস্তান গমন।

সম্পাদনা : লায়লী-মজনু, দৌলত উজির বাহারম খাঁ বিরচিত, প্র. মু. জুন ১৯৫৭, দ্বি. মু.ডিসেম্বর ১৯৬৬, তৃ. মু. সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, চ. মু. ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, প. মু. এপ্রিল ১৯৯২, ষ. মু. ১৯৯৮, প্রচ্ছদ কাইয়ুম চৌধুরী, পৃষ্ঠা ২৭৬, মূল্য ১৪০ টাকা, প্রথম প্রকাশক বাঙলা একাডেমী, ঢাকা।

বিদ্যাসুন্দরের কবি, (ক) দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ (১৫২০-৩২ খ্রিষ্টাব্দ) ও (খ) সাবিরিদ খান (১৫১৭-৮৫ খ্রিষ্টাব্দ), সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪, বাঙলা বিভাগ, ঢাবি, ঢাকা।

১৯৫৮

সম্পাদনা : তোহ্ফা, আলাউল বিরচিত, ১৩৬৪ সাল, ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১৪৬, মূল্য ২ টাকা, বাঙলা বিভাগ, ঢাবি, ঢাকা।

পুথি পরিচিতি : আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ-সংকলিত, ভাদ্র ১৩৬৫, সেপ্টেম্বর ১৯৫৮, অধক্ষ্য, বাঙলা ও সংস্কৃত বিভাগ, ঢাবি, রমনা, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৭০৪, মূল্য বিশ টাকা।

আওরা-দে-বারোজ প্রশস্তি, এতিম কাসেম বিরচিত, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা, ভাদ্র চৈত্র ১৩৬৫, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা।

১৯৫৯

অধ্যাপক আহমদ শরীফকে উৎসর্গকৃত গ্রন্থ (সংক্ষেপে-উৎসর্গকৃত গ্রন্থ) : আশিয়ানা, সামসুদ্দীন আবুল কালাম; বাহাদুর শাহ, কাজী আবুল হোসেন।

সম্পাদনা : সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ, মুহম্মদ খান বিরচিত, ১৩৬৬ সাল, ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দ, বাঙলা বিভাগ, ঢাবি, রমনা, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৪০, মূল্য আড়াই টাকা।
মধুমালতী, মুহম্মদ কবীর বিরচিত, ফাল্গুন ১৩৬৬/১৯৫৯, বাঙলা একাডেমী, বর্ধমান হাউজ, ঢাকা-২, প্রচ্ছদ নুরুল ইসলাম আলপনা, পৃষ্ঠা ৬০, মূল্য আড়াই টাকা।
যয়নবের চৌতিশা, শেখ ফয়জুল্লাহ্ বিরচিত, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ-প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৬, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা।
আরবি ত্রিশ হরফে মুনাজাত, মুহম্মদ ফসীহ্ রচিত, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ভাদ্র অগ্রহায়ণ ১৩৬৬, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা।
২৭ ফেব্রুয়ারি : ঢাবি বাঙলা বিভাগ ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি দিবস উপলক্ষে এক আলোচনাসভার ব্যবস্থা করে। অধ্যাপক আহমদ শরীফ এতে সভাপতিত্ব করেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে শিক্ষা কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত বাঙলা ভাষার জন্য অবৈজ্ঞানিক রোমান হরফ প্রবর্তনের তীব্র বিরোধিতা করা হয়।

১৯৬০

৭ আগস্ট : লেকচারার পদে স্থায়ী হিসেবে বহাল হন। ঐ পদে কর্মরত থাকেন ২৬.৮.১৯৭০ সন পর্যন্ত।
সম্পাদনা : মুসানামা, মুহম্মদ আকিল বিরচিত, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ শ্রাবণ ১৩৬৭ হইতে পুনর্মুদ্রিত, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা।
A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts in Munshi Abdul Karim's collction, with Munshi abdul Karim, Tr. by Syed Sajjad Hussain, Asiatic Society of Pakistan, Dhaka, May 1960, Page 589, Price Rs 20/-
নূরজামাল ও চার মোকামের কথা, হাজী মুহম্মদ বিরচিত, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭।
আজর শাহ্ সমন রেখে (খণ্ডিত) মুহম্মদ চুহর বিরচিত, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৌষ-চৈত্র, ১৩৬৭।

১৯৬১

সম্পাদনা : মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য, ৮২ জন কবির ৪৩৫টি পদের সংকলন, চৈত্র ১৩৬৭, এপ্রিল ১৯৬১, পৃষ্ঠা ১৯৫, মূল্য আড়াই টাকা, বাঙলা বিভাগ, ঢাবি।
মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা, মুহম্মদ আবদুল হাই সহযোগে, জুলাই ১৯৬১ বাঙলা বিভাগ, ঢাবি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ কার্তিক ১৩৭৫/১৯৬৮, তৃ. মু. শ্রাবণ ১৩৯২, চ মু শ্রাবণ ১৩৮৭, আগস্ট ১৯৮৫, স মু ১৯৯৬, প্রচ্ছদ কাইয়ুম চৌধুরী, পৃষ্ঠা ৩৭০, মূল্য আশি টাকা মাত্র, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা।
মা সুমা পরী উপাখ্যান, মনুচেহের বিরচিত, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা ১৩৬৮, ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ আষাঢ়, ঢাকা।
ভাবলাভ, শামসুদ্দীন সিদ্দিকী বিরচিত, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ১৩৭৪/১৯৬৮, ঢাকা।
কুকি কাটার পুথি, খণ্ডলে কুকির হামলার ইতিহাস, গুলবক্স বিরচিত, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ১৩৭৫, ইতিহাস সম্মেলন সংখ্যা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা।

১৯৬২

ঢাবি সাংবাদিকতা বিভাগে খণ্ডকালীন শিক্ষকরূপে কমঅরত, যা ১৯৮৩ সন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

সংগঠন : পাকিস্তান লেখক সঙ্ঘ, পূর্বাঞ্চল শাখা–সদস্য ও কোষাধ্যক্ষ (তবে সরকারী প্রভাব মুক্তির পরে); বাঙলা একাডেমীর নির্বাচিত কাউন্সিল সদস্য, ফেলো এবং আজীবন সদস্য।

জানুয়ারি : 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' বা নিউক্লিয়াসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। সিরাজুল আলম খান লিখেছেন, নিউক্লিয়াস গঠনের মুহূর্ত হতে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত সরাসরি নিউক্লিয়াস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন মরহুম কামরুদ্দিন আহ্মেদ এবং ড. আহমদ শরীফ।' বিস্তারিত দেখুন সিরাজুল আলম খান রচিত গ্রন্থ *একুশ শতকে বাঙালি*।

সম্পাদনা : মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ, প্রথম সংস্করণ পৌষ ১৩৬৯/১৯৬২, প্রচ্ছদ কামরুল হাসান, মূল্য ছয় টাকা একত্রিশ পয়সা, পৃষ্ঠা ৪৩৪, বাঙলা একাডেমী, বর্ধমান হাউজ, ঢাকা।

১৯৬৩

ঢাবি গ্রন্থাগার বিভাগে খণ্ডকালীন শিক্ষকরূপে যোগদান, যা ১৯৮৩ সনে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

১৯৬৪

সম্পাদনা : রসুল বিজয়, জয়েনউদ্দীন বিরচিত, সাহিত্য পত্রিকা, ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১৩৭০/১৯৬৪, পৃষ্ঠা ১১৫-১৯৭, মূল্য দেড় টাকা, বাঙলা বিভাগ, ঢাবি।

রাগতালনামা ও পদাবলী, আলাওল বিরচিত, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, সপ্তম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭০, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা।

জ্ঞান চৌতিশা, সৈয়দ সুলতান বিরচিত, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৭১ শ্রাবণ আশ্বিন সংখ্যা বাঙলা একাডেমী, ঢাকা।

১৭ জানুয়ারি : দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি, পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম সদস্য ছিলেন অধ্যাপক আহমদ শরীফ।

ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও প্রতিরোধ কমিটির আহ্বান : * প্রতি মহল্লায় দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করুন। * গুণ্ডাদের শায়েস্তা করুন, নির্মূল করুন। * পূর্ব পাকিস্তানের মা-বোনের ইজ্জত ও নিজেদের ভবিষ্যতকে রক্ষা করুন।

১৯৬৫

অধ্যাপক আহমদ শরীফ কর্তৃক লিখিত ভূমিকা, পরিচায়িকা ও মুখবন্ধ সম্বলিত গ্রন্থ (সংক্ষেপে-ভূমিকা লিখিত গ্রন্থ) : অপরাজেয় লোককবি করিম বখশ, নূরুল ইসলাম চৌধুরী।

সম্পাদনা : নীতিশাস্ত্র বার্তা, মুজাম্মিল বিরচিত, আশ্বিন ১৩৭২, অক্টোবর ১৯৬৫, প্রচ্ছদ আবদুর রউফ, পৃষ্ঠা ৬৭, মূল্য দুই টাকা, বাঙলা একাডেমী, বর্ধমান হাউজ, ঢাকা।

১০ অক্টোবর : ১৯৬২ সন থেকে দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে নিবেদিত গোপনে গঠিত 'অস্থায়ী পূর্ববঙ্গ সরকার' বা অপূর্ব সংসদ কাজ করে যাচ্ছিল। অধ্যাপক আহমদ শরীফ এই সংসদের একজন উপদেষ্টা ছিলেন। ১-১০-১৯৬৫ তারিখে সংসদ স্বাধীনতার ইশতেহার *ইতিহাসের ধারায় বাঙালি* প্রকাশ করে যা তিনি রচনা করেন। ঐ ইশতেহারে ইতিহাসের স্বাভাবিক ধারায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবি উঠেছে মর্মে তিনি মন্তব্য করেন। ইশতেহারটি শেষ হয় রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানের তিনটি চরণ দিয়ে। বিস্তৃত দেখুন আবদুল আজিজ বাগমার রচিত গ্রন্থ *স্বাধীনতার স্বপ্ন, উন্মেষ ও অর্জন*।

১৯৬৬

সংগঠন : বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, গঠিত ২০ ডিসেম্বর।

সম্পাদনা : পুথির ফসল, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ১০৩, মূল্য ২ টাকা, পাকিস্তান পাবলিকেশান্স ১৯৮, কাকরাইল, ঢাকা ২।

শা'বারিদ খান গ্রন্থাবলী, আষাঢ় ১৩৭৩ জুন ১৯৬৬, প্রচ্ছদ আবু তাহের, পৃষ্ঠা ১৯৬, মূল্য পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা।

১৯৬৭

"সৈয়দ সুলতান : তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ। এই গবেষণায় তার কোনো গাইড ছিল না।

১২ মার্চ : ড. আহমদ শরীফের জীবনী ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আজাদী পত্রিকায় একটি রচনা প্রকাশ হয়।

১৮ মার্চ : ডক্টরেট ডিগ্রি প্রাপ্তি উপলক্ষে বাঙলা একাডেমীতে ঢাকাস্থ চট্টগ্রাম সমিতি এক সংবর্ধনাসভার আয়োজন করে। এ সংবর্ধনাসভায় বিভিন্ন গুণীজন তাঁদের স্ব-স্ব বক্তব্য তুলে ধরেন।

সম্পাদনা : মধ্যযুগের রাগ-তালনামা, ফয়জুল্লাহ, আলাউল, কাজী দানিশ, বখ্শ আলি, আলি রাজা, ফাজিল নাসির মুহম্মদ, তাহির মাহমুদ, চামারু প্রমুখ বিরচিত, আষাঢ় ১৩৭৪, জুলাই ১৯৬৭, মূল্য তিন টাকা, পৃষ্ঠা ১১৮, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা।

চন্দ্রাবতী, কোরেশী মাগন বিরচিত, আশ্বিন ১৩৭৪, অক্টোবর ১৯৬৭, প্রচ্ছদ আনোয়ার হোসেন, পৃষ্ঠা ৭২, মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা।

২৫ জুন : দৈনিক পাকিস্তান : বেতার টিভি থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত বর্জনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানান ১৮ জন বুদ্ধিজীবী, যাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন অধ্যাপক আহমদ শরীফ।

১৯৬৮

ভূমিকা লিখিত গ্রন্থ : আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ রচনাবলী, রমেশ চন্দ্র গুপ্ত (সম্পাদিত), ১ম খণ্ড

সম্পাদনা : ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিনী (স্মৃতিগ্রন্থ), মৈথিল কবি বিদ্যাপতি বিরচিত {ভূমিকা, মূলপাঠ-অনুবাদ}, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ ১৩৭৫, ঢাকা।

গ্রন্থ : বিচিত চিন্তা, প্র. প্র. ২১.২.৬৮ দ্বি. মু. ১৯৭৫; প্রচ্ছদ হাশেম খান, কথাকলি চৌধুরী পাবলিশার্স, ৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা; পৃ. ৪১৮, মূল্য ১১.৫০।

২৮ জানুয়ারি : ১৯৬৮ সালের ২০ ও ২১ ডিসেম্বর ঢাকার কারিগরী মিলনায়তনে 'আফ্রো এশিয়া সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান' শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠের আয়োজন করা হয়। সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সাংবাদিক সফদার মীর, পূর্ব বাঙলার হাসান আজিজুল হক, কবি শামসুর রাহমান, ফজল শাহাবুদ্দিন, আবদুল গণি হাজারী প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি তাঁর ভাষণে সমদর্শিতা ও সহাবস্থানের ভিত্তিতে নির্যাতনের বিরুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার মানুষের একতাবদ্ধ হওয়ার মধ্যেই সার্বিক কল্যাণ নিহিত বলে মন্তব্য করেন। তাঁর মতে, মানুষকে শুভবুদ্ধি দান করার দায়িত্ব লেখকদের, কেননা শিল্প কোনোকালেই শুধু নন্দনতাত্ত্বিক ছিল না।

১৯৬৯

পুরস্কার : বাঙলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (গবেষণা ক্ষেত্রে)। তারিখ ০১. ১২. ৬৯। দাউদ সাহিত্য পুরস্কার (সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা গ্রন্থের জন্য)।

উৎসর্গকৃত গ্রন্থ : বাঙলা সাহিত্যের চরিত্র চিত্রন, রশীদ আল ফারুকী।

ভূমিকা লিখিত গ্রন্থ : অজয় রায়, বাঙলা ও বাঙালী।

সংগঠন : Asiatic Society of Bangladesh, General Secretary, ১৯৬৯-৭৩; লেখক স্বাধিকার সংরক্ষণ কমিটি।

গ্রন্থ : সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা, আশ্বিন ১৩৭৬, সেপ্টেম্বর ১৯৬৯, মাওলা ব্রাদার্স, ৪৯ বাংলাবাজার ঢাকা, প্রচ্ছদ কাইয়ুম চৌধুরী, পৃষ্ঠা ১৮৮, মূল্য ছয় টাকা।

সম্পাদনা : বাঙলার সুফী সাহিত্য, আলোচনা ও নয়খানি গ্রন্থ সম্বলিত, মাঘ ১৩৭৫, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯, প্রচ্ছদ তৌফিক হোসেন, মূল্য পনের টাকা পঞ্চাশ পয়সা, পৃষ্ঠা ৫৩১, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা।

নসিহতনামা, আফজল আলী বিরচিত, শ্রাবণ ১৩৭৬, আগস্ট ১৯৬৯, পৃষ্ঠা ৮৩, মূল্য দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা।

সাক্ষাৎকার : দৈনিক পূর্বদেশ, ১ ডিসেম্বর।

১৪ জানুয়ারি : লেখক স্বাধিকার সংরক্ষণ কমিটির পক্ষ থেকে চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর হামলার প্রতিবাদে বাঙলা একাডেমী প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি বলেন, সংবাদপত্র বন্ধ, প্রেস উপদেশ, বিশেষ সংবাদের উপর এমবার্গো, গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করা, রেডিও-টিভি সম্পূর্ণ কুক্ষিগত করা, বিএনআর-এর গোয়েন্দাগিরি প্রভৃতির মাধ্যমে চিন্তা ও মত প্রকাশের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

৬ অক্টোবর : চট্টগ্রাম সিম্পোজিয়ামে ড. এনামুল হকের সভাপতিত্বে 'সাহিত্য বিশারদ জ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন' শীর্ষক এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ আলোচনা সভায় অধ্যাপক শরীফ বলেন, আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের বিরল গুণের অধিকারী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ আমাদের পূর্বপুরুষদের কীর্তিকে আবিষ্কার করেছেন যা কয়েক যুগ সুপ্ত ছিল। তাঁর সৃষ্টি এবং লেখা বাঙলা ভাষাকে নতুনভাবে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দান করেছে।

৩০ নবেম্বর : পূর্ব পাকিস্তানকে 'বাংলা' করতে সাতজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ ৩০ নবেম্বর এক বিবৃতি দেন। তাঁরা হলেন কবি জসীম উদ্‌দীন, জনাব আবুল হাশেম, ড. এনামুল হক, বেগম সুফিয়া কামাল, জনাব মুনীর চৌধুরী, ড. আহমদ শরীফ এবং অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী।

২৫ ডিসেম্বর : পূর্ব পাকিস্তানের নাম 'বাংলাদেশ' দাবি উত্থাপন করে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে তিনি বলেন, একজন মানুষের তিন পরিচয়-নামের, দেশের আর পেশার।

১৯৭০

৩ জানুয়ারি : পূর্ব পাকিস্তানের ত্রিশজন শিক্ষাবিদ, কবি ও সাহিত্যিক এক যুক্ত বিবৃতিতে পাকিস্তানের সামরিক সরকার কর্তৃক আবুল কালাম আজাদ রচিত 'বাঙালী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ', কামরুদ্দিন আহমদ-এর 'সোশ্যাল হিস্ট্রি অব ইস্ট পাকিস্তান', ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর 'জেলে তিরিশ বছর', বদরুদ্দীন উমরের 'সাংস্কৃতিক সঙ্কট' ও 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা', সত্যেন সেনের উপন্যাস 'আল বেরুনী', আবদুল মান্নান সৈয়দের গল্পগ্রন্থ 'সত্যের মত বদমাস' ইত্যাদি গ্রন্থগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করার জন্য (শিক্ষাবিদ, কবি ও সাহিত্যিক) প্রতিবাদ জানান।

১৫ জানুয়ারি : প্রেস ও পাবলিকেশনস অর্ডিন্যান্স বাতিলের জন্য বাঙলা একাডেমীতে ড: এনামুল হকের সভাপতিত্বে সর্বস্তরের নবীন-প্রবীণ লেখক-শিল্পীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রতিবাদ সভায় ড. শরীফসহ সিকান্দার আবু জাফর, রণেশ দাশগুপ্ত, বেগম সুফিয়া কামাল, মিসেস মনোরমা বসু, ড. এবিএম হাবিবুল্লা, ড. আহমদ শরীফ বক্তৃতা করেন। বাঙলা একাডেমী প্রাঙ্গণ প্রতিবাদের বজ্র আওয়াজে প্রকম্পিত করে তোলেন।

১০ ফেব্রুয়ারি : সমকাল ভবনে ড. আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে 'লেখক স্বাধিকার সংরক্ষণ কমিটি'র এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি তাঁর ভাষণে শিল্প-সাহিত্যের এলাকা থেকে সরকারী নির্যাতনমূলক তৎপরতা বন্ধ করার এবং প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশনস অর্ডিন্যান্স বাতিল করার জোর দাবি জানান।

২৬ মার্চ : বাঙলা একাডেমী কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত।

২৭ আগস্ট : রিডার (বর্তমানে সহযোগী অধ্যাপক) হিসেবে পদোন্নতি।

৩০ আগস্ট : ড. শরীফসহ পূর্ব পাকিস্তানের ১৬ জন বুদ্ধিজীবী **পাকিস্তান: দেশ ও কৃষ্টি** গ্রন্থটি বাতিলের আহ্বান জানিয়ে এক যুক্ত বিবৃতি দেন ।

ভূমিকা লিখিত গ্রন্থ : সাহিত্য প্রসঙ্গে, সালেহা খাতুন।

গ্রন্থ : স্বদেশ অন্বেষা, ১ আষাঢ় ১৩৭৭, জুন ১৯৭০, প্রচ্ছদ হারাধন বর্মণ, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোং, ৬৭ প্যারীদাস রোড, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২০৮, মূল্য সাত টাকা।

জীবনে সমাজে সাহিত্যে, নভেম্বর ১৯৭০, দ্বি. মু. ডিসেম্বর ১৯৭৪, প্রচ্ছদ কাইয়ুম চৌধুরী, পৃষ্ঠা ২১২, মূল্য দশ টাকা, আদিল ব্রাদার্স এন্ড কোং, ৬০ পাটুয়াটুলী, ঢাকা-১।

১৯৭১

১ জুন : দুই মাস আত্মগোপন করে থাকার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান। ১৫ দিন চিকিৎসা ছুটির আবেদন করে ১৬ জুন আবার কাজে যোগদান, ১৩ আগস্ট পর্যন্ত কর্মরত। ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত অজ্ঞাতবাস থেকে ২০ ডিসেম্বর কাজে যোগদান।

সংগঠন : সভাপতি, লেখক সংগ্রাম শিবির, গঠিত ২ মার্চ।

৪ মার্চ : ঢাবির একশত আটাশজন শিক্ষক ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলী স্থগিত ঘোষণা করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

৫ মার্চ : ঢাবির ৫৫ জন শিক্ষক এক যৌথ বিবৃতিতে গণবিরোধী কার্যকলাপের জন্য পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকা বন্ধ করার জোর দাবি জানান। তাঁদের মধ্যে ড. শরীফ অন্যতম।

৫ মার্চ : ড. আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে 'লেখক সঙ্ঘ'এর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তিনি বলেন, এদেশের বুদ্ধিজীবীরা সংগ্রামী জনগণকে অনুপ্রেরণা যোগাবেন লেখনীর মধ্য দিয়ে।

৫ মার্চ : এই দিন বিকালে শহীদ মিনারে লেখকেরা শপথ নেন এবং জনগণের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। অধ্যাপক আহমদ শরীফ শপথ পাঠ করান। তাঁর সভাপতিত্বে ঐ সভায় বক্তৃতা করেন ড. মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, শামসুর রাহমান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর এবং শিল্পী এম. রহিউদ্দিন।

৬ মার্চ : লেখক সংগ্রাম শিবির তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কর্মকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং সবাই বজ্রকণ্ঠে শ্লোগান দেন—পরিষদ বৈঠক বর্জন কর, বাঙলাদেশ স্বাধীন কর।

১৪ মার্চ : 'লেখক সংগ্রাম শিবির' ড. আহমদ শরীফের নেতৃত্বে এক সভার আয়োজন করে। সভাপতি তাঁর ভাষণে মুক্ত সার্বভৌম বাঙলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীসহ সকল রাজনৈতিক নেতাকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আপোসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাবার আহ্বান জানান।

২১ মার্চ : ২১ মার্চ ১৯৭১ সালে বাঙলা একাডেমী প্রাঙ্গণে লেখক সংগ্রাম শিবির আয়োজিত সভায় ড. আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে এক বিপ্লবী কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন আহসান হাবীব, হাসান হাফিজুর রহমান, শামসুর রাহমান, ফজল শাহাবুদ্দীন, সৈয়দ শামসুল হক, হুমায়ুন কবির, শাহনুর খান, মাসুদ আহমেদ, আখতার হোসেন, রফিক নওশাদ, আলাউদ্দীন আল আজাদ, সালেহ আহমদ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, দাউদ হায়দার, মাকিদ হায়দার, মেহেরুন্নেসা প্রমুখ।

২৪ মার্চ : লেখক সংগ্রাম শিবিরের শেষ সভা ড. এ.বি.এম. হবিবুল্লার সভাপত্বিতে অনুষ্ঠিত হয়। 'ভবিষ্যৎ বাংলা' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রবন্ধ পাঠ করেন ড. আহমদ শরীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ড. মমতাজুর রহমান তরফদার, বদরুদ্দীন উমর, হুমায়ুন কবির, আহমদ ছফা, ফরহাদ মযহার, শাহনুর খান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সরদার ফজলুল করিম, সন্তোষ গুপ্ত প্রমুখ।

১৯৭২

নভেম্বর ঢাবি বাংলা বিভাগে নভেম্বর পর্যন্ত অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে কর্মরত।

৪ নভেম্বর থেকে প্রফেসর পদে কর্মরত।

ভূমিকা লিখিত গ্রন্থ : নন্দিত নরকে (হুমায়ূন আহমেদ), বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস (আহমদ ছফা)।

গ্রন্থ : সৈয়দ সুলতান-তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ, অগ্রহায়ণ ১৩৭৯, নভেম্বর ১৯৭২, প্রচ্ছদ রফিকুন্নবী, পৃষ্ঠা ৩৩, মূল্য আট টাকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২০ জানুয়ারি : ড. শরীফের সভাপতিত্বে শহীদ দিবস উপলক্ষে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, প্রতিবছর শহীদ দিবস পার্বণের মতো, উৎসবের মতো পালন করছি। কখনও বাস্তব প্রয়োগের কথা চিন্তা করিনি। ভাষা জীবনকে বিকশিত করে তোলে। ভাষা প্রয়োগ করতে না পারলে ভাষার অধিকারের কোন মূল্য নেই।

২০ জানুয়ারি : বাংলাদেশ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন আসাদ দিবস উপলক্ষে এক আলোচনাসভা আয়োজন করে। এতে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, দেশ মানে শুধু মাটি নয়, মানুষও। আসাদকে দিয়ে আমরা আজও অনুপ্রাণিত হবার আশা রাখি। তিনি এও বলেন যে, লাখো কংকালের উপর দাঁড়িয়ে আসাদকে স্মরণ করার মধ্যে একটা অর্থ নিহিত আছে।

৬ ফেব্রুয়ারি: বুদ্ধিজীবীরা বাংলা একাডেমীতে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণসভার আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন জাবির উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান। সভায় ড.শরীফ বলেন, স্বাধীন সরকারের কাছে আমাদের আহ্বান : আমাদের কথা বলার স্বাধীনতা দিন। আমরা ধনদৌলত কিছু চাই না শুধু বাকস্বাধীনতা চাই।

১০ আগস্ট : প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাভিলিয়নে কচিকাঁচার মেলা কর্তৃক কবি সুকান্তের জন্মদিবস উপলক্ষে এক আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ড. শরীফ প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন, কবি সুকান্ত চিরবিদ্রোহ ও ত্যাগের কবি। অনাহার, শোষণ ও পীড়নের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বস্তুতপক্ষে তিনি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের পরবর্তী বিপ্লবের কবি।

১৯৭৩

ডীন, কলা অনুষদ নির্বাচিত।

উৎসর্গকৃত গ্রন্থ : বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়, সুখময় মুখোপাধ্যায়; সর্প বিষয়ক গল্প ও অন্যান্য নাটক, সেলিম আল দীন।

ভূমিকা লিখিত গ্রন্থ : আমি একা দুরন্ত বাঙাল, মনিরুল আলম।

সংগঠন : সুকান্ত একাডেমী, মে মাসে গঠিত।

গ্রন্থ : বাউলতত্ত্ব, ফাল্গুন ১৩৭৯, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, প্রচ্ছদ আবুল বারক আলভী, পৃষ্ঠা ২৫৫, মূল্য ৮.০০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সম্পাদনা : হিন্দু কবির পদ সাহিত্য, মাঘ ১৩৭৯, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৫০, মূল্য ২ টাকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

তামাকু পুরাণ, কবি শান্তিদাস বিরচিত, ইতিহাস, ৭ম বর্ষ, ২য় তয় সংখ্যা ভাদ্র-চৈত্র ১৩৮০, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ, ঢাকা।

ভাষাকথাক্রম ব্যাকরণ {বাঙলা ভাষায় রচিত প্রথম ব্যাকরণ} উইলিয়াম কেরী বিরচিত, ভাষা-সাহিত্য পত্র, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৮০, জাবি, ঢাকা।

সাক্ষাৎকার : সংবাদ : ৫ ফাল্গুন ফেব্রুয়ারি; গণকণ্ঠ, ফেব্রুয়ারি; হলিডে, ১৭ জুন, নওশাদ আল কবির; পূর্বদেশ, ২৩ জুলাই; সংবাদ, ৫ আগস্ট, বিষয় : রবীন্দ্রনাথ; সংবাদ, ১২ আগস্ট, বিষয় : সুকান্ত; গণকণ্ঠ, ২৬ আগস্ট।

১ এপ্রিল : জনতা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিমিটেডের সাথে গণকণ্ঠের চুক্তি বাতিলের সরকারি পদক্ষেপের মাধ্যমে গণকণ্ঠ পত্রিকা বন্ধ করে দেয়ায় একে অমঙ্গলের ইঙ্গিত, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, গণতন্ত্রের পক্ষে বাধা স্বরূপ এবং শাসনতন্ত্রের মর্যাদা ক্ষুণ্নকরণ মর্মে বিবৃতি দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৬ জন শিক্ষক, যাঁদের মধ্যে অধ্যাপক শরীফ অন্যতম।

২ মে : কারিগরি মিলনায়তনে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সুকান্ত একাডেমীর উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথির ভাষণ দান করেন ড. আহমদ শরীফ। তিনি বলেন, সুকান্ত সংগ্রামী জীবনের চেতনা। এ উপলব্ধি ছাড়া সুকান্তকে স্মরণ রাখাই বৃথা।

৮ মে : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষে বাংলাদেশ টেলিভিশন এক আলোচনাসভার আয়োজন করে। এ আলোচনায় অংশ নেন ড. আহমদ শরীফ, ড. নীলিমা ইব্রাহিম, কবীর চৌধুরী, অধ্যাপক শুদ্ধসত্য বসু ও কবি হায়াত মামুদ। এ সভায় একদিকে ড. আহমদ শরীফ ও অন্যদিকে ড. নীলিমা ইব্রাহিম, জনাব কবীর চৌধুরী, অধ্যাপক শুদ্ধসত্য বসু ও কবি হায়াত মামুদের পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের ফলে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এ আলোচনাসভায় ড. আহমদ শরীফ বলেন, রবীন্দ্র সাহিত্য আমাদের উজ্জ্বল ঐতিহ্য; কিন্তু এ যুগে তা আমাদের সম্পদ হয়ে থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। ড. নীলিমা ইব্রাহিম, জনাব কবীর চৌধুরী, অধ্যাপক শুদ্ধসত্য বসু ও কবি হায়াত মামুদ- এঁরা বলেন, রবীন্দ্রসাহিত্য শুধু আমাদের ঐতিহ্য নয় বরং সম্পদ এবং তা সম্পদ হয়েই থাকবে।

বাংলাদেশ টেলিভিশনে রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে ড. আহমদ শরীফের বক্তব্যের বিরোধিতা করে জনপদসহ অন্যান্য পত্রিকাতে লিখিত হয়েছে। অধিকাংশ পত্রিকাতে তাঁর বক্তব্যের ভুল বোঝাবুঝি ছাপা হয়েছে। এই ভুল বোঝাবুঝি শুধরানোর জন্য তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমাদের এ কথাটা মানতে হবে, রবীন্দ্র-নজরুল আমাদের যতটা পরিচিত তাঁর চেয়ে অনেক বেশি শোনা কথার প্রভাবে শ্রদ্ধেয় অর্থাৎ আমাদের লেখাপড়া জানা লোকদের মধ্যে কৃচিৎ কেউ রবীন্দ্র-নজরুল রচনাবলির সঙ্গে আশানুরূপ বা প্রয়োজনানুরূপভাবে পরিচিত। অন্য সবাই স্কুল-কলেজের এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়েও পাঠ্যসূচীর বাইরে রবীন্দ্র-নজরুলের পরিচয় লাভে আগ্রহী নন। এই সত্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। অতএব, রবীন্দ্র-নজরুল আমাদের কাছে মিথিক্যাল বা লেজেণ্ডারি নায়ক বা দেবোপম ব্যক্তিত্ব। বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক অনেক দূর এগোয়।

১৭ জুন : তিনি বলেন, কেউ কখনো দেশের প্রকৃত চিত্র লুকাতে পারে না। বিদেশী বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে ঠিকই সব সংবাদ পৌছে যায়-বিবিসি, ভোয়া, রেডিও অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে সংবাদ পৌছে যায়। তাছাড়া এটাতো সরকারের জন্যই আত্মধ্বংসী ও ক্ষতিকর। বস্তুত মুক্ত চিন্তা আজ রুদ্ধ করা হয়েছে।

২১ জুলাই : তিনি কলা অনুষদের ডীন নির্বাচিত হওয়ায় এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। এ আলোচনাসভায় তিনি বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান ন্যক্কারজনক পরিস্থিতির জন্যে ছাত্ররাই দায়ী নয়। শাসনব্যবস্থার অসাধুতা ও স্বজনপ্রীতিই এর জন্যে বেশি দায়ী।

২৫ আগস্ট : গণকণ্ঠ প্রতিনিধির নিকট এক সাক্ষাতকারে তিনি বলেন, শিক্ষকদের দাবি পূরণে সরকারের আন্তরিক ইচ্ছা বা প্রস্তুতি নেই।

২৭ সেপ্টেম্বর : পাবলিক লাইব্রেরি অঙ্গনে লেখক শিবির আয়োজিত 'মত প্রকাশের স্বাধীনতা' শীর্ষক আলোচনা সভায় সভাপতির ভাষণে ড. শরীফ বলেন, কোন স্বাধীনতা কেউ ভিক্ষে দেয় না। পত্রিকার অধিকার হরণ মানেই জনগণের অধিকার হরণ।

১৯৭৪

ভূমিকা লিখিত গ্রন্থ : কুষ্টিয়ার বাউল সাধক, আবুল আহসান চৌধুরী।

সংগঠন : সভাপতি, মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটি, গঠিত ৩০ মার্চ; মন্বন্তর প্রতিরোধ আন্দোলন, গঠিত ১১ অক্টোবর।

গ্রন্থ : যুগ-যন্ত্রণা, জুন ১৯৭৪, কথাকলি, ৩৪ মনির হোসেন লেন, ঢাকা।

কালিক ভাবনা, অক্টোবর ১৯৭৪, প্রচ্ছদ হাশেম খান, পৃষ্ঠা ১৫৪, মূল্য ৯ টাকা, মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা।

সাক্ষাৎকার : দৈনিক বাংলা, ১ ফেব্রুয়ারি; দৈনিক বাংলার মুখ, ১৫ ফেব্রুয়ারি; গণকণ্ঠ, ২০ নভেম্বর; সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২২ নভেম্বর।

১ ফেব্রুয়ারি : দৈনিক বাংলার সাথে সাক্ষাতকারে তিনি অবাধ মেলামেশার পক্ষে তাঁর যুক্তি প্রদর্শন করেন এবং অবাধ মেলামেশাকে সমর্থন করেন। তবে তার মধ্যে অবশ্যই শালীনতা বোধ থাকবে। আগে পুরুষেরা নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসাবে মনে করত। নারীর যে একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে এ কথা পুরুষেরা কিছুতে মেনে নিতে পারত না, স্বাধীনতার পূর্বে কলে কারখানায় মালিক শ্রমিক সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যের মত ছিল। মালিক-শ্রমিকের প্রসঙ্গে বলেন, এদের সম্পর্ক কিছুতেই প্রভু-ভৃত্যের মত হবে না। শ্রমিকরা তাঁদের সমস্যার কথা মালিকদের জানাতে পারবেন। তাঁদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা যাবে না।

১০ ফেব্রুয়ারি : এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, যুগ বদলেছে, মাস্টাররা এখন বিদ্যা বিক্রয় করতে বাধ্য। তাই মাস্টাররা আর সম্মান পাওয়ার অধিকারী নন এবং তার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে ছাত্ররা এখন শিক্ষকের ওপর চড়াও হয়। তিনি বলেছেন, সম্মান মানেই দাস-প্রভুর সম্পর্ক।

২১ ফেব্রুয়ারি : পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে লেখক শিবির আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, আমাদের সাহিত্যে গণমানুষের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়নি। তিনি বলেন, গণমানুষের নাম করে আমরা স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি করছি। আগে আমরা মুসলমান, পরে পাকিস্তানী। এখন বাঙালি হবার চেষ্টা করছি। কিন্তু কখনও মানুষ হবার চেষ্টা করিনি।

২৩ ফেব্রুয়ারি : তাঁর সভাপতিত্বে পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে লেখক শিবির আয়োজিত ধর্মনিরপেক্ষতা শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তিনি বলেন, নাস্তিক হলেই মানুষ নীতিবিহীন হয় না। নাস্তিকতার মাধ্যমেও মানুষের কল্যাণ সাধন সম্ভব। তিনি বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে প্রত্যেকটি ধর্মকে পাশাপাশি আপন মহিমায় উন্নীত

করা নয়—তা হলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সম্ভাবনা থাকে। তাই ধর্মনিরপেক্ষতার মূল ভাব আমাদের অনুভব করতে হবে। এর ভুল ব্যাখ্যা যে কোনো অশান্তি ডেকে আনতে পারে।

৩ মার্চ : স্থানীয় চট্টগ্রাম প্রেসকাব মিলনায়তনে 'নিসর্গে'র ভাষাতত্ত্ব সংখ্যার প্রকাশনা উপলক্ষে বাংলাদেশ ভাষাতত্ত্ব সমিতি ও বাংলাদেশ পরিষদ চট্টগ্রাম কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক সমাবেশে সভাপতির ভাষণদানকালে তিনি বলেন, বাক্যের অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্যে শব্দ প্রয়োগে কারুকার্য ও কৌশলের প্রভাব অপরিসীম এবং এর জন্যে প্রয়োজন রয়েছে শব্দ সচেতনতার।

১ এপ্রিল : মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটির সভাপতি অধ্যাপক আহমদ শরীফ জাতীয় প্রেসক্লাবে বুদ্ধিজীবীদের এক বিরাট সমাবেশে অধিকার হরণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সংঘবদ্ধ হবার আহ্বান জানান। এই প্রসঙ্গে তিনি বুদ্ধিজীবী সমাজের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও দায়িত্ব এড়িয়ে চলার প্রবণতার নিন্দা করে আত্মসমালোচনার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

১ এপ্রিল: দি পিপল পত্রিকায় বিনা বিচারে আটকের কালাকানুনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানান।

৫ এপ্রিল : গণবাংলা পত্রিকায় তিনি বলেন ঢাবির শিক্ষকতার পরিবেশ ক্লেদাক্ত হয়ে উঠছে।

৭ এপ্রিল : হলিডে পত্রিকায় তিনি ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের আহ্বান জানান।

৬ জুন : তাঁর সভাপতিত্বে ঢাবি গ্রন্থাগার মিলনায়তনে বাংলাদেশ লেখক শিবির কর্তৃক আয়োজিত হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তিনি বলেন আজ এ সংস্কৃতি সঙ্কটের মোকাবিলা করতে হবে : আল মাহমুদকে কারামুক্ত করার জন্যে সচেষ্ট হোন।

১০ জুন : ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, শুধুমাত্র কলম পেশাই সাংবাদিকতা নয়। সাংবাদিকের আদর্শ থাকতে হয়, উদ্দেশ্য থাকতে হয়। উদ্দেশ্য না থাকলে, আদর্শ না থাকলে সাংবাদিকতা যথার্থ হয় না।

৩ অক্টোবর : "সিকিমের ভারতভুক্তি প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীন অস্তিত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ" এই মর্মে বাংলাদেশের ২৩ জন শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন চবির মোঃ আ. ওয়াসিহ, জাবির নূরুর রহমান খান, ঢাবির ড. আহমদ শরীফ, আহমদ কবির, মনসুর মূসা, সাইদ-উর-রহমান, সদরুল আমিন, নুরুল আসলাম, আহমেদ কামাল, ও কামরুল আহসান প্রমুখ।

৩ সেপ্টেম্বর : গণকণ্ঠ সম্পাদক আল মাহমুদের শর্তহীন মুক্তি দাবিতে ড. আহমদ শরীফসহ ৫৭ জন বুদ্ধিজীবী বিবৃতি দেন।

৩০ সেপ্টেম্বর : 'দেশ আজ ভয়াল মন্বন্তরের করালগ্রাসে নিপতিত' এই শিরোনামে ৪৮ জন শিক্ষক এক বিবৃতি দেন। তাঁরা মানুষকে বাঁচাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। এর মধ্যে ড. শরীফ ছিলেন অন্যতম।

২৪ সেপ্টেম্বর : দেশের মন্বন্তর ও মৃত্যু কোনো সাময়িক পরিস্থিতি নয়। মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার একটি মৌলিক রাজনৈতিক অধিকার। মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও

আইন সাহায্য কমিটির উদ্যোগে ড. আহমদ শরীফসহ ৫৭ জন বুদ্ধিজীবী এই বিবৃতি দেন।

১১ সেপ্টেম্বর : জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বুদ্ধিজীবীদের এক সভায় বর্তমান মন্বন্তরের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। "মন্বন্তর প্রতিরোধ আন্দোলন" নামে যে কমিটি গঠন করা হয় এতে ড. আহমদ শরীফসহ ৮২ জন বিভিন্ন পেশার লোক বিবৃতি দেন।

২৮ সেপ্টেম্বর : বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত।

২১ অক্টোবর : ড. শরীফের সভাপতিত্বে ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভায় দুর্নীতি ও প্রশাসনে অনিয়ম, ক্ষমতার অপব্যবহার বিষয়ে তদন্তের জন্যে দু'সদস্যের কমিটি গঠনের আহ্বান জানান হয়।

২৯ অক্টোবর : ডেন্টাল কলেজ ছাত্র সংসদ অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ড. আহমদ শরীফ এতে প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন, সমাজব্যবস্থায় আর্থিক শ্রেণিবিন্যাস বা বণ্টন ব্যবস্থা অসম হলে নিপীড়িত নির্যাতিত জনগণের মুক্তি অসম্ভব।

১ নবেম্বর : সাহিত্যিক সিকান্দার আবু জাফরের সভাপতিত্বে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে মন্বন্তর প্রতিরোধ আন্দোলন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এ প্রতিরোধসভায় ড. আহমদ শরীফ তাঁর ভাষণে বলেন, ভাতের অভাবে বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ লোক মরেছে, মরছে এবং মরবে। আমরাও হয়ত বড়জোর ৪/৫ মাস টিকব। তারপর আর সকলের সাথে আমাদেরও মরতে হবে। তিনি বলেন, পয়সা দিলে খাদ্য মেলে। অর্থাৎ সবাই মরছে পয়সার অভাবে। গত আড়াই বছরে এ পয়সার অভাবে ফেলেই আমাদের তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। বাঁচার অধিকার সবার আছে। এটা মৌলিক মানবিক এবং রাজনৈতিক অধিকার। তাই আমরা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পথে নেমেছি। আমরা রাজনীতি করি না। আমাদের রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের। সরকার এ দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে প্রতিরোধ গড়ে তোলার অধিকার আমাদেরও আছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে একা বাঁচা যাবে না, যৌথভাবে বাঁচতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলো কিছুই করছে না। স্বাতন্ত্র্যের নামে করছি করব করে তারা আন্তরিকতার অভাব দেখাচ্ছে।

৫ ডিসেম্বর : জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রে মহাত্মা লালন শাহ ফকিরের দ্বিশতজন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কবি জসীম উদ্‌দীন এতে সভাপতিত্ব করেন। এতে ড. শরীফ বলেন, লালন যদি শিক্ষার আলোক পেতেন, তখনকার সমাজব্যবস্থা যদি এতটা উন্নত হত তবে লালন রবীন্দ্রনাথ হতে পারতেন।

১২ ডিসেম্বর : ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে এক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভাপতি তাঁর আলোচনায় বলেন, আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজকে সুবিধাবাদী চরিত্র পরিহার করে আত্মমর্যাদাবোধে জাগ্রত হতে হবে।

25 December : The Bangladesh Times : The Government has reconstituted the Advisery council which was earlier set up for the propose of giving advice on the books and other publications and Ahmed Sharif is one of the members of that committee.

১৯৭৫

১৪ আগস্ট দুপুর ১২টা : বাকশালে যোগ দেননি।

১৫ সেপ্টেম্বর : ঢাবি বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান, ১৯৭৮ সন পর্যন্ত চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত। ডীন, কলা অনুষদের পদ থেকে অবসর লাভ।

১৯৭৫ সালের বাংলা একাডেমী কার্যনির্বাহী পরিষদে পদাধিকার বলে সদস্য, যা ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

সংগঠন : সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ১৯৭৫ থেকে ৭৬।

সম্পাদনা : *সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল,* দোনা গাজী বিরচিত, মাঘ ১৩৮১, ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫, প্রচ্ছদ মাহবুবুর রশীদ, পৃষ্ঠা ৪৭৬, মূল্য তিরিশ টাকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৯৭৬

উৎসর্গকৃত গ্রন্থ : অলঙ্কার অন্বেষা, নরেন বিশ্বাস; রং বেরং, মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ।

ভূমিকা লিখিত গ্রন্থ : চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রসঙ্গ, আবদুল হক চৌধুরী।

সংগঠন : চেয়ারম্যান, আসাদ দিবস উদযাপন কমিটি; সভাপতি, সার্জেন্ট জহুরুল হক দিবস উদযাপন কমিটি, ১৬ ফেব্রুয়ারি; সভাপতি, সংযুক্ত একুশে উদযাপন সাংস্কৃতিক কমিটি, ২২ ফেব্রুয়ারি; আহ্বায়ক, জাতীয় একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন কমিটি; আহ্বায়ক, ২৬শে মার্চ উদযাপন কমিটি।

সংগঠন : সভাপতি (১৯৭৬ থেকে ১৯৯৪), বাঙলাদেশ ভাষা সমিতি; সভাপতি (১৯৭৬ থেকে ১৯৮১), বাংলাদেশ লেখক শিবির।

সম্পাদনা : সওয়াল সাহিত্য, জুলাই ১৯৭৬, আষাঢ় ১৩৮৩, প্রচ্ছদ কাইয়ুম চৌধুরী, পৃষ্ঠা ২৩৫, দাম কুড়ি টাকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সাক্ষাৎকার : ফাল্গুনী, ২১ ফেব্রুয়ারি।

01 January : The Bangladesh Times : Dr. Ahmed Sharif hoped that the new year would be very much be evenful and people would become more conscious and force unity for their common cause.

৯ জানুয়ারি : আসাদ দিবস উদযাপন কমিটি গঠন করা হয় তাঁকে চেয়ারম্যান করে। কমিটিতে অন্যান্যের মধ্যে জনাব আহমেদ হুমায়ুন, জনাব এনায়েত উল্লাহ খান, ড. বদরুদ্দোজা চৌধুরী, ক্যাপটেন (অবঃ) আবদুল হালিম, কাজী জাফর আহমেদ, জনাব রাশেদ খান মেনন ও কমরেড অমল সেনও ছিলেন।

১৩ জানুয়ারি : তাঁর সভাপতিত্বে আসাদ দিবস উদযাপন কমিটির এক বর্ধিত সভা জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি সকল প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে এই দিনটি পালনের আহ্বান জানান।

২০ জানুয়ারি : শহীদ আসাদ দিবস উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি হিসেবে তিনি বলেন, "আমাদের কাপুরুষেরাই আসাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী।"

২৯ জানুয়ারি : ঢাবি সিনেট অধিবেশন বসে। অধিবেশনে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন করা হয়। এর একজন ছিলেন ড. শরীফ।

১৬ ফেব্রুয়ারি : শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হকের স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষে গঠিত উদযাপন কমিটি আয়োজিত সভায় সভাপতি হিসেবে তিনি বলেন, জনগণের মুক্তি সংগ্রামের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হকের আত্মদানের কথা স্মরণ রাখতে হবে।

১৮ ফেব্রুয়ারি : ঢাবি ক্লাবে শামসুদ্দোহা দিবস পালিত হয়। এতে সভাপতির ভাষণে বলেন, জোহার মৃত্যুতে যে শিক্ষা আমরা পেয়েছি তা চিরদিন আমাদের শিক্ষক সমাজকে জাগ্রত করে রাখবে।

২০ ফেব্রুয়ারি : ড. আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে একুশে উদযাপন কমিটি এক আলোচনাসভার আয়োজন করে। এবার ২১-এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-সভাপতিসহ অন্যান্য বক্তারা এ অভিমত পোষণ করেন।

৪ জুন : ড. আহমদ শরীফকে সভাপতি এবং শাহরিয়ার কবিরকে সম্পাদক করে লেখক শিবিরের ১৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন সরদার ফজলুল করিম, বদরুদ্দীন উমর, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আহমেদ হুমায়ুন, ড. মহিউদ্দীন আলমগীর, সাঈদ-উর-রহমান, সুলতানা রেবু, মুনতাসীর মামুন, গোলাম মোস্তফা, শামীম ইসলাম, আবরার চৌধুরী এবং অরুণ মৈত্র।

৬ জুন : হুমায়ুন কবিরের চতুর্থ স্মৃতি বার্ষিকী পালন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি অঙ্গনে ড. আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

৩১ আগস্ট : ঢাবি বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান ড. আহমদ শরীফসহ অন্যান্য শিক্ষক বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবরে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

১৭ নবেম্বর : ১৭ নবেম্বর (বুধবার) মজলুম জননেতা আবদুল হামিদ খান ভাসানী রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ড. আহমদ শরীফ তাঁকে দেখতে যান।

২৩ ডিসেম্বর : মতিঝিল আদর্শ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (জয়নুল আবেদিন) ঢাকা শহর শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ড. আহমদ শরীফ এ সম্মেলন উদ্বোধন করে বলেন যে, আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত কোনো সুপরিকল্পিত কর্মসূচী প্রণীত হয়নি, এটা জাতির জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক।

১৯৭৭

১ জুলাই ডীন, কলা অনুষদ নির্বাচিত।

উৎসর্গকৃত গ্রন্থ : লালন ফকির, কল্যাণ মিত্র; অনতিক্রান্ত বৃত্ত, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

লিখিত ভূমিকা গ্রন্থ : আলাওলের পদ্মাবতী, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (সম্পাদিত)।

বক্তৃতা : সৈয়দ মুহম্মদ তৈফুর স্মৃতি বক্তৃতা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ১০ জানুয়ারি।

সংগঠন : আহ্বায়ক, একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন জাতীয় কমিটি, ১৯৭৭।

গ্রন্থ : মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, এপ্রিল ১৯৭৭, প্রচ্ছদ মোহাম্মদ

ইদ্রিস, পৃষ্ঠা ৪৪৭, মূল্য ত্রিশ টাকা, মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা।

সম্পাদনা : সিকান্দারনামা, আলাউল বিরচিত, আশ্বিন ১৩৮৪, অক্টোবর ১৯৭৭, প্রচ্ছদ এ মুক্তাদির, পৃষ্ঠা ৪০০, মূল্য তিরিশ টাকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সাক্ষাৎকার : বিচিত্রা, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ফারুখ ফয়সল; মনীষা সাহিত্য গোষ্ঠী, ২ ফেব্রুয়ারি; উত্তরায়ণী, ২২ ফেব্রুয়ারি; দেশবাংলা, ১১ মার্চ; দেশবাংলা, ১৯ এপ্রিল, লিয়াকত আলী।

১১ জানুয়ারি : ঢাবি ছাত্রশিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (জয়নুল আবেদিন গ্রুপ) বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ড. শরীফ তাঁর বক্তৃতায় শিক্ষকদের সমস্যা সমাধানে সক্রিয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, শিক্ষকদের অভুক্ত রেখে তাঁদের কাছ থেকে মহৎ কিছু আশা করা উচিত নয়। অধিকার-বঞ্চিত রেখে দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করার অধিকার কারো নেই। তিনি বলেন, শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব যেমন শিক্ষকদের, শিক্ষা ব্যবস্থা তাঁদেরই। কোনো ভাড়াটে লোক দিয়ে এটা সম্ভব নয়। কারণ যে লোকজন পাঁচ বছর আগে ধর্মশিক্ষককে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বাদ দিয়েছিলেন, তাঁরাই এখন ধর্মশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করার কাজ করছেন।

২১ জানুয়ারি : ড. আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে ঢাবি ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনে লেখক শিবিরের "ভাসানী নির্যাতিত মানুষের নেতা ছিলেন" শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন যে, জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সঞ্চার করাই মওলানা ভাসানীর সবেচেয়ে বড় অবদান।

৪ ফেব্রুয়ারি : এফডিসিতে অনুষ্ঠিত একটি ছবির মহরত অনুষ্ঠানে ড. আহমদ শরীফ বলেন, ছবির দৃশ্যে আমি চুমু পছন্দ করি। তবে অবশ্যই তা হবে চলচ্চিত্রের ঘটনা ও শিল্পের প্রয়োজনে। ব্যবসার জন্য যত্রতত্র খুশীমত চুমুর দৃশ্য জুড়ে দেয়া অবশ্যই অশ্লীলতা। ছায়াছবিতে জীবন ও সত্যের প্রতিফলন অবশ্যই ঘটবে। শিল্পসত্যের বিশ্লেষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, সত্য মানে সুন্দর, অসুন্দর এমনকি অসত্যও। ফিল্ম সেন্সর বোর্ড চুমুর দৃশ্য সম্বলিত বিদেশী ছবি প্রদর্শনের ছাড়পত্র দিয়ে যদি দেশী ছবিতে চুমুর দৃশ্য সম্পর্কে আপত্তি তোলেন তবে তা হবে স্ববিরোধিতারই শামিল। ঘটনা ও শিল্পের প্রয়োজনে স্বাভাবিক গতিধারায় ছবিতে চুম্বন দৃশ্য থাকলে অপরাধের হতে পারে না।

২১ ফেব্রুয়ারি : একুশে উদযাপন কমিটির সভাপতি ড. আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে মাহবুব আলী ইনস্টিটিউটে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু দিন সহ্য করা গেলেও গণতন্ত্রমনা মানুষ দীর্ঘদিন যাবৎ ভিন্ন শাসন মেনে নিতে পারে না। একুশের প্রকৃত অর্থকে বিকৃত করে বিশেষ মহলের ষড়যন্ত্রে শোক দিবসে পরিণত করা হয়েছে।

৩ মার্চ : ঢাবির ১৫০ জন শিক্ষক এক যুক্ত বিবৃতিতে অবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানান। যাঁরা বিবৃতি দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ড. আহমদ শরীফ অন্যতম।

12 April : The Bangladesh Times : Dr. Ahmed Sharif and Barrister Maudud Ahmed have been respectively elected President and Secretary of 45-member new Executive body of the Committee for Civil liberties and Legal Aid.

৮ ও ৯ এপ্রিল : আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে ঢাবি ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে বাংলাদেশ লেখক শিবিরের উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সভাপতির ভাষণে তিনি জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে অধিকার-সচেতন করে তোলার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

২৮ এপ্রিল : ঢাবি কলা অনুষদের ডীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ড. আহমদ শরীফ ডীন নির্বাচিত হন।

১৫ মে : আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে জাতীয় প্রেসকাবে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইনী সাহায্য কমিটির *শাসনতন্ত্র সংশোধন ও মৌলিক অধিকার* শীর্ষক এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, জনগণের মৌলিক অধিকার সামাজিক ন্যায়বিচারের পূর্বশর্ত।

৬ ও ৭ জুন : দু'দিনব্যাপী বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে ড. আহমদ শরীফ সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, "আমাদের দেশে তিন শ্রেণীর লেখক আছেন : সরকার ঘেঁষা, সরকার ভীরু ও সরকার বিরোধী।

৪ জুলাই : বাংলাদেশ-লেখক শিবিরের উদ্যোগে *বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্য* শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। লেখক শিবিরের সভাপতি ড. আহমদ শরীফ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন।

১১ জুলাই : ড. আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে লেখক শিবির কর্তৃক আয়োজিত সাম্রাজ্যবাদ শীর্ষক এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় অর্থনীতিবিদ আনু মাহমুদ একক বক্তব্য রাখেন।

১, ২ ও ৩ নভেম্বর : টিএসসি সেমিনার কক্ষে লেখক শিবিরের পর পর তিনটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি সেমিনারেই ড. আহমদ শরীফ সভাপতিত্ব করেন।

২৬ ডিসেম্বর : ইতিহাসের আলোকে বাঙলাদেশের সংস্কৃতি : সামন্ত যুগ বিষয়ে সুকান্ত একাডেমি আয়োজিত সভায় অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস পঠিত প্রবন্ধ সূত্রে বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। দুই দিনের আলোচনা সভার প্রবন্ধ, আলোচনা ও সভাপতির বক্তব্য সঙ্কলিত আছে মুক্তধারা প্রকাশিত *ইতিহাসের আলোকে বাঙলাদেশের সংস্কৃতি* গ্রন্থে।

১৯৭৮

১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাবি বাংলা বিভাগে চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত।

বাংলা একাডেমী কার্যনির্বাহী পরিষদের সহযোগী সদস্য।

সংগঠন : সভাপতি, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ফ্রন্ট, গঠিত ১৭ জানুয়ারি।

গ্রন্থ : বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য প্রথম খণ্ড, ডিসেম্বর ১৯৭৮, বর্ণমিছিল, ঢাকা, দ্বি. মু. জানুয়ারি ১৯৯৯, প্রচ্ছদ উৎপল দাস, পৃষ্ঠা ৪৫৬, মূল্য ২৫০ টাকা, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ৬৫ প্যারীদাস রোড, ঢাকা।

সম্পাদনা : নবীবংশ ১ম খণ্ড, সৈয়দ সুলতান বিরচিত, কার্তিক ১৩৮৫, নভেম্বর ১৯৭৮, প্রচ্ছদ আবদুর রউফ সরকার, পৃষ্ঠা ৯৩৫, মূল্য পঁচাত্তর টাকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রসুল চরিত নবীবংশ দ্বিতীয় খণ্ড, (সৈয়দ সুলতান বিরচিত, রসুল চরিত, জয়কুম রাজার লড়াই, জ্ঞান প্রদীপ ও পদাবলী), কার্তিক ১৩৮৫, নবেম্বর ১৯৭৮, প্রচ্ছদ আবদুর রউফ সরকার, পৃষ্ঠা ৭২০, মূল্য ষাট টাকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

কিফায়তুল মুসল্লিন ও কায়দানী কিতাব, শেখ মুত্তালিব বিরচিত, ভাদ্র ১৩৮৫ আগস্ট ১৯৭৮, প্রচ্ছদ আবদুর রউফ সরকার, পৃষ্ঠা ২৩২, মূল্য বিশ টাকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ, ব্রজমোহন দাস বিরচিত, সাহিত্য পত্রিকা, দ্বাবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, শীত ১৩৮৫, ঢাবি, ঢাকা।

3 January : The Bangladesh Times : Representatives of 13 literary and cultural organisations at a meeting at the Dhaka University library auditorioum formulated a 13 member committee to formulate a declaration for united cultural movement with Dr. Ahmed Sharif President of Bangladesh Lekhak Shibir as the convenor. Other members to the committee were : Mr. Abul Quasem Fazlul Huq (Sukanta Acadeny).Indu Shaha (Natya Fauj) Najmul Haq Nannu (Durjay Sangskritik Sangsad) Mohsin Sastrapani (Unmesh Shahity o Sangskritik Sangsad) Fayez Ahmed (Shistu Natym), Pinaki Das (Sangskritik Andolan), Prof. Nurunnabi (Gana Sangsritik Parishad), Ahmed kabir (Bhasha Samity).Sharif Harun (Uchcharam Shahitya Chakra),.Abu Saleh (Chhara Sangsad), Aktarul Haq (Deshkal) and Joyti Chattopadhay (Samasthi). The meeting which was sponsored by Lekhak Shibir was presided over by its president Dr. Ahmed Sharif.

১৩ ফেব্রুয়ারি : দৈনিক বাংলা : ১৭ই মার্চ ঢাকায় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ফ্রন্টের তিন দিনব্যাপী সম্মেলন উপলক্ষে সাংবাদিক সম্মেলনে ড. আহমদ শরীফ সর্বস্তরে মাতৃভাষা বাংলা চালু, একটি পূর্ণাঙ্গ নাট্যশালা স্থাপন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও অবৈতনিক মাধ্যমিক শিক্ষার প্রবর্তন, অশ্লীল যৌন সাহিত্য প্রকাশের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ এবং কারাগারে আটক রাজনৈতিক বন্দী ও কর্মীদের পছন্দমত বই সরবরাহের দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এই ফ্রন্ট কাগজসহ প্রকাশনা ও মুদ্রণসামগ্রীর ক্রমবর্ধমান মূল্যহ্রাস এবং জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতানুযায়ী বইপত্রের মূল্য নির্ধারণ, সংবাদপত্রের ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাসহ মানুষের মৌলিক সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলবে।

৮ এপ্রিল : নবগঠিত গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ফ্রন্টের প্রথম জাতীয় সম্মেলন ৭, ৮ ও ৯ এপ্রিল ঢাবি টিএসসিতে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ড. আহমদ শরীফ।

সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, আমরা বাঁচতে চাই। বাঁচাতে চাই। গণমানুষকে বাঁচার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছি। সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ দেন জনাব মাশির হোসেন ও ঘোষণাপত্র পাঠ করেন জনাব শাহরিয়ার কবির। এ ছাড়া ঘোষণাপত্র ও নীতিমালার ওপর আলোচনা করেন জনাব মহসিন শস্ত্রপাণি ও নরেন বিশ্বাস। **সাংস্কৃতিক ঐক্য** (এপ্রিল ১৯৭৮, পৃ. ৬৭, মূল্য ১ টাকা) নামে সংকলন প্রকাশ করা হয়।

29 May : White paper on political murders urged. The third annual general meeting of the Committee for Civil Liberties and Legal Aid was held on Sunday at the auditorium of the Bangla Academy with Dr. Ahmed Sharif in the chair. The meeting in resolution demanded the constitution of an enquiry commission to probe into the killings of political workers by legal and extra-legal forces and agencies of the government from 1971 till today. It urged the authorities to publish a white paper in this regard.

১৬ জুন : বাংলা একাডেমীতে ড. আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ফ্রন্টের উদ্যোগে *সংবাদপত্রের অধিকার দিবস* শীর্ষক এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, বর্তমান জিয়া সরকার কালাকানুনগুলো ব্যবহার করে ক্ষমতাকে আরও পাকাপোক্ত করে তুলেছে। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন মোহাম্মদ তোহা, আনোয়ার জাহিদ, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, মহসিন শস্ত্রপাণি, আবদুল মতিন, শাহরিয়ার কবির ও মিঃ ইন্দু সাহা।

৯ সেপ্টেম্বর : মাহবুব আলী মিলনায়তনে মোহাম্মদ তোহার সভাপতিত্বে মাও সে তুং-এর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। ড. আহমদ শরীফ এ সেমিনারে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, মাও সে তুং চীনের ৮০ কোটি মানুষকে মুক্ত করেছেন এবং বিশ্বের তিনশ' কোটি মানুষও এখন মুক্তির পথে মাও সে তুং-এর চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হচ্ছে। আমরাও মাও সে তুং-এর পথ অনুসরণ করে মুক্তি প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। আর মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে সমাজতন্ত্র।

১৬ সেপ্টেম্বর : ড. আহমদ শরীফকে 'অতিসাম্প্রতিক আমরা' এবং বাংলাদেশ পরিষদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত নজরুল স্মরণসভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করতে বলায় তিনি তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী তিনি কোনো সরকারী প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে যেতে নারাজ এবং যেহেতু নজরুল ইসলামকে নিয়ে আজকাল ইসলামী ব্যবসা শুরু হয়েছে সেহেতু অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

১৯৭৯

উৎসর্গকৃত গ্রন্থ : চট্টগ্রামের চরিতাভিধান, আবদুল হক চৌধুরী।

বক্তৃতা : সাঈদুর রহমান ফাউন্ডেশন বক্তৃতা, বিষয় : সংস্কৃতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯ এপ্রিল।

গ্রন্থ : প্রত্যয় ও প্রত্যাশা, বৈশাখ ১৩৮৬, মে ১৯৭৯, ইউপিএল, ঢাকা, দ্বি. মু. ফাল্গুন ১৩৯৩, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭, প্রচ্ছদ সরদার জয়নুল আবেদীন, পৃষ্ঠা ১৯৪, মূল্য শোভন সংস্করণ ৬৪ টাকা, লেখক সংস্করণ ৪৮ টাকা, অক্ষর, ৪ নিউ সার্কুলার রোড, ঢাকা-১৭।

সাক্ষাৎকার : স্বকাল, ৬ মার্চ; বাংলাদেশ ইলাস্ট্রেটেড উইকলি, ২৪ জুন, এ. এফ. এম. সিরাউদ্দৌলা; বাংলাদেশ টাইমস, ৭ জুলাই, এ. ইউ. এম. ফখরুদ্দীন; স্বকীয়তা, অক্টোবর (সংখ্যা ১০), ইসরাইল খান; সত্যকথা, ২১ ডিসেম্বর, আলতাফ চৌধুরী।

২ জানুয়ারি : বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে শহীদ সিরাজ শিকদারের চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন শামীম শিকদার। সভায় ড. শরীফ বলেন, আমরা নিজেদের প্রগতিবাদী বলে দাবি করি, কিন্তু আমাদের চরিত্রে তার পরিচয় নেই। অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন আবদুল মতিন, সালেহা আনোয়ার উদ্দিন, সাইদ উর রহমান, সৈয়দ জহির সাদেক প্রমুখ।

২৩ এপ্রিল : বাংলা একাডেমীতে গণসংস্কৃতি পরিষদের তিন দিনব্যাপী দ্বিতীয় জাতীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন সমাপ্ত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ম. নুরুন্নবী এবং প্রধান অতিথির ভাষণ দেন ড. আহমদ শরীফ।

১৯৮০

২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে গঠিত বাংলা একাডেমী কার্যনির্বাহী পরিষদের সহযোজিত সদস্য।

পুরস্কার : বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ সাহিত্য পদক।

সাক্ষাৎকার : বসুন্ধরা, ২১ ফেব্রুয়ারি, জাহাঙ্গীর হোসেন বাদল; পারাপার, আগস্ট; গণকণ্ঠ, ২৬ অক্টোবর; সংবাদ, ১৬ নভেম্বর।

১৬ মে : ড. আহমদ শরীফ ঢাবি কলা অনুষদের ডীনের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি ১৯৭৩ সালের অগণতান্ত্রিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ বাতিলের দাবিতে পদত্যাগ করেন। ঢাবির ৩৭৭ জন শিক্ষক এক যুক্ত বিবৃতিতে ১৯৭৩ সালের অগণতান্ত্রিক ঢাবি অধ্যাদেশ বাতিলের অনুরোধ জানান। বিবৃতিতে স্বাক্ষরদানকারীদের মধ্যে ঢাবি কলা অনুষদের ডীন ড. শরীফও ছিলেন।

১৩ জুন : মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটির সভাপতি ড. আহমদ শরীফ ও সাধারণ সম্পাদিকা কামরুন্নাহার লায়লী বিবৃতি প্রদান করেন : সম্প্রতি তিনজন সংসদ সদস্যের প্রেস বিবৃতি থেকে যা জানা গেল, তাতে জাতির রাষ্ট্রের হিতকামী কোনো নাগরিকই বিচলিত না হয়ে পারে না। রালমপতি গাঁয়ের হত্যাকাণ্ড দক্ষিণ ভিয়েতনামের মাইলাইয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ফেনী, চট্টগ্রাম থেকে প্রায় এক লক্ষ লোককে পার্বত্য চট্টগ্রামে নির্বাসিত করা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদি অধিবাসীদের সম্পদ হরণ ও তাদের সংখ্যালঘু করার ষড়যন্ত্রেরই শামিল বলে আমরা মনে করি।

১৩ জুলাই : তিনি বলেন, গ্রাম সরকার গঠিত হলেও গ্রামের মানুষ জানমালের নিরাপত্তা পাচ্ছে না। গ্রামের সমস্ত অন্যায় কাজকর্ম তাদের গোচরীভূত হলেও অনেক সময় এক

শ্রেণীর প্রভাবশালী লোকদের দাপটে তারা কিছু করতে পারছে না। গ্রাম সরকার গঠিত হচ্ছে নির্বাচনে নয়, নিয়োগে।

১৪ অক্টোবর : ড. আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে ঢাবি টিএসসিতে বাংলাদেশ লেখক শিবির নিউজ প্রিন্টের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে এক সেমিনারের আয়োজন করে। আর প্রতিবাদ নয়, প্রতিরোধ। বর্তমান সরকারের গণবিরোধী ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ন্যূনতম কর্মসূচীভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানান সভাপতি। তিনি বলেন, মওলানা ভাসানীর মৃত্যুর পর বিরোধী দলগুলো জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য কার্যকর আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। আজকের সঙ্কট হলো সাহস ও নেতৃত্বের সঙ্কট।

১৩ অক্টোবর : মাহবুব আলী ইন্সটিটিউটে গণসংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে মাও সে তুং-এর স্মরণে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি মঃ নুরুন্নবী। ড. আহমদ শরীফ দেশের সমকালীন অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে এদেশে মার্কসবাদ প্রয়োগ করার জন্য বামপন্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, মৌলবাদীদের সাথে এদেশের বামপন্থীদের কোনো পার্থক্য নেই। কেননা মৌলবাদীরা সব সময় কোরানের উদ্ধৃতি দেন আর বামপন্থীরা মার্কসবাদ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের উদ্ধৃতি দেন। দেশের বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে মার্কসবাদ প্রয়োগ করেন না।

১৯৮১

সংগঠন : সভাপতি, সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদবিরোধী নাগরিক কমিটি, গঠিত ২৮ এপ্রিল; সভাপতি, কর্নেল তাহের সংসদ, গঠিত ৫ জুলাই; সভাপতি, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নাগরিকদের জাতীয় কমিটি, গঠিত ২৮ জুলাই।

সাক্ষাৎকার : লেখক সমাবেশ (কোলকাতা), ১ ফেব্রুয়ারি, রশীদ আল ফারুকী; নাহার; মশাল, বিষয় : জাসদের ১৮ দফা, ২১ ফেব্রুয়ারি।

১২ জানুয়ারি : ঢাবি কলা ভবন প্রাঙ্গনে ড. আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ লেখক শিবির এবং মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটির যৌথ উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিবাদসভাটি হয়েছিল উপদ্রুত এলাকা বিলের বিরুদ্ধে।

২৫ জানুয়ারি : সওগাত পত্রিকার সম্পাদক জনাব নাসির উদ্দিন ডিইউজের তিন দিনব্যাপী বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এতে ড. আহমদ শরীফ বলেন, আমাদের প্রত্যেকটি মানুষর খণ্ড চেতনার দরুনই আজ সর্বত্র আন্দোলন-বিমুখতা। যেমন নিউজপ্রিন্টের মূল্য বৃদ্ধি করলে সাংবাদিকরা প্রতিবাদে সোচ্চার হয় অথচ কাগজের দিস্তা ৬ টাকা হওয়ার পর কোনো প্রতিবাদ নেই। সুতার মূল্য বৃদ্ধি করার পরও কেউ প্রতিবাদ করে না। যে দেশে মানুষের মৌলিক অধিকার নেই সে দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হবে কি করে? তাই খণ্ডভাবে নয়, সকলের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমেই তা আদায় করতে হবে।

১৩ ফেব্রুয়ারি : তাঁর সভাপতিত্বে মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার '৮১ বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, সমকালীন চিন্তা ও চেতনাকে আবুল

ফজল ও এনামুল হক কখনও এড়িয়ে যাননি। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও সাধনা করে তাঁরা আদর্শ স্থাপন করেছেন।

২১ ফেব্রুয়ারি : তিনি ১৯৮০ সনের গৃহীত জাসদের ১৮ দফা কর্মসূচীকে স্বাগত জানান। এদের ভাল মন্দ দুটো দিককে তিনি তুলে ধরেছেন। ড. শরীফ অভিমত ব্যক্ত করেন যে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের গৃহীত কর্মসূচী কিছু বিশিষ্টতার দাবিদার। তাদের ১৮ দফা সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত বলে মনে হয়। এগুলোর বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হলে দেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি এও বলেন যে, ১৮ দফার মধ্যে দেশের সামাজিক ও আর্থিক শ্রেণিবিন্যাস স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। যেমন কৃষক শ্রমিক যে অর্থে শ্রেণি, সে অর্থে নারী পুরুষ শ্রেণি নয়।

২৬ এপ্রিল : ঢাবি ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে ড. আহমদ শরীফসহ ৮ জন বুদ্ধিজীবী দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও জনগণের চিহ্নিত শত্রু উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিরোধ করার জন্য নাগরিক প্রতিরোধ কমিটি গঠনের জন্য ঢাকার বিশিষ্ট লোকদের আহ্বান জানান। এ সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন মিঃ নির্মল সেন, জনাব ফয়েজ আহমদ, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, জাহানারা ইমাম ও জনাব এনায়েতুল্লাহ খান।

২৮ এপ্রিল : দৈনিক বাংলা : বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (আজাদ-সিদ্দিকী) দুদিনব্যাপী কেন্দ্রীয় সম্মেলন সোমবার ঢাবি মহসীন হল মাঠে শুরু হয়েছে। ড. আহমদ শরীফ এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন । তিনি বলেন, আমরা এক বিপন্ন সময় ও পরিবেশে বাস করছি। শোষিত মানুষ আজ যুবসমাজের দিকে তাকিয়ে আছে।

১৪ এপ্রিল : ঢাবি ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনের সেমিনার কক্ষে তার সভাপতিত্বে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী এক নাগরিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই নাগরিক সমাবেশে তাঁকে প্রেসিডেন্ট এবং এনায়েতউল্লাহ খানকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী নাগরিক কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে ২০১ জন সদস্য ছিল।

1 Aprial : The Bangladesh Observer : Elections for the teachers representatives in the Dhaka University senate, Syndicate was held on 30th March, 1981 at the Teacher Student Cantre. Main contestants in the elections were two panels led by Prof. Ahmed Sharif and Kabir Chowdhuary, Out of the total 35 seats in the senate the sharif panel bagged 26 seats while the rest 9 seats won by the kabir panel. Of the 2 seats in the Syndicate and Finance Committee Prof. M.A. Mannan, Dean, Faculty of Biological Sciences and Prof. Wahedunddin Mahmood of Economics Department were elected members respectively. Both of them belong to the Sharif panel.

৭ মে : টিএসসি সেমিনার কক্ষে তার সভাপতিত্বে সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী কমিটির এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির ভাষণে তিনি বাংলাদেশের বর্তমানে জামাতে ইসলামসহ বিভিন্ন ফ্যাসিবাদী শক্তির স্বাধীনতা বিরোধী তৎপরতায় সরকারের সহায়ক ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন সরকার ফ্যাসিস্ট জামাতকে জনগণের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে।

২৫ মে : বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী নাগরিক কমিটির সভাপতি ড. আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপে ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জনমত তৈরির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে শৈথিল্যের অভিযোগ করেন। এই দ্বীপ পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে সরকারের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ করেন। অন্যান্যের মধ্যে কর্নেল (অব) কাজী নুরউজ্জামান, নঈম জাহাঙ্গীর, এনায়েতউল্লাহ খান, মিঃ নির্মল সেন, মাহমুদুর রহমান মান্না, ফজলে হোসেন বাদশা ও মিসেস জাহানারা ইমাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

১১ জুলাই : তাঁর সভাপতিত্বে ঢাবি ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে কর্নেল তাহের সংসদ এক আলোচনাসভার আয়োজন করে। সভায় তিনি বলেন, তাহের শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক মানুষের প্রতিবাদের প্রতীক।

২৮ জুলাই : জাতীয় প্রেসক্লাবে এক জনাকীর্ণ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন উপলক্ষে গঠিত নাগরিক কমিটির পক্ষে তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জাতীয় প্রার্থীরূপে বঙ্গবীর ওসমানীর নাম ঘোষণা করেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন উপলক্ষে গঠিত নাগরিক কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী। অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলকে জাতীয় প্রার্থীরূপে বর্ণনা করে ড. শরীফ বলেন, দলমত নির্বিশেষে তাঁকে (ওসমানী) উপস্থাপিত করা হয়েছে। তিনি কমিটির ৩৫ দফা কর্মসূচীও ঘোষণা করেন। নাগরিক কমিটির পক্ষে বিশিষ্ট যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন ড. আহমদ শরীফ, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, লেঃ কর্নেল (অব) নূরুজ্জামান, উইং কমান্ডার (অব) এস. এ. বেগ, ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিয়া, আমানুল্লাহ কবির, ড. মফিজ চৌধুরী, জনাব এনায়েতউল্লাহ খান, জনাব ফয়েজ আহমদ, জনাব মাহমুদুর রহমান মান্না প্রমুখ।

১৯৮২

ভূমিকা লিখিত গ্রন্থ : আসহাব উদ্দিন রচনা সংগ্রহ, আসহাব উদ্দিন আহমদ।

সংগঠন : সভাপতি, ডারউইন মৃত্যুশতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি, গঠিত ২৪ ডিসেম্বর।

সাক্ষাৎকার : গণকণ্ঠ, ১১ অক্টোবর।

১৪ ফেব্রুয়ারি : তাঁর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ভাষা সমিতি প্রয়াত ডক্টর এনামুল হকের স্মরণে এক আলোচনাসভার আয়োজন করে। ডক্টর শরীফ এতে বলেন, ড. এনামুল হক যা বিশ্বাস করতেন, সেই বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য কাজ করতেন। নানা দিক থেকে বলা যায় তিনি একজন অনন্য মানুষ ছিলেন।

6 August : The Bangladesh Observer : Govt. Urged to stick to new drug policy. Leading physicians, educationals and journalists have welcome the new drug policy and urged upon the Government to Stick it firmly in the greater national interest. 229 distinguished persons of the country supported this policy. Renowned educationist and intellectual Dr. Ahmed Sharif was one of them.

২২ সেপ্টেম্বর : ভাষা সমিতির সভাপতি ড. আহমদ শরীফ ও সম্পাদক মনসুর মুসা একটি বিবৃতি দেন। জরুরী ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করা এবং প্রথম শ্রেণিতে আরবি ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ইংরেজি বাধ্যতামূলক না করার জন্য

সরকারের কাছে বাংলাদেশ ভাষা সমিতি এক আবেদন জানিয়েছেন। তাঁরা যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, প্রথম শ্রেণিতে আরবি ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ইংরেজি বাধ্যতামূলক করা অবৈজ্ঞানিক ও শিশু মনোবিজ্ঞানের নীতিবিরোধী। পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশে এ ধরনের ক্ষতিকর ও শিশু মনস্তত্ত্ববিরোধী শিক্ষা কার্যক্রম আছে কি না আমাদের জানা নেই। দুটো বিদেশী ভাষা বাংলাদেশের কোমলমতি শিশুদের মাথায় চাপিয়ে দিলে এদেশের ভবিষ্যত নাগরিকদের মৌলিক শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। বিদেশী ভাষা শেখা প্রয়োজন তবে সেটা অবশ্যই মাধ্যমিক ও উচ্চ পর্যায়ে হওয়া উচিত।

৯ অক্টোবর : ড. আহমদ শরীফসহ পনেরজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে ৩ ভাষা শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত পরিহার করে বিশেষজ্ঞদের মতামতগ্রহণের মাধ্যমে সুষ্ঠু শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও ব্যাপকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানিয়েছেন। বিবৃতিতে অন্যান্যের মধ্যে স্বাক্ষর করেন অধ্যাপক আবুল ফজল, অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, অধ্যাপক আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ, খান বাহাদুর আবদুল হাকিম, অধ্যাপক এ. আর. মল্লিক, অধ্যাপক মুসলেহ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, অধ্যাপক মফিজুল্লাহ কবীর, অধ্যাপক সালাউদ্দীন আহাম্মদ, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন, সরদার ফজলুল করিম, জনাব বদরুদ্দিন উমর, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

২৪ ডিসেম্বর : তাঁর সভাপতিত্বে বৃটিশ কাউন্সিল মিলনায়তনে ডারউইন মৃত্যু শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি এক সেমিনারের আয়োজন করে। সভাপতির বক্তৃতায় তিনি বলেন, ডারউইনের আবিষ্কৃত তথ্য উনিশ-বিশ শতকের ইউরোপীয় মানুষের চেতনায় ও জীবনভাবনায় কি পরিবর্তন ঘটিয়েছে আজ তা অনুধাবন করা প্রয়োজন। এ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।

১৯৮৩

২৮ ফেব্রুয়ারি, সোমবার রাত ২-৪৫ মিনিটে মাতা সিরাজ খাতুনের মৃত্যু। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর।

৩০ জুন, ডীন কলা অনুষদ ঢাবি পদ থেকে অবসর গ্রহণ।

৩০ জুন, ঢাবি বাংলা বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ।

উৎসর্গকৃত গ্রন্থ : পাথরের পুথি, দাউদ হায়দার।

সংগঠন : সভাপতি, কাল মার্কস মৃত্যুশতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি; সভাপতি, স্বদেশ চিন্তা সংঘ।

গ্রন্থ : **বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য** [দ্বিতীয় খণ্ড], ২৯ অগ্রহায়ণ ১৩৯০, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৩, প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ওবায়দুল ইসলাম, লিপি রাজা মিঞা, পৃ ১১৩৪, মূল্য ২০০ টাকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সাক্ষাৎকার : The New Nation, 30 Aug, Samina Islam

২৪ এপ্রিল : তাঁর সভাপতিত্বে ইনসিওরেন্স একাডেমী মিলনায়তনে কমরেড সুধাংশু বিমল দত্তের মৃত্যুতে এক শোকসভার আয়োজন করা হয়। সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, এ দেশের মাটি ও মানুষের সেবার জন্য ব্রত নিয়েই সুধাংশু বিমল দত্ত ১৯৩৯ সালে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। কিন্তু আজ সেই দল বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন। জনগণের মধ্যে

এখন এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে কম্যুনিস্ট আন্দোলনে যারা ছিলেন তাদের মৃত্যু হয়েছে। এ অবস্থার পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। শোকসভায় অন্যান্যের মধ্যে বদরুদ্দীন উমর, নুরুল হুদা মীর্জা, মোস্তফা জামাল হায়দার ও আরও অনেকে বক্তব্য রাখেন।

১২ জুন : ২৫ মে ১৯৮৩ প্রদত্ত এক সরকারী আদেশে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালককে একাডেমীর সকল কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রদান করায় একাডেমী কার্যনির্বাহী পরিষদের ৫ জন সদস্য ১২ জুন ১৯৮৩ একযোগে পদত্যাগ করেন। পদত্যাগকারী সদস্যগণ হলেন ড. আহমদ শরীফ, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ফয়েজ আহমদ, জাহানারা ইমাম ও মোহাম্মদ আবু জাফর।

৩০ জুন : ঢাবি সিনেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ২৯ জুন ভাইস চ্যান্সেলরের অভিভাষণের ওপর আলোচনাকালে তিনি বলেন, ছাত্ররা রাজনীতি করবে। জীবনে বাঁচার জন্য যে কাজ তাই রাজনীতি। তিনি আরও বলেন, আফ্রো, এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকার ছাত্ররা রাজনীতি করবে।

১ জুলাই : চ্যান্সেলর কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকের শিক্ষকতার মেয়াদকাল বাড়ানোর সিদ্ধান্ত অনুমোদিত না হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাবি সিনেটের অধিবেশন ১ জুলাই নির্ধারিত কার্যসূচী স্থগিত রেখে মুলতবি করে দেয়া হয়। এই শিক্ষকদের মধ্যে অধ্যাপক আহমদ শরীফ অন্যতম।

২০ আগস্ট : সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব শামসুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে *গণতন্ত্র ও স্বাধীন শক্তিশালী বিচার ব্যবস্থা* শীর্ষক দু'দিনব্যাপী এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ড. আহমদ শরীফ এ সেমিনারে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, যেখানে আজকে সংগ্রামের প্রয়োজন সেখানে আপনারা আলোচনা করে বিবেকের কাছে শান্তি পেতে চাইছেন।

৩০ আগস্ট : বেইলী রোডস্থ গাইড হাউস মিলনায়তনে বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক ও ছড়াকার লুৎফর রহমান সরকারের সভাপতিত্বে আবুল ফজল স্মরণে মুক্তধারা এক আলোচনাসভার আয়োজন করে। ড. আহমদ শরীফ এ সেমিনারে বলেন যে, অধ্যাপক আবুল ফজল সমকালীন চিন্তা-চেতনার নেতৃত্ব দিয়ে চিন্তার জগতে এক নতুন পরিবেশের সৃষ্টি করে গেছেন। আমরা তাঁকে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি বা সাহিত্যিক হিসাবেই দেখি না। তিনি ছিলেন যুগের ব্যক্তি। এ আলোচনাসভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম, ড. মোস্তফা নুরুল ইসলাম, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও অধ্যাপক আবদুল হাফিজ।

১৯৮৪

২০ জুন : ভ্রাতা অ্যাডভোকেট আহমদ সোবহানের মৃত্যু।

৩০ জুন : পর্যন্ত অতিরিক্ত সময়ের চাকরি হিসেবে ঢাবি বাংলা বিভাগে কর্মরত।

৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ঈদুল আজহার পূর্বদিন (হজের দিন) ১২-৩০ মিনিটে ৬১ বছর বয়সে ভ্রাতা ডাক্তার আহমদ জহীরের (বশর) মৃত্যু।

১ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ বছরের জন্য চবি বাংলা বিভাগে কাজী নজরুল ইসলাম অধ্যাপক পদে নিয়োগ লাভ।

পুরস্কার : অলক্ত সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার।

উৎসর্গকৃত গ্রন্থ : বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠ সমীক্ষা, মুহাম্মদ শাহজাহান মিয়া।
ভূমিকা লিখিত গ্রন্থ : ইউসুফ জোলেখা, ড. মুহম্মদ এনামুল হক।
বক্তৃতা : বাংলা একাডেমী বক্তৃতামালা, বিষয় : মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে চিন্তা-চেতনার বিবর্তনধারা, বাংলা একাডেমী, ২০-২২ সেপ্টেম্বর।
সম্পাদনা : বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, সম্পাদক শিবপ্রসন্ন লাহিড়ীর সঙ্গে বিশেষজ্ঞ ও উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেছেন, ১৯৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
২ জানুয়ারি : নিউ নেশান : শহীদ সিরাজ সিকদারের ৯ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাবি টিএসসি সড়কদ্বীপে শহীদ বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিক স্মৃতি সংসদ কর্তৃক আয়োজিত সভায় ড. আহমদ বক্তৃতা দেন।
১৪ ফেব্রুয়ারি : জনাব শামসুজ্জামান মিলনের সভাপতিত্বে কার্জন হল চত্বরে শহীদ বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিক স্মৃতি সংসদ, গণছায়া ও মহাকাল-এর যৌথ উদ্যোগে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। ড. আহমদ শরীফ তাঁর বক্তৃতায় বলেন, আমরা চরম অবক্ষয়ের মধ্যে আছি। জনসাধারণ বুঝে গেছে, বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সরকার দিয়ে কিছু হওয়ার নয়। নতুন নেতৃত্ব, নতুন আদর্শ এবং আন্দোলনের নতুন ধারা এই অবক্ষয়ের অবসান ঘটাতে পারে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।
১৭ ফেব্রুয়ারি : বাংলা একাডেমীতে জাবির ভাইস চ্যান্সেলর জনাব জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে বঙ্গবীর ওসমানীর স্মরণে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। এ স্মরণসভায় ড. আহমদ শরীফ বলেন, জেনারেল ওসমানী মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলেন, এদেশের স্বাধীনতা অর্জনে তাঁর ভূমিকা ছিল সর্বাধিক। প্রতারণা এবং মতলববাজি না জানার কারণে জেনারেল ওসমানী রাজনীতিতে সফল হতে পারেননি। তবুও তিনি ছিলেন বহুজনের হিতে গণতন্ত্রকামী।
১৮ ফেব্রুয়ারি : ডক্টর আহমদ শরীফ, লেঃ কর্নেল (অব) কাজী নুর উজ্জামান বীরউত্তম ও নঈম জাহাঙ্গীর এক যুক্ত বিবৃতিতে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিতভাবে উপজেলা নির্বাচন প্রতিহত করার জন্যে সর্বস্তরের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। সরকার এদিকে জনগণের সব রায় ও মতামত উপেক্ষা করে তথাকথিত উপজেলা নির্বাচনের কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। জনগণের দোরগোড়ায় প্রশাসনকে নিয়ে যাওয়ার নামে সামরিক শাসন দীর্ঘায়িত করারই অপচেষ্টা চলছে।
২১ এপ্রিল : ড. আহমদ শরীফসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫ জন শিক্ষক রেডিও-টেলিভিশনকে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থারূপে গড়ে তোলার দাবি জানিয়ে এক বিবৃতি দেন।
৫ মে : ঢাবি ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে জনাব বদরুদ্দীন উমরের সভাপতিত্বে লেখক শিবিরের চতুর্থ জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করা হয়। ড. আহমদ শরীফ এ সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ দেন। তিনি বলেন, দেশের রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষোভকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে না। জনসাধারণের সঠিক মুক্তি অর্জন তাদের দ্বারা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো চরিত্র নেই। জনগণের মধ্যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে তারা সত্যিকার পথে ব্যবহার করছে না।
১৪ মে : ড. আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে জাবি কর্তৃক বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা শীর্ষক এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সভাপতি তাঁর ভাষণে

বলেন, সংবিধানে চার মূলনীতি একটা ধাপ্পা, আমাদের শিশুর মত অবুঝ বলে ধারণা করে সান্ত্বনা দেয়ার ব্যাপার যেন।

২৯ মে : টিএসসিতে ওষুধ নীতি : দু'বছরের অভিজ্ঞতা শীর্ষক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আহ্বায়ক ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিয়া। এ আলোচনাসভায় ড. আহমদ শরীফ স্বাস্থ্যের জন্য ওষুধের আগে ভাতের জন্য আন্দোলনের ওপর গুরুত্ব দেন।

২০ আগস্ট : সাভার গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ-এর শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মও কেথরিনের সভাপতিত্বে জাতীয় প্রেসকাবে এক আলোচনা ও প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ আলোচনাসভায় ড. আহমদ শরীফ বলেন, গণস্বাস্থ্য ঔষধ কোম্পানীর ঘটনা যেন দেশীয় শিল্প ধ্বংস করার জন্য মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীগুলোর পুরাতন খেলা। তিনি মনে করেন, ঔষধনীতি মাল্টি ন্যাশনালের স্বার্থক্ষুণ্ন করে দেশীয় ঔষধ শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করায় মাল্টিন্যাশনালগুলো ঔষধনীতি বানচালের চক্রান্তে নেমেছে। অবশ্য তিনি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মালিককে স্মরণ করিয়ে দেন, ট্রেড ইউনিয়ন করা শ্রমিকদের বিশ্বস্বীকৃত মৌল অধিকার। ট্রেড ইউনিয়ন করার জন্য কোনো শ্রমিক কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়ে থাকলে তা প্রত্যাহার ও উৎপাদনের স্বার্থে শ্রমিকদের দাবি পূরণের আহ্বান জানান।

২৬ অক্টোবর : গণচীনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে গণসংস্কৃতি পরিষদ এক আলোচনার আয়োজন করে। এতে ড. আহমদ শরীফ বলেন, গণচীনে আধুনিকায়নের নামে সর্বনাশ হতে চলেছে। এতে হতাশ না হয়ে বৃহত্তর পার্টি গড়ার মাধ্যমে দুর্বার গণসংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

২৮ অক্টোবর : বাংলাদেশ লেখক ইউনিয়নের মত প্রকাশের স্বাধীনতার দাবিতে এক মিছিল বের হয়। এ মিছিলে ড. আহমদ শরীফসহ প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম, ড. ওয়াকিল আহমদ, ড. হুমায়ুন আজাদ, মিসেস মাফরুহা চৌধুরী, মিসেস জাহানারা ইমাম, মিসেস মকবুলা মনজুর, আহমদ ছফা, মহসিন শস্ত্রপাণি প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

১৩ নবেম্বর : শিল্পকলা একাডেমীতে ঋষিজ শিল্পী গোষ্ঠীর ৮ম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন, আন্তরিকভাবে চাইলে গণমানুষের দুঃখ-দুর্দশা মোচন সম্ভব। বিরোধী দলগুলো পাঁচ দফা দাবি নিয়ে সোচ্চার হলেও তাতে গণমানুষের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের কথা নেই।

১৬ ডিসেম্বর : ড. আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বাংলা একাডেমীতে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, স্বাধীনতা পূর্ব কালের চাইতেও আমাদের বর্তমান অবস্থা খারাপ। কারণ এখন আমরা নির্যাতিত-শোষিত হচ্ছি স্বদেশীদের হাতেই । সভায় অন্যান্যের মধ্যে গাজীউল হক, শ্রী সন্তোষ গুপ্ত, ড. কে. এম. মোহসীন, বেলাল মোহাম্মদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

১৯৮৫

২ জানুয়ারি : শহীদ সিরাজ শিকদারের দশম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। শহীদ বিপ্লবী ও প্রেমিক স্মৃতি সংসদ এবং সিরাজ শিকদার স্মৃতি সংসদ ও বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী এ

আলোচনা সভার আয়োজন করে। ড. শরীফ তাঁর বক্তৃতায় বলেন, সিরাজ শিকদার মানুষকে ভালবেসে তাদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন।

২ জানুয়ারি : উপমহাদেশের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ও চট্টগ্রামের কৃতি সন্তান মৃত দেশ প্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেন গুপ্তের স্বনামধন্য স্ত্রী ও রাজনৈতিক নেত্রী শ্রীমতী নেলী সেন গুপ্তার জন্ম শতবার্ষিকী এবং বিপ্লবী অগ্নি পুরুষ মাস্টারদা সূর্য সেনের ৫১তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ড. আহমদ শরীফ, জনাব আহমদ ছফা, জনাব আইয়ুব আলী, বিনোদ দাশ গুপ্ত, এক যুক্ত বিবৃতিতে সর্বস্তরের জনগণকে এ আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান।

৮ ফেব্রুয়ারি : শিশু একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত জ্ঞানের কথা বইটিকে এরশাদ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করায় ইসলাম বিরোধী তথ্য এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে যে সব কথা উঠেছে তা ড. আহমদ শরীফ এবং লেঃ কঃ (অবঃ) কাজী নুরউজ্জামান তা খণ্ডন করেন।

২১ ফেব্রুয়ারি : তাঁর সভাপতিত্বে বাংলা একাডেমীতে অমর একুশ উপলক্ষে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, আমাদের মূল দাবি, মূল অধিকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, দেশের সমস্ত লোককে শিক্ষিত করা। তিনি আরও বলেন একুশকে প্রসারিত করতে হলে চাই জ্ঞানচক্ষু, জ্ঞানের উন্মীলন। প্রাইমারি শিক্ষা, গণশিক্ষা-এছাড়া একুশের কথা বলা অর্থহীন।

২৫ ফেব্রুয়ারি : শফিউদ্দিন সরকারের সভাপতিত্বে অমর একুশে স্মরণে ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স-এর উদ্যোগে *ভাষা সংস্কৃতি ও প্রযুক্তি* শীর্ষক এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক আহমদ শরীফ আলোচনাসভায় বলেন, দেশকে বাঁচাতে হলে বিদেশী প্রভাবমুক্ত একজন সৎ নেতার প্রয়োজন, যে নেতা জানে কুকুর হয়ে আদর পাওয়ার চেয়ে বাঘ হয়ে গুলি খাওয়া ভাল।

১৯ এপ্রিল : বাংলাদেশ ভাষা সমিতির সভাপতি ডক্টর আহমদ শরীফ এবং সাধারণ সম্পাদক মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে একটি বিবৃতি দেন : সম্প্রতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণসূত্রে এবং ধর্মের নিশানবরদার একটি মহল কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকা সূত্রে জানা যাচ্ছে যে, বাংলা ভাষার মুসলমানীকরণের জন্য নানা রকম উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জনসাধারণের অর্থে পরিচালিত ঢাকার ইসলামিক ফাউন্ডেশনও জনস্বার্থের পরিপন্থী এবং বাংলা ভাষা চর্চা ও বিকাশের প্রতিবন্ধক। এই ভাষার মুসলমানীকরণের প্রয়াসের বিরোধিতা করে এবং এর বিরুদ্ধে সক্রিয় সাংস্কৃতিক কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান হয়।

১১ মে : দৈনিক ইত্তেফাক : নাবালিকাদের পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করার সাথে বিভিন্নভাবে জড়িত সকলের বিরুদ্ধে জনপ্রতিনিধি নিয়ে গঠিত কমিটি দিয়ে তদন্ত এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার জন্য ড. আহমদ শরীফ ও লে. ক. (অব.) কাজী নুরুজ্জামান দাবি জানিয়েছেন। পতিতালয়ের সর্দারনীর মত সংশ্লিষ্ট পুলিশ, এফিডেভিটদাতা ও নাবালিকার ছবি তোলার জন্য পতিতালয়ে প্রবিষ্ট ফটোগ্রাফার—এরা সমান দায়ী।

২৭ জুন : খায়রুল বাসার রচিত সৈনিক উপন্যাসের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক আহমদ শরীফ। ঢাবি টিএসসি সেমিনার কক্ষে বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শওকত আলী, আবুল কাসেম ফজলুল হক, মহসীন শস্ত্রপাণি, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, মেসবাহ কামাল প্রমুখ। সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, ঔপন্যাসিক নিজেই সংগ্রামী ও বিপ্লববাদী। তার রচিত দুয়েকটি নাটক আমি দেখেছি। তিনি আসলে গণসংগ্রামী। গণমানুষের পক্ষ হয়ে তিনি শোষণ-নিপীড়নমুক্ত সমাজ গঠনের একজন সৈনিক।

৮ আগস্ট : সংবাদ : ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে ঢাবির উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র তিন দিনব্যাপী বক্তৃতামালার আয়োজন করে। ড. আহমদ শরীফ বক্তৃতায় বলেন, আজকের যান্ত্রিক যুগে পৃথিবীটা যথার্থই কলসীর মত ছোট। এখানকার যে কারো চিন্তা-চেতনায়-প্রজ্ঞায় বিশ্বমানবিক উত্তরাধিকার।

১৭ আগস্ট : গণসংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ম. নুরুন্নবীর সভাপতিত্বে গণসংস্কৃতি পরিষদ *বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ কাঠামো* শীর্ষক এক আলোচনাসভার আয়োজন করে। ড. আহমদ শরীফ এ আলোচনাসভায় বলেন, "আমরা এই দেশে প্রথম জেনারেশনের লোক। আমরা বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, আমলা সবাই কৃষক-পিতার উদ্বৃত্তের ফসল। শহরে এসে হলাম বুর্জোয়া। আমাদের কোনো ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি। তাই চারদিকে লুটপাট ছাড়া আর কিছুই চলছে না। আলোচনাসভায় অন্যান্যের মধ্যে বদরুদ্দীন উমর, গিয়াস কামাল চৌধুরী, শামসুজ্জামান মিলন, ড. আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

১৯ সেপ্টেম্বর : ড. আহমদ শরীফের মতে, নারীঘটিত অপরাধের উদ্ভব ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে কারণ নির্দেশ করা হয় তা নিতান্ত তরল চিন্তাপ্রসূত। এ অপরাধের সাথে জড়িত কারণগুলো নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, বিবাহপ্রথা চালু হবার পর থেকে সমাজের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়োজনে সভ্যজগতে ভাসমান যাযাবর মানুষের যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য পতিতালয়ের ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় বা রাজকীয় অনুমোদনে চালু ছিল। এর ফলে ব্যবহারিক জীবনে অন্যান্য ক্ষেত্রে মানুষের যৌনাচার কোনো উপদ্রব সৃষ্টি করেনি। বর্তমানে আমাদের দেশে এই প্রথাটা বিলোপ করার ফলে সর্বত্রই অপ্রতিরোধ্য যৌন প্রবৃত্তির উপদ্রব ছড়িয়ে পড়েছে। সমাজকাঠামোর পুরো পরিবর্তন না করে এই পুরনো কাঠামোর খিলান ভাঙ্গা উচিত হয়নি।

৯ অক্টোবর : কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ কেন্দ্রের আলোচনাসভায় তিনি বলেন, তিন ধরনের লুটেরার হাতে আজ আমরা বিভ্রান্ত ও বিপন্ন হয়ে পড়েছি। সমাজ পরিবর্তন করতে হলে আজ আমাদের স্বদেশী স্বজাতি ও স্ব-মানবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে।

উৎসর্গকৃত গ্রন্থ : পৃথিবী আমার ঘর, জে. এইচ. মোল্যা।

ভূমিকা লিখিত গ্রন্থ : প্রসঙ্গ বাঙলা ভাষা, নরেন বিশ্বাস; মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনীতি, কাজী নুরউজ্জামান; জ্ঞান সাগর, এস এম এ আলীম।

বক্তৃতা : উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণাকেন্দ্র বক্তৃতামালা, বিষয় : মধ্যযুগের বাঙলায় জীবন ও জগৎ-জিজ্ঞাসার রূপ স্বরূপ, ঢাবি, ৬ আগস্ট।

সংগঠন : সদস্য, মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, গঠিত ২২ আগস্ট।

গ্রন্থ : কালের দর্পণে স্বদেশ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, প্রচ্ছদ আবুল বারক আলভী, পৃষ্ঠা ১৩০, মূল্য লেখক কাগজ ২৭ টাকা, সাদা ৩৭ টাকা, মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা। **মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্য,** ৫ পৌষ ১৩৯২, ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৫, প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা কাইয়ুম চৌধুরী, পৃষ্ঠা ১১২, মূল্য ১৫ টাকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সাক্ষাৎকার : দৈনিক সংগ্রাম, ৯ ফেব্রুয়ারি; বিচিত্রা, ১৬ ফেব্রুয়ারি, হুমায়ুন আজাদ; স্বদেশ, ২৮ মার্চ; সাপ্তাহিক অর্থনীতি, ১৯ সেপ্টেম্বর।

১৯৮৬

চবি বাংলা বিভাগে কাজী নজরুল ইসলাম অধ্যাপক পদের মেয়াদ শেষ।

৬ ফেব্রুয়ারি : ড. আহমদ শরীফ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ কেন্দ্র আয়োজিত *বিরাষ্ট্রীয়করণ কার স্বার্থে* শীর্ষক সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন, ১৫ দল ও ৭ দল জনগণকে বাঁদর নাচ নাচাচ্ছে। জামায়াতকে ঘৃণা করার কথা। কিন্তু ১৫ দল ও ৭ দল জামায়াতের সঙ্গে আপোস করে এক সঙ্গে মিটিং করেছে। এটা লজ্জার কথা। কারণ জামায়াত স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি। এ শক্তিকে ঘৃণা করা উচিত।

১ জানুয়ারি : গুলিস্তান চত্বরে তিনি এক বিবৃতিতে কম্যুনিস্ট লীগ নেতা জনাব আবদুল মতিনের ৫ দফার ভিত্তিতে ১৫ দল ও ৭ দলের সমন্বয়ে একটি বৃহত্তর ঐক্য ফ্রন্ট গড়ে তোলার আহ্বানকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, দেশ কালের প্রয়োজনে এই মুহূর্তে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর সময়োচিত আহ্বান ও প্রস্তাব আর কিছুই হতে পারে না।

২ জানুয়ারি : জিপিও গেটে শামসুজ্জামান খান মিলনের সভাপতিত্বে সিরাজ শিকদারের ১১তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষে শহীদ বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিক স্মৃতি সংসদ এক আলোচনাসভায় তিনি বলেন, আমরা শোষক, মোনাফেক, বেঈমান পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছি। এ শয়তানকে চিনতে হবে। তিনি বলেন, শোষক, ঠক, বেঈমানরা মন্ত্রী হয়। আর আমাদের ফেলে রেখে যায় রাস্তায়। আমরা গুলি খাই, নির্যাতন সহ্য করি। আর একেই সম্পদ করে তারা পদ দখল করে।

১৭ জানুয়ারি : জনাব সিরাজুল আলম খান ও জনাব জিল্লুর রহমান খান প্রণীত *সংবিধান ও সাংবিধানিক রূপরেখা* নামক গ্রন্থের প্রকাশনা উপলক্ষে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকাশিত বইয়ের সমালোচনা করে তিনি বলেন, এই বইয়ের মাধ্যমে লেখকদ্বয় আমাদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে দীক্ষিত করতে চাচ্ছেন।

৩১ জানুয়ারি : সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি শামসুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে *শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস রোধ ও শিক্ষার পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা* শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ড. আহমদ শরীফ এ সেমিনারে বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো আদর্শের রাজনীতি করলে শিক্ষাঙ্গনসহ সর্বত্র মারামারি বন্ধ হবে। বিবেক বুদ্ধি সচেতনতা নিয়ে ছাত্ররা রাজনীতি করবে, এ জন্যে মারামারি করার দরকার হয় না।

২ মার্চ : চবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. মইনুল ইসলামের সভাপতিত্বে *বাংলাদেশের সামরিক শাসনের স্বরূপ : একুশ ও একাত্তরের চেতনার আলোকে শীর্ষক* এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এ সেমিনারে ড. আহমদ শরীফ বলেন, মাটি ও মানুষের প্রতি যাদের মমতা নেই, দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার কোনো অধিকার তাদের নেই। আন্দোলনে যিনি নিজে এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকি নেবেন তিনিই প্রকৃত

নেতা এবং সেই নেতার ডাকেই মানুষ রাস্তায় নামবে।

৬ মার্চ : ড. মনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে চট্টগ্রাম প্রেসকাবে চট্টগ্রাম সংস্কৃতি পরিষদ এক সংবর্ধনা ও পদক বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। চবির উপাচার্য প্রফেসর মোহাম্মদ আলী ড. আহমদ শরীফকে চট্টগ্রাম সংস্কৃতি পরিষদ পদক '৮৬ প্রদান করেন। এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ড. শরীফ বলেন, মরিয়া হয়ে মরার সাহস নিয়ে রাস্তায় নামলেই জাতি স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি পাবে, নতুবা নয়। তিনি বলেন, জাতির ক্রান্তিকালের বড় দুর্বলতা হচ্ছে চরিত্রের অভাব, সত্য কথা নির্ভয়ে বলার সাহসী নেতৃত্বের অভাব। তাই ২৩ দল দীর্ঘদিন ধরে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে কিন্তু দেশে এ শাসন বহাল আছে।

৬ মার্চ : ঢাকা থিয়েটার আয়োজিত গ্রাম থিয়েটারের দু'দিন ব্যাপী প্রথম জাতীয় সম্মেলন ও পনের দিনব্যাপী জাতীয় নাট্যমেলা '৮৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেন, বর্তমান সমাজের মানুষ সময়ের সাথে সমকালিনতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং হাজার বছরের প্রাচীন মানসিকতাকে আমরা ধারণ করে এখনও মধ্য যুগেই অবস্থান করছি। তিনি গ্রাম-থিয়েটারের প্রথম জাতীয় সম্মেলন ও জাতীয় নাট্যমেলা '৮৬ এর সাফল্য কামনা করেন। অন্যান্যের মধ্যে রামেন্দু মজুমদার, আতাউর রহমান, নাসির উদ্দিন ইউসুফ, সেলিম আল দীন ও মাহবুব হোসেন খান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

২ জুন : বাংলা একাডেমীতে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ আলোচনাসভায় ড. আহমদ শরীফ বুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, একজন, দু'জন নয়, আমরা সকল বুদ্ধিজীবীরাই চরিত্রহীন, কাপুরুষ। আমরা সত্যকে সত্য বলতে এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলতে ভয় পাই। আমরা মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে বলার মধ্যে যেন বেশি আনন্দ পাই।

২৭ জুন : বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা পিযুষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে জাতীয় যুবসম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ড. আহমদ শরীফ প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। তিনি বলেন, গত ৩৮ বছর ধরে যারা ক্ষমতায় আছেন তারা কেউ দেশ প্রেমিক নন, এরা জুলুম প্রবণ এবং বিবেক বুদ্ধিহীন। তিনি বলেন, এদের কারণেই আমাদের সমাজে যত অনাসৃষ্টি। গত সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে বলেন, এই নির্বাচনে গণতন্ত্রের নামে শুভাতন্ত্র ও মস্তানতন্ত্র কায়েম করা হয়েছে।

২৫ জুলাই : সাপ্তাহিক বিচিত্রা : স্বাধীনতা স্মারক পুরস্কার সম্পর্কে অভিযোগ করে বলেন যে, ওদের কোনো অধিকার নেই এই পুরস্কার এভাবে দেওয়ার। এই অভিযোগ করে মুক্তিযোদ্ধা চেতনা বিকাশ কেন্দ্রের উপদেষ্টা ড. আহমদ শরীফ এবং সভাপতি লে. কর্নেল (অব) কাজী নুরউজ্জামান।

২৮ নভেম্বর : শিল্পকলা একাডেমীতে চট্টগ্রাম গ্রুপ থিয়েটার সমন্বয় পরিষদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ড. আহমদ শরীফ প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। তিনি গণমানুষের মুক্তির লক্ষ্যে জনগণকে জাগিয়ে তোলার উদ্দেশে সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু করার জন্য দেশের তরুণ সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

উৎসর্গকৃত গ্রন্থ : কেরামত মঙ্গল, সেলিম আল দীন; শুন হে লখিন্দর, শওকত আলী;

মাঘ নিশীতের কোকিল, আজাহার উদ্দিন খান; বাজ, আবুল হাসনাত।

ভূমিকা লিখিত গ্রন্থ : এই যুগের কিংবদন্তী, তিতাশ চৌধুরী।

বক্তৃতা : চবিতে কাজী নজরুল ইসলাম অধ্যাপক হিসেবে প্রদত্ত ৬টি বক্তৃতা, বিষয়:

ক. নজরুল ইসলাম : কবির মনোজগত
খ. পাঠক সমালোচকের চোখে নজরুল সাহিত্য
গ. কাজী নজরুল ইসলামের রাজনৈতিক মতাদর্শ
ঘ. নজরুল ইসলামের কবিস্বভাব : শক্তি পূজা
ঙ. নজরুলের কবিস্বভাব : প্রেমতৃষ্ণা
চ. নজরুলের কবিভাষা : পুরাণ ও প্রকৃতি।

বক্তৃতা : বাংলাদেশ লেখক ইউনিয়ন বক্তৃতা, বিষয় : বাঙলা সাহিত্যে প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার ধারা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।

সংবর্ধনা : ৫ মার্চ, চট্টগ্রাম সংস্কৃতি পরিষদ পদক প্রদান ও সংবর্ধনা।

গ্রন্থ : বাঙলা ভাষা সংস্কার আন্দোলন, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, প্রচ্ছদ উৎপল দত্ত, পৃষ্ঠা ৮৪, মূল্য ২০ টাকা, বাঙলাদেশ ভাষা সমিতি, ঢাকা।

ইদানীং আমরা, ২৫ বৈশাখ ১৩৯৩, ৯ মে ১৯৮৬; প্রচ্ছদ আবুল বারক আলভী, পৃষ্ঠা ১৫৪, মূল্য সাদা ৪৫ টাকা, লেখক কাগজ ৩৪ টাকা, মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা।

বাঙলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ও আনিসুজ্জামান সহযোগে, জুন ১৯৮৮, প্রচ্ছদ উৎপল দাস, পৃষ্ঠা ১০৬, মূল্য ৪০ টাকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সাক্ষাৎকার : নিপুণ, জানুয়ারি, আহমেদ মুসা; মশাল, ৭ মার্চ; দৈনিক পূর্বদেশ, ১১ মার্চ।

১৯৮৭

৩১ জানুয়ারি : লোকায়ত পাঠকেন্দ্র : *বাংলাদেশে নেতৃত্বের সমস্যা* বিষয়ে ঢাবি পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন আফজালুল বাসার। ড. আহমদ শরীফ তাঁর বক্তৃতায় বলেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে আত্মপ্রেমের তুলনায় দেশপ্রেম নিতান্তই নগণ্য। তাই প্রধান প্রধান দলগুলোতে নেতৃত্ব দখলের কৌশলকেই রাজনীতি মনে করা হয়। তিনি বলেন মানুষের প্রতি যে ভালবাসা মহান তাদের বৈশিষ্ট্য, বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে তা আজকাল প্রায় দেখাই যায় না। সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে অধ্যাপক আসহাব উদ্দীন, ডক্টর হারুন-অর রশীদ, সরদার ফজলুল করিম, সৈয়দ আবুল মকসুদ ও জনাব ফেরদৌস হাসান বক্তৃতা করেন। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক।

৪ মার্চ : বিচিত্রা : ড. সাঈদ-উর-রহমান, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ড. আহমদ শরীফ, খান সারোয়ার মুর্শেদের বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য রাখায় ড. সাঈদ-উর-রহমান পাদপ্রদীপের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৫০০, ৫০১ ও ৫০২ ধারার মামলা দায়ের করেন।

৮ মে : বিচিত্রা : ১৯৮৭ সালের মে মাসে রমজানে সকল হোটেল বন্ধ রাখার ঘোষণার প্রতিবাদে শেখ হাসিনাসহ ২৯ জন বুদ্ধিজীবী এক যৌথ বিবৃতি দেন। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ড. আহমদ শরীফও ছিলেন।

২০ জুলাই : বক্তৃতা : ঢাবির দর্শন বিভাগ সংলগ্ন ২০২৮ নম্বর কক্ষে দর্শন বিভাগের অধ্যাপক নীরুকুমার চাকমার সভাপতিত্বে জি.সি. দেব বক্তৃতামালা '৮৭ অনুষ্ঠিত হয়। এ বক্তৃতামালায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. আহমদ শরীফ মানবতা ও গণমুক্তি শীর্ষক এক বক্তৃতা প্রদান করেন।

27 August : The Bangladesh Observer : Intellectuals for withdrawal of ban on Banglar Bani. Forty-two intellectuals along with Dr. Ahmed Sharif demanded the withdrawal of the government order banning the Publication of Banglar Bani.

8 November : One hundred intellectuals, lawyers and journalists along with Dr. Ahmed Sharif protested the government decision to lease out Haripur Oil Field to semeter, a Canadian Company, for extraction of oil.

৬ নভেম্বর : জাতীয় সংহতি ও বিপ্লব দিবসের দ্বাদশ বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভায় ড. আহমদ শরীফ দেশ ও জনগণের স্বার্থে বিরোধীদল আহূত দশই নভেম্বরের কর্মসূচীকে সফল করে তুলতে অংশ নেয়ার আহ্বান জানান।

৮ নভেম্বর : ড. আহমদ শরীফের কাছে ঢাকা অবরোধের মাধ্যমে সরকারের পতন হবে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, জনগণ যখন কোনো সরকারকে অপছন্দ করে সেই সরকারের টিকে থাকা সম্ভব নয়। জনগণ–বিচ্ছিন্নভাবে কিছুই করতে পারে না। তার জন্য নেতৃত্ব প্রয়োজন। বর্তমানে যে নেতৃত্বের মাধ্যমে আন্দোলন হচ্ছে, সে নেতৃত্বের যোগ্যতার ওপর নির্ভর করছে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই সরকারকে উৎখাত করতে এগিয়ে আসবে কি না। যদি এগিয়ে আসে তাহলে সরকারের সাধ্য নেই টিকে থাকবে। পৃথিবীর কোনো দেশেই জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো সরকার শাসন ক্ষমতা চালাতে পারে না।

উৎসর্গকৃত গ্রন্থ : একদিন দাবানল, মনোরঞ্জন বিশ্বাস; ধার, আসহাব উদ্দিন আহমদ।

ভূমিকা লিখিত গ্রন্থ : নির্বাচনী বিনিপাত ও একত্রিশজন বুদ্ধিজীবী, করিম আবদুল্লাহ।

গ্রন্থ : এবং আরো ইত্যাদি, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭, ফাল্গুন ১৩৯৩, প্রচ্ছদ খালিদ আহসান, পৃষ্ঠা ১৬১, মূল্য ৫৫ টাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা।

বাঙালীর চিন্তা-চেতনার বিবর্তনধারা, ফাল্গুন ১৩৯৩, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭, প্রচ্ছদ সমর মজুমদার, পৃষ্ঠা ১৯৩, মূল্য সাদা ৮০ টাকা, লেখক কাগজ ৫৫ টাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, রেড ক্রিসেন্ট বিল্ডিং, ১১৪ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, জীবনী গ্রন্থমালা, ২২ মাঘ ১৩৯৩, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭, প্রচ্ছদ সমর মজুমদার, পৃষ্ঠা ৬৮, মূল্য ১৫ টাকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সম্পাদনা : একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায় কাজী নুরউজ্জামান ও শাহরিয়ার কবির সহযোগে, ১৯৮৭, দ্বি. মু. ১৯৮৭, তৃ. মু. ১৯৮৮, চ. মু. ১৯৮৯, প. মু. ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃষ্ঠা ১৯৪ মূল্য ৪০ টাকা, মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ঢাকা।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য; প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, ১৯৮৭, প্রচ্ছদ কাজী হাসান হাবিব, পৃষ্ঠা ৫০৮, মূল্য দুই শত টাকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

Genocide '71 [An account of the killers and collaborators] with Kazi NurUzzaman Dr Serajul Islam Chowdhury, Sharier Kabir, 1987, Mukti Juddhao Chetona Bikash Kendra, Dhaka, Page 256, Price 300.00, Cover Masuk Helal.

সাক্ষাৎকার : বিচিত্রা, ২০ ফেব্রুয়ারি; বিচিন্তা, ৮ নভেম্বর, আসিফ নজরুল ও আমিনুর রশীদ।

১৯৮৮

১ জানুয়ারি : নুরুল ইসলাম মনির সভাপতিত্বে সিরাজ শিকদারের ত্রয়োদশ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রে জাতীয় বিপ্লবী দল (প্রস্তাবিত) এক আলোচনাসভার আয়োজন করে। ড. আহমদ শরীফ এতে প্রধান অতিথি হিসাবে বলেন, সমাজ পরিবর্তনের জন্য সিরাজ শিকদারের পথই আজ সঠিক বলে প্রমাণিত। সিরাজ শিকদারকে মাটি ও মানুষের কাছাকাছি প্রকৃত নেতা হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, তিনি সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টা করে নিহত হয়েছেন।

১৯ জানুয়ারি : দেশপ্রেমিক স্মৃতি সংসদের আসাদ দিবস উপলক্ষে এক আলোচনাসভায় ড. আহমদ শরীফ বলেন, চলমান আন্দোলনে আসাদের মত সাহসী ও উদ্যমী তরুণের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলোর অনৈক্যের কারণেই সরকার এখনও টিকে আছে। দেশপ্রেমিক ও প্রগতিশীল শক্তির ঐক্য প্রয়োজন।

১৯ ফেব্রুয়ারি : ঋষিজের উদ্যোগে আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে ভাষা সৈনিক আবদুল মতিন ও গাজীউল হককে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এ সম্বর্ধনাসভায় তিনি সভাপতির ভাষণে বলেন, স্বাধীনতার এত বছর পরেও কোনো সরকার এই ভাষা সৈনিকদের সম্বর্ধনা দেয়নি। সেটা আমাদের লজ্জার ইতিহাস। ঋষিজ দুই ভাষা সৈনিককে জনগণের সামনে সম্বর্ধিত করে আমাদের সে লজ্জা ঘুচিয়েছে। আমরা ঋষিজের কাছে কৃতজ্ঞ।

২১ ফেব্রুয়ারি : দৈনিক সংগ্রাম : ড. আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে শহীদ দিবস উপলক্ষে বাংলা একাডেমীতে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সভাপতি তার বক্তৃতায় বলেন, আপনারা মনে করবেন না যে নামাজ-রোজায় মুক্তি পাওয়া যাবে। তা না করে আমাদের হতে হবে সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী। আমি স্বভাব দোষে নামাজ রোজা করি না। এ ব্যাপারে অন্যের কিছু বলার অধিকার নেই।

১৮ মার্চ : শামসুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির মিলনায়তনে পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ড. আহমদ শরীফ বলেন, আজ পেশাজীবীরা দাসে পরিণত হয়েছে। সমাজতন্ত্র ঠেকানোর উদ্দেশ্যে ধর্মকে টেনে আনা হয়েছে।

২৫ মার্চ : ড. আহমদ শরীফসহ ১০০ জন বুদ্ধিজীবী এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেন। তারা সকলেই রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তারা বলেন, ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণা করার এই অশুভ প্রয়াস জাতির জন্য মঙ্গলতো আনবেই না বরং বিরাজমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মতাদর্শগত ভারসাম্য তছনছ করে দেবে।

২৫ মার্চ : শামীম শিকদার নির্মিত 'স্বোপার্জিত স্বাধীনতা' শীর্ষক ভাস্কর্যের উন্মোচন করা হয়। জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক এই ভাস্কর্যের উন্মোচন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ড. আহমদ শরীফ বলেন, স্বাধীনতার ১৭ বৎসরের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের শত্রুরা

জাঁকিয়ে বসেছে। দেশ আজ রাজাকারের দখলে। এমনি মুহূর্তে শিল্পী শামীম শিকদার তাঁর ভাস্কর্যের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘটনাকে প্রস্তরীভূত করে চিরদিনের জন্যে জীবন্ত করে রাখলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমেদ, ভিসি (ঢাবি), আবদুল মান্নান, শামীম শিকদার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

৯ এপ্রিল : শেখ সালাহউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে ঢাকা জেলা ক্রীড়া মিলনায়তনে ছাত্রদল দু'দিনব্যাপী সম্মেলন আয়োজন করে। ড. আহমদ শরীফ এ সম্মেলনে বলেন, এ সরকার ধর্মের নামে মানুষের অকল্যাণ করছে।

১২ এপ্রিল : বদরুদ্দীন উমরের সভাপতিত্বে ঢাবি ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনে বাংলাদেশ লেখক শিবির এক সেমিনারের আয়োজন করে। ড. আহমদ শরীফ এ সেমিনারে বলেন, ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণা মানতে রাজি আছি কিন্তু এরশাদ সরকারকে কথা দিতে হবে যে, ধর্মকে এভাবে আনলে জনগণের অন্ন বস্ত্র বাসস্থান নিরাপত্তা শিক্ষা চিকিৎসার কোনো সমস্যা থাকবে না। তিনি জনবিচ্ছিন্ন সরকারের সকল ভাঁওতাবাজির চির অবসান ঘটানোর জন্য সকল প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান।

১৬ এপ্রিল : শিরীন হকের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নারীপক্ষ এক সমাবেশের আয়োজন করে। সভায় ড. আহমদ শরীফ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণার মাধ্যমে মানুষের সর্বপ্রকার মানবিক অধিকার হরণের প্রচেষ্টা চলছে।

3 June : The New Nation : 300-man citizens committee to resist state relegion bill/Du teachers bring out procession. 300-man citizens committee was formed to protest the state religion bill. Dr. Ahmad Sharif was one of them.

১৫ জুলাই : বাংলাদেশ উপন্যাস পরিষদের সভাপতি জনাব আবুল কাসেম ফজলুল হকের সভাপতিত্বে ঢাবি ভাষা ইনস্টিটিউটে বঙ্কিমচন্দ্রের দেড়শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। আলোচনাসভায় আলোচনা করেন ড. আনিসুজ্জামান, ড. আমিনুল ইসলাম, ড. হাসনা বেগম, জনাব বশির আলহেলাল। অধ্যাপক শরীফ তাঁর ভাষণে বলেন, বঙ্কিম মুসলিম বিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি শাসক মুসলমান এবং শাসক ইংরেজবিরোধী ছিলেন। উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ চারজন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিম-বিদ্যাসাগরের চাইতে রবীন্দ্রনাথ অনেক বেশি সাম্প্রদায়িক, কেবল নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরই তিনি হিন্দু ধর্ম থেকে মানবধর্মে উত্তীর্ণ হন। এই আলোচনা অনুষ্ঠানের বিভিন্ন বক্তার বক্তব্য নিয়ে পরে ব্যাপক বিতর্ক হয়। বিতর্কে আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিলেন অধ্যাপক শরীফ।

২১ জুলাই : তাহের সংসদের সভাপতি ফয়েজ আহমদের সভাপতিত্বে টিএসসি সড়কদ্বীপে তাহেরের দ্বাদশ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। এতে ড. শরীফ তাঁর বক্তৃতায় বলেন, বিরোধী দলের আন্দোলন শহুরে বক্তৃতা ও কাগুজে বিবৃতিতে সীমাবদ্ধ। গত ৫ বছরের আন্দোলন উপজেলা পর্যন্ত পৌঁছেনি, গ্রাম পর্যায়তো দূরের কথা।

২২ আগস্ট : প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজি ভাষা বাধ্যতামূলক ভাবে সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে ড. আহমদ শরীফ বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, গ্রামগঞ্জের শতকরা ৯৮ জন মা-বাবা নিরক্ষর এবং ক্বচিৎ কেউ স্বাক্ষর মাত্র। তাদের পক্ষে সন্তানকে ইংরেজিতে পড়ানো সম্ভব হবে না। ফলে তারা স্কুল ছাড়তে বাধ্য হবে।

১২ অক্টোবর : টিএসসিতে জাতীয় গণতান্ত্রিক সংহতি ফ্রন্ট আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় ড. আহমদ শরীফ বলেন, দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে রক্ত দিতে হবে। আঘাত পেতে হবে মারবার জন্য। তিনি আরও বলেন, বুর্জোয়া রাজনীতি আজ ব্যর্থ। কৃষক অভ্যুত্থানে সাফল্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা চাই ইতিহাসের প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। ক্ষমতাসীন শ্রেণীর ক্ষমতাচ্যুত করা কেবল বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই সম্ভব।

২ ডিসেম্বর : হেমাঙ্গ বিশ্বাসের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে উন্মেষ সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদ-এর উদ্যোগে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। টিএসসি সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত এ স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন ড. আহমদ শরীফ। তিনি বলেন, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান গণমানুষের মুক্তিসংগ্রামের গান। তিনি মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষার গান রচনা করেছেন এবং গণমানুষের পক্ষেই গান গেয়েছেন।

উৎসর্গকৃত গ্রন্থ : শ্রেষ্ঠ গল্প, হুমায়ূন আহমেদ।

ভূমিকা লিখিত গ্রন্থ : সুখের ঠিকানা, আমিনা মাহমুদ।

সংবর্ধনা : ২৪ ফেব্রুয়ারি : ঢাবির উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে টিএসসি সেমিনার কক্ষে ড. আহমদ শরীফের সম্মানে এক সংবর্ধনাসভার আয়োজন করা হয়। সম্বর্ধনাসভায় ড. আহমদ শরীফ বলেন, আমি সেই দিনের অপেক্ষা করে থাকব যেই দিন একটি মানুষও কোনো মানুষের দাস হবে না। মানুষ যেন সকল রকম দহন, পীড়ন, দমন, মালিন্যের মধ্যেও আপন মহিমাময় অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে শেষ দিন পর্যন্ত জাগ্রত থাকে। এই দেশ এই মাটিতে এই রাষ্ট্রে স্বাধীনতা তার নিসংশয় সর্বশেষ সত্য মূল্য ফিরে পাবে এটাই আমার শেষ প্রত্যাশা। সভায় অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক আসহাব উদ্দীন, কে.এম. সাদউদ্দীন, ড. হুমায়ুন আজাদ, এমাজউদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক সফিউদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক আবদুল্লা ফারুক, অধ্যাপক মমতাজুর রহমান তরফদার, অধ্যাপক কর্নেল (অব) কাজী নুরউজ্জামান, অধ্যাপক শওকত আলী, অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, গাজীউল হক, যতীন সরকার, মামুনুর রশীদ, আফজালুল বাসার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সভায় পাঠকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি নিম্নে উদ্ধৃত হল। এটি রচনা করেন অধ্যাপক আবু হেনা মোস্তফা কামাল।

ডক্টর আহমদ শরীফের সংবর্ধনা উপলক্ষে
শ্রদ্ধাঞ্জলি

দুঃসময়ের মানুষ আমরা; বৃহৎ ও মহৎ বেশি কিছু আমরা দেখিনি।
আপনার কাছে আমরা ঋণী, কেননা আপনি আমাদের স্বপ্নে দিয়েছেন
নতুন বিস্তার এবং দুঃসাহসী মাত্রা।

আপনার পাণ্ডিত্যে আমরা অভিভূত এবং দ্রোহে উচ্চকিত।
আমরা গর্বিত যে আপনার সমকালে আমরাও সংলগ্ন।
আপনি আমাদের মধ্যে এখনো উজ্জ্বল সূর্যের মতো দেদীপ্যমান,
এই সুখ ও আনন্দ তুলনারহিত।
আপনি আমাদের কাছে প্রগতি ও প্রজ্ঞার প্রতীক।
সমাজ-সংস্কৃতি ও ইতিহাসের চর্চায় গতানুগতিক সমর্থক
আপনি কখনো ছিলেন না। অন্ধ-বিশ্বাস ও সংস্কারের অচলায়তন
আপনি ভেঙেছেন অবলীলায়—আপনার কাছে আমাদের প্রজন্মের ঋণ
তাই অপরিশোধ্য। অপরীক্ষিত প্রথাকে আপনি গ্রহণ করেন নি,
আমাদের দিয়েছেন সত্যসন্ধ ও যুক্তিনিষ্ঠ হবার প্রেরণা।

গত দু'দশক ধরে
আমাদের মনোজগতে যে-রূপান্তর ঘটেছে
তার মর্মমূলে আছে আপনার মনন ও মেধার অভিঘাত।

আমরা জানি,
উত্তরকালের কাছে আরো গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানে
আপনি গৃহীত হবেন।
এবং জাতির অবিস্মরণীয় মনীষীদের অন্যতম বলে গণ্য হবেন।

আপনার কর্মময় সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি।

আপনার অনুরাগিবৃন্দ
১১ ফাল্গুন ১৩৯৪/২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮
ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

২৩ আগস্ট : (উন্মেষ সেপ্টেম্বর সংখ্যা) : গার্লস গাইড মিলনায়তনে খায়রুল বাসার নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'সড়ক'-এর উদ্বোধনী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. আহমদ শরীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন চলচ্চিত্রকার আলমগীর কবীর, অধ্যাপক মমতাজ উদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল

হক, মহসীন শস্ত্রপাণি প্রমুখ। সভাপতি বলেন, চলচ্চিত্রটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে উচ্চকিত প্রতিবাদ। সমাজের অসঙ্গতির বিরুদ্ধে, মিথ্যা প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে ক্রোধ। তিনি এই চলচ্চিত্র প্রয়াসের উচ্ছসিত প্রশংসা করে এমন একটি জীবনঘনিষ্ঠ ও প্রতিবাদী চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য খায়রুল বাসারকে ধন্যবাদ জানান।

সম্পাদনা : বাউল কবি ফুলবাস উদ্দীন ও নসরুদ্দীনের পদাবলী, আষাঢ় ১৩৯৫, জুন ১৯৮৮, প্রচ্ছদ আবদুল রোউফ সরকার, পৃষ্ঠা ২৪৩, মূল্য আশি টাকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সাক্ষাৎকার : আনন্দপত্র, ১২ মার্চ, ইনামুল হক ইনু; আগামী, ১৩ মে, ইয়াহিয়া মির্জা; রোববার, ২২ মে, আলিমুজ্জামান; ঢাকা কুরিয়ার, ২৭ মে, আর. বখতিয়ার; ফসল, ১৬ ডিসেম্বর, মোজাম্মেল হক খোকন।

১৯৮৯

৩ জানুয়ারি : শহীদ সিরাজ শিকদারের ১৪তম মৃত্যুবার্ষিকীতে শহীদ দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী স্মৃতি সংসদ আয়োজিত আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয় টিএসসি সড়কদ্বীপে। ড. আহমদ শরীফ বলেন, দীর্ঘ ১৪ বছর পর সিরাজ শিকদারকে স্মরণ করার অর্থ হচ্ছে মেহনতী মানুষের মুক্তি সংগ্রামে নতুন করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া।

৬ জানুয়ারি :বাংলাদেশ ভাষা সমিতির সভাপতি ড. আহমদ শরীফ এক বিবৃতিতে প্রথম শ্রেণি থেকে ইংরেজি ভাষা প্রচলনের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে এ সরকারি ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

২ ফেব্রুয়ারি : ঢাবি টিএসসির মোড়ে দুই দিনব্যাপী জাতীয় কবিতা উৎসবের দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে বর্তমান শাসকদের কথা উল্লেখ করে বলেন, আমাদের মুসলমান বানিয়ে বেহেশতে পাঠানোর অধিকার তাদের কে দিয়েছে? তিনি বলেন, আমাদের উচিত ছিল প্রতিবাদ নয়, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম প্রতিরোধ করা।

সংবর্ধনা : ৬ ফেব্রুয়ারি : মুক্তধারা কর্তৃক প্রদত্ত সংবর্ধনা, ৬ ফেব্রুয়ারি। সংবর্ধনার জবাবে তিনি বলেন, বিবেকের তাড়নায় দেশ ও রাষ্ট্রের সঙ্কট কোথায় তা আমি তুলে ধরে চলেছি। মানুষ যদি যুক্তি ও জ্ঞান দিয়ে চলে তবে আমি বিশ্বাস করি যে সহিষ্ণুতা দ্বারা দেশ ও সমাজের উন্নতি সাধন করতে পারে। শিশু একাডেমীর জিয়াউর রহমান মিলনায়তনে মুক্তধারার সপ্তাহব্যাপী মেলার সমাপ্তি দিবসে মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার গ্রহণকালে তিনি এ কথা বলেন। তিনি আরো বলেন : প্রকাশ্যে বলছি, আমি নাস্তিক। নাস্তিক বলেই আস্তিকদের চেয়ে বেশি পাপ করিনি।

৮ ফেব্রুয়ারি : অমর একুশে উপলক্ষে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের ১৪ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে তিনি মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অবতীর্ণ হবার জন্য সচেতন মনের গোষ্ঠীর প্রতি আহ্বান জানান।

সংবর্ধনা : ১৯ ফেব্রুয়ারি : ঋষিজ শিল্পী গোষ্ঠী পদক প্রদান ও সংবর্ধনা। প্রফেসর আহমদ শরীফকে একজন প্রতিবাদী কণ্ঠ ও জাতির অভিভাবক হিসেবে উল্লেখ করে ড. আনিসুজ্জামান বলেছেন, ড. শরীফ চলমান সঙ্কট সম্পর্কে জাতিকে সচেতন ও সতর্ক করেন। রমনার বটমুলে ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠী আয়োজিত অমর একুশে স্মরণে ড. আহমদ শরীফ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। ড. আনিসুজ্জামান

বলেন, ধর্মান্ধতা ও মৌলবাদ যে সময় আমাদের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করছে, ঠিক সে মুহূর্তেই ড. শরীফ উদ্যোগ নিয়ে জাতিকে প্রতিবাদী করে তোলেন।

২৯ মার্চ : অ্যাডভোকেট জনাব মিজানুর রহমান ভুঁইঞা জনাব আবুবকর সিদ্দিক চৌধুরীর নির্দেশক্রমে তার পক্ষে ড. আহমদ শরীফের নিকট ২১ মার্চ লিগ্যাল নোটিশ পাঠিয়েছেন। কারণ ১৯ মার্চ শামিম শিকদারের *অমর একুশের* ভাস্কর্য উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ড. আহমদ শরীফ বলেছিলেন, বাঙালি জাতীয়তাকে ধুয়ে মুছে ফেলার চক্রান্ত চলছে। দেশ আজ ইসলামী কুয়াশায় আচ্ছন্ন। যেদিন ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা হয়েছিল সেদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উচিত ছিল। দেশে যতই দারিদ্র নেমে আসছে ততই আমাদেরকে ইসলামি বড়ি খাওয়ানো হচ্ছে।

১৭ এপ্রিল : অধ্যাপক আহমদ শরীফ গত ৩০ মার্চ শিল্পী ফকির আলমগীরের গীত একটি গান টিভিতে প্রচারিত না হওয়ায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, এ শুধু ব্যক্তিবিশেষের অধিকার হরণই নয় বরং নাগরিকের স্বাধীন চিন্তা প্রকাশের মৌল মানবিক অধিকারের উপর সরকারের সরাসরি হামলা।

২৭ মে : সংবাদ : অধ্যাপক আহমদ শরীফ বলেছেন, চীন ও রাশিয়ায় প্রতিবিপ্লবীরা ক্ষমতা দখল করেছে বলে হতাশ হবার কিছুই নেই। এ দুদেশের বিপ্লবীরা সব ঠিক করে নেবে। তারই লক্ষণ এখন দেখা যাচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। মহান মে দিবস ও বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলনের ৫ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত এক আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এ কথা বলেন।

৮ জুলাই : ড. আহমদ শরীফ বলেন, স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িক জামাত-শিবিরকে পরাস্ত করতে আজ কেবল প্রতিবাদ নয়, প্রতিরোধ করতে হবে। প্রতিরোধের জন্য গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়া জাতিকে সাহসী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে সাহসী ব্যক্তি ও লেখকদের ভূমিকা আজ অগ্রগামী হওয়া দরকার। গণসংস্কৃতি পরিষদ আয়োজিত *লেখকদের অধিকার ও অঙ্গীকার* শীর্ষক আলোচনাসভায় তিনি এ কথা বলেন।

১০ জুলাই : সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশের বক্তৃতায় ড. আহমদ শরীফ বলেন, যে মৌলবাদী ধর্মব্যবসায়ীরা ১৯৭২ সালে পালিয়ে বেড়াত তারা এখন প্রবল পরাক্রমশালী। তাদের প্রতি উদাসীনতা দেখানোর কারণেই এরকম ঘটেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, বুদ্ধির জগতে বিরাট বাধা ওই গোষ্ঠীকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিরোধ করতে হবে।

২১ জুলাই : ড. আহমদ শরীফ বলেছেন, কর্নেল তাহেরের কোনো অপরাধের জন্য জিয়াউর রহমান সুকৌশলে বিচারের নামে হত্যা করার মতো এমন কৃতঘ্ন হলেন, তা আজো ঐতিহাসিক তথ্যে প্রমাণ জানা যায়নি। কর্নেল তাহের স্মারক বৃক্তৃতায় *বাংলার বিপ্লবী পটভূমি* শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন।

৯ আগস্ট : অধ্যাপক আহসাব উদ্দিন আহমদের ৭৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিকালে টিএসটিতে সংবর্ধনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংবর্ধনা পরিষদের আহ্বায়ক ড. আহমদ শরীফ। তিনি বলেন, মানুষের সেবক হিসেবে অধ্যাপক আসহাব উদ্দিন নির্যাতিত মানুষের বন্ধু ছিলেন। তিনি তাঁর রাজনীতি ও লেখনির মাধ্যমে সমাজের নির্যাতিত মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

২৯ আগস্ট : তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, ইরাক কুয়েত আক্রমণ করে অন্যায় করেছে, কুয়েতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পূর্বাহ্নে সচেষ্ট না হয়ে যুক্তরাষ্ট্র এখন অনাহূতভাবে সৌদী আরবে সৈন্য মোতায়েন করেছে। এই অনধিকার চর্চাকে বিশ্ববাসীর কেবল নিন্দাই নয়, প্রতিহত করাও উচিত।

৯ নভেম্বর : বাংলাদেশ ভাষা সমিতির সভাপতি ড. আহমদ শরীফ ৪ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, বাবরী মসজিদ সংক্রান্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় আগেও টাঙ্গাইলে, শ্রীমঙ্গলে ও খুলনায় মন্দির ভাঙ্গা হয়েছে।

২৬ ডিসেম্বর : এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, সকল দেশপ্রেমিকের এখন একটিই দাবি হওয়া উচিত আর তা হচ্ছে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাচন।

২৭ ডিসেম্বর : বাংলাদেশ ভাষা সমিতির সভাপতি হিসেবে তিনি বলেন, সকল দেশপ্রেমিকের এখন একটিই দাবি হওয়া উচিত আর তা হচ্ছে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাচন। কেবল তাহলেই দেশে সামরিক শাসন জারির লোভ কমতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

পুরস্কার : মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার।

উৎসর্গকৃত গ্রন্থ : বুদ্ধিজীবীদের দ্বন্দ্ব ও সাহিত্য সমাজে অবক্ষয়, ইসরাইল খান।

বক্তৃতা : গোবিন্দচন্দ্র দেব স্মারক বক্তৃতা, বিষয় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০ জুলাই।
কর্নেল তাহের স্মারক বক্তৃতা, বিষয় : বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি, কর্নেল তাহের সংসদ, ঢাকা, ২১ জুলাই ১৯৮৯

সংগঠন : সভাপতি, অধ্যাপক আসহাব উদ্দিন আহমদ নাগরিক সংবর্ধনা পরিষদ, গঠিত ৯ আগস্ট।

গ্রন্থ : বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি, ৬ শ্রাবণ ১৩৯৬, ২১ জুলাই ১৯৮৯, প্রচ্ছদ ইউসুফ হাসান, পৃষ্ঠা ৭৮, মূল্য ১৫ টাকা, কর্নেল তাহের সংসদ, ঢাকা।

সম্পাদনা : ছড়া ও ছবিতে মুক্তিযুদ্ধ, সদস্য, সম্পাদনা পরিষদ, ফাল্গুন ১৩৯৫, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৬৪, মূল্য ২৫ টাকা, মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ঢাকা।

১৯৯০

উৎসর্গকৃত গ্রন্থ : নজরুল চর্চা, নারায়ণ চৌধুরী; এখনো উন্মন আছে, সমুদ্র গুপ্ত; একলা আছে, মনোরঞ্জন বিশ্বাস; সাহিত্যে প্রগতি পরাগতি, মিহির আচার্য; নজরুল চর্চা, নারায়ণ চৌধুরী।

ভূমিকা লিখিত গ্রন্থ : বন্দি বিবেক সমাজ ও সাহিত্য জগতে বৈশ্যবৃত্তি, ইসরাইল খান; প্রবচনের রাজনীতি, বিনোদ দাশ গুপ্ত; হে কমরেড সিরাজ সুদ্রাতা, শামীম সিকদার।

বক্তৃতা : প্রথম নাজমা জেসমিন চৌধুরী স্মারক বক্তৃতা, বিষয় : শিক্ষা : একালে ও সেকালে, ঢাবি আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ১৪ সেপ্টেম্বর।

সংগঠন : সভাপতি, উপসাগরীয় যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সহায়তা কমিটি।

গ্রন্থ : বাঙলাদেশের সাম্প্রতিক চালচিত্র, ফাল্গুন ১৩৯৬, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, প্রচ্ছদ সমর মজুমদার, পৃষ্ঠা ১১৫, মূল্য ৬০ টাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা।
একালে নজরুল, ফাল্গুন ১৩৯৬, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, প্রচ্ছদ সমর মজুমদার, পৃষ্ঠা ২৩৫, মূল্য ১০০ টাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

সংস্কৃতি, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৮৪, মূল্য ৪৫ টাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
মানবতা ও গণমুক্তি, ১৯৯০, প্রচ্ছদ সমর মজুমদার, পৃষ্ঠা ১৬৩, মূল্য ১০৫ টাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১১৪ মতিঝিল বা. এ. ঢাকা।
সাক্ষাৎকার : মাসিক ডাইজেস্ট, ফেব্রুয়ারি, মাহফুজুর রহমান।

১৯৯১

১ ফেব্রুয়ারি : ড. আহমদ শরীফসহ স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এক আহবানে পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও অস্ত্রমুক্ত রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন জারিকৃত নীতিমালা কঠোরভাবে পালনের জন্য সকল রাজনৈতিক জোট ও ব্যক্তির প্রতি আহ্বান জানান এবং এই নীতিমালা ভঙ্গকারীকে গণশত্রু বিবেচনা করে কঠোরভাবে দমনের জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান।
৬ নভেম্বর : কর্নেল তাহের সংসদের সভাপতি ড. আহমদ শরীফ ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মুশতাক হোসেন ৭ নভেম্বর সিপাহী জনতার অভ্যুত্থান দিবস পালনের আহ্বান জানান।
৭ নভেম্বর : পটিয়া জেলা বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক ড. জহুরুল হক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. আহমদ শরীফসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জাতীয় প্রেসকাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পটিয়াকে জেলায় পরিণত করার দাবি জানান।
পুরস্কার : একুশে পদক।
25 December : First Nstional Humanist Award, The Humanist and Ethical Association of Bangladesh
ভূমিকা লিখিত গ্রন্থ : শ্রী রায় বিনোদ : কবি ও কাব্য, মুহাম্মদ শাহজাহান মিয়া।
গ্রন্থ : সাম্প্রদায়িকতার ও সময়ের নানা কথা, জানুয়ারি ১৯৯১, প্রচ্ছদ শিশির ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ১২৫, মূল্য ৬০ টাকা, প্রসূন প্রকাশনা, ঢাকা।
গণতন্ত্র, সংস্কৃতি, স্বাতন্ত্র্য ও বিচিত্র ভাবনা, আগস্ট ১৯৯১, প্রচ্ছদ মাসুক হেলাল, পৃষ্ঠা ১০৩, মূল্য ৬৫ টাকা, আফসার ব্রাদার্স, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা।
সাক্ষাৎকার : সাতদিনের পূর্বাভাস : ১৯ আগস্ট, আদিত্য কবির ও আমিনুর রশিদ।

১৯৯২

20 January : Sixty-seven eminent lawyers, intellectuals, retired armed forces, artists, freedom fighters and students leaders with Dr. Ahmed Sharif in a join statement on Sunday demanded public trial of Golam Azam as a war criminal and ban on the politics of anti-liberation force Jamat-e-Isalme.
২০ ফেব্রুয়ারি : ঋষিজ শিল্পী গোষ্ঠী ও বাংলা একাডেমী এক আলোচনাসভার আয়োজন করে। এ আলোচনাসভায় ড. আহমদ শরীফ বলেন, আমাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। জামাতিরা এত উদ্ধত ও প্রবল হয়ে উঠেছে যে, আমাদের চ্যালেঞ্জ করছে। গোলাম আযম মানবজাতির শত্রু, হন্তারক। তাকে দেশ থেকে তাড়াতেই হবে।
২৬ মার্চ : শহীদ জননী জাহানারা ইমাম সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পাকিস্তানী নাগরিক ও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে অপরাধী গোলাম আযমের ফাঁসির রায় ঘোষণা করেন।

যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিরুদ্ধে ১ ডজন অভিযোগ রয়েছে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে গণহত্যার প্ররোচনা। নারী ধর্ষণে প্ররোচনা। সংবিধানের ৩৮ নম্বর ধারা লংঘন। ইত্যাদি। গণআদালতে যারা রায় ঘোষণা করেন তারা হলেন ১. ড. আহমদ শরীফ, ২. গাজীউল হক, ৩. ব্যারিস্টার শফি আহমদ, ৪. কলিম শরাফী, ৫. কবির চৌধুরী, ৬. মযহারুল ইসলাম, ৮. ফয়েজ আহমদ, ৯. লেঃ কঃ (অব) কাজী নুরুজ্জামান, ১০. লেঃ কঃ (অবঃ) আবু ওসমান চৌধুরী, ১১. ব্যারিস্টার শওকত আলী খান।

৯ জুলাই : ড. আহমদ শরীফ বলেন, আমাদের প্রধান সমস্যা তিনমুখী। বড় সমস্যা হচ্ছে প্রধান ও শক্তিমান রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ছাত্রসংগঠনগুলোকে পারস্পরিক হানাহানিতে প্রকাশ্যে লেলিয়ে দিয়েছে, দেশের সর্বত্র। ফলে শিক্ষাঙ্গনে লেখাপড়া বলতে গেলে বন্ধই থাকে। দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে ব্যবসা ক্ষেত্রে এবং চাকুরী ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ এখনো গাঁ-গঞ্জের দরিদ্র পরিবার থেকে আসা। ফলে অর্থ সম্পদের দিকে তাদের লোভ এত বেশি যে, শাসনে-প্রশাসনে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে ন্যায়-নীতি-সততা-সুবিচার দুর্লভ হয়ে উঠছে। তৃতীয় সমস্যা, দেশ ঋণে-দানে-ত্রাণে এবং ভেতরে এনজিওর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও অভিভাবকত্বে চলে। এ অবস্থা দেশের মানুষের মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনে কখনো উন্নতি ও উৎকর্ষ ঘটাতে পারে না।

১৭ জুলাই : সাপ্তাহিক বিচিত্রার নির্বাহী সম্পাদক শাহরিয়ার কবিরকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়ায় বিভিন্ন সংগঠন এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং শাহরিয়ার কবিরকে তার পদে পুনঃবহালের দাবি জানিয়েছে। ড. আহমদ শরীফ এক বিবৃতিতে বলেছেন, ক্ষমতার নগ্ন অপব্যবহারের জন্যে সরকারের প্রতি আমরা স্বদেশ চিন্তা সংঘের পক্ষ থেকে ধিক্কার জানাচ্ছি।

৭ আগস্ট : মনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে পোস্তগোলার হাবিব ম্যাচ ফ্যাক্টরী শ্রমিক ক্লাবে "বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের" কেন্দ্রীয় তৃতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্বোধন করেন ডক্টর আহমদ শরীফ। তিনি বলেন, বিপ্লব করতে হলে শ্রমিকদেরকে বিপ্লবী তথা কমিউনিস্ট হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শ্রমিক আন্দোলনের ক্যাডারভিত্তিক লাইনের তিনি প্রশংসা করেন।

১০ আগস্ট : ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহ্বায়িকা জাহানারা ইমামের সভাপতিত্বে তাহের মিলনায়তনে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ আগস্টের হরতাল প্রশ্নে প্রফেসর আহমদ শরীফ ও প্রফেসর আনিসুজ্জামান এবং পাঁচদল নেতৃবৃন্দ নির্মূল কমিটির মতবিনিময় সভা ত্যাগ করেন।

১৪ অক্টোবর : মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি আহূত সভায় তিনি বলেন, বিএনপি আজ আমাদের সংগ্রামের পথে প্রধান/বড় বাধা হিসেবে দাঁড়িয়েছে। আজ বিএনপি'র বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করতে হবে। সভায় শেখ হাসিনা প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। এ ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন জাহানারা ইমাম, হাসান ইমাম, মাওলানা জাকির হোসাইন, আবদুল মান্নান চৌধুরী, লেঃ কঃ (অব) কাজী নুরউজ্জামান, আবদুল আহাদ চৌধুরী, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

১৬ অক্টোবর : বাংলাদেশ ভাষা সমিতির উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাঙলা প্রচলন এবং ইংরেজির অবস্থান শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের পর রাজনীতিবিদরা শুধু বাঙলা বাঙলা বলে চেঁচিয়েছেন। বাঙলা ভাষা, বাঙালির জন্যে কাজের কিছুই করেন। এ আলোচনাসভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মনসুর মুসা, অধ্যাপক আসহাব উদ্দিন, মুস্তফা নুরুল ইসলাম, আবদুল মতিন খান, মুহম্মদ নূরুল হুদা প্রমুখ। মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী।

২১ অক্টোবর : জাতীয় যাদুঘর শিশু মিলনায়তনে স্বদেশ চিন্তা সংঘের উদ্যোগে 'আমাদের সংস্কৃতির উপর সাম্প্রতিক হামলা' বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। বক্তার মধ্যে ছিলেন বদরুদ্দীন উমর, লে. ক. (অব.) নুরউজ্জামান, হায়দার আকবর খান রনো ও ড. হামিদা বানু। এতে সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক আহমদ শরীফ বলেন, ধর্ম শিক্ষার জন্য আরবি, হিব্রু বা অন্য কোনো ভাষার চেয়ে মাতৃভাষাই শ্রেয়। মাদ্রাসা শিক্ষা, ইংরেজি শিক্ষা আর বাঙলা শিক্ষা-এই তিন ভাষার তিন শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উপর বড় হামলা। এই সভায় সভাপতির ভাষণের অর্থান্তর ঘটিয়ে এবং তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে স্বার্থান্বেষী মহল তাকে 'মুরতাদ' আখ্যায়িত করে। দেশব্যাপী মুরতাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে এবং তার বিরুদ্ধে ১৮টি মামলা দায়ের করে। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ধর্মব্যবসায়ী থেকে শুরু করে বিভিন্ন মহল থেকে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়। দীর্ঘদিন যাবৎ সভা-সমাবেশ-মিটিং-মিছিল চলে। পত্রপত্রিকা সংবাদ, সম্পাদকীয় এবং নিবন্ধ ছাপে। সংসদে বিতর্ক হয়, ওয়াক আউট করে জামাতে ইসলাম। বিষয়টি পরীক্ষার জন্যে প্রিভিলেজ কমিটিতে প্রেরণ করা হয়।

উৎসর্গকৃত গ্রন্থ : লালন শাহ্, আবুল আহসান চৌধুরী; চরৈবেতী চরৈবেতী, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি, আজহার ইসলাম; নতুন ভাবনায় কালিদাস, প্রীতি মুখোপাধ্যায়; লোক প্রশাসনের তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ, মুস্তফা মজিদ।

বক্তৃতা : কবি মতিয়ুর রহমান স্মারক বক্তৃতা, বিষয় : সংস্কৃতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২-৩ মার্চ ।

সংগঠন : উপদেষ্টা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি, গঠিত ১৯ জানুয়ারি; অন্যতম বিচারক, ঢাকা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গঠিত গণআদালত-১, ২৬ মার্চ। ডক্টর অ্যাবিমেল গুজমানের জীবন রক্ষার আন্তর্জাতিক জরুরি কমিটি (বাংলাদেশ), গঠিত নভেম্বর।

গ্রন্থ : বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব, পৌষ ১৩৯৮ জানুয়ারি ১৯৯২, প্রচ্ছদ অমিয় ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ২৯৪, মূল্য ৮০ টাকা, সাহিত্যলোক, বিডন স্ট্রিট, কলকাতা ৬।

জাগতিক চেতনার বিচিত্র প্রসূন, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আজিজ মেহের, পৃষ্ঠা ১১০, মূল্য শোভন ৭০ টাকা, সুলভ ৪৫ টাকা, বস্তু প্রকাশন, ৬৮/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা।

সম্পাদনা, বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, সেপ্টেম্বর ১৯৯২, দ্বি. মু. ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, প্রচ্ছদ কাইয়ুম চৌধুরী, পৃষ্ঠা ৬৭৩, মূল্য ২০০ টাকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সাক্ষাৎকার : সাপ্তাহিক প্রিয়প্রজন্ম, ৯ ফেব্রুয়ারি, বিপ্লব রহমান; দৈনিক বসুমতি (কলকাতা), ১২ জানুয়ারি, প্রথমা রায় মণ্ডল; সাপ্তাহিক সমীক্ষণ, ৯ জুলাই, আনোয়ার পারভেজ হালিম; মাসিক মাটি, জুলাই-আগস্ট, মারুফ রায়াহন; সাপ্তাহিক খবরের কাগজ, ৩ নভেম্বর; সাপ্তাহিক সেবা, অক্টোবর, মুহম্মদ সামছুজ্জোহা।

১৯৯৩

১১ জুলাই : ঢাবি টিএসসিতে ড. আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘ এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভাপতি তার ভাষণে বলেন, বৌদ্ধ, খৃস্টানদের আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করি না। শুধু হিন্দু মারতে চাই, যে হিন্দুরা আমাদের দেশ স্বাধীন করে দিয়েছে। অকৃতজ্ঞতার তো একটা সীমা আছে। বলা হয় হিন্দুরা আমাদের দেশ নিয়ে নেবে। সভায় অন্যান্যের মধ্যে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, কর্নেল (অব) কাজী নুরউজ্জামান, বশীর আলহেলাল, মহসিন শস্ত্রপাণি, সরদার ফজলুল করিম, অধ্যাপিকা ফরিদা মজিদ, আবদুল আউয়াল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

১৩ জুলাই : স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘের সভাপতি ড. আহমদ শরীফ বাংলাদেশের খ্যাতনামা তরুণ লেখিকা তসলিমা নাসরিন কর্তৃক লিখিত *লজ্জা* বইটির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করায় গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ড. শরীফ সরকারের কাছে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জোর দাবি জানান।

২০ জুলাই : ঢাবি ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে ড. আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে মুক্তিযুদ্ধ ও শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় সভাপতি তার বক্তৃতায় বলেন, কর্নেল তাহের হত্যাকারীদের এই দেশেই বিচার হবে।

২৭ জুলাই : কমরেড চারু মজুমদারের ২১ তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় ড. আহমদ শরীফ এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, চারু মজুমদার ছিলেন একজন প্রবাদ পুরুষ। তিনি আরও বলেন, ইন্দিরা গান্ধী খুনি সিদ্ধার্থ শংকরকে দিয়ে চারু মজুমদারকে হত্যা করার পরও তার মূল্যায়নে ঘাটতি পড়েনি। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নির্মল সেন, হামিদুল হক, আ. ফ. ম. মাহবুবুল হক, ডা. রিয়াজুর রহমান প্রমুখ।

১২ আগস্ট : দৈনিক ইত্তেফাক, আজকের কাগজ : স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘের সভাপতি আহমদ শরীফ এক বিবৃতিতে বলেছেন, ঢাকার জন্মাষ্টমী মিছিলে যারা অকারণে হামলা করেছে তারা বাংলাদেশের, বাংলাদেশী মুসলমানের, সরকারের ও রাষ্ট্রের কারো মিত্র নয়, হিতৈষী নয়, তারা মানুষের ও মানবতার শত্রু।

৯ সেপ্টেম্বর : কমিউনিস্ট বিপ্লবের অন্যতম নেতা কমরেড মাও সে তুং-এর জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। এতে ড. আহমদ শরীফসহ অন্যান্য মাও সে তুং চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করেন এবং পরে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় ড. আহমদ শরীফ বলেন, মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে চীনে প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্র শতকোটি মানুষকে শোষণ-ক্ষুধা-দারিদ্র থেকে মুক্ত করেছিল। তিনি বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সাম্রাজ্যবাদী প্রচার মাধ্যমে একে

কমিউনিজমের পতন হিসেবে প্রচার চালাচ্ছে। তিনি বলেন, প্রকৃত পক্ষে এটা একটা সাময়িক ব্যাপার, সমাজতন্ত্রই মানবমুক্তির পথ হিসেবে আজও জনগণের শোষণ মুক্তির লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত। তিনি বলেন, সমাজতন্ত্র কমিউনিজম তথা মার্কস-লেলিন-মাও-এর দেখানো পথেই কেবল বিশ্বব্যাপী মেহনতি জনতার মুক্তি সম্ভব।

১২ সেপ্টেম্বর : ঢাবি টিএসসির সেমিনার কক্ষে শফিকুল কবিরের সভাপতিত্বে মাসিক লেখক পাঠক-এর প্রকাশনার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সেমিনারে ড. আহমদ শরীফ বলেন, সংবাদপত্র হল আসলে ব্যবসা। এই যে এখানে একটি সেমিনার হচ্ছে, জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কিছু কথাবার্তা হচ্ছে, এখানে কোনো পত্রিকার একজন রিপোর্টারও নেই। প্রেস রিলিজ পত্রিকা অফিসগুলোতে পৌঁছে দিলেও এ সভার খবর কোনো মানুষ জানবে না। মানুষকে জানানোর জন্যে মানুষের স্বার্থ নিয়ে কথা বলার জন্য তারা মাথা ঘামান না।

৭ অক্টোবর : লেখক শিবিরের সভাপতি হাসান আজিজুল হকের সভাপতিত্বে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে লেখক শিবিরের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ড. আহমদ শরীফ চাটুকারিতা ও তোষামোদকারীদের হাত থেকে বাঙালির আজন্ম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, দেশে একশ্রেণির কবি, সাহিত্যিক ও লেখক রয়েছে-সরকারের তোষামোদ করাই যাদের কাজ। অপশক্তি ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতিকে ধ্বংসের জন্য। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বদরুদ্দীন ওমর, কাজী নুরউজ্জামান, অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, শওকত আলী, আনু মুহাম্মদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, মামুনুর রশীদ।

৪ নভেম্বর : ঢাবি টিএসসিতে ড. আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘ এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, এনজিওগুলো আমাদের দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভীতিকরভাবে এগুচ্ছে। এরা মাসি হয়ে মায়ের চেয়ে বেশি দরদ দেখাচ্ছে। মনে রাখতে হবে যারা মাসি হয়ে মায়ের চেয়ে বেশি দরদ দেখায়, তারা কখনও মানুষ নয়, তারা ডাইনি। এদেশে এনজিওর কার্যক্রম দেখে ডাইনিই মনে হয়। তারা আমাদের বিভিন্ন অযোগ্যতার সুযোগ নিয়ে সমাজের সর্বত্র হাত বাড়াবার চেষ্টায় লিপ্ত।

৬ নভেম্বর : ড. আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে ঢাবি ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে কর্নেল তাহের সংসদ "বাংলাদেশে আমলাতন্ত্র : জবাবদিহিমূলক প্রশাসনের অন্তরায়" শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে। সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, এখানে কিছু প্রথম শ্রেণির তথাকথিত শিক্ষিত লোক সরকারের চাটুকারিতায় মত্ত। ঠিক একই অবস্থা আমাদের প্রশাসনে। সরকারি মন্ত্রীরা আমলাদের সঙ্গে পেরে উঠছেন না। ফলে আমলাদের হাতে মূল ক্ষমতা চলে গেছে। আমলারা আমাদের ইতিহাসকে ভুলে গেছে। জনগণের সাথে থাকার একটি নিয়ম থাকলেও প্রশাসন সর্বদা থাকছে জনবিচ্ছিন্ন। এদেশে এ জন্যে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার সহজ সমাধান হবে না তা আমরা অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝি।

২০ নভেম্বর : ঢাবি টিএসসি মিলনায়তনে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ড. আহমদ শরীফসহ দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বক্তৃতা করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, সাম্প্রদায়িকতা আমাদের অন্ধ করে দেয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার অঙ্গীকারে যুদ্ধ করেছিলাম। কিন্তু তা বেশিদিন টিকেনি।
২৫ নভেম্বর : ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে পটিয়া সমিতি কর্তৃক আয়োজিত মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ স্মরণে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ আলোচনা সভায় ড. আহমদ শরীফ বলেন, ১৯৩০ সাল পর্যন্ত দেশে বাঙলা ভাষার প্রচলন ছিল না। বিশারদের পুথি সংগ্রহ ও সৃষ্টকর্ম পর্যায়ক্রমে ১৯৭১ সালে আমাদেরকে পুরোপুরি বাঙালি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ড. মমতাজুর রহমান তরফদার, ড. ললিত মোহন নাথ, বিচার পতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম, ড. আশরাফ সিদ্দিকী, নুরুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ।
সম্মাননা : রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. লিট. [সম্মানসূচক] প্রদান, ৭ মে।
উৎসর্গকৃত গ্রন্থ : বাংলাদেশের মহাত্মা গান্ধী, তোফায়েল; The Ocean of Love, David G. Cashin.
বক্তৃতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি বক্তৃতা, বিষয় : বাঙালির জ্ঞাতিত্ব বন্ধন, বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২১ মে, সাহিত্য একাডেমী বক্তৃতা।
সংগঠন : কমরেড চারু মজুমদার মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন কমিটি, কমরেড মাও সে তুঙ জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটি।
গ্রন্থ : শাস্ত্র সমাজ ও নারীমুক্তি, ফাল্গুন ১৩৯৯, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, দ্বি. মু. বৈশাখ ১৪০১, সংকলন ও বিন্যাস ড. প্রথমা রায় মণ্ডল, পৃষ্ঠা ১৩৪, মূল্য ৭০ টাকা, বস্তু প্রকাশন, ৬৮/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা।
সংকট : জীবনে ও মননে, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, প্রচ্ছদ মঈন আহমেদ, পৃষ্ঠা ১১১, মূল্য ৭০ টাকা, বিদ্যাপ্রকাশ, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা।
মুক্তি নিহিত নতুন চেতনায় ও নতুন চিন্তায়, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ, পৃষ্ঠা ৯৪, মূল্য ৬০ টাকা, আফসার ব্রাদার্স, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা।
আহমদ শরীফ বিষয়ক গ্রন্থ : 'আহমদ শরীফ : নির্মোহ চিন্তার প্রতিকৃতি', রচয়িতা প্রথমা রায় মণ্ডল, প্রকাশ
সাক্ষাৎকার : কবিতীর্থ (কলকাতা), জানুয়ারি,প্রথমা রায় মণ্ডল; দৈনিক প্রতিবেদন, ২ জুলাই, কেশব মুখোপাধ্যায়; আগামী, ১২ ফেব্রুয়ারি; হিল লিটারেচার, ফেব্রুয়ারি; ভাষক, ২০ মার্চ, মাহফুজুল হক; বাংলাবাজার পত্রিকা, ৪ জুলাই, চৌধুরী জহিরুল ইসলাম।

১৯৯৪

৭ ফেব্রুয়ারি : টিএসসি সড়কদ্বীপে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের তৃতীয় জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ড. আহমদ শরীফ বক্তৃতায় বলেন, আমরা ক্রমশঃ ভিক্ষাজীবী জাতিতে পরিণত হয়ে পড়েছি। বিদেশী ঋণদান ও ত্রাণের ওপর আমরা এখন পুরোপুরি নির্ভরশীল। যতোদিন পর্যন্ত আমরা সকল ক্ষেত্রে স্বনির্ভর না হব ততোদিন

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তাদের খেয়ালখুশি মতো আমাদের চালাবে। আমাদের দেশের সরকার একটা মুৎসুদ্দি সরকার। বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এর হুমকিতে এ দেশ চলে।

১০ মার্চ : তোপখানা রোডস্থ চট্টগ্রাম সমিতির কার্যালয় প্রাঙ্গনে প্রধান বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেনের সভাপতিত্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের নায়ক মাস্টারদা সূর্যসেনের জন্মশতবার্ষিকী পালনের প্রস্তুতি গঠনের জন্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ড. আহমদ শরীফসহ ১০১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

২২ মার্চ : ড. আহমদ শরীফ মধ্যবর্তী নির্বাচন এবং কেয়ারটেকার সরকার এর বিল প্রসঙ্গে বলেন, আমাদের মতো দেশে বার বার নির্বাচনের প্রয়োজন হয় না। কেননা দুঃস্থ দরিদ্র অজ্ঞ নিঃস্ব নিরন্ন অসহায় ১১ কোটি মানুষ এখানে বাস করছে। এখানে গণতন্ত্র নামে ভোটতন্ত্র চালু রাখা হয়েছে।

৪ এপ্রিল : ঢাবি টিএসসি সেমিনার কক্ষে সাপ্তাহিক সেবা পত্রিকার ১৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ড. আহমদ শরীফ বক্তৃতায় বলেন, সংসদ সদস্যরা অপকর্ম করে দোষ হয় জনগণের। আমাদের দেশের সাংসদ ও আমলারা সাধারণ মানুষকে ভেড়া মনে করেন।

১৬ এপ্রিল : নববর্ষের প্রথম দিনে বাংলা একাডেমীর পঞ্চদশ শতাব্দী উদযাপন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের শতবর্ষের সংস্কৃতি শীর্ষক বক্তৃতা প্রদানের জন্য বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক মোহাম্মদ হারুন-উর-রশীদ ড. আহমদ শরীফকে আমন্ত্রণ জানান। আমন্ত্রণ পত্রে ৮ এপ্রিলের মধ্যে বক্তৃতা তথা প্রবন্ধটি প্রদানের জন্যে অনুরোধ জানানো হয়। জনাব শরীফ ৭ই এপ্রিলের মধ্যে প্রবন্ধ জমা দেয়ার পরও কর্তৃপক্ষ তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। এ বিষয়ে আমন্ত্রিত ড. শরীফ এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, বাংলা একাডেমী হচ্ছে বাঙালির সংগ্রামের বিজয়ের এবং গৌরবের প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূজাতীয় প্রতিষ্ঠান। সেখানেও এ ভোটতান্ত্রিক সরকার হামলা চালাচ্ছে। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকের লিখিত আমন্ত্রণক্রমে আমি পনেরো শতকের নববর্ষের লিখিত বক্তৃতা দিতে সম্মত হই এবং তা মুদ্রিত করে উপস্থিত শ্রোতাদের কাছে বিলি করারও কথা ছিল। আমি আমার লিখিত বক্তৃতার কপি ৭.৪.৯৪ইং তারিখে বাংলা একাডেমীর এক পরিচালকের হাতে দেই। কিন্তু বক্তৃতা মুদ্রিত করা হয়নি। আকস্মিকভাবে ১৩.৪.৯৪ইং তারিখে বা ৩০শে চৈত্র রাতে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ আমাকে সবিনয়ে জানালেন যে, মন্ত্রী নাকি আমার বক্তৃতা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। কাজেই তারা নাচার। নাগরিক হিসেবে আমার দায়িত্ব হচ্ছে সরকারি বেতনভুক চৌকিদার থেকে মন্ত্রী অবধি সবার অনুগত থাকা। কেননা, আমার জান-মাল, মান-গর্দান-কারার অধিকার শাসক-প্রশাসক হিসেবে তাদেরই রয়েছে। কাজেই আমার বাক-স্বাধীনতা হরণের মতো জুলুম ও অপমান ব্যক্তিগতভাবে আমাকে সহ্য করতেই হল।

১৮ এপ্রিল : আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েও ড. আহমদ শরীফকে বাংলা একাডেমীতে বক্তৃতা দিতে দেয়া হয়নি। এতে বাংলা একাডেমীর কাউন্সিলের সদস্যরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক মোহাম্মদ

মনিরুজ্জামানের সাথে সংবাদের প্রতিনিধির সাথে কথা হয়। তারা বলেন, বাংলা একাডেমী মুক্তচিন্তার একটি প্রতিষ্ঠান। একজন পণ্ডিত ব্যক্তি এখানে এসে কোনো বিষয়ে বক্তব্য দিলে তা হবে তার নিজের বক্তব্য, বাংলা একাডেমীর বক্তব্য নয়। আহমদ শরীফকে বক্তৃতা দিতে না দিয়ে বাংলা একাডেমি অনুচিত কাজ করেছে। এটা একজন লেখকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ।

২১ এপ্রিল : স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘের পক্ষ থেকে ড. আহমদ শরীফ বলেন যদি কোনো ব্যক্তির নামে সেতুর নামকরণ করতে হয় তাহলে ভাসানীর নামেই করা উচিত। এ ছাড়াও দেশের ১৯ জন শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক কবি ও বিশিষ্ট নাগরিক ড. আহমদ শরীফের মতের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন: ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ড. আহমদ শরীফ, জাহেদা আহমদ, আজিজ মেহের, ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ, সমুদ্র গুপ্ত, সাঈদ-উর রহমান, সাইয়িদ অতিকুল্লাহ, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, বেলাল বেগ, ড. আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।

২৩ এপ্রিল : টিএসসিতে বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেনের সভাপতিত্বে সূর্যসেনের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণ সভায় ড. আহমদ শরীফ বলেন, এদেশে মৌলবীরা কখনও কাফের পছন্দ করে না। কিন্তু '৪৭-এর পূর্বে মৌলবী-রা কাফের কংগ্রেসের সমর্থক ছিল। কারণ তারা তখন স্বাধীনতা চাইত। সূর্যসেনকে যারা মুসলমান বিদ্বেষী বলে, তারা প্রতিক্রিয়াশীল। তিনি আমাদের জাতীয় বীর। তিনি আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস রচনা করেছেন।

২৭ এপ্রিল : ঢাবি জগন্নাথ হলে ভারতের সংবিধান প্রণেতা বি.আর. আম্বেদকরের ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাকওয়ার্ড কাস্ট অর্গানাইজেশন এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। ড. আহমদ শরীফ বলন, আপনারা (নারীরা) নাস্তিক হোন। নাস্তিক না হলে নারীরা স্বাধীনতা পায় না। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, খবরদার—নিজের ভিটে ত্যাগ করবেন না। প্রাণের বিনিময়ে হলেও রক্ষা করুন। মনে রাখবেন, মানুষ কিন্তু শক্তের ভক্ত নরমের যম। তিনি বলেন, অনেকে হীনমন্যতায় ভুগে, সার্বভৌমত্বের কথা বলে ভারতকে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করতে দিচ্ছে না। ট্রানজিট সুবিধা দিচ্ছে না। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সুধাংশু শেখর হালদার, কামাল উদ্দিন হোসেন, শ্রী জগদীশ চন্দ্র শুকদাশ, এডভোকেট মোস্তফা আমিন, বিচারপতি দেবেশ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মন্ডল, সুভাষ চন্দ্র সাহা প্রমুখ।

৪ মে : আজকাল, কলকাতা : সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পরেও দ্বিধাহীনভাবেই আমরা এ কথা বলতে পারি, আমরা এখনও পর্যন্ত এমন কোনো বৈজ্ঞানিক সমাজদর্শন মার্কসবাদের বিকল্প হিসেবে পাইনি যা বৃহত্তর জনগনের কল্যাণের পথ দেখায়। তথ্যকেন্দ্রে বই প্রকাশের একটি অনুষ্ঠানে বর্ষীয়ান বামপন্থী বুদ্ধিজীবী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের *আমার তুমি জন্মভূমি কার বা রাখো ডর* এবং ওপার বাংলার সাম্যবাদী আন্দোলনের পুরোধা রণেশ দাশগুপ্তের *সাম্যবাদী উত্থান প্রত্যাশা* বই দু'টির আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে ড. আহমদ শরীফ এ কথা বলেন। মৌলবাদের সমালোচনার জন্যে শরিফ বাংলাদেশের রুশদি হিসেবে পরিচিত। মৌলবাদীরা তাঁর

ফাঁসির দাবিতে পোস্টার মেরেছে ঢাকার রাস্তায়। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও এশিয়াটিক সোসাইটির আমন্ত্রণে তিনি এখন কলকাতায়। অনুষ্ঠানে হীরেন মুখোপাধ্যায় ও রণেশ দাশ গুপ্তের প্রজ্ঞা ও সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে বলেন মহাশ্বেতা দেবী, তরুণ সান্যাল, মিহির আচার্য, সিদ্ধেশ্বর সেন, শৈবাল মিত্র।

১ জুন : বাংলাদেশ ভাষা সমিতির পক্ষে সমিতির সভাপতি ড. আহমদ শরীফ ও সম্পাদক হাবিবুল্লাহ কমিউনিস্ট অধ্যাপক আসহাব উদ্দিনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। শোকবাণীতে তাঁরা বলেন, আসহাব উদ্দিন ছিলেন মানবতাবাদী, বিপ্লব আকাঙ্খী, সংগ্রামী রাজনৈতিক কর্মী, সমাজ পরিবর্তনকামী বিশিষ্ট ব্যঙ্গ রসিক সাহিত্যিক। বাংলাদেশ ভাষা সমিতি আসহাব উদ্দিনের মৃত্যুতে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে।

১৫ জুন : ঢাবি চারুকলা ইনস্টিটিউটের বকুল তলায় মান্নান হীরার সভাপতিত্বে আরণ্যক নাট্যগোষ্ঠী মৌলবাদ বিরোধী নাট্যোৎসব ও সংস্কৃতি কর্ম সভার আয়োজন করে। এতে ড. আহমদ শরীফ প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, জীবনের জন্যে ধর্ম, ধর্মের জন্য জীবন নয়। তিনি বলেন, মৌলবাদ মানে নিজেকে বন্দি করে ফেলা, রোবটের মত চলা, মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি, বিশ্বাস আচার-আচরণ মানুষের এগিয়ে যাবার পথ বন্ধ করা। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, যা মানুষের জন্যে কল্যাণের, মনুষ্যত্ব বিকাশে যা কল্যাণীয় আমরা তা করে যাব। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কথা সাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, কাজী নুরউজ্জামান, নাট্যকার মামুনুর রশীদ, আতাউর রহমান প্রমুখ।

১৬ জুন : রাত দশটায় ৪/৫ জন যুবক ড. আহমদ শরীফের বাসা লক্ষ্য করে ৪টি ককটেল নিক্ষেপ করে। এতে অবশ্য কেউ হতাহত হয়নি। উল্লেখ্য, কয়েকটি মৌলবাদী সংগঠন বেশ কিছুদিন যাবত ড. আহমদ শরীফের ফাঁসির দাবি জানিয়ে আসছে এবং তারা আহমদ শরীফের বিরুদ্ধে সভা-সমাবেশ করে নানা রকম বিষোদগার চালাতে থাকে। ড. আহমদ শরীফের বাসায় বোমা হামলার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবং হামলাকারীদের অনুসন্ধান চালায়। এ ব্যাপারে থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে।

১৭ জুন : কয়েকটি সংগঠন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী ড. আহমদ শরীফের বাসায় ১৬ই জুন বোমা হামলার তীব্র নিন্দা জানান এবং নিন্দা জানিয়ে তারা পত্রিকায় বিবৃতিও প্রদান করেন। বিবৃতিদাতা সংগঠনসমূহ হচ্ছে-বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন, বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ, বাংলাদেশ বেতার টিভি শিল্পী সংসদ, বাংলাদেশ যাত্রা শিল্পী উন্নয়ন পরিষদ, চারু শিল্প সংসদ, বাংলাদেশ পথ নাটক পরিষদ ও চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, বাসদ (খালেকুজ্জামান), সাম্যবাদী দল (মাঃ লেঃ) সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, বিপ্লবী, শ্রমিক আন্দোলন, ছাত্রলীগ, ছাত্র আন্দোলন ছাত্র ইউনিয়ন, জাসদ (ইই) ও স্বদেশ চিন্তা সংঘ। ঢাবি শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে অধ্যাপক খন্দকার নিজামউদ্দিন ও ড. আরেফিন সিদ্দিকী এক যুক্ত

বিবৃতিতে ড. আহমদ শরীফের বাসায় বোমা হামলার তীব্র নিন্দা জানান এবং তাঁর জান মালের নিরাপত্তা রক্ষার্থে সরকারের প্রতি যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানান। সংগঠনগুলো অবিলম্বে বোমা হামলাকারীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদাবি করেন। .

২৬ জুন : আজকের কাগজ : প্রতিক্রিয়ার মৃত্যুঘণ্টা : আবদুল মতিন খান।
ড. আহমদ শরীফের সংগ্রাম ও দ্রোহ ফল দিতে শুরু করেছে। হতভম্ব জাতির মধ্যে নবচেতনার জোয়ার এসেছে। গোঁড়ামি ও অন্ধতা, কুসংস্কার ও কূপমুকতা, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ তোষণ প্রভৃতি অপপ্রবণতার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিরোধ ক্রমাগত বাড়ছে। বাংলাদেশের অতীত ইতিহাসের দৃষ্টান্ত যদি কোনো শিক্ষা হয় তাহলে ধরে নেয়া যায় যে, সাম্রাজ্যবাদ ও তার নেওটা মৌলবাদের মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠেছে।

১১ জুলাই : দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক মিল্লাত, দৈনিক ইনকিলাব : ১. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ : নাস্তিক মুরতাদদের সৃষ্ট উত্তেজনাকর পরিস্থিতির জন্য সরকার দায়ী, ২. সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের গণজমায়েত ও মার্কিন দূতাবাসে স্মারকলিপি পেশ। আজ নাস্তিক-মুরতাদদের শাস্তির দাবি জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়েছে, ৩. জামায়াত কর্ম পরিষদের প্রস্তাব : ধর্মদ্রোহী মুরতাদদের প্রশ্রয় দিলে সরকারকে খেসারত দিতে হবে, ৪. নাস্তিক-মুরতাদদের বিষয়ে সরকারের ভূমিকা জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে : জামায়াত

২০ জুলাই : বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহেরে ১৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। তিনি সভাপতির বক্তৃতায় বলেন, মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে এদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আবারো অবসান ঘটাতে হবে।

২৯ জুলাই : দৈনিক সংগ্রাম, আজকের কাগজ, ভোরের কাগজ, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক ইত্তেফাক, ডেইলি স্টার, মর্নিং সান : ১. টিএসসিতে গুলী, চারু মজুমদারের মৃত্যুবার্ষিকীর আলোচনা সভা পন্ড, ২. টিএসসি সড়কদ্বীপে আলোচনা সভায় হামলা, ৩. চারু মজুমদারের মৃত্যুবার্ষিকী সভায় সশস্ত্র হামলা কয়েকজন আহত, ৪. সভামঞ্চ ভাংচুর আহমদ শরীফসহ নেতারা সটকে পড়েন, ৫. Ban on religion based politics demanded. ৬. Charu Majumder memorial function foiled 10 hurt. ২৮ জুলাই তারিখে টিএসসি সড়কদ্বীপে ড. আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে চারু মজুমদার স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। আলোচনার এক পর্যায়ে একদল সশস্ত্র যুবক ঝড়ের বেগে এসে অতিথি শাহ আলম, সমাবেশ উদ্যোক্তা এবং শ্রোতাদেরকে মারপিট করে। ড. আহমদ শরীফসহ এ হামলার শিকার হন আরও অনেকে।

২ আগস্ট : দৈনিক শক্তি, নিউ নেশান, দৈনিক মিল্লাত, দৈনিক ইত্তেফাক : আহমদ শরীফের মামলা গোপালগঞ্জ থেকে ঢাকায় স্থানান্তরের নির্দেশ

৮ আগস্ট : আজকের কাগজ, সংবাদ, বাংলা বাজার পত্রিকা, আল মুজাদ্দেদ, নিউ নেশান, বর্তমান দিনকাল, বাংলাদেশ অবজারভার, দৈনিক জনকণ্ঠ, ফাইনানসিয়াল এক্সপ্রেস, দৈনিক মিল্লাত, দৈনিক দিনকাল, মর্নিং সান, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক লাল সবুজ, দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক রূপালী, ডেইলি স্টার, বর্তমান বাংলা :. ড. আহমদ শরীফের জামিন মঞ্জুর। ড. আহমদ শরীফ ঢাকা মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালত থেকে ৭.৮.৯৪ তারিখে জামিন লাভ করেছেন। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে মন্তব্য করার জন্য দায়ের করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ড. আহমদ শরীফের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হয়। ড. আহমদ শরীফের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি কে এম হাসানের নির্দেশে এই মামলাটি সিএমএম কোর্টে হস্তান্তর করা হয়। ৭.৮.৯৮ তারিখে ড. আহমদ শরীফ সশরীরে উপস্থিত হয়ে মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে জামিনের আবেদন করেন। তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে মাননীয় হাকিম জামিন মঞ্জুর করেন।

২৮ আগস্ট : সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ড. আহমদ শরীফের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলাটি গোপালগঞ্জ থানা মেজিস্ট্রেট আদালত হতে ঢাকা, মহানগর মূখ্য হাকিম আদালতে স্থানান্তর সম্পর্কিত হাইকোর্টের রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত ঘোষণা করেন।

৮ সেপ্টেম্বর : সংবাদ, ভোরের কাগজ, আজকের কাগজ, দৈনিক রূপালী, দৈনিক লাল সবুজ, বাংলাদেশ টাইমস, ডেইলী স্টার : ১. বামফ্রন্টের সংহতি সমাবেশে বক্তাদের অভিমত : জামাত-জাপার সঙ্গে হাতমিলিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। ২. বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সংহতি সমাবেশ : ফতোয়াবাজ মৌলবাদের বিরুদ্ধে আপোস-হীন সংগ্রামের ডাক, ৩. বামফ্রন্ট আয়োজিত সমাবেশের ঘোষণা : সকল দল-ব্যক্তি-সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধভাবে মৌলবাদ বিরোধী সংগ্রামে শামিল হতে হবে, ৪. যারা ধর্মের নামে ভণ্ডামি করেছিল তারাই আজ ক্ষমতায় যেতে চাচ্ছে, ৫. বামফ্রন্টের সমাবেশে ৫ '৭২ সালের সংবিধান পুনঃপ্রবর্তনের দাবি, ৬. Resist Communal forces : LDF, 7. LDF rally calls for unity against fundamentalism. ৭.৯.৯৪ইং তোপখানা রোডে বিমল বিশ্বাসের সভাপতিত্বে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বপক্ষে সাম্প্রদায়িকতা, ফতোয়াবাজ ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট এক গণসংহতি সমাবেশের আয়াজন করে। এ সমাবেশে ড. আহমদ শরীফ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, শেখ মুজিব মহত্বের কারণে একাত্তরের ঘাতক দালালদের ক্ষমা করেছিলেন। আজকে তারাই আমাদের হুমকি দিচ্ছে।

৫ অক্টোবর : ড. আহমদ শরীফের নিজ বাসভবনে সিরাজ শিকদারের ৫০তম জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলন হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে ড. শরীফ বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো হতাশায়

ভুগছে। কিন্তু তারা জানেনা মার্কসবাদের বিকল্প কিছু নেই। নির্যাতিত বঞ্চিত মানুষগুলো সমাজতান্ত্রিক দেশেই বেঁচে থাকার প্রেরণা পায়। মানব মুক্তির জন্যই মার্কসবাদের প্রয়োজন। সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সাঈদ-উর-রহমান, শামীম শিকদার, অধ্যাপক নূরুন্নবী, ডাঃ নাজমুল হক শিকদার, আবদুল মান্নান, শামসুজ্জামান মিলন, হাসান ফকরী, জাকির মোস্তাফিজ, হামিদুল হক প্রমুখ।

সিরাজ সিকদারের ৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন কমিটি এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করে। এ র‍্যালির উদ্বোধন করেন ড. আহমদ শরীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, আবদুল মান্নান, ডাঃ নাজমুল হক শিকদার, ম. নুরুন্নবী, শামসুজ্জামান মিলন, নাজমুল ইসলাম সাইদ, হাসান ফকরী, জাফর হোসেন, জাকির মোস্তাফিজ মিলু প্রমুখ।

১ নভেম্বর : ঢাবির স্বোপার্জিত স্বাধীনতা চত্বরে জাতীয় ছাত্রদলের অষ্টম কাউন্সিল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং বলেন, বিশ্বব্যাপী প্রগতিশীলদের সঙ্গে মৌলবাদের বিরোধিতা চলছে। বাংলাদেশে মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীলদের আন্দোলন দরকার, কেননা মৌলবাদী সাপ মাথা জাগাতে পারলেই ছোবল দেবে। এদেরকে প্রতিহত করা জরুরি। তিনি বলেন, খালেদা সরকার এদেশে সাম্রাজ্যবাদ আমলা মুৎসুদ্দির গণতন্ত্র প্রবর্তন করে দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

৪ নভেম্বর : দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক : ঢাকার পশ্চিম আগারগাঁওয়ে বিএনপিবাজারের নতুন মাটি থেকে মাস্তান ও পুলিশ দ্বারা বিনা নোটিশে বস্তি উচ্ছেদের প্রতিবাদ করেন।

২১ নভেম্বর : রাজনৈতিক সংকট নিরসনে কমনওয়েলথ মহাসচিব স্যার নিনিয়ান স্টিফেনের মধ্যস্থতায় সংলাপ ব্যর্থ ও নিনিয়ান চলে গেলেও সংলাপ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখে সংকট নিরসন করার জন্য আহবান। তিনি বলেন, ভালই হয়েছে। মর্যাদা রক্ষা পেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নেপথ্যে থেকে কমনওয়েলথ ও বৃটিশদের দিয়ে এ তদারকি, নজরদারি, খবরদারি চালাচ্ছে। নিনিয়ানের কথা যে দু'পক্ষই শোনেনি এতে সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদা রক্ষা হল।

৩১ ডিসেম্বর : সম্মিলিত বিরোধী দল জাতীয় সংসদ থেকে একযোগে পদত্যাগ করার পর উদ্ভূত পরিস্থিতি বিষয়ে বলেন, আমাদের সংবিধানে একটা ত্রুটি আছে, সেটা হল, প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় ছাড়া প্রেসিডেন্ট সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারেন না। তিনি মন্ত্রিসভার সদস্যদেরও মন্ত্রিসভা থেকে পদচ্যুত করতে পারেন না। যদি তিনি তা পারতেন; তবে প্রেসিডেন্টের পক্ষে সবচেয়ে ভাল হত সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন দেয়া।

২৮ নভেম্বর : সমাজচেতনার তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ঢাবির ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র সেমিনার কক্ষে তিনি বলেন, মানুষের মুক্তির প্রতিশ্রুতি শুধু রাজনৈতিক সমস্যা নয়, এটি মানবতার সমস্যা এবং এ প্রশ্নে সবচেয়ে বড় কথা বিদ্যমান সমাজ বদলে ফেলতে হবে।

উৎসর্গকৃত গ্রন্থ : আবদুল মা'রুফের দেশ, রানা চট্টোপাধ্যায়; ছোট ছোট দুঃখকথা, তসলিমা নাসরিন।

ভূমিকা লিখিত গ্রন্থ : পটিয়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, এম. এফ. এ. কে. জাহাঙ্গীর।
বক্তৃতা : বনফুল স্মারক বক্তৃতামালা, বিষয় : বাংলাদেশে বাঙলা সাহিত্যের বিবর্তনধারা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ৪-৫ এপ্রিল।
সংবর্ধনা : বাংলা বিদ্যা সম্মিলনী (কলিকাতা) কর্তৃক 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষক' রূপে সল্টলেক স্টেডিয়ামে প্রদত্ত সংবর্ধনা, ৩০ এপ্রিল।
সংগঠন : মাস্টারদা সূর্যসেন জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন পরিষদ।
সভাপতি, শহীদ বিপ্লবী কমরেড সিরাজ সিকদারের অর্ধশত জন্মবার্ষিকী উদযাপন কমিটি,গঠিত ৬ আগস্ট ১৯৯৪।
গ্রন্থ : প্রগতির বাধা ও পন্থা, বইমেলা ১৯৯৪, প্রচ্ছদ এস. জি. দস্তগীর, পৃষ্ঠা ১৫২, মূল্য ৯৫ টাকা, সন্দেশ, ১৬ আজিজ মার্কেট, ঢাকা।
এ শতকে আমাদের জীবনধারার রূপরেখা, ডিসেম্বর ১৯৯৪, প্রচ্ছদ জাফর ইকবাল, পৃষ্ঠা ১২০, মূল্য ৭০ টাকা, চার্বাক, ৪৯ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা।
সম্পাদনা, শাহজালাল-মধুমালা উপাখ্যান, সতেরো শতকের কবি মুকুল ওর্ফে মঙ্গল বিরচিত, সাহিত্য পত্রিকা, কার্তিক ১৪০২, ঊনচল্লিশ বর্ষ সংখ্যা-১, পৃ. ১১৮, বাংলা বিভাগ, ঢাবি, ঢাকা।
রেজওয়ান শাহ উপাখ্যান, কবি শমশের আলী বিরচিত, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৪০২, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৩, পৃ. ১-৪৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নসিবনামা, সতেরো শতকের রোসাঙ্গরাজ্যের কবি মরদান রচিত, সাহিত্য পত্রিকা, ঊনচল্লিশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪০২, পৃ. ১৪৭-২২৪, বাংলা বিভাগ, ঢাবি, ঢাকা।
সাক্ষাৎকার : সেবা, ৩ এপ্রিল; সাপ্তাহিক বাংলাবার্তা, ৪ মে; দৈনিক প্রতিদিন (কলকাতা), ৫ মে; দৈনিক আজকাল, ২৯ মে, মধুময় পাল; অনন্যা, ১৫ আগস্ট।

১৯৯৫

১১ মার্চ : ঢাবির টিএসসি সেমিনার কক্ষে বিপ্লবী নারীমুক্তি আয়োজিত 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও নারীমুক্তির সমস্যা' শীর্ষক সেমিনারে বলেন, নারী দিবসের শিক্ষা হচ্ছে শ্রেণি আন্দোলন থেকে নারী আন্দোলনে আসা নয়। নারী আন্দোলনকে শ্রেণি আন্দোলনে নিয়ে যাওয়া। নারী দিবস পালনের বেড়াজাল থেকে এখনই বেরিয়ে আসতে হবে, তা হলেই প্রকৃত নারীমুক্তি আসবে।
১৮ মার্চ : এক বিবৃতিতে তাহের সংসদের পক্ষ থেকে বলেন, সম্প্রতি সেনাবাহিনীর কতিপয় সাবেক উচ্চপদস্থ অফিসারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি জিয়া হত্যা ও সাবেক জেনারেল মঞ্জুর হত্যার অভিযোগ এনে বিচার শুরু করা হয়েছে। হত্যা, ক্যু, ষড়যন্ত্রের রাজনীতি বন্ধ করা ও সেনাবাহিনীর উচ্চাভিলাষী চক্র কর্তৃক গণতন্ত্র হত্যা করার প্রক্রিয়া বন্ধ করার জন্য এ ধরনের বিচার অনুষ্ঠিত হলে তা দেশের জনগণ শুভ পদক্ষেপ হিসেবেই স্বাগত জানাবে। কিন্তু অবৈধ ক্ষমতা দখল তথা ক্যুদেতার বিচার ও সংবিধান লংঘনের বিচার না করে বিচ্ছিন্নভাবে শুধু সাধারণ হত্যাকাণ্ড হিসাবে একে গণ্য করে দেখানো ভাঁওতাবাজি ও বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক।
২৫ মার্চ : *মানবাধিকার ও বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের সমস্যা* শীর্ষক সেমিনারে বক্তৃতাকালে বলেন, শাসক ও সন্ত্রাসীদের দ্বারা সংখ্যালঘুরা যে পরিমাণ নির্যাতিত হচ্ছে

তার চাইতে বেশি নির্যাতিত হচ্ছে সংখ্যাগুরুরা। কিন্তু তারা তাদের অনুভূতির কথা প্রকাশ করতে পারছে না। ব্রাহ্মণদের ভয়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বেদ পড়তে পারত না। গান্ধীর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ রয়েছে, তিনি হিন্দুদের কাছে সেইন্ট। তিনি গীতা, বেদ পড়তেন এবং তাঁর আশ্রমে তা সকলকে পড়তে হত। তিনি আরও বলেন, সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু সমাধানের উপায় হচ্ছে, স্রষ্টা মানতে হবে, শাস্ত্র বাদ দিতে হবে; সেক্যুলার হতে হবে; কমিউনিস্ট হতে হবে; নাস্তিক হতে হবে; রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিহার করবেন ইত্যাদি।

২১ এপ্রিল : তিনি বলেন, শামসুর রাহমান একজন ধর্মনিরপেক্ষ কবি। তাই মৌলবাদীরা তাঁকে পছন্দ করে না। তিনি বলেন, মৌলবাদের উত্থান রুখতে সারা দেশে ফ্রি থিংকার সোসাইটি গড়ে তুলতে হবে। অসন্ত্রাসী পদ্ধতিতে মৌলবাদীদের ঘায়েল করার জন্য মুক্ত চিন্তার প্রকাশকে উৎসাহিত করতে হবে।

১৫ জুন : ঢাবি ছাত্র ঐক্য ফোরামের ১৬তম জাতীয় কাউন্সিলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন আহমদ শরীফ। তিনি বলেন, আমাদের অন্ধ করে রাখার যে ধারা বৃটিশ আমল থেকে চলছিল সে ধারা আজও বর্তমান।

২৩ জুলাই : শনিবার বিকালে টিএসসি মিলনায়তনে স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘ আয়োজিত 'এনজিওদের নির্বাচন ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে সভাপতি হিসাবে তিনি বলেন, ঢাবির অর্ধেক শিক্ষক মৌলাবাদী, বাকি অর্ধেক বিএনপি ও আওয়ামী লীগের। এই শিক্ষকরা বর্তমানে বেচাকেনার মাল। তিনি বলেন, কাশ্মীরে যখন নরহত্যা হয়, বসনিয়ায় মুসলমানের উপর যখন হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন চলে, মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হয় তখন মৌলবাদীদের চেতনা জাগে না, শুধু বাবরী মসজিদ ভাঙলে তাদের মধ্যে ইসলামী জোশ জেগে ওঠে।

৫ আগস্ট : ঢাবি ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে 'এঙ্গেলস মৃত্যুশতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি' এক সেমিনারের আয়োজন করে। ড. আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ড. সাইদুর রহমান, ডাঃ রিয়াজুর রহমান, বশীর আলহেলাল, ডাঃ টি. আলী, আব্দুল মতিন খান, আব্দুল মান্নান প্রমুখ বক্তৃতা করেন। ড. আহমদ শরীফ বলেন, এঙ্গেলস মার্কসের চেয়ে ১২ বছর বেশি বেঁচে ছিলেন। এই ১২ বছরে মার্কসবাদকে পূর্ণতা দান করে আমাদের কৃতজ্ঞ করেছেন। তিনি আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একদল বিএনপির, একদল জামাতের এবং একদল আওয়ামী লীগের কিন্তু জনগণের পক্ষে কেউ নেই। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্তির পর এখন কমিউনিস্টদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না; তিনি কয়েক জনের ও দলের নাম উল্লেখ করে বলেন, এসব সাচ্চা কমিউনিস্টদের এমনই ঈমানের জোর যে তারা এদল-ওদলে ঢুকে পড়েছেন। ইদানীং খাঁটি বাঙালিও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ বাঙালি মুসলমান আবার কেউ বাঙালি হিন্দু। স্বয়ং শেখ হাসিনা নিজেকে বাঙালি মুসলমান প্রমাণ করার জন্য দুই দুবার হজ্ব পালন করলেন।

২৮ আগস্ট : ঢাবি টিএসসি সেমিনার কক্ষে স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘের উদ্যোগে 'সমস্যা জর্জরিত দেশ ও সমাজের মুক্তির পথ' শীর্ষক আলোচনাসভায় সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, দেশে রাজনীতিবিদদের চরিত্রে দূষণ রয়েছে। সঠিক নেতৃত্ব দেবার কোনো লোক

নেই। আলোচনায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন কাজী নূরউজ্জামান। আলোচনা করেন বদরুদ্দীন উমর, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক ও হায়দার আকবর খান রনো।

২৩ সেপ্টেম্বর : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক পরিষদের 'বিশিষ্ট সদস্য' নির্বাচিত।

২৪ সেপ্টেম্বর : শনিবার বিকালে টিএসসি মিলনায়তনে মাও সে তুং স্মৃতি উদযাপন কমিটি আয়োজিত মাও সে তুং স্মরণসভায় সভাপতির বক্তৃতায় তিনি বলেন, ধর্মীয় কুয়াশার মধ্যে আমরা আজ আচ্ছন্ন। পাথরের দেবতা তাই দুধ খাচ্ছে।

১০ অক্টোবর : দৈনিক খবর : 'এই সংকট ক্ষমতালোভী দুটি দলের সংকট।' দৈনিক জনকণ্ঠ : '২ লাখ অরাজক রাজনীতিকের হাত থেকে ১২ কোটি লোককে মুক্ত করার সময় এসেছে।' বাংলাবাজার পত্রিকা : 'মুষ্টিমেয় চালাক অসাধু লোক ছাড়া জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি।' দৈনিক সমাচার : একাত্তরের মতো আর একটি রণাঙ্গন চাই।' দৈনিক ইনকিলাব : 'রাজনীতির সাথে জনগণের সম্পর্ক নেই।' দৈনিক লাল সবুজ : সমাজ পরিবর্তনে একাত্তরের ন্যায় নতুন রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।' দৈনিক জনতা : 'জিয়া কৃত্রিম গণতন্ত্র চালু করেছিলেন, এখনও তা চলছে।' ভোরের কাগজ : 'স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘের ১৪ দফা দাবি পেশ।' দৈনিক দিনকাল : 'বানানো নেতৃত্বে দেশ চলছে '৪৭ সাল থেকে।' দৈনিক আজকের প্রত্যাশা : 'জনসেবকের পরিচয় দিয়ে রাজনীতিকরা শোষকের ভূমিকাই পালন করেছে।' The New Nation : 'People have no link with present political crisis.' Bangladesh Observer : Political situation dangerous.'

স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বলেছেন, নির্বাচনের দুই বছর বাকি থাকতেই ক্ষমতায় যাবার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। অথচ সাধারণ মানুষের কাছে এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। জাতীয় প্রেসক্লাবে স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘের নেতৃবৃন্দ সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘের ১৪ দফা 'কর্মসূচী' ঘোষণা করেন।

৭ নভেম্বর : কর্নেল তাহের সংসদ এক আলোচনাসভার আয়োজন করে টিএসসি সেমিনার কক্ষে। আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে তিনি বলেন, এ দেশের রাজনীতিবিদদের চারিত্রিক উন্নতি হয়নি, তাই দেশের আজ বারোটা বেজে গেছে।

২৪ নভেম্বর : ১৬ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কবি ও লেখক অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের *নারী* গ্রন্থকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এক বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, এটা নাগরিক ও লেখকের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারে একটি হস্তক্ষেপ। বিবৃতিতে অন্যান্যের মধ্যে স্বাক্ষর করেন প্রফেসর আহমদ শরীফ, প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ড. রঙ্গলাল সেন, কবি শামসুর রাহমান, বশীর আলহেলাল, কবি রফিক আজাদ প্রমুখ।

৮ ডিসেম্বর : ড. আহমদ শরীফ বলেন, রাজনৈতিক ক্ষমতার লক্ষ্যেই সরকার ও বিরোধী দল পরস্পর ক্রমশ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে। এর সঙ্গে জনগণের প্রকৃত স্বার্থের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে আন্দোলনের মুখে সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেই বলে আমার ধারণা।

২৩ ডিসেম্বর : দৈনিক বাংলা : বাংলাদেশের বাম আন্দোলনের প্রবাদপুরুষ আবদুল হকের (তিনি ২২-১২-৯৫ রাত ১০.৪৫ মিনিটে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন) মৃত্যুতে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এক সভায় তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি গঠিত হয়। উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন ড. আহমদ শরীফ, বদরুদ্দীন উমর, বিনোদ দাসগুপ্ত, আবদুল মতিন খান, ড. আকমল হোসেন, প্রতাপউদ্দীন আহমেদ, সালাহউদ্দীন আহমেদ প্রমুখ।

২৭ ডিসেম্বর : দৈনিক জনকণ্ঠ : হাজার হাজার পার্টিকর্মী ও শোকার্ত মানুষ আন্তর্জাতিক সঙ্গীত গেয়ে লাল সালাম জানিয়ে প্রয়াত বিপ্লবী কমিউনিস্ট নেতা আবদুল হকের প্রতি তাঁদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। বেলা আড়াইটায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ এম এ করিমের সভাপতিত্বে এই সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে ড. আহমদ শরীফ, অধ্যাপক বদরুদ্দীন উমর, অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক প্রমুখ বক্তৃতা করেন। আহমদ শরীফ বলেন, আবদুল হকের অনন্য ব্যক্তিত্ব আমাদের চিরদিন অনুপ্রাণিত করবে।

সম্মাননা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত, ২৩ সেপ্টেম্বর।

উৎসর্গকৃত গ্রন্থ : ঘরে ফেরা, আমিনা মাহমুদ; কান পেতে রই, ইন্দু সাহা; ডিরোজিও : জীবন ও সাহিত্য, শফিউদ্দীন আহমদ।

সংগঠন : সভাপতি, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস মৃত্যুশতবর্ষ উদযাপন কমিটি।

গ্রন্থ : সময়-সমাজ-মানুষ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, প্রচ্ছদ প্রবীর সেন, পৃষ্ঠা ১৫৯, মূল্য ৮০ টাকা, বিদ্যাপ্রকাশ, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা।

দেশ-কাল-জীবনের দাবি ও সাক্ষ্য, ১৯৯৫, প্রকাশক : মোঃ শাহ আলম শান্তি, জার্মানি, পৃষ্ঠা ১০১, মূল্য ৯০ টাকা, ঢাকা।

সাক্ষাৎকার : খবরের কাগজ, ১২ সেপ্টেম্বর; আজকের কাগজ, ১৬ নভেম্বর; আজকের কাগজ, ৮ ডিসেম্বর।

১৯ মে : তিনি নিম্নবর্ণিত অসিয়তনামা তার প্যাডে লিপিবদ্ধ করেন :

আহমদ শরীফ
প্রাক্তন অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বাড়ি ২৫-বি, সড়ক-১, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৫ ॥ টেলিফোন ঃ ৫০৩৩৯৭

॥ অসিয়তনামা ॥

আমি সুস্থ শারীরিক ও সুস্থ মানসিক অবস্থায় আমার দৃঢ় সঙ্কল্প বা অঙ্গীকার স্থির সিদ্ধান্ত রূপে এখানে পরিব্যক্ত করছি।

আমার মৃত্যুর পরে আমার মৃতদেহ চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের কাজে ব্যবহারের জন্যে ঢাকার ধানমণ্ডীস্থ বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে অর্পণ করতে চাই।

আমার এ বাঞ্ছার বাস্তবায়নে আমি আমার সন্তানদের ও আত্মীয়স্বজনদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি। চক্ষুদান ও রক্তদান তো চালুই হয়েছে। চক্ষু শ্রেষ্ঠ প্রত্যঙ্গ আর রক্ত হচ্ছে

প্রাণপ্রতীক। কাজেই গোটা অঙ্গ কবরে কীটের খাদ্য হওয়ার চেয়ে মানুষের কাজে লাগাইতো বাঞ্ছনীয়।

আহমদ শরীফ
১৯.৫.৯৫

স্বাক্ষর
সাক্ষী

১. আবদুল মতিন খান, অবসরপ্রাপ্ত উপসচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার। বাড়ি-২, সড়ক-৫, ব্লক-এফ, সেকশন-২, মীরপুর, ঢাকা-১২১৬।

২. আব্দুল মান্নান, অবসরপ্রাপ্ত সহকারী সচিব, ২৩, সিদ্ধেশ্বরী রোড, ঢাকা-১২১৭।
৩. সালেহা শরীফ

১৯৯৬

৩ জানুয়ারি : তিনি বলেন, বুর্জোয়া দলগুলো থেকে যারাই সংসদে আসুক না কেন তারা কেউ জনগণের বন্ধু হবে না। তিনি গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউতে সিরাজ সিকদারের ২১তম হত্যাবার্ষিকী উপলক্ষে মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন কমিটি আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন।

৬ জানুয়ারি : দৈনিক বাংলা : বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা আবদুল হক স্মরণে অনুষ্ঠিত শোকসভায় তিনি বলেন, আদর্শহীন, চরিত্রহীন রাজনীতিবিদে ভরা এই দেশে আবদুল হকের মত লোককে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারা যায় না। তিনি আজীবন একই আদর্শে অবিচল ছিলেন।

১৩ ফেব্রুয়ারি : অধ্যাপক আহমদ শরীফের ৭৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 'আচার্য আহমদ শরীফ' শিরোনামে জনাব আবুল কাসেম ফজলুল হক একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। 'ড. আহমদ শরীফ, মনন ও প্রতিবাদী বহির্বৃত্ত' শিরোনামে ড. প্রথমা রায় মণ্ডল একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধ দু'টি এ দিন জনকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

২৩ এপ্রিল : ভোরের কাগজ, দৈনিক খবর : চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ ও জালালাবাদ পাহাড় যুদ্ধের ৬৬ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২২-৪-৯৬ তারিখে মাস্টারদা সূর্যসেন পরিষদ এক আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ঢাবি ছাত্র শিক্ষক মিলনায়তনে বিচারপতি দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ড. আহমদ শরীফ, সৈয়দ হাসান ইমাম, আর এন দত্তগুপ্ত, অধ্যাপক আবদুল মান্নান প্রমুখ। আহমদ শরীফ বলেন, স্বদেশী, স্বজাতি, স্বধর্মী রাজা হলেও মানুষ স্বাধীন হয় না। শোষিত-বঞ্চিত গণমানুষের মুক্তি হল স্বাধীনতা।

৫ সেপ্টেম্বর : দৈনিক খবর : স্বদেশ চিন্তার সঙ্ঘের সভাপতি হিসেবে এক বিবৃতিতে বলেন, গোটা তৃতীয় বিশ্বের স্বঘোষিত অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক মার্কিন সরকারের অযাচিত নজরদারির, খবরদারির ও তদারকির জুলুমে মজলুম বিশ্ব আজ দুঃসহ যন্ত্রণাগ্রস্ত। ইরাক ও সাদ্দাম দুই ভিন্ন সত্তা। সাদ্দামকে উৎখাত করার লক্ষ্যে কথায় কথায় নানা তুচ্ছ অজুহাতে ইরাকী জনগণের জানমালের উপর হামলাকে আমরা

দানবিক বলেই মনে করি। বিশ্বের দুস্থ মানবতার স্বঘোষিত ত্রাণকর্তা মার্কিন সরকার ফিলিপাইনে সোরোদের, মায়ানমারে কারেনদের, ভারতে কাশ্মীরীদের, রাশিয়ায় চেচেনদের, বুরুন্ডি-রুয়ান্ডায় তুতসী হুতুদের রক্ষার জন্য এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা ভাবে না। আমরা মার্কিন সরকারের হামলার নিন্দা করছি এবং প্রতিকারের, প্রতিবাদের ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা করার জন্য জাতিসংঘের কাছে দাবি জানাচ্ছি।

৫ অক্টোবর : আজকের কাগজ : রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধের লক্ষ্যে তথাকথিত ছাত্ররাজনীতি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার পরামর্শ দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ড. আহমদ শরীফ বলেন, ছাত্রদের রাজনীতি করার অধিকার হল নাগরিক অধিকার। তবে কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গ দল হিসেবে অথবা বেতনভুক গুণ্ডা হিসেবে ছাত্রসমাজের কাজ করা উচিত নয়। জাতীয় প্রয়োজনে ছাত্ররা সভা করবে, আন্দোলন করবে। মিছিল করবে। প্রতিবাদ করবে। তাই ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করা উচিত হবে না। বরং আইন করে রাজনৈতিক দলের অঙ্গ দল হিসেবে ছাত্রদের ব্যবহার প্রক্রিয়া প্রতিহত করতে হবে।

১৬ অক্টোবর : বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ পরিচালিত সপ্তদশ পাঠচক্রে মূল বক্তা হিসেবে তিনি পৌরাণিক বিশ্বাস সংস্কারের পুনঃপ্রচার ও এর কুফল বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

১৮ নভেম্বর : মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর ২০তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষে এক আলোচনাসভায় তিনি বলেন, এই চরিত্রহীনের দেশে একমাত্র ভাসানীই চরিত্র রক্ষা করে জনগণের একজন হয়ে জনগণের জন্য কাজ করে গেছেন। ভাসানী কখনো ক্ষমতার জন্য মন্ত্রী, এমপি হওয়ার জন্য রাজনীতি করেননি। নিজের জীবনে প্রচণ্ডভাবে ধার্মিক হয়েও ভাসানী কখনো ধর্মের নামে অন্যকে প্রভাবিত করেননি।

২২ ডিসেম্বর : বিকালে বি বি এভিনিউ চত্বরে কমরেড আবদুল হকের ১ম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত জনসভায় তিনি বলেন, প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা কমরেড আবদুল হক বিপ্লবী আদর্শে অটল ছিলেন। গণমানুষের সংগ্রামে তিনি আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নতুন করে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য শ্রমিক-কৃষককে অঙ্গীকার করতে হবে।

উৎসর্গকৃত গ্রন্থ : বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবী প্রগতি ও প্রতিক্রিয়া দ্বন্দ্ব, ড. প্রথমা রায় মণ্ডল; বাঙলা বানান রীতি ও শুদ্ধিকরণ, কালাম মাহমুদ; জন্মের উপসংহার, শফিকুল হক স্বপন; বিপন্নতা প্রতিদিন, আ. উ. এ. সিরাজউদল্লা; মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য, সেলিম আল দীন।

সম্পাদনা : হাজার মসায়েল ও নূরনামা, রোসাঙ্গ কবি আবদুল করিম খোন্দকার বিরচিত, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৪, পৃ. ১-৬৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুসার সাওয়াল, নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত, সাহিত্য পত্রিকা, ফাল্গুন ১৪০৪, একচল্লিশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ. ৭১-১২৫, বাংলা বিভাগ, ঢাবি, ঢাকা।

শরীয়তনামা, নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৪০৪, পৃ. ১-৫১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আহমদ শরীফ বিষয়ক গ্রন্থ : 'আহমদ শরীফ : নির্মোহ চিন্তার প্রতিকৃতি', রচয়িতা প্রথমা রায় মণ্ডল, প্রকাশ।

সাক্ষাৎকার : আজকের কাগজ, ১৫ জানুয়ারি; আজকের কাগজ, ৮ ফেব্রুয়ারি; ভোরের কাগজ, ২৫ মার্চ; আজকের কাগজ, ১৫ অক্টোবর।

৩১ ডিসেম্বর : মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এম আফজালুর রহমান-এর নিকট হলফনামা প্রদান করেন :

হলফনামা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রাক্তন প্রফেসর আমি ডক্টর আহমদ শরীফ, পিতা-মৃত আবদুল আজিজ, স্বেচ্ছায় শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থাবস্থায় আমার মরণোত্তর দেহ বা লাশ ধানমন্ডিস্থ বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ মর্গে শিক্ষার্থীদের অ্যানাটমি ফিজিওলজি ইত্যাদি শেখার কাজে লাগবে জেনে বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পণ করার সংকল্প গ্রহণ করেছি। এ বিষয়ে আমার স্ত্রীর ও পুত্রগণের সম্মতি রয়েছে। কাজেই মৃত্যুর পরেই আমার মৃতদেহ উক্ত কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে অর্পণ করার জন্যে আমার স্ত্রীকে ও পুত্রদের নির্দেশ দিচ্ছি। আমার জানাজার প্রয়োজন নেই।

আহমদ শরীফ
৩১.১২.৯৬
পিতা-মৃত আবদুল আজিজ
(আদি নিবাস গ্রাম-সুচক্রদণ্ডী, থানা-পটিয়া,
জিলা-চট্টগ্রাম) বাড়ি নম্বর-২৫/বি, সড়ক-১,
ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৫।

স্বাক্ষর
এম. আফজালুর রহমান
মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট
ঢাকা

যাহেদ করিম
এডভোকেট
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
বাড়ী-২৫/বি, সড়ক-১
ধানমন্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৫।

১৯৯৭

২ জানুয়ারি : পল্টন মোড়ে শহীদ বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিক স্মৃতি সংসদ আয়োজিত কমরেড সিরাজ শিকদারের ২২তম মৃত্যুবার্ষিকীর আলোচনাসভায় সিরাজ শিকদার হত্যার শোককে শক্তিতে পরিণত করে মেহনতী মানুষের মুক্তির আন্দোলন এবং বর্তমান সরকারকে উৎখাত করতে শ্রমিক কর্মজীবী এবং সর্বহারা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবার জানান।

৮ জানুয়ারি : কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বাংলাদেশ লেখক শিবির কর্তৃক আয়োজিত স্মরণসভায় বলেন, আখতারুজ্জামান নামের অর্থ জামানার নক্ষত্র। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস আমাদের সাহিত্যাকাশে নক্ষত্রের মতই। এই অর্থ নিয়ে তিনি বেঁচে থাকবেন।

১৩ ফেব্রুয়ারি : অধ্যাপক আহমদ শরীফের ৭৭তম জন্মদিন পালিত হয়। তাঁর বাসভবনে অনুরাগীরা সংক্ষিপ্ত এক আয়োজনের মাধ্যমে তাঁকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত

করেন। তাঁর বাসভবনেই বিকেল ৪-৩০ মিনিটে জন্মদিন পালন শুরু হয়। ফুলের তোড়া হাতে বিপুল সংখ্যক অনুরাগী তাঁর পরিবারের সদস্যদের সাথেই তাঁকে অভিনন্দন জানান। ৭৭তম জন্মতিথির এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদগ্ধ অনুরাগী আহমদ শরীফের জীবন ও কর্মের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করে বক্তব্য রাখেন। তাঁরা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য গবেষণায় আহমদ শরীফের কীর্তির কথা উল্লেখ করেন। বক্তারা আহমদ শরীফকে একজন আধুনিক মানবতাবাদী ও একই সাথে বিদ্রোহী এবং আপোসহীন ব্যক্তি হিসাবে অভিহিত করেন। অনুষ্ঠানে আহমদ শরীফ নিজেকে এক সাধারণ মানুষ হিসাবে দাবি করেন। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, কবি সাযযাদ কাদির, সাহিত্যিক মাহবুব তালুকদার, বশীর আলহেলাল, শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, অধ্যাপক আহমদ কবির, বাসদ নেতা খালেকুজ্জামান ভূঞা প্রমুখ। অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির ভাষণে তিনি শিক্ষক হিসেবে, চিন্তাবিদ হিসেবে এবং সচেতন নাগরিক হিসেবে অধ্যাপক আহমদ শরীফের অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্ণনা করেন। এছাড়াও বাংলা একাডেমী, উন্মেষ এবং বিজ্ঞান চেতনা পরিষদসহ কয়েকটি সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাঁর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

১৪ মার্চ : জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত স্মরণসভায় মরহুম কৃষকনেতা আবদুস সাত্তার-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে আহমদ শরীফ বলেন, '৭১ সালে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এদেশে শোষিত বঞ্চিত নিরন্ন সাধরণ মানুষের প্রত্যাশিত মুক্তি হয়নি। মুক্তি হয়েছে দেশী শাসক, ব্যবসায়ী, আমলা আর সামরিক অবসরপ্রাপ্তদের।

১৮ মে : কান্দুপট্টি পতিতালয় থেকে পতিতাদের উচ্ছেদ প্রসঙ্গে স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘের বিবৃতিতে বলা হয়, সম্প্রতি ঢাকা মহানগরীর কান্দুপট্টি পতিতালয় থেকে কয়েক শ' পতিতাকে উৎখাত করে অনিশ্চিত জীবনের মধ্যে নিক্ষেপ করার ঘটনায় আমরা উদ্বিগ্ন। বিবৃতিতে পতিতাদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার দাবি জানানো হয়।

১ আগস্ট : চারু মজুমদারের ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গণসংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে আয়োজিত সভায় তিনি বলেন, আমাদের প্রথম ও প্রধান শত্রু হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ।

১২ সেপ্টেম্বর : জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র মিলনায়তনের গণসংস্কৃতি পরিষদ আয়োজিত 'মাও সে তুং ও নয়া গণতন্ত্র' শীর্ষক আলোচনাসভায় তিনি কমিউনিস্টদের কীর্তিকলাপে ক্ষোভ প্রকাশ করে তাদের উদ্দেশে বলেন, মার্ক্সবাদ, লেনিনবাদ সম্পর্কে আপনারা যতই বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন, আপনাদের মধ্যে ততই বিভাজন বাড়ছে। তিনি বলেন, নিজেরা সংঘবদ্ধ হয়ে মানুষকে দলে ভেড়ান, যত বেশি লোক কাছে ভিড়বে ততই সফলতা আসবে। কারণ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা দ্বারা মানুষের স্বাধিকার অর্জন সম্ভব নয়। এ জন্য চাই মানবিক বন্ধন। তা না হলে সারা জীবন বিপ্লবই করতে হবে। সাফল্য আসবে না।

২১ সেপ্টেম্বর : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে তরুণ গবেষক মুনীর মোর্শেদের 'সিরাজ শিকদার ও পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি' শীর্ষক গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে আহমদ শরীফ বলেন,

আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের কথা বললেও মুক্তিযুদ্ধের জনক তাজউদ্দীনের প্রাপ্য সম্মান তারা দেয় না।

১০ অক্টোবর : তিনি বিটিভি সম্পর্কে বলেন, মিথ্যা কথা, কটূক্তি এসব শিখতে হলে বিটিভি দেখতে হবে। বিটিভি কোনো শিক্ষিত মানুষের দেখবার পর্দা নয়। এটি হল মারামারি ও লুটোপুটির বাক্স।

২১ নভেম্বর : মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর ২১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গণসংস্কৃতি পরিষদ আয়োজিত জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি বলেন, মওলানা ভাসানী এমন একজন প্রতিভা ছিলেন যিনি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। সমাজের অনেক গুণী প্রতিভাধরেরাও শিক্ষিত ছিলেন না।

২৯ নভেম্বর : ভাষাসৈনিক আবদুল মতিন চিকিৎসা সহায়ক কমিটির আহবায়ক হিসেবে তিনি তাঁকে যাঁরা সাহায্য করেছে তাঁদের ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে সহায়তা করতে আগ্রহী ব্যক্তিদের এই কমিটির মাধ্যমে কিংবা সরাসরি তাঁর কাছে অর্থসাহায্য পাঠানোর আহবান জানিয়েছেন।

১৮ ডিসেম্বর : শান্তি চুক্তি বিষয়ে তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকজন গত ৫০ বছর ধরে নির্যাতিত, শোষিত এবং অবহেলিত হচ্ছিল। মাউন্ট ব্যাটেন মুসলমানদের জন্য যে আলাদা বসতভূমি তৈরি করেছিল সেখানে মুসলমান অধিবাসীহীন অঞ্চল হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে জুড়ে দিয়ে অন্যায় করেছিল তাদের প্রতি। পরে পাকিস্তান আমলে কাপ্তাই ব্যারেজ তৈরি করে হাজার হাজার উপজাতি অধিবাসীকে নিঃস্ব করে দেওয়া হয়েছিল। '৭২ সালের সরকার সেখানে মুসলমান অধিবাসীদের বসতি স্থাপন করে উপজাতিদের পাতের ভাত, ভিটির মাটি দখল করে নিয়েছিল। '৭৬ সালে একইভাবে ওদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয় মুসলিম অধিবাসীদের। আজকে এই শান্তি চুক্তি হওয়ার ফলে ওরা আংশিকভাবে নির্যাতনমুক্ত হয়েছে বলে আমি খুবই আনন্দিত।

উৎসর্গকৃত গ্রন্থ : মুসলিম মধ্যবিত্তের রাজনীতি, বদিউজ্জামান; নানাবিধ প্রসঙ্গ, প্রতাপ মুখোপাধ্যায়।

ভূমিকা লিখিত গ্রন্থ : হিন্দু ধর্ম ও দর্শন, প্রেমরঞ্জন দেব; জীবন জিজ্ঞাসা : শৈল্পিক সংগ্রাম, এস. এম. নূর-উল-আলম।

বক্তৃতা : আরজ আলী মাতুব্বর স্মারক বক্তৃতা, বিষয় : যুক্তি, জিজ্ঞাসা ও চিন্তার মুক্তি, বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ, ঢাকা, ১০ এপ্রিল

গ্রন্থ : জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা, জানুয়ারি ১৯৯৭, প্রচ্ছদ মানবেন্দ্র সুর, পৃষ্ঠা ১০৪, মূল্য ৬০ টাকা, বিদ্যাপ্রকাশ, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা।

স্বদেশ চিন্তা, বইমেলা ১৯৯৭, প্রচ্ছদ মঈন আল কাসেম, পৃষ্ঠা ৯৫, মূল্য ৬৫ টাকা, সন্দেশ, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা।

উজান স্রোতে কিছু আষাঢ়ে চিন্তা, ফাল্গুন ১৪০৪, ফেব্রুয়ারি, প্রচ্ছদ মোমিন উদ্দীন খালেদ, পৃষ্ঠা ১১১, মূল্য ৮০ টাকা, মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা।

সাক্ষাৎকার : স্বাধীন বাংলা (কলকাতা), ৫ ফেব্রুয়ারি, কেশব মুখোপাধ্যায়; বাংলা বাজার পত্রিকা, ২৬ এপ্রিল ও ১ মে; মানবজমিন, ৬ জুলাই, মোহসিন আব্বাস ও রাজীব নূর; মুক্তকণ্ঠ, ১০ অক্টোবর; দৈনিক রিপোর্টার, ২১ জানুয়ারি।

১৯৯৮

২ জানুয়ারি : শহীদ সিরাজ শিকদারের ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় শোক দিবস পালনের আহবান জানিয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক আলোচনায় তিনি সিরাজ শিকদারের আত্মত্যাগ থেকে শিক্ষা নিয়ে জনগণের মুক্তি আন্দোলন শুরু করার আহবান জানান।

১২ ফেব্রুয়ারি : অন্বেষা পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, আমার মতে শিক্ষা হচ্ছে গোড়ার দিকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মনুষ্যসন্তানদের মধ্যে মানবিক গুণের বিকাশ সাধন। যাতে করে সমাজবদ্ধ জীবনে একটা ছেলে বা মেয়ের সম ও সহস্বার্থে, সংযমে, পরমত, পরকর্ম ও আচার সহিষ্ণুতায়, শ্রম ও পুণ্য বিনিময়ে সহযোগিতার অঙ্গীকারে, সমাজে শান্তিতে, স্বস্তিতে সুনাগরিক হিসেবে সহাবস্থান করতে পারে। কাজেই এজন্য প্রয়োজন সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা। আর উচ্চশিক্ষা হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় অবধি যুক্তি বুদ্ধি বিবেকের বিকাশ সাধনের সঙ্গে মূর্ত জীবনের প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার যন্ত্র প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের আধুনিকতম সর্বপ্রকার ধারণা আয়ত্তে আনা। যেহেতু একালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, স্রষ্টা ইউরোপ এবং ইংরেজি ভাষা সেখান থেকেই এসেছে, কাজেই উচ্চমাধ্যমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা দানের মাধ্যম হওয়া উচিত বিশ্বের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা অর্থাৎ ইংরেজি।

১৩ মার্চ : দৈনিক মানবজমিন : পশ্চিমবঙ্গের পাক্ষিক দেশ পত্রিকা থেকে বদরুদ্দীন উমরের 'বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস : অন্যমত' শীর্ষক লেখাটি বর্জন প্রসঙ্গে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। মানবজমিনের সাহিত্য সাময়িকী ৬ মার্চ ১৯৯৮ সংখ্যায় বদরুদ্দীন উমরের লেখাটি মুদ্রিত হলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী মহলে। প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ড. আহমদ শরীফ বলেন, বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস লেখার যথার্থ ব্যক্তি হচ্ছেন বদরুদ্দীন উমর। তিনি এ বিষয়ে ৩০ বছর ধরে গবেষণা করছেন। ৩ খণ্ডের বইও বের হয়েছে তার। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কোনো বয়স্ক রাজনৈতিক মুসলমান বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে চায়নি। তাঁদের ধারণা ছিল এটি হিন্দুদের ভাষা। ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে যখন বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নিয়ে কথা বলেন, তখন বাঙালি মুসলমানরা তাঁকে ধিক্কার দিয়েছিল। এমনকি মুসলমান ছাত্ররা প্রথমে এর বিরোধী ছিল। যখন দেখলো বাংলা রাষ্ট্রভাষা না হলে তারা চাকরির ক্ষেত্রে পিছিয়ে যাবে। তখনই তারা আন্দোলনে নামে।

৫ জুলাই : আজকের কাগজ : বাংলাদেশের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সোফা (স্ট্যাটাস অব ফোর্সেস এগ্রিমেন্ট) চুক্তির প্রতিবাদ জানিয়ে কয়েকজন শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও বিশিষ্ট নাগরিক গতকাল শনিবার এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেছেন, এ চুক্তির বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ দেশে সেনা ঘাঁটি করার অধিকার পাচ্ছে। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন ড. আহমদ শরীফ, শরীফউল্লাহ্ ভুঁইয়া, ড. মোফখ্খারুল ইসলাম, জাহাগীর

কবীর, গজনফর কবীর, যাহেদ করিম, বদরুল আলম. আব্দুল মান্নান, তপন কুমার দে, ওয়াহিদ জাবেদ প্রমুখ।

২৯ অক্টোবর : তিনি মামলা থেকে জামিন লাভ করেন।

১৬ নভেম্বর : টিএসসি সড়কদ্বীপে মওলানা ভাসানীর ৯ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শহীদ বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিক স্মৃতি সংসদ আয়োজিত আলোচনাসভায় ড. আহমদ শরীফ বলেন, 'ভাসানী নেই বলে আজ প্রতিবাদেরও কেউ নেই। ভাসানীর মৃত্যুর পর গণআন্দোলন হয়নি, হয়েছে ক্ষমতার ভাগাভাগি। মওলানা ছিলেন স্বৈরাচার বিরোধী। প্রতিক্রিয়ার অনুচররা মওলানা নাম ব্যবহারে দ্বিধা করছে না।

২৭ নভেম্বর : দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক প্রথম আলো, মুক্তকণ্ঠ, আজকের কাগজ, দৈনিক মানব জমিন, দৈনিক সংবাদ, বাংলাদেশ অবজারভার, ইনডিপেন্ডেন্ট : অধ্যাপক আহমদ শরীফের বিরুদ্ধে মামলার কার্যক্রম স্থগিত। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের মাননীয় বিচারপতি মোঃ সিরাজুল ইসলাম ও বিচারপতি বিজন কুমার দাস সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ ১৯৯২ সালের ২২ অক্টোবরে দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে, গোপালগঞ্জের সদর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ড. আহমদ শরীফের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া সংক্রান্ত মামলার কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেছেন। ড. আহমদ শরীফের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন ব্যারিস্টার মাসুদ রেজা, সোবহান এবং তাকে সহায়তা করেন এডভোকেট যাহেদ করিম ও এ্যাডভোকেট আনোয়ারুল আজিম খায়ের।

২৮ ডিসেম্বর : স্বদেশ চিন্তা সংঘের সভাপতি ড. আহমদ শরীফ মার্কিন ফ্যাসিবাদী শক্তি কর্তৃক ইরাকের জন সাধারণের উপর বোমা হামলার নিন্দা করেন।

উৎসর্গকৃত গ্রন্থ : অবক্ষয় ও উত্তরণ, আবুল কাসেম ফজলুল হক; যদ্যপি আমার গুরু, আহমদ ছফা; ঋষি, মঙ্গল চন্দ্র মণ্ডল; যে দাঁড়ায় মেঘের ছায়ায়, ওবায়দুল ইসলাম; এখন বৃষ্টিতে এসিড, বেলাল মোহাম্মদ; নির্বাচিত প্রবন্ধ, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ভূমিকা লিখিত গ্রন্থ : অবহেলিত জনগোষ্ঠীর মুক্তির প্রবক্তা-ড. আম্বেদকর, সুভাষ কান্তি বড়ুয়া।

গ্রন্থ : মানস মুকুরে বিম্বিত স্বদেশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, প্রচ্ছদ আনওয়ার ফারুক, পৃষ্ঠা ১১২, মূল্য ৬০ টাকা, প্রাচ্যবিদ্যা প্রকাশনী, ৮৫ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। **স্বদেশের স্বকালের সমাজের চালচিত্র,** চৈত্র ১৪০৪, এপ্রিল ১৯৯৮, প্রচ্ছদ আনওয়ার ফারুক, পৃষ্ঠা-৯৬, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

বিশ শতকে বাঙালী বিহগ দৃষ্টিতে তাদের রূপ-স্বরূপ, ক. আশ্বিন ১৪০৫, অক্টোবর ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ৬৪, মূল্য ৩২ টাকা, ঈক্ষণ, ১০৬ আজিজ সুপার মার্কেট (তিনতলা), শাহবাগ, ঢাকা, ২য় সংস্করণ ড. প্রথমা রায় মণ্ডল সম্পাদিত, ২৮ মার্চ ১৯৯৯, নামকরণ : বিশ শতকে বাঙালি, প্রচ্ছদ শ্রী তপন চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ১২০, মূল্য ৫০ টাকা, সম্প্রীতি, ৬ অ্যান্টনী বাগান লেন, কলিকাতা ৭০০০০৯।

১৯৯৯

২ জানুয়ারি : শহীদ বিপ্লবী নেতা সিরাজ শিকদারে মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শনিবার ফটো জার্নালিস্ট এ্যাসোসিয়েশন মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি বলেন,

হরতাল করার অধিকার গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকার। এই সরকার হরতাল বন্ধের জন্য হৈ চৈ শুরু করেছে। দেশে যে হারে বেকারত্ব সৃষ্টি হয়েছে বেকারদের সাথে নিয়ে এখনই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার উপযুক্ত সময়।

১১ ফেব্রুয়ারি : বামপন্থীদের ঐক্যপ্রয়াসে, জনগণের মুক্তির আন্দোলন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে ঢাকার সকল বাম নেতা ও বাম বুদ্ধিজীবীদের আহ্বান করেন নিজ বাসভবনে। এই সভায় তিনি এ ধরনের একটি সংগঠনের ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করে পাঠ করে শোনান, যার মূল কথা হচ্ছে : United we stand, divided we fall. তিনি বলেন, আমরা পরিণামে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মানব মুক্তিকামী প্রগতিশীল মার্কসবাদসম্মত চিন্তাশীল যুক্তিবাদী ব্যক্তিদের একটা সঙ্ঘ গঠন করতে চাই। এতে উপস্থিত ছিলেন বদরুদ্দীন উমর, রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রনো, নির্মল সেন, দিলীপ বড়ুয়া প্রমুখ। পরে এটা ১৯৯৯ সনের ১ জুলাই তারিখে 'সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী সংঘ' রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৩ ফেব্রুয়ারি : অনাড়ম্বর পরিবেশে তাঁর ৭৮তম জন্মদিন অনুষ্ঠান পালিত।

১৯ ফেব্রুয়ারি : ডেইলি স্টার পত্রিকায় জিয়াউল করিম গৃহীত একটি সাক্ষাৎকার মুদ্রিত হয়। এটি আগের দিন নেয়া হয়েছিল। এটিই ছিল ড. আহমদ শরীফ প্রদত্ত শেষ সাক্ষাৎকার।

২১ ফেব্রুয়ারি : শ্বশুরগৃহ থেকে আসা জিয়াফতের গোমাংস খান রাতে। সাধারণত তিনি গোমাংস খান না। কিন্তু ওই দিন তিনি বলেন, গরম কর, আমি খাব। রাতে মাংস খাওয়ায় কোনো অসুবিধা হয়নি।

২২ ফেব্রুয়ারি : দুপুরে আবার ঐ মাংস খান। খাওয়ার পর দুপুর ২টা থেকে প্রচণ্ড পেট ব্যথা শুরু হয়। বিকেল নাগাদ পেট ব্যথা কমে যায় কিন্তু দাস্ত শুরু হয়। এই সঙ্গে তাঁর হার্ট পেইন শুরু হয় কিন্তু বেশি ডায়াবেটিসের রোগীরা ব্যথা অনুভব করে কম। এখানে উল্লেখ্য, নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে তার বেশ অরুচি ছিল। রাত ৮টায় পার্শ্ববর্তী ক্লিনিকের এক তরুণ চিকিৎসক তাকে দেখেন এবং মন্তব্য করেন, মাসল পেইন। তেমন গুরুতর কিছু নয়।

২৩ ফেব্রুয়ারি : সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের হার্ট স্পেশালিস্ট ড. এম. এ. জামানকে দেখানোর জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়। আগের দিন হরতাল থাকায় ঐ দিন খুব ভিড় হবে এবং ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে অনেক সময় অপেক্ষা করতে হবে; তাছাড়া রাত ৮টার দিকে তিনি বলেন যে তিনি ভাল আছেন। ফলে ডাক্তারের কাছে আর যাওয়া হয়নি।

রাত ৯টা : রাতের খাবার খেলেন খুব কষ্ট করে। যেন রাতে ঘুম হয়।

রাত ১০টা : নাতি অভি খুবই অসুস্থ। তাঁকে বুকে নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে শুয়ে থাকেন। পৌরসভা নির্বাচন সম্পর্কে বিভিন্ন কথাবার্তা বলেন। ঐ দিন সারা দেশে পৌরসভা নির্বাচন চলছিল।

অভিকে কাজলের (জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ) কাছে দিয়ে বলেন স্বপনকে ডেকে দাও। কিন্তু স্বপনের বদলে আসেন তাঁর স্ত্রী নাসিমা। কাজল ও নাসিমা মিলে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমানোর আগে তিনি বলেন, কাল সকালে আমি পুরোপুরি ভাল হয়ে যাব।

রাত ১২ : কাজলের দরজা নক করে বলেন, বউমা একটি ঘুমের ওষুধ দাও। ঘুম আসছে না। ঘুমের ওষুধ নিয়ে চলে আসেন, সেটি খান। কিন্তু তার ঘুম আসেনি। তিনি জেগেই ছিলেন। অস্থির ছিলেন। কষ্ট পাচ্ছিলেন। কিন্তু কাউকে বিরক্ত করেননি।

২৪ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার দিবাগত ভোর ১-১৫ মিনিট : কাজলের দরজা নক করেন। তখন তাঁর বেশ শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। বেশ জোরে একটি ধমক দিয়ে বলেন, তুমি আমাকে কি ওষুধ দিলে যে এত কষ্ট হচ্ছে! তখন ঘাম হচ্ছিল।

ভোর ১-৩৫ মিনিট : ইতোমধ্যে সকলকে ডাকা হয়েছে। জেনে গেছে সকলে, হার্ট এটাক হয়েছে। দ্রুত হাসপাতালের পথে রওনা হন তারা। নিজেই দোতলা থেকে হেঁটে নিচে নামেন। নিজেই গাড়িতে ওঠেন। নেহাল গাড়ি চালাচ্ছিলেন। গাড়িতে ছিল আর কাজল, কাল্ত, স্বপন, আমজাদ। গাড়িতে যাওয়ার পথে কোনো কথা বলেননি। শুধু একবার বলেন, গ্লাসটা নামিয়ে দাও।

ভোর ১-৪০ মিনিট : ধানমন্ডি ২৭ নং সড়ক অতিক্রম করার সময় ঘড়ঘড় আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেল। কাজলের কাঁধে মাথা রেখে তিনি চলে গেলেন। হাসপাতালের ইমারজেন্সিতে নেওয়া হল। স্বপন, কান্ত তখনো বুঝতে পারেনি। ডাক্তাররা ৪০-৪৫ মিনিট আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। বললেন, আপনারা বড় দেরি করে ফেলেছেন। ওখান থেকে দুটি ফোন করেন কাজল। বাড়ির ৫ তলায় খালাশাশুড়িকে, তিনি ইউএনবির সাংবাদিক রাশেদ চৌধুরীকে (কাজলের খালাতো ভাই) সংবাদ দিলেন। নাট্যকার মামুনুর রশীদকে (কাজলের খালু) ফোন করা হল। ফেরার পথে কাজল এবং কান্ত ডেইলি স্টার অফিসে কয়েকজন সাংবাদিককে অনুরোধ করেন বিবিসিকে সংবাদটি পাঠানোর জন্যে। রেডিওকে সংবাদ দেয়া হয়। বিবিসি ১ ঘন্টার মধ্যেই যোগাযোগ করে। তারা বিভিন্ন তথ্য নেয়। বিভিন্ন জায়গায় খবর পাঠান কাজল। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ এক বাঙালির মৃত্যু ঘটেছে। বাঙালির ইতিহাসের অবিনির্মাতা মৃত্যুবরণ করেছেন। একজন মার্কসীয় ভাবরাজ্যের শ্রেয়োসন্ধানী বাঙালির মৃত্যু ঘটেছে। একজন পুরোদস্তুর জাগতিকতাবাদী মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। একজন শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক এবং শ্রেষ্ঠতম গবেষকের মৃত্যু ঘটেছে। পটিয়ার লেধু, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ আর বদিউন্নেসার প্রাণপ্রিয়, আবদুল আজিজ আর সিরাজ খাতুনের প্রাণপ্রিয়, সালেহা শরীফ-রেজভী-ফৈজি-স্বপন-কাজল-বেলী-নাসিমা-কান্ত-অভি-অর্চি-পান্থ এবং বাংলার অসংখ্য মানুষের প্রাণপ্রিয় মানুষটি আর নেই।

ভোট ৩টা : অ্যাম্বুলেন্সে তার মরদেহ বাসায় আনা হয়েছে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল থেকে।

ভোর ৪টা : শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের স্নেহাশীর্বাদপ্রাপ্ত অধ্যাপক সাঈদ-উর-রহমান, অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু জাফর, অধ্যাপক আহমদ কবীর, অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, অধ্যাপক মনসুর মুসা এলেন ২৫/বি নম্বর বাড়িতে। এলেন অধ্যাপক আহমদ শরীফের ভ্রাতুষ্পুত্র জাস্টিস ফজলুল করিম, ভ্রাতুষ্পুত্র বেদারউদ্দীন খায়ের এবং সাংবাদিক রাশেদ চৌধুরী। সন্ধানীকে খবর দেয়া হল কর্নিয়া গ্রহণের জন্যে। কিন্তু প্রথমবার আসার পথে শহীদ মিনারের সামনে হাইজ্যাকারের পাল্লায় পড়ে তারা আসতে পারলেন না।

ভোর ৪-৩০ মিনিট : রেডিও অফিসে পুনরায় সংবাদ পৌঁছানো হল। সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল থেকে আনা হল মৃত্যুর সনদপত্র।

ভোর ৬-৩০ মিনিট : বিবিসি থেকে সংবাদ প্রচার করা হল। একটি পুরনো সাক্ষাৎকারও প্রচার করা হল।

ভোর ৭-০০টা : ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ চক্ষু হাসপাতালের সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতির পক্ষ থেকে কম্পিউটার অপারেটর জাকির হোসেন অধ্যাপক আহমদ শরীফের কর্নিয়া দুটি গ্রহণ করেন।

ভোর ৭-০০টা : বাংলাদেশ বেতারে মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা হল।

পরপরই শুরু হল মানুষের ঢল। হরতাল থাকলেও মানুষ আসার কমতি ছিল না। ২৮ তারিখ পর্যন্ত সারা দেশ থেকে অনবরত মানুষ এসেছে ধানমন্ডি ১ নম্বর রোডের ২৫বি নম্বর বাড়িতে।

তাঁর কর্নিয়া দু'জনের চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়। এরা হলেন-হাফেজ খায়রুল আলম খোকন, গ্রাম-কয়কিয়া, থানা-কালকিনি, জেলা-মাদারীপুর। অন্যজন হলেন সাকির হোসেন, আবু হাসনাত রোড, ঢাকা। এরা কর্নিয়া সংযোজনের অপেক্ষায় শীর্ষ দুই তালিকাভুক্ত। কর্নিয়া কার চোখে সংযোজন করা হবে তা পূর্বনির্ধারিত না থাকলে অপেক্ষমাণ শীর্ষ তালিকাভুক্তদের সংযোজন করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজের জাতীয় চক্ষু বিভাগ ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. সৈয়দ মোদাসসের আলী, ড. হাসান শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং অরবিস-এর ড. লিভেরি এই সংযোজন (গ্রাফটিং অপারেশন) সম্পাদন করেন। কর্নিয়া সংযোজনের ফলে জনাব খায়রুল এবং জনাব শাকির এখন চক্ষুষ্মান।

সকাল ৮-০০ : গঠিত হল অধ্যাপক আহমদ শরীফের প্রয়াণে শোক পালনের জাতীয় কমিটি। এই কমিটির বিবরণ : আহবায়ক : লে. কর্নেল (অব) নূরুজ্জামান বীরউত্তম ও বদরুদ্দীন উমর, সদস্য সচিব : মামুনুর রশিদ, সদস্য-হাসান ফকরী, আবু ইউসুফ, আজিজ মেহের, মীর মোস্তফা আলী, কামাল লোহানী, রফিক আজাদ, শাহ আবদুর রউফ, মোহন রায়হান, সাইদুল হক, মুস্তাফা মজিদ, শফিক উজ জামান, মুনীর সিরাজ, সৈয়দ ফয়েজুর রহমান (অব), মুহম্মদ জালাল, হায়দার আকবর খান রনো, মহসিন শস্ত্রপাণি, কাজী মনজুর, মেসবাহ কামাল, টি. আলী, রাশেদ খান মেনন, মোহাম্মদ তৌহিদুল আনোয়ার, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ড. আহমেদ কামাল, ড. সাঈদ-উর-রহমান, মোহাম্মদ আবু জাফর, আবুল কাসেম ফজলুল হক, কে. এম. সাদ্ উদ্দিন, আহমদ কবির, মনিরুজ্জামান মিঞা, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, মনসুর মুসা, বেলাল চৌধুরী, দিলীপ বড়ুয়া, শাহ্ আলম শান্তি, এখ্লাস উদ্দিন আহ্মেদ, অঞ্জলি বিশ্বাস, জীয়েসা মুস্তাফা, নাজমুন নেছা, নাসরিন কোরাইশী, সেলিনা বেগম চৌধুরী, রোকেয়া হোসাইন কচি, সাহিরা নাজ, মাকসুদুল মান্নান, রফিকউল্লাহ খান, দুলাল ভৌমিক, ড. মুহাম্মদ সামাদ, আতিকুল হক চৌধুরী, আব্দুল মান্নান, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ফয়জুল হাকিম, কাজী এ. বি. এম. ইকবাল, জোনায়েদ সাকি, আবরার চৌধুরী, শওকত আলী, সমুদ্র গুপ্ত, সালাম সালেহ উদদীন, মনসুর হাবীব, তপন চক্রবর্তী, শাহজাহান ভূইয়া, অসীম সাহা, নওশের ইসলাম, লুৎফর রহমান সরকার, টিপু বিশ্বাস, গজন্ফর কবীর, হাবীবা খানম, রাহানা মাহ্মুদ, বিলকিস্ আলমামুন, খালেকুজ্জামান, আ. ফ. ম. মাহবুবুল হক, স্বপন সরকার, বি. এ. রশীদ, বশীর

আলহেলাল, আহমদ ছফা, নির্মল সেন, মোঃ আমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া, সুব্রত চৌধুরী, হাসান হাফিজুর রহমান সোহেল, জাকির হোসেন রাজু, নূরুল ইসলাম, বীণা শিকদার, নূরজাহান বেগম, ডা. মুশতাক হোসেন, মাহফুজ উল্লাহ্, রফিজ উল্লাহ্, ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, সন্‌জীদা খাতুন, আজাদ চৌধুরী, শাহাদত আলী, মুহম্মদ সেলিম, আশফাক-উল-আলম, আরেফিন সিদ্দিক, মোঃ আশরাফ আলী খান, সিরাজুল ইসলাম, ওবায়দুল ইসলাম, লায়েকা বশীর, শামসুল হক খোন্দকার, সিদ্দিকুর রহমান, ফকরুল আলম, ডা. রিয়াজুর রহমান, শফিউল আলম, দিদারুল আলম, মোঃ জহিরুল হক, মুনীর মোরশেদ, আনোয়ার হোসেন, মোঃ শহীদুল্লাহ্, মতিউর রহমান, আবদুর রব, সিরাজুল ইসলাম খান, অপু রোজারিও, ডা. মোহাম্মদ ফরিদ আহমদ, সুলতানা বেগম রেবু, জেসমিন বুলি, সৈয়দ শফিকুজ্জামান, আজিজুননিসা বেগম, খুশী কবির, মোঃ সাজাহান মিয়া, মোনায়েম সরকার, প্রফেসর আ. ব. ম. ফারুক, নাসির উদ্দীন ইউসুফ, কবীর খান।

সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচী :

১. কমিটির উদ্যোগে ২৮শে ফেব্রুয়ারি রবিবার বিকাল ৪টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গণজমায়েতে শ্রদ্ধা নিবেদন ও গণমিছিল।

২. কমিটির উদ্যোগে ৩রা মার্চ বুধবার বিকাল ৪টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জাতীয় শোকসভা।

চট্টগ্রামে গঠিত হল ড. আহমদ শরীফ নাগরিক শোকসভা কমিটি, চট্টগ্রাম: আহ্বায়ক : অধ্যাপক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, সদস্য সচিব : হেলাল উদ্দিন চৌধুরী, সদস্য : ডা. কামাল এ. খান, ড. অনুপম সেন, আবদুল্লাহ আল হারুন চৌধুরী, বিধান কৃষ্ণ সেন, মোখতার আহমদ, এ. কে. এম. এমদাদুল ইসলাম, অরুণ দাশগুপ্ত, ড. হামিদা বানু, অধ্যাপক চৌধুরী জহুরুল হক, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ হোসেন খান, আবুল মোমেন, ড. মাহবুবুল হক, মাহবুব হাসান, শফিউল আলম, কাজী জাফরুল ইসলাম, সুখেন্দু ভট্টাচার্য, রানা দাশগুপ্ত, আবুল কালাম আজাদ, নাসিরুদ্দিন চৌধুরী, বখতেয়ার নূর সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবুল মনসুর, ড. মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারী, ড. ইফতেখার উদ্দিন, আলহাজ এস. এম. জামাল উদ্দিন, আবু ছালেহ, মুহম্মদ ইদ্রিস, ডা. এ. কিউ. এম. সিরাজুল ইসলাম, আতাউল হাকিম, মহীবুল আজিজ, আবু সুফিয়ান, ফারুক ইকবাল, অঞ্জন কুমার সেন, নুরুল আমিন, আখতার কবীর চৌধুরী, ইন্দু নন্দন দত্ত, ডা. চন্দন দাশ, কাজী শাহজাহান, নুরজাহান খান, এম. এ. সালাম, প্রদীপ দেওয়ানজী, আহমেদ ইকবাল হায়দার, অভীক ওসমান, রঞ্জিত রতি, অধ্যাপক সৌমেন দাশ, অধ্যাপক ফাউজুল কবির, ইব্রাহীম হোসেন চৌধুরী বাবুল, সঞ্জীব বড়ুয়া, ম. সাইফুল আলম চৌধুরী, শেখ ইফতেখার সাইমুল চৌধুরী, আবু সাঈদ জুবেরী, মৃদুল গুহ, বিশ্বনাথ চৌধুরী, সোলায়মান খান, আবদুল হালিম দোভাষ, দেওয়ান মাকসুদ আহমদ, অলক ঘোষ, দীপক চৌধুরী, হোসাইন কবির, রাশেদ রউফ, আইরিন সাহা, দিলীপ ভদ্র, মফিজুর রহমান, পঞ্চানন চৌধুরী, অঞ্চল চৌধুরী, গোলাম কিবরিয়া, অশোক সেনগুপ্ত, ওমর কায়সার, বিশ্বজিত চৌধুরী, মুহাম্মদ ইসহাক চৌধুরী, সাথী দাশ, শাহীনুর সরওয়ার, শেখ শওকত ইকবাল চৌধুরী, মাশরুজ্জামান মুকুট, অসীম দাশ, অশোক

বড়ুয়া, তপন বড়ুয়া, আসিফ সিরাজ, কলিম সরওয়ার, রাশেদ হাসান, নীলুফার রহমান, ইন্দিরা চৌধুরী, নাজিমউদ্দিন শ্যামল, শিমুল সেন, শাহরিয়ার খালেদ, শাহ আলম, তৌহিদুল আলম, রমিজ আহমেদ, মোহাম্মদ আলী টিটু, আবদুল হাদি, তৌহিদুল আনোয়ার, সোহেল আনোয়ার, প্রণব চৌধুরী, শাহেদ ইমরান, সৌমেন রুদ্র, সুনীল ধর, শওকত আলী সেলিম, দীপেন চৌধুরী, মওলানা ইকবাল ইউসুফ, দেবাংশু হোর, মঈনুল শাওন, মাসুম চৌধুরী, মোহাম্মদ শাহজাহান, সৌমেন ধর, আহমেদ মুনির, রেজাউল করিম সুমন, শওকত বাঙালি, স্বপন সেন, মিলি চৌধুরী, শরীফা বুলবুল, অনুপ বিশ্বাস, সঞ্জিত বণিক, নজরুল ইসলাম মোস্তাফিজ, সুজিত ভট্টাচার্য দোলন।

দুপুর ১-৩০ মিনিট : পুত্র ড. নেহাল করিমের অনুরোধে তাদের আত্মীয় সামসুল কবীর খান অ্যাম্বুলেন্স আনালেন এবং বারডেমের মরচুয়ারিতে রাখলেন মরদেহ।

রাত ৮-০০টা : বাংলাদেশ টেলিভিশন সকাল ১০/১১টার সময় তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠানো মৃতদেহসহ পরিবারের অন্যান্যদের ধারণকৃত ছবি এবং মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করে। সম্ভবত ১৯৭৩ সনের ৮ই মে তারিখে বিটিভিতে রবীন্দ্র বিতর্ক শুরু করার পর এই প্রথম অধ্যাপক আহমদ শরীফ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবাদ প্রচার হল।

২৫ ফেব্রুয়ারি : ঢাকার সব দৈনিকের প্রথম পাতায় গুরুত্বসহকারে সংবাদ শিরোনাম প্রকাশ হয়। বিভিন্ন কাগজ শোক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে, বিভিন্ন ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান প্রকাশ ও প্রেরণ করে শোকবাণী, শোকবার্তা, শোক বিবৃতি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা শোকবাণী প্রেরণ করেন।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া শোকবাণী প্রেরণ করেন।

বহু সংগঠন এবং ব্যক্তি শোক প্রকাশ করে মরহুমের বাসভবনে যান এবং কাগজে বার্তা পাঠান। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক সমিতি ঢাবি, বাংলা একাডেমী, গণসংস্কৃতি পরিষদ, এসোসিয়েশন অব ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিজ ইন বাংলাদেশ (এডাব), বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, জাসদ, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, ভিসি-চবি, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি, বাসদ, বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, ঋষিজ শিল্পী গোষ্ঠী, সূর্যসেন পরিষদ, জাতীয় জাদুঘর, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, সাম্যবাদী দল, জাতীয় কবিতা পরিষদ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সতীর্থ একাত্তর, শিশু একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ছাত্র ফেডারেশন, ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক কমিটি, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট, কৃষক ও গ্রামীণ মজুর ফেডারেশন, চলচ্চিত্র পরিষদ, জাতীয় হিন্দু পরিষদ, কৃষক সমিতি, সমাজ চেতনা, পটিয়া সমিতি, স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘ, ক্ষেতমজুর সমিতি, নাগরিক কেন্দ্র, লেখক শিবির, ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক জোট, ছাত্র ফেডারেশন, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, মন্ত্রী জিল্লুর রহমান, এ. এস. এইচ. কে. সাদেক, রফিকুল ইসলাম, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, ওবায়দুল কাদের, রাশেদ মোশাররফ, আ. স. ম. আবদুর রব, জাতীয় জাদুঘর, মাস্টারদা সূর্যসেন পরিষদ, শিক্ষক সমিতি চবি, ভাষা সমিতি, চট্টগ্রাম

বিশ্ববিদ্যালয়, মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্যকারী কমিটি, কর্নেল তাহের সংসদ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ইতিহাস পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ফ্রন্ট, সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী নাগরিক কমিটি, বাংলা বিভাগ ঢাবি, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, হাজারীবাগ ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, সৃজন, কবি সুকান্ত স্মৃতি সংসদ, সূচনা অধ্যয়ন কেন্দ্র, বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, গণশিল্পী সংস্থা, শহীদ বিপ্লবী এবং দেশপ্রেমিক স্মৃতি সংসদ, শহীদ আসাদ পরিষদ, চারণ, প্রগতি সংস্কৃতি সংসদ, প্রাচ্য সাংস্কৃতিক আন্দোলন, শ্রমজীবী মুক্তি আন্দোলন, জাতীয় জনতা পার্টি, ঢাকাস্থ আকিয়ারা সমিতি, কালচারাল রিপোর্টার্স ফোরাম, বাংলাদেশ গণআজাদী লীগ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, গণতন্ত্রী পার্টি, ঢাবি সাংবাদিক সমিতি, বস্তি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি, বিপ্লবী নারী মুক্তি, বিপ্লবী ঐক্য ফ্রন্ট, প্রগতিশীল নারী আন্দোলন, বুধসন্ধ্যা, বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ ইত্যাদি। (এই তালিকা অসম্পূর্ণ এবং এতে কোনো রকম পর্যায়বিন্যাস করা হয়নি। তাছাড়া শোকবার্তা, শোকবাণী, শোক সংবাদ প্রকাশের তারিখ নির্বিশেষে এখানে ভুক্তি উল্লেখ করা হল। -স.)

২৫ ফেব্রুয়ারি : বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হল তাঁর মৃত্যু সংবাদ।

উৎসর্গকৃত গ্রন্থ : আমার জীবনস্মৃতি, মাহমুদ নুরুল হুদা; মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি স্মরণে, ইসরাইল খান; মওলানা ভাসানীর ভাষণ ও বিবৃতি, ড. সাঈদ-উর-রহমান।

ভূমিকা লিখিত গ্রন্থ : পলিটিক্স্ বনাম পলিট্রিক্স্, হাসান ফকরি।

গ্রন্থ : নির্বাচিত প্রবন্ধ, ফাল্গুন ১৪০৫, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, প্রচ্ছদ কাইয়ুম চৌধুরী, পৃষ্ঠা ২৯৫, মূল্য ২০০ টাকা, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

২৮ ফেব্রুয়ারি : রবিবার। হরতাল এবং সরকারী ছুটির কারণে মরদেহ হস্তান্তরের তারিখ পিছিয়ে দেয়া হয়েছিল। ঢাকার অধিকাংশ দৈনিকে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে আজ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে অধ্যাপক আহমদ শরীফের মরদেহ হস্তান্তর করা হবে এবং তাঁর প্রতি অন্তিম শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ পাওয়া যাবে।

শোক পালনের জাতীয় কমিটি সব কাজই সুসম্পন্ন করেছে। শহীদ মিনারের ৫টি মিনারের মধ্যে মাঝখানের ৩টি মিনারব্যাপী দীর্ঘ কালো কাপড়ে লেখা আছে :

বাধাই বাধা ছিন্ন করার প্রেরণা যোগায়।
ড. আহমদ শরীফ শ্রদ্ধা নিবেদন জাতীয় কমিটি।
আহমদ শরীফের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

বেদীর সবচেয়ে উঁচু বিশাল লাল চত্বরের মাঝখানে তার মরদেহ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। পূর্ব দিকের নিচের চত্বর থেকে বাঁশ দিয়ে নির্মিত অস্থায়ী দিকনির্দেশকের পাশ দিয়ে সারি বেঁধে যাবে মানুষ-পুষ্প, ভালবাসা, কান্না, শ্রদ্ধা আর আবেগ নিয়ে যাবে, তাকে কিছুটা দিয়ে যাবে, কিছুটা নিয়ে যাবে সাথে করে। শেষবার দর্শন করবে শুভ্র সমুজ্জ্বল ঐ মানুষটিকে।

দুপুর থেকে মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। একেবারে নিচের চত্বরে বসার ব্যবস্থা ছিল। একে একে সর্বস্তরের মানুষের আগমন ঘটেছিল। অনেকেরই হাতে ছিল পুষ্প, পুষ্পস্তবক, পুষ্পমাল্য। কর্মীদের হাতের এবং বুকের কাপড়ে সাঁটা ছিল ব্যাচ।

বিকেল ৩টা বেজে ১০ মিনিট : বারডেমের মরচুয়ারি থেকে তার মরদেহ বহনকারী বিশেষ যানটি যখন সাইরেন বাজিয়ে শহীদ মিনার চত্বরে এসে পৌঁছেছিল, শোক বিদ্যুৎবাহিত হয়েছিল। কান্না, ভালবাসা আর আবেগমথিত বিহ্বলতা কাটিয়ে তাকে রাখা হল পূর্বনির্দিষ্ট জায়গায়।

অধ্যাপক আহমদ শরীফের কন্যাপ্রতিম অধ্যাপক প্রথমা রায় মণ্ডলের পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠান শুরু হল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সারি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকল। সকল রকমের পেশাজীবী, সকল স্তরের মানুষ - যাদের কখনো এমনকি অনেকে প্রত্যাশাও করেননি তারাও আসলেন তাদের প্রিয় মানুষটির মরদেহ শেষবার দেখবার জন্য। শহীদ মিনার ভরে উঠল। শহীদ মিনার আমাদের জাতীয় ফুলদানি; সেই শহীদ মিনারে শোভা পাচ্ছে আমাদের একটি জাতীয় ফুল - অধ্যাপক আহমদ শরীফ।

শহীদ মিনারের পূর্ব পাশে মাইকে অধ্যাপক মেসবাহ কামাল এবং ফয়জুল হাকিম লালা ধারাভাষ্য দিচ্ছিলেন।

যারা শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন তাদের একটি তালিকা এখানে উল্লেখ করা হল : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, বিভিন্ন অনুষদের ডীন, সিন্ডিকেট সদস্য, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, বিভিন্ন বিভাগীয় চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, শিক্ষক সমিতি, ডিবেটিং সোসাইটি। বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, শিশু একাডেমী, ভাষা ইনস্টিটিউট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট, জাতীয় হিন্দু পরিষদ, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, জাতীয় কবিতা পরিষদ, বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘর, সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতি, লালমাটিয়া কলেজ বাংলা বিভাগ, স্বদেশ চিন্তা সঙ্ঘ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অধ্যাপক আহমদ শরীফের আড্ডায় অংশগ্রহণকারী অনুসারীবৃন্দ, অধ্যাপক আহমদ শরীফ জাতীয় শ্রদ্ধা নিবেদন কমিটি, বাংলাদেশ লেখক শিবির, বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি, শহীদ বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিক স্মৃতি সংসদ, কর্নেল তাহের সংসদ, ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক কমিটি, মাস্টারদা সূর্যসেন পরিষদ, স্বপন স্মৃতি পরিষদ, গ্রামীণ বুদ্ধিজীবী ফ্রন্ট, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতি, বাংলাদেশ নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও পুনর্বাসন পরিষদ, বাংলাদেশ রাইফেলস ক্লাব, জনইতিহাস চর্চা কেন্দ্র, পটিয়া সমিতি ঢাকা, চট্টগ্রাম সমিতি, শহীদ আসাদ পরিষদ, বস্তি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি। **রাজনৈতিক সংগঠন :** শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল, জাতীয় গণফ্রন্ট, জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল (এমএল) দীলিপ বড়ুয়া, বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল (এম এল) অজয় দত্ত, বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, বিপ্লবী ঐক্য ফ্রন্ট, গণআজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ), ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি, ইউপিডিএফ পিজিপি, ইউপিডিএফ পিসিপি, ইউপিডিএফ এইচডব্লিউএফ, পাহাড়ী গণপরিষদ, বাংলাদেশ আদিবাসী সমিতি, পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (খালেকুজ্জামান), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (আ. ফ. ম. মাহবুবুল হক)। **ছাত্র ও যুব সংগঠন :** বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন,

বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন, বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন, বাংলাদেশ যুব মৈত্রী, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী, বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলন, বিপ্লবী ছাত্র সংঘ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, সমাজবাদী ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র ঐক্য ফোরাম, জাতীয় ছাত্রদল, যুবলীগ, বঙ্গবন্ধু যুব পরিষদ, কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, সতীর্থ '৭১, প্রজন্ম '৭১, সামছুন্নাহার হল ছাত্রীবৃন্দ। **শ্রমিক দল** : অটোরিক্সা শ্রমিক মৈত্রী, বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন, ভাসমান শ্রমিক ইউনিয়ন, গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরাম, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন। **মহিলা দল** : প্রগতিশীল নারী আন্দোলন, বঙ্গবন্ধু মহিলা পরিষদ, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম, জাতীয় মহিলা পরিষদ, ভাসমান নারী শ্রমিক ইউনিয়ন, বিপ্লবী নারী মুক্তি, বাংলাদেশ কৃষাণী সভা। **এনজিও** : এডাব, গণসাহায্য সংস্থা, নিজেরা করি। **সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান** : সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, ধ্রুবতারা সাংস্কৃতিক সংসদ, বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, অপূর্ব সংসদ, গণশিল্পী সংস্থা, ফোকাসের বাইরে ও অশৃচি, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, ঋষিজ শিল্পী গোষ্ঠী, সপ্তকলি সাংস্কৃতিক ফোরাম চট্টগ্রাম, প্রত্যয় সাংস্কৃতিক আন্দোলন, প্রগতি সংস্কৃতি সংসদ, লেলিহান সাহিত্য সংস্কৃতি, গণসংস্কৃতি পরিষদ, উন্মেষ সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ, ধাবমান (সাহিত্য আন্দোলন) নারায়ণগঞ্জ, শ্রুততি (সাংস্কৃতিক একাডেমী) নারায়ণগঞ্জ, সূচনা অধ্যয়ন চক্র, কবি সুকান্ত স্মৃতি সংসদ, মাতৃধারা, আপেক্ষিক, সৃজন, চারণ, ক্রান্তি, সময়, কেন্দ্রীয় খেলাঘর, বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন, ঢাকা থিয়েটার, থিয়েটার, নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়, আরণ্যক, কারক নাট্য সম্প্রদায়, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতি। **পত্রিকা** : সমাজ চেতনা, আত্মপ্রতিকৃতি, সাপ্তাহিক নতুন কথা, পথিক, পাক্ষিক অনন্যা, সাপ্তাহিক সেবা, সাপ্তাহিক মেরু। **ব্যক্তি** : ড. প্রথমা রায় মণ্ডল, কলিকাতা; খন্দকার লিয়াকত আলী, মুক্তিযোদ্ধা, বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেন, বিচারপতি কাজী এবাদুল হক, বিচারপতি ফজলুল করিম, প্রাক্তন উপাচার্য মনিরুজ্জামান মিঞা, প্রাক্তন উপাচার্য আবদুল মান্নান, অতিরিক্ত এটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম, সাবেক স্বাস্থ্য সচিব টি. হোসেন, ড. হারুনুর রশিদ, মুক্তধারার চিত্তরঞ্জন সাহা, ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ, ফয়েজ আহমদ প্রমুখ। (অসম্পূর্ণ তালিকা -স.)

এই তালিকা থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসা মানুষের পরিধি অনুমান করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের প্রথম সারির কোনো নেতাকে শহীদ মিনারে দেখা যায়নি।

সময় দীর্ঘ করা যাবে না। কারণ মরচুয়ারি থেকে আনা মরদেহ মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট ৩ ঘণ্টার মধ্যে হস্তান্তর করতে হবে। অতএব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন পর্ব শেষ করতে হবে।

বিকেল ৫-০০টা : দু'মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে হাজার বছরের এক শ্রেষ্ঠ বাঙালির প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হল। মরদেহ প্রদান সম্পর্কিত উইলটি মাইকে পাঠ করে শোনানো হল। এর পর তার মরদেহ কাঁধে করে শহীদ মিনার চত্বর থেকে সম্মুখবর্তী সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের (২৪, ধানমন্ডিস্থ বেসরকারি বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল) অ্যাম্বুলেন্সে উঠিয়ে দেয়া হয়। মরদেহ প্রদান করেন সকলের পক্ষে বদরুদ্দীন উমর, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ এবং আহমদ শরীফ পরিবারের সদস্যবৃন্দ। অধ্যাপক আহমদ শরীফের

স্ত্রী সালেহা শরীফ, তাদের তিন পুত্র, তিন পুত্রবধূ এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যসহ অজস্র মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

বিকেল ৫-৪০ মি. : বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পক্ষে কলেজের এনাটমী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এম. আর. সরকার, ড. আফতাব উদ্দিন আহমেদ, ড. মাহবুবুর রহমান ও ড. বদির উদ্দিন মিলকীর নিকট মরদেহ হস্তান্তর করা হল। এনাটমি বিভাগের প্রধান জনাব সরকার লিখিতভাবে মরদেহ গ্রহণ করেন। সাক্ষী হিসেবে থাকেন বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম, অধ্যাপক মনসুর মুসা, অধ্যাপক প্রথমা রায় মণ্ডল, হরিসাধন দেব ব্রহ্মণ, হাসান ফকরী ও ফয়জুল হাকিম লালা।

১ মার্চ : দৈনিক রূপালী : 'মৌলবাদের বিরুদ্ধে আহমদ শরীফ প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।' একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি বিকেলে ঢাবি টিএসসিতে স্মরণসভার আয়োজন করে। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক কবির চৌধুরী। অন্যান্য যারা বক্তব্য রাখেন তারা হলেন কবি শামসুর রাহমান, ব্যরিস্টার শওকত আলী, সৈয়দ শামসুল হক, শাহরিয়ার কবির, ডা. আনোয়ারা সৈয়দ হক ও সাদিকুর রহমান পরাগ।

১ মার্চ : দৈনিক জনতা : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের ৯ জন শিক্ষক এক বিবৃতিতে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগে ড. আহমদ শরীফ চেয়ার স্থাপনের জন্য দাবি জানান। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন ড. সেলিম আল দীন, আফসার আহমদ, লুৎফর রহমান, হারুন-অর-রশীদ খান, সামাদ আহ্সান, খায়েরুজ্জামান মিতু, আমিনুল ইসলাম, সানোয়ার হোসেন ও ইউসুফ হাসান।

৪ মার্চ : প্রথম আলো : 'আহমদ শরীফ ছিলেন সাহসী, আপোসহীন ও সৃষ্টিশীল মানুষ।' ড. আহমদ শরীফ শ্রদ্ধা নিবেদন জাতীয় কমিটি ৩ তারিখ বুধবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত শোকসভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক লেঃ কর্নেল (অব) কাজী নুরুজ্জামান। এতে বক্তব্য রাখেন কবি শামসুর রাহমান, বদরুদ্দীন উমর, আহমদ শরীফের স্ত্রী সালেহা শরীফ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ফয়েজ আহমদ, আহমদ ছফা, ড. হুমায়ুন আজাদ, অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী, দিলীপ বড়ুয়া, আ.ফ.ম মাহবুবুল হক, আহমদ শরীফের ভ্রাতুষ্পুত্র বিচারপতি ফজলুল করিম, বশির আলহেলাল, আবু ইউসুফ, ড. নেহাল করিম প্রমুখ।

৬ মার্চ : দৈনিক প্রভাত : 'আহমদ শরীফ ছিলেন মুক্ত মনের সৎ মানুষ।' টিএসসির মিলন চত্বরে কর্নেল তাহের সংসদের উদ্যোগে বিকেলে অধ্যাপক আহমদ শরীফ স্মরণে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন তাহের সংসদের সভাপতি কামাল লোহানী। বক্তব্য রাখেন নির্মল সেন, প্রফেসর আহমদ কবির, অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, জাসদ নেতা আবু সাইয়িদ খান, ড. শফিকুজ্জামান, ড. আনোয়ার হোসেন, আবদুল আজিজ বাগমার, ডা. মোস্তাক হোসেন, রুহুল কুদ্দুস বাবু প্রমুখ।

৬ মার্চ : দৈনিক আজাদী : 'ড. আহমদ শরীফ বাংলা সাহিত্যকে ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ করেছেন।' চবি বাংলা বিভাগের উদ্যোগে ৫ তারিখে বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. শাহজামান মনিরের সভাপতিত্বে চবির প্রথম নজরুল অধ্যাপক ড. আহমদ শরীফ স্মরণে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন ড. ভুইয়া ইকবাল, ড. সৌরেন বিশ্বাস, চৌধুরী জহুরুল হক, গোলাম মোস্তফা, একেএম নুরুল ইসলাম ও মহীবুল আজিজ।

৬ মার্চ : আজকের কাগজ : জাতীয় হিন্দু পরিষদের সভাপতি প্রেমরঞ্জন দেবের সভাপতিত্বে জাতীয় হিন্দু পরিষদ কার্যালয়ে ২ ফেব্রুয়ারি ড. আহমদ শরীফ স্মরণে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে আলোচনা করেন সুধীন রায় নারায়ণ, ছত্র নারায়ণ দাস, অধ্যাপক এম.এল. চৌধুরী, গৌতম দাস, শান্তিরঞ্জন দাস মহারাজ, শৈলেন সিংহ রায়, সুনীল বর্মন ও শৈলেন্দ্র নারায়ণ পুরকায়স্থ।

৭ মার্চ : ভোরের কাগজ : 'ঢাবি বাংলা বিভাগে আহমদ শরীফ চেয়ার প্রতিষ্ঠার দাবি।' ঢাবি বাংলা বিভাগ কর্তৃক আই.বি.এ. মিলনায়তনে ড. সাঈদ-উর-রহমানের স্বভাপতিত্বে ড. আহমদ শরীফ স্মরণে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় ৬ মার্চ। এতে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক রাফিকুল ইসলাম মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সনজীদা খাতুন, অজয় রায়, সৈয়দ কামরুদ্দীন হোসেন, ওয়াকিল আহমদ, হুমায়ুন আজাদ, কাজী শহীদুল্লাহ, আবুল কাসেম ফজলুল হক, মোহাম্মদ আবু জাফর, নুরুর রহমান খান, আনিসুজ্জামান প্রমুখ।

৭ মার্চ : ভোরের কাগজ : ৪ মার্চ ঢাবি শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে অধ্যাপক আ.ফ.ম. ইউসুফ হায়দারের সভাপতিত্বে ড. আহমদ শরীফ স্মরণে শোকসভার আয়োজন করা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন আহমদ কবির, সাইদ-উর-রহমান, শফিকউজ্জামন, আ.ম.ম. শহীদুল্লাহ, রঙ্গলাল সেন, আবু জাফর, অজয় রায়, কে. এম. সাদউদ্দিন, তৌহিদুল আনোয়ার প্রমুখ।

১০ মার্চ : পটিয়া সমিতি কর্তৃক আহমদ শরীফ স্মরণে পুস্তিকা প্রকাশ। নাম : উপমহাদেশের খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী পটিয়ার কৃতী সন্তান আহমদ শরীফ স্মরণানুষ্ঠান।

১১ মার্চ : সংবাদ : 'ড. আহমদ শরীফ কর্ম ও চিন্তার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকবেন।' ১০ মার্চ তারিখে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে পটিয়া সমিত আয়োজিত ড. আহমদ শরীফ স্মরণে শোকসভায় সভাপতিত্ব করেন ড. ললিত মোহন নাথ। আলোচনা করেন ফয়েজ আহমদ, গাজীউল হক, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, কামাল লোহানী, মনসুর মুসা, আহমদ ছফা, বিচারপতি ফজলুল করিম, ড. বি. বি. চৌধুরী, হাসান ফকরী, আলহাজ সামসু-দ্দিন আহমদ, হরিসাধন দেব ব্রহ্মণ, ড. নেহাল করিম প্রমুখ।

১১ মার্চ : মানবজমিন : 'ড. শরীফের লাশ নিয়ে কেন এই আলোচনা!' ড. শরীফের স্বেচ্ছায় দানকৃত মরদেহ নিয়ে কৌতূহলের অন্ত নেই। শিক্ষার্থীদের শিক্ষার জন্য দান করা মরদেহ কীভাবে এবং কবে কখন ব্যবচ্ছেদ করা হবে সে বিষয়ে শিক্ষক/ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতামত থাকতে পারে। এক পক্ষ মনে করেন জানাজা ছাড়া লাশ শিক্ষার উপলক্ষ করা যায় কি না, এ বিষয়ে কিছুটা অস্বস্তি আছে। বিখ্যাত ব্যক্তির মরদেহ কাটাছেঁড়ার ব্যাপারেও দ্বিধা থাকতে পারে। তবে ধর্ম, আস্তিক/নাস্তিক বিষয়গুলি ব্যক্তিগত, সে সব বিষয়ে মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন। বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এনাটমি বিভাগের প্রধান ডা. এম. আর. সরকার বলেন, তাঁর মরদেহ যথাযথভাবে ফরমালিন দিয়ে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ছয়টি কার্ড অনুযায়ী লাশ ব্যবচ্ছেদ করা যায়। তারা সেভাবেই ড. শরীফের লাশ ব্যবচ্ছেদ করবেন। এই ছয়টি কার্ড হচ্ছে: এক. সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটি, দুই. ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটি, তিন. হেডনেক, চার. থোরাকস, পাঁচ. অ্যাবডোমেন এবং ছয়. ব্রেন আইবলের বিভিন্ন অংশ ব্যবচ্ছেদ।

১৩ মার্চ : দৈনিক পূর্বকোণ : 'ড. আহমদ শরীফ বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের একজন।' ১২ তারিখে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে ড. আহমদ শরীফ নাগরিক শোকসভা কমিটি কর্তৃক শোকসভা আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। আলোচনা করেন আবুল মোমেন, আসাদ চৌধুরী, এ. কিউ. এম. সিরাজুল ইসলাম, হরিসাধন দেব ব্রহ্মণ প্রমুখ।

২১ মার্চ : নতুন কথা : 'শরীফ স্যার সকলকে চক্ষুষ্মান ও সাহসী হতে বলেছেন।' ১৮ তারিখে শহীদ আসাদ মিলনায়তনে ওয়ার্কার্স পার্টির উদ্যোগে আয়োজিত শোকসভায় সভাপতিত্ব করেন কামরুল আহসান। বক্তব্য রাখেন রাশেদ খান মেনন, মামুনুর রশীদ, ড. নেহাল করিম, ড. মেসবাহ কামাল ও পরেশ চন্দ্র সাহা।

মার্চ : সাদাত উল্লাহ খান সম্পাদিত প্রতিবুদ্ধিজীবী ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা অধ্যাপক আহমদ শরীফকে উৎসর্গ করা হয়।

এপ্রিল : ড. আহমদ শরীফ নাগরিক শোকসভা কমিটি, চট্টগ্রাম কর্তৃক পুস্তিকা প্রকাশ। নাম : অসত্যের বিরুদ্ধে বিশাল দ্রোহী পুরুষ ড. শরীফ স্মরণে। সম্পাদক-হরিসাধন দেব ব্রহ্মণ।

১ এপ্রিল : দৈনিক আজকাল (কলকাতা) : ২৮ মার্চ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি মিলনায়তনে আহমদ শরীফ স্মরণ কমিটি কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি মিলিত প্রয়াসে ড. আহমদ শরীফ স্মরণে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বক্তব্য রাখেন বিজিত দত্ত, কার্তিক লাহিড়ী, অমলেন্দু দে, মামুনুর রশীদ, কামাল লোহানী , ড. প্রথমা রায় মণ্ডল প্রমুখ।

৩ এপ্রিল : জাতীয় যাদুঘর মিলনায়তনে সুমন ও সাবিনার সঙ্গীত সন্ধ্যায় সুমন তার গাওয়া গানগুলি অধ্যাপক আহমদ শরীফের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদন করেন।

৭ এপ্রিল : লেখা : 'ড. আহমদ শরীফ স্মরণসভা।' বাংলা একাডেমী সেমিনার কক্ষে ২৩ মার্চ তারিখে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক মনসুর মুসা। আলোচনা করেন আবুল কাসেম ফজলুল হক, আহমদ কবির, সাঈদ-উর রহমান, মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ, ড. শিরিন আফরোজা খানম। সভাপতিত্ব করেন ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন।

৯ এপ্রিল : দৈনিক ইত্তেফাক : ৭ এপ্রিল প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরাম খুলনা স্থানীয় উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তনে ড. আহমদ শরীফ স্মরণে শোকসভার আয়োজন করে। সভাপতিত্ব করেন ফোরামের আহ্বায়ক শেখ সাদী ভূইয়া। বক্তৃতা করেন অধ্যাপক আহমদ আলী মিয়া, অধ্যাপক আবদুল মান্নান, মুঈদ রহমান, আবদুল হামিদ আফগান, রবিউল ইসলাম, আশেক-ই-এলাহী ও আশেকুর রহমান।

১০ এপ্রিল : প্রথম আলো : 'ড. আহমদ শরীফের স্বপ্ন ছিল সংস্কারমুক্ত ও অসাম্প্রদায়িক।' ৯ তারিখে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে বাংলাদেশ লেখক শিবির শোকসভার আয়োজন করে। সভাপতি শওকত আলী। আলোচনা করেন বদরুদ্দীন উমর, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, হুমায়ুন আজাদ, আহমদ ছফা, মেসবাহ কামাল, ডা. মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

২২ এপ্রিল : ভোরের কাগজ : ' ড. আহমদ শরীফ ছিলেন আলোর শিখার মতো।' ২১

তারিখে ঢাবি টিএসসি মিলনায়তনে ভাষা সমিতির আয়োজনে ড. আহমদ শরীফ স্মরণে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক খান সারোয়ার মুর্শিদ। আলোচনা করেন ড. আনিসুজ্জামান, ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, আবুল কাসেম ফজলুল হক, আমিনুল ইসলাম, আবদুল মতিন খান, আবদুল আজিজ বাগমার, নির্মলেন্দু গুণ ও সুলতানা বেগম।

২৯ এপ্রিল : আজকের কাগজ : 'দেশ ও জাতির দুঃসময়ে প্রয়োজন দুঃসাহসী ও বিবেকবান মানুষ।' ২৮ তারিখে জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ড. আহমদ শরীফ স্মরণে শোকসভার আয়োজন করা হয়। সভাপতি ছিলেন প্রফেসর মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। প্রবন্ধ পাঠ করেন ড. অজয় রায়-'অধ্যাপক আহমদ শরীফ, জীবন ও সাধনা' এবং অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক-'অধ্যাপক আহমদ শরীফের বাংলা, বাঙালি ও বাঙালিত্বের ভাবনা'। আলোচনা করেন অধ্যাপক মনসুর মুসা।

৭ মে : জনকণ্ঠ : 'আহমদ শরীফের মূল্যায়ন হবে নানাভাবে, কিন্তু তাকে উপেক্ষা করা যাবে না।' ৬ মে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র মিলনায়তনে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের উদ্যোগে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। আলোচনা করেন হুমায়ুন আজাদ, আবুল কাসেম ফজলুল হক এবং রাশেদ খান মেনন। সভায় অধ্যাপক সালাউদ্দিন আহমেদের প্রবন্ধ পাঠ করে শোনানো হয়।

জুন : আবু ইউসুফ সম্পাদিত আত্মপ্রতিকৃতি ত্রৈমাসিকের জুন ১৯৯৯ সংখ্যা অধ্যাপক আহমদ শরীফকে উৎসর্গ করা হয় এবং এতে অধ্যাপক শরীফ বিষয়ক ৫টি প্রবন্ধ ছাপা হয়।

৩০ সেপ্টেম্বর : মানবজমিন : 'লাশ এখন আলো ছড়াচ্ছে।' সারোয়ার হোসেন : 'মানুষ মানুষের জন্য।' মুক্ত চিন্তার বুদ্ধিজীবী, আমৃত্যু শিক্ষক প্রয়াত আহমদ শরীফ মৃত্যুর ৬ মাস পরও জ্ঞান বিতরণের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছেন। ড. আহমদ শরীফ এখন শুয়ে আছেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজের এনাটমি বিভাগের ল্যাবরেটরিতে ডিসেকশন টেবিলের ওপরে। তার অবিকৃত মস্তিষ্কটি সংরক্ষণ করা হয়েছে কলেজের এনাটমি বিভাগের জাদুঘরে। প্রতিদিন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা তার মরদেহ নিয়ে কাটাছেঁড়া করছেন। আর এ থেকেই জ্ঞানার্জন করছেন মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের খুঁটিনাটি সব বিষয় সম্পর্কে। গত ১ জুলাই থেকে ড. আহমদ শরীফের মরদেহ ব্যবচ্ছেদের কাজ শুরু হয়েছে। এ ব্যবচ্ছেদ শেষ হতে আরো ১ মাস লাগবে। বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ড. আহমদ শরীফের মরদেহ ব্যবহৃত হচ্ছে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন শেখানোর কাজে। শিক্ষার্থীরা দেহ ব্যবচ্ছেদ করে হাতেকলমে শিখছেন শিরা, ধমনী থেকে শুরু করে মাংসপেশী, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুসসহ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনপ্রণালীর কাজ।

গতকাল বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এনাটমির বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক এম. আর. সরকার জানিয়েছেন, গত ১ জুলাই থেকে ড. আহমদ শরীফের মরদেহ ব্যবচ্ছেদের কাজ শুরু হয়েছে। ব্যবচ্ছেদের প্রথম দিন কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের প্রায় ২শ' মেডিক্যাল শিক্ষার্থী ও ১০ জন গাইড টিচার উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে ২৫ জন ছাত্রের একটি গ্রুপ প্রতিদিন ব্যবচ্ছেদ করছেন। এ ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা মানবদেহের খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান অর্জন করছেন।

অধ্যাপক এম. আর. সরকার ও সহযোগী অধ্যাপক নীলুফার বানু জানান, একেক অংশ একেকবার ব্যবচ্ছেদ করা হচ্ছে। প্রথম দফাতেই চামড়া কেটে নেয়া হয়। ইতোমধ্যে দেহের উপরের অংশের ব্যবচ্ছেদ শেষ হয়েছে। শিগগিরই পেটের ব্যবচ্ছেদ শুরু হবে। ৪টি ভাগে ব্যবচ্ছেদের বেশিরভাগ কাজই শেষের দিকে। বাকি ব্যবচ্ছেদ সম্পন্ন হতে আরো ১ মাস সময় লাগতে পারে। তারা জানান, মস্তিষ্কটি অবিকৃত অবস্থায় কলেজের জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ব্যবচ্ছেদ শেষে একইভাবে হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী, অন্ত্র, কিডনি, মুত্রথলিসহ বিভিন্ন ধরনের ভিসেরা কলেজের ল্যাবরেটরিতে সংগ্রহ করা হবে। তিনি জানান, একটি জারের মধ্যে ফরমালডিহাইড, কার্বলিক এসিড, রেকটিফাইড স্পিরিট ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে রেখে এগুলো সংগ্রহ করা হবে এবং শিক্ষার্থীদের জ্ঞানর্জনের কাজে ব্যবহার করা হবে। তারা জানান, যতদিন হাসপাতাল থাকবে, ততদিনই এগুলো সংরক্ষণ করে রাখা যাবে। অধ্যাপক এম. আর. সরকার আরো জানান, তবে দেহের হাড়গুলো সংগ্রহ করা হবে না। কারণ, এ হাসপাতালে সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। ব্যবচ্ছেদ শেষে ফেলে দেয়া হবে। সাধারণভাবে হাড়গুলো আজিমপুর কবরস্থানে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তবে ড. আহমদ শরীফের মরদেহের ক্ষেত্রে হাড়গুলো কী করা হবে সে বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। তিনি মৃত্যুর আগে বলে গেছেন, জানাজা পড়া যাবে না। কিন্তু দাফন করা যাবে কি না সে বিষয়ে কিছু বলেননি।

গতকাল বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের তৃতীয় তলায় এনাটমি বিভাগের ল্যাবরেটরিতে গিয়ে দেখা যায়, ল্যাবরেটরির একাংশে দু'টি ডিসেকশন টেবিলের ওপর রয়েছে দুটি মরদেহ। সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা দু'টি মরদেহের একটি ড. আহমদ শরীফের। অপরটি অন্য এক জনের। ড. আহমদ শরীফের মরদেহটির অর্ধেক ব্যবচ্ছেদ সম্পন্ন হয়েছে। ল্যাবরেটরির একজন কর্মচারী জানান, মরদেহটি এখন ডিসেকশন টেবিলে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজের এমবিবিএস প্রথম বর্ষের ছাত্র নাফিস খান অংশ নিয়েছেন ড. আহমদ শরীফের মরদেহ ব্যবচ্ছেদে। তিনি বলেছেন, জীবিত মানুষ ও মরদেহের মধ্যে পার্থক্য অনেক। চেনার কোনো উপায় নেই। তবে আমরা জানতাম এটি ড. আহমদ শরীফের মরদেহ। একই বর্ষের ছাত্রী লাভিভা ইয়াসমিন বলেন, প্রথম প্রথম ব্যবচ্ছেদে খারাপ লাগত। এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছি। প্রথম বর্ষের অপর এক ছাত্র নীলুফার সুলতানা জানান, প্রতিদিন ২ ঘণ্টা করে আমাদের শব ব্যবচ্ছেদের কাজ করতে হয়। তারা ৩ জনই ড. আহমদ শরীফের শব ব্যবচ্ছেদ করছেন।

কেবল ড. আহমদ শরীফ নন, বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রয়েছে স্বশিক্ষিত চিন্তাশীল মানুষ আরজ আলী মাতব্বরের দেহ। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে এনাটমি মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে শিল্পী ও সমাজকর্মী মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়ের কংকাল। তিনিই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে দেহদানকারী প্রথম ব্যক্তি। একই মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের কংকাল। তারা সবাই শিক্ষার জন্য তাদের মরদেহ উৎসর্গ করে গেছেন।

২০০০

২৩ ফেব্রুয়ারি : 'আহমদ শরীফ স্মারক সংকলন' প্রকাশ; সম্পাদনা শাহ আলম শান্তি ও ওয়ালী রহমান; প্রকাশক-সংলাপ, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ফোরাম; ল্যুদভিজটার ১৬৫০, ৬৩০৬৭ অফেন বাখ, জার্মানী; পৃ. ১৩৭, মূল্য ১০০ টাকা।

২৪ ফেব্রুয়ারি : আজকের কাগজ : লাশ হয়ে মাটির উর্বরতা নয় বাড়াচ্ছে জ্ঞানের পরিধি : সেলিম জাহেদ : মৃত্যুর প্রায় সাড়ে ৪ বছর আগে ড. আহমদ শরীফ অসিয়তনামায় লিখেছিলেন, 'চক্ষু শ্রেষ্ঠ প্রত্যঙ্গ, আর রক্ত হচ্ছে প্রাণ প্রতীক। কাজেই গোটা অঙ্গ কবরে কীটের খাদ্য হওয়ার চেয়ে মানুষের কাজে লাগাইতো বাঞ্ছনীয়।' তাই, এই মনীষী মৃত্যুর আগে শ্রেষ্ঠ প্রত্যঙ্গ দু'টি দিয়েছিলেন 'সন্ধানী'কে, আর দেহটি অর্পণ করেছেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের জন্যে।

আহমদ শরীফের মরদেহটি গতকালও ব্যবহৃত হয়েছে বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমি শিক্ষার্থীদের দেহ ব্যবচ্ছেদের কাজে। পরিবারের সদস্যরাও এক বছরের মাথায় দেখতে যান পরমাত্মীয় ড. আহমদ শরীফকে।

গতকাল বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজের তৃতীয় তলায় গিয়ে সাক্ষাত পাওয়া যায় বাংলা সাহিত্যের বিদগ্ধ পণ্ডিত ড. আহমদ শরীফের। তিনি শুয়ে আছেন মেডিক্যালের অ্যানাটমি বিভাগের ল্যাবরেটরি ডিসেকসন টেবিলের ওপর। সাদা কাপড়ে ঢাকা উত্তরমুখি মরদেহটির কাছে যাওয়া যাচ্ছিলো না রাসায়নিক দ্রব্য ফরমালিনের ঝাঁঝের কারণে। মৃতদেহ প্রিজার্ভেসনের জন্যে ব্যবহার করা হয় এই ফরমালিন।

বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমি বিভাগের প্রধান ডা. এম. আর. সরকার গতকাল এ প্রতিবেদককে জানান, ড. আহমদ শরীফের দেহ ব্যবচ্ছেদের কাজ প্রায় শেষ। বাকি আছে শুধু বাম হাত ও ডান পাটি।

মেডিক্যাল সূত্রে জানা যায়, অ্যানাটমিতে মৃতদেহ কাজে লাগে দু'ভাবে। প্রথমত দেহ ব্যবচ্ছেদ, তারপর স্কেলেটন বা কঙ্কাল হিসেবে। ব্যবচ্ছেদের জন্যে ব্যবহৃত দেহটি দীর্ঘদিন রাসায়নিক পদার্থে ডুবিয়ে রাখার ফলে কঙ্কালটি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষায় আর কোনো কাজে আসে না। ব্যবচ্ছেদহীন দেহ থেকে যে কঙ্কাল হয় সেই কঙ্কাল থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা শিখতে পারে অস্থিবিদ্যা। তাই ড. আহমদ শরীফের কঙ্কালটি রাসায়নিক দ্রবণের ফলে শিক্ষার আর কোনো কাজে না আসায় মেডিক্যাল কলেজ সংরক্ষণ করবে না।

মৃত্যুর পর প্রকাশিত তিনটি গ্রন্থ : কালোচিত কিছু বিবেচ্য বিষয়, ফাল্গুন ১৪০৬, ফেব্রুয়ারি ২০০০, প্রচ্ছদ সমর মজুমদার, পৃষ্ঠা , মূল্য ৮০ টাকা, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

কিছু বিশ্বাসের বাহ্যিক পুনর্বিবেচনা, ফাল্গুন ১৪০৬, ফেব্রুয়ারি ২০০০, প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ, পৃষ্ঠা ১৫০, মূল্য ১২০ টাকা, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

বিশ্বাসবাদ-বিজ্ঞানবাদ-যুক্তিবাদ-মৌলবাদ, ফাল্গুন ১৪০৬, ফেব্রুয়ারি ২০০০, প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ, পৃষ্ঠা ১১২, মূল্য ১০০০ টাকা, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

পরিশিষ্ট

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

চিন্তামূলক গ্রন্থ

১. *বিচিত চিন্তা,* কথাকলি, ১৯৬৮;
২. *সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা,* মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৬৯;
৩. *স্বদেশ অন্বেষা,* খান ব্রাদার্স, ১৯৭০;
৪. *জীবনে সমাজে সাহিত্যে,* আদিল ব্রাদার্স, ১৯৭০;
৫. *সৈয়দ সুলতান তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ,* বাংলা একাডেমী, ১৯৭২;
৬. *যুগ-যন্ত্রণা,* কথাকলি, ১৯৭৪;
৭. *কালিক ভাবনা,* মুক্তধারা, ১৯৭৪;
৮. *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ,* মুক্তধারা, ১৯৭৭;
৯. *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (১ম খণ্ড), বর্ণ মিছিল, ১৯৭৮;
১০. *প্রত্যয় ও প্রত্যাশা,* অক্ষর, ১৯৭৯;
১১. *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (দ্বিতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩;
১২. *কালের দর্পণে স্বদেশ,* মুক্তধারা, ১৯৮৫;
১৩. *মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য,* বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫;
১৪. *বাঙলা ভাষাসংস্কার আন্দোলন,* বাঙলাদেশ ভাষা সমিতি, ১৯৮৬;
১৫. *ইদানীং আমরা,* মুক্তধারা; ১৯৮৬;
১৬. *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ,* বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭;
১৭. *এবং আরো ইত্যাদি,* মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৮৭;
১৮. *বাঙালীর চিন্তা চেতনার বিবর্তন ধারা,* ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ১৯৮৭;
১৯. *বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি,* কর্নেল তাহের সংসদ, ১৯৮৯;
২০. *একালে নজরুল,* মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯০;
২১. *বাঙলাদেশের সাম্প্রতিক চালচিত্র,* মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯০;
২২. *মানবতা ও গণমুক্তি,* ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ১৯৯০;
২৩. *সাম্প্রদায়িকতার ও সময়ের নানা কথা,* প্রসূন প্রকাশনা, ১৯৯১;
২৪. *গণতন্ত্র, সংস্কৃতি, স্বাতন্ত্র্য, বিচিত্র ভাবনা,* আফসার ব্রাদার্স, ১৯৯১;
২৫. *বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব,* সাহিত্যলোক (কলিকাতা), ১৯৯২;

২৬. *জাগতিক চেতনার বিচিত্র প্রসূন,* বস্তু প্রকাশন, ১৯৯২;
২৭. *সংস্কৃতি,* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২;
২৮. *শাস্ত্র, সমাজ ও নারীমুক্তি,* বস্তু প্রকাশন, ১৯৯৩;
২৯. *সংকট : জীবনে ও মননে,* বিদ্যা প্রকাশ, ১৯৯৩;
৩০. *মুক্তি নিহিত : নতুন চেতনায় ও নতুন চিন্তায়,* আফসার ব্রাদার্স, ১৯৯৩;
৩১. *প্রগতির বাধা ও পন্থা,* সন্দেশ, ১৯৯৪;
৩২. *এ শতকে আমাদের জীবনধারার রূপরেখা,* চার্বাক, ১৯৯৪;
৩৩. *সময়, সমাজ, মানুষ,* বিদ্যাপ্রকাশ, ১৯৯৫;
৩৪. *দেশ-কাল-জীবনের দাবি ও সাক্ষ্য,* আলীগড় লাইব্রেরী, ১৯৯৫;
৩৫. *স্বদেশচিন্তা,* সন্দেশ, ১৯৯৭;
৩৬. *জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা,* বিদ্যাপ্রকাশ, ১৯৯৭;
৩৭. *উজান স্রোতে কিছু আষাঢ়ে চিন্তা,* মুক্তধারা, ১৯৯৮;
৩৮. *মানস মুকুরে বিম্বিত স্বদেশ,* প্রাচ্যবিদ্যা প্রকাশনা, ১৯৯৮;
৩৯. *স্বদেশের স্বকালের সমাজের চালচিত্র,* আগামী, ১৯৯৮;
৪০. *বিশ শতকে বাঙালী,* ঈক্ষণ [নবজাতক, কলিকাতা], ১৯৯৮;
৪১. *নির্বাচিত প্রবন্ধ,* আগামী, ১৯৯৯;
৪২. *বিশ্বাসবাদ, বিজ্ঞানবাদ, যুক্তিবাদ, মৌলবাদ,* আগামী, ২০০০;
৪৩. *কালোচিত কিছু বিবেচ্য বিষয়,* আগামী, ২০০০;
৪৪. *কিছু বিশ্বাসের বাহ্যিক পুনর্বিবেচনা,* আগামী, ২০০০;
৪৫. *অপ্রকাশিত-অগ্রন্থিত,* সময় প্রকাশন (যন্ত্রস্থ)।

সম্পাদিত গ্রন্থ

১. *লায়লী মজনু,* দৌলত উজির বাহরাম খাঁ, বাংলা একাডেমী, ১৯৫৭;
২. *পুথি পরিচিতি,* আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, বাঙলা বিভাগ, ১৯৫৮;
৩. *তোহ্‌ফা,* আলাউল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাঙলা বিভাগ, ১৯৫৮;
৪. *সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ,* মুহম্মদ খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাঙলা বিভাগ, ১৯৫৯;
৫. *মধুমালতী,* মুহম্মদ কবীর, বাংলা একাডেমী, ১৯৫৯;
৬. *মুসলিম কবির পদসাহিত্য,* বাঙলা একাডেমী, ১৯৬১;
৭. *মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা,* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১ (মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সহযোগে), মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৬১;
৮. *মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ,* বাংলা একাডেমী, ১৯৬২;
৯. *রসুলবিজয়,* জয়েনউদ্দীন, বাঙলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৪;
১০. *নীতিশাস্ত্র বার্তা,* মুজাম্মিল, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৫;
১১. *পুথির ফসল,* বিভিন্ন দোভাষী কবির রচনা সংকলন, পাকিস্তান পাবলিকেশন, ১৯৬৬;
১২. *শা'বারিদ খান গ্রন্থাবলী,* বাংলা একাডেমী, ১৯৬৬;

১৩. *মধ্যযুগের রাগতালনামা,* বাংলা একাডেমী, ১৯৬৭;
১৪. *চন্দ্রাবতী,* কোরেশী মাঘন, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৭;
১৫. *বাঙলার সূফীসাহিত্য,* বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯;
১৬. *নসিহতনামা,* আফজাল আলী, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯;
১৭. *বাউলতত্ত্ব,* বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩;
১৮. *হিন্দু কবির পদসাহিত্য,* বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩;
১৯. *সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল,* দোনা গাজী, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫;
২০. *সওয়াল সাহিত্য,* বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬;
২১. *সিকান্দরনামা,* আলাউল, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭;
২২. *নবীবংশ,* সৈয়দ সুলতান, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮;
২৩. *রসুলচরিত,* সৈয়দ সুলতান, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮;
২৪. *কিফায়তুল মুসল্লিন ও কায়দানী কিতাব,* শেখ মুতালিব, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮;
২৫. *বাউল কবি ফুলবাস উদ্দীন ও নসরুদ্দীনের পদাবলী,* বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮;
২৬. *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান,* বাংলা একাডেমী, ১৯৯২;
২৭. *বিদ্যাসুন্দর,* শ্রীধর কবিরাজ, সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, ঢাবি, ১৩৬৪;
২৮. *আওরা দ্য বারোজ প্রশস্তি,* এতিম কাসেম, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৫;
২৯. *য়য়নবের চৌতিশা;* শেখ ফয়জুল্লাহ, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৬;
৩০. *আরবী ত্রিশ হরফে মুনাজাত,* মুহম্মদ ফসীহ, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৬;
৩১. *মুসানামা,* মুহম্মদ আকিল, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৭;
৩২. *রাগতালনামা ও পদাবলী,* আলাউল, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৭০;
৩৩. *খণ্ডলে কুকির হামলার ইতিকথা,* গুলবখশ, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ১৩৭৪;
৩৪. *ব্যাড়ী ভক্তি তরঙ্গিনী,* বিদ্যাপতি (১৪ শতকের কবি), ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ১৩৭৫;
৩৫. *তামাকু পুরাণ,* ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ১৩৮০;
৩৬. *ভাষা কথাক্রম ব্যাকরণ,* উইলিয়াম কেরী, ভাষাসাহিত্য পত্র, বাঙলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮০;
৩৭. *চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ,* ব্রজমোহন দাস, সাহিত্য পত্রিকা, বাঙলা বিভাগ, ঢাবি, ১৩৮৫;
৩৮. *গৌরী মঙ্গল,* কবিচন্দ্র মিশ্র, পাণ্ডুলিপি, বাঙলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮৬;
৩৯. *সাহজালাল মধুমালা উপাখ্যান,* সতেরো শতকের কবি মুকুল ওর্ফে মঙ্গল, বাঙলা বিভাগ, ঢাবি, ১৪০২;
৪০. *রেজওয়ান শাহ উপাখ্যান,* কবি শমসের আলী, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৪০৩;
৪১. *নসিবনামা,* সতেরো শতকের রোসাঙ্গ কবি রাজ্যের কবি মর্দান, সাহিত্য পত্রিকা, ঢাবি, বাঙলা বিভাগ, ১৪০২;
৪২. *হাজার মসায়েল ও নূরনামা,* রোসাঙ্গ কবি আবদুল করিম খন্দকার, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৪০৪;
৪৩. *শরীয়তনামাও মুসার সাওলাল,* খোন্দকার নসরুল্লাহ, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৪০৪;
৪৪. *মুসার সাওয়াল,* নসরুল্লাহ খোন্দকার, সাহিত্য পত্রিকা ১৪০৪ ২য় সংখ্যা ফাল্গুন ১৪০৪;

৪৫. *সাধক কবি হাজী মুহম্মদ*, বাংলা একাডেমী, ১৩৬৭;
৪৬. *একাত্তরের ঘাতক ও দালালেরা কে কোথায়*, ড. আহমদ শরীফ, কাজী নুরউজ্জামান, শাহরিয়ার কবির, মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ১৯৮৭;
৪৭. *Genocide '71, An Account of the Killers and Collaborators,* Translation from Bangla, Translated by Niaz Zaman, Edited by Dr. Ahmed Sharif, Kazi Nuruz Zaman, Dr. Serajul Islam Chowdhury, Shahriar Kabir, Muktijuddha Chetona Bikash Kendra, 1987, Dhaka, Bangladesh.

আহমদ শরীফ
প্রাক্তন অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বাড়ি ২৫-বি, সড়ক-১, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা ১২০৫ ॥ টেলিফোন : ৫০৩৩৯৭

।অসিয়তনামা।

আমি সুস্থ শারীরিক ও সুস্থ মানসিক অবস্থায় আমার দৃঢ় সঙ্কল্প বা অঙ্গীকার স্থির সিদ্ধান্ত রূপে এখানে পরিত্যক্ত করছি।

আমার মৃত্যুর পরে আমার মৃতদেহ চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের অ্যানাটমি [Anatomy] ও ফিজিওলজি [Physiology] সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের কাজে ব্যবহারের জন্যে ঢাকার ধানমন্ডিস্থ বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজে অর্পণ করতে চাই।

আমার এ বাঞ্ছার বাস্তবায়নে আমি আমার সন্তানদের ও আত্মীয়স্বজনদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি। চক্ষুদান ও রক্তদান তো চালুই হয়েছে। চক্ষু শ্রেষ্ঠ প্রত্যঙ্গ, আর রক্ত হচ্ছে প্রাণ-প্রতীক। কাজেই গোটা অঙ্গ কবরে কীটের খাদ্য হওয়ার চেয়ে মানুষের কাজে লাগাইতো বাঞ্ছনীয়।

আহমদ শরীফ
১৯.৫.৯৫

সাক্ষী

১। আবদুল মতিন খান (আবদুল ১৯/০৫/১৯৯৫)
অবসরপ্রাপ্ত উপসচিব
অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার
বাড়ি-২, সড়ক-৫, ব্লক-এফ
সেকশন-২, মীরপুর,
ঢাকা-১২১৬

২। আবুল মাসুদ ১৯-৫-৯৫
অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিসচিব,
২৬, সিদ্ধেশ্বরী রোড,
ঢাকা-১২১৭

৩। সাজেদা শরীফ
১৯-৫-৯৫

চ ১২৭০৫৬২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রাক্তন প্রফেসর আমি ডক্টর আহমদ শরীফ, পিতা-মৃত আবদুল আজিজ, স্বেচ্ছায় শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থাবস্থায় আমার মরণোত্তর দেহ বা লাশ ধানমণ্ডীস্থ বাঙলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ মর্গে শিক্ষার্থীদের অ্যানাটমি ফিজিওলজি ইত্যাদি শেখার কাজে লাগবে জেনে বাঙলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পণ করার সংকল্প গ্রহণ করেছি। এ বিষয়ে আমার স্ত্রী ও পুত্রগণের সম্মতি রয়েছে। কাজেই মৃত্যুর পরেই আমার মৃতদেহ উক্ত কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে অর্পণ করার জন্যে আমার স্ত্রী ও পুত্রদের নির্দেশ দিচ্ছি। আমার জানাজার প্রয়োজন নেই।

Signed affixed hereto on
oday the ... ... of ... ... 19 ...
or Mr./Mrs ... ...
ho Dio. Who ... ...
Who has been identified by ...
e. ... ... of ... address

আহমদ শরীফ
১১.১২.৯৯

আহমদ শরীফ
পিতা-মৃত আবদুল আজিজ
(আদি নিবাস গ্রাম-সুচক্রদণ্ডী, থানা-পটিয়া, জিলা-চট্টগ্রাম) বাড়ি নম্বর-২৫/বি, সড়ক-১, ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৫।

১১.১২.৯৯
প্রফেসর আবদুল রহমান
মেডিক্যাল অফিসার ম্যাজিস্ট্রেট,
ঢাকা।

যাদেব করিম ১১/১২/৯৯
যাদেব করিম
এডভোকেট
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
বাড়ী-২৫/বি, সড়ক-১
ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৫।

PROFESSOR &
... OF T.E DEPARTMENT
...
... MEDI COLLEGE (D... ...
...

আলোকচিত্র